১৪২১

পরিচয়

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২০—বৈশাখ-আশ্বিন ১৪২১
ফেব্রুয়ারি-অক্টোবর ২০১৪
৭-১২, ১-৩ যুগ্ম সংখ্যা ৮৩ বর্ষ

সাক্ষাৎকার

কবিতা - ১

গল্প - এক :

কবিতা ২

গল্প - দুই :

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকের কথা

এবারের শারদ-প্রতিবেদন কিছুটা বিষণ্ণতা মিশ্রিত। পরপর দুটি আকস্মিক মৃত্যু আমাদের শুধু বেদনাহতই করেনি পরিচয়-এর প্রকাশনা-সংক্রান্ত পরিকল্পনাও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। গ্রাহক ও পাঠকেরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, নিয়মিত সংখ্যা প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটেছে। গ্রাহকেরা একটি প্রাপ্য-সংখ্যা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

কারণটি খুলে বলা দরকার। প্রথমে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কবি শুভ বসুর আকস্মিক প্রয়াণ ঘটেছিল। তার কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেলেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অজয় চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয়জন পত্রিকা প্রকাশের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পত্রিকা-প্রকাশের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই মধ্যিখানের একটি সংখ্যার প্রস্তুতি সত্ত্বেও তা প্রকাশ করা যায়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়। এই দুই সহযোগীর অকাল-প্রয়াণে পরিচয় ব্যথিত। পরিচয়-এর লেখক, পাঠক ও বন্ধুরা মিলে পত্রিকা-অফিসেই স্মরণ-সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এবারে শারদ-সংখ্যার কথা। গত দু'বছরের মতো এবারেও একটি বিশেষ নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচিত করে ক্রোড়পত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে অভ্র ঘোষ, অজয় চট্টোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল। অজয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে দু-একজনের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি, দু'একটি প্রত্যাশিত রচনা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হাতে না আসায় ক্রোড়পত্রের পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি বলেই মনে হয়। তবে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ রচনা নিঃসন্দেহে ক্রোড়পত্রে আছে। পরিচয়-এর দীর্ঘকালীন বন্ধু প্রণব বিশ্বাস নিজেই উদ্যোগী হয়ে দুটি লেখা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লাভ নেই। এটা তাঁর স্বভাব।

এ বছর প্রবাদ-প্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর ওপরে এই সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে পরিচয়-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। অথচ সম্প্রতি একটি প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় এ সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। তৎকালীন পরিচয়-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার এবং শম্ভু মিত্রের প্রাসঙ্গিক বাদপ্রতিবাদের মূল্যবান রচনা দুটি এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল। পাঠকেরা নিজেরাই এ থেকে সিদ্ধান্ত

নিতে পারবেন। শুধু এই প্রসঙ্গে বিনীতভাবে একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। এই বাদ-প্রতিবাদের অনেক পরে পরিচয়-এর ঘরে সতরঞ্চি পেতে একদা শম্ভু মিত্র তাঁর চাঁদ বণিকের পালা পাঠ করেছিলেন। সেদিন পত্রিকা অফিসে ভিড় উপচে পড়েছিল। অতএব গোপাল হালদার-শম্ভু মিত্রের বাদপ্রতিবাদের পরেও তাঁর সঙ্গে যে পরিচয়-এর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি, এটা তারই নিদর্শন।

প্রবন্ধ ছাড়া যথারীতি প্রতিষ্ঠিত লেখকের গল্প আছে, আছে কিছু কবিতা। বিজ্ঞাপন আমরা পাই না, বলা চলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না, তথাপি এভাবেই নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'পরিচয়'। এভাবেই চলার প্রত্যাশা সে রাখে। কিছু গ্রাহক ও পাঠকই তার ভরসা।

পত্রিকা-প্রকাশনার মূল পরিকল্পনাটি করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, তার যোগ্য সহকারী অনিল ঘোষ। কবিতা সংগ্রহের ব্যাপারে যথারীতি সক্রিয় ভূমিকা নেন কবি অমিতাভ চক্রবর্তী। যোগাযোগের দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন শ্রী প্রবীর সাহা। এঁরা কেউ কৃতজ্ঞতার দাবি করেন না। কারণ, সকলেই পরিচয়-এর মানুষ।

পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের শারদ-শুভেচ্ছা জানিয়ে এই প্রতিবেদনের সমাপ্তি ঘটুক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

মুখোমুখি

এক. ক্যাজুয়েলটি : গোপাল হালদার
দুই. প্রত্যুত্তরে : শম্ভু মিত্র

শিল্পীদের ব্যক্তি অবস্থান, সৃষ্টির অবস্থান স্থাণুবৎ, জড়বৎ হতে পারে না। চিরকালীন এই সত্য উপলব্ধিতে কখনও কখনও বিতর্কিত সৃষ্টি হয়েছে। পরিচয়-এর পৃষ্ঠায় সেই বিতর্ক সর্বদায় লালিত হয়েছে, কখনও সরাসরি, কখনও প্রচ্ছন্নে। শিল্পীদের দ্বন্দ্বে, শিল্পের দ্বান্দ্বিকতায় পরিচয়-এর অবস্থান স্পষ্ট এবং এই কারণেই সমস্ত মতকেই সম্মান দিতে জানে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত এরকমই ভিন্ন মতের দুটি লেখা পুনরায় প্রকাশে ব্রতী হয়েছে প্রাসঙ্গিক কারণে। বিতর্ক চলতেই পারে। বিতর্কই নতুন মতবাদের জন্ম দিতে পারে।

মিশ্র সংস্কৃতির অনন্য লীলাভূমি ত্রিপুরা

সংহতি চেতনাই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

প্রিয়ভূমি এই আগরতলাকে

আরো

সবুজ

সুন্দর

পরিচ্ছন্ন

ও

নির্মল

করার লক্ষ্যে

চলুন

আমরা সবাই হাতে হাত রাখি

গড়ে তুলি এক স্বপ্নের শহর

আগরতলা পুর নিগম

ক্যাজুয়েলটি

যুদ্ধে নাকি সত্য হয় 'ক্যাজুয়েলটি'। ভারতীয় নির্বাচন সে অর্থে যুদ্ধ নয়। কারণ, তার অনেক আগেই সত্য একেবারে সিংহমার্কা। 'সত্যমেব জয়তে' রূপে ক্যাজুয়েলটি হয়ে গিয়েছে। কাজেই নির্বাচনে তার ক্যাজুয়েলটি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভোটাভুটি সত্য দিয়ে হয় না, সত্য আশ্রয় করেও হয় না। হয় ক্ষমতার জন্য, অর্থ ও অনর্থকে আশ্রয় করে। অর্থ ও অনর্থের ব্যবহার সব রকমেই এ ক্ষেত্রে fair। আর যুগটা যখন দেনাপাওনার যুগ তখন কেন মনে করব অর্থটা অনর্থ, কিম্বা অনর্থ বস্তুটা নিরর্থক?

"সকল মানুষেরই দাম আছে"—তবে সাংবাদিকের থেকে বিসাম্বাদিকের দাম ভোটের দিনে আরও বেশি। মানুষের থেকে অনেক বেশি দাম মর্কটের এবং সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির। বাজারটায় যখন পড়তা তখন সংস্কৃতির ব্যাপারী কি above the battle থাকবে? আর তার চোখের সামনে দিয়ে নির্বাচনের 'বাস' সর্বজাতীয় যাত্রী নিয়ে ধুলো উড়িয়ে, পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে, যান্ত্রিক বিষাণ বাজিয়ে চলবে রাজপুরীর দিকে? আমরা অন্তত সংস্কৃতি-কর্তাদের এ রকম আচরণের কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাই না। তাশখন্দে না হয় 'কলোনিয়ালিজম' শব্দটাই অস্পৃশ্য এবং তাতে সাহিত্যিক অধ্যাত্ম-শুচিতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো দিন রাজনীতিকে পরিত্যাজ্য মনে করেন নি। যে বাঙালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা সোভিয়েত-এর বোমা-বিস্ফোরণে শিউরে উঠেন, তাঁদের কেউ কেউ আবার ব্রিটিশ-মার্কিন বোমা-পরীক্ষায় এখন হয়তো রোমাঞ্চিত হন—কারণ তাঁরা রবীন্দ্র-মানবতার ঐতিহ্যবাহী। আর রবীন্দ্রনাথ যদি হিজলীর পরে মনুমেন্টের তলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হলে বারাসতের মাঠেই বা উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্কর ছুটে গিয়ে দাঁড়াবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ বাণীর পশারী, ওঁরা ভঙ্গির ব্যবসায়ী। এই বোড়ের চালে মুখে যদি মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে বাঁচাতে উদয়শঙ্করের ফুটো নৌকোকে চাপান দেন, শম্ভুবাবুদের আড়াই-চালের অশ্ব নীতিকে আঁকড়ে ধরেন, আর মনোজবাবুদের গজ-গতিকেও বিনা অঙ্কুশেই তাড়িত করেন, তা কি তাঁদের অপরাধ? উদয়শঙ্কর রাজনীতি বোঝেন না (এ সত্য কথা কে না মানে?), তিনি মন্ত্রীনীতিরই অনুগামী (এ কথা বা কে না মানে)। এরূপেই উল্টোদিকে শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথাও তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন। তা হলে তাঁর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি ও হুমায়ুনী কাব্যামৃত পরিবেশন অর্থনীতি হতে যাবে কেন? আমরা বিশ্বাস করি, তাও রাজনীতি, তবে এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর রাজনীতি—জনসমাজের রাজনীতির থেকে অনেক বেশি যা দামী। কারণ, জনতার রাজনীতি তো কুড়ি বৎসর শম্ভুবাবু দেখেছেন, কই, কুড়ি বৎসরেও তো সে রাজনীতির কোনো ফল দেখেন নি? শুধু 'ফেলই' দেখেছেন—১৯৪৩ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই তো অভিজ্ঞতা। অথচ এ কালের মধ্যেই মন্ত্রীদের রাজনীতির প্লাবন তো পদবীতে-পারিতোষিকে-সম্মানে-সংগঠনে কত খ্যাত-অখ্যাত এবং কুখ্যাত—কত ক্ষেত্রকেই সুজলা, সুফলা করে তুলল। তিনি বা এমন সুফলা রাজনীতিকে

আশ্রয় করতে সফল হবেন না কেন? মনোজ বসুর তো চিরদিনেরই কথা "ভুলি নাই"—"রাজনীতিও চিনি, সাহিত্যও চিনি, কিন্তু ব্যবসা ভুলি নাই।" তিনি চীনময় হোন্, স্নাবময় হোন্, বাম্ময় হোন্—দেশে দেশে যতই ঘুরুন, যতই নাচুন, যতই হাসুন, যতই ভালোবাসুন—আহার্যপাত্রে যেমন, আহরণ ভাঁড়ার সম্বন্ধেও তেমনি তাঁর সেই একই কথা "ভুলি নাই।"

কেউ ভুল করেন নি—সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির দামটা যখন বেশি সংস্কৃতিকে ক্যাজুয়েলটি হতেই হবে, Every man has his price. এটাই এই নির্বাচনী রাজনীতির শিক্ষা।

গোপাল হালদার

পরিচয়—ফাল্গুন, ১৩৬৮ (১৯৬১)—৩১ বর্ষ, ২ সংখ্যা সংস্কৃতি সংবাদ

[বানান অপরিবর্তিত]

প্রত্যুত্তরে

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

গত ফাল্গুন ১৩৬৮ সংখ্যায় শ্রীগোপাল হালদার কয়েকটি উক্তি করেছেন তারই সম্পর্কে এই চিঠি। অনুগ্রহপূর্বক চিঠিটি আপনাদের আগামী সংখ্যায় ছাপালে বাধিত হবো।

১। শ্রীগোপাল হালদার বলেছেন,—'শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথা তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন।'

যে-কেউ আমার বিশ বছরের ইতিহাস জানেন তাঁদের পক্ষে এ ভুল অস্বাভাবিক। আমি আমার কিশোর বয়স থেকেই থিয়েটার ভালোবেসেছি, এবং যা কিছু করেছি সব থিয়েটারের জন্যই করেছি।

২। আমি কোনও নির্বাচনী প্রচারকার্য্য করতে যাই নি। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম একটি সাংস্কৃতিক সভায় যাওয়ার জন্য। এর বেশী কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না, কারণ—

৩। যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায়, এবং যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমার ভালো বলেই মনে হোত, তাতে কী হোত? গোপালদার পক্ষে গেলেই কি আমি মহৎ শিল্পী হতাম? আর না গেলেই কি আমার সংস্কৃতি বিকৃত? মহৎ শিল্পী হবার পথ তো তাহলে বড়ো সোজাই হোত। এবং গোপালদা যদি ভবিষ্যতে কোনওদিন মন্ত্রী হন তাহলে তখন তাঁকে সমর্থন করায় মন্ত্রীনীতি হবে না তো? ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের মৌলিক অধিকার আছে যে-কোনও প্রার্থীকে সমর্থন করার। সেইটাই ডিমোক্র্যাসীর অধিকার। এবং সেইজন্য যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায় তাহলেও কোনও দৈনিক বা মাসিক পত্রিকার পক্ষে অশালীন হবার কোনও যুক্তি ঘটে না।

৪। গোপালদা ঠিক লিখেছেন, আমি কুড়ি বছর থেকে খালি ফেলই দেখছি।

(ক) প্রথম ফেল গোপালদাদের গণনাট্যসংঘে। যেখানে কাজ করতে পারলাম না। খালি আমি নয়, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যও।

(খ) দ্বিতীয় ফেল, বহুরূপী সংগঠন থেকে 'পথিক' ক'রে, 'চার অধ্যায়' ক'রে, 'দশচক্র' ক'রে গোপালদার দলভুক্ত প্রগতিবাদীদের কাছে প্রত্যেকবার প্রভূত গালাগালি খেয়েছি।

(গ) তৃতীয় ফেল, আমাদের 'রক্তকরবী' অভিনয় নিয়ে যখন সমাজের একটা অংশে অত্যন্ত উত্তেজনা, এবং আমাদের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেবার জন্য যখন অনেক চেষ্টা চলেছে তখন গোপালদার দলীয় দৈনিক কাগজ একটি কথাও আমাদের পক্ষে বলে নি। অথচ অত্যন্ত সম্প্রতি আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদপূর্ণ চিঠি ছাপাতে পেরেছে যে আমি নাকি 'বিসর্জন' অভিনয়ে আমার নিজের লেখা সংযোজনা করেছি। আনন্দবাজারেরও আগে স্বাধীনতা কাগজ এই শুভকর্মের সূচনা করে।

(ঘ) এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে বড়ো কেল হচ্ছেন গোপালদা নিজে। তাঁর নিজের কাগজে—পরিচয়ে—এরই আগের সংখ্যায় আমাদের সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করা হয়েছিল¹ সেটার তিনি কিছু করতে পারলেন না, পারলেন কেবল রাস্তার রকের ছেলেদের মতো দায়িত্বহীন টিপ্পনি কাটতে?

অথচ কেন? আমি যদি বাজে লোকই হই তাহ'লে আর আমাকে এতো খোঁচাখুঁচি কেন? কুড়ি বছর তো অনেক বছর, এবার শীগগিরই তো শেষ হবে, আর কেন? আর যদি আমার মধ্যে কোনও পদার্থ থেকে থাকে তাহলে একটু জিজ্ঞাসা করা যেত, একটু আলোচনা ক'রে নেওয়া যেত, এবং এতদিন ধ'রে নির্বিচারে আমার সম্পর্কে যতো অশ্রদ্ধেয় উক্তি করা হয়েছে সেগুলোকে রোধ করাও যেত। তা না ক'রে এতো সহজে মানুষকে বিচার করা হয় কেন? অতি সরলীকৃত ফরমুলা দিয়ে মানুষকে বিচার করবার ঔদ্ধত্য থাকে অল্পবয়সীদের। গোপালদার বয়স কি তার চেয়ে বেশী হয়'নি?

আরও আশ্চর্য রকম হাস্যকর মনে হয় যখন এইসব সুবাদে রবীন্দ্রনাথের নাম গদগদকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। কারণ মাত্র কয়েক বৎসর আগে পরিচয়ে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের নামে কী বলা হয়েছে আর কী হয় নি। আজ হাওয়া পাল্টেছে। কিন্তু তাই ব'লে আমার মতো সামান্য ব্যক্তিকে গালি দিতে গিয়ে অতো বড়ো নামটাকে টেনে আনবার কী দরকার? আমার ত্রুটির তো শেষ নেই, আমাকে এমনিই গালি দেওয়া যায়।

অনেক মোহ ভেঙে যাওয়ার দাম দিয়ে তবেই জীবনে জ্ঞানকে পেতে হয়। আমারও চারপাশে সেই রকম অজস্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নমূর্তি। তার মধ্যে গোপালদার মূর্তিও এমন ক'রে ভেঙে পড়বে এটা কেন যেন আশা করি নি। ইতি—

২৭।৩।৬১ শম্ভু মিত্র

পুনশ্চ—আশা করি, চিঠিটা সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গালাগালি দেবেন।

[শ্রীশম্ভু মিত্রের উপলব্ধির সম্পূর্ণ পরিচয় যাতে পাঠকবর্গ পেতে পারেন তার জন্য এই পত্র আমরা যথাযথ প্রকাশ করলাম। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—সম্পাদক।]

১। "আমাদের" বলতে শ্রীশম্ভু মিত্র কি বুঝিয়েছেন জানি না। তবে আগের সংখ্যায় 'বহুরূপী' সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই প্রকাশিত হয় নি। এমনকি তার আগের সংখ্যাতেও নয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'সংস্কৃতি-সংবাদ' বিভাগে 'নাট্যপ্রসঙ্গ' শিরোনামায় যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে প্রসঙ্গত লেখক 'বহুরূপী', শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের নাম উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেন, পাঠকদের সুবিধার্থে সেই অংশটুকু আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। এ মন্তব্যই সম্ভবত ওঁদের সম্পর্কে, কিন্তু তা 'বিদ্বেষপ্রসূত' কিনা পাঠকরা সে বিচার করবেন। প্রসঙ্গত জানানো দরকার বর্তমান চিঠিতে উল্লেখ ছাড়া সেই আলোচনার প্রতিবাদে অন্য কোনো পত্র বা আলোচনা আমরা এ-যাবৎ পাই নি।

"শুধু নাট্যপরিবেশন নয়, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন তথা দর্শক রুচি গড়ে তোলার পেছনে লিটল থিয়েটার গ্রুপের এ জাতীয় প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমশই তাঁরা এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। এই দলটির কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। বাংলা দেশের গণনাট্য আন্দোলন ও সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এঁদের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত

ভূমিকাও স্মরণ করি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 'বহুরূপী' জীবিত থেকেও যেন নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তৃপ্তি মিত্র পেশাদারী নাটকে অভিনয় করে এবং 'বহুরূপী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণী ব্যক্তি একে একে দল ছেড়ে হয়তো এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। কচিৎ দু-একটি অভিনয়, তাও পুরনো নাটকের অভিনয় মারফৎ মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার হলে 'বহুরূপী' নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের আদর্শ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল আবেগে যখন দেশে এক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রমঅগ্রসরমান, তখন 'বহুরূপী'র প্রয়াসও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা সেই আশা রাখি। কারণ প্রথমাবধি যত সীমাবদ্ধতাই থাক, 'বহুরূপী' ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি এই আন্দোলনের সহযাত্রী হন তাহলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অনেক শক্তিশালী হবে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে দীর্ঘদিন আবার এই সম্প্রদায় সম্প্রতি একটি নতুন নাটক, 'বিসর্জন', মঞ্চস্থ করেছেন। 'পরিচয়' 'বহুরূপী'র পুরনো বন্ধু। তাই 'বহুরূপী'র প্রতিটি উদ্যোগ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি। 'বিসর্জন' দেখার সুযোগ আমরা এখনও অর্জন করি নি। তাই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব হল না। আমরা ভরসা রাখি 'মুক্তধারা'র মতো এই নাটকটি 'কাঞ্চনরঙ্গ'র ন্যায় তলিয়ে যাবে না। বরং 'বিসর্জন' 'বহুরূপী'র জীবনে নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দেবে। বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রূপে এঁরা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলনকে, নিজেদেরও অগ্রসর করতে তৎপর হবেন।"

মাঘ সংখ্যা 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে 'কাঞ্চনরঙ্গ' গ্রন্থটির যে আলোচনা ছিল—শ্রীশম্ভু মিত্র নিশ্চয়ই সেটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন নি। —সম্পাদক

পরিচয়—চৈত্র, ১৩৬৮ (১৯৬১), পাঠকগোষ্ঠী

[বানান অপরিবর্তিত]

আকালের ভাবনা

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

১

লেখাটির শিরোনাম নিয়ে সম্ভবত বাম, অ-বাম কেউই আপত্তি করবেন না। বামপন্থীদের পক্ষে সত্যিই এ এক গভীর আকাল। জ্যোতিষীরা বলবেন রাহুর দশা, আম-জনতা বলবেন ঘোর কলি। কেন্দ্রে এবং এই রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে, কেন এত বড় বাম বিপর্যয় ঘটে গেল, ইতিমধ্যেই তা নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, হরেক কিসিমের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে আরও হবে। এই লেখার উদ্দেশ্য সেটি নয়। বর্তমান সংকট থেকে বামপন্থাকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু নিদান বামমহল থেকে দেওয়া হয়েছে। যে বিকল্পের কথা বলা হচ্ছে, নীতিগতভাবে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেও এই কথাটিও হয়ত বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যে, এই সব বিকল্পের কোনটাই কার্যকরী হবে না যদি না আরও গভীরে গিয়ে মৌলিক কিছু প্রশ্নের মোকাবিলা করা হয়। কিন্তু প্রথাগত বামপন্থী চিন্তার গতিমুখ দেখে তেমন ভরসা হয় না এবং সেই কারণেই এই লেখা।

সাধারণভাবে বামমহলে বিভিন্ন ধরনের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেসব বিকল্পের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি এরকম : বাম ঐক্যকে জোরদার করা, বিভেদ ও বিভাজন ভুলে সংহতির রাজনীতিকে শক্তিশালী করা;অতীতের গণআন্দোলনের রাজনীতিতে ফিরে যাওযা;তৃণমূল স্তরে হারিয়ে যাওয়া গণসংযোগকে পুনরুদ্ধার করা; বাম আন্দোলনের ঐতিহ্যকে, বাম অতীতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-কর্মকাণ্ডকে মানুষের সামনে তুলে ধরা; দম্ভ ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মলিনতাকে পরিহার করে আদর্শ ও আত্মত্যাগের ভাবনায় পার্টিকে নিয়োজিত করা। ঔচিত্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে এই ভাবনাগুলির কোনটাই ভুল নয় এবং প্রতিটি পদক্ষেপই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সমস্যা হলো যে, এই বিকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হলে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন, যেগুলির নিরসন না হলে বিকল্প ভাবনাগুলি অধরাই থেকে যাবে। আশংকা হয় প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থীরা এই প্রশ্নগুলিকে কোনও গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করবেন কি না।

২

প্রশ্ন এক : ইতিহাসের এ এক অদ্ভুত পরিহাস যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বড় ভাঙনের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে বাম ঐক্যের আওয়াজ এখন জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে ১৯৬৪ সালের আগে কিংবা পরে বাম আন্দোলনে আর কোনও ফাটল ধরেনি। ১৯৬৪ সালের আগে আর. এস. পি., আর. সি. পি. আই. প্রভৃতি দলের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৬৯

সালে সি. পি. আই (এম) ভেঙে সি. পি. আই. (এম-এল), পরবর্তীকালে পি. ডি. এস. এবং বিভিন্ন নকশালপন্থী দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভব বারে বারেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনকে বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্টায়িত করেছে এই বিভাজন ও ক্রমবিভাজনের রাজনীতি। এরই সূত্র ধরে বামপন্থী মহলে প্রায়সময়েই বলা হয়ে থাকে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে না স্বীকার করলেও এ কথা অনেকেই মেনে নিচ্ছেন যে, এই বিভেদের রাজনীতি আখেরে ক্ষতি করেছে বামপন্থার, দুর্বল করেছে বাম আন্দোলনকে।

এখানেই একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। বাম আন্দোলনের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার নিরিখে এরকম একটা কথা দাবি করাই যেতে পারে যে রাজনৈতিক বিভাজন অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, কারণ ইতিহাস বলে যে এই বিভাজনই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বামপন্থাকে শক্তি যুগিয়েছে, বামপন্থী রাজনীতি ও মতাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কথাটা অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও এই মতের সপক্ষে জোরালো সওয়াল করা যায়। ১৯০৩ এবং ১৯১২ সালে বলশেভিক-মেনশেভিক বিভাজন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে ১৯১৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও তাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা ও গড়ে ওঠা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এককালের প্রভাবশালী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি কিংবা সোশ্যালিস্ট ভেঙে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এ সবেরই প্রয়োজন হয়েছিল এক ধরনের ঐতিহাসিক ন্যায্যতার স্বার্থে এবং পরবর্তীকালে যখন অনেক দেশেই এককালের শক্তিশালী বহু কমিউনিস্ট পার্টিরই অবলুপ্তি ঘটল, তখনও কিন্তু এ কথা কখনই বলা হয় নি যে, এই বিভাজনের ঘটনাগুলি ছিল ঐতিহাসিক ভুল। প্রশ্নটা এখানেই ওঠে : আজ যখন ঐক্যের আহ্বান জানানো হচ্ছে, তার অর্থ কি এই যে, পরোক্ষে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের বাম আন্দোলনে এই সব অতীতের বিভাজন অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ছিল, কিম্বা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না? সংশোধনবাদ বনাম সাচ্চা বামপন্থার নামে যে বিভাজনগুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কি কোনও ভুল ছিল? এই প্রশ্নের নিরসন না করে বাম ঐক্যের আওয়াজ তোলা কতটা অর্থবহ হবে, তা নিয়ে সেই কারণেই একটা বড় রকমের সংশয় থেকে যায়।

প্রশ্ন দুই : এই স্পর্শকাতর বিষয়টির যথার্থ উত্তর পেতে হলে আরও গভীর একটি প্রশ্নের অনুসন্ধান অতীব প্রয়োজনীয়। সেটি এরকম : নির্মোহ দৃষ্টিতে বামপন্থীরা কি অতীত ইতিহাসের, তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতার, ভুল-ভ্রান্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত? বাস্তব সত্য এটাই যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তাঁরা এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যান এবং তখন যুক্তি দেওয়া হয় যে, অতীত অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভুল ও ব্যর্থতার ভূরি ভূরি নিদর্শন জনসমক্ষে হাজির করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কারণ তার ফলে পার্টিকর্মীরা হয়ে পড়বেন হতোদ্যোম, যা মোটেই যে-কোনও বামপন্থী দলের পক্ষে একেবারেই কাম্য নয়। তার ফলে একদিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় অসম্পূর্ণ এবং অসত্য ইতিহাস রচনা করার প্রবণতাকে, সেখানে বড় হয়ে দেখা দেয় একরৈখিক সাফল্যের এক মহাভাষ্য। এমনভাবেই রচিত হয়েছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সরকারি মহাপখ্যান,

যেখানে উপেক্ষিত হয়েছিল ভিন্নতার কণ্ঠস্বর, সেখানে পার্টিকেন্দ্রিকতার নামে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল সংখ্যালঘুর বক্তব্যের। এই আদলেই আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনের, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচিত হয়ে এসেছে, যেখানে পার্টি লাইনের প্রয়োজনে এক পক্ষ আর এক পক্ষের চোখে চিত্রিত হন 'দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী' কিংবা 'বামপন্থী হঠকারী' হিসেবে এবং যার সুবাদে খুব সহজেই খারিজ করে দেওয়া যায় এই মোটা দাগের শব্দবন্ধনীর বাইরে অবস্থানকারী পার্টির অভ্যন্তরস্থ নানা মত ও বক্তব্যকে। ইতিহাসকে দেখার এই যান্ত্রিক, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার না করা পর্যন্ত কোনও প্রকৃত আত্মানুসন্ধান বামপন্থীদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যাঁরা মার্কসবাদে এখনও আস্থাশীল, তাঁদের পক্ষে বিষয়টি আরও একটি বিশেষ কারণে প্রয়োজনীয়। মার্কসের নিজের বৌদ্ধিক চর্চার অন্যতম উপাদান ছিল ইতিহাসকে ঘুরে ফিরে দেখা এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বারে বারেই নিজের বক্তব্য ও তাত্ত্বিক অবস্থানের নির্মোহ পর্যালোচনা করা। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে দৃষ্টি দেন পুবের দিকে, বিশেষ করে নজর দেন রাশিয়ার প্রতি।

প্রশ্ন তিন : তাই বলে কি এ কথা সত্যিই বলা চলে যে বামপন্থীরা, বিশেষত কমিউনিস্টরা, ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাতে বিশ্বাসী? এ কথা অবশ্যই ঠিক নয়, কারণ তাঁরা তো সবসময়েই সচেষ্ট থাকেন অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে, সক্রিয় থাকেন বামপন্থীদের আত্মত্যাগ ও আদর্শের কাহিনী বর্ণনা করে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে। আপাতদৃষ্টিতে এই ভাবনার মধ্যে কোনও ভুল নেই, কিন্তু দুটি বড় সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যা, অত্যন্ত প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে ও ভঙ্গিতে যখন অতীতের বন্দনা করা হয়। সেই মুহূর্তে দর্শক বা শ্রোতা আপ্লুত হন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই বিস্ময়বোধ হয় ক্ষণস্থায়ী; কারণ, বর্তমান প্রজন্মের এক বড় অংশের কাছেই তিরিশ-চল্লিশের দশকের বাম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবহ ও তাৎপর্য অনেকটাই অধরা কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে, গৌরবময় অনেক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বর্তমান সময়ের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটের যোগসূত্রটি তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয় না। তাঁদের অনেকের কাছেই এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মানুষের ভূমিকা ইতিহাসের বেশি আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ভিন্নগোত্রীয়। যখন এ কথা বলা হয় যে, অতীতের বাম কর্মীরা ছিলেন একনিষ্ঠভাবে পার্টির প্রতি দায়বদ্ধ এবং এক অর্থে তাঁদের সীমাহীন আত্মত্যাগ, অননুকরণীয় জীবনযাত্রা এ সবই ছিল পার্টি-নিবেদিত প্রাণেরই অভিব্যক্তি, তার মধ্যে অনুচ্চারিত থেকে যায় একটি গভীর প্রশ্ন। পার্টির আদর্শের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার এই যে আর্তি, তা কি এও দাবি করে না যে নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিকেও পার্টির যূপকাষ্ঠে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে? বস্তুত সেটাই ঘটেছিল এবং সেই কারণে এই নমস্য মানুষদের দৃষ্টান্তমূলক আত্মত্যাগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল পার্টির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং তার ফলে শেষেরে ক্ষতি হয়েছে পার্টিরই। একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী হিসেবে পার্টির ভুলভ্রান্তি, অন্যায়, অবিচার, হঠকারী অনেক

সিদ্ধান্ত,—এ সব নিয়ে তাঁদের মনে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির একরৈখিক শৃংখলা ও শাসন ভিন্নতার ভাবনাকে পার্টি বিরোধিতারই সমার্থক মনে করে। বামপন্থার বর্তমান সংকটকে বুঝতে হলে এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যাবে না।

প্রশ্ন চার : একরৈখিকতার ভাবনা যদি এইভাবে চূর্ণ করে দেয় ভিন্নতার স্বরকে, তাহলে কি আদৌ শেষ বিচারে কোনও সৃজনশীল বামপন্থা গড়ে তোলা সম্ভব? আরও স্পষ্ট করে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, বহুত্ববাদের ধারণাকে বর্জন করে, তাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া ও তাকে মেনে নেওয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত? প্রশ্নটা আজ অত্যন্ত বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, প্রথাগত মার্কসবাদী চিন্তার ধৈর্য ও সংকট এখন এত তীব্রভাবে দৃশ্যমান যে তার বিকল্পের খোঁজ মার্কসীয় চিন্তার বিপুল ঐতিহ্যের মধ্যেই খুঁজতে হবে, আহরণ করে আনতে হবে রোজা লুক্সেমবুর্গ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের চিন্তাভাবনা থেকে প্রয়োজনীয় মালমশলা,—যার সঙ্গে চিরাচরিত মার্কসবাদী তত্ত্বভাবনার বড় রকমের ফারাক হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঠাকুরের নাম করার মত মার্কস-লেনিনকে মাঝে মাঝে স্মরণ করে মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যে পরিণত করার যে সংস্কৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তা দিয়ে বামপন্থাকে কি আদৌ সৃজনমুখী করা যাবে,—এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার বোধহয় প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন পাঁচ : এই ভাবনারই সূত্র ধরে আরও একটি প্রশ্ন, যাকে প্রথাগত বামপন্থী ভাবনা বাতিল করে দেয়, প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রশ্নে মার্কসবাদের সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও র‍্যাডিক্যাল এমন অনেক ভাবনা বর্তমানে পুঁজিবাদের সমালোচনা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যার সঙ্গে বৌদ্ধিক স্তরে অনেক মতপার্থক্য সত্ত্বেও মার্কসবাদের এক ধরনের বোঝাপড়া প্রয়োজন। মোদ্দা কথাটা এই : উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-উপনিবেশবাদ, ও অস্মিতার রাজনীতি ইত্যাদি ভাবনার প্রতি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি কেমন হবে? যাঁরা কট্টরপন্থী, যাঁরা মার্কসবাদের একরৈখিক ব্যাখ্যাকেই ধ্রুব সত্য জ্ঞান করেন, তাঁদের চোখে এই সব ভাবনাকে পত্রপাঠ বাতিল করা প্রয়োজন, কারণ এগুলি মার্কসবাদের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করে এবং সেই কারণে এসবই হলো প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা। যাঁরা অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী, তাঁরা এই বক্তব্যের কিছুটা স্বীকার করে নিয়েও মনে করেন যে, এর মধ্যে এক ধরনের বিপজ্জনক সরলীকরণ আছে, যা মোটেই কাম্য নয় এবং সেই কারণে এঁদের অবস্থা অনুযায়ী মার্কসবাদ কিছু কিছু প্রশ্নে এইসব বিকল্প র‍্যাডিক্যাল ভাবনার সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে। অর্থাৎ, এ হলো সহিষ্ণুতা বনাম অ-অসহিষ্ণুতার মানসিকতার বিরোধ।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। যেমন, উত্তর-আধুনিকতা চিহ্নিত করে বহুত্ববাদের গুরুত্বকে এবং মার্কসবাদ যে তত্ত্বগতভাবে অনেক ক্ষেত্রেই একরৈখিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের যান্ত্রিক নির্ধারণবাদে পর্যবসিত হয়, তা অনস্বীকার্য। উত্তর-উপনিবেশবাদ দেখাবার চেষ্টা করে যে, ঔপনিবেশিক মানস শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শোষণ নয়, —উপনিবেশবাদ এক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুশাসনও বটে। অস্মিতার রাজনীতির কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ভারতবর্ষের বড় দেশে জাতপাত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলিকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে বিচার

করতে আগ্রহী এবং তাঁরা মনে করেন না যে, এগুলিকে শুধুমাত্র শ্রেণীর ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। খোলা মন নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই বক্তব্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে, যা মার্কসবাদকে অনেক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, এক ধরনের যান্ত্রিকতা ও নির্ধারণবাদের ভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মার্কসবাদী দল এই তত্ত্বভাবনাগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে এক কথায় খারিজ করে দেয়। একটি উদাহরণ দিই। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত সি. পি. আই (এম)-এর বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে (৪-৯ এপ্রিল) 'মতাদর্শগত বিভিন্ন বিষয়' সংক্রান্ত গৃহীত প্রস্তাবে উত্তর-আধুনিকতা ও অস্মিতার রাজনীতিকেই বর্তমান সময়ে মার্কসবাদের প্রধান মতাদর্শগত শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। গ্রহণ ও বর্জনের যে দ্বান্দ্বিকতার ভাবনা মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য, এই ধরনের বক্তব্যে তা আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত।

প্রশ্ন ছয় : বর্তমানের বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বামপন্থীরা সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে এখনও যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছেন, তা সত্যিই কি মানুষের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম? সি.পি.আই. ও সি. পি. আই (এম), উভয় পার্টির চোখেই সমাজতান্ত্রিক দেশ বলতে এখন চিহ্নিত হয় চিন, ভিয়েতনাম, কিউবা এবং উত্তর কোরিয়া। সমস্যা হলো চিন ও ভিয়েতনাম যখন বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিশেল ঘটাতে গিয়ে হরেক সমস্যার সম্মুখীন, কিংবা কিউবাতে একভাবে এবং উত্তর কোরিয়াতে আরও প্রকটভাবে পরিবারতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে সাম্যবাদের বৈপ্লবিক আদর্শের সঙ্গে কি এসবকে মেলানো যেতে পারে? বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব কিংবা ভিন্ন মতের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ বাতিল কিংবা অস্বীকার করে সমাজতন্ত্রের ভিত্‌কে কি শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে রাখা সোভিয়েত-উত্তর পৃথিবীতে সম্ভব না কাম্য? রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতাকে আশ্রয় করে যে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়, লেনিন সেটা বুঝেছিলেন রুশ বিপ্লবের কিছুকাল পরেই, যখন বুখারিনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল 'নেপ'-এর কর্মসূচি, যা ছিল বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিশেল নিয়ে প্রথম দুঃসাহসিক পরীক্ষা। লেনিনোত্তর পর্বে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে যে হুকুমদারি অর্থনীতির মডেলটি চালু করা হলো, তার মাশুল দিতে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। এটা কি সত্যিই অপরিহার্য ছিল? যে বিকল্পের সম্ভাবনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করা হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি? আমাদের চিরাচরিত বামপন্থী ভাবনায় এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি কেউই হতে চান না।

সাম্রাজ্যবাদের বিষয়টি জটিলতর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রশ্নটা ৯/১১-এর পরবর্তী পৃথিবীতে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান ও তার বিপদ নিয়ে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্ট ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে তার যে লড়াই অব্যাহত রয়েছে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদের বিপদকে, তার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে কি বামপন্থীরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন? সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের বিকল্প যে ধর্মীয় মৌলবাদ নয়, সাম্রাজ্যবাদের

বিরোধিতার পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধেও যে পথে নামা প্রয়োজন, তার মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে মানুষকে হুঁশিয়ারি দেওয়া দরকার, সাবেকি বামপন্থী ভাবনায় তার অভাবটা খুবই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদীদের ঠেকাতে হলে এই প্রশ্নটিকে আগামী দিনে বোধ হয় খুব একটা উপেক্ষা করা যাবে না।

প্রশ্ন সাত : বামপন্থী মহলের এক বড় অংশই এখন মনে করছেন যে, পুরনো ধাঁচের কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা বদল করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে পার্টি সংগঠনের বিষয়টি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। কিন্তু সেই বিকল্প ভাবনাটি কী, তার কোনও স্পষ্ট ধারণা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এর একটা কারণ বেশ স্পষ্ট। নতুন ধাঁচে পার্টির ধারণা নিয়ে ভাবনাচিন্তার কথা উঠলেই অবধারিতভাবে যে প্রশ্নটি এসে পড়ে সেটি হলো যে, এটা করতে গিয়ে যদি কেন্দ্রিকতা ও শৃংখলার অনুশাসনের বিষয়টি পিছনের সারিতে চলে যায় তাহলে সেই পার্টিকে কি আর কমিউনিস্ট পার্টি বলা যাবে? আরও সহজ করে বললে, সে ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তফাতটা আর রইবে কোথায়?

এরকম ভাবনায় দুটি বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায়। এক : আদর্শ কমিউনিস্ট পার্টি বলতে ১৯০২ সালে লেনিন 'কী করতে হবে?' পুস্তিকাতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভাবনাকে আশ্রয় করে যে ভাষ্যটি রচনা করেছিলেন, তাকেই চূড়ান্ত ও সর্বজনীন বলে মেনে নেওয়া হয়। দুই: মার্কসবাদী তত্ত্বভাবনার ইতিহাসের মধ্যেই এই ভাষ্যের প্রবল কেন্দ্রিকতামুখী ঝোঁকের যে সমালোচনা করেছিলেন ত্রৎস্কি, রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব, তাকে কোনও আমল দেওয়া হয় না। প্রথাসিদ্ধ বামপন্থী ভাবনায় উপেক্ষিত থেকে যায় জীবনের শেষ পর্বে এসে এই পার্টি-কেন্দ্রিকতারই বিরুদ্ধে লেনিনের সাবধানবাণী। আনতোনিও গ্রামশির সতর্ক উচ্চারণ যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে হতে হবে প্রভুত্বের (domination) নয়, আধিপত্যের (hegemony) অনুসারী, সাবেকি বামপন্থী ভাবনায় তা ব্রাত্যই থেকে গেছে। নতুন ধাঁচে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করতে হলে মনোনিবেশ করার সময় এসেছে লেনিনের পুনর্পাঠে, প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মার্কসবাদী চিন্তা ও তত্ত্বের বিপুল ঐতিহ্যের যে ইতিহাস, সেখানে বারে বারেই উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে নানা তর্ক-বিতর্কের, তার পুনর্বিবেচনার। কেন্দ্রিকতার গুরুত্বকে খাটো না করেও পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির গুরুত্বকে কীভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক মানসিকতাকে কীভাবে বিকশিত করা যেতে পারে, কেন্দ্রিকতা ও শৃংখলার নাম করে ক্ষমতার অপব্যবহার, গোষ্ঠীতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতাকে কেমন ভাবে প্রতিহত করা সম্ভব, যা হতে পারে পার্টি ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জীবনমুখী সংযোগের একমাত্র গ্যারান্টি,— এই বিষয়গুলি নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতাগুলো বোধ হয় আরও একবার ঝালিয়ে নেবার সময় এসেছে। ১৯৫৬ সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস, সত্তর দশকে ইউরোকমিউনিজম, আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের ভাবনা, সমকালীন বিশ্বের লাতিন আমেরিকায় পার্টির বদলে মোর্চার ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, গ্রীসে STRIZA-র ধাঁচে নতুন ধাঁচে বাম মোর্চা গঠন,

পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে Dielinke এই নামে সম্মিলিত বামজোট ইত্যাদি বিষয়গুলো পার্টি সংগঠনের প্রশ্নটিকে নতুনভাবে দেখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভিন্নধর্মী ভাবনার খোরাক যোগাবে।

৩

এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বর্তমানে গোটা দেশ ও আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যে সংকটে নিমজ্জিত, তা থেকে মুক্তির উপায় বাতলাতে পারেন বামপন্থীরাই। কিন্তু বামপন্থীরা নিজেরাই যদি নতুনভাবে ভাবতে অপারগ হন, তাহলে দেশ ও রাজ্যকে নতুন দিশা তাঁরা কীভাবে দেখাবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। নতুন ভাবে ভাবার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তার একটি হলো চিন্তা করার ক্ষেত্রে এক ধরনের মানসিক জাড্য, যা প্রকারান্তরে প্রায় মৌলবাদী রক্ষণশীলতারই সমার্থক। অপরটি হলো ব্যাবহারিক রাজনীতির বাধ্যবাধকতা, যা থেকে জন্ম নেয় পাইয়ে দেবার, সস্তা জনপ্রিয়তার রাজনীতি। আম-জনতাকে খুশি রাখতে গিয়ে বামপন্থীরা অনেক সময়েই ভুলে যান 'নায়ক' ছবিতে উত্তমকুমারের সেই সংকল্প : "পাবলিক ব্যাপারটা, বুঝলি, বড় গোলমেলে"। বস্তুত ব্যাপারটা তাই-ই। আমরা যখন জনগণ, জনমানস ইত্যাদি কথাগুলো ব্যবহার করি, তখন হয়ত খেয়াল করি না যে এগুলো কোনও বিমূর্ত ধারণা নয়। দৈনন্দিন ঘটনা ও বিভিন্ন ধারণার ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তারই প্রতিফলন সহজেই ঘটে মানুষের মানসিকতায়। তাই একই মানুষ একবার বামপন্থীদের পক্ষে রায় দিয়ে পরের বার সহজেই ডানপন্থীদের দিকে ঝোঁকেন। অর্থাৎ, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় তাঁরা যেটা ভাল বোঝেন, সেটাই করেন। এখানেই নিহিত রয়েছে একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন। সাধারণভাবে মানুষ আপাত জ্ঞান, আপাত ধারণাকেই সত্য বলে মনে করে, যার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আনতোনিও গ্রামশি। এই বিপত্তির ফলেই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল, যেমনটি হয়েছে পৃথিবীর আরও অনেক দেশে। বর্তমানে কেন্দ্রে ও পশ্চিমবঙ্গে ঘোর দক্ষিণপন্থী যে দুটি সরকার জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসীন রয়েছে, তার ব্যাখ্যাও এখানে মেলে। বামপন্থীদের ওপরে তাই এই কঠিন দায়িত্বটি বর্তায় যে আপাত জ্ঞানের মোহাবরণ ছিন্ন করে প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত জ্ঞানের পথ বাতলে দেওয়া এবং সেখানেই বাম রাজনীতির সার্থকতা। তার জন্য প্রয়োজন গভীর দূরদৃষ্টি ও যথার্থ ইতিহাসচেতনা এবং সেই সঙ্গে সঠিক ও স্বচ্ছ তাত্ত্বিক অবস্থান, যা বর্তমানকে স্পর্শ করে, কিন্তু স্বপ্ন দেখায় এক বাস্তবমুখী, বিকল্প ভবিষ্যতের। দুঃসময়ের গর্ভেই অংকুরিত হয় সুসময়ের বীজ। গভীর সংকটের মধ্যেই জন্ম নেয় সংকট থেকে পরিত্রাণের সৃজনশীল ভাবনা। সেই পথ, সেই ভাবনা, সেই বিকল্প বামপন্থীদেরই দেখাতে হবে,—এই ভরসাটুকু এখনও আছে। তার জন্য প্রয়োজন হবে না ভাবকতার কিংবা তিরস্কার ও পুরস্কারের ক্ষুদ্র দলীয় রাজনীতির। শ্রমজীবী মানুষের কাছে রাজনীতির বিকল্প ভাবনাকে পৌঁছে দেওয়াটাই হবে বামপন্থীদের অঙ্গীকার, কারণ তাঁরাই পারেন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে, পৃথিবীকে বদলে দিতে।

পন্থা ও পন্থী

সৌরীন ভট্টাচার্য

বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে যে-প্রশ্ন গত শতকের নব্বইয়ের দশকে অনেকের মনে হানা দিয়েছিল এবার সে-প্রশ্নটা একেবারে আমাদের গায়ের উপরে এসে পড়েছে। সোভিয়েত জমানা ভেঙে পড়ার পরে এ-প্রশ্ন অনিবার্য ছিল। তখনকার সোভিয়েত প্রতিপক্ষ যে-পশ্চিমি দুনিয়া, তার তরফে ওই ভাঙনে নিশ্চিতভাবে বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছিল। তার মধ্যে খুব আড়াল আবডালও কিছু ছিল না। কমিউনিস্ট মতাদর্শ, সোভিয়েত ধাঁচের রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, যুদ্ধোন্মাদনায় বিরূপতা, শান্তি আন্দোলন ইত্যাদি যাদের দু-চোখের বিষ ছিল তাদের কাছে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক নিশ্চয়ই জয়ের দশক। সত্যি কথা বলতে কি বিশ শতকের পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বড়ো অংশই ছিল এই জয়-পরাজয়ের লড়াই চিহ্নিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধের ইতিহাস এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

বার্লিন দেয়াল একদিন ভেঙে পড়ল। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলি একদিন একে একে নিজেদের মতো স্বাধীনতা ঘোষণা করল। রাশিয়ার আধিপত্য খর্ব হল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশেও নানা টালমাটাল দেখা দিল। পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কোথাও আর আগের রাজনৈতিক প্রশাসনিক চেহারা টিকিয়ে রাখা গেল না। এককথায় সমাজতন্ত্রের তখন ছত্রখান চেহারা। এ অবস্থায় যদি পশ্চিম নিজেকে জয়ী না ভাববে তো কখন ভাববে। এমনিতে পশ্চিম দুনিয়ার দেশে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থা তখন মোটেই সুবিধাজনক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশকের শান্ত নিরাপদ থিতু চেহারা তখন টলে গেছে। তেলের সংকট, ডলারের সংকট, কর্মসংস্থানের সংকট সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে দিব্যি মাথাচাড়া দিয়েছে। ধ্বস্ত সমাজতন্ত্র ছাড়া পশ্চিমের তরফে খুব বড়ো মুখ করে বলার আর বিশেষ কিছু ছিল না। পশ্চিমের জয়গাথায় তখন বেশ তাল মিলিয়েছিল বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রাভাণ্ডারের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সোভিয়েত তন্ত্রের ভেঙে যাওয়া নিয়ে প্রকাশ্য হাততালি তাঁদের মানায় না। এই প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে সেরকম কোনো স্থূল হর্ষধ্বনি ছিলও না। তাঁরা যা করেছিলেন তা আরো একটু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা। বাজারের প্রসার, স্বাধীনতার বিকাশ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অবসান ইত্যাদি ধারণাগুলির সুফল বিচারে ও প্রচারে তাঁরা মেতে উঠলেন। অন্তর্নিহিত বার্তাটা মোটেই অপ্রত্যক্ষ ছিল না। ঠিক ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তটাই ছিল বিশ্বায়নের মুহূর্ত। অর্থনৈতিক নীতিগুচ্ছের একটা নির্দিষ্ট প্যাকেজ তখন 'ওয়াশিংটন কন্‌সেন্‌সাস' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল। এই শব্দবন্ধে 'ওয়াশিংটন' ঠিক মার্কিন দেশের রাজধানী নয়। যে-সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তরফে 'বিশ্বায়ন'-এর নীতি বলে চিহ্নিত নীতিগুলি মূলত প্রণয়ন করা হয়েছিল তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ও সদর দপ্তর ওয়াশিংটন। কিন্তু ওয়াশিংটনের সর্বসম্মতি, এই উল্লেখের তাৎপর্য তো লক্ষ করতেই হয়। এসব গেল বিশ শতকের শেষ দশকের কথা।

পৃথিবীর হালচাল এই সময় থেকে দারুণভাবে বদলে গেল। খোলা বাজারের অর্থনীতির মানসিক আবহাওয়াতে পুঁজি রীতিমতো বেপরোয়া হয়ে উঠল। এমনিতেই এই পর্বে রাষ্ট্রের হাত সমাজে ও অর্থনীতিতে সংকুচিত হওয়ার পালা। বাজার নামক প্রতিষ্ঠানকে যতদূর সম্ভব অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করতে দিতে হবে। কথায় কথায় রাষ্ট্রের নানারকম বাধানিষেধ বাজারের উপরে চাপানো চলবে না। ওইসব সমাজতান্ত্রিক মুদ্রা ক্রমে ক্রমে বর্জন করে চলতে হবে। সামাজিক মঙ্গল ও জনস্বার্থের লক্ষ্য মাথায় রেখে রাষ্ট্র নানারকম নিয়মকানুন প্রবর্তন করে যাতে সংগঠিত পুঁজির কাজকর্মে অনেক বাধাসৃষ্টি হয়। এরকম বাধাবিপত্তির সামনে পুঁজির মালিক পুঁজি লগ্নিতে কুণ্ঠিত বোধ করে। পুঁজিকে উৎসাহ দেবার জন্য তাই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কমাতে হয়, তার জন্য প্রয়োজনে সামাজিক স্বার্থসাধনের লক্ষ্যকেও দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। এইরকম যুক্তিক্রমেই আমরা পৌঁছে যাই ভরতুকি তুলে দেবার অবস্থানে। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য ভরতুকির ব্যবস্থা করতে গিয়ে সরকারের বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। বাজেট ঘাটতি কমানোর একটা উপায় কর বৃদ্ধি। কর বাড়াতে গেলে যাদের কর দেবার ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকেই তা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ করের বোঝা চাপবে ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে বেশি আয়ের ব্যক্তিদের উপর। আর করপোরেট আয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির লাভের উপর। ব্যক্তিগত আয়করের ধাক্কায় লোকেরা আয়বৃদ্ধিতে উৎসাহ হারাবে। কোম্পানির করের প্রতিক্রিয়ায় লগ্নি নিরুৎসাহিত হবে। এই অর্থনৈতিক দর্শনের যুক্তিতে তাই বলা হয় যে রাষ্ট্রনির্ভর অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার ব্যাহত হবে। সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মন্দার চেহারা ফুটে উঠবে। সব মিলিয়ে যে জনস্বার্থ ও সামাজিক লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রনির্ভর অর্থনীতির চিন্তা করা হয় সেটাই শেষ পর্যন্ত মার খায়। প্রগতির অর্থনীতিকে তেজিয়ান করে তুলতে তাই বিকল্প পরামর্শ দেওয়া হয় অনিয়ন্ত্রিত বাজারকে প্রসারিত করার জন্য। এই মতাদর্শের প্রবক্তারা বলেন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যসাধন ঠিকমতো করতে পারলে সমাজের দুর্বল অংশও তাতে উপকৃত হবে। কেননা মোট কর্মকাণ্ডটাই জোরালো হয়ে উঠবে। ভরতুকি-নির্ভর অক্ষমতার বোঝা রাষ্ট্রকে টেনে চলতে হবে না। বাজারের জোরে সকলেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। একটা ছোটো কথা অবশ্য এখানে উহ্য থাকে। যারা সেরকম দাঁড়াতে পারবে না, বুঝতে হবে তারা বাজারের প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠার যোগ্য নয়। কী আর করা যাবে। এই বিতর্কটা এখানে এসে ঠেকে যায়।

বাজারে যারা এঁটে উঠতে পারে না তাদের যে তাহলে কী হবে এ প্রশ্নে ওই পক্ষের খুব বেশি কিছু বলার থাকে না। কারণ বাজার তাদের জন্য মাথা ঘামায় না, ঘামাবার কথাও নয়। যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে বাজার শুধু তাদের দিকেই তাকায়। ক্রয়ক্ষমতা নেই যাদের তাদের নিয়ে বাজার কী করবে। ফলে বাজারের দৃষ্টিতে তারা পাশেই পড়ে থাকে। বাজার তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঠিক এখানেই, মুখে না বললেও, মনে মনে সবাই রাষ্ট্রের কথা ভাবেন। সমাজকল্যাণ তো রাষ্ট্রের কাজ, এই রকমের একটা আলগা ভাবনায় অনেকেই রাষ্ট্রচিন্তায় আশ্রয় নিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকেন। মরুক গে, যার যা হবার তাই হবে, এরকম কথা ঠিক প্রকাশ্যে বলা শোভন নয়। তাই এটা সেটা বলতে হয়, খানিকটা নীরবতা পালন করতে হয়।

আর এ ব্যাপারটা এমন কিছু অবাক হবার মতো কথা নয়। দর্শনের প্রান্তসীমায় পৌঁছোনোর পরে দর্শনশাস্ত্রের পক্ষে নীরব থাকাই যে শ্রেয়, এরকম পরামর্শ একালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের কাছে আমরা পেয়েছি। আমাদের অর্থনীতিবিদদের আমরা হামেশাই বলতে শুনি, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এই পর্যন্ত বলা বলা সম্ভব, তার পরে তো রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার ব্যাপার, সে আমরা জানি না। বেশিদিন আগের কথা নয়, এই আমাদের সিঙ্গুরের গাড়ি কারখানার বিতর্কের সময়ের কথা। আমাদের এখানকার পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধে-নিবন্ধে এরকম কথা লেখা হয়েছিল যে, আধুনিক শিল্প নির্মাণের প্রাথমিক পর্বে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর কিছু অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু আখেরে এই আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা থেকে তারাও লাভবান হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে। কতদিন? ক্লাসিকাল শিল্প-বিপ্লবের নজির টেনে বলা হয়েছিল, তা একশো-দেড়শো বছর হতে পারে। ততদিন একটু ধৈর্য ধরার সুপরামর্শ যদি কেউ কানে না তোলে তাহলে আর কী করা যাবে।

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়েও ওই পক্ষের বক্তব্য বা অবস্থান মোটামুটি নীরবতার কিংবা সহনশীলতার। বৈষম্যের কথা তুললেই প্রথমে তাঁরা বলেন, সবই কি সমান হয়, না হওয়া ভালো। হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান? কী নিদারুণ কুযুক্তি। সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈবম্যের যাঁরা প্রতিকার চান, যেন তাঁরা হাতের এবং, বোধহয় পায়েরও, সব আঙুল সমান করতে চান। উপরন্তু তাঁরা বোধহয় সব মানুষের উচ্চতাও সমান করতে চান। আর এইসব অসমান ব্যাপার যদি তাঁরা মেনে নিতে পারেন তাহলে আয়ের বৈষম্য, ধনের বৈষম্য, সামাজিক সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বৈষম্য, এসব মেনে নিতেই বা আপত্তি হবে কেন। প্রশ্নটা যে ফিতে মেপে সমতা সাধনের প্রশ্ন নয়, বিদ্ঘুটে বৈষম্যের মোকাবিলার প্রশ্ন, এ কথাটা ওই পক্ষ ঠিক শুনতেও চান না, মানতেও পারেন না। প্রশ্নটা যে শুধু অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা মূলত নৈতিকতার প্রশ্ন, এ কথাটা তাঁরা ভালো করে খেয়াল করতে পারেন না। শাস্ত্রগতভাবে অর্থনীতিশাস্ত্রের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের বিচ্ছেদের ফলে এরকম জিনিস সহজে ঘটতে পেরেছে। শাস্ত্রচর্চার এই জায়গায় কিছু বদলের ঝোঁক ফুটে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে চিন্তাধারার প্রধান অংশে তার প্রভাব টের পেতে সময় লাগবে। শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছাড়া কানে যে কিছুই ঢোকে না। রুটি নেই, তো কেক খেলেই পারে, এ মনোভাব থেকে মুক্তি অত সহজে মিলবে বলে মনে হয় না। বৈষম্যজনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলার নজির আধুনিক কালেও অনেক আছে। এ কালের নামজাদা অর্থনীতিবিদ ফ্রিডম্যানের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময়ে চিলিতে বড়ো মাপের সামাজিক প্রতিবাদ দানা বেঁধেছিল। চিলির অর্থনীতি তখন ফ্রিডম্যানীয় আদর্শে যেদিকে ঝুঁকেছিল তাতে দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভুক্তভোগীরা ঠিক শ-দেড়েক বছর অপেক্ষা করতে রাজি হচ্ছিল না।

একটা কথা খেয়ালে রাখতে হবে যে বৃদ্ধির অর্থনীতিতে শামিল হলে বৈষম্য খুব বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। শুধু তাই নয়। সত্যি কথা বলতে কি খানিকটা আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। বেশি সমবণ্টনে সঞ্চয় মার খায়। লগ্নিতে তেমন বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় না। কাজেই বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আর্থিক বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, শক্তিধর রাষ্ট্র, আদর্শ হিসেবে এইসব ধারণা বেশ হাত ধরাধরি করে চলে। এই মুহূর্তে আমাদের রাষ্ট্রের দিকেই তাকানো যাক। ভারতীয়

অর্থনীতি গত কয়েক বছর শ্লথবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে চলছিল। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারে বদল এল। রাষ্ট্রীয় মুদ্রাতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। শক্তিধর রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যের উপরে দু-বেলা জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে নরমে গরমে আমাদের রাষ্ট্রশক্তির সম্ভাব্য জোরের বার্তা বেশ পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেহরু ধাঁচের সমাজতন্ত্রের চিহ্ন বলে পরিচিত লক্ষণগুলো বেশ হিসেব করে মুছে ফেলা হচ্ছে। এসবের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কথা কি খুব বেশি শোনা যাচ্ছে? ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার পরিণতি সম্বন্ধে এতদিনে দেশের লোকের একটা আন্দাজ তৈরি হয়ে যাবার কথা। স্যাম পিত্রোদার উৎসাহের জোয়ারে ভাসা তথ্য প্রযুক্তির ভারতের কথা এখনো কেউ ভোলেননি নিশ্চয়। বিশ্বায়ন-বৃদ্ধি-বৈষম্য এই গল্পটা এতদিনে বেশ চেনা। বস্তুত সমাজকল্যাণের আদর্শ পালন করতে গেলে তা করতে হবে এই মূল নীতিচক্রের বাইরে থেকে। তা সত্ত্বেও সবকিছু রাতারাতি নিশ্চয়ই ভেঙেচুরে যাচ্ছে না। বস্তুত একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে সমাজ ও রাজনীতির স্তরের কর্মকাণ্ড আদর্শ ও আন্দোলনের কী জরুরি ভূমিকা রয়েছে এখানে। তাই সুস্থ রাজনীতি বাঁচিয়ে রাখা ও জাগিয়ে তোলার দায় রয়েছে সবার জন্য। সবার জন্য কথাটার উপরে জোর দিতে হবে। রাজনীতি শুধু রাজনৈতিক কর্মী বা দল বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের হাতেই ছেড়ে রাখা চলে না। শেষ পর্যন্ত আমরা যারা নিতান্ত সাধারণ মানুষের পরিচয়ে ঘুরেফিরে বেড়াই, মনে রাখতে হবে যে সমাজ ও রাজনীতির চেহারা সত্যি সত্যি অনেকটাই নির্ভর করে তাদের উপর। একে তো নির্বাচনের দায়ের কথা ভুললে কারো চলে না। কাজেই নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সেই সাধারণ মানুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়। আর তা ছাড়া একটু ভাবলে দেখা যাবে যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নীতি-দুর্নীতির বোধ ও রুচি-অরুচির ধারণা দিয়ে আমাদের জননেতা ও নেত্রীদের আচার-আচরণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আর সেই সুবাদে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর চেহারা কেমন দাঁড়াবে তাও কিন্তু অনেকটাই থাকে আমাদেরই হাতে। আসলে আমাদের দায়িত্ব সত্যি বিরাট। বড়ো বেশি ভুলে থাকি আমরা সে কথা। তাই অভিযোগের যে-আঙুল তোলা উচিত ছিল নিজেদেরই দিকে তা কোনো তর্ক-মুহূর্তে তুলে বসি এর ওর তার দিকে। ভুলে যাই চারিপাশের ভালো-মন্দ-মাঝারির দায় কারো চেয়ে আমার কিছু কম নয়। এই অন্যমনস্কতায় অবহেলা করে বসি নিজেকেই। অনুশীলনে যে-নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে সুন্দর করে তোলার কথা ছিল সেই নিজেকে অনাদরে ও তাচ্ছিল্যে খেলো করে তুলি। নিজেকে হারিয়ে যেতে দিই তুচ্ছতায়।

গত শতকের নব্বই দশকের গোড়ায় যখন সোভিয়েত তন্ত্রের সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের ধ্বস্ত চেহারা যখন পরিষ্কার ফুটে উঠছিল, চীন তখনই বাজার সমাজতন্ত্রের স্লোগানের আড়াল খুঁজছিল। যে-উদ্‌বেগে চীন তখন তাদের কমিউনিস্ট পার্টির রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলছিল আমাদের এখানে বামপন্থী মহলে সেসব তখন দেখেও না-দেখার ভান করতে হচ্ছিল। ভাবখানা যেন এই, সোভিয়েত তো হাতে রইল না, এখন চীনও যদি হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে তো পুরো দিশাহারা অবস্থা। আমাদের

বামপন্থীর তত্ত্ব আবহাওয়ায় তখন এরকম বিশ্বাস লালন করা হচ্ছিল যে, চীনের রাষ্ট্রে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব অটুট, তাই সেখানে বাজারকে একটু-আধটু ছাড় দিলে ক্ষতি নেই। বাজার থাকবে পার্টির নিয়ন্ত্রণে। ইতিহাসের দিগ্‌দর্শনের দিক থেকে এই অবস্থান কি যথেষ্ট দূরদর্শী ছিল? এ কথা তখনই খেয়াল করা কি একেবারে অসম্ভব ছিল যে উত্তর-সোভিয়েত বিশ্বপুঁজি সব গ্রাস করতে উদ্যত। রাষ্ট্রশক্তি হয়তো কমবেশি চিরকালই পুঁজির প্রতি অনুকূল ছিল। কিন্তু সেই পর্বে একের পর এক রাষ্ট্র যে পুঁজিগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল, এ প্রক্রিয়া খুব দুর্লক্ষ্য ছিল না। আইনকানুন রাষ্ট্রের হাতে, পুঁজি তা হেঁচকা টানে কেড়ে নিতে চায়নি। শুধু চেষ্টা চালিয়ে গেছে রাষ্ট্রকে দিয়েই কিভাবে তার প্রয়োজনানুগ আইনি কাঠামো তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়। বিশ্বায়ন পর্বে আমাদের সংস্কার প্রচেষ্টার ইতিউতি তাকাতে জানলে নতুন পুঁজির গতিপ্রকৃতির সূক্ষ্মতা দিব্যি টের পাওয়া যাবে। চীনে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা গেছে তাই পুঁজির কাজ সেখানে অনেক সরাসরি করা সম্ভব। পুঁজির মতিগতি সেখানে পার্টি পথেই প্রতিফলিত হবে। সেই পথেই পুঁজি সেখানে আজ পয়লা নম্বরে পৌঁছে বিশ্বকে টেক্কা দেবার লক্ষ্যে ধাবিত। মেড্ ইন্ চায়না আজ অবাধ অশ্বমেধে বেরিয়েছে।

এসব যখন ঘটছিল পশ্চিমবঙ্গে তখন বামপন্থা ক্ষমতায় অটুট। একটার পর একটা নির্বাচনে বামফ্রন্টের জয় আসছে। ফ্রন্টের এক ডাকে ব্রিগেড সমাবেশে মাঠ ভার যাচ্ছে অনায়াসে। খুব অনায়াসে নয় যদিও। আয়াস করতে হচ্ছে, সামান্য। শুধু বাস বোঝাই করে সভায় লোক জড়ো করার ব্যবস্থাটুকু মাত্র করতে হচ্ছে। উপযুক্ত নির্দেশনামা স্তরে স্তরে পৌঁছে দিতে হচ্ছে। যাকে বলে পার্টি মেশিনারি তাকে কাজে লাগাতে হচ্ছে ঠিকমতো। তবুও মাঠ ভরছিল। ছায়ামুখেরা ময়দান থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল সভাশেষে। শেষ দিকে অবশ্য মিছিল আসছিল, তবে সব মিছিলের সব লোকই যে মাঠে ঢুকছিল তা নিয়ে হয়তো সংশয় দেখা দিচ্ছিল। ব্রিগেড মাঠের আশেপাশে যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের মতো দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দূর জেলা থেকে কলকাতা শহরে আসা, আবার কবে সুযোগ হবে কে জানে। আসলে হাত যে অনেকদিন থেকে নামানো মাটির দিকে। আর সত্যিই তো, সব সময়ে কি মুঠো বাগিয়ে থাকা যায়। আপৎকালীন মুদ্রা তাই শান্তিকল্যাণের দিনে টিঁকে থাকেও না আর টিকিয়ে রেখে কোনো লাভও হয় না। সময়ে জলস্রোত নেমে যায়, ভাঁটার টান লাগে।

বিশ্ব বিপর্যয়ের দিনেও ব্যাপারটা কেমন যেন ঠিক পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থার গায়ে এসে আছড়ে পড়েনি। ভাবখানা প্রায় এইরকম, এই তো আমরা বেশ দিব্যি আছি। এখানে যে বামপন্থা বহাল তবিয়তে রয়েছে এটাই যেন তখনকার সময়ের একটা পরম বিস্ময়। চীন থেকেও নাকি আমাদের এই রহস্যের চাবিকাঠির সুলুক সন্ধান করার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করা হচ্ছিল। বামপন্থার পিঠ চাপড়ানিতে তখন তেমন টান পড়েনি। ভিতরে ভিতরে হয়তো ঘুণ ধরছিল। কেউ তা টের পাননি তাও সম্ভবত ঠিক না। আমরা বাইরে থেকেই যেটুকু যা আন্দাজ পাচ্ছিলাম অতেই বোঝা যাচ্ছিল নেতৃত্বের উপরের মাঝের ও নীচের তলাতেও উদ্‌বেগ জমছিল। প্রধান বামপন্থী দলটা যে তখন চলছিল হালছাড়া পালছেঁড়া নৌকোর মতো, এ বোধটা অনেকের মনেই দানা বাঁধছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে তখনও সে কথা ঘোষণা করা বা স্বীকার করারও দিন আসেনি। যে-সংকট মাথাচাড়া

দিচ্ছিল তার অন্তত দুটো মাত্রা লক্ষ করা চাই। একটা রাষ্ট্রের স্তরে, অন্যটা সংগঠনের স্তরে। রাষ্ট্রীয় স্তরে নানা ছাঁদের শিল্পপুঁজি ততদিনে বামফ্রন্ট সরকারের চারপাশে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। আর এ প্রক্রিয়া কিছু অভাবনীয় ছিল না। সরকারের পক্ষে শিল্পের দাবি, কর্মসংস্থানের চাহিদা খুব বেশিদিন অগ্রাহ্য করলে চলবে কী করে। আর শিল্প ঠিক সেই টোপটা নিয়ে আসে। বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দিলে আমরা পুঁজি লগ্নি করব। আর এত এত কর্মসংস্থান হবে। সবাই জানেন আজকের সংগঠিত শিল্পের হাত ধরে কর্মসংস্থান খুব বেশি হবে না। সোজা কথা, শিল্পের তাতে পোষাবে না। আমরা না হয় জনদারিদ্র্যে ভরা বিপুল জনসংখ্যার পিছিয়ে-পড়া দেশ, ভদ্র ভাষায় আমরা উন্নয়নশীল, আজকের উন্নত বলে পরিচিত দেশে দেশে কর্মসংস্থানের কী চেহারা। ইউরোপ আমেরিকার কর্মহীনতার সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে? গ্রোথ বা আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের আজ আর ওরকম কোনো সহজ সরল সম্পর্ক নেই। 'জবলেস গ্রোথ' তাই আজকের চালু শব্দবন্ধ। সংগঠিত শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগের বেলায়, কর্মসংস্থানের যে-টোপ দেওয়া হয় ওটা মূলত মন-ভোলানো কথা। আমাদের এখানে সিঙ্গুরে মোটরগাড়ি কারখানার প্রস্তাব নিয়ে যখন তাত্ত্বিক স্তরে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছিল তখনও এই একই টোপ ঝোলানো ছিল। এইসব টোপ গিলে গিলেই রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক মজবুত হয়। আজকের বিশ্বায়নের পুঁজির হাতে রাষ্ট্র এমনি করে বারবার গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে আছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রমুখ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান, বিশ্বায়নের যুগে এসবের মধ্যে দিয়েই সব রাষ্ট্রের উপরে আজ এক ধরনের আন্তর্জাতিক নজরদারি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এতে করে পুরোনো ধাঁচের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণায় ধাক্কা লাগছে কিনা সে প্রশ্ন বিলক্ষণ ওঠে। বিশ্বায়ন বা অন্য কোনো কিছুর নামে আন্তর্জাতিকতার দিকে বেশি এগোতে গেলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের জন্য খুব বেশি মায়া করলে চলবে কেন। মনে রাখতে হবে যে আজকের বিশ্বায়ন সংগঠিত করপোরেট পুঁজির জন্য প্রায় নিরঙ্কুশ। সব রাষ্ট্রই আজ কম বেশি এই প্রক্রিয়ায় গ্রস্ত। তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। বর্তমানের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিন্যাসে এ রকমের তারতম্য অনিবার্য। গায়ের জোরের ফারাকটা যাবে কোথায়। তাই বিশ্বায়নের অভিঘাতে আমাদের মতো দেশে পরিস্থিতি যেরকম দাঁড়াবে তা নিশ্চয়ই সব দেশে সব সময়ে সমানভাবে তুল্যমূল্য হবে না। আমাদের এখানে রাজনীতির চেহারা কী দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার সময়ে এসব কথা খেয়াল রাখা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের স্বস্তির দিন ফুরোবার লক্ষণ দেখা গেল ওই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে। ঘটনাচক্রে কোথাকার জল যে কোথায় গড়ায় ইতিহাসের পাকে পাকে তা সত্যিই বলা যায় না অত পরিষ্কার করে। আগে থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় না সব সময়ে. সিঙ্গুরে জমি দখল নিয়ে যে-আন্দোলন দানা বাঁধছিল তা যে আখেরে ওইরকম পরিণতিতে পৌঁছোবে তা সত্যিই কি গোড়ার দিকে কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল। ২০০৭ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটা ক্রান্তিকাল হিসেবে দেখা দিল। বামফ্রন্টের নেতা নেত্রী ও মন্ত্রীদের গলায় গোড়ার দিকে যে আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল তা আস্তে আস্তে নেমে এল নিচু পর্দায়। ধাপে ধাপে নানা ধাঁচের বিরোধী কণ্ঠস্বরও চড়ছিল। প্রথম পর্যায়ের সিঙ্গুর আন্দোলন ও বেসরকারি শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ

বিষয়ে নীতিগত অবস্থান—এই বিতর্কের অবসান হতে না হতে নন্দীগ্রাম আন্দোলন ও পুলিসের গুলিচালনা নিয়ে তীব্র বিক্ষোভ। সিঙ্গুর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত না থাকলে নন্দীগ্রামের বিক্ষোভ যে-মাত্রা স্পর্শ করেছিল তা সম্ভব হত কিনা বলা শক্ত। আবার নন্দীগ্রাম আন্দোলন ওই রকমের একটা চেহারা নিতে পারল বলে সিঙ্গুর আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব জোরদার হয়ে উঠতে পারল। এত পরিষ্কার কার্যকারণের ছকে এসব ঘটনার ধারা এরকমভাবে হয়তো বলা যায় না। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক কোনোদিন এসব আখ্যান হয়তো আমাদের আরো বিশদে শোনাবেন। তবু আপাতত এটুকু বোধহয় বলাই চলে যে, ২০০৭-এর আগে আর পরে, আমাদের এখানকার ঘটনাস্রোতে এরকম একটা দাগ টানা সম্ভব হয়ে উঠল। এবং ওই সময়ে বামফ্রন্ট-এর শাসনের আমলে সম্ভবত তা আর কখনো দেখা যায়নি।

এর পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগামী দিনের ইঙ্গিত লক্ষ করা গেল। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সে ইঙ্গিত অশনি সঙ্কেতের চেহারায় দেখা দিল। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হল। বামপন্থী মহলে হাহাকারের চেহারা প্রকাশ্যে ফুটে বেরোল। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে ফ্রন্ট মুখ থুবড়ে পড়ল। দলের সংগঠন ধরে রাখা দায় হয়ে উঠল। আজকের এই মুহূর্তে বামপন্থী মহলে বড়ো প্রশ্নটা উঠছে ঠিক এই জায়গায়। অতঃ কিম্?

এ প্রশ্নের উত্তর কার জানা আছে জানি না। তবে আত্মসমীক্ষার ভঙ্গিতে একটা দুটো কথা হয়তো সংক্ষেপে তোলা যায়। আমি প্রথমে বলব এই প্রশ্নের মধ্যে আসলে দুটো বড়ো প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। একটা পন্থার প্রশ্ন আর একটা পন্থীর প্রশ্ন। বামপন্থার কী হবে, এটা অনেক বড়ো প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক মাত্রায় ছাড়া এ প্রশ্নের বিচার সম্ভব না। আধুনিক পৃথিবীতে সেই মাত্রায় এই প্রশ্নের বিচার করতে গেলে হয়তো দেখা যাবে যে প্রশ্নটা শেষমেশ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে : বামপন্থার মানে কী হবে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের এখানকার বামপন্থীদের নিয়ে। তাঁরা এখন কী করবেন। আপাতত অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্ম ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মারামারি, সংঘর্ষ, অগণতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি অনেক রকমের সমস্যা আছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে আছে রীতিমতো জরুরি তাত্ত্বিক প্রশ্ন। সে প্রশ্নের দিকে নজর করলে ওই প্রথম প্রশ্ন ও দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যেও হয়তো কোনো যোগসূত্র চোখে পড়বে।

আমাদের চেনা রাজনীতির চেহারায় রাষ্ট্র অবশ্যই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। আধুনিক সংগঠনে রাষ্ট্র নিশ্চয় এক মুখ্য প্রতিষ্ঠান। সামাজিক ক্ষমতারও যেন সে প্রায় কেন্দ্রবিন্দু। পুলিশ মিলিটারির দৃশ্যমান ক্ষমতা তো রাষ্ট্রের হাতে আছেই। আছে আইন প্রণয়ন ও বিচারের ক্ষমতা। সব মিলিয়ে সমাজ সংগঠনে কোনো কারণে যাঁরা রূপান্তর কল্পনা করেন তাঁদের রাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়ানোর চিন্তা খুব স্বাভাবিক। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্য অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। বিপ্লবের পথে যাঁরা সমাজ রূপান্তর সাধনের কথা ভাবেন তাঁরাও তাই ভাবেন, আবার জনগণতান্ত্রিক নির্বাচনী পথে যাঁরা সমাজজীবনের অনাচার অত্যাচার বৈষম্য ও নিপীড়নের কিছু সুরাহা করতে চান তাঁরাও তাই চান। রাষ্ট্র ক্ষমতা যে-রাজনীতির লক্ষ্য সেই রাজনীতিকে আজ একটা প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। রাষ্ট্র যদি আজ পুঁজিগ্রস্ত হয়ে থাকে, এবং সেই পুঁজির আপজাত্য যদি প্রকট হয়ে দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই বা আমার বামপন্থার হাল কী

দাঁড়াবে? পুঁজির আপজাত্য কাকে বলছি তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেবার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু এটুকু বলা যেতেই পারে যে পুঁজি বিনিয়োগে লাভ অবশ্যই একটা লক্ষ্য এবং যেন তেন প্রকারেণ লাভ ও সর্বোচ্চ লাভই একমাত্র লক্ষ্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাত আছে। তার জন্য কর ফাঁকি থেকে আরম্ভ করে দেশের আইনকানুন দোমড়ানো মোচড়ানো ও রাষ্ট্রীয় অলিগলিতে সিঁধিয়ে যাওয়া কোনো সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক পুঁজির করণীয় হতে পারে না। পুঁজিও সমাজেরই অংশ, সমাজের স্বাস্থ্য ও সে স্বাস্থ্যের ভগ্নদশায় পুঁজিরও দায় আছে। সে দায়কে তুড়ি মেরে চলা পুঁজির আপজাত্যের লক্ষণ। সেই পুঁজি আজ রাষ্ট্রের দখল নিয়ে নিয়েছে, এ কথা মেনে নিলে প্রশ্ন উঠবেই, সেই রাষ্ট্রের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবার পরে রাজনীতির দশা কী দাঁড়াবে। সে লক্ষ্যসাধন বিপ্লবের পথেই হোক আর নির্বাচনের পথেই হোক। সেখানে পৌঁছে গেলে সেই তো পুঁজির জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে। সেই পুঁজির মন জুগিয়েই তো চলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই যে প্রথম সিঙ্গাপুরে গেলেন তা তো নয়, এর আগেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে গেছেন, তবে তিনি অন্য মুখ্যমন্ত্রী। একই গানে আরো কোনো কথা আছে কিনা খুঁজতে গেলে দেখা যায় আছে, তবে সে অন্য গানের কথা, এও তেমনি। ব্যাপারটা তো একই থাকছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এ দল, ও দল না কোন্ দল এল তাতে কি সত্যিই খুব কিছু বদলায়। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে। আজকের পৃথিবীতে সেরকম বদলানো কি খুব স্বাভাবিক। সরকারি প্রশাসনে ও চালচলনে একটু-আধটু এদিক ওদিক হয়ে থাকে, হতেই পারে। কোনো জমানায় হাত মুঠো করে চোখ পাকিয়ে কঠোর হস্তে বেয়াড়াপনা দমন করার মুদ্রাটা হয়তো একটু বেশি প্রকট কিংবা প্রকাশ্য। অন্য কোনো জমানায় হয়তো মূলত একই রকম কাজকর্ম করা হয়, কিন্তু ভাবখানা একটু মোলায়েম। এরকম ঠিক উনিশ-বিশও নয়, অনেকক্ষেত্রেই হয়তো ফারাকটা উনিশ-সোয়া উনিশের।

আজকের পৃথিবীর যা আন্তর্জাতিক বিন্যাস তাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছে যাবার পরে এতরকমের দস্তুর মেনে চলতে হয় যে সেখানে ভিন্ন আদলের কোনো মতাদর্শের জায়গা খুব সংকুচিত। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের যে-পুরোনো ধারণায় আমরা অভ্যস্ত আজ আর তা তেমন করে জাতি-রাষ্ট্রের নাগালে নেই, না থাকবারই তো কথা। বিশ শতকের পৃথিবীতে দুটো বড়ো ব্যাপার ঘটে গেছে। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা জাতীয়তা নিয়ে যে-প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তাতে জাতি-রাষ্ট্রোত্তর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপরে নজর যে বেশি করে পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। লীগ অফ্ নেশনস্, রাষ্ট্রসংঘ থেকে আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রমুখ আঞ্চলিক সংঘ-সমিতির প্রত্যেকেরই নজর কিন্তু জাতীয়তার উপরে আরো কোনো স্তরে। জাতি-রাষ্ট্রিকতার বাইরের কোনো পথের সন্ধান আজ আর তেমন অদ্ভুত কিছু ব্যাপার নয়। আজ রাষ্ট্র ক্ষমতায় পৌঁছোনোর লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করতে নেমে এই আন্তর্জাতিক বিন্যাসের কথা ভুললে চলবে না। লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পরে আর যে একজনের থেকে আর একজনকে বিশেষ ফারাক করা যায় না তার খানিক রহস্য লুকোনো আছে এখানে। মতাদর্শগত অবস্থানকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বাধ্যবাধকতার সঙ্গে মানিয়ে চলতেই হয়। দ্বিতীয় ব্যাপারটা ছিল শতকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত তন্ত্রের পত্তন ও শতকের শেষের দিকে সে-তন্ত্রের পতন। সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন

সমাজতান্ত্রিক শিবিরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল দ্বিপাক্ষিকতা। শতকের শেষে সেই শিবিরের পতনে যেন সূচিত হল দ্বিপাক্ষিকতার বদলে বহুপাক্ষিকতার জয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি করে বহুপক্ষের মিলিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত কিছু নীতিসূত্র। যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ামক হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে গৃহীত শর্তাবলি। তেমনি পরিবেশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও। বহুপাক্ষিকতার নীতি সব সময়ে সুষম কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ওঠেও নানা সময়ে, কিন্তু তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ার খোলামেলা মেজাজের সঙ্গে তা যেন তুলনায় বেশি সংগতিপূর্ণ। এটাই বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক আবহাওয়া। কতগুলো শর্ত আজকে সব রাষ্ট্রকেই মেনে চলতে হয়। আবারও বলছি সব রাষ্ট্রই সব সময়ে সমানভাবে এইরকম আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় শামিল হয় কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। জাতীয় স্বার্থ বাদ সাধলে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ কেউ মাড়িয়ে চলার চেষ্টা করে না, তা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কথাটা এই যে, আজ সব রাষ্ট্রকে একটা বাধ্যবাধকতার গন্ডির বাধানিষেধ মেনে চলতে হয়। আর সে গন্ডির মধ্যে আজ আন্তর্জাতিক পুঁজির অভিরুচি খুব স্পষ্ট করে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, অন্তত বেশির ভাগ সময়ে। জাতীয় স্বার্থে পুঁজির আবেগ আজ আর জাতীয়তার আদর্শে বাধা পড়ে না। পুঁজির হিসেবের সঙ্গে মিললেই তবে সে আবেগে সাড়া জাগে। দেশে বিদেশে হাল আমলে এর অনেক নজির আছে। তাই প্রশ্ন : বামপন্থা কি আজ নির্বিচারে রাষ্ট্রশক্তির লক্ষ্যে ধাবিত হবে?

আমাদের চেনা রাজনীতির তাই প্রধান ধরণ। তবে তার বাইরে আর কোথাও কিছু নেই তা কিন্তু ঠিক নয়। রাষ্ট্র আজ মানুষের জীবনে একটা অত্যন্ত বড়ো জায়গা জুড়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও জীবনের অনেক জরুরি ক্ষেত্র অবশ্যই বর্তমান যেখানে নানা মুদ্রায় নানা মাপের কাজ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। শুধু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতির অভ্যাসে আমরা এতদূর আচ্ছন্ন হয়ে গেছি যে রাজনীতির আরো বড়ো যে অর্থ রয়েছে তা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। রাজনীতির কথা ভাবতে গেলে ভাবতেই হবে ক্ষমতার কথা। ক্ষমতা মানেই শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়। আমাদের জীবনযাপনের প্রায় সর্বত্র ক্ষমতার ছায়াপাত লক্ষ না করে উপায় নেই। রাষ্ট্রের ক্ষমতা, সে ক্ষমতার কখনো কখনো নিতান্ত উৎকট প্রকাশ এত প্রকাশ্য যে তা আমাদের চোখে পড়বেই। কিন্তু সামাজিক জীবনের সবখানে, পরিবারে, ক্লাসঘরে, বিবাহবাসরে, পূজামণ্ডপে সর্বত্র আছে ক্ষমতার বিন্যাস। আর সে বিন্যাসের এপারে ওপারে আছে বৈষম্যের নানা বিড়ম্বনা। রাজনীতির কাজ এই স্তরে খুঁজে নেবার কোনো দরকার নেই? প্রধানত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতিতে মেতে থেকে সমাজের জীবনের এই বিস্তৃত ক্ষেত্র অনেকদিন বড়ো বেশি অবহেলা করা হয়ে গেছে না কি? কিন্তু এইবার আমাকে এখানে থামতেই হবে। যদিও আমি জানি এই জায়গায় থামতে চাইলে অজয়বাবু আর এক ধাপ কফির প্রস্তাব করে আলোচনাটা আরো একটু এগিয়ে নিতে চাইবেন।

অজয়বাবুর কথা উঠে পড়ল প্রায় অনিবার্যভাবে। 'পরিচয়'-এর শারদীয় সংখ্যার লেখাটা তৈরি হলে আমাদের একদিন কফি হাউসে আড্ডায় বসা একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। প্রণব সে আড্ডার সঞ্চালক। অর্থাৎ নেতৃত্ব সব তার। আর একটা কফি হবে কিনা। সঙ্গে কি

স্যান্ডউইচ না পকোড়া? প্রণবের এই সঙ্গে অন্যতম দায়িত্ব ছিল বামপন্থী রাজনীতি সম্বন্ধে এক একটা মোক্ষম প্রশ্ন তুলে দেওয়া। এ বছর বড্ড মনে পড়ছে অজয়বাবুকে। এখনো অতীত কালের ক্রিয়াপদ রপ্ত হয়নি। এবারেও কফি হাউসের দিনক্ষণ ঠিক করার কথা হয়েছিল। দায়িত্ব ছিল যথারীতি প্রণবের। কী যে হয়ে গেল।

এবারের লেখাটা অজয়বাবু কতদিন আগে বলে রেখেছিলেন আমাকে। যে-উদ্‌বেগ থেকে এসব লেখার কথা উনি ভাবছিলেন সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু ওঁকে যে-কথা একাধিকবার বলেছি, আবারও বলছি এখন, অজয়বাবুর প্রশ্নের উত্তর আমি কী করে দেব। ওঁকে বলতাম, আমি তো কিছু করিনি কখনো। সংগঠন করিওনি, সংগঠন নিয়ে সংশয় আমার কাটেনি আজও। ফলে সংগঠিত রাজনীতির কথা আমি কাকে কী বলব...

তবে ভাবতে ইচ্ছে করে একলা রাজনীতিরও জায়গা আছে হয়তো। ক্ষমতার বিন্যাস যদি সর্বগ্রাসী হয়, তাহলে আমার অস্তিত্বও রাজনীতিতে ভরা। আমি কার দিকে কী চোখে তাকাই তার মধ্যে রাজনীতি নেই। আমি কার দিকে কিভাবে হাত বাড়াই তা কি রাজনীতি নয়? আমি কী হতে চাই আর চাই না তা কি রাজনীতির বাইরে? হওয়ার রাজনীতি একটু অভ্যাস করতে পারি না, অজয়বাবু—চলুন ওঠা যাক। কফি হাউস বন্ধ হবে এবার।

বাম আন্দোলনের মতাদর্শগত সমস্যা প্রসঙ্গে

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

এ রাজ্যে বাম আন্দোলন যে বড় ধরনের সংকটে পড়েছে, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। খুব দ্রুত এই সংকট দূর হবে, এটা ভাবারও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ত্রিপুরা বা কেরলাতে পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের মতো অতটা খারাপ নয়। ত্রিপুরাতে তো এখনও বামফ্রন্টের জনসমর্থন ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সেটা ভেবে স্বস্তিতে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সামগ্রিকভাবেই বামপন্থীদের গুরুত্ব কমছে। শুধু বামফ্রন্টভুক্ত বামপন্থীরাই নয়। বামফ্রন্টের বাইরে যে বামপন্থীরা আছেন, সংকট ক্রমবর্ধমান তাঁদের ক্ষেত্রেও। বিহারের উপনির্বাচনে সিপিআই এম এল (লিবারেশন) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে মাওবাদীরা হটে গেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সশস্ত্রবাহিনীর বহু সদস্য এখন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, বামফ্রন্টের ছেড়ে-যাওয়া জমি বামফ্রন্ট-বহির্ভূত বামপন্থীরা দখল করছেন, এটা সত্যি নয়। সত্যি এটাই যে রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্ব কমছে বামফ্রন্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই। সামগ্রিকভাবেই এদেশে বামপন্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বামপন্থার স্বাভাবিক আশ্রয় হ'ল শ্রমজীবি মানুষ, কেননা মতাদর্শগতভাবে বামপন্থা হ'ল শ্রমজীবি মানুষের মতাদর্শ। সামাজিক বাস্তবতার কারণেই শ্রমজীবি মানুষরাও বামপন্থাকে আশ্রয় করে। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে বিশ্বায়নের বাজার অর্থনীতি শ্রমজীবি পরিবারগুলিকে আরও বেশি কোণঠাসা ক'রে ফেলেছে। বহুদিন বহু সংগ্রাম ক'রে শ্রমজীবিরা যেসব অধিকারগুলি অর্জন করেছিল, তা সবই একে একে ছিনিয়ে নেওয়া হ'চ্ছে। আট ঘন্টা শ্রমের কথা এখন আর 'মে দিবস' ছাড়া কোনোদিনই উচ্চারিত হয়না, কর্মনিরাপত্তা এখন প্রায় একটি নিষিদ্ধ শব্দ, শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায় এখন আর নিগমকর্তাকে বহন করতে হয়না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকেও লঘু ক'রে ফেলা হচ্ছে ক্রমশ। রাষ্ট্রচিন্তাতেও আসছে শ্রমজীবি-বিরোধী পরিবর্তন, 'কল্যাণমূলক' রাষ্ট্রের কথা এখন আর শোনা যায় না, রাষ্ট্রকেও পুঁজির নিয়ম মেনে চলতে হবে, কেননা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুখে নাকি সেভাবেই বদলে নিতে হবে জাতিরাষ্ট্রের ধারণাটিকে।

বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির যুগে শ্রমজীবিদের ওপর পুঁজির আক্রমণ তীব্রতর হ'চ্ছে। এই সামাজিক বাস্তবতার কারণেই বামপন্থার ওপর শ্রমজীবিদের আস্থা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় বেড়ে যাবার কথা। বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির যুগে শ্রমজীবির ওপর পুঁজির আক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে, জাতিরাষ্ট্র প্রায় নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পুঁজির পক্ষে, আর একই সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে ভারতের রাজনীতিতে বামপন্থীদের প্রাসঙ্গিকতা কমছে। কেন এটা ঘটছে, সেটার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দরকার। দরকার এই কারণে

যে, ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবির আস্থা ফিরিয়ে না আনতে পারলে বামপন্থীরা তাদের সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে না। এই প্রবন্ধে সেটাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

সোভিয়েতের পতন, পুঁজিবাদে বিশ্বায়ন ও বামপন্থার সংকট

বামপন্থীরা একটা বিকল্প বিশ্বের কথা বলতো শ্রমজীবিদের কাছে। সেই বিশ্বটা হ'ল শ্রমজীবি-কেন্দ্রিক বিশ্ব, পুঁজি যেখানে সামাজিক উদ্বৃত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে শ্রমজীবিদের পীড়ন করার বদলে শ্রমজীবির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। এই বিশ্বটা একদা ছিল সম্ভাব্য বিশ্ব, যুক্তি দিয়ে যা অনুমান করা যায়। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে এটা দাঁড়ালো একটা বাস্তব বিশ্ব, যে বিশ্ব তার নিজের আদলে পৃথিবীর একটা বড় অংশকে পুঁজিকেন্দ্রিক সমাজের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়। চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত বিতর্ক থেকেই এই সমাজের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তারপর চীনে দেঙ-পন্থার জয়, পূর্ব জার্মানির পতন এবং সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরোধহীন পুঁজিবাদী রূপান্তর—সব কিছুর সমাহারে, মতাদর্শগত জগতে এক ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয় বামপন্থী চিন্তায়, শ্রমজীবি মানুষের আস্থা টলে যায় বামপন্থার ওপর থেকে। এই অবস্থায় শেষ মারটা আসে পুঁজিবাদ বিশ্ব থেকে—বিকল্প একটা শ্রমজীবি-কেন্দ্রিক বিশ্বকে যে পুঁজিবাদী তার অস্তিত্ব রক্ষার জান্তব তাগিদেই যমের মতো ভয় করে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকেন্দ্রিক যে অর্থনৈতিক আক্রমণ, সেটার কথা বলছি না। পুঁজিবাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে মতাদর্শের ঢাল দরকার হয়, সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ কেড়ে নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো এই ঢালটিকেই। সোভিয়েত ধরনের সমাজব্যবস্থাগুলির পতনের কারণ হিসেবে ক্রমাগত একথা প্রচার করা শুরু হ'লো যে 'গণতন্ত্র' ও 'ব্যক্তিস্বাধীনতার' অভাবে এই সমাজগুলিতে নাগরিকবা সন্ত্রস্ত থাকত, ব্যক্তি মানুষ নিজের ইচ্ছাগুলিকে অবদমিত রাখত—যে কারণে নাকি শেষপর্যন্ত জনরোষেই এই ব্যবস্থাগুলোর পতন ঘটল। প্রচার করা হলো যে, এই সব দেশের রাষ্ট্রনেতাদের কোনো 'দায়বদ্ধতা' না থাকার কারণে তারা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেছিল, দেশের সম্পত্তি লুঠ ক'রে তারা নিজস্ব বৈভবের একটা চোখধাঁধানো জগত তৈরি করত, জনরোষবৃদ্ধির সেটাও একটা কারণ।

পাঠক লক্ষ করবেন, এই ধরনের রাষ্ট্রগুলো ভেঙে দেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ কী ধরনের চক্রান্ত করেছিল সে নিয়ে একটা কথাও উচ্চারিত হয় না। পোলিশ সলিডারিটির নেতা লেখ ওয়ালেশা যে সি আই এ-র বেতনভুক ছিল সেটা প্রকাশিত হবার পরে কীভাবে এই তথ্যটিকে অবান্তর ক'রে ফেলা হয়, সমকালীন ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কতজন এ খবর আর মনে রাখেন ইদানীং? এরিক হোনেকার কিংবা চাউসেস্কু অথবা মিডোসোভিচ—যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অত্যাচারের নির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে বিচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাদের কাউকে শেষপর্যন্ত কোনো বিচার মঞ্চে তোলা হয়নি। একই অবস্থা হয়েছিল পলপটের। আজও কেউ জানে না নমপেনে যে খুলির মিউজিয়ম খোলা হয়েছে, সেই খুলিগুলির ইতিহাস কী। এই নেতারা নাকি জনগণের সম্পত্তি লুঠ করে বৈভবের পাহাড় গড়েছিল? জনগণের সম্পত্তি লুঠ কাকে বলে, রাশিয়ার মানুষ সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে যখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দুহাতে লুঠ

ক'রে রাতারাতি একদল রাশিয়ান অক্টুতপতি তৈরি হল ইয়েলেৎসিনের সময়ে। গর্বাচেভ বা ব্রেজনেভের সময়ে এটা ঘটেনি। অথচ সারা বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষকে একেবারে নিশ্চিত করে বুঝিয়ে দেওয়া হল কমিউনিস্টরা কতটা নরখাদক, কতটা দুর্নীতিবাজ, কতটা চরিত্রহীন (মাও-এর ডাক্তারের তথাকথিত ডাইরির কথা এ প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য)। নীট ফলটা দাঁড়ালো এই যে 'গণতন্ত্র' 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র সেই বস্তাপচা তত্ত্ব নানা প্যাকেজে নানা কায়দায় সর্বত্র ছড়ানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা গেল এই সুযোগে। সমাজে সর্বত্র সব শ্রমজীবির মগজে একথা ঢুকে গেল যে, ভাত কাপড়ের গণতন্ত্র নয়, ব্লু ফিল্‌ম দেখতে পাওয়ার গণতন্ত্রই হল আসল গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের যে শ্রেণিচরিত্র থাকে, এটা বলতে গেলে এখন মার খেতে হবে, 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' যে কর্তৃত্বকারী পুঁজিবাদী মতাদর্শ নিয়ন্ত্রিত এবং পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থা নির্ধারিত এ কথা শোনার লোক আর পাওয়া যাবে না। 'শ্রেণি' শব্দটা শুনলেই বিদ্বজ্জন নাসিকা কুঞ্চন করেন এবং 'পরিচয় সত্তা'র বহুমাত্রা এবং তৎসৃষ্ট বহুত্ববাদের কথা ব'লে পুঁজি যাকে যমের মতো ভয় করে সেই শ্রমিক শ্রেণি পরিচয়ের ধারটি ভোঁতা করে দেবার ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লাগেন তাঁরা। শেষোক্ত এই কাজটি নিষ্ঠার সাথে পালন করার কাজে নামানো হয়েছে উত্তর আধুনিকতার 'ডিসকোর্স'-ভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব। মার খেয়ে ঘরে ফেরা শ্রমিক যাতে কিছুতেই তার শ্রেণিসত্তা থেকে জোটবদ্ধ হবার চেষ্টা না করে, তার জন্য তার কাছে এই তত্ত্ব নিয়ে আসে তার বহুসত্তার গোলমেলে চিন্তা। যে শ্রমিক সে আবার পুরুষও বটে, কাজেই নারীবাদী মহিলা শ্রমিকের পুরুষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নাকি নির্মাণ করতে হবে একটা পাল্টা ডিসকোর্স। এইভাবে আসবে বহু-স্বর এবং তার মধ্য দিয়েই কণ্ঠে সিদ্ধ হবে পুঁজিবাদের, কেননা এই বহু-স্বরের কোলাহলেই চাপা পড়ে যাবে আট ঘন্টা শ্রমের দাবি'র মতো জরুরি কিছু দাবি।

এই মতাদর্শগত বাতাবরণটি কাজে লাগিয়ে দেশবিজয়ে নেমেছে বিশ্বায়নের পুঁজি। তার গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণের জমিটি তৈরি করা হয়েছে বাজারব্যবস্থার মহিমা বর্ধন করে। সোভিয়েতের পরিকল্পনা মারফৎ অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবার ব্যর্থতার ইতিহাস এই বিশ্বায়িত বাজারব্যবস্থার ন্যায্যতা নির্মাণ করেছে। আর সেই ন্যায্যতাকে পাথেয় ক'রে বাজার এবং পুঁজিবাদী বাজারের সমীকরণ ঘটিয়ে দেওয়াটাকেও ন্যায্য ক'রে নেওয়া হয়েছে। বাজার যে ব্যক্তিসম্পত্তিনির্ভর না হ'য়ে যৌথ সম্পত্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নির্ভরও হতে পারে অর্থাৎ বাজারি দক্ষতার জন্য ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক নয়, পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থার মহিমা বর্ধনের উচ্চস্বরে সেই যুক্তিগ্রাহ্য কথাটাও হারিয়ে গেছে। সারা পৃথিবী এখন জানে, বাজার হলো সর্বভৌম, সর্বভৌম এই বাজারটি বিশ্বায়িত এবং এই বাজারে চালকের আসনে বসবে পুঁজি। পুঁজির মালিক অর্থাৎ সামাজিক উদ্বৃত্ত যার কুক্ষিগত, (মানুষের সঞ্চয়ের টাকা হিসেবে যা ব্যাঙ্কে থাকে অথবা শেয়ারবাজারে ঢোকে সেটাই সামাজিক উদ্বৃত্ত; পুঁজির মালিক আসলে বিনিয়োগ করে সেই টাকাটা, নিজের টাকায় কুটিরশিল্প আর ক্ষুদ্র ব্যবসার বাইরে কোনো কিছু করা যায় না) সে করবে বিনিয়োগ, বিনিয়োগে থেকে হবে উৎপাদন আর উৎপাদন যত বাড়বে ততই হবে শ্রীবৃদ্ধি। কাজেই যেভাবে পারো পুঁজিপতি জোগাড় কর, তাদের তুষ্ট করার জন্য শ্রমআইনে তারা যা চায় সেরকম পরিবর্তন আনো, বাজারের ওপর রাষ্ট্রের খবরদারি রেখো

না, পুঁজিপতিরা যেমন চায় তেমনভাবেই চলুক অর্থনীতি। নতুবা সমূহ বিপদ। অর্থনীতি অচল হয়ে পড়বে। কেউ কাজ পাবে না, কারও সংসারে খাদ্য জুটবে না। পুঁজিপতি ধরো, পুঁজিপতি বন্দনা কর, পুঁজিপতি যা বলে তা করো। এই হলো আজকের অর্থনৈতিক চিন্তা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কমিউনিস্টরাও এখন এই সুরেই কথা বলেন—এছাড়া নাকি বিকল্প নেই বর্তমান পরিস্থিতিতে।

মতাদর্শগতভাবে বিভ্রান্ত শ্রমজীবি মানুষ এবং তাঁদের যাঁরা স্বাভাবিক নেতা সেই কমিউনিস্টরা যাতে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন এবং তার ন্যায্যতা নির্মাণের মতাদর্শ মেনে নেয় এবং সেই আদলে নিজেদেরকে পুনঃশিক্ষিত করে, তার জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে প্রযুক্তিতে মানবসভ্যতার যে সর্বশেষ সংযোজন, সেই তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব। মিথ্যা এবং অর্ধসত্য তথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে হাতের কাছে রেখে দেওয়া হয়, জঞ্জাল ঘেঁটে ঠিক তথ্যটা বুঝে নেবার কাজটাকে এমনভাবে দুরূহ ক'রে ফেলা হয় যে ঝানু মার্কসবাদীও এখন পুঁজিবাদ যে ধরণের বামপন্থা চায়, সেই বামপন্থার ন্যায্যতা এবং যুক্তিগ্রাহ্যতা খোঁজেন। শ্রেণি-রহিত পরিচয়সত্তাকেন্দ্রিক বামপন্থা, পরিবেশবাদী বামপন্থা, কর্মভিত্তিক বামপন্থা—বামপন্থাকে এখন বাঁচার রসদ খুঁজতে হয় এইসব জঞ্জাল ঘেঁটে ঘেঁটে। নিজেদের মতাদর্শগত জোরের জায়গাটা কী, সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে বিপর্যয় ঘটা সত্ত্বেও এই জোরের জায়গাটা কেন টিকে থাকতে পারে, বামপন্থার দায়িত্ব হ'ল সেগুলিকে চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা। নিজেদের বোধের ক্ষেত্রগুলি দৃঢ় থাকলে শ্রমজীবি মানুষদেরকে কাছে পাওয়াটাও সহজ হয়। বোধের ক্ষেত্রগুলি আলগা হতে শুরু করলে মতাদর্শ দুর্বল হয়, দুর্বল মানুষ মতাদর্শ যুদ্ধে পরাজিত হয়। পরাজিত মানুষদের কাছে কেউ ভরসা খুঁজতে আসে না। এই মৌলিক সত্যটি মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সত্যি। যে বামপন্থী নিজের মতাদর্শে আস্থা রাখতে পারে না, কোন্ শ্রমজীবি আসবে তার কাছে এই বিপুল মতাদর্শগত আক্রমণ প্রতিহত করার মন্ত্র খুঁজতে? বামপন্থীরা নিজ মতাদর্শেই আর আস্থা রাখতে পারছেন না। পুঁজিবাদের আক্রমণ তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও বামপন্থীদের ওপর শ্রমজীবিদের আস্থা ক্রমশ কমে যাবার কারণ এটাই। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হ'লে বামপন্থী মতাদর্শের জোরের জায়গাটা কী, আলোচনা করতে হবে সেটিকে নিয়েই। বিদ্যমান বাস্তবতা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও মতাদর্শের কোন্ বিষয়গুলিকে নিয়ে কখনও আপোষ করা যায় না, চিহ্নিত করতে হবে সেগুলিকে। এ সংকট কাটানোর একমাত্র উপায় সেটাই।

যে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে হবে

এটা অবশ্যই ঠিক নয় যে একবিংশ শতকের সামাজিক বাস্তবতা হল উনবিংশ বা বিংশ শতকের সামাজিক বাস্তবতার কার্বন কপি। সময়ের বদলে হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজেও বহু নূতন উপাদান এসেছে। বিশ্বায়নের যুগের ভারতবর্ষেও এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। শ্রমজীবি মানুষের দুনিয়াটিও বদলে গেছে। কায়িকশ্রমনির্ভর উৎপাদনের পাশাপাশি এসেছে মেধাশ্রমনির্ভর উৎপাদন। মেধাশ্রমনির্ভর উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমজীবির সঙ্গে কায়িকশ্রমনির্ভর উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমজীবির আছে বিপুল ব্যবধান। এই ব্যবধান শুধু অর্থনৈতিক ব্যবধান নয়, এ ব্যবধান সাংস্কৃতিক ব্যবধানও বটে। কৃষিনির্ভব পরিবারের অনুপাত কমছে, কৃষিজীবির চরিত্রও

বদলে যাচ্ছে এদেশে। শ্রেণির বাইরে মানুষের যে নানাবিধ পরিচয়সত্তা সেগুলির গুরুত্ব বাড়ছে। গুরুত্ব বাড়ছে অন্য ধারার আন্দোলনেরও (স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত আন্দোলন)। 'ক্ষমতা', 'ক্ষমতা দখল'—এইসব শব্দগুলির মর্মবস্তু নিয়ে বিতর্কের পরিসরটি দুর্বল হয়ে পড়ছে এর ফলে। ক্ষমতা এখন আর স্রেফ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়, রাষ্ট্রের বাইরে সামাজিক পরিসরেও বহু স্তরে বহুবিধ ক্ষমতাকে চিহ্নিত করা হয়, মতাদর্শের হেজেমনি রক্ষায় যেগুলোর গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। 'গণতন্ত্র' এবং 'বহুস্বর'-এ এসেছে অন্য ধরণের তাৎপর্য। 'গণতন্ত্র' কি শুধু শ্রেণিগণতন্ত্র? পরিচয়সত্তার যদি শ্রেণির বাইরে অন্য ধরনের অভিব্যক্তি স্বীকৃত হয়, তাহলে গণতন্ত্রের ধারণাটি স্রেফ শ্রেণিনির্দিষ্ট থাকবে কেন? 'বহুস্বর'ও সেকারণেই শ্রেণিনির্দিষ্ট থাকেনা। শ্রেণির মধ্যেকার বহুস্বর নয়, শ্রেণির বাইরে অন্য যে পরিচয়সত্তা থাকে বহুস্বরের পরিধি হবে সে পর্যন্ত বিস্তৃত। পুঁজিভিত্তিক যে সমাজব্যবস্থা, তার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা বলা হয়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়া এবং চীনের বাজারমুখী সংস্কারের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই 'সমাজতান্ত্রিক' সমাজব্যবস্থা নিয়েও বহু সংশয়, বহু বিতর্ক জমা হয়ে আছে। মতাদর্শের সংকট কাটাতে হলে সেগুলি নিয়েও মুক্ত আলোচনা করতে হবে। সমস্যা আছে পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত ধারণা নিয়েই। বলশেভিক ধাঁচের পার্টি কাঠামো কি আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? এই পার্টি কাঠামোই কি শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে তার 'ভ্যানগার্ড' বাহিনীর মানসিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসেবে কাজ করেনি? প্রশ্নের ফিরিস্তি লম্বা করা যায়। কিন্তু সেটা এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, মনে হয় তার প্রয়োজনও নেই এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য।

সামাজিক বাস্তবতার বহুবিধ পরিবর্তন এসেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ মৌলিক বিষয়গুলি অপরিবর্তিত আছে, মতাদর্শগত বিভ্রান্তি ও সংশয় কাটাবার জন্য সেগুলিকেই প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার। পুঁজিবাদ ভেঙে দিয়ে একটা শ্রমজীবি ভিত্তিক (সমাজতান্ত্রিক) সমাজ গড়ার কাজটি সচেতনভাবে করার জন্য যেসব মৌলিক মতাদর্শগত প্রশ্নে দৃঢ় থাকা দরকার, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি', 'পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতা' ইত্যাদির কথা বলে সেই সব মৌলিক মতাদর্শগত বিষয়গুলিকে আলগা করে দিতে চাইছে আজকের পুঁজিবাদী মতাদর্শ। বাকি সব বিষয় নিয়ে বহু বিতর্ক করা যাবে, বহু কিছু নূতন ক'রে শিখতে হবে, বহু বিষয়কে নূতন ক'রে ব্যাখ্যা করতে হবে, কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলিকে নিয়ে কোনো সমঝোতা করা যাবে না। কেননা সচেতন উদ্যোগ নিয়ে এই ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য যে হিম্মত লাগে, সেই হিম্মতটাই আর থাকবে না সে ক্ষেত্রে। সমঝোতা ক'রে নারীবাদী কিংবা পরিবেশবাদী আন্দোলন করা যাবে, সমাজ বদলের আন্দোলন আর করা যাবে না।

কোন্ কোন্ বিষয়গুলি মৌলিক? প্রথমেই আসে পরিচয়সত্তার প্রশ্নটি। সামাজিক মানুষের বহুবিধ পরিচয়সত্তা যে থাকে সেটা কোনো আশ্চর্য আবিষ্কার নয় উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিকদের। 'সোসিওলজি' শাস্ত্রটিই তৈরি হয়েছে এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে। পরিচয়সত্তায় অবশ্যই বহুমাত্রা থাকে মানুষের, আর সেজন্যই মানুষকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করা হয় সমাজবিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখায়। সেগুলি থেকে বহু কিছু শেখার আছে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথাটা এই যে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয় মূলত কীসের ভিত্তিতে? যদি ভাবাদর্শগত অবস্থান এই থাকে যে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব বস্তুবাদের ভিত্তিতে, তাহলে এটা মানতেই হবে যে সমাজের ভিত্তি হলো অর্থনীতি এবং সে কারণেই মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয় তার অর্থনৈতিক অবস্থান দিয়ে, কেননা সমাজের বস্তুগত ভিত্তি হ'ল তার অর্থনীতি। এই মতাদর্শগত অবস্থান থেকে সরে যাবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হাজির করে, এমন কিছু ঘটেনি এই একবিংশ শতকে। যাঁরা এ নিয়ে তর্ক করেন, সেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কিংবা এমনকি মার্কস-এঙ্গেলস-এর সময় থেকেই, তাদের মূল কথাটা কী? কথাটা হ'লো, এভাবে দেখলে 'অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের' শিকার হতে হয়—অর্থনীতিই সবকিছু নির্ধারণ করতে পারেনা। মুশকিল হ'লো, একথাটা এদেরকে এমনকি ইদানীংকালের দেরিদাপন্থীদেরও শেখানো যায় না যে এই 'নির্ধারণ'-এর কথাটা আসে 'শেষ বিচারে' এবং এটা মার্কস-এঙ্গেলস আদৌ বলেননি যে তাঁদের মতাদর্শ অনুসারে অর্থনীতিই সবকিছু নির্ধারণ করে দেয়, সব কিছুকেই অর্থনীতির ভাবায় অনুবাদ করে দিতে হবে। অর্থনীতি ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে (যথা রাজনীতি, সংস্কৃতি) যা এক বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রেক্ষিতে এমনকি নির্ধারক ভূমিকাও পালন করতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির ভিতবর্জিত একটা সামাজিক অবস্থান কোনো সমাজবদ্ধ জীবের থাকতে পারে না এবং এই ভিতটাই নির্ধারণ করে দেয় সামাজিক মানুষের অন্য পরিচয়ের সীমানা। ভারতবর্ষের যে জাতিভেদভিত্তিক সমাজ, সেটাও দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতার ওপর, যেটার অনড়তার কারণ ছিল শ্রমবিভাগের অনড়তা। অর্থনৈতিক কারণে শ্রমবিভাগে যত ভিন্নতা আসছে, এই জাতভিত্তিক সমাজটাও ততই নড়বড়ে হয়ে উঠছে—জাতের মধ্যেই আসছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা। স্রেফ সংরক্ষণের সুবিধা চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ জাতের সুবিধাভোগী অংশটা এটা অস্বীকার করতে চায়। জাতভিত্তিক রাজনীতি ক'রে তারা ক্ষমতা পেতে চান, ক্ষমতা রক্ষা করতে চান এবং সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সংরক্ষণের সুবিধাটা বংশানুক্রমে ভোগ করতে চান আর পরিচয়সত্তাভিত্তিক রাজনীতি তাঁদের এই কায়েমি স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করে। নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে বর্গ অর্থাৎ অর্থনৈতিক বর্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব বাড়ছে এবং এটাই প্রমাণ করে যে মানুষের সামাজিক অবস্থান শেষ বিচারে নির্ধারিত হয় তার অর্থনৈতিক অবস্থান দিয়ে। সমাজের বস্তুগতভিত্তি জাতপাত নয়, সমাজের বস্তুগত ভিত্তি হ'ল তার অর্থনীতি।

একই ধরণের যুক্তি পেশ করা যায় নারীবাদী পরিচয়সত্তা থেকে ধর্মভিত্তিক পরিচয়সত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন ধরনের পরিচয়সত্তা সংক্রান্ত 'ডিসকোর্স'-এর বিষয়ে। এই ডিসকোর্সগুলির প্রতিটিই ইদানীং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বহুক্ষেত্রেই বামপন্থী আন্দোলনের পালের হাওয়া কেড়ে নিচ্ছে এইসব পরিচয়সত্তাভিত্তিক আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলির কোনোটাই পুঁজির কর্তৃত্ব উৎখাত করে শ্রমজীবির কর্তৃত্ব আনার লক্ষ্যে পরিচালিত নয়। পুঁজি তাই স্বচ্ছন্দে এদের সাথে আপোষ করতে পারে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণে এই আন্দোলনগুলি মানুষের শ্রমজীবিভিত্তিক পরিচয়সত্তাকে খর্ব করার কাজে সাহায্য করে, পুঁজিবাদ (সাম্রাজ্যবাদ) সেগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদতও দেয়। পুঁজির কর্তৃত্ব উৎখাত করা সেহেতু বামপন্থীদের কেন্দ্রীয়

লক্ষ্য এবং লক্ষ্য থেকে চ্যুত হলে বামপন্থা যেহেতু আর বামপন্থা থাকে না, এই ধরনের পরিচয়সত্তাভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে বামপন্থীদের মতাদর্শগত লড়াই সব সময় জারি রাখতে হবে। শ্রমভিত্তিকপরিচয় সত্তার রাজনীতিকে জোরদার করার স্বার্থেই এটা করতে হবে। এ থেকে বিচ্যুত হলে বামপন্থা তার জোরের জায়গাটাই হারিয়ে ফেলবে।

এ কথার অর্থ এই নয় যে ব্যাবহারিক রাজনীতিতে অন্য পরিচয়সত্তাভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্কটি সবসময়ই বৈরিতামূলক। মনে রাখতে হবে অন্য পরিচয়সত্তাভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে বামপন্থীদের লড়াইটা মতাদর্শগত। মতাদর্শগত লড়াইটা জারি রেখে এই ধরনের রাজনীতিভিত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়, যদি সেই ঐক্যবদ্ধ লড়াই পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমজীবির যে স্ট্র্যাটেজিক লড়াই, সে লড়াই-এ একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বামপন্থীদের সমস্যা হল, মতাদর্শগত লড়াই জারি রেখে এই ধরনের ভিন্ন পরিচয়সত্তার রাজনীতির সঙ্গে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়া যায়, সেই কৌশলটাই আয়ত্ত করতে পারছেন না তাঁরা। বরং নিজেদের মতাদর্শগত দুর্বলতার কারণে এইসব অন্য পরিচয়সত্তাভিত্তিক বিশেষত জাতপাতভিত্তিক পরিচয়সত্তার রাজনীতির কাছে একটা বিশাল রাজনৈতিক জমি হারিয়েছেন তাঁরা। উত্তর ভারতে লোহিয়াপন্থী রাজনীতির কাছে বামপন্থীদের পরাজয়, মহারাষ্ট্রে দলিত এবং অন্য পশ্চাৎপদ জাতিভিত্তিক পরিচয়সত্তার রাজনীতির দাপটে তাদের পিছু হটা—এসবের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। ব্যতিক্রম কেরালা, যেখানে এক প্রজন্মের বামপন্থী (কমিউনিস্ট) নেতারা এই অন্য পরিচয়সত্তার সঙ্গে বামপন্থী পরিচয়সত্তার রাজনীতির একটা মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন। কীভাবে সেটা ঘটানো গিয়েছিল, এ প্রবন্ধের অল্প পরিসরে তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা মনে রাখা ভালো যে অন্য পরিচয়সত্তার রাজনীতির সঙ্গে কমিউনিস্ট রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটাতে ভারতের বামপন্থীরা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন, এটা সত্য নয়।

প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। শ্রেণিভিত্তিক পরিচয়সত্তার মৌলিক বিষয়টিতে বামপন্থীরা এতটা নড়বড়ে হয়ে পড়েছেন কেন ? কেন এটা ঘটতে পারল যে পশ্চিমবঙ্গে একটা বামপন্থী সরকার শ্রমজীবির স্বার্থে কোথায় আঘাত লাগছে এটা একেবারেই বুঝতে পারলেন না এবং একজন উচ্ছৃঙ্খল নেত্রী যাবতীয় বাম শ্লোগান আত্মসাৎ করে বামরাজত্বের অবসান ঘটাতে পারল এই রাজ্যে ? মূল কারণ এটাই যে শ্রেণিভিত্তিক পরিচয়সত্তা সংক্রান্ত রাজনীতি যে বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, যে-বাস্তবতাকে আজকের পুঁজিবাদ নানাভাবে বদলে দিচ্ছে, তার ব্যাপ্তি ও জটিলতাকে উপলব্ধি করার মতো মতাদর্শগত ক্ষমতায় তাদের ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং এই ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করেছে তারা পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন সৃষ্ট যাবতীয় শ্রমজীবি বিরোধী মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে। সোভিয়েতে ব্যবস্থার পতন তাঁদের মতাদর্শগত জগতে একটা নিঃশব্দ ধ্বস নামিয়েছে, সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্যতা নিয়ে নিজেরাই সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়েছেন এবং স্রেফ টিকে থাকার তাগিদে নানাবিধ বাধ্যবাধকতার কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন একটা সময়জুড়ে।

মার্কসবাদী পরিচয়সত্তার রাজনীতিতে যে শ্রমিক শ্রেণির কথা বলা হয়, যে শ্রমিক শ্রেণির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইটা হ'ল সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই, সেই শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্ব কোথায়,

সংশয় দেখা দিয়েছে (জাগানো হয়েছে) এই মৌলিক বিষয়টিতেই। সংগঠিত শ্রমিকের নেতৃত্বে অন্যান্য শ্রেণির মোর্চা গড়ে সংগঠিত করার কথা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। কোপ নেমেছে এই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির ওপরই। সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংকোচন ঘটছে দ্রুতগতিতে, বাড়ছে অসংগঠিত শ্রমিকদের বাহিনী, যে বাহিনীকে কর্মক্ষেত্রে সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব। সংগঠিত ক্ষেত্রেও আবার বাড়ছে মেধাশ্রমভিত্তিক কাজ। মেধাশ্রম যার জীবিকা তার সঙ্গে অসংগঠিত শ্রমিকের আর্থিক ও সংস্কৃতিক তফাৎ বিপুল। শ্রেণি হিসেবে শ্রমিকরা সমসত্তসম্পন্ন কি না, সংশয় দেখা দিয়েছে এই মৌলিক বিষয়টিতেই। জীবিকাক্ষেত্র হিসেবে কৃষির গুরুত্ব কমছে, কৃষকের চরিত্রও বদলাচ্ছে। সমাজে একই সঙ্গে বাড়ছে মধ্যস্তরভুক্ত মানুষদের গুরুত্ব। যাদের মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় পেটিবুর্জোয়া, পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে সাথে যে পেটিবুর্জোয়া গুরুত্ব কমে যাবার কথা ছিল। এইসব কিছুর ফলেই ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়সত্তার বিকাশ ঘটছে। চিরায়ত মার্কসবাদ যে শ্রমভিত্তিক একটি অভিন্ন পরিচয়সত্তার কথা বলে, সংশয় দেখা দিয়েছে সেটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই। এর ফলে পুঁজি এবং তার সহযোগী প্রাক-পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একটা মজবুত কর্মসূচি গ্রহণ করাই কঠিন হয়ে উঠেছে। শ্রমজীবির স্বার্থ ঠিক কী, সেটা নিয়ে নানাবিধ সংশয় দেখা দিচ্ছে এবং সেই সংশয়ের ধাত্রীভূমিতেই জন্ম নিচ্ছে এমন কিছু কর্মসূচি যা শ্রমজীবিদের বামপন্থীদের কাছে আনার বদলে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শিল্পকর্মসূচি এবং তার ফলশ্রুতিতে একজন উচ্ছৃঙ্খল নেত্রীর বামপন্থী হয়ে ওঠার মধ্যে তার প্রমাণ আছে।

একবিংশ শতক উনিশশতক বা বিংশ শতকের কার্বন কপি নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে অবস্থার অভিন্নতাও আছে। পুঁজি হ'ল মৃতশ্রম এবং পুঁজির কর্তৃত্ব হ'ল জীবন্ত-শ্রমের (শ্রমজীবির) ওপর মৃত-শ্রমের কর্তৃত্ব। সমাজতন্ত্র চায় মৃত-শ্রমের ওপর জীবন্ত-শ্রমের কর্তৃত্ব। এটা হ'ল সেই মৌলিক সত্য যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কসীয় মতাদর্শ। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহু পরিবর্তন এসেছে এই সমাজে। বিশ্বায়নের পুঁজিবাদ বহু পুরোনো সত্যকে ভেঙে দিয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মৌলিক সত্যটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে গড়ে ওঠা শ্রমজীবিদের মধ্যে একটা অভিন্নতা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। পুঁজির পরিসর যতটা বিস্তৃত ততটা জুড়েই জীবত শ্রম (শ্রমশক্তি) থাকে তার কর্তৃত্বাধীন—কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটে মজুরি থেকে কাজের পরিস্থিতি, কর্মসুরক্ষা থেকে সামাজিক সুরক্ষা, শ্রমজীবির জীবিকা অর্জনের সমস্ত পর্যায়টা জুড়ে। কৃষি যখন পুঁজির আওতায় আসে, কৃষিনির্ভর জীবনও এভাবেই নির্ধারিত হয়। এমনকি মধ্যবর্গীয় মানুষদের জীবন ও জীবিকা এই পরিসরের বাইরে যেতে পারে না। সমাজে যে ভোক্তার জগত থাকে, সে জগতটিও এই মৃত-শ্রমের কর্তৃত্বাধীন। মৃত শ্রমের কর্তৃত্বে বাঁচা জীবন্ত শ্রমের পরিচয়সত্তার এই জায়গাটি হ'ল মার্কসবাদী রাজনীতির ভিত্তি। আর এই প্রশ্নে মতাদর্শগত অবস্থান যদি দৃঢ় থাকে, কর্মসূচি প্রণয়নের কাজটি তখন আর অত দুরূহ থাকে না। বর্তমান লেখকের বক্তব্য, সোভিয়েত উত্তর বিশ্বায়নের পুঁজিশাসিত সমাজ বামপন্থীদের এই মতাদর্শগত জায়গাটাই আলাদা করে দিয়েছে। যে কারণে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে

কিছু আপ্তবাক্য উচ্চারণের বাইরে আর কিছু করতে পারছেন না তাঁরা। বহুমাত্রিক পরিচয়সত্তার মধ্য থেকে মানুষের শ্রমভিত্তিক পরিচয়সত্তাটিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ক'রে, অন্য পরিচয়সত্তাভিত্তিক মতাদর্শের সঙ্গে তাদের মতাদর্শের ভিন্নতার জায়গাটিতে দৃঢ় থেকে প্রয়োগের মাটিতে পা রেখে এই সংকট কাটাতে হবে বামপন্থীদের, এর কোনো বিকল্প নেই।

আর একটি মৌলিক বিষয় আলোচনা করেই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। প্রসঙ্গটি হলো 'বহুস্বর' এবং 'গণতন্ত্র' নিয়ে। প্রসারিত গণতন্ত্র, যে-গণতন্ত্রে সকলের অংশগ্রহণ থাকে এবং সে কারণেই বহুস্বরের অস্তিত্ব থাকে, সেই গণতন্ত্রর সঙ্গে বামপন্থী তথা কমিউনিস্টদের কোনো সংঘাত নেই। শ্রমজীবিরা যেহেতু সমাজের সুবিপুল সংখ্যাগুরু এবং তাত্ত্বিক বিচারে শ্রমজীবির স্বার্থের বাইরে কমিউনিস্টদের যেহেতু অন্য কোনো স্বার্থ নেই, গণতন্ত্র এবং বহুস্বর নিয়ে কমিউনিস্টদের কোনো মাথাব্যথা নেই, বরং বলা যায় গণতন্ত্রের ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয় পুঁজির শাসন দূর করে শ্রমজীবির শাসন প্রতিষ্ঠিত করার কাজটা ততই সহজতর হবার কথা। বস্তুত সোভিয়েত বিপ্লবের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ক্ষমতা দখলের পর এই বহুস্বরের ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য লেনিন উদ্যোগও নিয়েছিলেন। বাস্তবে যা দেখা গেল সেটা এই যে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে শিশু বলশেভিক রাষ্ট্রকে ভেঙে দেবার কাজে উঠে পড়ে লাগে বিরোধীরা। অনেকটা বাধ্য হয়ে, এই শিশু রাষ্ট্রটিকে বাঁচাবার স্বার্থে লেনিনকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয়েছিল।

একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কীভাবে বহুস্বরকে নিষ্ক্রিয় করার মতো গণতান্ত্রিককাঠামো গড়তে পারে, সে নিয়ে সমস্যা আছে। পুঁজি যে অন্তর্ঘাত করে, উস্কানি দিয়ে জনমত গড়ে এই ব্যবস্থাটিকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করবে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ক'রেই বিকল্প ব্যবস্থাটিকে প্রসারিত গণতন্ত্রের ওপর দাঁড় করাতে হবে, নতুবা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে —যে অবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় (যে কারণে এই রাষ্ট্রটি ভেঙে যাবার সময় কোনো রকম জনপ্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি)। কীভাবে এই বহুস্বরভিত্তিক গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেই একটা সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্র গড়া যায় তার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ল্যাটিন আমেরিকায়। জনগণের ক্ষমতায়ন হলো এই পরীক্ষার মূলমন্ত্র। হুগো সাভেজ যেটা করতেন তা হ'লো শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচন নয়, নির্বাচন করবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আবার সেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনমত যাচাই করতেন। একই সঙ্গে ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, যাতে জনগণ সরাসরি ক্ষমতা ভোগও করতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। একবিংশ শতকে যাঁরা সমাজতন্ত্র গড়তে চাইলেন, তাঁদের সবাইকে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বহুস্বর এবং প্রসারিত গণতন্ত্রের বিষয়টিকে বলশেভিকরা যেভাবে বুঝেছিলেন তাতে যান্ত্রিকতা ছিল এটা স্বীকার করতেই হবে। তবে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকে লঘু করে দেখাও আদৌ ঠিক হবে না। ল্যাটিন আমেরিকায় আগামী দিনে সম্ভবত তার প্রমাণও পাওয়া যাবে, আলেন্দের চিলি সে প্রমাণ পেয়েছিল ১৯৭৩ সালে।

কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিয়েও একই কথা। বলশেভিক ধাঁচে গড়ে ওঠা

কমিউনিস্ট পার্টিতে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' ভিত্তিক পার্টি সংগঠনে বহুস্বর ধারণ করা সম্ভব নয়, এই ধারণা ইদানীং দৃঢ়মূল হচ্ছে। সমস্যাটির নানা দিক আছে। সব দিকই বিবেচনায় আসা দরকার। এই ধরনের পার্টি কাঠামো অকারণে গড়ে ওঠেনি। কমিউনিস্ট পার্টিকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনী, যে-বাহিনী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাতের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। সুতরাং যে কোনো ধর্মঘটি শ্রমিক এই দলের সদস্য হতে পারে না। সদস্য নিতে হবে বেছে বেছেই। আন্দোলন সংগঠিত করতে হ'লে দলটিকে একই ভাষায় কথা বলতে হবে। সুতরাং বিতর্ক যা-ই হোক দলের অভ্যন্তরে, শেষ পর্যন্ত দলটিকে কথা বলতে হবে এক স্বরেই। এমন যুক্তি ঠিকই আছে। কিন্তু সমস্যা হ'ল, সদস্য নির্বাচন যদি এমনভাবে হয় যে জনগণের স্বাভাবিক নেতা হবার বদলে নির্বাচিত সদস্যটি হবে দলের মধ্যে ক্ষমতাসীন অংশটির পক্ষে হাত তোলার লোক এবং সেটাই তার প্রাথমিক যোগ্যতা, তাহ'লে দলটিতে পচন শুরু হবে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকেই। তারপর যদি স্তরে স্তরে এই ক্ষমতার সমীকরণ মেনে মেনে কমিটি এবং তার নেতা তৈরি হয় এবং 'কেন্দ্রিকতা' প্রয়োগ ক'রে অন্যদের দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়, তাহ'লে এই দলটি শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয় একটা আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলে। জনগণের সঙ্গে যে তার বিযুক্তি ঘটে গেছে সেটা বোঝার ক্ষমতাও আর থাকে না। এইসব সমস্যা অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে। করার পথ কী হতে পারে? পার্টি সদস্য অবশ্যই বেছে নিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে, যে গণসংগঠন থেকে এই সদস্যটি পার্টিতে সদস্যপদ পাচ্ছে, সেই সংগঠনে কতটা সে আস্থাভাজন, তার একটা পরীক্ষাও থাকতে হবে, কেননা পার্টি পচে গেলেও সাধারণ শ্রমজীবি পচে যায় না এবং গণসংগঠনে থাকে সাধারণ শ্রমজীবি যারা স্বেচ্ছায় নিজের তাগিদে এই গণসংগঠনে যোগ দেয়। পরীক্ষাটা কীভাবে হ'তে পারে সেটা ভাবা যেতে পারে, তবে অবশ্যই তা গণতন্ত্রের ওপর আস্থা রাখার ব্যবস্থাভিত্তিক হ'তে হবে। ওপর থেকে প্যানেল দিয়ে কমিটি নির্বাচন করার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে সর্বস্তরে—প্রাথমিক সদস্য নির্বাচন থেকে উচ্চতম কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র। যাঁরা যে কমিটিতে যাবেন, তাঁরা সেই স্তরে নির্বাচিত হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থার ভিত্তিতে। ভিন্ন মতের ব্যক্তিদেরও প্রতিনিধি থাকতে হবে কমিটিতে। কায়েমি স্বার্থ যাতে বাসা বাঁধতে না পারে তার জন্য একদম নিয়ম করে পুরোনো কমিটির একাংশকে সরে দাঁড়াতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে পার্টি কংগ্রেসে চার বা পাঁচ বছরের জন্য ফয়সালা করার বদলে মাঝে মাঝেই প্লেনাম করে আলোচনায় আনতে হবে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভবত আরও অনেক কিছু নিয়ে করতে হবে। মনে রাখতে হবে মতাদর্শের বন্ধনই বামপন্থার বন্ধন। মতাদর্শের বন্ধন আলগা হ'য়ে গেলে বামপন্থা আর বামপন্থা থাকে না। বর্তমান সংকটে এই কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখা প্রয়োজন।

সংকটের এক বড়ো কারণ বামপন্থী রাষ্ট্রচিন্তা

অভ্র ঘোষ

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সংকট যে ক্রমাগত গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোনো মহলেই এখন আর নেই। বিকল্প পথ, বিকল্প ভাবনার গুরুত্ব নিয়েও মতদ্বৈধ নেই। অবশ্য বিকল্প চিন্তার স্বীকরণ যে এই সংকটের কালেই শুরু হয়েছে, আগে কখনো তার কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি—এমনটা নয়। মার্কসীয় দর্শন ও চিন্তার বিস্তারের ইতিহাসে প্রত্যেক পদক্ষেপেই তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, ভিন্ন মত, মতান্তর—সবই ছিল। কিন্তু তাত্ত্বিক মহলের এই বহুস্বর বা তর্ক-প্রতর্ক যে বাস্তব সমাজে প্রয়োগকর্তা মার্কসবাদীদের সব সময়ে সতর্ক বা প্রভাবিত করতে পেরেছে—সেকথা বলা যাবে না। বরং উল্টোটাই, মার্কসবাদী মতাদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রয়োগকর্তারা কতগুলি গোঁড়া মার্কসবাদী চিন্তা বরাবর আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, তাঁরা কোনোরকম হেরফের বরদাস্ত করেননি, ফলে সমস্যা মেটা তো দূর অস্ত, দিনে দিনে সমস্যা বদ্ধমূল হয়েছে। সংকট শিকড়ের গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

মার্কসবাদী দর্শনে এরকমই এক জটিল সংকট রাষ্ট্র নামক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। যে-রাষ্ট্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ওতপ্রোত অংশ এবং যার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সর্বব্যাপী। সাবেকি মার্কসবাদী ব্যাখ্যানুযায়ী বা একালের এক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় 'দরবারি মার্কসবাদের' ভাষ্যানুযায়ী রাষ্ট্র সমাজের একটি উপরিকাঠামো মাত্র, তার ভিত্তি হল ভিন্ন ভিন্ন যুগে তাদের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সামন্তশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে এবং ওই শ্রেণির প্রভুত্ব রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান-আদেশে প্রতিফলিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওই একই নিয়মে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে বুর্জোয়া রাষ্ট্র। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বে সৌধ-উপরিসৌধের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় এরকম এক নিয়ন্ত্রণবাদী অনড় দৃষ্টি প্রয়োগকর্তা মার্কসবাদীদের চিন্তায় দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপ্ত। তবে তাত্ত্বিকমহলে বিতর্কের ঝড় বহুকাল ধরেই আছে। বিশ শতকের তিরিশের যুগে ইতালির মার্কসবাদী চিন্তক আন্তোনিও গ্রামশি এই যান্ত্রিক চিন্তার বিরুদ্ধতা করেছিলেন এবং মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের বেশ খানিকটা পরিমার্জনাই করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের উত্থান ও ইতালিতে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পরাজয় ইত্যাদি অভিজ্ঞতার নিরিখে গ্রামশি সাবেকি মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে অন্যভাবে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন রাষ্ট্র আসলে পরস্পরবিরোধী দুই ভিন্ন কর্মধারার সমন্বিত রূপ। একদিকে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ ও দমনমূলক কার্যকলাপ করে থাকে, অন্যদিকে জনসমাজে মানুষের চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করে রাষ্ট্র। একে নাগরিকের স্বাভাবিক আনুগত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়, তার পিছনে ভয়-ভীতি-শাস্তির কোনো প্ররোচনা থাকে না। বস্তুত এটাই রাষ্ট্রের সবল ও নৈতিক ভিত্তি। এই দুরকম কাজের ভিত্তিতে গ্রামশি

সমাজটাকেও দু-ভাগে ভাগ করে রাষ্ট্রীয় সমাজ (পলিটিক্যাল সোসাইটি) ও নাগরিক সমাজের (সিভিল সোসাইটি) কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, আধুনিক সংহত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম উৎস হল এই নাগরিক সমাজ। এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপরিকাঠামোগত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি সমাজের মতাদর্শগত পরিমণ্ডল রচনা করে এবং এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই রাষ্ট্র জনসাধারণের চিন্তাভাবনা প্রচলিত ব্যবস্থার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করে বা সাজিয়ে নেয়। সিভিল সোসাইটির এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যকে গ্রামশি নাম দেন হেজিমনি বা আধিপত্য। বলপ্রয়োগ বা দমনমূলক ব্যবস্থাগুলির অর্থাৎ ডমিনেশন বা কর্তৃত্বের চাইতে এই হেজিমনি হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বস্তুত রাষ্ট্র যে শ্রেণি-আধিপত্যের হাতিয়ার—এই সাবেকি বুনিয়াদি মার্কসীয় তত্ত্বকে ভিত্তি করেই গ্রামশি তাঁর হেজিমনির ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। লিখেছেন, সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণি প্রধানত তার নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা চালিত, কিন্তু শাসকশ্রেণি সব সময়ে ওই সংকীর্ণ স্বার্থের বশে নিয়মনীতি নির্ধারণ ক'রে বা বলপ্রয়োগ ক'রে চাপিয়ে দেয় না তার শাসননীতি সর্বসাধারণের ওপর। বরং শাসকশ্রেণি তার রাজত্বকে স্থায়ী করার জন্য চাইবে শ্রেণিগত সংকীর্ণ স্বার্থকে যথাসম্ভব সমাজের সর্বজনীন স্বার্থ ক'রে তুলতে এবং শাসকশ্রেণির মতাদর্শকে সর্বজনীন মতাদর্শে উন্নীত করার চেষ্টা করতে। এবং সেটা করতে পারলেই শাসকশ্রেণির হেজিমনি বা আধিপত্য তৈরি হয়, দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে ডমিনেশনের মাধ্যমে মানুষের আনুগত্য অর্জন করতে হয় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস যদি ব্যাপ্ত হয় যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানগুলি সাধারণ জনগণের স্বার্থেই তৈরি হয়েছে এবং সেগুলি অনুসরণ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহলেই রাষ্ট্রে নাগরিকদের আনুগত্যের ভিত্ শক্ত হবে। পৃথিবীতে গত তিন শতক ধরে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ইতিহাস ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা-অধিকার প্রদান করে এবং তাদের স্বাভাবিক আনুগত্য অর্জন ক'রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহ ইওরোপ-আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে টিকে আছে। প্রয়োজনে ডমিনেশনের ব্যবহার যে হয় না, তা নয়। শাসকশ্রেণির স্বার্থের বিস্তার ও বিকাশের সম্ভাবনা কিছুমাত্র রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাষ্ট্র তার বলপ্রয়োগের অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করে থাকে। অতএব গ্রামশির সিদ্ধান্ত এই যে, আধিপত্য ও দমনমূলক কর্তৃত্ব অর্থাৎ হেজিমনি আর ডমিনেশনের ধারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন বিরোধী দুই প্রক্রিয়া নয়, একই প্রবাহের দুই সমান্তরাল ধারা। তবে টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রকে তার হেজিমনির ধারাকে বেশি গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ ওইটিই তার মূল প্রাণশক্তি। হেজিমনির এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে আন্তোনিও গ্রামশি রাষ্ট্রের আপেক্ষিক গুরুত্বকে খুব চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। রাষ্ট্র সমাজ-সভ্যতার সমস্ত পর্বে সর্বদাই বিদ্যমান উৎপাদন-রীতি-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—বহু প্রচলিত এবং প্রায়-আপ্তবাক্যে পর্যবসিত মার্কসীয় তত্ত্বের এই ছকটিকে ভেঙে গ্রামশি রাষ্ট্রভাবনাকে আরেকটু প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া, হেজিমনি ও ডমিনেশনের এই গ্রামশীয় বিভাজনকে যদি আমরা গুরুত্ব দিই বা মান্যতা দেওয়ার কথা ভাবি, তাহলে গত শতাব্দীর ইওরোপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা বা ভঙ্গুরতার বীজ কোথায় নিহিত ছিল, তার বিশ্লেষণও বোধহয় সহজ হয়ে

যায়। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, ডমিনেশনের ডিসকোর্সের নিরিখেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চেহারা আমাদের নিরীক্ষণে ধরা পড়েছে—কমিউনিস্ট পার্টির দোর্দণ্ড প্রতাপে পার্টি ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব যে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং জনসমাজে পার্টি-রাষ্ট্রের প্রভুত্বের তাড়নায় সাধারণ মানুষজনের যে কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না—এসব কথা এককালে বুর্জোয়া সমালোচকদের বক্তব্য ছিল, কিন্তু গত বিশ-পঁচিশ বছরের সমাজতান্ত্রিক সংকট-চর্চার নিরিখে বলা যায় যে, এখন মার্কসবাদী মহলের চিন্তকেরাও প্রায় সকলেই এসব কথা মেনে নিচ্ছেন। অন্যদিকে হেজিমনির ডিসকোর্সের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক বিষয়ে বিকল্প মডেলটি যদি তৈরি হয়ে উঠতে পারত—যার সম্ভাবনার কথা বিশ শতকের গোড়ার দিকে রোজা লুক্সেমবার্গের চিন্তায়, খানিকটা বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে লেনিনের কিছু কিছু সতর্কবার্তায় এবং অবশ্যই প্রবলভাবে গ্রামশির সিভিল সোসাইটির ভাবনায় ধরা পড়েছিল,—তাহলে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারত। কিন্তু বাস্তব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রয়োগকর্তা মার্কসবাদীরা এসব বিষয়কে আদপেই পাত্তা দেননি। হেজিমনি তৈরির পরিবর্তে স্তালিনীয় ডমিনেশনের রাষ্ট্রই প্রধানতম ধারা হয়ে উঠেছিল।

গ্রামশিকে অনুসরণ করেই ফরাসি চিন্তক লুই আলথুসে Ideological State Apparatus-এর কথা বলেছিলেন একসময়। লিখেছিলেন, রাজনৈতিক শক্তি আর রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের কথা বিবেচনা ক'রে প্রশাসনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ আর রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর দখলদারি করা এক কথা নয়। বহু যুগ ধরে উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তি যে তার আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে বা এখনও পারছে তার কারণ মতাদর্শগত রাষ্ট্রকাঠামোকে (Ideological State Apparatus) সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে। অর্থাৎ বৃহত্তর জনসমাজে মানুষের মনন, চিন্তা, বোধ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি সবকিছু তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে যেসব সামাজিক সংস্থা—যেমন পরিবার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ কিংবা প্রেস-রেডিও-টিভির মতো গণমাধ্যম ইত্যাদি—তাদের ওপর যথাযথ প্রভাব কায়েম করতে না পারলে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার প্রাধান্য সুনিশ্চিত করতে পারত না। তবে এই প্রভাব গায়ের জোরে বা দখলদারির মনোভাব থেকে নয়, মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বস্তুত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের এক আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য আছে, সে তার সীমিত আপন পরিসরে তার নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর দখলিস্বত্ব কায়েম ক'রে সমাজে সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু ওই রাজনৈতিক হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ডমিনেশনগত ভ্রান্তি অবিরাম ঘটেছে। সমাজের ওপর প্রবল কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্র তথা সর্বময় পার্টি কর্তৃত্বের ধারাবাহিক জুলুম অব্যাহত ছিল এবং তারই করুণ পরিণামে আজকের সমাজতন্ত্রের এই গভীর সংকট। সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও সংকটকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এসব কথা বহুদিন থেকেই আলোচিত হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, কেননা সংকটমুক্তির জন্য খোলামেলা আলোচনা না হলে সঠিক রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সমস্যাটা কেবল সোভিয়েত রাশিয়া বা পূর্ব ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, তা কিন্তু নয়। মানে ও বহরে আদৌ তুলনীয় নয় যদিও, কিন্তু ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতার কথাও এই একই নিরিখে বিচার করা যেতে পারে। কারণ সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এখানেও একধরণের সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে, আর সেটা জাতীয় স্তরে না হলেও রাজ্যস্তরে তো বটে। তাতে দেখা গেছে ১৯৭৭-এর পর একটানা চৌত্রিশ বছর সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে বামপন্থী দলগুলি যে জমানা তৈরি করেছিল তাতেও এই রোগ প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, সরকারি প্রশাসনকে ব্যবহার করে জনজীবনে আধিপত্য কায়েম করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ওই রোগের বিস্তার ঘটেছে। পরপর সাতবার বিপুল ভোটাধিক্যে ক্ষমতায় আসীন হয়ে বামপন্থী জোট সরকার যখন একচ্ছত্র রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ আর রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর দখলদারি সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্টের কাছে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ন্যূনতম ভিত্তি আইনের অনুশাসন সর্বতোভাবে মান্যতা পায় না। আগেই বলেছি, রাজনৈতিক হেজিমনির প্রতিষ্ঠা গায়ের জোরে হয় না। তারজন্য চাই দীর্ঘ মতাদর্শগত সংগ্রাম, সহিষ্ণুতা ও অপরের অধিকারকে সম্মান জানানোর সাধু প্রবৃত্তি। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় চালাতে হয় সেই সংগ্রাম। বিশেষ করে ভারতের মতো বৃহৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয়। সমাজের অগণিত গণসংগঠনগুলিকে গায়ের জোরে দখল করে, স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডি দখল করে কিংবা ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে স্বাভাবিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবার সুযোগ না দিয়ে তার ওপর দখলিস্বত্ব কায়েম করা থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। দখলদারির মানসিকতা থেকেই মঞ্চদখল, এলাকা দখল, গ্রাম দখলের বীভৎস রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃতি পেয়েছিল — শেষ পর্যন্ত প্রশাসনে আইনের অনুশাসন ও গণতান্ত্রিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকেনি। এই দখলের রাজনীতিতে মতাদর্শের কোনো ভূমিকা ছিল না, হেজিমনি প্রতিষ্ঠার সাধু সংকল্প ছিল না,—বস্তুত সেসব থাকতে পারেও না, যা ছিল তা হল রাষ্ট্রযন্ত্রের অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার কুরুচিকর রাজনৈতিক মনোবৃত্তি। ছল-বল-কৌশল-চাতুরি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ, সুস্থ মতাদর্শের স্থান তাতে কিছুমাত্র নেই। পার্টি সেখানে সমস্ত ক্ষমতার উৎস, জনসাধারণ দাবা বোর্ডের বোরে মাত্র। মার্কসীয় তত্ত্বে না-কি একথা সাব্যস্ত ছিল যে, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে থাকা গণসংগঠনগুলির সম্পর্ক রচনা করতে হবে তাদের স্বাধিকারের নীতিকে ভিত্তি করে। অর্থাৎ সমাজের ছাত্র সমিতি, শিক্ষক সমিতি, মহিলা সমিতি কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা ও আরও বহু রকমের স্বার্থ সংগঠন পার্টির অঙ্গুলিহেলনে ওঠানামা করবে না, তাদের স্বাধিকার থাকবে, নিজস্ব সম্মান ও শক্তি নিয়ে তারা আপন আপন এক্তিয়ারে ভূমিকা পালন করবে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত সংগ্রামে এদের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু সেটা পার্টির লেজুড়বৃত্তি করে নয়, স্বাধিকার বজায় রেখে পার্টির সম্পূরক শক্তি হয়ে উঠতে হবে তাদের। বামপন্থী আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে এ-বাংলায় তেমন ঐতিহ্য গড়ে উঠতে আমরা দেখিনি—বাম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে শুরু করে বুদ্ধিচর্চা বা শিল্পচর্চার ক্ষেত্রগুলিতেও পার্টি-কর্তৃত্বের আস্ফালন সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সবাইকে

একছাঁচে ফেলে পার্টি তার নিজের শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়েছে। স্লোগানটা ছিল এরকম যে, পার্টি সর্বশক্তিমান, তাকে এড়িয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর। বোঝাই যাচ্ছে এই স্লোগানে পার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা সর্বদাই একমুখি—দেওয়া-নেওয়ার সংস্কৃতি বা বিশ্বাসে তার মদত নেই। প্রবল এই ক্ষমতাতন্ত্রের লক্ষ্য একটাই। তা হল নির্বাচনে জয়লাভ করা আর রাষ্ট্রক্ষমতাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা, আর সেটা শাসকের স্বার্থে, নিজের অনুগতদের স্বার্থে, পার্টির স্বার্থে—ব্যাপক জনসমাজে বহুস্তরীয় গণতান্ত্রিকতার স্বার্থে আদৌ নয়।

গণতন্ত্রহীনতার এরকম এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দেশের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যথাযোগ্য নিয়মে কায়েম করেছে এবং এ-বিষয়ে অর্থাৎ মডেল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গোটা ভারতবর্ষে তাঁদের স্থান সর্বাগ্রগণ্য—এরকম এক জাঁকজমকপূর্ণ দাবি বারবার ঘোষণা করেছেন শাসক দল। কিন্তু সুবুদ্ধিসম্পন্ন যেকোনো মানুষই জানেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতির অসাধু কৌশল ও দখলের মানসিকতা যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনে সাধারণ মানুষের অভীপ্সিত গণতান্ত্রিক অধিকার ততটাই বিপর্যস্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, গান্ধি-অনুপ্রাণিত পঞ্চায়েতি রাজের মূলমন্ত্র ছিল 'গ্রামস্বরাজ'-এর ভিত্ তৈরি করা, রাজনৈতিক দলের প্রভুত্ব কায়েম করা নয়। সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন, গ্রামসমাজের দেখভাল ও উন্নয়ন-কর্মে সাধারণ্যের অংশগ্রহণ, জনগণের স্বয়ম্ভরতা ও চেতনাবৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক উপায় হিসেবে ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব। কিন্তু বাস্তব ব্যবস্থায় পার্টির অধিনায়কত্বে ভোট দখলের চাতুর্যে এবং আপাদমস্তক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সংকীর্ণ ক্ষমতার আবর্তে পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছে দলীয় রাজনীতির পীঠস্থান। অনিবার্যত এবং অতিক্রান্ত দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, গুণ্ডামি, রাজনৈতিক হানাহানির অপর নাম হয়ে উঠল একালের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এর নাম গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আদৌ নয়, পক্ষান্তরে একে বলা যায় কেন্দ্রীভূত পার্টি-ক্ষমতার গ্রাম-দখলের কৌশলী রাজনীতিমাত্র। রাষ্ট্রযন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহারের এ আরেক নির্লজ্জ নিদর্শন। ১৯৯৮ সালে 'Micro Foundations of Bengal Communisum' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'Conceptually, the whole question of empowerment of the people, decentralization and grassroot democracy has been defined within the contours of the discourse of a Leninist-Stalinist party whose essential political ethos is centralisation...Nowhere in the party's design it is even mentioned that the institutions of Panchayats themselves are important and have even to be developed from within. অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন, পঞ্চায়েত রাজ্য সরকারের এজেন্টমাত্র, তার প্রধান কাজ হল গ্রামের উন্নয়ন নয়, গ্রামের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তৈরি করা, তাদের সংগঠিত করা যাতে তারা পার্টির কার্যক্রমে অংশীদার হয়ে ওঠে। পার্টি তার নীতি ও প্রোগ্রাম অনুসারে পঞ্চায়েতকে পরিচালনা করবে, পার্টির জোনাল ও লোকাল কমিটি পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে শেষ কর্তৃত্ব বলে বিবেচিত হবে। ফলে গ্রামীণ স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নয়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী সিপিআই (এম)

গণতন্ত্রকে বরবাদ করে প্রবল কেন্দ্রিকতা স্থাপন করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটেনি, পঞ্চায়েতের রাজনীতি তৈরি করেছে একধরণের ধামাধরা পার্টিকর্মী যারা সাধারণের মঙ্গলভাবনার পরিবর্তে পার্টির কুক্ষিগত অসাধু, দুর্নীতিপরায়ণ, মতলববাজ গ্রাম্য রাজনীতির আবর্ত তৈরি করেছে।

সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য তাঁর 'পঞ্চায়েত ও উন্নয়ন' (সাহিত্য সংসদ, ২০০৯) শীর্ষক বইটিতে লিখেছেন, ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর বামপন্থীরা পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার কথা ভেবেছিলেন বিশেষ কয়েকটি কারণে। কারণগুলি মূলত রাজনৈতিক এবং নিজেদের ক্ষমতার ভিত্ পাকা করে তোলার জন্যই ওই প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ। স্বাতী লিখেছেন, ষাটের দশকের শেষে পরপর দুবার কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছিল সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে। সরকারের গণভিত্তি সুদৃঢ় হলে কেন্দ্র এ-কাজ করতে পারত না। তাই কেবল শহরাঞ্চলে নয়, বৃহত্তর গ্রামীণ এলাকায় জনসমর্থনের ভিত্তি পাকাপোক্ত করা সিপিআই (এম)-এর সমূহ কর্তব্য ছিল এবং সেটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গড়ে তোলাই সবচাইতে সুবিধাজনক পথ। দ্বিতীয়ত, সত্তর দশকের প্রথমার্ধে গোটা পশ্চিমবঙ্গ নকশাল আন্দোলনে জর্জরিত ছিল, ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্দোলনের সম্ভাবনা রুখে দেওয়া যাবে ব্যাপক ভূমিসংস্কার করে এবং তার জন্য প্রশাসনিক পরিষেবা জোগাতে পারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এমন এক চিন্তা কাজ করেছিল। তৃতীয়ত, ক্ষমতায় আসার পরপরই উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আমলাবর্গের সাহায্য-সহযোগিতা কতোটা পাওয়া যাবে তা নিয়ে গভীর সংশয় ছিল বাম মন্ত্রিসভার ও দলীয় নেতাদের। তাই প্রশাসনের বাইরে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে পঞ্চায়েতের মতো বৈধ ক্ষমতা-কেন্দ্র তৈরি করা জরুরি ছিল। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল গ্রামবাংলায় বাম দলগুলির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা। পঞ্চায়েত ছিল তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের পিছনে সবটাই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সামাজিক গণতন্ত্রের প্রসার নয়। ক্ষমতার রাজনীতির এক প্রধান ঘাঁটি হয়ে উঠল পঞ্চায়েত। রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধির স্বপ্নে গ্রামে যে-আত্মীয় সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান ছিল কিংবা মানবেন্দ্রনাথ রায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে অরগানাইজড ডিমোক্রেসির কথা ভেবেছিলেন এককালে, আমাদের কার্যকলাপে তা আজ সম্পূর্ণ উলটো খাতে এক অনিবার্য ধ্বংসের দিকে অতিদ্রুত ধাবমান হয়ে পড়ল।

তিন বছর হল পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে, পরিবর্তনের ধ্বনি তুলে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নতুন সরকার গঠন করেছে। শাসক দলের পরিবর্তন ঘটেছে ঠিক কথা, কিন্তু শাসনের রাজনৈতিক ধারা কি পাল্টেছে? নতুন সরকারের গতিপ্রকৃতি, রাজনৈতিক আচার-আচরণের নির্লজ্জ চেহারা দেখে একথা বলতে কারোরই অসুবিধে হচ্ছে না যে, পুরনো বামপন্থী শাসনেরই এ আরেক কদাকার প্রতিরূপ। প্রচলিত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আইনের অনুশাসন, সংসদীয় রাজনীতির আচার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে সংকীর্ণ দলগত স্বার্থে ব্যবহার করার চরম লজ্জাহীন দৃষ্টান্ত প্রতিদিন ধাপে

ধাপে বাড়ছে। অবশ্য এরকমই তো হবার কথা। বিপুল ভোটাধিক্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে দখলদারি মানসিকতার পর্যাপ্ত প্রকাশ ঘটাবে তৃণমূল কংগ্রেস—তেমনটাই তো স্বাভাবিক। তবে সমাজের সর্বস্তরে অতিদ্রুত তার ছড়িয়ে পড়ার যে দুর্লক্ষণ আমরা দেখছি, বা খানিকটা অস্বাভাবিকও বটে। অথচ কোথাও কোনো প্রতিরোধের ছবি নেই। আসলে সামাজিক সমস্ত ক্ষমতা উবে গেছে, রাজনীতির পাঁক আর দুর্বৃত্তের হানাহানিতে পূর্ণ আমাদের এই প্রতিবেশে কে কাকে সামলাবে, সকলেই তো দলীয় নামাবলি গায়ে চাপিয়ে একই পথের পথিক। নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যাবতীয় অনৈতিকতা সম্বল করে রাজনীতির আসরে নেমে পড়াই এখন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র রাজনীতি।

গাঢ় অন্ধকারের এই রাজনীতি থেকে মুক্ত হবার রাস্তা কি আছে কোথাও? প্রশ্নটা এখন সকলের মনেই ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু সমাধান-সূত্র তেমন মিলছে বলে মনে হয় না। অথচ সমাজ-রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে বিকল্প রাজনীতির তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত তো এদেশেই ছিল। আমরা মুখে বলি সেই গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের কথা, কিন্তু তাঁদের চিন্তার আশ্রয়ে আমাদের কাজেকর্মে তার কি ছিটেফোঁটা প্রতিফলন ঘটে? আসলে রাষ্ট্রক্ষমতা-নির্ভর একান্ত ক্ষমতাশ্রয়ী বাস্তব রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শে বা প্রোগ্রামে সমাজ-নির্ভর রাজনীতির হদিশ পাওয়াই মুশকিল। রাজনীতির গোটা প্যারাডাইমটাকেই পাল্টে দিতে হয় তাহলে। কিন্তু সে-ঝুঁকি কি নিতে আমরা প্রস্তুত? রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের চাইতে সমাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে আমরা তাঁকে 'অরাজনৈতিক' বলে সাব্যস্ত করেছি। গান্ধিজি 'গ্রামস্বরাজ'-এর কথা বলতেন, পার্টি-রাষ্ট্রের তীব্র বিরোধী ছিলেন বলে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে তিনি নৈরাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন—এরকম সমালোচনা তাঁর কপালে জুটেছে। গান্ধিশিষ্য জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন দলহীন গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন তখন তাকে উপহাস করা হয়েছে একান্ত অবাস্তববাদী বলে। মার্কসবাদের ফলিত চেহারার বিরোধিতা করে মানবেন্দ্রনাথ রায় কেবল স্তালিনধর্মী রাষ্ট্রতন্ত্রকেই সমালোচনা করেননি, প্রবল সমালোচনা করেছিলেন তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারি ব্যবস্থাকেও, কেননা ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের প্রবল ঝুঁকি তাতেও নিহিত ছিল। মানবেন্দ্রনাথ গান্ধিপন্থী ছিলেন না কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সমাজ ও রাষ্ট্রের দূরত্ব কমিয়ে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে তিনি গান্ধির কমিউনিটারিয়ান স্টেটের মর্যাদায় একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত তো ছিল এদেশেই।

এই সবকিছুকেই ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতির আবর্তে আমরা ইউটোপিয়া বলে বিবেচনা করে পাশে সরিয়ে রাখি, তার এসেন্সটাকে বোঝার চেষ্টা করিনি। জয়প্রকাশের কাছে গান্ধি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর রাজনীতির জন্য নয়, তাঁর লোকনীতির জন্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী করে তোলার লক্ষ্যকে গান্ধি পরিহার করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ ফুরিয়েছে, এবার চাই লোকনীতির লক্ষ্যে লোকসেবক সংঘ—এরকম এক পরিকল্পনার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পর্বেও তাঁর গঠনমূলক আন্দোলনের এক বড়ো ইতিহাস

আছে। পঞ্চায়েতিরাজের চিন্তাও ওই একই গঠনমূলক আদর্শ ও লক্ষ্যে ধাবিত। গ্রামীণ মানুষের সত্যিকারের স্বাশসনের জন্যই চাই পঞ্চায়েত—রাষ্ট্র হয়ে উঠুক 'ওশানিক সার্কেল'-এর মতো, কেন্দ্র-রাজ্য-জিলা-ব্লক-গ্রাম নিজের নিজের বৃত্তে সকলেই হয়ে উঠুক স্বয়ন্তর ও স্বশাসিত, কেউ কারোর উপর নিয়ন্ত্রণের বোঝা চাপিয়ে দেবে না—এমনই এক বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রকাঠামোর কথা গান্ধি দর্শনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ বা জয়প্রকাশরা ওই এসেন্সটাকেই ধরতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ'-এর চিন্তাতেও ওই স্বশাসনের প্রতিজ্ঞা ছিল। রাষ্ট্র-সর্বস্ব রাজনীতিতে সর্বগ্রাসী পার্টির ভূমিকায় এই সবকিছুই অবান্তর হয়ে গেল, প্রয়োজন বোধহয় সেই দিকেই আবার মুখ ফেরাবার চেষ্টা করা। অবশ্য যদি সত্যিই পরিত্রাণ আমরা প্রত্যাশা করি—তা হলেই, নচেৎ সবকিছুই অলীক।

সময় সমাজ সাহিত্য

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে (১৯৫৬) একটি বই বেরিয়েছিল : *বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা*। দেখে মনে হতে পারে : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*-র মতো এটি বোধহয় বাঙলা ছোটোগল্পের ইতিহাস। ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। বইটির সঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত থাকলেও এটি আসলে গল্প-সঙ্কলন; যুগ্ম সম্পাদক : শ্রীকুমারবাবু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল। বইটির নামপত্রে লেখা আছে : 'উত্তর ভাগ—প্রথম পর্ব'। ভূমিকা থেকে জানা যায় : এই পর্বটিই আগে বেরিয়েছিল, পূর্বভাগ আর উত্তরভাগ-এর দ্বিতীয় পর্ব বেরবে পরে। উত্তরভাগ প্রথম পর্ব-র অন্তর্গত গল্পগুলি ১৯২৫-৫০-এর মধ্যে লেখা; সম্পাদক জানাচ্ছেন : দ্বিতীয় পর্বেও ঐ একই সময়কার গল্প থাকবে। আর পূর্বভাগ-এ থাকবে 'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রভৃতি প্রথম যুগের ছোটগল্প-রচয়িতাদের রচনা'। উত্তর ভাগ—প্রথম পর্ব ছাড়া আর কোনো ভাগ বা পর্ব আদৌ বেরিয়েছিল কিনা জানা নেই।

যে-কারণে বইটি নিয়ে আলোচনা সেটি এবার বলি। সম্পাদকরা মনে করেন : মোটামুটি ১৯২৫ থেকেই বাঙলা ছোটোগল্পের আধুনিক যুগের শুরু। নির্বাচিত গল্পগুলি তাঁরা সাজিয়েছেন 'সামাজিক চেতনার বিভিন্নমুখী প্রকাশ'-এর 'পর্যায়ক্রমে'। চেষ্টা ছিল 'ছোটগল্পের বিষয়নির্বাচনক্ষেত্র ও সৃষ্টিপ্রেরণাবৈচিত্র্যের অতীত-সীমাতিসারী আশ্চর্য প্রসারটি' দেখানোর। গল্পগুলিকে তাই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : ১. সমাজচিত্র, ২. সমাজ-জীবনের ব্যতিক্রম, ৩. পাতাল-জীবন, ৪. যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়, আব ৫. ব্যক্তিপরিচয় ও প্রতিবেশ-চিত্র। লেখকদের মধ্যে আছেন প্রবীণ জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) থেকে নবীনতম সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৯২১-৯০)। (পরিশিষ্ট দ্র.)

সম্পাদকরা আশ্বাস দিয়েছিলেন : 'উত্তরভাগের দ্বিতীয় পর্বে পূর্বোক্ত-কাল-পরিধির মধ্যেই আরও কয়েকটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রচনা প্রকাশিত হইবে।' অর্থাৎ ঐ পাঁচটি ভাগ বা পর্যায় দিয়ে সব গল্পকে শনাক্ত করা যাবে না। তাঁরা এও স্বীকার করেছেন যে এই বিন্যাসরীতির সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই আছে। কিন্তু তার পরে তাঁরা যা লিখেছেন সেটিই খেয়াল করার মতো :

> গল্পগুলির নির্বাচনের কারণ এই যে উহাদের মধ্যে লেখকদের বিশিষ্ট সমাজ-চেতনা ও জীবনবোধের এক একটি দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক বাঙলা গল্পলেখকদের মনে বাঙ্গালা দেশের যে সমাজরূপ ও ব্যক্তিজীবনের সব সম্ভাবনা বীজাকারে নিহিত থাকিয়া তাঁহাদের গল্পরচনার প্রেরণা যোগাইতেছে এই গল্পসমষ্টি পাঠের ফলে তাহা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইল। (পৃ. পাঁচ)

এরপরে প্রচণ্ড ফেনিল কয়েকটি বাক্যে যা লেখা হয়েছে তার সারাৎসার খুব সংক্ষেপে

দেওয়া যায়। কিন্তু প্রায় ষাট বছর আগে কী ধরণের পণ্ডিতি বাঙলা লেখা হতো তার নমুনা হিসেবে ঐ অংশটি তুলে দিচ্ছি :

> এই চলমান জীবনধারায় মুহূর্তে মুহূর্তে যে ঢেউ ঝলকিয়া উঠিতেছে, যে আবেগ ও অনুভূতি সমতল মসৃণতার উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া একক স্বাতন্ত্র্যে আত্মঘোষণা করিতেছে, যে ক্ষণিকা খেয়াল-কল্পনা-ভাব-মদিরতার রঙীন বুদ্বুদ উত্থান-পতনের মাঝখানে নিমেষের জন্য স্থিরতার কল্প বিভ্রান্তি জাগাইতেছে তাহারা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার মনোলোকের একটা প্রাণবেগচঞ্চল বর্ণবৈভবপূর্ণ, সঙ্কেতভাষ্য ছবি অঙ্কিত করিতেছে। গল্পসমষ্টির ভিতর দিয়া সাম্প্রতিক বাঙ্গলার প্রাণপরিচয়, উদার অন্তর-লোকের উদ্‌ঘাটন উহাদিগকে একটি গুরুতর ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে। (পৃ. পাঁচ)

এই অংশটি শ্রীকুমারবাবু শেষ করেছেন এই বলে : 'এইবার সংগৃহীত গল্পগুলির মধ্যে জীবনসত্যের যে পরিচয় মিলিতেছে তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।' (পৃ. পাঁচ)

তাহলে প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে সমাজ-চেতনা-জীবনবোধ, তারপরে ব্যক্তিচরিত্র। সমস্যা হলো : দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যায়ের গল্পগুলি চরিত্রপ্রধান, কিন্তু প্রথম পর্যায়ের পাঁচটি গল্পও এক ধরণের নয়। শ্রীকুমারবাবুও সেটি স্বীকার করেছেন : 'প্রথম পর্যায়ে বিন্যস্ত গল্পগুলির মধ্যে ব্যক্তি-পরিচয়ের যে অভাব আছে তাহা নহে; তথাপি ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের সামগ্রিক চিত্রাঙ্কন।' (পৃ. পাঁচ)

বোঝাই যায় : যে ধরণের গল্পে সমাজ-জীবন 'ব্যক্তিত্বকে অভিভূত' (পৃ. সাত) করে শ্রীকুমারবাবু তাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তর মিলে বাঙালি সমাজে এমন এক আলোড়ন তুলেছিল যাকে অস্বীকার করা শ্রীকুমারবাবুর মতো নন্দনসর্বস্ব সমালোচকের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তার জন্যেই 'যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়' নাম দিয়ে ছটি গল্প তাঁকে নিতেই হয়েছে। ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন :

> পরবর্তী পর্যায়ে [চতুর্থ পর্যায়] বিগত মহাযুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে যে ভয়াবহ বিপর্যয় আনিয়াছে তাহারই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীর যুগযুগান্তরের সংস্কার ও ধর্মবোধ, বদ্ধমূল আদর্শবাদ এই বারুদের বিস্ফোরণে ভাঙ্গিয়া খানখান হইয়া গিয়াছে।
>
> এই প্রলয়-ঝটিকায় সমস্ত ভদ্রসংস্কার, সমস্ত মানমর্যাদা, জীবনবোধের সমস্ত রুচি-শালীনতা [,] পরিবার-বন্ধনের সমস্ত মাধুর্য নিঃশেষে উঠিয়া গিয়া জীবনের নগ্ন, রিক্ত, প্রবৃত্তিমাত্র-সম্বল বীভৎস কঙ্কালটি অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় এগুলি যেন বাঙ্গলাদেশের পরিচিত সমাজ-চিত্র নয়, বাঙ্গালী নামের অন্তরালে, বাঙ্গলার জানা-শোনা ভৌগোলিক পরিবেশে কোন এক প্রেতপুরীর জীবনযাত্রা অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গালী মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার শ্মশানে কবন্ধনৃত্যেরই আমরা দর্শক। কিন্তু এই জীবনচিত্রের মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকিলেও লেখকের মানস তিক্ততা ইহাকে বাস্তব অপেক্ষা বীভৎসতর করিয়া তুলিলেও ইহা যে মূলত মর্মান্তিকভাবে সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (পৃ. বারো-তের)

ওয়াকিবহাল মানুষ মাত্রেই বুঝবেন : ঐ গল্পগুলিতে বিন্দুমাত্র 'অতিরঞ্জন' নেই। বরং গল্পের ঘটনার চেয়ে বাস্তবই বীভৎসতর ছিল; লেখকরা সেই বীভৎসতাকে গল্পে দেখান নি, আভাসটুকু দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন।

যেমন, প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার'। গল্পটি যদি কারুর না-ও পড়া থাকে, মৃণাল সেনের *কলকাতা* ৭১ চলচ্চিত্রটির কল্যাণে অনেকেরই জানা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পটি হয়তো কম পরিচিত, এর তুলনায় তাঁর 'কেড়ে খায়নি কেন?' বোধহয় বেশি চেনা। অভাবিত ও অচিন্তিত-পূর্ব ঘটনার বিবরণ আছে এই দুটি গল্পে। তবু প্রত্যক্ষদর্শীরা আক্ষেপ করেছেন : বাঙলা কথাসাহিত্যে ঐ নিদারুণ সময়ের প্রতিফলন কত অস্পষ্ট, কত খণ্ডিত। ১৯৪৪-এ, মন্বন্তরের ঠিক পরের বছরেই ঐ আকাল ও তার পরিণাম নিয়ে লেখা কয়েকটি গল্প ও একটি একাঙ্ক নাটকের সঙ্কলন বেরিয়েছিল : নাম ছিল *মহামন্বন্তর*। সম্পাদক পরিমল গোস্বামী, ভূমিকা লিখেছিলেন গোপাল হালদার। সে-ভূমিকার গোড়াতেই ফুটে উঠেছে এই ক্ষোভ :

> মন্বন্তর শেষ হয়নি, মহামারী তার জের টেনে চলেছে, হয়ত দ্বিতীয় মহামন্বন্তরেরও আয়োজন হচ্ছে। তবু চোখের উপর আমরা যে শ্মশান-দৃশ্য দেখেছি তার কোনো আভাস কি বহন করবে না আমাদের কালের কোনো ইতিহাস? দু'একটি প্রয়াস তার হয়েছে, ইংরেজিতে ও বাংলায়। সে প্রয়াস দেখে কেবলই মনে হয়—কত সত্য, কিন্তু কত অসম্পূর্ণও। (পৃ. [তিন])

এত ভয়াবহ দুঃসময়ের প্রতিফলন কথাসাহিত্যে সমসময়ে, এমনকি অব্যবহিত পরেও পুরোপুরি ঘটে না; দুচারটে রেখাচিত্রই আঁকা হয়। এমন ঘটাই বোধহয় স্বাভাবিক। তবু সেই মন্বন্তরের এত বছর পরেও গোপাল হালদারের ঐ খেদ পুরোপুরি মেটে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অশনি-সংকেত* (১৩৫০-৫২ ব.) থেকে অমলেন্দু চক্রবর্তীর *আকালের সন্ধানে* (১৯৮০/১৯৮২)-র পরেও ঐ খেদ থেকেই যায় : মন্বন্তরের *গোটা চেহারা* কথাসাহিত্যে এখনও আসে নি।

তবু সমকালে লেখা গল্পে 'অতিরঞ্জন' ও 'বাস্তব অপেক্ষা বীভৎসতর' রূপায়ণের অনুযোগ নিতান্তই অসার। আর 'যুগযুগান্তরের সংস্কার ও ধর্মবোধ, বদ্ধমূল আদর্শবাদ' ইত্যাদি গম্ভীর বচন একেবারেই ফাঁপা (উঁচুরীতির ভাষায় যাকে বলে 'শূন্যগর্ভ', বা শঙ্করাচার্য থেকে কর্জ করে বলা যায় : 'তৃণাচ্ছাদিত-কূপবৎ')। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)-র পর থেকেই বাঙলার সমাজজীবন খুব তাড়াতাড়ি বদলাতে থাকে; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও কম ধাক্কা দেয় নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* ছাড়া বাঙলা সাহিত্যে তারই বা স্পষ্ট প্রতিফলন কোথায়? তাই প্রশ্ন জাগে : বহুযুগ ধরে সঞ্চিত সংস্কার ও ধর্মবোধ আর 'বদ্ধমূল' আদর্শবাদের মধ্যে সত্য কতটুকু? বরং উপনিবেশ-পূর্ব বাঙলায় তথা ভারতে ওসবের ক্রমিক ও দ্রুত রূপান্তরই চোখে পড়ার মতো।

শ্রীকুমারবাবু এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চান নি। তিনি তাই স্বস্তি পেয়েছেন তাঁর সঙ্কলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। এই দুটি গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'সমসাময়িক প্রভাবমুক্ত, বিশেষ যুগসমস্যার দ্বারা অস্পৃষ্ট ব্যক্তি-জীবন-প্রধান' (পৃ. পনের)। এমন কালাতীত, যুগসমস্যা ও গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সাহিত্যই শ্রীকুমারবাবুর প্রিয়—এ কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু এমন গল্প কি সত্যিসত্যিই হয়—এক রূপকথার গল্প ছাড়া?' শ্রীকুমারবাবুর গল্প-সঙ্কলনের এই শেষ পর্যায়েই আছে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা'। গল্পটি শুরু হয় এইভাবে :

> গত [উনিশ] শতকের শেষ আর এই [বিশ] শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরেজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তা-ব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।
>
> এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত ও বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন।

এরই খেই ধরে আসে সিলেট (শ্রীহট্ট, এখন অসম রাজ্যের অন্তর্গত)-এ সুরমা নদীর পাড়ে এক হাই স্কুল আর তার পণ্ডিতমশায়ের আত্ম-অবমাননার কাহিনী। দেশাঙ্ক কালাঙ্ক দুর্গতি যুগসমস্যা গোষ্ঠীজীবন ইত্যাদি সব বহাল। তা সত্ত্বেও শ্রীকুমারবাবু এই গল্পয় শুধু হাস্যরস থেকে করুণরসে রূপান্তরটুকুই নজর করেছেন। তার পটভূমি তিনি খেয়ালই করেন নি, আর এটি যে নিছক ব্যক্তি-জীবন-প্রধান কাহিনী নয়—এই বিষয়টিও তাঁর চোখে পড়ে নি।

এই হলো নন্দনসর্বস্ব সাহিত্যদৃষ্টির সমস্যা।[৭]

সাহিত্য, সময় ও সমাজ-এর সম্পর্ক এতই নিবিড় যে এদের কোনো একটিকে অন্য দুটি থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। রসসর্বস্ব সাহিত্যবিচারের খুঁত একেবারে গোড়ায় : সময় ও সমাজকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সাহিত্যের রস চাখার ইচ্ছে। একটি বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টির বিচারে সে-কাজ নিশ্চয়ই করা যায়। গোটা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রর ঝোঁক এইদিকে। বিশেষ কোনো একটি শ্লোক, নির্দিষ্ট একটি কাব্য—সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেটি পড়া ও ব্যাখ্যা করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। নিছক তত্ত্বকথা নয়, দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছু বলা হয় না—এটি তার শক্তির দিক। আবার একই সঙ্গে দুর্বলতার দিকও বটে। কল্পনার বিদেহী আত্মার মতো সাহিত্যও আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে থাকে। ঐ রচনার সমসময়ে লেখা অন্যান্য রচনার সঙ্গে কোনো যোগ থাকে না। এমন করে মাটি থেকে উপড়ে, পটভূমি সরিয়ে একক মাত্রায় কোনো সাহিত্যকর্মর বিচার একান্তই বিষয়ীগত (*সাবজেকটিভ*) হতে বাধ্য।

কোনো কোনো কালপর্বয় সাহিত্যে সময়ের পটভূমি ও সমাজের চেহারা আপাতদৃষ্টিতে গৌণ বলে মনে হয়। কিন্তু সে হলো আপাতদৃষ্টির বিচার। ঠিকমতো দেখতে শিখলে তবেই বোঝা যায় : যে কোনো সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গেই ঐ দুটি উপাদান পরতে পরতে মিশে আছে। কোনো কোনো কালপর্বয়, যেমন ১৯৪০-এর দশকে বাঙলা কথাসাহিত্য—আর শুধু কথাসাহিত্যই বা কেন, গোটা বাঙলা শিল্পসাহিত্য—ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে যায়। চাইলেও সময় ও সমাজকে তখন অগ্রাহ্য করা যেত না।

১৯৭০-এর দশকেও আর-একটি ঘূর্ণি দেখা দিয়েছিল। যত আবছাই হোক, বাঙলা

কথাসাহিত্যে তার ছাপ পড়েছে। সমকালের লেখাপত্রে হয়তো পুরোপুরি স্পষ্ট ছাপ পড়ে না, কিন্তু সর্বকালে... লেখাপত্রেই কিছুটা ছাপ পড়বেই।

একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় : রূপকথা না-লিখে জীবন্ত মানুষজনের কথা লিখতে হলে সময় ও সমাজের ছাপ না-পড়ে যায় না। সত্যিকারের শিল্পী হলে তাঁর রচনায় সময় ও সমাজ জায়গা করে নেবেই। গল্প উপন্যাস নাটক চলচ্চিত্র ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই। সেই শিল্পী চান বা না-চান, সময় ও সমাজ তার পরোয়া না-করেই প্রচ্ছন্নভাবে শিল্পকর্মর মধ্যে হাজির থাকে। সব দেশের সব কালের ক্ষেত্রেই কথাটি খাটে।

আগেই বলা হয়েছে, শিল্পকর্মে সময় ও সমাজের ছাপ পড়া অনিবার্য ও রচয়িতার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। এমনকি ঘোর পলায়নবাদী রচয়িতাও ঐ দুটি উপাদানকে একদম এড়িয়ে যেতে পারেন না, যদিও তাঁর চেষ্টাই থাকে শতকরা একশ ভাগ অবাস্তব স্বপ্নলোক গড়ার। সময় ও সমাজও তার বদলা নেয় মোক্ষম : মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তেমন রচয়িতা চিরদিনের মতো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যান।

টীকা

১ 'রূপকথার গল্প' মানে শুধুই ছেলেভুলানো রাজারানির গল্প নয়। বাংলা দূরদর্শন-এ নিত্য যেসব ধারাবাহিক চলচ্চিত্র দেখানো হয় সেগুলোও একই জাতের—সাবালক হয়েও যারা মনে নাবালক তাদের সময় কাটাতে এগুলো কয়েক মাস, এমনকি বছর ধরে চলে (চলতি নাম : মেগা সিরিয়াল)। কখনও আবার কোনো কোনো ধারাবাহিক হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, প্রায় বিনা নোটিশে তুলে নিতে হয়। সেগুলোর বদলে আসে নতুন এক রূপকথা—সমান উদ্ভট, নতুন বোতলে পুরনো মদ।

২ 'নন্দনসর্বস্ব' বলছি এই কারণে যে নান্দনিক বিচার ছাড়া আর কোনো কিছুই এ ধরনের সাহিত্যদৃষ্টিতে থাকে না। অথচ ন্যূনতম ইতিহাসবোধ ছাড়া শিল্পসাহিত্যের বিচার খণ্ডিত হতে বাধ্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র নির্দ্বিধায় কবুল করেছিলেন : 'ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে আমার নিজেরও কোন প্রবণতা নাই। কাজেই সাল, তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে হয়ত অনেক স্থানে ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে। গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ রস-বিশ্লেষণের চেষ্টা হিসাবে লইয়া পাঠক এই জাতীয় ত্রুটিকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন ইহা আশা করা যাইতে পারে' (*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৪৫। ১৯৮৮ সং [পৃ. ছয়])।

রচনাপঞ্জি

গোপাল হালদার। পরিমল গোস্বামী সম্পা. *মহামন্বন্তর* (জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৪৪)-এর ভূমিকা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮৮ (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ ব.)।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল [সম্পা.]। *বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা* (উত্তর ভাগ—প্রথম পর্ব)। মহাজাতি প্রকাশক [১৩৬০ ব.]।

পরিশিষ্ট

সূচি

সমাজ-চিত্র :

জগদীশ গুপ্ত। রামের টাকা।
মনোজ বসু। কার্তিক ও চিত্রাঙ্গদা।
আশাপূর্ণা দেবী। অভিনেত্রী।
নরেন মিত্র। রস।
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সত্যমেব।

সমাজ-জীবনের ব্যতিক্রম :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্রদানী।
সুবোধ ঘোষ। গরল অমিয় ভেল।
নবেন্দু ঘোষ। কান্না।
রমাপদ চৌধুরী। জ্বালাহর।

পাতাল জীবন :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। টোপ।
ননী ভৌমিক। খুনীর ছেলে।
সুশীল জানা। আত্মা।
সমরেশ বসু। জোয়ার ভাঁটা।

যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় :

প্রবোধ সান্যাল। অঙ্গার।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নমুনা।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বস্ত্র।
সন্তোষকুমার ঘোষ। কানাকড়ি।
প্রভাত দেব সরকার। বিনিয়োগ।
বাণী রায়। ময়নামতীর কড়চা।

ব্যক্তি-পরিচয় ও প্রতিবেশ-চিত্র :

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। অসমাপ্ত।
গজেন মিত্র। আশ্রয়।
সৈয়দ মুজতবা আলী। পাদটীকা।
বিমল মিত্র। মিলনান্ত।
ভবানী মুখোপাধ্যায়। বাতায়ন।
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। উপসংহার।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : সিদ্ধার্থ দত্ত, মলয়েন্দু সিংহ

বিজ্ঞান বিশ্বাস ও সংস্কার

রাজকুমার রায়চৌধুরী

যে রহস্য মানুষের জীবনকে ঘিরে আছে তা কখনোই পুরোপুরি উন্মোচিত হবে না ফিরে ফিরে তা দেখা দেবে কখনো কখনো। সেগুলি (ওই বিশ্বাসগুলি) নৈরাশ্যবাদকে প্রকাশ করে, এমনকি একধরণের স্বাভাবিক সংশয়বাদকে (ম্যাক্‌মিলিয়ন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজন ১৪ খণ্ড, পৃ. ৪০২, অনুবাদ সুকুমারী ভট্টাচার্য)। উপরের কথাগুলি লেখা হয়েছে নরলোক দেববাদ, বিশ্ব ও নিজের মরণোত্তর অস্তিত্ব সম্পর্কে মূল প্রশ্নগুলি যাদের উত্তর দেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা এ নিয়ে পণ্ডিত, দার্শনিকরা বহুকাল ধরে চর্চা করে এসেছেন কিন্তু কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এই রহস্যের আর একটা দিকের ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন যা হল লৌকিক জগতের দিক। বিশেষ করে বিশ্ব কীভাবে তৈরি হল, পৃথিবীর স্থান তাতে কোথায়, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উৎস কোথায় ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে যুগ যুগ ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানার। প্রথম দিকে মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পিছনে বিভিন্ন দেবদেবীর (যাঁরা অলৌকিক শক্তিধর) প্রভাব কল্পনা করেছে। যেমন হিন্দুধর্মে ইন্দ্রকে বজ্রের দেবতা হিসাব চিহ্নিত করা হয়েছে (নর্স পৌরাণিক কাহিনিতে ইন্দ্রর ভূমিকা নিয়েছে থর নামে এক দেবতা)। এখনকার যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে এই সমস্ত দেবদেবীর লীলা নিছকই কল্পনাভিত্তিক মনে হলেও, স্মরণে রাখতে হবে প্রাচীন যুগে এই ছিল কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণার প্রথম পদক্ষেপ। বজ্রপাতের পিছনে যে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে তা জানতে মানুষের প্রচুর সময় লেগেছে যদিও বিদ্যুতের সঙ্গে মানুষের পরিচয় অনেক দিনের, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে ইল বলে এক মাছের শক খেয়ে লোকে আক্রান্ত হত, এই শকের জন্য ইল মাছকে বলা হত নীলনদের বজ্রপাত। এখন আমরা এই মাছকে ইলেকট্রিক ইল বলি।

আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু এই কার্যকারণ সম্পর্কের উপরই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সবসময় কারণ (বিজ্ঞানিক অর্থে) আবিষ্কার করা সম্ভব হত না, আপাত দৃষ্টিতে কিছু ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলে মনে হত। গভীর অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল ঘটনাগুলি আদৌ অলৌকিক নয়, এখানে লৌকিক, অলৌকিক ঘটনার সংজ্ঞা অ্যাব্‌সলুট নয়। এটা আপেক্ষিক। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগে যদি কেউ পকেট থেকে একটা ছোট যন্ত্র বার করে কলকাতায় বসে দিল্লীর কোন লোকের সঙ্গে রাস্তায় কথা বলত তখন নিশ্চয়ই এটাকে ম্যাজিক মনে করা হত। মোবাইল আবিষ্কারের ফলে এটা এখন এত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার যে লোকে ধরে নেয় এটাই তো স্বাভাবিক, খুব কম লোকই জানতে আগ্রহী কি করে এটা সম্ভব হচ্ছে, এখানেই যুক্তিবাদের ভূমিকা আছে।

মোবাইল আবিষ্কারের পূর্বে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের লোকের সঙ্গে রাস্তায় যেতে যেতে কথা বলা পঞ্চাশ বছর আগে অলৌকিক মনে হত কারণ কী করে এটা সম্ভব এই প্রযুক্তি জানা ছিল না। লৌকিক অলৌকিক ঘটনা তাই সময় নির্ভর। কোনো একটা বিশেষ সময়ে প্রকৃতির শক্তি সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি সেই সময়ে এমন কোনো ঘটনা যদি ঘটে যা তৎকালীন জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় তবেই তা অলৌকিক বলে গণ্য করা হয়। যুক্তিবাদী মন সেটা সম্ভব বলে মনে করে না, কারণ যুক্তিবাদীরা সমস্ত কিছুই যুক্তির বিচারে গ্রাহ্য কিনা তা বিশ্লেষণ করেন, কোন ঘটনার পিছনে কী কারণ আছে তার চর্চাই বিজ্ঞানের চর্চার একটা বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি এর সংজ্ঞা কি জানতে গেলে দেখব বিভিন্ন চিন্তাবিদরা বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। অনেক শিক্ষিত লোককে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত উত্তর পাবেন কেন। পদার্থবিদ্যা রসায়ন বিদ্যা এমন কি চিকিৎসা বিদ্যা এগুলিই বিজ্ঞান কিন্তু এগুলি তো বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নাম মাত্র। অভিধান ঘাঁটলে বা গুগুল সার্চ করলে বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যাবে তার মূল বক্তব্য হল সুসঙ্ঘবদ্ধ প্রণালীতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যে জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় তাই বিজ্ঞান। এই সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় বিজ্ঞান আরোহীতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্তত এতদিন ছিল। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল পপার এই আরোহী প্রথার বিরোধী, আরোহী প্রথায় যে মেকানিকাল বা যান্ত্রিক পদ্ধতি আছে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা তার বাহিরে গিয়ে প্রকৃতির গতি শক্তি সম্পর্কে যে মডেল করছে তা আরোহী প্রথা বা ইনডাক্শন মেথড ছাড়িয়ে খানিকটা উল্টোদিকে হাঁটছে। আগে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি তত্ত্ব খাড়া করতেন। সেই তত্ত্বটি থেকে নতুন কোনো ঘটনার যদি ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় এবং পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় সেই ভবিষ্যৎ বাণী হুবহু মিলে যাচ্ছে, সেটা পৃথিবীর যে-কোনো জায়গাই যে-কোনো পরীক্ষাই হোক না কেন, বা যেই করুক না কেন, তাহলে বিজ্ঞানীর তত্ত্বকে প্রকৃতির সূত্র হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আমরা পরে দেখব আধুনিক বিজ্ঞানে কী করে এর বদলে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্‌রা বলে দিচ্ছেন তাঁদের তত্ত্ব প্রমাণ করতে কী পরীক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ এখানে তত্ত্ব আগে পরীক্ষা পরে। ঈশ্বরকণার অস্তিত্ব অঙ্ক কষে ১৯৬৫-৬৬ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল পরীক্ষাগারে তা ধরা পড়ল ২০১২ সালে। কারণ ১৯৬৫ সালে পরীক্ষাগারে এই কণার সন্ধান পাবার মত জটিল যন্ত্র তৈরি হয়নি।

বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আমরা এখানে আলোচনা করছি তার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত বস্তু হচ্ছে 'জ্ঞান'। 'জ্ঞান' বলতে আমরা কী বুঝি, কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়, আদৌ জ্ঞান সম্ভব কিনা এ-বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে বহু দার্শনিকরা বহু তর্কবিতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে অন্টোলজি বা এপিস্টেমলজির কচকচিতে না গিয়ে আমরা খুব সহজ ভাবে সাধারণ বুদ্ধিতে কি করে জ্ঞান লাভ করি তার আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশ্ব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান যা চোখে দেখে, শুনে এবং সাধারণভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি কিন্তু আমাদের চোখের দৃষ্টি, শোনার বা ঘ্রাণ সবই খুব সীমিত। এই ইন্দ্রিয় জাত যে জ্ঞান তাকে উপাত্ত জ্ঞান বলে, যদিও ভারতীয় দর্শনে প্রতিভাস শব্দটিও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে ভ্রম নয় তা কী করে বুঝব। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে মনে হয় জল

আছে কিন্তু তা ভ্রমমাত্র। যদিও আমার কাছে এ উদাহরণ এখন খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না কেন চোখের এই ভ্রম খুব সহজেই দূর করা যায় এবং এই ভ্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আলোর প্রতিসরণ ধর্ম থেকে যে ব্যাখ্যা করা যায় তা স্কুলের ছেলেরাও জানে। কিন্তু আমরা আর একটা জ্ঞানের কথা বলব তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন উপায়েই যাচাই করা সম্ভব নয়। আইনস্টাইন বলে যে একজন মানুষ ছিলেন কী করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, আইনস্টাইনকে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের কেউ বেঁচে থাকলে হয়ত নিজের কানে তাঁর মুখে আইনস্টাইনের কথা জানতে পারি এছাড়া আইনস্টাইনের নিজের লেখা গবেষণাপত্র বা তাঁর সম্পর্কে যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের লেখা পড়ে আমাদের প্রত্যয় হয় যে আইনস্টাইন বলে সত্যিই একটা লোক ছিলেন।

কিন্তু আইনস্টাইন যে সত্যিই ওই লেখাগুলি নিজে লিখেছেন এসব যাচাই না করেও আমরা আমাদের যুক্তিতে আইনস্টাইনের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু আরো যদি পিছিয়ে যাওয়া যায়, যেমন আলেকজান্ডার বা নেবুচাদ্‌নেজার নামক ব্যক্তিরা, বই এর পাতায় অমর হয়ে আছেন কিন্তু ওঁরা যে সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন তা বিশ্বাস করব কি করে। এ ব্যাপারে আমাদের ইতিহাসবিদরা যাঁরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে এঁদের কথা লিখেছেন তাঁদের উপর বিশ্বাস করতে হবে। এই বিশ্বাস ও আমাদের যুক্তিতে আটকায় না কারণ তাঁরা শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিলেও এমন কিছু করেন নি যা অলৌকিক বা যুক্তির অগ্রাহ্য বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে সে নদিয়ার একটি গ্রামে একটি মন্দিরের পাশে মনসা দেবীর পায়ের ছাপ দেখেছে এবং সেই ছাপ এখনো দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কিছুতে যুক্তি দিয়ে তা মেনে নিতে পারি না। পায়ের ছাপটা ফ্যাক্ট বা তথ্য মনে হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাদী মন মনসা দেবী বলে কোনো অতি মানবিক চরিত্র স্বীকার করতে চায় না। যুক্তিবাদীদের মতে কিছু ভণ্ড লোক সরললোকেদের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকাচ্ছে স্রেফ পয়সা রোজগার করার জন্য।

আগেই বলেছি আলেকজান্ডার বা নেবুচাদ্‌নেজার ধূসর অতীতের চরিত্র হলেও তাঁরা যে এক সময়ে জীবিত ছিলেন তা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি নেবুচাদ্‌নেজারের পুত্র ব্যাবিলনের রাজা বেলসাজারের অস্তিত্বকে। কিন্তু যখন পড়ি তিনি এক বিরাট ভোজনসভার আয়োজন করেছিলেন, যে ভোজনসভায় আনন্দ উৎসবের মধ্যে হঠাৎ দেওয়ালে দৈববাণী ফুটে উঠল 'মেনে মেনে টেকেল উফারসিন্'—যার অর্থ ব্যাখ্যা করতে ডাকা হল প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ড্যানিয়েলকে। ড্যানিয়েল এসে সেই দৈববাণীর ব্যাখ্যা করে বললেন বালসাজারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, সেই রাত্রেই বালসাজার নিহত হন, তখন বালসাজারের নৈশভোজ বা তাঁর নিধনে বিশ্বাস করতে আমাদের অসুবিধে হয় না কিন্তু দেওয়ালে ওইভাবে আপনা হতে লেখা হতে পারে তা আমরা বিশ্বাস করি না। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কিন্তু রিমোট কন্ট্রোলে দেওয়ালে লেখা ফুটে উঠার ব্যবস্থা করা খুব সহজ কিন্তু সেই প্রযুক্তি তখনকার যুগে ছিল না। কাজেই সেটা ছিল একটা অলৌকিক ঘটনা যা যুক্তিবাদী মন তা মানতে রাজি নয়। এখনকার যুগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের অর্থ এই নয় যে চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যা প্রত্যক্ষ হয় তাই জ্ঞান বলে ধরে নেওয়া। প্রযুক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়দের প্রসারিত করেছে বললে খুব একটা ভুল হবে না, টেলিস্কোপ দেখার ক্ষমতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে গ্রহ নক্ষত্রদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ যাতে

করে সম্ভব হয়েছে আবার লীওয়েনহুকের (১৬৩২-১৭২৩) মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ধূলোর থেকেও অতি সূক্ষ্ম বস্তু দেখার এক বিরাট সম্ভাবনা এনে দিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখন এটা এক অপরিহার্য যন্ত্র।

আমরা যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বলি তা শুধু বিজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, জ্ঞান চর্চার প্রত্যক্ষ শাখা, তা সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস বা কলা হোক্ না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কার্ল সাগান (১৯৩৪-১৯৯৬) তাই বলেছেন বিজ্ঞান শুধু একটা তথ্যের সংগ্রহশালা নয় এটা হল মানুষের একটি বিশেষ চিন্তাধারা। অনেক বিজ্ঞানীদের হাতে দেখা যায় একাধিক জ্যোতিষের আঙুটি, নানান দেবতা অপদেবতার কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এগুলি তাঁরা পড়েন। তাই বিজ্ঞান এঁদের কেরিয়ার হলেও এদের বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না। আবার অনেক ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন যাঁরা এ সমস্ত কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, এঁরা বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী মানুষ। কিন্তু কোনটা কুসংস্কার আর কোনটা সংস্কার এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার সংস্কার বলতে আমরা কি বুঝি? সংস্কারের ঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই।

ইংরাজিতে যে সমস্ত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় তা হল নোশন বা ধারণা, বিশ্বাস বা প্রেজুডিস এগুলির কোনোটাই যুক্তি নির্ভর নয়, অর্থাৎ সোজা কথায় এগুলি একধরনের বিশ্বাস যা আমরা আমাদের কালচার ও ট্র্যাডিশনের অঙ্গ। এই সমস্ত বিশ্বাসই গোঁড়াবাদীদের কাছে অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের রূপ নেয় তাই সংস্কার ও কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় খুবই ক্ষীণ, কিন্তু রিচুয়াল বা বংশ পরম্পরায় রিচুয়াল হিসেবে গণ্য হয় তাকে আমরা কুসংস্কার হিসেবে গণ্য করি না, এগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক আচার হিসেবে গণ্য হয়, বিয়ে ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যজ্ঞের আয়োজন করা বা এমন কি গয়াতে মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডি দেওয়া এগুলির পিছনে কোনো তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি না থাকলেও শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেশির ভাগ হিন্দুই তা পালন করেন। যুক্তিবাদীরাও এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তা না হলে যাঁরা এ গুলিকে পরিহার করবেন তাঁরা পাগল বা উদ্ধত হিসেবে গণ্য হবেন। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—দুর্গাপূজা। এ বিষয়ে গদগদ উচ্ছ্বাস না প্রকাশ করলে চরম নাস্তিক বা আরো কিছু বিশেষণে আপনি ভূষিত হবেন।

দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গে একটি বিরাট ব্যবসা। টিভি চ্যানেল-গুলোতে দুমাস আগে থাকতে দুর্গাপূজার থিম কী হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করে, বড় বড় পূজাগুলির বাজেট কোটি টাকা অনায়াসে ছাড়িয়ে যায়। এদের পৃষ্ঠপোষক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড় বড় নেতা বা মন্ত্রীরা, বামপন্থীরা হয়ত সরাসরি ভাবে এর পৃষ্ঠপোষণ করেন না কিন্তু পূজামণ্ডপে তাঁরা উপস্থিত থাকেন হয়ত মার্কসবাদী পুস্তক বিক্রী করার জন্য। ছোট, বড়, মাঝারী তারকারা (রুপালী পর্দা টেলিভিশনের সোপ অপেরার নায়ক নায়িকারা), সুপরিচিত বা অর্ধপরিচিত স্বল্পবসনা সুন্দরী মডেলরা পূজার চারদিন, কী ভাবে কাটাবেন, কী খাবেন তার মুখরোচক আলোচনা নিয়ে খবর কাগজ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি সরগরম থাকে। দেশের দুঃখদারিদ্র্য, যেন মনে হয় দেশ থেকে দূরে সরে গেছে, গাজা বা ইরাকে শত শত লোক মারা গেলেও দুএকটা ফুট নোট ছাড়া সে খবর একদিন গুরুত্ব পায় না। এই দুর্গাপূজা যে পৌত্তলিকতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ

একথা বলার মত বুদ্ধিজীবী কালা পাহাড়ের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। এমনকি আমরা স্মরণে রাখি না ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই উৎসব মোটেই প্রধান উৎসব নয়। মহারাষ্ট্রে যেমন গণেশ পূজার পপুলারিটির তুলনায় দুর্গাপূজা খুবই স্তিমিত, বিদেশে আবার প্রবাসী বাঙালীরা তাঁদের বাঙালিত্বের পরিচয় দেন দুর্গাপূজার আয়োজন করেন এমনকি অনেক যুক্তিবাদী ও তথাকথিত টিভির বুদ্ধিজীবীরা (আশ্চর্যের ব্যাপার, টিভিতে সিনেমা ও নাটকের লোক ছাড়া বুদ্ধিজীবীর খোঁজ পাওয়া দুষ্কর, বিজ্ঞানীদের তো বুদ্ধিজীবী বলে ধরাই হয় না) দুর্গাপূজার পক্ষে যুক্তি দেন এই বলে যে এতে কত লোকের রোজগার হয়। অনেকে আবার খুব ভাবপ্রবণ হয়ে যান; যখন কাগজে ছাপা হয় মুসলমানরাও দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করছেন। বস্তুত দুর্গাপূজার মণ্ডপের অনেক উপকরণই মুসলিমরা তৈরি করেন এটা তাঁদের জীবিকা, আমরা ভুলে যাই একজন প্রকৃত মুসলমান ঘোরতর ভাবে পুতুল পূজার বিরোধী। পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান ছাড়া যদি লোকের অর্থ সংস্থান আর কোনো উপায় না থাকে তবে বুঝতে হবে আধুনিক অর্থনীতির সমাজে ঢুকতে আমাদের বহু দিন বাকি আছে। শুধু দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এখন যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই সব বারোয়ারি পূজার হাত থেকে আমরা কোনোদিন মুক্তি পাব তার কোন আশা নেই। এর কারণ আমাদের দর্শনে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পজিটিভিসমের ডোজ দরকার ছিল তা কোনোদিনই দেওয়া হয়নি, উল্টে আধুনিক আঁতেলরা ফুকো, দেরীদা, অনেকান্তবাদ, পোস্ট মর্ডানিজমের নামে সাবেকী বিজ্ঞানকেও দূরে রাখার চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞান বিরোধী সংস্কারবদ্ধ গোষ্ঠীর এতে খুব সুবিধে হয়েছে। কিন্তু এর ফলে সমাজের খুব ক্ষতি হয়েছে। যে ছেলে হাঁটতে শেখেনি তাকে অলিম্পিকের দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার প্রচেষ্টা করলে সে কোনদিন হাঁটতে শিখবে না, ধর্ম হওয়া উচিত ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অবিশ্বাসের ব্যাপার। এখন বারোয়ারি পূজায় বিশাল অঙ্কের চাঁদা (বা তোলা) না দিলে পাড়ায় অচ্ছুত হতে হবে। পাড়া ছাড়তেও হতে পারে। প্রত্যেক শনি মঙ্গলবার রাস্তা রাস্তায় সদ্য গজিয়ে ওঠা মন্দিরের সামনে টাইকোট পরিহিত পুরুষ ও সুসজ্জিতা জিন্‌স ও টপপড়া তরুণীদের ও অবস্থাপন্ন বিপুলদেহী শিক্ষিতা মহিলার নৈবেদ্যের থালা সাজানো দেখে মনে হয় যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির কথা লিখে কালি ও কাগজ এবং সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না। শিক্ষিত যুক্তিবাদীরাও কিছুটা অগ্রসর হয়েও থেমে যান। ভাবেন দুশো বছর আগে ডিরোজিয়ান বা ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিভাধর সদস্যরা যার কিছুই করতে পারেননি তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং স্রোতে গা ভাসিয়ে ফুকো, হাবেরমাস, পোস্ট মর্ডানিজমের চর্চা করা অনেক নিরাপদ, আপামর জনসাধারণ (সত্যি কথা বলতে কী বর্তমান লেখকও) যার বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝবেন না কিন্তু এতে নিরাপদ থাকা যায়। কোনো গোঁড়া ধর্মীয় সংস্থা আপনাকে ঘাঁটাবেনা। এঁরা ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কার ও কুসংস্কারের এক সূক্ষ্ম বিভাজন করেন। এঁরা সবাই ডাইনি হিসেবে কাউকে পুড়িয়ে মারাকে নিশ্চয়ই কুসংস্কার হিসেবে ধরেন। কিন্তু টিভি চ্যানেলে যখন প্রায় দিবারাত্র দেখেন সুন্দরী, সসজ্জিতা মহিলারা বেশ কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে একটি লক্ষ্মীযন্ত্র বা পাদুকা কিনলেই জীবন ধনধান্যে ভরে উঠবে, সমস্ত গাড়িবাড়ির সমস্যা দূর হবে তখন কিন্তু সমবেতভাবে

এইসব বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে না। সাধারণ স্বল্পবিত্ত মানুষ টিভি চ্যানেলে এগুলো দেখে প্রতারিত হন ও অনেক কষ্টে জমানো টাকা হারান এইসব বুজরুকির শিকার হয়ে। আরো মারাত্মক হল সিউডো সায়েন্টিফিক্ বিজ্ঞাপনগুলি। স্যুট টাই পরিহিত তথাকথিত প্রসিদ্ধ ডাক্তারী (যাঁর ডাক্তারী ডিগ্রীটি স্বপ্রদত্ত) নানারকম উল্টোপাল্টা তত্ত্ব খাড়া করে দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে একটা চুম্বকের বালা পড়লে যাবতীয় রোগভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বা একটা গাছের রস খেলে সব কঠিন পুরোনো ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। সরল দর্শক ভাবেন না ব্যাপারটা এত সহজ হলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে পৃথিবীর নানা দেশে আধুনিক গবেষণাগারে বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার দরকার ছিল না। টিভি চ্যানেল বা সংবাদপত্রের মালিকরা বলবেন এগুলি বিজ্ঞাপন মাত্র এগুলি লোকে বিশ্বাস করে বা না করে তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সমাজের কাছে কি তাঁদের কোন দায়বদ্ধতা নেই? আমাদের দেশের একটা বিরাট অংশ স্বল্পশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত, চারিদিকে মুক্তির কোনো আশ্বাস নেই, টিভিতে বলছে এতেই তাঁরা অনেক কিছু বিশ্বাস করেন ও বুজরুকির শিকার হন। কিন্তু যুক্তিবাদীরা এই সমস্ত বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন বা সভা করে মানুষকে সচেতন করেছেন বলে আমার জানা নেই। কিছু সংস্থা আছে যাঁরা বিজ্ঞান চেতনার জন্য নানা অনুষ্ঠান করে। এদের কর্মকর্তারা অনেকেই সত্যিই খুব সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, গ্রামেগঞ্জে সব জায়গায় যাচ্ছেন মানুষকে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু এঁরা সংখ্যায় কম এবং শিক্ষিত সমাজেও তাঁদের শত্রু অনেক। প্রযুক্তির যত উন্নতি হচ্ছে আমাদের দেশ এবং তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব এই সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের থেকে মুক্তি পাওয়া দূরে থাক, আরও গভীর গাড্ডায় নিমজ্জিত হচ্ছে। প্রযুক্তির সাহায্যে এইসব পুজা বা অনুষ্ঠানের জাঁকজমক আরো বেড়েছে, যেমন লেসার বা থ্রি ডাইমেনশনাল প্রজেক্সন, হলোগ্রাম ইত্যাদি ব্যবহার করে লোককে চমৎকৃত করা হচ্ছে। এইসব প্রযুক্তির পিছনে যে বিজ্ঞান আছে তা জানবার আগ্রহ উচ্চশিক্ষিত লোকেদের মধ্যেও খুব কম। বিজ্ঞানের সাফল্যগুলি আমরা ভোগ করছি (যেমন কালার টিভি, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট) কিন্তু বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদ সম্পর্কে সাধারণ লোককে অভিহিত করার কোন প্রচেষ্টা নেই। আমার মনে হয় এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে, অন্ধ বিশ্বাসে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা যেকোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষ হোক না কেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা বা ম্যানিপুলেট করা রাজনীতিক দলগুলির পক্ষে অনেক সহজ হয়। অন্ধ বিশ্বাস সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করা যায়। বাম, ডান বা মধ্যপন্থী কোনো দলই এই ভণ্ডামী ও দ্বিচারিতা থেকে মুক্ত নয়। যুক্তিবাদ শিক্ষিত লোকের একচেটিয়া নয়, বরং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির থেকেও অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি আছেন যাঁরা ধর্মের নামে বুজরুকি ধরতে পারেন তাঁদের স্বাভাবিক বিচার বোধ থেকে। বরং বেশির ভাগ শিক্ষিত লোকই যুক্তিবাদের পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েও থেমে যান, তাঁরা সংস্কার ও কু-সংস্কারের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজন তৈরি করেন। ডাইনিবাদ কুসংস্কার বলে মনে করেন, কিন্তু এঁরাই উচ্চবর্ণের লোক হলে ঘটা করে ছেলের পৈতে দেন নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণের জন্য। আমরা যে একটা ভণ্ড সমাজে বাস করছি একথা বলা যে যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিজ্ঞানীরা

সমাজবহির্ভূত জীব নন, বিজ্ঞান ও সমাজের বাহিরে কোনো জ্ঞানের চর্চা নয়। অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করেন যাকে আমরা কমনসেন্স বা সাধারণ জ্ঞান বলে মনে করি বিজ্ঞান তারই একটা প্রসারিত রূপ যা প্রাকৃতিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। প্রথমে এই প্রসারিত রূপকে বিজ্ঞান একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যা সাধারণ মানুষের কাছে মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্য বা বোধগম্য বলে মনে হয়, জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস আলোচনা করলে ব্যাপারটা আর একটু খোলসা হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। তারারা কী বস্তু, বিশ্বের উপাদান কী, এইসব প্রশ্ন মানুষের মনে ভিড় করেছিল। বিভিন্ন তারাপুঞ্জের আকৃতি মানুষের চোখে বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতিচ্ছবি বলে মনে হত। এই সমস্ত জন্তুদের নাম এখনও রাশি বা কনস্টেলেশনের ক্ষেত্রে এখন প্রযোজ্য। যেমন মেষ, বৃষ, কর্কট ইত্যাদি। মানুষ লক্ষ্য করেছিল এইসব রাশির মধ্য দিয়ে চাঁদ ও সূর্যের গতিপথ। সেই সময় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র যে বৃত্তাকারে ঘুরছে এরকম ধারণাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সৌর জগতের এই সরল মডেলে একটা জিনিস ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এটা হল গ্রহদের গতিপথ, শনি, বৃহস্পতি বা অন্যান্য গ্রহরা কখনো সোজা পথে বা কখনো উল্টোপথে ঘোরে। এই বিচিত্র গতির জন্যই এদের নাম প্ল্যানেট যার অর্থ হল ইতস্তত বিচরণকারী, অবশ্য টলেমি পৃথিবী কেন্দ্রিক মডেল ত্যাগ না করে আর একটু জটিল মডেল তৈরি করেছিলেন যা গ্রহদের এই বিচিত্র গতির একটা ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিল। টলেমির (১০০-১৬৮ খৃ.) মডেলের বহুদিন ধরে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি, চার্চের পক্ষে তো এটা আদর্শ মডেল কারণ তাহলে পৃথিবীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র এবং মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট জীব বলে ধরে নেওয়া যাবে। কিন্তু টলেমির উপর লোকের বিশ্বাস শুধু এই কারণে হয়নি; এই মডেল প্রায় নিখুঁত ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। এই মডেল ছিল কমনসেন্স। কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)ই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি টলেমির মডেলকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, অবশ্য এর আগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ আর্য ভট্ট মনে করতেন পৃথিবী তার নিজের চারদিকে ঘোরে বলেই দিন রাত হয় এবং তারাদের অবস্থান পরিবর্তনের কারণও এই আহ্নিক গতি।

ভারতে অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা কোপারনিকাসের আগে আর্যভট্টই সূর্য কেন্দ্রিক সৌর জগতরে মডেল আবিষ্কার করেন। কিন্তু আমার জানত এবিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। আমরা কোপারনিকাস ও গ্যালিলিওকে পাইনি, পেলে বোধহয় আমাদের সমাজে অন্ধবিশ্বাস একটু কমত। যদিও নিউটন অ্যালকেমি (লোহা থেকে সোনা বানানোর বিদ্যা) ও জ্যোতিষচর্চা করতেন বলে জানা যায় কিন্তু আগেই বলেছি বিজ্ঞানীরা সমাজ বহির্ভূত কোনো জীব নন এবং বিজ্ঞানচর্চা ও অন্যান্য জ্ঞানচর্চার মত তৎকালীন সমাজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনা। যদিও যুক্তিবাদীর লক্ষ্য থাকবে এইসব প্রভাবকে অতিক্রম করে এক ধাপ এগোনো।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে আমরা আলেকজান্ডার, নেবুচাদনেজার ইত্যাদি ইতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের চোখে না দেখলেও বা প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ না পেলেও বিশ্বাস করি এইসব লোক এবং সময় পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। এই বিশ্বাস আমাদের যুক্তিকে আঘাত করে না, ধরা যেতে পারে বহুদিন ধরে ইতিহাসিক ও লেখকরা কোনো মিথ্যার প্রচার করে যাচ্ছেন তা নয়।

কিন্তু কেউ যদি আলেকজান্ডার আকাশ পথে ভ্রমণ করতেন বলে দাবি করেন তা আলেকজান্ডারকে না দেখেও কোনো যুক্তিবাদী এটা মেনে নিতে পারেনা। তার কারণ এমন কোনো নিদর্শন আমরা পাইনি যা থেকে প্রমাণ হয় যে তখন বিমানের আবিষ্কার হয়েছিল। তাই যুধিষ্ঠিরের পুষ্পক রথে চড়ে আকাশ ভ্রমণ আমরা কবির কল্পনা হিসাবেই ধরি, তার সঙ্গে আক্ষরিক বাস্তবতা খুঁজি না। যাঁরা বিজ্ঞানের কিছু খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন যে ২০১২ সালে জেনিভায় সার্ন পরীক্ষাগারে হিগস্ বোসন আবিষ্কার হয়েছে, যাকে মিডিয়া ঈশ্বরকণা (নামটি ডিক টেরেসি ও লেডার ম্যানের লেখা একটি বই থেকে নেওয়া) বলে খুব প্রচার করেছিল। কিন্তু অঙ্ক কষে ১৯৬৬ সালেই এই কণাটির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী যার মধ্যে ছিলেন পিটার হিগস (১৯২৯—), যাঁর নামে এখন কণাটিকে সকলে চেনে, কিন্তু অল্পসংখ্যক সন্দেহবাদী বাদ দিলে বেশীর ভাগই লোক ধরে নিয়েছেন পরীক্ষাগারে সত্যিই এই কণা ধরা পড়েছে। এই বিশ্বাসের পিছনে আছে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও গণিতের উপর আস্থা।

যুক্তিবাদীদের পক্ষে সবকিছু হাতে কলমে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। হিগস বোসন কোনো ম্যাজিক বা অলৌকিক ঘটনা নয়।

আমেরিকা বা অন্য কোনো ধনী দেশ যদি বিপুল অর্থ খরচ করে সার্নের মেশিনের মত কোনো মেশিন বানাতে পারে তাহলে তারাও হিগস বোসনের সন্ধান পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তা না হলে আমরা সন্দেহ করতেই পারি সত্যিই হিগস বোসন বলে কোনো কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে কিনা।

এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা পদ্ধতি আলোচনা করলে জানতে পারব আরোহী প্রথাই বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়, যুক্তিবাদ মানে এই নয় শুধু একটা জানলা খুলে রেখে মনের আর সব জানলা বন্ধ করে রাখা। তাহলে তো যুক্তিবাদের সঙ্গে অন্ধ বিশ্বাসের কোন তফাৎ করা যাবে না।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৯) নিজে আরোহী পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন, তাঁর মতে কোনো তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে তা নির্ভর করবে তত্ত্বটি ভুল কিনা এটা যদি পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে এই বাক্যটি, কাল বৃষ্টি হতেও পারে নাও হতে পারে। পপারের মতে এটি কখনোই বৈজ্ঞানিক স্টেটমেন্ট হতে পারেনা কারণ এই তত্ত্বটি ভুল কিনা তা প্রমাণ করার উপায় নেই। কিন্তু 'কাল বৃষ্টি পড়বেই' এই স্টেটমেন্ট বৈজ্ঞানিক কারণ এটি ভুল কিনা তা প্রমাণ করা সম্ভব।

এখানে আমরা পপারের উক্তির উপর ভিত্তি করে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আলোচনা করব। গাছ থেকে একটি আপেল পড়তে দেখে নিউটন আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র (আপেল পড়ার ঘটনাটি পুরোপুরি মিথ নয়, উইলিয়াম স্টাকলি (১৬৮৭-১৭৬৫) তাঁর রচিত 'মেময়েরস অফ্ স্যর আইজ্যাক নিউটন'স লাইফ' গ্রন্থে একরকম একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা তিনি স্বয়ং নিউটনের মুখ থেকে শুনেছিলেন।) নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রকে প্রায় দুশো বছরের বেশি মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে শেষ কথা বলে ধরা হত। গাছ থেকে আপেল পড়া ঘটনাটির আজ পর্যন্ত কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু কোটি কোটি আপেলের পতন থেকে কি

আমরা শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত থাকব যে পরের আপেলটিও পাকলে গাছ থেকে টুপ করে মাটিতে পড়বে। তা হয়ত পারব না তবে প্রায় নিশ্চিত হতে পারি। মজার কথা হল নিউটনের এই সূত্রটি যে কেউ একটি বল নিয়ে যাচাই করতে পারেন। একটি বল উপরে ছুঁড়লে সেটা নিচে পড়বেই, যদি না আমরা বলটাকে এমন জোরে ছুঁড়ি বা এসকেপ ভেলোসিটিকে ছাড়িয়ে যাবে ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে হয় পৃথিবীর চারধারে ঘুরবে নয় পৃথিবীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু মাটিতে পড়বে না)।

কার্ল পপারের দর্শন অনুযায়ী নিউটনের সূত্রটি বৈজ্ঞানিক সূত্র কারণ এটি ভুল কিনা তা পরীক্ষা করে যাচাই করা সম্ভব। কিন্তু হাজার পরীক্ষা করেও কোনো ভুল না পেলেও সূত্রটি যে ধ্রুব সত্য তা মেনে নিতে হবে? এর উত্তর হবে 'না', তবে সূত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমশ বেড়ে যাবে।

এখন আমরা জানি নিউটনের সূত্র অনুযায়ী সমস্ত গতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্যালাক্সীর মতন বিশাল বস্তু বা অণু পরমাণুর মত অতি ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র খাটে না। এক্ষেত্রেও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা বাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রের দরকার হবে। এই দুটি তত্ত্বই কমনসেন্স দিয়ে বোধগম্য হবে না; নিউটনের সূত্র অনুযায়ী সময় অ্যাবসলুট, অর্থাৎ কে সময় মাপছে তার উপর সময় নির্ভর করবে না। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রে সময় ও আপেক্ষিক এর কারণ আলোর গতি শূন্যে একাই থাকবে। আমরা স্থির থেকে বা চলন্তগাড়ি থেকে যদি আলোর গতি মাপি, দুটি ক্ষেত্রেই আলোর গতি একই থাকবে, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে মাপা সময় এক হবে না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় আরো সব প্রায় ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটে।

কোন কণার অবস্থান সঠিক ভাবে জানতে গেলে তার ভরবেগ বা মোমেন্টাম বা তার গতি নির্ণয় করতে পারব না এই সূত্র আবিষ্কার করেন হাইসেনবার্গ (১৯০১-১৯৭৬) এবং এই সূত্রটি এখন হাইসেনবার্গ অনিশ্চয়তা বাদ হিসেবে পরিচিত। এই তত্ত্ব শক্তি ও সময় সম্পর্কেও খাটে। এর ফলে কোনো বস্তু সঠিক কোনো সময় কোথায় আছে জানার চেষ্টা করলে তার শক্তি বা এনার্জি ওই মুহূর্তে কত হবে তা বলা সম্ভব হবে না। এর ফলে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে পারে। যার একটা হল টানেলিং। ধরা যাক কোনো বস্তুর সামনে একটা বাধা আছে, সেটা আমরা একটা ছোট পাহাড়ের আকারে ধরে নিতে পারি, যদি বস্তুটির অবস্থান কোনো সময় কোথায় তা জানতে পারি তবে তার শক্তি কত আদৌ জানতে পারবনা, এই শক্তি অসীমও হতে পারে। ফলে বস্তুটিকে পাহাড়ের একধার থেকে অপর ধারেও দেখতে পারি। এই টানেলিং শুধু বিজ্ঞানীর কল্পনা তা নয় পরীক্ষাগারেও এটা প্রমাণিত হয়েছে। ব্রায়ান জোসেফসন নামক এক বিজ্ঞানী (১৯৪০—) এই তত্ত্ব প্রমাণ করেন এবং মাত্র ৩৩ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পান।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে যেমন অ্যাবসলুট সময়ের ধারণা নস্যাৎ করে দিয়েছে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বা জেনারেল থিয়োর অফ রিলেটিভিটি দেশ কাল ও বিশ্ব সম্পর্কেও আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই তত্ত্বের ফলে আমরা জানতে পারি কোন ভরের উপস্থিতিতে দেশকাল বক্র হতে পারে, আলোও ভরের সামনে এলে সরলরেখায় চলে না। আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আমাদের কমনসেন্স দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষাগারে এখনো পর্যন্ত এরা ভুল প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আমাদের দিয়েছে নিউক্লিয়ার

এনার্জি আর আমরা এখন যে সমস্ত গ্যাজেট, যেমন স্মার্টফোন, কালার টিভি বা ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করি সবই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি সত্ত্বেও শিক্ষিত মানুষ ও সংস্কার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত নন। বৈজ্ঞানিক নিরক্ষরতা যে শুধু মাত্র একটা কালচারাল সমস্যা তা নয়, আমাদের অস্তিত্বই নির্ভর করছে এই সমস্যা আমরা দূর করতে পারি কিনা তার উপর। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদ প্রবণতা, মূর্তি পূজা, বহু ঈশ্বরবাদ, গোঁড়ামী এইসব মধ্যযুগীয় ব্যাপারগুলোর একটি বা অপরটির কাছে বিলিয়ে দিয়েছিলেন আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের ইংরেজি শিক্ষার ওজন বেশ ভারী। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীরা বহুদিন ধরে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারেননি (বিনয় ঘোষ—বাংলার বিদ্যুৎ সমাজ, প্রকাশ ভবন, ২০০৬)

আগেই বলেছি যুক্তিবাদীদেরও মনের সবকটা জানালা খোলা রাখা উচিত। কিন্তু হিগস্ বোসনের অস্তিত্বের বিশ্বাস করা না করার সঙ্গে মনসার পায়ের ছাপের অস্তিত্বের বিশ্বাস এক বস্তু নয়, বিজ্ঞানের সূত্রগুলি পরীক্ষাগারের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়, কালক্রমে পুরোনো সূত্র বাতিল করে নতুন সূত্রের আমদানি করতে হয় এটাই বিজ্ঞানের পদ্ধতি, কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া সমাজের পক্ষে অতীব জরুরি এটা না হলে সংস্কার আর কু-সংস্কারের অন্ধকূপে আমরা আটকে থাকব তা প্রযুক্তির যতই উন্নতি হোক না কেন। মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানো বা হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার ক্ষমতা থাকলে ও যে দেশে জাতপাতের নাম করে লোককে নির্যাতিত করা হয়, বিজাতের মানুষকে বিয়ে করলে বরকনে দুজনেকেই খুন করা হয়, শিশু কন্যা জন্মালে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয় সে দেশের পক্ষে প্রযুক্তির গুণগান গাওয়া শুধু পাগলামি নয় একটা অপরাধও বটে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ডারউইনের তত্ত্বের। পৃথিবীতে প্রাণীর বৈচিত্র দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে-কোনো এক অতীতে এককোষী প্রাণীর উদ্ভিদের পর সমস্ত প্রাণীই বিবর্তনের ফলে নানারকম চেহারা পেয়েছে, ডারউইন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। নিউটনের তত্ত্বের মত গণিতের সূত্রে তখন এই তত্ত্বকে বাঁধা সম্ভব ছিল না। ডারউইন প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বাঁদর থেকে মানুষের বিবর্তন অধিকাংশ মানুষ মেনে নিতে পারে নি। আমেরিকার কিছু স্টেটে এখনো ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে বাইবেলের সৃষ্টি কাহিনি পড়া বাধ্যতামূলক। ডি এন এ আবিষ্কার হওয়ার ফলে এখন ডারউইনের তত্ত্ব উড়িয়ে দেওয়া খুব শক্ত। শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে আমাদের ডি এন এ-র তফাৎ শতকরা দু ভাগেরও কম। কালো মানুষ ও সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যে ডি এন এর পার্থক্য প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। ডারউইনের সময় কিন্তু বেশ কিছু যুক্তিবাদী ব্যক্তি ডারউইনকে সমর্থন করেছিলেন। ওয়ালেস ও একই সময়ে এই তত্ত্বের আবিষ্কারক। আমাদের দুর্ভাগ আমরা কোন ডারউইনকে পাইনি বা পেলেও তাঁকে গ্রহণ করতাম কিনা সন্দেহ আছে। পৃথিবীর সব রহস্য যে বিজ্ঞান উন্মোচিত করেছে তা নয়। কিন্তু যুক্তিসম্মত প্রশ্ন তোলাই মানুষের কাছে অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর' এটা ভক্তিবাদীর বক্তব্য হতে পারে যুক্তিবাদীর নয়। প্রশ্ন, প্রশ্ন এবং প্রশ্নই যুক্তিবাদীর ধর্ম।

অবাস্তবের সন্ধানে বাস্তব

রুশতী সেন

খোদ কলকাতা শহরের একটি কলেজ। বেশি বড় নয় অবশ্য। ছাত্রীসংখ্যা হাজারের কম। বছর তিনেক আগেকার ঘটনা। প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণিতে সাম্মানিক ভর্তির জন্য পরীক্ষা চলছে। প্রচুর পরীক্ষার্থী। তাই পরীক্ষাকক্ষে পাহারাদারির জন্য ইংরেজি বিভাগের বাইরের শিক্ষক-শিক্ষিকারও ডাক পড়েছে। যে-পরীক্ষাকক্ষের গল্প, সেখানে পাহারা দিচ্ছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক, সঙ্গে ইতিহাস বিভাগের এক তরুণ শিক্ষকও আছেন। পরীক্ষার সময়সীমা একঘণ্টা। দশ মিনিট যেতে না যেতেই ফুঁসে উঠল এক পরীক্ষার্থী। প্রশ্নপত্রে এত ভুল। এগুলো কী? অর্থহীন কতগুলো শব্দ লেখা, যার মানে জানতে চাওয়া হয়েছে, যেমন—dost, hath, polygamy।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক মেয়েটিকে শান্তভাবে শুধোলেন, তুমি sure যে এগুলো কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ নয়? দ্রুত উত্তর দিল পরীক্ষার্থী—H. S.-এ আমি 82% পেয়েছি English-এ। এইসব শব্দ থাকলে আমি জানতাম না?

ইতিহাসের তরুণ শিক্ষকটি এখনো কোনো কথা বলেননি। এবারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত চাইলেন—প্রশ্নে যখন এত ভুল, ইংরেজি বিভাগের একজনকে ডেকে পাঠাই, দিদি? কনিষ্ঠ সহকর্মীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বললেন—না, ডাকতে হবে না, আমিই সামলাতে পারব। তারপর পরীক্ষার্থীকে বললেন, প্রশ্নপত্রে একটিও ভুল নেই। যা পার, লেখ।

ভর্তির পরীক্ষায় মেয়েটি যত কম নম্বরই পাক, উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে ৮০ শতাংশের উপরে যে নম্বর, তার একটা গুরুত্ব তো যোগ করতেই হবে ভর্তির নিরিখ নির্ধারণে। সুতরাং ২০১১সালে polygamy-র হদিস না-জানা (অন্য দুটি না হয় কবিতায় ব্যবহৃত পুরনো ইংরেজি) অথচ উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে ৮০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রীটি খুব সম্ভব কোনো কলেজে ইংরেজিতে সাম্মানিকসহ স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে পেরেছিল। আর ইতিহাসের শিক্ষকটি তো তাঁর স্নাতকোত্তর পাঠক্রম সসম্মানে সমাপ্ত করে, তবেই না মহাবিদ্যালয়ে পাকা চাকরি পেয়েছেন। তাঁর যা বয়স, সেই সুবাদে বোঝা কঠিন নয় যে, শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের মহান আদর্শ মেনে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে স্কুলে যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর নীচে ইংরেজি পড়ানো বেআইনি হয়ে গিয়েছিল, তখনকার স্কুলজীবন থেকে আজ তিনি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আনুষাঙ্গিক শিক্ষা-প্রশাসন তো তাঁকে পথে বসায়নি। শৈশবে ইংরেজি না পড়ে যে কতদূর সফল হওয়া সম্ভব, তার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে তাঁকে পাঁচজনের সামনে দাঁড় করানো যায়। পাকা চাকরি পাওয়ার পাঁচবছরের মধ্যে তাঁর বাড়ি বড় হয়েছে, নতুন গাড়ি হয়েছে। প্রথমবর্ষ সাম্মানিকের প্রথম ক্লাসেই তিনি পড়ুয়াদের ঠিকানা জানতে চান। অসম্ভবরকম দূরবর্তী নয় যাদের বাসস্থান ওই শিক্ষকের কোচিংক্লাসের ঠিকানার থেকে, তারা অনেকেই তাঁর কোচিং-এ হাজির হয়। কলেজে সাম্মানিক ক্লাসের হাজিরা খাতায় পড়ুয়াদের উপস্থিতি নথিবদ্ধ হওয়ায় জন্য শিক্ষক

বা পড়ুয়া কোনোপক্ষেরই কলেজের ক্লাসে আসা আবশ্যিক নয়। সময়সুযোগমতো হাজিরা খাতাটিকে ক্লাস নেওয়ার বা ক্লাস করার প্রামাণ্য দলিল করে নিলেই হলো। তার জন্য কলেজের ক্লাসে এসে শিক্ষকের পড়ানো অথবা পড়ুয়াদের সেই-পড়ানো শোনা—এসবই বাহুল্যমাত্র। অর্থাৎ পথে কেউই বসে না। ২০১১ সালে কলেজজীবন শুরু করা, polygamy কে printing mistake ভাবা ওই ছাত্রীটিও নিশ্চয় বসবে না—যদি সে তার আগ্রহের সাম্মানিক ইংরেজি নিয়ে পথ চলে, তাহলেও।

এমনটাই কি সর্বত্র ঘটছে? শহরে, শহরতলিতে, গ্রামে, সর্বত্র? সব শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে? পরিপূর্ণ সর্বজনীন যদি হয়ে যেত ঘটনাটা, তার গুটিকয়েক বেওকুফ মাস্টারের প্যানপ্যানানি আর শুনতে হতো না। মাস গেলে বেশ বড়সড় অঙ্কের চেক পাওয়ার খচখচানি থেকে, অথবা গভীরতর কোনো বুদ্ধিহীনতা থেকে যেসব মাস্টার এখনো ভাবেন, পাঠ্যসূচির যে-অংশ তাঁর পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট, কলেজে ক্লাসে তার পুরোটাই পড়িয়ে দিতে পারা তাঁর কর্তব্য তাঁদের দু-পায়ে হাঁটাচলার অধিকার বোধকরি আর খুব বেশিদিন থাকবে না। বিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতার এক প্রাচীন কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অভিজ্ঞ এক মাস্টারমশাই মুখ কালো করে বলেছিলেন, থিওরির ক্লাস তো ফাঁকা থাকেই; আর প্র্যাকটিকাল ক্লাসে ছেলেরা হাবেভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, কোচিংক্লাসে যদি প্র্যাকটিকালটাও হয়ে যেত, তবে আর এত ঝামেলা করে কলেজে আসতে হতো না। দেড়দশক বাদে এই সেদিন নদীয়া জেলার এক বাংলো শিক্ষক বললেন, সাম্মানিক ক্লাসে বছর শুরু হওয়ার সাতদিনের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের ভিড় কমতে থাকে। সপ্তাহ দুয়েক পরে ক্লাসে যারা থাকে, তারা শিক্ষকের বক্তৃতার সময় হাতের মোবাইল নিয়ে খেলে, নিজেদের মধ্যে অবিরাম কথা বলে। বুঝিয়ে দেয়, ওই বক্তৃতা কতখানি নিষ্প্রয়োজন। বড় বড় কথা শুনে কিংবা বইয়ের নাম জেনে লাভটা কী হবে? কোচিং-ক্লাসে তৈরি নোট পাওয়া যায়, পড়তে তো সেটাই হয়; বই আবার পড়ে কে?

একটা গোটা বই বা বইয়ের বেশ কয়েকটি অধ্যায় পড়ে ফেলার ব্যাপারটা যে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত উঠেই গেছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের অথবা সন্দেহের নামমাত্র পরিসর শিক্ষাব্যবস্থার কোনো আনাচেকানাচেও পড়ে নেই। এক শিক্ষিকা কলেজে পাকাপাকি চাকরি পাওয়ার পরপরই সেই কলেজের লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে লাইব্রেরির একটি বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা নিজের প্রয়োজন বোধে কেটে নিয়েছিলেন। গ্রন্থাগারিক বিষয়টির প্রতি অধ্যক্ষার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় শিক্ষিকাটি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন। তাঁর বক্তব্য : গ্রন্থাগারে বসে পড়তে পড়তে তিনি যখন কাঁচি চেয়েছিলেন, ওই গ্রন্থাগারেরই অন্যতম কর্মী তাঁকে কাঁচি এনে দেন। স্বভাবতই শিক্ষিকা ধরে নেন, বইয়ের পাতা কেটে নেওয়ার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের সম্মতি আছে। শীলমোহরে বন্ধ খাতার প্যাকেট খোলা থেকে আরো অনেক কারণেই যে শিক্ষিকা কাঁচি চাইতে পারেন এবং কাঁচি দেওয়ার আগে প্রয়োজনের চরিত্র নিয়ে শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করা উক্তকর্মীর কাছে শোভন ঠেকেনি, এমন সব দুর্বল যুক্তি শিক্ষিকা মানতে নারাজ। শিক্ষিকার দ্বিতীয় বক্তব্য : এই গ্রন্থাগারে যে বইয়ের পৃষ্ঠা কাটা নিষিদ্ধ, সে কথা তাঁকে আগে জানানো গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের

উচিত ছিল।

অর্থাৎ, এই ঘটনার আগে যত গ্রন্থাগারে ওই শিক্ষিকা পড়াশুনা করেছেন, সেইসব জায়গায় বইয়ের পৃষ্ঠা কাটার পক্ষে আইনি সমর্থন ছিল। অন্যথায়, ওরকম কাটাকুটি যে বেনিয়ম, তা স্বতন্ত্র বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হতো। আর তিননম্বর সম্ভাবনা, যা পড়ে রইল, তা হলো : ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থাগারে বই ব্যবহার করবার অভ্যাস উক্ত শিক্ষিকার ছিল না। এই পরিমণ্ডলে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ক্লাস না করে প্রাইভেট টিউশন নিতে যায়। সপ্তাহে একদিন, দু'দিন, তিনদিন পর্যন্ত কোচিংক্লাসের টাইমিং ফুলফিল করে কলেজে এসে পৌঁছতে পারে না তারা। অনুপস্থিতির কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার সামনে সরবে ঘোষণা করতে কোনো সংকোচ, কুণ্ঠা বা ইতস্ততভাব নেই তাদের। এসব ঘটনার দায় কার? ছাত্রছাত্রীদের? শিক্ষকশিক্ষিকাদের? অভিভাবক-অভিভাবিকাদের? শিক্ষাপ্রশাসকের? রাষ্ট্রের?

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র নিশ্চুপ এবং নির্বিকার—এতবড় অণৃতভাষণে অতিবড় নিন্দুকেরও কণ্ঠরুদ্ধ হবে। রাষ্ট্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি উন্নত করতে নানান্ নিয়ম চালু করেছেন। যেমন, মহাবিদ্যালয়ে কোনো পড়ুয়ার উপস্থিতির হার যদি বছরে ৬৫ শতাংশের নীচে নেমে যায়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরীক্ষার পূর্ববর্তী মহাবিদ্যালয় আয়োজিত নির্বাচনী পরীক্ষায় সেই পড়ুয়া বসতে পারবে না। যদি বা বসেও, তাহলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের অধিকার তার থাকবে না। এমন নিয়মের ভিতরকার গল্পটা আসলে কেমন, সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক। গল্পটা নেহাতই এক বেচারি কলেজের। এতটাই বেচারি যে, বর্তমান জামানাতেও এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের কোনো সঙ্ঘ নেই। উপস্থিতির হারে কমতির কারণে কয়েকজন ছাত্রীকে বিএ, বিএসসি পার্ট টু্য পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করবার অধিকার দেওয়া হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া মেনেই মহাবিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত। পরিণামে কলেজের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে শতরঞ্চি পেতে ছাত্রীরা অবস্থানে অংশ নিল। ধরা যাক ছাত্রীসঙ্ঘবিহীন এই মহিলা কলেজটির নাম মাতঙ্গিনী মহাবিদ্যালয়। মাতঙ্গিনীর ইতিহাসে এরকম ছাত্রী-অবস্থানের ঘটনা এই প্রথম। এহেন অবস্থানের অনুষঙ্গে পরবর্তী ঘটনাটি আরো অভিনব। স্থানীয় পৌরপিতা, পদাধিকারবলে যিনি মাতঙ্গিনীর পরিচালনসমিতির অন্যতম সদস্য, তিনি এসে অবস্থানকারী ছাত্রীদের সঙ্গে এক শতরঞ্চিতে বসলেন। যারা প্রবেশদ্বার আটকেছে, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ছাত্রী এল পার্ট টু্য-র নির্বাচনী পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলতে— গেটে যারা বসে আছে, তাদের থেকে কম উপস্থিতির হার নিয়ে মাতঙ্গিনীর বেশ কিছু ছাত্রী নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেছে। ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক যিনি, তিনি বললেন, ওই 'বেশ কিছু'র ভিতর থেকে অন্তত একজনকে যদি প্রতিনিধিটি তাঁর সামনে নিয়ে আসতে পারে, তবে তিনি দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকটি অবস্থানকারিণীর পরীক্ষায় বসবার ব্যবস্থা করে দেবেন। ছাত্রীটি বিদায় নিল এবং সেই যে মেয়ে, সেই তো গেল, গেল তো গেল, আর এল না।

ঠিক পরের পরীক্ষায়, অর্থাৎ বিএ, বিএসসি পার্ট ওয়ানের নির্বাচনী পরীক্ষার পরে মাতঙ্গিনীর ছাত্রীরা পরীক্ষার ফলাফল সংবলিত কাঠের নোটিসবোর্ড টুকরো টুকরো করে ভাঙল।

কলেজের সামনে পথ অবরোধ করল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেন সেই শতরক্ষিতে বসা পৌরপিতা। সংবাদপত্রে খবর হলো, স্থানীয় পৌরপিতার শুভার্থী হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত মাতঙ্গিনীর নির্বাচনী পরীক্ষার ফল সুষ্ঠুভাবে বেরোতে পেরেছে। এত শুভেচ্ছা, এত বিবেচনা সত্ত্বেও একটা মনোমতো রাজনৈতিক বর্ণের ছাত্রীসংগঠন এখনো মাতঙ্গিনীতে গড়ে ওঠেনি। তবে যতরকম সাধু প্রচেষ্টা চলছে, তার নিরিখে মনে হয়, যে-কোনোদিনই তেমন-সঙ্ঘের জন্ম হতে পারে। শিক্ষকসংগঠনের ব্যাপারে অবশ্য সাফল্য বেশি। এখন আর বেচারি মাতঙ্গিনীর সব শিক্ষক শিক্ষিকারা একটি শিক্ষক সংগঠনের সদস্য নন। যেসব পূর্ণসময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি স্থায়ী নয়, নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য চুক্তিবদ্ধ, তাদের আকারে ইঙ্গিতে এমনকী প্রত্যক্ষভাবেও এখন জানানো হয় যে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, নতুন চুক্তি শিক্ষকটির অনুকূলে থাকবে কিনা, তা নির্ভর করবে নবতর শিক্ষকসংগঠনটির সদস্যপদ গ্রহণ করা-না-করার উপরে। ওই বিশেষ-সংগঠনটির সদস্যপদ ছাড়া মহাবিদ্যালয়ের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগ্রহণের যোগ্যতা বিবেচনার মধ্যেই আনা অসম্ভব।

আর একটি নীতি অবশ্য কেবল মাতঙ্গিনীর মতো ছাত্রীসঙ্ঘবিহীন বেচারি কলেজে নয়, সব কলেজেই ছড়িয়ে দিচ্ছেন রাষ্ট্র—স্নাতকোত্তর খোল। যেখানে স্নাতকশ্রেণীর তিনটি বর্ষের ক্লাস একসঙ্গে চললে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্রামকক্ষে বা গ্রন্থাগার সংলগ্ন পড়ার ঘরে শ্রেণীকক্ষের উপমা খুঁজতে হয়, সেই মহাবিদ্যালয়েও নাকি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করাই শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মুখ্য উপায়। এই নিয়েই মাতঙ্গিনীতে গোলমালের সূচনা। একটি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এম. এ. এম. এ. করে নেচে উঠেছিলেন, সে অনেকদিনের কথা। অন্যান্য বিভাগ যখন স্থানাভাব, স্নাতকশ্রেণী অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ সামনে আনার চেষ্টা করলেন, উক্ত বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এমন সব হেঁদো কথায় ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। বিভাগীয় নৃত্যের তালে তাল মিলিয়ে অধ্যক্ষা যখন নাচ শুরু করলেন, সে-নাচের লয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না বিভাগটি। হঠাৎ ভোল পাল্টে তাঁরা জানালেন, না এম.এ.তে পড়াতে তাঁরা পারবেন না। কিন্তু ততদিনে 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালা'-র ভঙ্গিতে 'এম.এ. খোলো' রব উঠেছে শিক্ষাপ্রশাসনের নীতিতে। আর শিক্ষার উন্নয়নে প্রাণ-প্রদত্ত এই অধ্যক্ষার আমলে কলেজ বাড়িটি বাড়ানোর জন্য কিছু টাকাকড়িও এসেছে। মাতঙ্গিনীতে একাধিক বিষয়ে এম.এ. চালু হয়েছে এবং ওই উদ্যোগী অধ্যক্ষা অবসরগ্রহণের পরে মাতঙ্গিনীর স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সঞ্চালিকা হয়ে থেকে গেছেন। তাই কলেজে নতুন ঘর যা তৈরি হবে, সবেতেই প্রথম ন্যায্য দাবি স্নাতকোত্তরের অর্থাৎ পি.জি.-র। স্নাতকস্তরের যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নাতকোত্তরে ক্লাস নিতে আপত্তি ছিল, তাদের বিরুদ্ধে বিনা নোটিসে ইনসাবর্ডিনেশন-এর লিখিত অভিযোগ দাখিল করে গেছেন অধ্যক্ষা।

বলা বাহুল্য, মাতঙ্গিনীর মতো মহাবিদ্যালয়ে সাম্মানিক স্নাতক বিভাগগুলিতে সর্বাধিক শিক্ষক সংখ্যা চার। যাঁরা এই মুহূর্তে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়ানোর অসুবিধা জানিয়েছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই বর্তমান পি.এইচ.ডি-র কাজ করছেন। পড়ানোর অভিজ্ঞতা তাঁদের অনেকেরই

দশ বছরের বেশ খানিকটা কম। স্নাতকশ্রেণীর তিনটি বর্ষের ক্লাস যখন চলে, তখন তাঁদের কারোরই ক্লাসের সংখ্যা সপ্তাহে উনিশ-কুড়ির কম নয়। পরিচালন সমিতির সভায় স্থির হলো, অভিযুক্তরা কেউ উজ্জীবনী পাঠমালা থেকে গবেষণা, কিছুর জন্যই ছুটি পাবেন না। আরো কী কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাঁদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে, তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

মহাবিদ্যালয়টি সার্থকনামা হয়ে উঠছে সবদিক থেকেই। মাতঙ্গিনী হাজরার নেত্রী মূর্তি কলেজ প্রশাসনের হর্তাকর্তা বিধাতাদের প্রতিটি তেজী সিদ্ধান্তে প্রতিভাত হয়। আর শিক্ষক শিক্ষিকারা? প্রতিবাদের 'প' মুখে আনলেই তাদের মাইনে বন্ধের জুজু, কলেজ অচল হয়ে যাওয়ার জুজু দেখানো হয়। মাইনে বাড়লে যে লোকে ভীতু হয়ে যায় এ তো জানা কথা। উপরন্তু তাঁদের মধ্যেই আছেন এমন শিক্ষাব্রতী, যিনি ২-১৫-য় নির্ধারিত ক্লাসের ছাত্রীদের হাজিরা খাতায় সাড়ে-এগারোটার মধ্যে none found লিখে দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যান। ছাত্রীরা ২-১৫-য় গিয়ে দেখে ক্লাস হচ্ছে না। পরে জানে, তারাই নাকি অনুপস্থিত ছিল। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গব না-থাকার ফায়দাটা কেউ কেউ ভালোই তোলেন।

ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট কোচিং ক্লাসের দোহাই দিয়ে কলেজে আসে না—এটা পুরো গল্প নয়;এর একটা উল্টোপিঠও তবে আছে। তাই চোরের মায়ের বড় গলা পর্যন্ত চলে। কিন্তু প্রতিবাদ গলা থেকে বড় একটা কাজে প্রসারিত হয় না। অবশ্য সম্প্রতিকালে প্রতিবাদ করে, দাবি জানিয়ে কীই বা ফল হলো? এই যে প্রাক্তন অধ্যক্ষা অবসরগ্রহণের পরে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সঞ্চালিকা হিসেবে মাতঙ্গিনীতে থেকে যাচ্ছেন, তা নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আপত্তি শুনে পরিচালন সমিতি বললেন, তাঁদের হাত-পা বাঁধা। প্রাক্-নির্বাচনী যথাপূর্বম্ তথাপরম্ পরিস্থিতি ঘোষিত হয়ে গেছে, চলবে ১৬ মে ২০১৪ পর্যন্ত। এর মধ্যে কোনো ঘটেযাওয়া ঘটনাকে বাতিল অথবা কোনো পুরনো সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা তো দূরস্থান, পরিচালন সমিতির কোনো সভাই বসতে পারবে না। তাই ১৬ মে-র পরে অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বক্তব্য তাঁরা ভেবে দেখবেন।

পরিচালন সমিতির প্রতি সসম্ভ্রম আস্থায় মাতঙ্গিনীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা দিন গোনেন। দেখেন ১৬ মে-র অনেক আগে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বদল হন। মাতঙ্গিনী তবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসনের কতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এ-মহাবিদ্যালয়ের উপরে আছে, ভেবে তাঁরা একদিকে গর্বিত, অন্যদিকে আতঙ্কিত হন। জীবনমৃত্যুর কথা কে বলতে পারে। মাতঙ্গিনী যাঁদের কর্মক্ষেত্র, তাঁদের কেউ যদি ১৬ মে-র আগে দেহ রাখেন, তবে দাহকার্যের জন্য প্রাক্‌নির্বাচনী স্থিতাবস্থার কালক্রম পেরোতে বরফে শুয়ে থাকতে হবে কতদিন, কে জানে! প্রাণ যায় যাক, ১৬ মে-র আগে যেন না যায়। বলা বাহুল্য, ১৬ মে-র পরে পরিচালন সমিতির সভা আবার শুরু হয়েছে। সেখানে স্নাতকোত্তরের সঞ্চালিকা-প্রসঙ্গটি এখনো ওঠেনি। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সমিতির সভা সীমাবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু এমন একজন উদ্যোগী শিক্ষাব্রতী মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর-সূত্রে কিংবা আজীবন গবেষণাসূত্রে যুক্ত থাকবেন, এতো গর্বের কথা। শিক্ষক শিক্ষিকাদের তা নিয়ে আপত্তি কেন? তিনি অধ্যক্ষা থাকাকালীন কলেজে বিল্ডিং এক্সটেনশন-এর প্রচুর ফান্ড এনেছেন, কলেজের প্রায় সমবয়সী চাঁপাগাছ কেটে ফেলে সেখানে লিফ্‌ট বসানোর জায়গা বের করেছেন। সেই

লিফ্‌ট বছরের পর বছর উঠছে তো উঠছেই, চালু আর হচ্ছে না। চাঁপাগাছ কাটা নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আপত্তিতে প্রত্তন ছাত্রীরা শামিল হলে বলেছেন, ওই অন্যায়রকম দুঃসাহসী প্রাক্তনীরা যদি কলেজমুখো হয়, তবে তাদের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবেন। কলেজকে স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে তুলবার জন্য এই মহান শিক্ষাব্রতী জান-প্রাণ কবুল করেছেন। তবু তাঁকে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সঞ্চালিকা হিসেবে পেয়ে শিক্ষক সংসদ কৃতার্থ হচ্ছেন না কেন? কেন তাঁরা বলছেন, কলেজে এরকম একজন ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সম্মানহানিকর?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে ওই অধ্যক্ষার অধ্যক্ষা-পদ থেকে অবসরগ্রহণের দিনটিতে। মাতঙ্গিনী কলেজের সময় হলো সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে। সেই বিশেষ দিনটিতে ৪-১৫-র পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ অধ্যক্ষার ঘরে ঢুকে জানতে চান, তাঁদের সার্ভিস বুকগুলো সই হয়েছে কিনা। এই সই যে তার আগের দিন পর্যন্ত কাজের চাপে অধ্যক্ষা করে উঠতে পারেননি, এ-কথা জানা ছিল বলেই শিক্ষকদের এই জিজ্ঞাসা। অধ্যক্ষা জানান, তিনি সন্ধ্যা আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকবেন, তখন সই করবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলেন, সাড়ে-চারটের অর্থাৎ কলেজে দিনের শেষ ঘণ্টা পুড়ে গেলে তো অধ্যক্ষা হিসেবে তাঁর কোনো কাজই আর স্বীকৃত নয়। তিনি তো তখন অবসরপ্রাপ্ত। অধ্যক্ষা প্রবল ক্রোধে বলে ওঠেন, তবে তিনি এই মুহূর্তেই চলে যাবেন। বিদ্যুৎগতিতে বেরোতে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মীদের (অবশ্য তাঁর আমল থেকেই পরিচালন সমিতির বয়ানে সহকর্মীর পরিবর্তে সাবর্ডিনেট কথাটি ব্যবহার হচ্ছে; মাতঙ্গিনী নতুন কলেজ নয়, এর আগে স্বনামধন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যক্তিরা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে থেকেছেন, তাঁদের সঙ্গে শিক্ষক-সংসদের যে সর্বদা সহমত হয়েছে এমনও নয়; কিন্তু অতীতে এমন অলংকারে পরিচালন সমিতি কখনো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূষিত করেননি) ধাক্কা দেন (স্বেচ্ছায় নাকি অনিচ্ছায়, তা জানা নেই)। আচমকা ধাক্কায় কেউ পড়ে গেছেন, কেউ আহত হয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্নাতকোত্তর-কার্যাবলীর জন্য অধ্যক্ষার পূর্বনির্দিষ্ট কামরায় তাঁকে পাওয়া যায়। অধ্যক্ষার কক্ষে তিনি ব্যাগ এবং ল্যাপটপ ফেলে এসেছিলেন। সে জিনিসগুলি তাঁকে ধাক্কা খাওয়া বা না-খাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারাই দ্বিতীয় কামরাটিতে পৌঁছে দেন। জিনিসপত্র নিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর চামড়া গণ্ডারের, তিনি পরের দিন সকালেই স্নাতকোত্তরের সঞ্চালিকা হিসেবে মাতঙ্গিনীতে যোগদান করবেন। দুটি তথ্য বাদ পড়েছে। এক, যেসময় অধ্যক্ষাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের অভিজ্ঞতা নিকটবর্তী থানায় লিপিবদ্ধ করেন। দুই, পরদিন, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষার কাছ থেকে মাতঙ্গিনীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা একটি চিঠি পান, যেখানে অভিযোগ আছে, ব্যাগটি যখন তিনি অধ্যক্ষার কক্ষে ফেলে গিয়েছিলেন, তার ভিতরে হাজার চারেক টাকা ছিল। ব্যাগটি তাঁকে স্নাতকোত্তর কামরায় পৌঁছে দেওয়ার পরে তিনি দেখেছেন চার হাজার টাকা নেই।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মহাবিদ্যালয়ে ওই ভূতপূর্ব অধ্যক্ষার (ধরা যাক তাঁর নাম মন্দাকিনী) উপস্থিতি মানতে সম্মত নন। কিন্তু প্রাক্-নির্বাচনী অনড় অবস্থার নির্দেশ মেনে সঞ্চালিকাকে যে আপাতত কাজ করতে দিতেই হবে, সেকথা পরিচালন সমিতি প্রমাণ

করেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের এমেরিটাস ফেলোশিপ পেয়ে মন্দাকিনী যে তাঁর এই পুরনো কলেজকেই কর্মকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করতে চান, এই ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে সম্মতিপত্রও দিয়ে দিতে হয়। না হলে, কলেজ অচল হবে, শিক্ষকদের মাইনে হবে না, এইসব জুজু পরিচালন সমিতির সভাপতি সফলভাবে দেখাতে পারলেন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকার এই সম্মতিপত্র প্রদান কিন্তু প্রাক্‌-নির্বাচনী অনড় অবস্থায় আটকাল না, কারণ ওই সম্মতিদান মহাবিদ্যালয় প্রশাসনের দিনানুদৈনিক কাজকর্মের অন্তর্গত। কিন্তু সঞ্চালিকা-পদটির পুনর্বণ্টন পরিচালন সমিতির সভা ছাড়া অসম্ভব। আর প্রাক্‌-নির্বাচনী অনড়তার মধ্যে পরিচালন সমিতির সভা বসাও সম্ভব নয়। মাতঙ্গিনীতে যেদিন অধ্যক্ষা-শিক্ষিকা ধাক্কাধাক্কি হলো, তার দিনকয়েকের মধ্যে পরিচালন সমিতির উদারমনা সদস্যরা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হলেন। মোটা টাকা মাসমাইনে পাওয়া গাবাঁচিয়ে প্রতিবাদ করা মাস্টাররা ভাবলেন, বুঝি তাঁদের কথার সত্যিই মূল্য দেবেন পরিচালন সমিতি। কিন্তু প্রাক্‌-নির্বাচনী অনড়তার পাঠ নিয়ে কেমন বোকা-বোকা হয়ে আজও দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা।

সেদিনের আলোচনাসভায় পরিচালন সমিতির সভাপতির হাতে ছিল একটি সংবাদপত্র। যেখানে খবর আছে, মাতঙ্গিনীর মন্দাকিনী সহকর্মীদের লাথি মেরে ফেলে দিয়ে অধ্যক্ষাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁদের বুদ্ধি কম, তাঁরা মনে করেছিলেন, এই খবরের অতিশয়োক্তি প্রসঙ্গে একটি সংশোধনীপত্র উক্ত সংবাদপত্র দপ্তরে পাঠানো সমীচীন। কথাটা খুব আমল পায়নি। আসলে প্রতিবাদের ভাষাটা যে যার-বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তার কাছ থেকে না-শেখাই বাঞ্ছনীয়। এই ধারণাটা তো ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। সেদিনের সভায় সভাপতি অবশ্য লাথি না ঘুঁষি, চড় না কিল, তা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। কেবল খবরে যে মন্দাকিনীকে একটি রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ বলা হয়েছে, তা নিয়ে ধিক্কার দিলেন। বললেন সেই মাননীয় সম্পাদকের সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন এবং সম্পাদক মন্দাকিনীর নাম শুনে স্পুটনিক থেকে পড়েছেন—জন্মান্তরেও নাকি এমন কোনো ব্যক্তিকে তিনি চিনতেন না।

খেলাটা শুরু হলো তার পরে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তরফে পরিচালন সমিতির সদস্যদের প্রতি আবেদন করা হলো, সি সি টি ভি ফুটেজ সেই উত্তেজক বিকেলের কী ছবি তুলেছে, সেটা দেখার জন্য। তাঁরা বললেন, ধিক্‌, অমন লজ্জাজনক ঘটনা তো ভুলতে পারাই সংগত। তাঁরা কি ওই বিকেলের ময়নাতদন্ত করতে পারেন? যদি একান্তই করতে হয় তদন্ত, তার জন্য তদন্ত কমিশন বসানো হবে, এবং তা হবে অবশ্যই অনড় অবস্থা কেটে গেলে। শোনা যাচ্ছে,খুব সম্প্রতি, সেই কমিটি, কাজ শুরু না করলেও, নিয়োজিত হয়েছে। অধ্যক্ষা মন্দকিনী যে কতখানি নির্যাতিত হয়ে কর্মজীবনের শেষদিনে মহাবিদ্যালয় ছেড়ে গিয়েছিলেন, তা কমিটি অচিরেই প্রমাণ করতে পারবেন বলে মনে হয়। কারণ যে সত্য প্রমাণিত হবে, তার উপক্রমণিকা হাওয়ায় জানান দিচ্ছে অনড় অবস্থার সময় থেকেই। শিক্ষা প্রশাসন মহলে খবর ছড়িয়ে গেছে যে মন্দাকিনী সার্ভিস বুকে স্বাক্ষর বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কাজগুলি অসমাপ্ত রেখে সেদিন কলেজ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁকে হাত ধরে

টেনে বা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে বার করেন। না, লাথির উল্লেখ অবশ্য নেই এই সংস্করণে। শিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা ধিক্কার দিয়েছেন, একজন মহিলা অধ্যক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত, সর্বাধিক বেতন পাওয়া গোষ্ঠীর একাংশ এমন জঘন্য ব্যবহার করলেন কী করে। তাঁকে যখন অনুরোধ করা হয়, সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে, তিনি বলেন, ৪৭১টি কলেজের দেখভাল তাঁকে করতে হয়, তার ভিতরকার একটিতে কী ঘটল না ঘটল, তা বুঝবার জন্য সিসিটিভি দেখবার সময় তাঁর নেই। আর কে ধাক্কা আগে দিয়েছে এটা কখনোই বড় কথা নয়, ধাক্কাধাক্কি যে হয়েছে, তার দায় তো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপরেই বর্তায়। মাতঙ্গিনীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা যতই ভাবুন তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য ধাক্কা খেয়ে ধাক্কি দিয়েছেন তদন্ত কমিশন নিশ্চয় সিসিটিভি না-দেখে, এমনকী দেখেও, প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে ধাক্কি নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ধাক্কার জন্য দায়ী। মন্দাকিনীর মতো শিক্ষাব্রতী কি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন? অসম্ভব।

এই সিসিটিভি তো মন্দাকিনীর আমলেই মাতঙ্গিনীতে প্রথম বসে। টিভি বসার পরে অধ্যক্ষার তর্জন গর্জন নিয়মিত হলো—আমি ঘরে বসে সব দেখতে পাই, কে কখন আসেন, কখন যান, কত কঠিন শাস্তি যে আপনাদের জন্য আসছে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। একবার এক অভিজ্ঞ শিক্ষিকা আর না-পেরে বলেছিলেন—নিয়ম যাঁরা ভাঙেন, তাঁদের জন্য যে শাস্তি আপনার ন্যায্য মনে হবে, তার ব্যবস্থা করুন, কিন্তু এভাবে সকলকে সবসময় হুমকি দেবেন না। ভাগ্যবতী সেই শিক্ষিকাটি মন্দাকিনীর আগেই অবসর নিতে পেরেছেন। মন্দাকিনীর আমলে। যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে attendance সই করতে যেতেন, তাঁরা সাধারণত অধ্যক্ষার কুর্সিটি শূন্যই দেখতেন। আবার হাজিরাখাতায় যদি অধিকারের বাইরে কোথাও চোখ পড়ে যেত, তো দেখতেন, মন্দাকিনী নিত্যই দশটায় কলেজে আসেন অথবা কলেজের কাজেই বাইরে থাকেন। তা এসব নিয়ে তো আর সাবর্ডিনেটদের কথা বলা সাজে না। আর মাসের শেষে যে মোটা মাইনে পান তাঁরা এবং মাসভর যে ওই মাইনের উপযুক্ত কাজ করেন না, এরকম কথায় মাতঙ্গিনীর কর্মীদের কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁদের মাসমাইনে পাওয়া-না-পাওয়া মন্দাকিনীর ব্যক্তিগত দয়ার উপরেই নির্ভর। এমনও ঘটেছে যে পাঁচঘণ্টা কলেজে থেকে, নির্ধারিত সবকটি ক্লাস নিয়ে অধ্যক্ষার চোখের সামনে দিয়ে departure সই করে বেরনোর পরদিন এক শিক্ষিকা দেখলেন, হাজিরা খাতায় তাঁর নামের পাশে আগের দিন লেখা হয়েছে not seen during departure। আবার departure-এ শুধু সই করে সময় না লিখে তিনদিন পরে সময়বিহীন সই-এর পাশে 4-40 pm বসিয়ে দিয়ে মন্দাকিনী বা তাঁর সিসিটিভির নজর এড়াতে পেরেছেন, এমন শিক্ষিকাও মাতঙ্গিনীতেই মিলবে। উভয়েই মন্দাকিনীর সাবর্ডিনেট। এ হেন অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে কি কখনো তাঁরই বসানো সিসিটিভি ফুটেজ কথা বলতে পারে? তদন্ত কমিশনের যে রিপোর্ট পূর্বনির্ধারিত রয়েছে, সেখানে কোনো বিঘ্ন অথবা অস্বস্তি যদি সিসিটিভি ফুটেজ তৈরি করে, তবে তো তা না-দেখাই ভালো। আর দেখলেই বা কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি? ধাক্কিকে ধাক্কায় পরিণত করা কী এমন দুরূহ আজকের জমানায়? যখন ডি.এন.এ. টেস্ট-এর রিপোর্ট থেকে পাসপোর্ট পর্যন্ত সবকিছুই অনায়াসে জাল হতে পারছে? আর মন্দাকিনী কি যে-সে অধ্যক্ষা? মাতঙ্গিনীতে অধ্যক্ষা হয়ে

আসার আগে নিজের দাবি পূরণের জন্য তখনকার একমাত্র শিক্ষক সংগঠনের মিছিল, অবস্থান, ঘেরাও ইত্যাদিতে তিনি যেমন শামিল হয়েছেন, তেমনই এখন বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের লালনপুষ্ট সদ্যোজাত শিক্ষক সংগঠনটির উন্নতিকল্পে হাত মিলিয়েছেন পাঁচজনের সঙ্গে।

মন্দাকিনীর আমলে মাতঙ্গিনী মহাবিদ্যালয় যে সরকারের কড়া নজর ছিল, একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। একবার, প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় তখন। এই কলেজে স্নাতকস্তরে যে কটি বিষয়ে সাম্মানিক বিভাগ আছে, তার একটি হলো অর্থনীতি। এই বিষয়টির এমনই গেরো যে, বিষয়টিতে সাম্মানিক পাঠক্রমে ভর্তি হতে গেলে, উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় পড়ুয়ার অর্থনীতি না পড়লেও চলে, কিন্তু গণিত পড়তেই হয়। মন্দাকিনী একবার ঘোষণা করলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি এসেছে যে, সাম্মানিক অর্থনীতি পড়তে আর উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় অঙ্ক কষা পড়ুয়াদের পক্ষে আবশ্যিক নয়। তা এমনই ঘোর কলি যে অর্থনীতি বিভাগের এক সামান্য শিক্ষিকা (যিনি মন্দাকিনীর সাবর্ডিনেট তো বটেই!) উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে চাইলেন। অধ্যক্ষা তেমন কোনো বিজ্ঞপ্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলেন না। সেটাই অবশ্যই বড় কথা নয়। শিক্ষিকার স্পর্ধাটাই মুখ্য। ফল হলো কী? একবছর পরে আবার যখন প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় এল, অধ্যক্ষা জানালেন, গতবার সাম্মানিক অর্থনীতিতে ভর্তির জন্য যে তালিকা বেরিয়েছিল, সে তালিকায় lack of transparency রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নিজে point out করেছেন। সুতরাং এবারের তালিকা যেন ওরকম incompetent লোক দিয়ে অর্থনীতি বিভাগ না বানায়। সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কি সব কলেজের সব কটি সাম্মানিক বিষয়ে ভর্তির তালিকা সততার কষ্টিপাথরে খুঁটিয়ে বিচার করেন? ৪৭১টির মধ্যে একটি কলেজে অধ্যক্ষা-শিক্ষিকায় ধাক্কাধাক্কির খবর কানে গেলে, আদতে কী ঘটেছে, তা সিসিটিভি ফুটেজে দেখে নেওয়ার সময় শিক্ষা দপ্তরের আমলার নেই। আর খোদ শিক্ষামন্ত্রীর এত সময় আছে? নাকি মাতঙ্গিনী মহাবিদ্যালয়ে মন্দাকিনী অধ্যক্ষা থাকাকালীন রাজ্য সরকারের এতখানিই প্রাণের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল, যে, শুধু মাতঙ্গিনীর তালিকা মন্ত্রী নিজে দেখতেন? মন্ত্রী যে দেখেছেন, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই, কারণ মন্দাকিনী যতবার সিসিটিভি দেখে সাবর্ডিনেটদের শাস্তির হুমকি দেন, তার চেয়ে বেশি বই কমবার নয় তিনি সরবে ঘোষণা করেন কোনোরকম মিথ্যাভাষণের বা মিথ্যাচারণের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র ঘৃণা।

তবে কি মন্দাকিনীর অপমানিত অবসরগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী আর রাজ্য সরকারের প্রাণের প্রতিষ্ঠান রইল না? কারণ শিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তার মত তো আর যেকলবার নয়! এ কলেজ যে ৪৭১টির মধ্যে একটি হেঁজিপেঁজি ছাড়া কিছুই নয়, যেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহবত্‌ শেখানোর অধিকার শিক্ষা দপ্তরের বড় কর্তার আছে, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগ করবার আগে প্রকৃত ঘটনা জানতে কলেজের ভিতরকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখবার ফুরসৎ তাঁর নেই। অবশ্য তাই বা বলা যায় কেমন করে? প্রাক্‌-নির্বাচনী যথাপূর্বম্‌ তথাপরম্‌কে তো মাতঙ্গিনীর পরিচালন সমিতি যেভাবে মান্যতা দিয়েছেন, তা তো এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। তখন তো শিক্ষাব্রতী মন্দাকিনীর অসম্মানিত অবসরগ্রহণ ঘটে গেছে! আর শিক্ষার অগ্রগতির প্রতি দায়বদ্ধতায় সেই

মহিমময়ী কত ক্লেশেই না বহন করে চলেছেন মাতঙ্গিনীর স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সঞ্চালনার দায়ভার। পুরোটা তাই স্পষ্ট হচ্ছে না। এখনও কি মাতঙ্গিনীতে এমন কেউ স্নাতকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, যিনি মন্দাকিনীর মতোই নিবিড় মনোযোগ আদায় করছেন সরকারি শিক্ষাপ্রশাসনের স্তর থেকে?

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে যে আলোচনায় পরিচালন সমিতির সদস্যরা আগামী আড়াইমাস অনড় থাকার কথা নরমে গরমে ঘোষণা করে গেলেন, সেই আলোচনাসভার শেষ ঘটনাটি না বললে এ গল্প অসমাপ্ত থাকে। সেই যে শতরঞ্চিতে বসা পৌরপিতা। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার আগে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে সঠিক দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে যথার্থ জননেতার ভঙ্গিতে বললেন : আমি এই মাতঙ্গিনী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। এখানকার বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকেরই এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা আমার চেয়ে বেশিদিনের। আগামী আড়াইমাস যদি কলেজের কাজ ঠিকমতো না চলে, যদি কলেজের গেট কোনো কারণে অসময়ে বন্ধ হয়, যদি অ্যাডমিশন ফর্ম ঠিকমতো বিক্রি না হয়, আমি কিন্তু ছেড়ে দেব না। আমার অঞ্চলের মেয়েদের স্নাতকোত্তর পড়বার সুযোগ আমার অঞ্চলেরই গৌরব।

কাকে ছাড়বেন না তিনি? এ মহাবিদ্যালয় তো তেমন নেতা-নেত্রী সমাহারের জন্য বিখ্যাত নয়। তেমন খ্যাতি থাকলে, আর কি তাঁরা আলোচনা সেরে নির্বিবাদে বেরোতে পারতেন? অবশ্য মাতঙ্গিনীর পাঁচদশক পেরনো ইতিহাসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবরোধের শতরঞ্চিতে বসে মহাবিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার আটকানোর অনন্য কীর্তি পরিচালন সমিতির যে সদস্যের, এমন ফতোয়া দেওয়ার অধিকার তাঁরই জন্মায় বটে। এমন কি একটি মেয়েও ওই পৌরপিতার অঞ্চলে আছে, যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিন্ন অন্য কোনো নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে বঞ্চিত? তাঁর বচনে মনে হয়েছিল, যেন পাথরপ্রতিমা গ্রামের মেধাবী ছাত্রীটি এবার অনেকখানি জলস্থল না-পেরিয়ে পায়ে হেঁটে স্নাতকোত্তরে পৌঁছনোর সুযোগ পাবে।

মাতঙ্গিনীর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হয়ে সাফাই গাইবার কোনো পথই খোলা নেই। আমি এখনই স্নাতকোত্তর পড়াতে প্রস্তুত নই, খানিকটা সময় লাগবে—এ-কথা বললেই তো মনে হয় হাজিরা খাতায় পড়ুয়াদের নামের পাশে উপস্থিত বা অনুপস্থিত লেখা ছাড়া আরকিছু কাজ বুঝি ক্লাস নিতে গেলে করতে হয়। মন্দাকিনীর আমলে বোধহয় অধ্যক্ষার এবং তাঁর সহকর্মী বা সাবর্ডিনেটদের জ্ঞানের ফারাকটাও একটা ত্রুটির পর্যায়েই পড়ত। শোনা যায়, কনিষ্ঠ সহকর্মীকে তিনি বলতেন, ক্লাসে কার্ল মার্ক্স পড়াতে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কথা বলে যেও, ও ব্যাপারে আমার ফান্ডা প্রচুর। শতরঞ্চিতে বসে-টসেও যে পছন্দসই রঙের একটা ছাত্রীসংসদ কলেজটাতে এখনো বানানো গেল না, এর পিছনেও শিক্ষিকাদের কেউ কেউ মেঘনাদের মতো আছেন বলে হয়তো রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিবর্গের ধারণা। পুরনো জমানাতেও বাইরের ছাত্রনেতা বা নেত্রী কলেজে এসে ছাত্রীদের অভাব অভিযোগ জানাতে চেয়েছে। মাতঙ্গিনীর ছাত্রী-প্রতিনিধি জানিয়েছে, তাদের সমস্যা তারা শিক্ষিকাদের সঙ্গে বা প্রয়োজন হলে অধ্যক্ষার সঙ্গে কথা বলে মিটিয়ে নিতে পারবে। তখনকার অধ্যক্ষারা অবশ্য এত উন্নয়নমুখী বা জ্ঞানী ছিলেন না। পরিচালন সমিতিও শিক্ষিকাদের ভাবতেন না নিজেদের বা অধ্যক্ষার সাবর্ডিনেট। গোটা ব্যাপারটা খুব

ম্যাড়ম্যাড়ে ছিল।

এখন যারা বয়স্ক বা তথাকথিত অভিজ্ঞ শিক্ষিকা, যাঁদের মধ্যে youth বা dynamism-এর নামমাত্র নেই, তাঁরা ওই ম্যাড়ম্যাড়ে ব্যাপারটাকেই শাশ্বত ভাবেন। একবার এক ছাত্রী নির্বাচনী পরীক্ষায় বসতে না-পারার হেতু হিসেবে পিতার মৃত্যু, পিতৃব্যের মৃত্যু এবং নিজের নৃত্যানুষ্ঠান এই তিনটি কথা বলল। তিনটি ঘটনাই একসঙ্গে ঘটেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সব গুলিয়ে ফেলে বলে বসল, সে ওই শতরঞ্চিতে বসা পৌরপিতার স্নেহের পাত্রী। শিক্ষিকারা কেউ কেউ এমনই স্থবির যে, মেয়েটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবার অনুমতি যখন দিতেই হলো, তখন তাঁরা ওই পৌরপিতার সামনেই বলে ফেললেন—পরের বছর থেকে এই নির্বাচনী পরীক্ষার মশকরাটা তুলে দেওয়াই সমীচীন। এত অরাজকতা বেশ কিছুদিন ধরে সয়ে সয়ে তবেই না শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ 'ছেড়ে না দেওয়া'-র হুমকিতে পৌঁছন। যাই হোক, ১৬ মে পেরিয়ে আরো তিনমাস কাটতে চলল। মাতঙ্গিনীতে গেট বন্ধ হয়নি, প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য প্রচুর ফর্ম বিক্রি হয়েছে, প্রথম বর্ষে ছাত্রীরা প্রতি বছরের মতোই ভর্তি হয়েছে। প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুও হয়ে গেছে। তবে বলাই বাহুল্য, স্নাতকোত্তরের সঞ্চালিকাকে নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আপত্তির বিষয়টি ১৬ মে-র পরবর্তী তিন মাসে পরিচালন সমিতির সভায় এখনো উঠতে পারেনি। আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিরিয়ানি-পোলাও সহযোগে আলোচিত হতে হতেই সময় ফুরিয়ে যায়। সভাপতি সরলমতি এবং ভোজনরসিক হলেও নিদারুণ ব্যস্ত মানুষ। অন্য সদস্যদেরও সচলতার অন্ত নেই। রাজ্যস্তরে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজের রঙ বদলানোর স্বতস্ফূর্ততায় আশ্চর্য তরুণমনা সব সদস্য আছেন এই সমিতিতে। মনের তারুণ্য যত, জীবনে ব্যস্ততাও স্বভাবতই তত। মাতঙ্গিনীর মতো জবুথবু একটা প্রতিষ্ঠান, যেখানে একটা ছাত্রীসংসদ পর্যন্ত নেই, সেখানে আর কত সময় দেওয়া যায়? মন্দাকিনীর পরবর্তী নতুন অধ্যক্ষা যদি তাঁর তুল্য কি তাঁর চেয়েও বেশি তেজদীপ্ত হন, তখন হয়তো তাঁরা আগ্রহ ফিরে পাবেন। এখন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকার আমল। নৃত্যের যে লয় তাঁরা নির্দেশ করবেন, কার্যক্ষেত্রে অপমানে, হুমকিতে, ফতোয়ায়, অসভ্যতায় নৃত্যের লয় তার তিন থেকে চারগুণ হয়ে দাঁড়াবে, সে তো ঠিক এখনই সম্ভব নয়।

সত্যিই কি থাকতে পারে মাতঙ্গিনীর মতো কোনো মহাবিদ্যালয়? বর্তমান জমানাতেও? যখন নাকি শিক্ষকদিবস পালনের অনুষঙ্গে মৃত্যু হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীর? শোনা যায়, শিক্ষক দিবস পালনের জন্য উঁচু ক্লাসের দিদিরা যে অঙ্কের চাঁদা চেয়েছিল, মেয়েটি ততটা দিতে পারেননি অথবা দিতে চায়নি। এই অপরাধে সে wash room-এ বন্ধ হয়ে গেল। বের করার পরে তাকে বাঁচানো যায়নি। পরের বছরও শিক্ষক দিবস যথানিয়মে পালিত হলো। উক্ত বিদ্যালয়ে, উক্ত শহরে বা উক্ত প্রদেশে কেউ বললেন না যে, শিক্ষকরা সম্মানগ্রহণের অধিকার হারিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা হারিয়েছে সম্মানপ্রদর্শনের অধিকার কিংবা দায়িত্ব। না বলাই বোধহয় স্বাভাবিক। শিক্ষক দিবসে শিক্ষিকার জন্য কার্ড নিয়ে যেতে পারেনি বলে নামকরা বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সেদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে শিক্ষিকারই হস্তক্ষেপে—এমন ঘটনা এক দশকের পুরনো। আবার মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে

ছাত্রীরা চুটকি পরিবেশন করছে—কেমন করে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়িকে বিয়ের পরপরই টাইট দিতে হয়, অধ্যক্ষা ছাত্রীগর্বে গর্বিত হয়ে তা উপভোগ করছেন, এমন ঘটনাও নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা।

তবুও কি মাতঙ্গিনী মহাবিদ্যালয়ের গল্পটা সত্যি হতে পারে? যখন অধ্যক্ষা মেরে বলেন, মার খেয়েছেন? নিজ মুখে ব্যাখ্যা করেন নিজের ফান্‌ডা? অধ্যক্ষার ঠেলায় পড়েযাওয়া বা আহত হওয়া শিক্ষিকাদের বলা হয়, অভিযোগ ভুলে কর্তব্য করতে, প্রাক্‌নির্বাচনী কানুনপর্বে ঢুকে গেলেই কেষ্ট মিলবে? অথচ কেষ্ট কেন, ১৬ মে ২০১৪-র তিনমাস পরেও রাধা বা চন্দ্রাবলী কিছুই মেলে না। ধরা গেল, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সব দাবি মিথ্যা। তাহলে সিসিটিভি-র প্রসঙ্গ তুললেই সকলে দুহাতে চোখ ঢেকে বলছেন কেন, দেখব না, দেখব না, অমন করে বাইরে থেকে দেখব না? আহা সত্যিই তো। বাইরে যখন ধাক্কা দিচ্ছিলেন মন্দাকিনী, ভিতরে তখন নিজের স্বেচ্ছাচারে গড়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (যার বিশদ বর্ণনার জন্য আর একটি এই আয়তনের গল্প লাগবে) ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে তাঁর শিক্ষা-পিপাসু মন-প্রাণ যে মার খাচ্ছিল তা, কি কোনো ছবিতে ধরা পড়ে?

শিক্ষার হাল-হকিকত নিয়ে লিখতে বসে এমন এক আজগুবি অবাস্তব গল্প তৈরি হলো, এ-ও তো আর এক স্বেচ্ছাচার। এ স্বেচ্ছাচার বোধকরি ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহারের থেকেও গোলমেলে। পোলাও বিরিয়ানির আঘ্রাণ আস্বাদ পেরিয়ে শিক্ষাব্রতীদের সরল কানে-মনে এ বানট কাহিনী পৌঁছনোর সম্ভাবনা খুবই কম। এইটুকুই যা ভরসা। গল্প একটা ঝোঁকের মাথায় বানিয়ে ফেললেও, সংসার, সমাজ, মাসমাইনে, কিছুই তো আর ফেলনা নয়।

খালেদ চৌধুরী : আমাদের শিল্পসংস্কৃতি চর্চার একমাত্র সন্ন্যাসী

চন্দন সেন

বেশির ভাগ সময়েই চাঁদির লোভে, কখনোবা চটির ভয়ে ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব আর আদর্শ বন্ধক দেওয়ার এই সর্বগ্রাসী বৈশ্য প্রতিযোগিতার মত্ত আবহে গ্রহান্তরের মানুষ ছিলেন খালেদ চৌধুরী। এই স্বশিক্ষিত টোটাল শিল্পীকে বাদ দিয়ে আমাদের মঞ্চস্থাপত্যের ইতিহাস, আরো ভালো করে বললে, আমাদের থিয়েটারের ইতিহাস লেখা আজ সম্ভবই নয়। অথচ গণনাট্য আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে আজকের আধুনিক থিয়েটারের মঞ্চশৈলী, সংগীত, রূপটান, নামাংকন—ইত্যাকার বহুবর্ণী প্রদেশে তাঁর সাত দশকের উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়ে এখনও বিশদচর্চা হয়নি,—এবার তা শুরু হওয়া আরো জরুরী হয়ে উঠল,—অন্ততঃ এ বছরের এপ্রিলের শেষ দিনটিতে ৯৫ বছরের এই মহাপ্রাণ প্রয়াত হবার পর। সাধারণভাবে প্রয়াণের পর প্রণত হবার শোকাবহেই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিষয়ে উদাসীনতা সরিয়ে কিছুটা মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয় বাঙালী-মনন—এমন অনুযোগ আর একবার প্রশ্রয় না হয় পাক, তবু খালেদ চৌধুরীকে নিয়ে শোকসভা, স্মরণসভার গতানুগতিকতা কাটিয়ে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের স্বার্থেই উপেক্ষা স্খলনের এই চর্চায় এবার আরো বেশি নিষ্ঠ হওয়া দরকার।—কারণ যাপনে ও মননে খালেদদা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অনন্য আর সর্বার্থেই ব্যতিক্রমী এক সন্ন্যাসী।

আসামের করিমগঞ্জের দাসগ্রামে ১৯১৯-এর ২০ ডিসেম্বর এক স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম চন্দ্রনাথ দত্তের সন্তান চিরকুমারের, ব্রতচারী আন্দোলনের খ্যাতকীর্তি উদ্ভাবক গুরুসদয় দত্ত তাঁর এই নাতির নামকরণ করেছিলেন শোনা যায়। মাত্র ১০ বছর বয়সে মা হেমনলিনীকে হারিয়েছিলেন চিরকুমার, যার চিররঞ্জন নামেও কিছুটা পরিচিত ছিল।—তারপর একদিন বাড়ীর লোকেদের সংগে মনান্তর এবং রাগ করে পালিয়ে চলে আসা সিলেটের এর মুসলিম পাড়ায়। সেখানকার সমাজ তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিল এই নিত্যস্বপ্নদর্শীকে,—তখনও তাঁর কৈশোর অস্থির তারুণ্যকে স্পর্শ করেনি। ধর্মান্তরিত না হয়েও তখন তিনি কখনও রহমান, কখনও 'আব্বাস', কখনও বা 'খালেদ'। শেষে 'খালেদ' নামটাই পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করলেন 'চিরকুমার দত্ত'। 'খালেদ' শব্দের অর্থ চিরন্তন। 'খালেদ' এর সংগে দত্তের বদলে চৌধুরী পদবী নিয়ে সারাজীবন ধর্মান্ধতাকে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে হাস্যমুখে চিরন্তন পরিহাস করে গেলেন তিনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল স্কোয়াডে যুক্ত হন খালেদ। ছবি আঁকা আর গান গাওয়া আর বাঁশি-বেহালা বাজানোয় তাঁর আশ্চর্য সহজাত প্রতিভা ঐ কালচারাল স্কেয়াডে এসে প্রকাশের অভিমুখ পেল। দিনে ছবি আঁকা, পার্টির পোস্টার লেখা আর রাতে হেমাংগ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, শান্তা সেনদের সংগে গলা মেলানো। জীবনের

ছবি, জীবনসংগ্রামের ছবি আঁকা আর উদার অসাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণায় লালিত হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শোষণ-শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বানে (আঁকা আর গানের) সাংস্কৃতিক প্রচারনায় (হেমাংগ বিশ্বাসের গানের দলের সদস্য হিসাবে) সমর্পিতপ্রাণ খালেদ চৌধুরীর মনে তখন 'নান্যে সুখমস্তি'-র-তাগাদা, আরো জানার, আরো বোঝার, আরো বড় কাজের সংগে যুক্ত হবার তীব্র ক্ষুধা। এই অন্বেষণের আবেগেই ১৯৪৫-এই কোলকাতায় চলে আসা এবং ৭০ বছর ধরে আমৃত্যু কোলকাতার সংগে বেড়ে ওঠা। ইচ্ছে ছিল কোলকাতা আর্ট কলেজের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ছবি আঁকার প্রথানুগ শিক্ষা নেবেন। কিন্তু জয়নুল আবেদিন আর কামরুল হাসান-এর মতো বরেণ্য শিল্পীদের সংগে পরিচয়ের সূত্রে সেই ইচ্ছে থমকে গেল। তাঁরা বুঝেছিলেন, ২৬ বছরের এই ভার্সেটাইল প্রতিভা ভাবনায় আর প্রকাশভংগীতে এমনই স্বশিক্ষিত যে বাঁধা সিলেবাসের খাঁচায় তাকে আটকানোর প্রয়োজন নেই। এর মধ্যেই ছেচল্লিশের দাংগা আছড়ে পড়ল বাংলার পুবে আর পশ্চিমে। কোলকাতায় দাংগাধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে কমিউনিস্টদের সংগে আর্ত ও আহতদের অক্লান্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন খালেদ চৌধুরী। ইতিমধ্যে চালচুলোহীন খালেদ আশ্রয় পেয়েছেন পার্টির কমিউনে। দাংগা শেষে সেখান থেকে গণনাট্যের কাজ করেছেন অনলস নিষ্ঠায়। পোস্টার এঁকেছেন, গান গেয়েছেন, তালবাদ্য থেকে নানারকম তারের যন্ত্র বাজিয়েছেন। গণনাট্যের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্যের সংগে তাঁকে নাচতেও দেখা গেছে সেই সময়। আর তার উপর থিয়েটার।

১৯৪৫-এ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে প্রবাদ-প্রতীম শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের পরিচালনায় শ্রীরংগমে 'রক্তকরবী' নাটকে সূর্য রায়ের সহযোগী হিসাবে মঞ্চস্থাপত্যের কাজ দিয়ে নতুন করে যাত্রারম্ভ। ১৯৫৪-তে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী প্রযোজিত ইতিহাস সৃষ্টিকারী 'রক্তকরবী' নাটকে স্বাধীনভাবে মঞ্চসজ্জা, আবহ সৃষ্টি আর পোশাক পরিচ্ছদ নির্মাণের দায়িত্ব পালন করে তাঁর জয়যাত্রার শুভারম্ভ। ২০০৪-এই তাঁর তৈরী মঞ্চস্থাপত্যধন্য নাটকের সংখ্যা ১০০ পার হয়ে গেছে। বহুরূপীর 'পুতুল খেলা', 'ডাকঘর', 'পাগলা ঘোড়া', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', ইত্যাদি নাটকে, রূপকার-এর 'কালের যাত্রা', থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর 'বেড়া', 'বিসর্জন', সায়ক-এর 'কর্ণাবতী', চুপকথা-র 'আকরিক', কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের 'চিলেকোঠার সিপাই', 'নক্সী কাঁথার মাঠ', নান্দীকার-এর 'মেঘনাদ বধ কাব্য', সুন্দরম-এর 'ছায়ার প্রাসাদ'—প্রভৃতি নাটকগুলিতে তাঁর মঞ্চস্থাপত্য আর তার পিছনে তাঁর মৌলিক ভাবনা নিয়ে একটি তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানী বই হয়তো ভবিষ্যতের কোন পরিশ্রমী গবেষক লিখবেন। কারণ শম্ভু মিত্র যাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন 'অসাধারণ প্রতিভাবান' কিম্বা যাঁর কৃত মঞ্চসজ্জা" পুংখানুপুংখরূপে দর্শনীয় ও শিক্ষনীয়" তাঁর দর্শন আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইতিহাস তো এখন পর্যন্ত নীরস তথ্যের বাইরে কিছু দিতে পারছেনা। কারণ খালেদ চৌধুরীর মঞ্চভাবনা ও স্থাপত্যচিন্তা কোনদিনই খাঁটি ভারতীয়ত্বর ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়নি, শিল্পে সহজতার শক্তির অন্বেষণ করতে গিয়ে এক্সপ্রেশনিজম থেকে তাঁর অভিযাত্রা ক্রমশঃ চলে গিয়েছে ইম্প্রেশনিজমের দিকে। রবীন্দ্রনাথের রংগমঞ্চ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি তাঁকে সবসময় টানত কিন্তু মঞ্চভাবনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাস, ভূগোল আর দর্শনের চেনাজানা সীমানাগুলোকে প্রয়োজনে অবলীলায় ভেঙেছেন। 'পগলা ঘোড়া' কিম্বা

'বিসর্জন' অথবা 'সওদাগরের নৌকা' নাটকগুলোর ক্ষেত্রে একই নাটকের দুই সময়ের কিম্বা দুই দলের অভিনয়ে দুরকম মঞ্চস্থাপত্য করেছেন, দুটিতেই স্বাতন্ত্র্য আর অভিনব ভাবনার স্বাক্ষর।—থিয়েটারের নতুন নতুন ভাবনার কাজে তাঁর প্রিয় দোসর ছিলেন আর এক আলোক-উজ্জ্বল প্রতিভা তাপস সেন। কত স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টিতে এই দুজনের যৌথ স্বাক্ষর যে প্রযোজনাকে রসাস্বাদনে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে তা নিয়েও একটি আকর্ষণীয় গবেষণা গ্রন্থ লেখা হতে পারে।—জীবনের উপান্তে এসে তার খুব দুঃখ হচ্ছিল, তর্ক করার, চ্যালেঞ্জ করার শিল্পজ্ঞান এই প্রজন্মের মস্তিষ্কে তেমন প্রশ্রয় পাচ্ছেনা। তাঁর কাজকে মাথা নীচু করে মেনে নেওয়াকেও তিনি সমর্থন করেননি, তর্ক ছাড়া শিল্পের বৈচিত্র্য বেড়ে উঠতে পারেনা—এমন এক যুক্তিনিষ্ঠ বশ্যতাহীন বৈপ্লবিক ধারণাকে তিনি আমৃত্যু লালন করেছেন।

লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁর সহজাত আগ্রহ তরুণ বয়স থেকেই নেশার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁর নিরলস কর্মতৎপরতার মধ্যেই তিনি হেমাংগ বিশ্বাস, রণজিৎ সিংহ ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে তোলেন "ফোক মিউজিক অ্যাণ্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট"। নিজের অতি চেনা উত্তরবংগ-আসাম গোয়ালপাড়ার বাইরে অন্য এলাকার লোকসংগীত সংগ্রহে আর সব স্বরলিপি তৈরিতেও তাঁর নেশা ও দক্ষতার প্রমাণ মিলেছে বারবার। আত্মজীবনীমূলক 'স্মৃতির সরণি' এবং "থিয়েটারে শিল্পভাবনা" (জানুয়ারি ১৯৯৭—প্রতিক্ষণ প্রকাশনা) ছাড়া তাঁর অন্য যে গ্রন্থটি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার নাম "লোকসংগীতের প্রাসংগিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ" (মার্চ, ২০০৪—লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রকাশনা)।

অজস্র গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন তিনি এবং প্রচ্ছদের ছবি দিয়ে সম্পূর্ণ বই-এর নির্যাস তুলে এনেছেন বারবার। ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-র এক আশ্চর্য টাইটেল কার্ড যেখানে কোলকাতা শহরটাকে দেখানো হচ্ছে একটা বাচ্চার আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে—সেও খালেদ চৌধুরীর সৃষ্টি। তবে টালিগঞ্জ পাড়া তাঁকে বিশেষ টানে নি।

এই বহুমাত্রিকপ্রতিভার সম্মান ও স্বীকৃতি কিন্তু মূলতঃ নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবেই। সংগীত নাটক আকাদেমি সম্মান (১৯৮৬), কালিদাস সম্মান (২০০২), দীনবন্ধু পুরস্কার (২০০৫) পদ্মভূষণ (২০১২) ইত্যাদি অজস্র সম্মান খালেদ চৌধুরীর ভেতরের সহজ সরল বৈরাগী মনকে প্রভাবিত করেনি কোনদিনই। শেষ জীবনে শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট পেয়েছেন প্রবলভাবে, কিন্তু সদাহাস্যময় মানুষটি এক দৃঢ় আত্মসম্মান বোধে আর স্টোইক ধৈর্যে সবরকম প্রতিকূলতাকে সহ্য করেছেন। শেষ জীবনে দুঃসহ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যাঁরা তাঁর সংগে কথা বলতে আসতেন তাঁরা অনুভব করতেন রক্তকরবী-র রঞ্জনের সংলাপ—"গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ"—তখনও তাঁর চর্চিত অনুভব। মহানগরের নাট্যদলের বাইরেও যারা তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসতেন নিজের সব যন্ত্রণা সরিয়ে রেখে তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করে গেছেন। সোনারপুরের 'কৃষ্টিসংসদ'-এর প্রশংসিত প্রযোজনা 'দূরবীণ'-এর মঞ্চপ্রকল্প তাঁর। পরিচালক সংগ্রামজিৎ বলছিলেন, অনেক লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে তাঁকে এই নাটকের সাফল্যের শেষে একটা খামে করে হাজার পাঁচেক টাকা তাঁর প্রবল পরিশ্রমের সম্মান দক্ষিণা হিসেবে দিতে গিয়েছিলাম, খালেদদা হাসতে হাসতে খামটা আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—কত কষ্ট করে তোমরা থিয়েটারটা করো তা জানি, এটা তোমাদের আগামী নাটকের জন্য খরচ কোরো।'

মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে একটি দৈনিকের হয়ে সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল এই প্রতিবেদকের। চারপাশের সমাজ-রাজনীতির দুরবস্থায় যন্ত্রণার্ত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে যাচ্ছিল তাঁর রোগার্ত বার্দ্ধক্য আর অনিকেত বেঁচে থাকার হাহাকারকে। বলছিলেন, শুধু আমার কথা উঠছে কেন, রবিশংকর সম্পর্কে, উৎপল দত্ত সম্পর্কে শম্ভু মিত্র সম্পর্কে ৫০-৬০-এর দশকের বামপন্থী সংস্কৃতির প্রধানরা যে মূল্যায়ন করেছেন, তাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তাতে কোনো অভিযোগ না জানিয়েও এটুকু বলা চলে—পি. সি. যোশির পর শিল্প-সংস্কৃতির সৃজনশীল মানুষদের প্রাপ্য সম্মান; মর্যাদা ও কাজ করার সংকীর্ণ প্রভাবমুক্ত পরিবেশ তৈরীতে আর কেউ সঠিকভাবে এগিয়ে আসতে পারেননি।—দলবাজির এই উন্মুক্ত হুল্লোড়ে শুধু খালেদরাই কোন দল বা গ্রুপ ছিল না।

মৃত্যু নিয়ে তাঁর রসিকতার অন্ত ছিল না। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শরীরের প্রবল কষ্ট সহ্য করে সেঞ্চুরি থেকে মাত্র পাঁচ বছর আগে থমকে যাওয়া জীবন-রসিক বলে গেলেন—"আমি কিন্তু নরকে যাব, স্বর্গে ভীষণ ভীড়। সবাই পুজো-আচ্চা করে, চোরডাকাতও পুণ্যি করে, গংগাস্নান করে, দেখনা, সব ব্যবসায়ীরা, নেতামন্ত্রীরা গাদা গাদা পাপ করে। যে যায় কুম্ভমেলায় নয়তো গংগাসাগরে। কেউবা আবার হত করতে। ব্যাস, ওদের পাপ মকুব। ওরাও সংগে যাবে। অত ভীড় ভাড়াক্কা আমার পোষাবে না। আমি পুজোও করিনি, গংগাস্নান অথবা নমাজ পড়া কোনোটাই করিনি, সুতরাং নরকেই—"

(প্রদীপ দত্ত—"চিরকুমার থেকে খালেদ")

চিরকুমার খালেদ চৌধুরীর নিজের কোন সংসার ছিল না, অনিকেত জীবনের বিবেক থেকে সন্ধ্যায় আশ্রয় মিলেছিল এক শুভার্থীর সৌজন্যে। নার্সিংহোমে অন্তিম চিকিৎসা পেতে গিয়ে সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী এই মানুষটির যেদিন জীবনাবসান হোল এ বছরের এপ্রিলের সেই নিদাঘ দগ্ধ ভোরের মহানগরের আকাশে দু-একখণ্ড মেঘ জমছে। তাঁর আত্মজন আর শিল্পসংস্কৃতির বন্ধুরা খবর পেয়ে সেই সকালে ছুটছেন তাঁর মরদেহটিকে দেখবেন শ্রদ্ধা জানাবেন, কেউ কেউ কাঁধে নেবেন—এমন কর্তব্যতাড়িত আবেগে। এদের কজন জানতেন শ্মশান বা কবর সম্পর্কে সম্মান বীতস্পৃহ খালেদদা যে গোপনে সেই দায়টুকুও নিজেই সেরে রেখেছেন? তাঁর চোখের কর্ণিয়া নিয়ে গেছে শুশ্রূত আই ফাউন্ডেশন। তিনি দেহ দান করে গেছেন এন আর এসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা : পুরাণ পেরিয়ে পাড়ি

শর্মিলা ঘোষ

মঙ্গলকাব্যের অতি পরিচিত পুরাণকথাকে আশ্রয় করে শম্ভু মিত্র ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে 'বহুরূপী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় পর্বে পর্বে লিখলেন তাঁর শেষ নাটক—"চাঁদ বণিকের পালা"। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিত আখ্যানের কাঠামোটুকু গ্রহণ করলেও পুরাণকথাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেননি নাটককার। স্বভাবতই তাঁর লক্ষ্য ছিল মিথকথার নতুন এক নির্মাণ। সমসময়ের প্রেক্ষিতে মিথকে ব্যবহার করেছেন তিনি। বস্তুতঃ 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে সময় ছড়িয়ে আছে তার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। যে সময়ে দাঁড়িয়ে এই নাটক রচনা সেই ছিন্নমস্তা সময়কে অনুধাবন করতেই যেন পুরাণে ইতিহাসে নাটককারের এই পাড়ি।

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা বরং এই নাটক রচনার প্রেক্ষিতটি দেখে নিতে চাইব। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপী মঞ্চস্থ করে রাজা অয়দিপাউস এবং রাজা নাটক দুটি। অভিনয়পত্রীতে দুটি নাটককে একত্রে 'অন্ধকারের নাটক' বলেছিলেন শম্ভু মিত্র কিন্তু এই দুই অন্ধকারের তাৎপর্য যে এক নয় সেকথা তিনি জানতেন। তবু নাটক দুটিকে পরপর দুদিন অভিনয় করে (প্রথম অভিনয় : রাজা অয়দিপাউস—১২/৬/৬৪, রাজা—১৩/৬/৬৪) তিনি যেন একক মানুষের সংগ্রামকে, সত্যের জন্য আলোর জন্য তাঁর অন্বেষণকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। অয়দিপাউসের সত্যের জন্য অন্বেষণের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন আলোর জন্য সুদর্শনার পথ পরিক্রমাকে। তাই বাইরের দিক থেকে এই দুই নাটকের মধ্যে মিল খুঁজে না পেলেও 'একটা কোন অন্ধকারের বোধ' দিয়ে শম্ভু মিত্র নাটক দুটিকে একসাথে নির্বাচন করেছিলেন। কবি সমালোচক শ্রী শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—"মায়ামমতাহীন যে প্রচণ্ড ভয়ংকর অন্ধকার আমাদের সামনে ছড়িয়ে থাকে জীবন নাম নিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে যেন গোটা জীবনের মানে খুঁজতে চান তিনি; বুঝে নিতে চান কীভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে একেবারে নিঃস্বতা আর সর্বনাশের পটে। এই বুঝে নেবার জন্য একদিকে অভিনয়ের কারণে 'রাজা অয়দিপাউস' এবং 'রাজা' নাটক নির্বাচন আর অন্যদিকে অনিবার্য এক নতুন নাট্যরচনার দিকে এগিয়ে যাওয়া"[১]—বলা বাহুল্য এই নাটকটিই *চাঁদ বণিকের পালা*।

বস্তুতঃ, 'রাজা' নাটকের মহলার সময়েই যে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি লেখার ভাবনা শম্ভু মিত্রের মনে এসেছিল একথা জানিয়েছেন তিনি নিজেই। পরবর্তীকালে একটি সাক্ষাৎকারে শম্ভু মিত্র বলেছিলেন—'...আমার মনে আছে যখন আমি 'অয়দিপাউস' আর 'রাজা' রিহার্সাল দিচ্ছি, সেই মহলার সময়েই ...কেমন করে জানিনা এই চাঁদ সদাগরের কাহিনীটা মাথায় এসেছিল এবং মনে হয়েছিল যে এইটা আমাদের এখানকার সঙ্গে—আধুনিক কালের সঙ্গে ভয়ানক ভালো মেশে। এইটা করা যায়।'[২]

মনসামঙ্গল কাব্যের মিথ ভেঙে সমকালকে প্রকাশ করার চেষ্টা অবশ্য এই প্রথম নয়। দীর্ঘদিন ধরেই চাঁদ-মনসার মিথ আধুনিক কালকে, আধুনিক মনকে, আধুনিক জীবনের জটিলতাকে প্রকাশ করেছে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে। মন্মথ রায়ের নাটকটি অবশ্য প্রধানত পৌরাণিক। সমকাল সেখানে পরতে পরতে জড়িয়ে নেই একথা সত্য, তবে মনে রাখতে হবে নাট্যকার কিন্তু এই সময়ে লেখা তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের অবস্থাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে লেখা কালিদাস রায়-এর কবিতা, অমিয়ভূষণের উপন্যাস, অজিতেশের নাটক অথবা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় প্রধানত বিষয় হয়েছে মনসার প্রতিস্পর্ধী চাঁদের পৌরুষ এবং বারবার পরাজিত হয়েও তাঁর অপরাজেয় মনোভাব। কিন্তু শম্ভু মিত্রের নাটকে সমকাল অর্থাৎ প্রধানত সত্তরের দশক প্রকাশিত হয়েছে তার সবটুকু বাস্তবতা নিয়ে। এই নাটকে শম্ভু মিত্র পুরাণকথার মূল কাঠামোটির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাননি কিন্তু এর আন্তর্বাস্তবতাকে একেবারে বদলে দিয়েছেন। বস্তুত তার নাটকে 'মিথটাই রয়েছে বাইরে, কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্তর্কাঠামোটা সমকালের'।* সত্তরের দশকের অস্থির রাজনীতি এবং সামাজিক প্রতিবেশের অরাজকতা, বলা যেতে পারে একটা অন্ধকার কালো সময় যেন মনসার প্রতিকল্পে তার সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে।

প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন এমন অন্ধকারের বোধ দিয়ে নাটক নির্বাচন বা লেখার প্রবণতা? এর উত্তর পেতে আমাদের ফিরতে হবে আরও একটু অতীতে, পৌঁছতে হবে ১৯৬২ সালের সময়সীমায়। ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের একটি সভায় আবৃত্তি করার 'অপরাধে' কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শম্ভু মিত্রকে প্রবলভাবে আক্রমণ করা হয় এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সমালোচনা শুরু হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার পাতায়। ফাল্গুন, ১৩৬৮ সংখ্যায় পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রী গোপাল হালদার 'সংস্কৃতি সংবাদ'-এ 'ক্যাজুয়েলটি' শিরোনামে এই ঘটনার নিন্দা করে লিখেছিলেন—'... যে বাঙালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা সোভিয়েত-এর বোমা বিস্ফোরণে শিউরে ওঠেন, তাঁদের কেউ কেউ আবার ব্রিটিশ মার্কিন বোমা পরীক্ষায় এখন হয়তো বোমাঞ্চিত হন, কারণ তাঁরা রবীন্দ্র মানবতার ঐতিহ্যবাহী। আর রবীন্দ্রনাথ যদি হিজলীর পরে মনুমেন্টের তলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হলে বারাসাতের মাঠেই বা উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্কর ছুটে গিয়ে দাঁড়াবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ বাণীর পশারী, ওঁরা ভঙ্গির ব্যবসায়ী। এই বোড়ের চালের মুখে যদি মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে বাঁচাতে উদয়শঙ্করের ফুটো নৌকাকে চাপান দেন, শম্ভুবাবুদের আড়াই চালের অশ্বনীতিকে আঁকড়ে ধরেন, আর মনোজবাবুদের গজ-গতিকেও বিনা অঙ্কুরেই তাড়িত করেন তা কি তাঁদের অপরাধ? উদয়শঙ্কর রাজনীতি বোঝেন না (এ সত্য কথা কে না মানে?) ...এরূপেই উল্টোদিকে শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথাও তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন। তা হলে তাঁর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি এবং হুমায়ুনী কাব্যামৃত পরিবেশন অর্থনীতি হতে যাবে কেন? আমরা বিশ্বাস করি তাও রাজনীতি, তবে এক্ষেত্রে মন্ত্রীর রাজনীতি—জনসমাজের রাজনীতির থেকে অনেক বেশি যা দামী। কারণ জনতার রাজনীতি তো কুড়ি বৎসর শম্ভুবাবু দেখেছেন। কই কুড়ি বৎসরেও তো সে রাজনীতির কোন ফল দেখেন নি? শুধু ফেলই দেখেছেন—১৯৪৩ থেকে ১৯৬২

পর্যন্ত এই তো অভিজ্ঞতা। অথচ এ কালের মধ্যেই মন্ত্রীদের রাজনীতির প্লাবন তো পদবীতে পারিতোষিকে সম্মানে সংগঠনে কত খ্যাত-অখ্যাত এবং কুখ্যাত কত ক্ষেত্রকেই সুজলা সুফলা করে তুলল। তিনি বা এমন সুফলা রাজনীতিকে আশ্রয় করে সফল হবে না কেন?...

কেউ ভুল করেন নি—সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির দামটা যখন বেশি সংস্কৃতিকে ক্যাজুয়েলটি হতেই হবে, Every man has price. এটাই এই নির্বাচনী রাজনীতির শিক্ষা।'[৪]

সন্দেহ নেই, উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ কিন্তু চাঁদ বণিকের পালা পর্যন্ত পৌঁছতে এই প্রেক্ষাপটটুকু আমাদের জেনে নিতেই হবে। 'পরিচয়' পত্রিকা ছাড়াও অচলপত্র, স্বাধীনতা, প্রমুখ পত্রিকায় এই ঘটনার নিন্দা করে বিভিন্ন সংবাদ এবং চিঠি প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য এই সংবাদ এবং চিঠিগুলি বিশেষ কোন একটি রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ সমর্থন চিঠিগুলিতে ছিল।

এই সমস্ত সমালোচনার উত্তরে শম্ভু মিত্র 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদককে একটি মাত্র চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটিতে তিনি জানান যে তিনি কোন নির্বাচনী সভায় যাননি, একটি সাংস্কৃতিক সভায় যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, আর 'যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায় এবং যদি কোনও ব্যক্তি বিশেষকে আমার ভালো বলেই মনে হতো তাতে কী হতো? গোপালদার পক্ষে গেলেই কী আমি মহৎ শিল্পী হতাম? আর না গেলেই কি আমার সংস্কৃতি বিকৃত? মহৎ শিল্পী হবার পথ তো তাহলে বড় সোজাই হতো।... ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের মৌলিক অধিকার আছে যে কোনও প্রার্থীকে সমর্থন করার। সেইটাই ডিমোক্র্যাসীর অধিকার এবং সেইজন্য যদি আমি যেতামই কোন নির্বাচনী সভায় তাহলেও কোন দৈনিক বা মাসিক পত্রিকার পক্ষে অশালীন হবার কোন যুক্তি খাটে না।'[৫]— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এই চিঠির অন্তর্নিহিত পাঠটি।

'পরিচয়' পত্রিকায় লেখা এই চিঠিটি ছাড়া শম্ভু মিত্র তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া সমস্ত সমালোচনার আর কোন প্রতিবাদ না করে " দশকের ব্যবধানে 'দশচক্র' " নাটকটির পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিবাদকে সংহত করে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করলেন। যে নাটকে একজন মানুষ তাঁর আত্মধর্ম ও সম্মান বাঁচাতে ব্রুট মেজরিটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, সমষ্টি থেকে একলা হয়েছে এমন নাটক তিনি বেছে নিলেন বিশেষ ঐ সময়সীমায়। এই নাটকে একজন একক মানুষ অনেক প্রচলিত অথচ ক্ষয়ে যাওয়া সত্যকে ফেলে নিজস্ব সত্যকে খুঁজে নিয়েছে। এই একক মানুষের জীবনের নানা প্রতিকূলতা এবং সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই মানুষটির কণ্ঠস্বর কোথায় যেন মিলে যায় শম্ভু মিত্রের সমকালীন জীবনের বিভিন্ন জটিলতার সঙ্গে। পরবর্তীকালে একটি প্রবন্ধেও তিনি লেখেন—'যখন আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের দেশ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে চলেছে, যখন আমাদের প্রচণ্ড চিন্তা হয়েছে যে একটা ব্যক্তিগত মানুষ কি করে নিজের সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করবে এই দিশাহারা সমাজের মধ্যে তখন আমরা আবার 'দশচক্র' করেছি।'[৬] বিশেষ ঐ কালপর্বে, দিশেহারা সমাজের মধ্যে ইবসেনের 'এ্যান এনিমি অব দি পিপল' নাটকের শেষে ড. স্টকম্যানের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল— 'I have made a great discovery that the strongest man in the world is he who stands most alone'. আর অনুবাদে দশচক্র নাটকে পূর্ণেন্দু গুহ বলেছিলেন—'পৃথিবীতে সেই মানুষই সবচেয়ে শক্তিশালী

যে একা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে'। আর তখনই মনে হয় দশচক্র নাটকের প্রধান চরিত্র এবং তার অভিনেতা-নির্দেশক যেন একই পরিস্থিতির শিকার। আর সেকারণেই সমকালীন জীবনের সমস্ত জটিলতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সমস্ত প্রতিবাদকে সংহত করে 'দশচক্র' নাটকের পুনঃপ্রযোজনা।

একেবারে সমসময়ে লেখা 'অসাময়িক' (১৯৬২) ও 'অরণ্যে' (১৯৬৩) গল্প দুটিতেও রূপ পেয়েছে এক বিশ্বাসঘাতকতার আলেখ্য। দুটি গল্পই ছদ্মনামে লেখা। দুটি গল্পেই এসেছে গ্রুপ থিয়েটারের প্রসঙ্গ—সেখানকার ভেঙে যাবার কথা। 'অসাময়িক' গল্পে নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং নাট্যজীবনে এক বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হবার কথা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অন্য ভালোবাসায় উত্তরণের কথা আছে এ গল্পে কিন্তু সেই উত্তরণ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত স্তরে। আর অরণ্য গল্পটিতেও আছে নবনাট্যের বর্তমান অবস্থার কথা, সংগঠনগুলোর নৈতিক পতনের কাহিনী। 'অরণ্যে' গল্পের একটি চরিত্র অনিল রায় ধিক্কার দিয়ে যখন বলেন—'তোমাদের মনের ভিতরে কোথাও কোন ঠাকুরঘর নেই, ...'[৭] অথবা যখন আবার বলেন—'আমরা রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম, থিয়েটারকেও ভালবাসতাম, কিন্তু ক্রমশ চতুর্দিকে দেখতে দেখতে রাজনীতিতে বিশ্বাস একেবারে চলে গেল। ... Doesn't matter. I am in the minority.'[৮] তখন মনে হয় শম্ভু মিত্রের একেবারে নিজস্ব কণ্ঠস্বরই যেন প্রকাশ পাচ্ছে এই উক্তির মধ্যে দিয়ে। শুধুমাত্র ছোট গল্প নয়, সেই সময় শম্ভু মিত্র সমাজ এবং জীবনকে কি চোখে দেখছেন তা স্পষ্ট হয় সকসময়ে লেখা 'গর্ভবতী বর্তমান' (১৯৬৩) এবং 'অতুলনীয় সম্বাদ' (১৯৬৫) নাটকে, যে দুটিকে নিজেই কৃষ্ণ কৌতুকীয় নাটিকা বা ব্ল্যাক কমেডি বলে উল্লেখ করেছেন নাটককার। সমাজের প্রতি এক তীব্র কটাক্ষ নাটক দুটিতে খুব স্পষ্ট। সমসময়ে লেখা চলছে 'রাজার কথায়' (১৯৬৫) নামক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি যেখানে শম্ভু মিত্র বলছেন 'নবান্ন' করার পর গণনাট্য ছাড়ার সময় থেকে তাঁদের নাট্যচর্চাকে যেভাবে রাজনৈতিক কারণে বাধা দেওয়া হয়েছে, যেভাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অসূয়া চরিতার্থতা ছাড়া আর কোন লাভ হয়নি। তাই 'ফল হলো না। ধুলো উড়ল, কাদা ছুটলো, কিন্তু ঠাকুরঘরটিকে কেউ নিকিয়ে সাফ করতে এল না।'[৯] এভাবেই 'অরণ্যে' গল্পের চরিত্র অনিল রায়ের বলা ঠাকুরঘরের প্রসঙ্গটি আবার এল সমসময়ে শম্ভু মিত্রের ভাবনায়। আর এই সব কিছুর প্রতিক্রিয়াতেই যেন অভিনয়ের জন্যে বেছে নেওয়া হচ্ছে অন্ধকারের নাটক শিরোনামে 'রাজা অয়দিপাউস' এবং 'রাজা' নাটক দুটি আর শুরু হচ্ছে জীবনের এতদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নিয়ে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক রচনা।

আর একটি কথা উল্লেখ করাও বোধহয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শম্ভু মিত্র এই সময় একটি চিঠিতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বহুরূপীর অপর এক নাট্যব্যক্তিত্ব কুমার রায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'আমি সত্যি বিগত কালের। আর আমার বার্ধক্যও তাই। তাই কেমন যেন আর আগ্রহ লাগে না। ...'[১০] এই বার্ধক্যের বোধ কি ১৯৬২ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ারই অংশ? এমনটা ভাবা বোধকরি খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। ১৯৬৫-র সেই কালপর্বে শম্ভু মিত্র যখন সম্পূর্ণভাবে নাটক প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত, যখন তাঁর নির্দেশনা ও অভিনয়ে তৈরি হচ্ছে কালজয়ী এক-একটি নাট্যভাবনা, তখন কেন শম্ভু মিত্র

এমন কথা লিখলেন—তা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়। মনে করতে পারি এর ঠিক আগেই শুরু হয়েছে 'চাঁদ বণিকের পালা' রচনা যার মধ্যে দিয়ে শম্ভু মিত্রের জীবনের নানা ঘটনার প্রক্ষেপ যেন খুঁজে পাওয়া যাবে বিবিধ অনুষঙ্গে। ঠিক এমন একটা সময়ে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা দেখে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে ১৯৬২ সালের উল্লিখিত ঐ বিরুদ্ধতা কি গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল শম্ভু মিত্রের মনে? আর জীবনের এই কঠিন অনুভবের ফলেই কি 'অসামরিক' বা 'অরণ্য'-র মত অন্ধকার গল্প রচনা অথবা 'অতুলনীয় সম্বাদ' বা 'গর্ভবতী বর্তমান'-এর মত 'কালো' নাটক লেখা এবং দিশেহারা সমাজের মধ্যে অসহায় মানুষের সার্থকতা খোঁজার চেষ্টায় *দশচক্র*, *রাজা অয়দিপাউস* এবং *রাজা* অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ভয়ংকরের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে, জীবনের কঠিন নির্দয় নৈর্ব্যক্তিক ভীষণকে জেনে নিয়ে সত্যের জন্য আলোর জন্য অন্বেষণের শেষে কি একদিকে শুরু হল জীবনের তখন পর্যন্ত না মেলা হিসেবগুলো জড়ো করতে করতে 'চাঁদ বণিকের পালা' রচনা, যে নাটক পরবর্তী প্রায় দশ বছর ধরে নাটককারের জীবনের নানা না-মেলা অঙ্ক-র ভার বহন করে পুরাণ থেকে 'পাড়ি' দিয়ে ক্রমশ হয়ে উঠবে এ যুগের একজন বিক্ষত মানুষের জীবনের কথা? আবার এই সময়েই মনে জাগছে অবসরের ইচ্ছা। নিজেকে মনে হচ্ছে বিগত কালের। প্রশ্ন জাগে এই অবসর কি বহুরূপী দল থেকে? কারণ এর ঠিক আগেই অসামরিক ও অরণ্যে—দুটি গল্পেই রয়েছে গ্রুপ থিয়েটারের দল ভেঙে পড়ার ছবি, বিশ্বাসঘাতকতার আলেখ্য। এমন কিছু কি ঘটেছিল সেই সময় যাতে মনে জেগেছিল অবসরের ইচ্ছা আর সেকথা কি ভাগ করে নেওয়া গিয়েছিল দলেরই একজন সঙ্গীর কাছে? শিবদাসের মতোই যে তখনও বিশ্বাস করে আধুনিক এই চাঁদ সদাগরকে? কিন্তু অবসর তো তিনি নিচ্ছেন না। বরং নিজেকে প্রায় সর্বতোভাবে উজাড় করে দিচ্ছেন নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কাজে। ১৯৬৫তেই বহুরূপীর তরফে বিভিন্ন নাট্যদলকে সংগঠিত করে একটি নাট্যপর্যদ স্থাপন করে যে ভাবনার সূচনা হয়েছিল এবং শম্ভু মিত্র প্রথম থেকে যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে। চাঁদ বণিকের পালা লেখার শুরুতে এই অবসরের ভাবনা আর ক্রমশ চাঁদ সদাগরের কথা, তার সংগ্রামের কথা লিখতে লিখতে অবসরের একেবারে বিপরীতে চাঁদের মতই আবার আবার 'পাড়ি' দেবার সিদ্ধান্ত কোথায় যেন নাটককার কেই চিহ্নিত করে দেয়। নির্দিষ্ট করে দেয় তাঁর জীবনের নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতকে।

চাঁদ বণিকের পালাটি রচনার পর শম্ভু মিত্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন সেকথা। স্বভাবতই অসম্ভব খুশি দীপেন্দ্রনাথ নাটকটি পাঠের আয়োজন করেন। পরিচয় পত্রিকার ঘরে শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে চাঁদ বণিকের পালা নাটকের প্রথম সেই পাঠ দর্শক শ্রোতাকে (যার মধ্যে শঙ্খ ঘোষও একজন) এক মহত্তের আস্বাদ দিয়েছিল সন্দেহ নেই।

বণিক চাঁদ সদাগরের নৌযাত্রার আয়োজন দিয়ে শুরু হয় নাটক। প্রথম পর্বের শুরুতেই খুব বলিষ্ঠ এক জয়ের আশা গড়ে ওঠে চাঁদ ও তাঁর সঙ্গীদের 'সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি' দেবার সংকল্পে। চাঁদ তাঁর সঙ্গীদের এক রোমান্টিক স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করেন। অজানা সমুদ্রের বুক তোলপাড় করে সমস্ত শুভ, মঙ্গল, পৌরুষের উপর বিশ্বাস রেখে এক উজ্জ্বল চম্পকনগরীর স্বপ্ন দেখান তিনি। চাঁদ জানেন যে এই অভিযানে শিবাই-এর পথ তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তিনি মানতে

চান না মনসার সর্পিল আন্ধারকে, তিনি জানেন শুধু তাঁর শিবকে। সাথীদের তিনি বলেন—'দিনরেতে বুকে ভরসা রেখো আমাদের জয় হবেই হবে। ... আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য; আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারবে না।'

এই জয়ের স্বপ্নে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির সূচনা।

আর শেষ।

শেষ নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা করা হলেও আমার মনে হয় নাটকটি শেষ হয়েছে সমস্ত সর্বনাশের মধ্যে অবস্থান করেও, রিক্ত নিঃস্ব চাঁদের পুনরায় পাড়ি দেবার এক অসামান্য সংকল্পে।

এই শুরু আর শেষের মাঝখানে—এই নাটকের আধুনিক জীবনের প্রায় সব জটিলতাকে স্পর্শ করা এক অসামান্য বিস্তার। পুরাণ থেকে কাঠামো নিলেও সমকালীন মন নিয়ে, এক আধুনিক মানুষের সমস্ত জীবনযন্ত্রণা নিয়ে গড়ে ওঠে এই নাটক।

নাটকের প্রথম পর্বে চম্পকনগরীর হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে চাঁদের এই অভিযান কিন্তু তাঁর কোন একক প্রয়াস নয়। চাঁদ এ অভিযানে সামিল হতে ডাক দেন চম্পকনগরীর সকল সদাগর ভাইকে। সকলকে নিয়ে পূর্বপুরুষদের তর্পণ করতে চান তিনি। আর দেশের প্রতি তাঁর এই প্রেম চাঁদ সদাগরকে করে তোলে আধুনিক যুগের একজন মানুষ। ঐতিহ্যের প্রতি, অতীতের প্রতি তাঁর এই টান নাটকের একেবারে প্রথমেই চাঁদ সদাগরকে মধ্যযুগীয় গণ্ডি থেকে বাইরে নিয়ে আসে।

জয়ের আশায় মশগুল চাঁদ এবং তাঁর সঙ্গীদের সমুদ্রযাত্রার পূর্ব মুহূর্তে আসে বাধা — এ বাধা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক। স্থানীয় মাণ্ডলিক কৌলীনন্দন মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যের সাহায্য নিয়ে চাঁদের এই অভিযান বন্ধ করে দিতে চান। চাঁদের গুরু বল্লভাচার্য ও তার শিষ্য চন্দ্রধরকে এই অভিযান পরিত্যাগ করতে বলেন। চাঁদ বিস্মিত হন বল্লভাচার্যের এই বক্তব্যে কারণ তিনিই একদিন বলেছিলেন যে মিথ্যা যতই প্রভাবশালী হোক সবশেষে সত্য জয়ী হবেই। কিন্তু এখন বল্লভাচার্য মনে করেন একেবারে বিপরীত কথা। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বল্লভাচার্য বলেন—'জগতে যে অন্ধকার অকাল নেমেছে সেখানে জ্ঞানের সম্মান নাই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচরণ নাই, সুভাষণ নাই, মাংসমুখ ছাড়া অন্য কোন সুখচিন্তা নাই—আর তাই আদর্শের পাশে ছুটে কোন লাভ নাই ... কারণ সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার।'

প্রশাসনিক স্তর পেরিয়ে পরের বাধাটি আসে দলগত স্তরে। বনমালী, অভিযাত্রী দলেরই একজন, বৌ-এর প্রতিভূস্বরূপ একটি কোলবালিশ নিয়ে যেতে চায় 'সমুদ্দুরে'। তুচ্ছ এক আরামদ্রব্যের জন্য বনমালীর আবদারের আপাত হাস্যরসের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর ইঙ্গিত। বনমালীর কথায় চাঁদও যখন অট্টহাস্য করে ওঠে তখন বনমালী বলে—'দেখো চাঁদ সাধু। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বাঁচন পদ্ধতি ... তুমি কেন তোমার নিজস্ব পছন্দ বা অপছন্দ আমাদের ওপর চাপাও? এটা তো অন্যায় একেবারে কুৎসিৎ অন্যায়।' বনমালীর এই হঠাৎ বিদ্রোহ এবং চাঁদের প্রতি তীব্র বিষক্ষরণ বুঝিয়ে দেয় যাদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদের এই অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবার আয়োজন, সেখানেও রয়েছে সমালোচনার বিষ। এ যেন একেবারেই

ব্যক্তিস্বার্থ বনাম সংঘস্বার্থের একটি দৃষ্টান্ত। বহুরূপীর প্রধানরূপে শম্ভু মিত্রকেও এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যেখানে হয়তো তাঁকে 'Dictator' বলেই মনে করেছেন কোন কোন সদস্য।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এরপরের আঘাত আরও গভীর কারণ তা আসে পারিবারিক স্তর থেকে। চাঁদ জানতে পারেন, তাঁরই ঘরে, তাঁরই অন্তঃপুরে, তাঁরই সহধর্মিণী সনকা গোপনে গোপনে স্তব করে চলেছে মনসার—'যুক্তির অতীত তুমি জ্ঞানের অতীত। তমসার রূপে মাগো আলোর অতীত।' শিবাই-এর পথকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করা চাঁদ এই ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় বলে ওঠেন—'মানুষ যে ঘর বান্ধে সে কি শুধু ইঁট, কাঠ, পাথরের ঢের দিয়া কও? বিশ্বাস না যদি থাক্যে—ঘরে এস্যা যদি দেখে, ঘরে তার অন্ধকার কোণে কোণে সর্প ঘোরে— তাইলে সে সসর্প দালানে কোনোদিন সংসারের প্রতিষ্ঠা হয়? সেটা কি কখনো ঘর হয়?—ধর্মপত্নী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়?—হায় হায় ভগবান, মানুষের মন তবে কোথায় ভরসা পাবে?' নাটকের প্রথম পর্বেই নাটককার অপূর্ব কৌশলে যেন তিনটি বৃত্তে চাঁদের বিরুদ্ধে শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করে দিলেন। সবচেয়ে দূরবর্তী অথচ সবচেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী স্তরে তা প্রশাসনিক, পরবর্তী কাছের স্তরটিতে তা আপাত লঘু কিন্তু মূল অভিযানেই ভাঙন ধরিয়ে দেবার ক্ষমতাধারী দলগত এবং সবচেয়ে কাছের বৃত্তটিতে তা একেবারে পারিবারিক স্তর থেকে উঠে আসা।

সনকা অবশ্য চাঁদকে বোঝাতে চায় কেন সে পূজা করেছে মনসার। 'আন্ধার এই সময়ে আন্ধারের দেবতাকে তুষ্ট করে একটি সুখী পরিবারের আশা তার। কিন্তু সত্য আর শিবের ঘরে এই মিথ্যা মেনে নিতে না পেরে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর হন চাঁদ। গভীর বেদনায় উচ্চারণ করেন—'আপন অন্তরে তুমি ভালোমতো জানো, এই পূজা ন্যায় নয়। তুমি জানো জ্ঞানের পূজার ঘরে অজ্ঞানের পূজা দেওয়া যায় না কখনো। তাই তুমি গোপনতা করো ... কতোদিন ঠকাও এমতো? বলোতো সনকা কতো দিন? মোর লেগ্যে শিঙার করেয়েছ, চক্ষেতে কাজল আর ঠোটেতে তাম্বুল, সর্ব অঙ্গে চন্দনের বাস, আর নাভিমূলে ত্রিবলির ঠাম, সেই রূপ দেখ্যে আমি মোহিত হয়্যেছি, আর তুমি অন্তরে অন্তরে মনসার পূজা কর্যে গেছ? আমারি অঙ্কেতে শুয়্যা নারী, তুমি আন কথা ভেব্যে ভেব্যে গেছ? বা — বা, বারে সনকা —' এই অংশের বর্ণনায় কোথায় যেন 'বিসর্জন' নাটকের গুণবতী ও গোবিন্দমাণিক্যের দ্বন্দ্ব তুলনীয় হয়ে.ওঠে। সেখানেও সন্তানলাভের জন্য গোবিন্দ্যমাণিক্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনশত ছাগ বলি দিতে চেয়েছিলেন গুণবতী। গোবিন্দমাণিক্যের আদর্শকে লঙ্ঘন করে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন দেবীকে, রাজপুরোহিতকে। চাঁদের আদর্শকে লঙ্ঘন করে সনকার এই মনসার স্তব আর গোবিন্দমাণিক্যের বিশ্বাসের বিপরীতে গুণবতীর বলিদান কোথায় যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় আমরাও মুহূর্তেই চাঁদের যন্ত্রণার শরিক হয়ে পড়ি কিন্তু সনকা কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? 'সবার মঙ্গল তরে, সদাগর স্বামীপুত্র সকলের কল্যাণের তরে' সনকার যে পূজা সে তো সংসারেরই মুখ চেয়ে। এর উত্তর সত্যিই জানা নেই আমাদের।

ঘটনার অমোঘ প্রভাবে প্রবল ক্রোধে চাঁদ বণিক মনসার ঘট ছুঁড়ে ফেলার পরমুহূর্তেই তাঁর ছয়পুত্রের মৃত্যু ঘটে সর্পাঘাতে। কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রদের এই মৃত্যু অথবা মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যের আদেশে গাঙুরের সকল ঘাট থেকে নৌযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া—কোন কিছুই

নিরস্ত করতে পারে না চাঁদকে। কলার ভেলা বেঁধে নিজ হাতে যত্ন করে নিজের ছয় পুত্রকে শুইয়ে গাঙুরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি বলেন—'চলো, চলো পাড়ি দিতে হবে। পাড়ি দেওয়া খুব প্রয়োজন।' এমন এক অদ্ভুত আঁধার সময়ে হয়তো চাঁদ সদাগরের মত মানুষরাই কেবল পাড়ি দিতে পারেন। ভাবতে পারেন দেশের কথা—দেশের ভবিষ্যতের কথা। কারণ চাঁদ জানেন তার ছয় পুত্রের মত 'হয়তো বা আরও পুত্র যাবে। ... তবু যদি আমরা সকলে আজ পাড়ি দিতে পারি—তাইলে সে তারি মধ্যে আরো কত পুত্র বেঁচ্যে যাবে। সেই সব বীজগুলা একদিন গাছ হবে, মহীরূহ হবে, ফল দেবে, আমাদের দেশের মুখ হাসিতে ভরাবে। ভাইরে আমি জানি, আমার এদেশের অন্তর মরে নাই। সে তো আমাদের ডাকে। চলো চলো চলো,—।' তাই ছয় পুত্রের মৃত্যুর বেদনাকে বহন করে, শাসকদলের নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে, সনকার অভিশম্পাত বুকে নিয়ে, রাত্রির অন্ধকারে নোঙরের দড়ি কেটে সমুদ্রযাত্রা করেন চাঁদ বণিক। যিনি কখনোই আপোস করেন না অজ্ঞানতার সঙ্গে, তমসার সঙ্গে, মনসার সঙ্গে—যাঁর একমাত্র আশ্রয় তার শিব—শিবাই।

অবশেষে শুরু হয় চাঁদ বণিকের অভিযান। অনেক কিছু হারিয়েও শেষপর্যন্ত চাঁদ পাড়ি দেন সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে। তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে নাটককার লেখেন—

'আথালিপাথালি পড়ে দুরন্তসাগর
তারি মধ্যে স্থির থাকে চাঁদ সদাগর
পুত্র শোকে শীর্ণমুখ নিদ্রাহীন চোখে
লক্ষ্য পানে তবু চ্যায়া থাকে অপলকে'।।

প্রথম দিকে সফল হয় অভিযান। অনুপম এক দ্বীপের সন্ধান পায় নাবিকরা। কিন্তু অপর্যাপ্ত অর্থ পেয়ে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে সুরা এবং নারীর দুর্নিবার আকর্ষণে তারা হারিয়ে ফেলে পুনরায় পাড়ি দেবার আগ্রহ। আর ছুটে বেড়াতে মন নেই তাদের। নাবিকদের এই আচরণ যেন সার্থকতাকে সন্দেহ কি চোখে দেখে তারই ইঙ্গিত দেয়। একবার সফল হলে সমষ্টি থেকে যেতে চায় নিরাপদ সেই আশ্রয়ে। অপর্যাপ্ত অর্থ, সুরা, নারী পেয়ে সেটাকেই জীবনের মোক্ষ মনে করে তারা। আবার এই নাটকে যাত্রার শুরুতেই এমন অনুপম দ্বীপের সন্ধান অভিযান বন্ধ করার জন্য শাসক শ্রেণির কোন কূটচাল হওয়াও অসম্ভব,নয়। সত্যের জন্য, শিবের জন্য, আদর্শের জন্য চাঁদের অভিযান যাতে ব্যর্থ হয় তার জন্য হয়তো এত সহজে এই অনুপম দ্বীপে পৌঁছে যায় তারা। কিন্তু একক ব্যক্তি পাড়ি দিতে চান আরও গভীরে, আরও অজানায়। তাই চাঁদকেই আদর্শের কথা শুনিয়ে উদ্দীপ্ত করতে হয় নাবিকদের। বলতে হয় তাদের সকলকে নিয়ে তাঁর আশার কথা। পিতৃপুরুষের কাছে তাদের সকলের দায়ের কথা। এর উত্তরে নাবিকদের উচ্চারণের মধ্যে থেকেই যেন উঠে আসে সমসময়। প্রথম নাবিক বলে—'আমরাই কি কেবল বীরত্ব দেখাব? আর সবে নিরাপদ গৃহস্থলী বেছ্যে নিয়া শুধু আমাদের কর্তব্য ব্যাখ্যান কর‍্যে উপদেশ দিবে? আর কোন দায় নেই? দায় শুধু আমাদের?' অন্য কোন নাবিক বলে—'আমরা তো কল্পনা কর‍্যেছি যে আমাদের পাড়ি দিতে দেখ্যে চম্পকনগরী হতে আরো কত নবীন জুয়ান দূর সমুদ্র লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিবে। ... কিন্তু কই কিছু তো হল না। উপরন্তু আমরাই নিঃসঙ্গ হলাম। আজ আমরা নিঃসঙ্গ।' তৃতীয় কোন নাবিক এই কথারই সূত্র ধরে বলে—'আমরা যে

কী করে চল্যেচি,—বেঁচেছি না মর্যে গেছি, তারও কথা চম্পকনগরী এতটুকু ভাবে নাই'। উত্তরে চাঁদ যদিও গভীর বিশ্বাস থেকে বলেছিলেন—'ভেব্যেছে, ভেব্যেছে। দেশের অন্তর আমাদের কথা নিচ্চয় ভেব্যেছে।' কিন্তু চাঁদের এই আশ্বাস শান্ত করতে পারে না নাবিকদের। গভীর অভিমান আর ক্ষোভের সঙ্গে প্রথম নাবিক তাই বলে—'না ভাবে নাই, কোথায় ভেব্যেছে? যদি ভেব্যে থাকে তাইলে এ লবণাক্ত সমুদ্দুরে পানীয়ের তরে এতোটুকু মিঠাজল পাঠাবার কথা কেন কারো স্মরণ হলো না?'

আগেই বলা হয়েছে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক রচনার এই বিশেষ কালপর্বটিতে শম্ভু মিত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির বিশাল কর্মযজ্ঞে। এ যেন তাঁর জীবনেরও শেষ অভিযান। বহু বছর ধরে অন্য ধারার থিয়েটারের জন্য একটি নিজস্ব মঞ্চ চেয়েছিলেন তিনি। বহুবার চেষ্টার পর ১৯৬৮ পরবর্তী সময়ে এই ভাবনা কিছুটা রূপ পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সে আশাও নির্মূল হয়ে যায়। চাঁদের সঙ্গীর লবণাক্ত সমুদ্দুরে মিঠা জল না পাঠানোর উচ্চারণে শ্রী শঙ্খ ঘোষ খুঁজে পান ব্যক্তি শম্ভু মিত্রের অভিমানী একক স্বর। তাঁর মনে হয়েছে চাঁদের সঙ্গী নাবিকের এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে 'কারো কেন মনে হল না একটি জাতীয় নাটমঞ্চ বানিয়ে দেবার কথা'—[১১] ব্যক্তি শম্ভু মিত্রের এই অভিমানেরই প্রকাশ।

শেষপর্যন্ত নাবিকদের নিয়ে আবার পাড়ি দিলেন চাঁদ সদাগর কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। অন্ধকারের অভিশাপে কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল বাণিজ্যতরী। সকলেই ভয়ংকর সেই বিপদের মধ্যে অভিযানের নায়কের কাছে পথ জানতে চায়। কিন্তু চাঁদ বলেন 'শুধু উদ্দেশ্যটা জানি আমি। পথ তো জানে না কেউ।' স্বভাবতই নাবিকরা বিশ্বাস করে না চাঁদের কথা বরং তাকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, শঠ বলে। একমাত্র শিবদাস ছাড়া বাকি সকলেই অবিশ্বাস করে তাঁকে। শেষপর্যন্ত কালীদহে ডুবে যায় সপ্তডিঙা। মৃত্যু হয় চাঁদের সব সহযাত্রীর। শুধু একা একজন পরাজিত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকেন চাঁদ। আর অভিযানের এই ব্যর্থতাতেই শেষ হয় নাটকের প্রথম পর্ব।

নাটকের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় এর দীর্ঘদিন পর। এর মধ্যে জন্ম হয়েছে লখিন্দরের এবং ন্যাড়ার কথা থেকে জানা যায় সে এখন যুবক। আশাহীন-দিশাহীন এই সময়ে চাঁদ গৃহে ফিরে মুখোমুখি হন স্ত্রী সনকা এবং পুত্র লখিন্দরের। মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দর কোন পৃথক চরিত্র হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই নাটকে লখিন্দর নিজের পরিচয় অন্বেষণকারী একজন অনুভূতিশীল যুবক। নতুন সময়ের যৌবনকে যেন লখিন্দরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। সত্তরের দশকের পশ্চিমবাংলার সেই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে, যুবশক্তির রাজনৈতিক বিশ্বাস, নকশাল আন্দোলন, শাসকশ্রেণীর অত্যাচার এই সমস্ত কিছু লখিন্দরের মধ্যে দিয়েই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে নাটকে। অস্তিত্বের এই সংকট লখিন্দরকে সর্ব অর্থে একজন আধুনিক ও জটিল মানুষ করে তুলছে। এক বিপন্নতা ও অস্থিরতা যেন কাজ করে চলে তার মধ্যে। এতদিন যে বীর পিতার কথা লখিন্দর জেনে এসেছে আজ সর্বস্ব হারানো চাঁদের মধ্যে তাঁকে আর খুঁজে পায়না লখিন্দর। নিজের শিকড়ের অন্বেষণে সে চাঁদকে বলে—'তুমি কী? কে তুমি? মানুষের নিজের তো এট্টা কোন পরিচয় থাকা চাই। নাকি আমরা কেবল মুকুরের সামনে দাঁড়্যায়ে নানাবিধ ভূমিকায় অভিনয় কর্যে কর্যে যাব? শুধুই মুখোশ? মানুষের মুখ এই কোনো?'

পিতা-পুত্রের সম্পর্কের এই টানাপোড়েনের মধ্যেই পরবর্তী ঘটনাক্রমে প্রবেশ করে রাজনীতি। বেণীনন্দন ও কমলভাচার্য চাঁদ সদাগরের গৃহে আসেন নতুন এক সমীকরণ নিয়ে। বেণীনন্দন নতুন ময়ূরপঙ্খী বানিয়ে চাঁদের পুনর্বার পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করে দেবে আর তার বিনিময়ে চাঁদকে যোগ দিতে হবে বেণীনন্দনের পক্ষে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিপক্ষ দলের প্রতিনিধি রূপে করালী আর ভৈরব আসে। তারাও চাঁদ সদাগরকে নিতে চায় নিজেদের দলে। বেণীনন্দনকে তাড়িয়ে চম্পকনগরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে তারা আর সেজন্য চাঁদকে তাদের প্রয়োজন। খুব সূক্ষ্ম রাজনীতির খেলা এখানে দেখিয়েছেন নাটককার। লক্ষ্যপূরণের জন্য যে-কোনো পথই যে নেওয়া যায় সমকালীন রাজনীতির এই অন্তঃসারশূন্যতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। বেণীনন্দন এবং করালী উভয়পক্ষই চায় বিভিন্ন সভায়, জনমণ্ডপে চাঁদ তাদের হয়ে কথা বলুক। বিপক্ষ দলের কুৎসার কথা উচ্চারণ করুক। আর একটি ব্যাপার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুপক্ষই মনসার পূজার সঙ্গে যুক্ত করতে চায় চাঁদকে। এদের দুজনের কাছেই অবশ্য মনসার পূজা করাটা উদ্দেশ্য সফল করার একটা পন্থা মাত্র। ফলে নিজস্ব লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এইসব ছোটোখাটো মানসিক সংস্কার কাটিয়ে উঠতে বলে তারা। কিন্তু চাঁদ বণিক তো এ ধরনের কোন আপোষে বিশ্বাস করেননি কোনদিন। শিবাই-এর পথকেই তিনি একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেছেন। একথা স্পষ্ট যে 'চাঁদ তাঁর বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে কোন ফাঁক রাখতে চায় না, কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার তাঁকে অসৎ হতে ভণ্ড হতে বাধ্য করে। চাঁদের কোন প্রতিপক্ষ চায় না যে সে বিশ্বাসের দিক থেকে, আদর্শের দিক থেকে শিব বিশ্বাস ত্যাগ করে মনসা বিশ্বাসে আশ্রয় নিক'।[১৩] 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে এমন কোন দৃঢ় মানসিক সংযুক্তি নেই তাদের। বরং 'তারা শুধু চায়, যে ভণ্ডামিকে তারা অনুমোদনযোগ্য মনে করে চাঁদ সেই ভণ্ডামিরই আশ্রয় নিক'।[১৪]

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে-কোন পথ নেওয়া যায়, ছোটোখাটো মানসিক সংস্কার বলি দিতে হয়— দলবদলের এই সহজ পথ থেকে চাঁদ সদাগরকে সরিয়ে আনে নরহরি। এক আত্মসংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় তাঁকে। এই সাধারণ মানুষদের তুলনায় আদর্শবাদী চাঁদের কাছে যে সকলের প্রত্যাশা অনেক বড় সে কথা মনে করিয়ে দেয় চাঁদকে। নরহরি বলে—'তুমি তো কেবল তোমার নিজের নও। তুমি মানুষের কল্পনার। তোমার সে দায় তুমি মনে রেখো চন্দ্রধর সদাগর।' নরহরির এই কথা চাঁদকে যেন আবার তার সত্যের মুখোমুখি শিবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। চাঁদ বুঝতে পারেন শিবাই-এর পথই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। সেই সত্যের পথ থেকে সরে আসার কোন উপায় নেই তাঁর।

ইতিমধ্যেই চাঁদের কাছে আসে পূর্বের সেই ব্যর্থ অভিযাত্রী দলের সঙ্গী নাবিকদের পিতা ও অভিভাবকের দল। চাঁদের কাছে তাদের সন্তানদের সংবাদ নিতে আসার মধ্যে যে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা তাতে প্রশ্ন চিহ্ন লাগে যখন দেখা যায় বনমালীর নেতৃত্বে তারা এসেছে চাঁদের কাছে। 'বাণিজ্যে যত লাভ হয়্যাছিল সমস্ত একলা লুঠ করার উদ্দেশ্যে চাঁদ মেরে ফেলেছে ভবদাস, দক্ষদাস, রিভুপাল, শিবদাস—তার প্রাণাধিক প্রিয় এই সব সঙ্গীদের—এমন অপবাদ শুনতে হয় চাঁদকে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বনমালী প্রশ্ন করে—' ...একযোগে পাড়ি দিয়্যা তারা সব ডুব্যে গেল। আর সদাগর একেলা কী কর্যে বেঁচ্যে ফির্যে এল? বড়ো কৌশলের 'একযোগ' মনে হয় যেন। জয় হলে সবাকার,—তার মধ্যে নায়কের অবশ্যই বেশী অংশ,—আর মৃত্যু হলে শুধু অনুগামীদের।

নায়ক বাঁচিয়্যা থাকে কোনো এক নিগূঢ় প্রকারে? বাঃ, বারে বিচার কৌশল।' বনমালীর এই ধরনের মন্তব্য আর বৃদ্ধদেব কান্না কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয় চাঁদকে। ন্যাড়া তাঁকে অনেক বোঝায়, অনর্থক পাপ বোধে কষ্ট পেতে নিষেধ করে কিন্তু চাঁদের মনে হয় জয়ের কথা বলেই তো তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন সকলকে। এক আত্মসমালোচনায় চাঁদ বণিক দগ্ধ করেন নিজেকে। তিনি কি 'নিজেরে নিজের চ্যায়া বড়ো কর্যে দেখাবার' জন্য সকলকে বলেছিলেন নিশ্চিত জয়ের কথা—এমন প্রশ্ন তাঁকে অস্থির করে তোলে। এমনই সে আত্মগ্লানি যে নাটকে এই একটিমাত্র সময়ে চাঁদ সদাগর আত্মহননের কথা বলেন। চিরকাল সত্যের পূজারী, আলোর পূজারী চাঁদ বলেন—'...সেই এট্টা পথ আছে।—না হয় তো বেণী কিংবা করালীর কথা শুন্যা মনসার পূজা দিয়্যা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেত্যে পারি। আরো এট্টা পথ,—আত্মহননের। আর কী উপায় আছে বল?' চাঁদের এই কথার পরে অন্ধকারই নেমে এসেছিল চতুর্দিকে। এ শুধু মঞ্চের অন্ধকার নয়, এ যেন জীবনানন্দের কবিতার সেই 'অদ্ভুত আঁধার' যা প্রায় গ্রাস করে নিয়েছিল এই নাটকের সমস্ত আলোকে। সনকা ও পুরনারীদের মনসার পূজা নিয়ে প্রবেশ। মনসার স্তবে 'আলোতে আবিল চক্ষু করো অন্ধকার' উচ্চারণ;—এই সমস্ত আঁধার কিন্তু সরে যায় যখন লখিন্দর হঠাৎই এসে পিতাকে আবার 'পাড়ি' দিতে বলে। প্রাথমিকভাবে তাঁকে বুঝতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত চাঁদের যন্ত্রণাকে স্পর্শ করতে পারে সে। বুঝতে পারে 'পাড়ি' দেওয়া ছাড়া তার পিতার জীবনে আর উপায় নেই কোনো। আশৈশব কল্পনার এই বীর পিতাকে লখিন্দর বলে—'...পাড়ি দেও পিতা, আমি অনুচর হয়্যা সাথে সাথে যাব। আমারে তোমার অনুচর কর্যা নেও পিতা।' লখিন্দরের এই কথায় চাঁদ যেন ফিরে পান তার সমস্ত অতীত। উদ্দীপিত হয়ে নিজের ভাঙা জীবনের উপর লখিন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি। সমস্ত সম্পত্তি বেচে নৌকা গড়ে লখিন্দরকে 'সমুদ্দুরে' 'পাড়ি' দেওয়াবেন তিনি। তাতে ব্যক্তি চাঁদ সদাগর হয়ত দেউলিয়া হয়ে যাবেন কিন্তু চম্পকনগরীর ভবিষ্যৎ হবে সুস্থ, মুক্ত, অনর্গল। আর সেই ভবিষ্যতের আশায় চাঁদ তাঁর সমস্ত কিছুর বিনিময়ে পুত্রের সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করতে শুরু করেন।

শম্ভু মিত্রের জীবনের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনার প্রক্ষেপ দুর্লক্ষ্য নয়। অন্য ধারার থিয়েটারের একটি নিজস্ব মঞ্চের জন্য তাঁর যে ভাবনা-চিন্তা দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পরেও তা যখন সম্ভব হল না তখন তাঁর মনে হয়েছিল প্রায় এমন কথাই। তাঁকে কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন অভিনয় করিয়ে টাকা তুলতে বলেছিলেন তিনি, যাতে ভবিষ্যতে একটা মঞ্চ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ততদিনে হয়তো ব্যক্তি শম্ভু মিত্র থাকবেন না কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। থিয়েটারের তো একটা নিজস্ব ঠিকানা হবে।[৮]—'সেদিন আমারে যদি ভুল্যে যায় লোকে, যাক ভুল্যে যাক। নতুন যে বীর হবি তারি পথে জয়ধ্বনি দিয়্যা আনন্দে উন্নত হোক চম্পকনগরী। আমি কিছু চাইনেক। শুধু হোক। শুধু সেই ভবিষ্যৎ সত্য হোক।'

পুত্রকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রার এই আবেগমথিত উচ্চারণের পরেই সূত্রধর গান ধরে—

> হায় হায় হায় রে বণিক, এই তব শিবের বন্দনা।
> ঘর যায় বন্ধু যায়
> জীবন যৌবন যায়
> একমাত্র আশা থাকে ভবিষ্য কল্পনা?

বোঝা যায় লখিন্দরের পাড়ি দেবার ভবিষ্য কল্পনাই চাঁদের একমাত্র এবং শেষ আশ্রয়, আর সেই আশ্রয়টুকু নিয়েই শুরু হয় নাটকের তৃতীয় পর্ব।

নাটকের তৃতীয় পর্বে নিজের সর্বস্ব দিয়ে চাঁদ তাঁর পুত্র লখিন্দরের জন্য সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করেন। সূত্রধার-এর গান থেকে জানা যায় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা চাঁদকে বাধা দেন দারিদ্র্যের কথা বলে। আর সনকা মনে করে সবকিছু কেড়ে নিয়েও চাঁদের আকাঙ্ক্ষা মেটেনি, এখন আবার তার একমাত্র আশা লখিন্দরকেও 'ফুসলায়্যা' সাগরে পাঠাতে আগ্রহ তাঁর। কিন্তু চাঁদ মনে মনে ভাবেন—

'চাঁদ ভাবে মনে মনে এ ছাড়া তো আর কোনো
পথ নাই পথ নাই
ভবিষ্যে বঞ্চনা কর‍্যে কেবল বাঁচ্যাব মোহে
এ হেন বাঁচ্যায় কোনো ন্যায় নাই ন্যায় নাই।'

চাঁদের সর্বস্ব দিয়ে তৈরি হয় লখিন্দরের মনের মত নৌকা। কিন্তু চাঁদের সংকল্প 'পাড়ি দেওনের পূর্বে লখ্যায়ের বিয়্যা দেয়্যা চাই।' সনকার স্বপ্নাদেশ অগ্রাহ্য করে সায় বণিকের কন্যা বেহুলা সুন্দরীর সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ দেন চাঁদ সদাগর। এর পরেই মনসার হিংস্র অনুরাগীদের লখিন্দর হত্যার ষড়যন্ত্র অসাধারণ দক্ষতায় দেখান নাটককার। এখানেই বুঝি ধর্ম আর রাজনীতি সবচেয়ে কাছাকাছি এসে পরস্পরের হাত ধরে। সত্তরের দশকের সমকালীন সময় যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাথায় মনসার ঘটের মত সর্পলাঞ্ছিত শিরস্ত্রাণ পরা একটি যুবকের প্রশ্নের উত্তরে অন্যজন জানায় লখিন্দরের অভিযানের সবকটি নৌকায় 'ফুট্যা' করে দেওয়া হয়েছে অথবা 'ফেড়্যে' দেওয়া হয়েছে। তাই সমুদ্রে পৌঁছানোর আগেই লখিন্দরের বৈতরিণী পার নিশ্চিত। অর্থের বিনিময়েই হয় এই সব কিছু। কাজ হলে আরও অর্থ বিনিময়ের অঙ্গীকারও হয়। এরই মধ্যে আসে তারাপতি কর্মকার। লখিন্দরের বাসরঘরে ছিদ্র করে রাখার দায়িত্ব ছিল তার। তাকে দিয়ে জোর করে ভয় দেখিয়ে এ কাজ করানো হয়েছে। কিন্তু বাধ্য হয়ে একাজ করলেও তারাপতি কর্মকারের অধিকার নেই অর্থ না নিয়ে চলে যাবার। 'গাঙুরের তীরে যুবকের মৃতদেহ' অথবা 'বিয়্যাযোগ্যা কন্যা এক আছে না তোমার সাবধানে চলো'—যেন একেবারে সমকালীন খবরের কাগজের শিরোনাম থেকে নেওয়া। এতটাই সমকাল নিষ্ঠা দেখান নাট্যকার। শুধুমাত্র গাঙুরের বদলে সেখানে অন্য কোন নদীর নাম থাকে। এই ধরনের উক্তি একদিকে যেমন তারাপতি কর্মকারকে অর্থ নিতে বাধ্য করে তেমনই '৭০-এর দশকের সমকালীন অরাজকতাকেও নির্মাণ করে দেয়।

যুবকদের প্রস্থানের পরেই লখিন্দর আর বেহুলা উঠে আসে সাতালি পর্বতের উপর। লোহার বাসরঘরে যাবে তারা। 'আজ রাতে যদি স্বাতী তারকার একবিন্দু জল ঝর‍্যে পড়ে আমাদের মুহূর্তের শুক্তির উপরে, তাইলে জীবন-মুক্তাবুরী হবে'—এমনই আকাঙ্ক্ষা লখিন্দরের। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় সে বেহুলার কাছে। বেহুলাকে রেখে লখিন্দর বাসর ঘর দেখে আসতে গেলে সনকা আসে বেহুলার কাছে। ছায়ামূর্তির মত তার কাছে গিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়—'আজ রাতে কথা দেও আমার নিকটে, আমৃত্যু সর্বদা তুমি তার কাছাকাছি রবে। যদি কোনো সর্বনাশ আসে নিজের জীবন দিয়্যা তুমি তারে আগুল্যে বাঁচ্যাবে।

কথা দেও।' সনকাকে দেওয়া বেহুলার এই প্রতিশ্রুতি কোথায় যেন নাটকের পরবর্তী গতিপথেরও নির্দেশ দেয়। লখিন্দর আর বেহুলা বাসরের উদ্দেশ্যে রওনা হবার ফাঁকে ফাঁকেই নাটককার গড়ে চলেন সত্তরের দশকের সেই উত্তাল সময়ের রূপরেখা। যুবকের দল অন্য দলের দুজন যুবককে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে নিয়ে যায়—বোঝা যায় খুন করবার জন্য—সমকালীন হিংস্র রাজনীতির সূত্র ধরে আসে এইসব দৃশ্য। 'গাঙুরের তীরে যুবকের মৃতদেহ'—সমসময়কেই যেন চিহ্নিত করে। চক্রান্তের নতুন নতুন সূত্র উদ্‌ঘাটিত হয়।

আরো এক দম্পতি রাত জেগে সাম্তালি পর্বতের চূড়ায়। পুত্রের মঙ্গলকামনায় বাসর রাতে পাহারা দেন তারা। এই দৃশ্যে চাঁদ ও সনকার কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয় তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন। চাঁদের প্রতি সনকার সংলাপে তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশিত হলেও কোথায় যেন তার অন্তরের টানটুকুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর চাঁদ বোধহয় শুধু সনকার কাছেই এমন অকপট—'ক্ষমতায় কুলাল না। এতো দ্বন্দ্বে বাহিরে অন্দরে—, চাঁদ ভেস্যা গেল।' এর ঠিক বিপরীতে বেহুলা ও লখিন্দরের 'ভালবাসার আশ্রয়ে এক ক্ষণস্থায়ী ইতিবাচক মূল্য'[১৪] গড়ে ওঠে নাটকে। কিন্তু তাদের ভালবাসার উচ্চারণকে ঢেকে দিয়ে আবার শোনা যায় মাতালের কলরব, একটা নারীর জন্য তাদের কামনা আর তারই সঙ্গে এই পানোন্মত্ত যুবকরাই স্তব করে মনসার। এরই মাঝে যুবকের দল নিয়ে আসে ডরিলকে। লোহার বাসরঘরে তারাপতি কর্মকারের করে রাখা ফুটোর ভিতর দিয়ে কালনাগিনী প্রবেশের দায়িত্ব তার। লখিন্দর যখন বেহুলাকে নতুন এক ভালবাসার পাঠ শোনায় আর সনকা যখন চাঁদকে শেষবার ভালবাসতে বলে ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ধর্ম আর রাজনীতি মিশে কালসর্পের রূপ ধরে দংশন করে লখিন্দরকে। প্রবল বিষে নীল হয়ে মৃত্যু হয় তার।

বেহুলার আর্তনাদে ছুটে যায় সনকা। উন্মাদিনীর মতই অভিশাপ দেয় তাকে। এই সমস্ত বিভ্রান্তির মাঝেই ন্যাড়া কলার মান্দাস প্রস্তুত করে লখিন্দরেক শোয়ায়, চাঁদের হাত ধরে লখিন্দরের মুখে স্পর্শ করায় এবং তারপর বেহুলা তার স্বামীকে নিয়ে ভেসে যায় গাঙুরের জলে। আর বেহুলার এই ভেসে যাওয়ার মধ্যেই শেষ হয় এই নাটকের তৃতীয় পর্বের প্রথম অংশটি।

তৃতীয় পর্বের শেষাংশে এক নিঃস্ব রিক্ত ট্র্যাজিক নায়কের সাক্ষাৎ পাই আমরা। এই নাটকের পর্ববিভাগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়, প্রথম পর্বে চাঁদের যৌবন, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর প্রৌঢ়ত্ব আর তৃতীয় পর্বে চাঁদের বার্ধক্য যেন দেখান নাটককার। তবে তৃতীয় পর্বের এই শেষাংশটিতে লখিন্দরের মৃত্যু, সেই মৃতদেহ নিয়ে বেহুলার ভেসে যাওয়া, সনকার পাগল হয়ে যাওয়া—এই সমস্ত আঘাতে চাঁদ প্রায় উন্মাদ। তাঁর আচার-আচরণ অসংলগ্ন। সর্বব্যাপ্ত পরাজয়ে চাঁদ যেন এক ভগ্নস্তূপ 'যার সঙ্গে সমকালীন জীবন প্রবাহের কোন সংযোগ নেই, সমকালীন মানুষ বরং তাকে উন্মাদ বলে মনে করে। বরং তার অতীত সম্পর্কে কৌতূহল আছে অ্যাকাডেমিশিয়ানের।'[১৫] যদিও চাঁদের জীবনী রচনার প্রসঙ্গটি সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের চেহারা নেয়। এরপর কি নিয়ে বেঁচে থাকবেন চাঁদ? শেষ আশ্রয়টুকুর পরেও শেষতম কোন আশ্রয় কি খুঁজে পাবেন তিনি? উন্মাদ প্রায় চাঁদকে আগলে রাখে ন্যাড়া। রক্ষা করে অন্যদের হাত থেকে। চাঁদকে অন্ন জোগায়, তার ক্ষত নিরাময় করে। এরই ফাঁকে জুড়িয়া গায়—

শিব তারে বাঁচালো না
সদুদ্দেশ্য বাঁচালো না
আপন কর্মের প্রতি নিষ্ঠা তারে বাঁচালো না
শেষমাত্র আশা ছিল ভবিষ্য কল্পনা
বিধাতার পরিহাসে তাও তারে বাঁচালো না
কোথা যে কী ভুল হোল জানে না আবর
এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর।।
এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর।।

'চাঁদ আছে স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতার সংযোগস্থলে'[৬৭]-একথা মনে রাখতে বলছেন প্রখ্যাত সমালোচক। 'একা থাকলেই তার কাছে ছুটে আসে অন্ধকারের জীব, যারা একটু দোল দেওয়ার পরামর্শ দেয়, যাতে চাঁদ পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। এই দুই চরিত্র উঠে আসছে চাঁদেরই আন্তর অন্ধকার থেকে, যাকে আমরা হ্যালুসিনেশন বলতে পারি।'[৬৮] সত্যিই কি হ্যালুসিনেশন থেকে গড়ে উঠেছিল ঐ দুই অন্ধকারের জীব? ভুললে চলবে না ঐ দুই জীব 'স্ত্রীকণ্ঠে' কথা বলে এবং তারা 'অন্ধকারের জীব'। যে অন্ধকার এই নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনসার প্রতীক। তাই ঐ দুই অন্ধকারের জীব চাঁদেরই অচেতন থেকে গড়ে ওঠা নাকি চাঁদকে উন্মাদ করে দেওয়ার জন্য মনসারই কোন কূটচাল সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাদের সংলাপ থেকে একথা স্পষ্ট যে তারা পাগল করে দিতে চায় চাঁদকে। চাঁদ যেন নিজেকে 'সজ্ঞান রাখনের চেষ্টা ছেড়্যে দেয়'—সে বিষয়েই সমস্ত আগ্রহ তাদের। ভেবে দেখা যেতে পারে চাঁদ নিজেকে সজ্ঞান রাখার চেষ্টা ছেড়ে দিলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে কার? বৃদ্ধ, প্রেতসম, উন্মাদ প্রায় চাঁদও কার প্রতিস্পর্ধী হতে পারে?

দুই বৃদ্ধের উক্তি থেকে দেশের অরাজকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যায় নীতি বলে কিছু নেই। 'কালসন্ধ্যা'-র দুই বৃদ্ধের অনুষঙ্গ কি মনে পড়বে আমাদের? এরই মাঝে ভুলুয়া সর্দারের কাছে পাওয়া যায় বেহুলার খোঁজ। সে যে স্বৈরিণী হয়েছে এমন ইঙ্গিতও মেলে। সকলেই চাঁদের কাছে জানতে চায় কেন তিনি যেতে দিয়েছিলেন বেহুলাকে? বেণীনন্দনের কণ্ঠে শোনা যায় 'কোন্ যুক্তিবলে যুবতী বহুড়ীট্যারে একা ছেড়্যে দিলে? একে নারী, তায় যুবতী বয়সী, জানো নাকো পথে পথে কতো শঙ্কা আছে? আর নিজে ঘরে বস্যা ন্যাড়ার অর্জিত অন্ন খ্যায়া মনে মনে আশা করো যে মেয়েট্যা ফির‍্যে এস্যা তোমার আদর্শট্যারে সার্থকতা দিবে। যৌবনে যে চাঁদ ভুল পথে গিয়েছিল, স্পর্ধা করে পাড়ি দেওয়ার নামে বীরের মুখোশ পরেছিল, সব কিছু মনসার নিয়মের বশে হয় জেনেও 'আমি' বলে একটি পরিচয় তৈরি করতে চেয়েছিল—সেটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ চাঁদের। সেখানটাতেই তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ।

বেহুলা অবশ্য ফিরে আসে লখিন্দরের জীবনের আশ্বাস নিয়ে। তবে চাঁদ মনসার পূজা দিলে তবেই লখিন্দর প্রাণে বাঁচবে। আর অস্বীকার করলে ভিত্তিতেই মারা যাবে সে। কিন্তু নিজের সম্ভ্রমের বিনিময়ে লখিন্দরের জীবনের আশ্বাসটুকু পেলেও আকাশের মত বড় হয়ে বেহুলা চাঁদ বণিককে বলতে পারে—'বেহুলার আধখানা মন কয়, আমার যা হয় হোক পূজা তুমি দিও না শ্বশুর। যতো কষ্ট কর‍্যা থাকি আমি—সমস্ত বিফলে যাক, তবু সম্মান তো তোমাদের।...সিদ্ধান্ত

তোমার।' তাহলে বেহুলা কী নিন্দনের অথবা সেই সব অন্ধকারের জীবেদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে বেহুলা ফিরে এসে চাঁদের আদর্শকেই সার্থকতা দিতে চাইল তো? আর এই উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই বেহুলা পুরাণ ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে কোন এক অনাগত অথচ আশার ভবিষ্যতে। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার এমন কোন উক্তি আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু এই নাটকে বেহুলা, লখিন্দরের মতো '৭০ দশকের যুব-শক্তির আর এক প্রতিনিধি। তাই সে চাঁদকে বলতে পারে না আদর্শ ত্যাগ করার কথা। বলতে পারে না আত্মসমর্পণের কথা। বেহুলা জানায় কিভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতার কামোৎসুক চোখের সামনে অশ্লীল নাচ নাচতে হয়েছে তাকে। 'আর সেই নাচের ভিতর দিয়ে সায়-বণিকের কন্যা, সেই যে বেহুলা—তুমি যারে দেখ্যেছিলে বিবাহের দিনে, সে বেহুলা মর্যে গেল।' কিন্তু এত কিছুর পরেও, লখিন্দরের প্রাণের বিনিময়েও বেহুলার আধখানা মন চায় না চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দিন। 'শিবাই'-এর পথ ছেড়ে, নিজের এতদিনের আদর্শ ছেড়ে মনসার অন্ধকার পথে যেতে বাধ্য হবে চাঁদ—এমনটা চায় না বেহুলা।

কিন্তু বেহুলার কথা শুনে চাঁদ সদাগর অবশ্য মনসাকে পূজা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এমন এক সিদ্ধান্ত নিতে স্বভাবতই অসম্ভব এক যন্ত্রণা হয় চাঁদের, তবু শিবের খেলা শেষাবধি 'খেল্যে' যাবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বেহুলাকে বলেন চাঁদ 'জীবনের থিক্যা অন্ধ কথ্যা-কথ্যা শিবাইয়ে পৌঁছাতে চাই, সেথা শিবাই মেলে না, আর শিবায়ের থিক্যা অন্ধ কথ্যা কথ্যা জীবন পৌঁছতে চাই, দেখি জীবন মেলে না।' কিন্তু মনসার পূজার উপকরণ তো জানা নেই তাঁর। তাই চাঁদ বলেন—'আমি বেলপাতা দিয়্যা পূজা দিব।...শিব, তোর খেলা আমি শেষাবধি খেল্যে যাব। আমি বেলপাতা দিয়া মনসার পূজা দিব।' নাটকে মনে হয় এও এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। শিবপূজার উপকরণ দিয়েই মনসার পূজা দেবেন চাঁদ। তাঁর কাছে তো নিজের আদর্শ ভিন্ন কোন নতুন পথ নেই। শিবানুগামী রূপে নিজের আমিত্বকে, নিজের আদর্শকে এভাবেই বাঁচিয়ে রাখতে চান তিনি।

লখিন্দর এলে বেহুলা জানায় চাঁদের মনসাকে পূজা দিতে যাবার কথা, জানায় তেত্রিশ কোটি দেবতার চোখের সমুখে তার লাস্য নৃত্যের কথা। বেহুলার প্রশ্ন এসব জেনেও লখিন্দরের পক্ষে তাকে নিয়ে আর ঘর করা সম্ভব কিনা। এই প্রশ্ন মনসামঙ্গল কাব্যে ওঠেনি কারণ সেখানে বেহুলা কোন স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু শম্ভু মিত্রের নাটকে বেহুলা সত্তরের দশকের এক আত্মমর্যাদা পূর্ণ নারী। তাই নিজের সম্মান ও মর্যাদা বাঁচিয়ে স্বামীর ঘর করবে সে। জানতে চাইবে স্বামীর সিদ্ধান্ত। এমনটাই তো স্বাভাবিক।

আর লখিন্দর? সত্তরের দশকের সেই উত্তাল সময়ের যুবশক্তির প্রতীক। সে জানে কোন্ পরিস্থিতিতে কেন বেহুলাকে এ পথ নিতে হয়েছে। তাই বেহুলাকে ভালবাসতে কোন দ্বিধা নেই তার। কিন্তু যে চাঁদ সদাগর কোনও প্রলোভনে অথবা কোনও ভয়ে কখনও শিবাই-এর পথ ত্যাগ করেননি, কখনও আদর্শের পথ, আলোর পথ ছেড়ে মনসার অন্ধকার পথ গ্রহণ করেন নি—তাঁকে আজ লখিন্দরের প্রাণের জন্য মনসার পূজা দিতে হচ্ছে। তার পরেও কিভাবে লখিন্দরের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব? তাই লখিন্দর বলে—'আমার কারণে মোর পিতা মনসার পূজা দিল। তার পাছে সসম্মানে বেঁচ্যে রব আমি? মনসার দোরে যায়্যা অসম্মান ভিক্ষা কর্যা তুমি বাঁচালে আমারে, তার পরে নিজে মর্যে গেলে। সেই জ্ঞান শিহরে বহন কর্যা খুশি মনে বেঁচ্যে রব আমি?'

শেষ পর্যন্ত বেহুলা আর লখিন্দর আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। বাসর রাত্রে একবার তাদের দুজনের ভালবাসায় মরে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল; লখিন্দরকে 'বাঁচিয়ে' আনার এই দিনেও তারা চাইল ভালবেসে মরে যেতে। বেহুলার আনা বিষের কৌটো থেকে লখিন্দর 'জনম এয়োতি' বেহুলাকে আগে বিষ দেয়। তারপর নিজে বিষ খেয়ে 'এত কেন ভালবেস্যেছিলরে আমায়?' বলতে বলতে মৃত্যুর আচ্ছাদন টেনে দেয়।

মনসার পূজা সমাপ্ত করে চাঁদ ফিরে দেখেন মৃত্যু হয়েছে বেহুলা লখিন্দরের। যুগলে আত্মহত্যা করেছে তারা। এখানে নাটককার শম্ভু মিত্র সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যান মনসামঙ্গলের অতি পরিচিত কাহিনী থেকে। মূল আখ্যানে মনসার পূজা দেবার পরে চাঁদ ফিরে পেয়েছিলেন সব কিছু। ফিরে পেয়েছিলেন সপ্তডিঙা-ছয়পুত্রের জীবন এবং লখিন্দরের প্রাণ। কিন্তু পুরাণের মাহাত্ম্য প্রচারের কোন দায় আধুনিক এই নাটককারের নেই বরং মনসার পূজা দিলেও যে সবকিছু পাওয়া যায় না এমন ইঙ্গিত রয়েছে নাটকের শেষে। মনসাকে অসত্য প্রমাণের জন্যই যেন মৃত্যু ঘটে বেহুলা লখিন্দরের। বেহুলা জানিয়েছিল চাঁদ সদাগরকে—'সন্তান তোমার মাটিতে পা দেওনের অধিকার পাবে, বেঁচ্যে রবে তোমাদের সাথে, যদি—মনসার পূজা দেও তুমি, এই এট্টা শর্ত আছে।—যদি অস্বীকার যাও, সন্তান তোমার ডিঙিতেই মর‍্যা যাবে।' কিন্তু সে শর্ত তো পালন করলেন চাঁদ। এক ভয়ঙ্করের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে পূজা দিলেন অন্ধকারের দেবী মনসার। কিন্তু সে পূজাও তো বাঁচাতে পারল না লখিন্দরকে। ব্যর্থ হল মনসার পূজা। মঙ্গলকাব্যের মিথ ভেঙে বেরিয়ে এলেন নাটককার।

মনসার কাছে হাঁটু গেড়ে মাথা নীচু করে পূজা দেবার পরেও ফিরে যখন চাঁদ দেখলেন মৃত্যু হয়েছে বেহুলা লখিন্দরের তখন বুকের পাঁজর পুড়িয়ে চাঁদ উচ্চারণ করেন—এট্যাও বিফলে গেল। পূজা দেওয়া হল। তবু যেন পূজা দেওয়া হয় নাই। পাড়ি দিয়্যেছিনু, তবু যেন পাড়ি দেওয়া হয় নাই। ঘর বেন্ধেছিনু, তবু যেন ঘর বান্ধা হয় নাই।—তুমি তো উলঙ্গ শিব তাই মোরে বুঝি উলঙ্গ করাতে চাও? চাঁদ বণিকের সব পরিচয়—যেন জলের আল্পনা? সব মুছে দিতি চাও? দেও। মারো তুমি। মের‍্যে পিষ্যে ফেলো।' কিন্তু সত্যিই কি বেহুলা লখিন্দরের আত্মহত্যায় বা চাঁদের এই হাহাকারে শেষ হয় নাটক? নাকি তাদের এই মৃত্যু কোথায় যেন চাঁদের সংগ্রামকেই জারি রেখে দেয়? তাই কি শেষ পর্যন্ত চাঁদ আবার সেই অতীতের পাড়ি দেওয়ার উপর বিশ্বাস বেসে, কালীদহে ডুবে যাওয়া সেই সব সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে জীবন জোড়া এক পাড়ি দেবার কথা বলেন? 'শিবদাস, ভবদেব, দক্ষদাস—একদিন তোরা পাড়ি দেওয়্যাট্যায় বিশ্বাস তো বেস্যেছিলি। সেইটুকু পরিচয় তোদের আমার। আয় উঠ্যা আয়, সাগরের তল থিক্যা ফির উঠ্যা আয়। দাঁড়গুল্যা হাতে তুল্যে নেরে। পুনারায় পড়ি দিতে হবে। আমরা কজনা প্রেতের মতন চিরকাল পাড়ি দিয়্যা যাব।...নোঙর তো কেট্যে দেছে শিব।—এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও—পাড়ি দেও—।'

'এ যেন চিরকালের সেই নাবিক, চিরপরিচিত। যে কেবলই জল মেপে যায় আর পাড়ি দিয়ে চলে। যার অবস্থিতি সর্বযুগে সর্বত্র।'[১৭] চাঁদের এই পাড়ি টেনিসনের এনক আর্ডেন-এর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে মৃণাল সেনকে। তিনি বলেছেন—'টেনিসনের এনক আর্ডেন-এর কথা মনে পড়ে, যার মাথা ছিল উঁচু, সে পরোয়া করতো না কাউকেই। এ যেন সেই এনক আর্ডেন

যে ফিরে এলো বহুযুগ পরে, যেন মৃত্যুর ওপার থেকে, সর্বস্বান্ত হয়ে। এ যেন সেই নাবিক যার মাথা আজ হেঁট হয়ে গেছে। যাকে আজ কেউ পরোয়া করে না। সারা রাত সে আজ প্রলাপ বকে এবং হঠাৎ, হঠাৎ-ই, এক সময়ে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে A Sail, a sail... পাড়ি দেও... পাড়ি দেও...।"[১৭] কিন্তু শম্ভু মিত্রের নাটকে চাঁদের যে শেষ পাড়ির ডাক তাকে কি 'প্রলাপ' বলে মনে হয় আমাদের? নাকি তাঁর সারাটা জীবন ব্যাপী লড়াই-এরই আর এব extension?

এমনটা মনে হয় চাঁদের প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতায়। এই নাটকে লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছে দুবার। কিন্তু প্রাণাধিক লখাইকে হারিয়ে চাঁদের হাহাকার কি প্রতিক্ষেত্রে একইরকম দেখি আমরা? প্রথমবার, পাড়ি দেবার প্রাক্কালে, বাসররাতে, সর্পবিষে যখন মৃত্যু হয়েছিল লখিন্দরের তখন সেই আঘাতের পর চাঁদ হয়ে উঠেছিলেন অপ্রকৃতিস্থ। উন্মাদপ্রায় এক ট্র্যাজিক নায়কের অসংলগ্নতা দেখেছিলাম আমরা কিন্তু নাটকের একেবারে অন্তিমে মনসার শর্ত মেনে নিয়ে পুত্রের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পূজা দেবার শেষে চাঁদ যখন দেখলেন সে পূজা বিফলে গেছে—মৃত্যু হয়েছে লখিন্দর বেহুলার তখন কি পূর্বেকার অপ্রকৃতিস্থতা আর দেখা যায় চাঁদের আচরণে? এবারের আঘাতও অপরিসীম কিন্তু এরপরে তো চাঁদ আবার পাড়ি দেবার কথা বলেন। কালীদহে ডুবে যাওয়া সঙ্গীদের আবার ডাক দেন পাড়ির উদ্দেশ্যে। চাঁদ সদাগরের এই প্রতিক্রিয়া কোথায় যেন অন্য ভাবনাকে উসকে দেয়। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দিয়ে ফিরে পেয়েছিলেন সবকিছু। কিন্তু শম্ভু মিত্রের নাটকে এমনটা ঘটে না। মনসার পূজা দেওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু ঘটে বেহুলা লখিন্দরের। মনসামঙ্গলে ঊষা-অনিরুদ্ধ তাঁদের কাজ সমাপ্ত করে ফিরে গিয়েছিলেন স্বর্গে। বলা যায় সেই মিথকেই যেন বেহুলা-লখিন্দরের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সমকালকে জড়িয়ে নিয়ে নতুন এক ব্যাখ্যা দিলেন নাটককার। প্রশ্ন জাগে নাটকের এই চাঁদ সদাগর কি আদৌ চেয়েছিলেন মনসার বদান্যতা? নাকি বেহুলা-লখিন্দরের মৃত্যু দিয়েই মিথ্যে প্রমাণ করা গেল মনসাকে। ভেঙে গেল প্রচলিত মিথ। মনসার এই পরাজয় কি আসলে চাঁদের—বেহুলার এবং লখিন্দরের জয় নয়? একথা সত্য মৃত্যু হয়েছে বেহুলা-লখিন্দরের কিন্তু এবারের মৃত্যু তো সর্পবিষে নয়; ধর্ম আর রাজনীতি মিলে কালসর্পের রূপ ধরে ছোবল মেরেছিল প্রথমবার আর এইবার ভালবাসা আর আদর্শবাদ মিলে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া—আর সে আদর্শ তো চাঁদের থেকেই পাওয়া। তাই কি প্রথমবার সর্পবিষে লখিন্দরের মৃত্যু ছিন্নভিন্ন অপ্রকৃতিস্থ করে দেয় চাঁদকে। মনসার কাছে সর্বাত্মক পরাজয় বলে মনে হয় তাঁর এই পরিণতিকে আর দ্বিতীয়বার বেহুলা-লখিন্দরের স্বেচ্ছামৃত্যু কোথাও মনসাকেই হারিয়ে দেয়। মনসাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। আর তাই বুঝি যুগল এই আত্মহত্যায় শেষ হয় না নাটক। চাঁদ তাঁর শেষ সংলাপে উচ্চারণ করেন 'এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও।—পাড়ি দেও।'

সর্পবিষ লখিন্দরের মৃত্যুর পর ভগ্নস্তূপসম চাঁদের যে আচরণ তাই দিয়ে কি আদৌ বিচার করা যায় স্বেচ্ছায় বিষপানের পর বেহুলা-লখিন্দরের মৃত্যুর পরবর্তী চাঁদকে। আপন সময়ের প্রতি অসীম এক আনুগত্যে শম্ভু মিত্র ভয়ংকরের মুখোমুখি দাঁড় করালেন চাঁদ বণিককে। মাথা নীচু করে মনসার পূজা দিতে হল তাঁকে। কিন্তু সেই ভয়ংকরকে পেরিয়ে তো আবার পাড়ি

দেবার ডাক দিলেন চাঁদ। সঙ্গী মৃত নাবিকেরা। মৃত্যু ঘটেছে ভবিষ্য কল্পনা লখিন্দরের। কিন্তু তাতে কী? জীবন জোড়া এই পাড়িতে চাঁদ বণিক তো আসলে একাই। প্রথম বারেও তো শিবদাস ছাড়া আর কেউ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি তাঁকে। তখনই নিশ্চয়ই চাঁদ বুঝেছিলেন যে আসলে তিনি সংখ্যালঘু। একই সময়ে লেখা গল্পের অনিল রায় বা জলধিদার মত 'in the minority'.

একাকিত্বের এই প্রশ্নে শম্ভু ঘোষের মনে পড়েছিল হার্মান উল্ডের 'দি ডিস্‌কভারি' নাটকের কলম্বাসের কথা। আর তারই অনুষঙ্গে ড. স্টকম্যান অথবা ড. পূর্ণেন্দু গুহর শেষ উচ্চারণ। আর এই উচ্চারণেই টেনিসন, হার্মান উল্ড, ইবসেন, শম্ভু মিত্র এবং এনক আর্ডেন, কলম্বাস, ড. স্টকম্যান, পূর্ণেন্দু গুহ অথবা চাঁদ সদাগর কোথায় যেন একই সূত্রে গ্রথীত হয়ে যান। আর তখনই চাঁদ বণিকের পালা মঙ্গলকাব্যের মোড়কে আমাদের সমসাময়িক কালের কাব্য হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে অবিশ্রান্ত জীবনের এক অসামান্য দর্শন।

চাঁদ সদাগরও আর শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্যের চরিত্র হয়ে থাকেন না। হয়ে ওঠেন আধুনিক মানুষের এক প্রতিভূ। একক মানুষের যন্ত্রণা রূপ পায় তাঁর চরিত্রের মধ্যে। আর সেখানেই চাঁদের লড়াই, তাঁর একাকীত্ব কখন যেন তাঁর স্রষ্টার জীবনের সংকট-সংগ্রাম-বিপন্নতার সঙ্গে মিলে যায়। সমালোচকের কতামতো এ নাটককে সম্পূর্ণভাবে আত্মজীবনী বলা না গেলেও চাঁদের অনমনীয় মনোভাব, জীবনব্যাপী সংগ্রাম এবং একেবারে শেষে সমস্ত সর্বনাশের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়েও জীবনজোড়া পাড়ি দেবার ডাক নাটকের মধ্যে নাটককারের অস্তিত্বকে যেন চিনিয়ে দেয়। এ নাটকে জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্বের অভিজ্ঞতা যেন পরতে পরতে প্রকাশ করলেন নাটককার একথা সত্য কিন্তু এটুকু বললেই চাঁদ বণিকের পালার সবকটি সূত্রকে স্পর্শ করা যায় না কারণ সবসময় আর স্রষ্টাকে অতিক্রম করে 'চাঁদ বণিকের পালা' হয়ে উঠতে পারে সর্বকালীন মানুষের অনুভব। বিশেষ কোন মানুষকে ছুঁয়ে থেকেও নির্বিশেষ হয়ে উঠতে পারে এই নাটক। তাই সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবার আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয় নিয়ে চাঁদের যে স্বপ্ন তা হয়ে ওঠে 'আমাদের যে-কোন মহিমময় মানবিক স্বপ্নের এক প্রতিরূপ মাত্র। সেই স্বপ্নপূরণের কাজে চাঁদের প্রতিটি ব্যর্থতা, তার সর্বস্বহারা হয়ে যাবার প্রতিটি ইতিহাস আমাদের অনেকের ব্যর্থ জীবন ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যেতে পারে।'[১৮] পুরাণের মধ্যে বোধহয় এভাবেই নিজের এবং সমগ্র জাতির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান করেন মহৎ স্রষ্টা। কিন্তু শুধুমাত্র পুরাণের অনুসন্ধানেও তো শেষ হয় না এই নাটক। বরং লোকপুরাণের মিথ যেখানে শেষ হয়ে যায়, তারপরেও এগিয়ে চলে এ নাটকের আখ্যান। 'চাঁদ বণিকের পালা' তাই পুরাণকে আশ্রয় করেও হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত। আবার বিশেষ কোন ব্যক্তিগত পরিচয়কে পেরিয়ে বৃহত্তর অর্থে তা হয়ে উঠতে পারে সমাজগত এবং আরো গভীর কোন অন্বেষণে দর্শনগত। আবার অন্যভাবে দেখলে একক কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং দর্শনগত পরিচয়কে পুরাণের মধ্যে দিয়ে অনুসন্ধান করে আধুনিক যুগের এবং একেবারে আজকের কথা বলতে পারে এই নাটক।

আর তার ফলে মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত মিলনাত্মক কাহিনীটি হয়ে ওঠে আধুনিক জীবনের এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারের ছবি। শম্ভু মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—'খুব আধুনিক কালের

একটা মানুষের চেহারা আছে এই চাঁদে। সেই ভয়াবহ একাকিত্বের ট্র্যাজেডি। যার ভার ও শূন্যতা প্রতিদিন বাড়ে'।[১৮] এই নাটক তাই মুহূর্তে হয়ে ওঠে চিরকালের সৎ, সংবেদনশীল মানুষের এক অনুভবের নাটক। এই নাটক দিয়ে আমরা যেন চিনতে পারি নিজেকে। নিজের পারিপার্শ্বকে। পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারটিতেই শম্ভু মিত্র বলেছিলেন—'যে ভরসা দিয়ে চাঁদ বণিকের পালা আরম্ভ, কিন্তু শেষে ভরসা করবার মতো আর কিছু থাকে না। ভরসার ভিত্তিভূমি একে একে সব ভেঙে যেতে থাকে। চাঁদ সংগ্রাম করতে করতে হারছে, তার একটা মহিমা আছে। কিন্তু হারছেও, ভীষণভাবে হারছে, সেটাও সত্যিকথা।'[১৯] কিন্তু চাঁদ কি সত্যিই হারছেন? তিনি তো শেষ পর্যন্ত 'পাড়ি' দেবার কথাই বলছেন। মনসার বদান্যতা পেয়ে সব কিছু 'ফিরে' পেলে চাঁদের অন্য রকম এক পরাজয় মেনে নিতাম আমরা, কিন্তু শম্ভু মিত্রের চাঁদ সদাগর যে তা পেলেন না, সবকিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েও মনসাকে মিথ্যে প্রমাণ করে, মঙ্গলকাব্যের মিথ ভেঙে তিনি যে আবার 'পাড়ি' দেবার ডাক দিলেন—পুরাণ পেরোন এই পাড়ি–র মধ্যে দিয়েই চাঁদের প্রতিবাদ, চাঁদের সংগ্রাম অমরত্ব পেল। আর তখনই চাঁদের অভিযান মনসামঙ্গলের ভৌগোলিক বা অভিপ্রায়গত নির্দিষ্টতা ভেঙে হয়ে ওঠে 'যে কোন ক্ষুদ্রতা থেকে উৎসর্জিত হবার অভিযান, যা করতে পারেন একজন মানুষ নিজেকে অস্পর্শযোগ্য পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য।'[২০] জীবনজোড়া এই পাড়ি দেবার ডাককে আমরা চাঁদের পরাজয় বলি কি করে? শঙ্খ ঘোষের মতো 'আশাময় সমাপ্তি' যদি নাও বলি, 'সংগ্রামময় সমাপ্তি' তো বলতে পারি। এই নাটক জুড়ে শত্রুর সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, অন্ধকারের সঙ্গে, স্বার্থান্ধতার সঙ্গে এবং অবশ্যই নিজের সঙ্গে চাঁদের যে লড়াই শেষ পর্যন্ত তো সেটাই জারি থেকে যায়। আর তখনই মঙ্গলকাব্যের মোড়ক ভেঙে এই নাটক হয়ে ওঠে আজকের এবং চিরকালের একক মানুষের স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার, আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখার এক দুঃসহ উপলব্ধির নাটক, হয়ে ওঠে পুরাণের মধ্যে শিকড় গেঁথেও 'পুরাণ পেরিয়ে পাড়ি' দেবার এক অসামান্য নাট্যসৃজন।

তথ্যসূত্র :

১. শঙ্খ ঘোষ, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Tussle?", দ্র. ড. অপূর্ব দে (সম্পা.), চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ.৪

২. 'শম্ভু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'—সুবীর রায়চৌধুরী, বহুরূপী, ৮৩ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৯৭৯) পৃ. ১৬১

৩. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, মিথপুরাণের ভাঙা গড়া, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ২১৬

৪. শাঁওলী মিত্র, 'শম্ভু মিত্র : ১৯১৫-১৯৯৭ : বিচিত্র জীবন পরিক্রমা', নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১০, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৫. শাঁওলী মিত্র, শম্ভু মিত্র : ১৯১৫—১৯৯৭ : 'বিচিত্র জীবন পরিক্রমা', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১০, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৬. শম্ভু মিত্র, 'ফিরে তাকাই'. বহুরূপী ৭০, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ১৭১

৭ ও ৮. শম্ভু মিত্র, "অরণ্যে", 'পাঁচটি গল্প দুটি নাটিকা', দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪

৯. শম্ভু মিত্র, 'রাজার কথায়', সমার্গ সপর্যা, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, শমিত সরকার, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৭৯

১০. কুমার রায়, বহুরূপীর হৃদয় ও তিনটি বাড়ি, তিনটি ঠিকানা, বহুরূপী ১০৯, মে ২০০৮, পৃ. ১৩১

১১. শঙ্খ ঘোষ, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Tussle?", দ্র. ড. অপূর্ব দে (সম্পা.) চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ.৯

১২ক ও ১২খ. পবিত্র সরকার, "চাঁদ বণিকের পালা" দ্র. ড. অপূর্ব দে (সম্পা.) চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ. ৩৪

১৩. শাঁওলী মিত্র, 'শম্ভু মিত্র : ১৯১৫—১৯৯৭ : 'বিচিত্র জীবন পরিক্রমা', নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১০, পৃ. ৪৪৭

১৪. পবিত্র সরকার, "চাঁদ বণিকের পালা" দ্র. ড. অপূর্ব দে (সম্পা.) চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ. ৩৮

১৫. সৌমিত্র বসু, "চাঁদ বণিকের পালা : শৈলী ভাবনা", নাট্যচর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫৫

১৬ক ও ১৬খ সৌমিত্র বসু, "চাঁদ বণিকের পালা : শৈলী ভাবনা", নাট্যচর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫৫

১৭ক ও ১৭খ মৃণাল সেন, চাঁদ বণিকের পালা : শম্ভু মিত্র, বহুরূপী ৮৩, মে ১৯৯৫, পৃ. ৮৪

১৮. শঙ্খ ঘোষ, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Tussle?", দ্র. ড. অপূর্ব দে (সম্পা.)চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ.৯

১৯ক ও ১৯খ শম্ভু মিত্রের ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা অনুলিখনকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ, পঞ্চম বৈদিক ২৮, ... এবং দেবযানী—বিশেষ প্রযোজনা সংখ্যা

২০ সৌমিত্র বসু, "চাঁদ বণিকের পালা : শৈলী ভাবনা", নাট্যচর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫৯

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ (১৯১৮—১৯২৪)

প্রবীর বসু

রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে থেকে মনে হয়েছিল যে ভারতের প্রতি ইংরাজদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে কোনো ফল নেই, সেখানকার সংবাদপত্রগুলি পাঞ্জাবের ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর—শ্রমিক দল যদিও ভারতের সপক্ষে জোর লড়াই চালাচ্ছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল পাবার আশা নেই।

১৯২০ সালের ৮ই জুলাই ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে অমৃতসরে জেনারেল ডায়ারের আচরণ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিচিত বোমানজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন যে বোমানজি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে সরকারের পতন সেখানে প্রায় অনিবার্য ছিল। মন্টেগু যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সত্য ও ভারতবাসীর পক্ষে বক্তৃতা দেন—কিন্তু উপনিবেশবাদী সদস্যেরা তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। বোমানজি বলেন, ভারতীয়রা —বিশেষত চরমপন্থীরা—এই বিতর্কের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। তিনি মন্টেগুকে সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করার জন্য আলোয়ারের মহারাজাকে অনুরোধ করবেন বলে ঠিক করেছেন। রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন,—

'Father wrote him (Montagu) a few lines of congratulations.'

এখানে পুনরায় সেই রবীন্দ্রনাথ কথিত ভাল ইংরাজ ও খারাপ ইংরাজের তথ্য এসে পড়ে। একথা ঠিকই যে মন্টেগু ছিলেন একজন উদারচেতা শাসক। কিন্তু তিনি শাসকই, শাসক ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রিটিশ রাজশক্তির শেকড় ছড়িয়ে বসাই তার কাম্য। ডায়ারের পাশবিক অত্যাচার তাঁর পছন্দ হয়নি। পছন্দ না হওয়ার কারণ ছিল এই যে তিনি মনে করতেন এর দ্বারা সমগ্র দেশে প্রতিবাদের প্রচার ও প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়ে সংগঠিত হবে এবং এইভাবে প্রশাসনের কাজ আরও শক্ত হয়ে পড়বে। নিজে একজন ইংরাজ হয়ে এই দেশ থেকে ইংরাজ শাসনকে উৎখাত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি নরম মনোভাবাপন্ন হলেও স্থির সংকল্পচিত্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বুঝতে ভুল করলেও তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত অল্পবিস্তর সুবিধা ও সমর্থনকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে ভারত বিরোধিতারই নজির বেশি পেয়েছিলেন।

১৯শে জুলাই সেখানকার হাউস অব লর্ডসে অমৃতসরের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই বিতর্কে ডায়ারের আচরণের সমর্থনে যে-সব বক্তৃতা হয়, তাতেই বোঝা যায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে এখানকার আইনপ্রণেতাদের মনোভাব কত সঙ্কীর্ণ। রথীন্দ্রনাথ ডায়রিতে লিখেছিলেন,—

'The speeches showed how strong the feeling of race prejudice, the callousness of heart there is among the majority of the people here specially with regard to India. Father felt it immensely. He feels there is absolutely nothing that we can expect from England–we have been deluding ourselves all this while our salvation will come as a gift from England. No it is time that we should think of working out our own salvation.'

ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ডায়ার বিতর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কোনও মন্তব্য করেননি এমন নয়। তাঁর তীব্র মন্তব্য আছে অ্যান্ডরুজকে লেখা তাঁর ২২শে জুলাই-এর চিঠিতে,—

'The result of the Dyer debates in both houses of parliament makes painfully evident the attitude of mind of the ruling class of this country towards India. It shows that no outrage, however monstrous, committed against us by agents of their government, can arouse feelings of Indignation in the hearts of those from whom our governors are chosen. The unashamed condonation of brutality expressed in their speeches and echoed in their news papers in ugly in its frightfulness ... I only hope that our countrymen will not loss heart at this, but employ all their energies in the service of their country in a spirit of indomitable courage and determination ... All great boons only come to us through the power of the immortal spirit we have within us and that spirit only proves itself by its defiance of danger and loss.'

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে তাঁর দেশবাসীকে আত্মশক্তির উত্থানের কথা বলেছেন ; কোনও রাজনৈতিক দলের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আত্মসমর্পণ করা নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস পরবর্তীকালে আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে। তবে এই ধরনের মন্তব্য এক কবিই করতে পারেন আর তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ৬ই অক্টোবর ব্রাসেলস্ থেকে কবি রোটেনস্টাইনকে যে চিঠিটি লেখেন তাতে তাঁর এই পরিচয়টাই গুরুত্ব পেয়েছে এবং একই সঙ্গে উঠে এসেছে সমকালীন ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতি তাঁর তীব্র ধিক্কার,—

... 'In England, I have distinctly felt in my last visit, it is obscured owing, I am sure, to the politics that ever stands between our people and yours, consciously or unconsciously. I have nothing to do directly with politics, I am not a nationalist, moderate or immoderate in my political doctrine or aspiration. But politics is not a mere abstraction, it has its personality and it does intrude into my life where I am human.'

তবে নিজে কবি বলেই তাঁর কিছুই করার নেই, এই নিশ্চেষ্ট যুক্তি তিনি মানেন না কারণ ওই একই চিঠিতে তার পরেই তিনি লিখছেন,—

শতাব্দীব্যাপী শোষণ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে তিনি নিজেকে কিছুতেই বলতে পারেন না যে, 'এ পলিটিক্সের বিষয়, কবি হিসাবে এখানে তোমার কিছু করার নেই।'

সামরিক ব্যয় সম্পর্কে Esher commission report ও Reform bill নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি একে Cruel Mockery বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর সজাগ দৃষ্টিতে সব কিছু উপলব্ধি করে বলেন যে এইভাবে শাসনের নামে ভারতের সম্পদের সমস্তটাই গ্রাস করে প্রত্যন্ত অংশ দিয়ে বলা হয় যে শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে। সেটা যে স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব নয় সে কথা না বলে তার জায়গায় প্রচার চালিয়ে যাওয়া হয় যে ক্ষমতা পেয়েও অযোগ্য ভারতবাসী তাকে কাজে লাগাতে পারে না। চিঠিটি কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। পরিশেষে তিনি দূরদৃষ্টির সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন,—

'But you must know that the downfall of your empire is imminent when the moral downfall of your people is proceeding in a rapid pace. It is natural that you will put more and more faith upon brute force for holding together your unwieldy empire, making it so monstrously ugly that the whole outraged world will pull it down to disgust. Your bloated prosperity is a barrier that prevents you to see what bearers of doom are silently marshalling their forces against you till the sudden signal is given from the dark.

এই ভাবে দেখা এবং দেখানোর মধ্যে একটা নিজস্বতা আছে যা কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও নেতার হতে পারে না। কারণ এই দেখার মধ্যে কোনও ক্ষমতা প্রাপ্তির উল্লাস বা ক্ষমতা হারানোর বেদনা নেই। বেদনা যা কিছু আছে তা হল এক আন্তর্জাতিক স্তরে মনুষ্যহীনতার। এ হল কবির এক সাবধানবাণী কিংবা এক বিষাদময় অভিশাপ হয়ত।

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ২রা নভেম্বর New York Call পত্রিকায়। কাগজে সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম দেওয়া হয়,—

'TAGORE IN U.S. TELLS OF BRITISH CRIMES.'

এখানে তিনি ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে বলেছিলেন,—

'It is natural to expect that the movement will meet with violence by the ruling power at some time or other. But the idea of resistance will have been tried before this happens ... and if we can stand firm in our faith, then we shall win over those who use Brute Force.

Now and the immediate future will be a terrible trial for India. Because physical force has assumed such tremendous proportions now, and it has the power to cause such widespread havoc and misery, that it will require all our moral force and strength of spirit to withstand it, and to pass through the great suffering which is sure to come to us.

বিগত ২রা নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু ৪ঠা নভেম্বরই তাঁর মত পালটে যায় এবং গান্ধীজীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। আসলে অ্যান্ডরুজের পত্রে গান্ধীজীর আন্দোলনের রূপরেখা এবং সেই সময়ে চলতে থাকা খিলাফত আন্দোলনের দাবিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ও খিলাফত নেতা সৌকত আলির শান্তিনিকেতনে আসার সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উষ্মীন্ন হয়ে ৪ঠা নভেম্বর অ্যান্ডরুজকে লিখে জানালেন,—

'Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know, that the political problem is growing in intensity in India and its encroachment is difficult to resist. But, all the same we must never forget that our mission is not political, where I have my politics, I do not belong to Santiniketan.

... If Shaukat Ali can come to Santiniketan and talk to our boys about his fanatical programme then it will be difficult for me to ask students from all

parts of the world to come there and accept from India her gift of peace and wisdom.'

এই বিবৃতির পর অসহযোগ আন্দোলনের অনেক কর্মসূচি সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। লক্ষ্য করার বিষয় হল ; আন্দোলনটির চরিত্র বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ Faraticism শব্দটি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কেন লিখলেন এমন কথা ; সেটা বুঝতে আমাদের কিছুটা ইতিহাসাশ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারিই শুধু ছিলেন না, তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের ধার্মিক গুরু 'খলীফা'ও ছিলেন। কিন্তু মুসলিম প্রধান মধ্যপ্রাচ্যে এঁর অপশাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আরব রাষ্ট্রবাদীরা এঁর বিদ্রোহী হন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সহযোগী হন। কিন্তু এই সুলতান যুদ্ধে জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করেন। সুতরাং মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতিরা তাঁর রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং খলীফার আধিপত্য খর্ব হয়ে তিনি একটি ছোট রাজ্যের অধিকারী থেকে যান। তুরস্ক ও খলীফার সঙ্গে এই ব্যবহারে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা নিজের অসন্তোষকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য জায়গায়-জায়গায় খিলাফত কমেটির স্থাপনা করেন। ভারতীয় মুসলমানদের গোঁড়া অংশও এঁর মর্যাদাহানিতে ক্ষুব্ধ হয়ে খিলাফত আন্দোলনের ডাক দেন। যদিও ভারতে খিলাফত কমেটির স্থাপনা ১৯১৮তেই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখন সেটি কোনও ব্যাপক স্বরূপ পেতে পারেনি। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের সাম্রাজ্যের বিভাজনের বিরুদ্ধে এবং খলীফার পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া। সেই অর্থে এই আন্দোলন ছিল মূলতঃ প্রতিক্রিয়াবাদী। রবীন্দ্রনাথ তাই একে ধর্মীয় অন্ধ উন্মাদনা বলেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির শর্ট-কাট রাজনীতি এর স্বরূপ বদলে দিয়ে একে ব্রিটিশ বিরোধী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অংশ করে তোলে।

আসলে গান্ধীজীর ইতিহাস সম্মত তথ্যজ্ঞানহীনতা কিংবা চটজলদি রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কারণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এই সহজ সুযোগটি ব্যবহার করতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। তিনি এইভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ উদার মুসলিম ও কট্টরপন্থী মুসলিমের মাঝে ঐক্যকে, দুটি আন্দোলনকে, এক করে করে শক্তিশালী হবার পথ তৈরি করে দেন। আর সেই কারণেই হিন্দু-মুসলমান নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার চরম ক্ষতিসাধন করেন। কিন্তু রাজনীতিতে এত সব ভাববার সময় কোথায়? সেখানে তাৎক্ষণিক লাভ-লোকসানটিই বিবেচ্য। গান্ধীজীর এই পদক্ষেপে অ্যান্ডরুজের মতো গোঁড়া গান্ধীভক্তও এই নীতি সমর্থন করতে পারেননি। ১৯২০ সালের ৯ই অগাস্ট তিনি বিরক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন,—

'I feel almost certain that your words not have been understood,–so obsessed is everyone with the idea of a superficial Hindu Unity with Muslim which is not based in any true foundation...I fear, with all my heart, that Mr. Gandhi is in it, deepest of all. The truth is that the 'Khilafat' appeals to the very worst side of Islam–that religious arrogance, which is every whit as

bad as racial arrogance. It has made Muslims demand the buttressing up of the Turkish empire in its entirety including the subjection of Syrians and Arabs and Armenians, —and this again is a tyranny ... I have spoken equally strongly against the religious tyranny, which the Turkish Khilafat implies, if it is to force other people into subjection in order to uphold the Khalifa's temporal power.'

রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজীর এই নীতি সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লাভের লোভে গান্ধীজী দূরদৃষ্টি ও মানবিকতাবোধকে বলি দিয়েছিলেন—কিংবা. এইসব ইতিহাস হয়তো তাঁর অজ্ঞাত ছিল। এর অনেক পরে নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালের ২৪শে জুন এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রম্যাঁ রলাঁকে বলেছিলেন,—

'খিলাফতের ব্যাপারে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সমর্থন করতে গিয়ে গান্ধী যা করেছেন, তাতে যা তিনি চেয়েছিলেন—সেই ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে কাজ করেননি, কাজ করেছেন ইসলামের ঔদ্ধত্য এবং শক্তির পক্ষে, এবং সেটাই হিন্দু-মুসলমানদের প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে দিয়ে নিজে নিজে স্পষ্ট হয়েছে ; এ ব্যাপারে শেষোক্তরা ইংরেজ সরকারের গোপন সমর্থনপুষ্ট প্ররোচক।'

আসলে আরও পরবর্তী সময়ে, ধর্মীয় কারণে যে দেশভাগ হবে, যখন রবীন্দ্রনাথ আর থাকবেন না, তখনকার সেই অঘটনের বীজ বপনের প্রক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কিছু করার ছিল না, কারণ কংগ্রেস চলেছিল নিজের খেয়াল-খুশি মতন কখনও গড়িয়ে-গড়িয়ে কখনও তীব্র গতিতে।

গান্ধীজীর সঙ্গে কবির মতবিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আসলে একজন কবি ও রাজনীতিবিদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি খুব সাধারণ তো ছিলেন না। একজন তাঁর আদর্শকে রাজনীতির ওপর স্থান দিতেন আর অন্যজন কবি হলেও মানবিক কল্যাণ বোধে রাজনীতি সচেতন হয়ে থাকতে চাইতেন।

আমরা আগেই দেখেছি কংগ্রেস নেতারা হান্টার কমিশন বয়কট করে নিজেরাই একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই রিপোর্ট সমগ্র দেশবাসী ও সরকারের কাছে কোনও গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে কংগ্রেস যদি হান্টার কমিশনে অংশগ্রহণ করত, তাহলে সেই কমিশনের একপেশে তথ্য ও সেগুলি অবলম্বনে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা হত ও তার ফলে পার্লামেন্টের আলোচনাও যে প্রভাবিত হতে পারত ; সেই দূরদৃষ্টি কংগ্রেসের তখন ছিল না। ১৯২০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্র পাঠে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ প্যারিস থেকে এই প্রসঙ্গে অ্যান্ডরুজকে চিঠিতে লেখেন,—

'To what futility Gandhi's Methods lead we have seen in his withdrawal of evidence before Hunter's Commission. It was merely negative both in its procedure and its results. It merely had the effect of giving vent to a petulant spirit of vexation and we neglected the only opportunity we had of effectively bringing the most atrocious facts of a terrible crime before the great world's tribunal. The non-official report ! The printing cost of it was a fine we im-

posed upon ourselves over the above that which was imposed by the martial law.'

রবীন্দ্রনাথের এই মতামত পাঠ করার পর তাহলে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ আসলে কী চান। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর পথ ও পদ্ধতিগত দিক থেকে মতপার্থক্য হতেই পারে কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্য ও স্বাধীনতার অর্থই বা কী তাঁর কাছে? এই প্রশ্নের উত্তর বহুবার বহু জায়গায় পাব কিন্তু এই সময় পর্বে নিউ-ইয়র্কে হেলেন কেলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি হেলেন কেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাড়িতে যান। হেলেন কেলার কবিকে বলেন,—

'আমার কাছে কখনো কখনো বড়ই আশ্চর্য মনে হয় যে ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি।'

এই মন্তব্যের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—

'স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে পারি, যা হয়ত অন্য কোন দেশ পারে না। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই ভারতবর্ষ সমূহ উপকৃত হবে না। যেখানে সমাজের প্রতিটি শ্রেণী পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবে উদ্বুদ্ধ, যেখানে গণকল্যাণই সকলের মুখ্য লক্ষ্য, স্বাধীনতা শুধু সেখানে ফলপ্রসূ হতে পারে।'

দেশীয় রাজনীতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক মন বারংবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই মতামত ব্যক্ত হয়েছে। ৮ই মার্চ তারিখে তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন,—

'দেশে নন্-কোঅপরেশনের যে বান ডেকেচে তার প্লাবন আমাদের আশ্রমে এসেও প্রবেশ করেচে তা বেশ বুঝতে পারছি। ... আমাদের দেশের পক্ষে এরকম বন্যার নিশ্চয়ই দরকার ছিল, সেইজন্যেই এমন সহসা এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হতে পেরেচে। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। ... আমরা মানবের কল্যাণকামনা এবং লোকহিতানুষ্ঠান করব, কিন্তু সে কি কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের অনুগত হয়ে? রাষ্ট্র-বিপ্লবকে আমি দোষ দিচ্ছি নে, যথাস্থানে তার মর্যাদা আছে—কিন্তু শান্তিনিকেতনকে আমরা যদি কোনো একটি রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্রস্থান করে তুলি তাহলে কি আমাদের আশ্রমের অসম্মান হয় না? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আড়ি করে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা আমি লজ্জাকর বলে মনে করি। ...

একথা নিশ্চয় জেনো যে প্রমত্ততাকে পক্ষভুক্ত করে যখন কোনো কল্যাণকর্ম করবার চেষ্টা হয় তখন যত ধানের বীজ বোনা হয় তার চেয়ে কাঁটার বীজ বেশি পড়ে। বেড়া দেবার জন্য কাঁটা গাছেরই দরকার, ধান গাছের নয়—অতএব পোলিটিক্যাল রাগারাগির বেড়া, নন-কোঅপরেশনের বেড়া যেখানে তুলতে হবে সেখানকার মালী সেখানকার নিয়মেই কাজ করুক—কিন্তু বিশ্বনীড়ে আমরা বিশ্বদেবের নামে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করেছি, সেখানে সকল রকম বেড়া ভাঙতে হবে।'

এই একই কারণেক দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ-বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই এপ্রিল লন্ডনে যে সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাতে কোনো অংশগ্রহণে অসম্মত হন। তা সত্ত্বেও সভার বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নাম ব্যবহার করা হলে তিনি প্যারিস থেকে তার প্রতিবাদ করেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিবাদে তাঁর নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন তখন গান্ধীজী সেই প্রতিবাদকে Immature বলেছিলেন এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ রেখেছিলেন। ওই ঘটনার অনেক পরে অবশ্য গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চ গরম করা বক্তৃতা করেন। এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে কথায়-কথায় রবীন্দ্রনাথ গভীর বেদনায় বলেছিলেন,—

'জানো, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারের সময়, তখনও এদেশে ভালো করে খবর পৌঁছয়নি। আমি বোধহয় আশু চৌধুরীদের ওখান থেকে খবর পাই, ভালো করে মনে নেই। শুনে যে একটা প্রবল অসহ্য কষ্ট হয়েছিল, সে আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হতে লাগল,—এর কোনো উপায় নেই, কোনো প্রতিকার নেই, কোনো উত্তর দিতে পারব না, কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহলে জীবনধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই রাত্রেই ওই চিঠি লিখলুম...কাউকে বলিনি এ বিষয়ে, রথীদেরও না।...পাছে কেউ বাধা দেয় এই ছিল ভয়।...সেই সময় আমি গান্ধীজীকে বললুম যে, এ ব্যাপার নিয়ে আপনি একা দেশব্যাপী আন্দোলন এখনই শুরু করুন, কিন্তু তিনি তখন রাজী হলেন না। তখন তাঁর বড়লাটের সঙ্গে কোনো একটা সুবিধের পরামর্শ চলছিল,—সেটা নষ্ট করতে চাইলেন না, পরে অবশ্য এই ব্যাপারকেই প্রধান প্ল্যাটফর্ম করে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার কী যে আশ্চর্য লেগেছিল বলতে পারিনে।'

যে আত্মসম্মান বোধ জাগিয়ে তুলে তিনি নিজ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তা আজও আমরা সেই অর্থে অর্জন করতে উঠতে পারিনি। কোনও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই তা হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরন্তর ঘটতে থাকা গণহত্যা। কখনো তা বিচ্ছিন্নতার নামে, কখনো তা সম্প্রদায় ও জাত-পাতের নামে আবার কখনো তা বর্ণের নামে কিংবা ধর্মের নামে। এর ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারিনি। তাই কখনো বিহারে, অসমে, বাংলায় কখনো কাশ্মীরে কিংবা গুজরাতে নির্বিকার গণহত্যা চলতেই থাকে। সকলেই বলেন এইরকম হওয়া উচিত নয়; এটা অন্যায়; এটা পাপ। কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়ে কোনও উপাধিধারীকে উপাধি ত্যাগ করতে সচরাচর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পেরেছিলেন। এখানে কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে গান্ধীজী তাঁর 'BUER WAR MEDAL' এবং 'KAISER-I-HIND GOLD MEDAL' পদক ত্যাগ করেছিলেন ১৯২০ সালের ১লা আগস্টে। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগের এক বছর দু-মাস পরে।

আমরা কংগ্রেস ও গান্ধীজীর প্রসঙ্গে ফিরে আসব। পঞ্চম জর্জের ক্ষমা ঘোষণায় মুক্ত হয়ে তাঁর প্রিয় দুই আলিভাইদের সঙ্গে তিনি খিলাফত প্রশ্নে একনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সেই সময় তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের চেয়ে খিলাফত আন্দোলন সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে যায়। তিনি ১০ই মার্চ খিলাফত কমেটিকে একটি ফতোয়া জারি করে জানান যে খিলাফতের দাবি স্বীকৃত না হলে যেন অহিংস অসহযোগের পথ নেওয়া হয়। ১লা ও ২রা জুন এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করা হয় যে সরকারকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ১লা আগস্ট তারিখেই মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সারা ভারত শোকস্তব্ধ হয়ে যায় এবং কংগ্রেসের চরমপন্থী রাষ্ট্রবাদী নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শূন্যতাই গান্ধীজীর কাছে এনে দেয় এক সুবর্ণ সুযোগ। সর্বভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীজীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়। মন্টেগু-ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরেই অ্যানি বেসান্ট ব্রিটিশ সরকারের অনুকূলে মত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে তাঁর হোমরুল লীগের সদস্যেরাই তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে গান্ধীজীকে সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন। তিলকের মৃত্যুতে তাঁর ইন্ডিয়ান হোমরুল লীগও নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে নীতিগত দিক থেকে কংগ্রেস কোন্ পথে যাবে তাকে একটা বাস্তবরূপ দিতে ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। এর প্রথম স্বরূপটি ছিল নেতিবাচক যার অন্তর্গত ভারতীয়দের দ্বারা উপাধি ও অবৈতনিক পদ বর্জন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পদত্যাগ; সরকার আয়োজিত অনুষ্ঠান, দরবার প্রভৃতিতে যোগ না দেওয়া ; সরকারি মালিকানাধীন, সাহায্যপ্রাপ্ত বা পরিচালিত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের সরিয়ে আনা এবং সেই জায়গায় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা, আইনজীবী ও মামলাকারীদের ক্রমশ সরকারি আদালত ত্যাগ করে পরামর্শের মাধ্যমে বিবাদীদের সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা, সেনা, কেরানি ও অন্যান্য শ্রমিকদের মেসোপটেমিয়া বা ভারতের বাইরে কাজ করতে অসম্মত হওয়া, নবগঠিত কাউন্সিলের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও ভোটে অংশগ্রহণ না করা এবং অবশ্যই বিদেশী দ্রব্য বর্জন।

উক্ত ফিরিস্তি ছাড়া যে ইতিবাচক স্বরূপটি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সেটি ছিল কংগ্রেস দ্বারা গণতান্ত্রিক সহযোগীতায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সংস্থা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সম্পূর্ণ দেশে স্থাপনা করা, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ-এর স্থাপনা, স্বদেশী বস্ত্র এবং স্বদেশীর প্রচার করা, কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যায় বৃদ্ধি করা, তিলক স্বরাজ্য কোষ-এ টাকা জোটানো, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, মদ্য-পান নিষেধ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এসব ছাড়া অবশ্যই ছিল চরখা কেটে সুতো তৈরি ও কাপড় বোনার কাজও। গান্ধীজী মন্তব্য করেছিলেন, এই কার্যপদ্ধতি যথাযথ পালিত হলে এক বছরের মধ্যে দেশবাসী স্বরাজ প্রাপ্ত করবে।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই ভবিষ্যৎবাণীকে ও স্বরাজপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে চরখাকে খুব ভাল চোখে দেখেননি। ব্যক্তিগত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই ঘোষণার প্রতি বহুবার কটাক্ষ করেছেন। এমনকি হ্যামলেটের সঙ্গে গান্ধীজীর জীবননাট্যের তুলনা করে ১৯২৬ সালের ২৫শে জুন তিনি সুইজারল্যান্ডে রম্যাঁ রলাঁকে বলেছিলেন যে,—

'বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর যে-আপস তাঁকে ইংলন্ডের জন্যে সৈন্য সংগ্রহে নামিয়েছিল, তখন থেকেই এটা ছিল নৈতিক অধঃপতন। এইভাবেই তিনি বিশ্বস্ত মনে তাঁর জনগণের মুক্তির মহৎ লক্ষ্যসিদ্ধির কথা ভেবেছিলেন। সেটা বৃথাই। সেই একই রকম, যখন তিনি মহৎ পরিকল্পনার অলৌকিক সিদ্ধির জন্যে নির্দিষ্ট ও আশু দিনক্ষণ স্থির করেছিলেন। এইভাবে তিনি আপাত-

পৌত্তলিক ব্যঞ্জনার উপায়গুলোকে খেলিয়েছিলেন, যা তাঁকে (রবীন্দ্রনাথ) শঙ্কিত করেছিল। এই বিশ্বাসপ্রবণতার সংক্রমণে হাজার হাজার জনকে, তাঁর দেশের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে যেতে দেখে ভীত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাঁকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বাংলাদেশের মহত্তম জীবিত শিল্পী এবং উচ্চ চেতার অধিকারী বলে মনে করেন—অলৌকিক তারিখটির কম্পিত প্রতীক্ষায় ছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) সঙ্গে আলোচনা করতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি (শরৎচন্দ্র) বলেছিলেন, এ সম্পর্কে সন্দেহ করলেও তিনি দুঃখ পাবেন। তারিখটি বৃথাই পেরিয়ে গেল ; এবং এইটিই হলো ব্যর্থতা।'

উক্ত খবরটি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ১/আনন্দ বাজার-পত্রিকা, থেকে জানা যায়।

কলকাতায় গান্ধীজীর প্রধানত নেতিবাচক প্রস্তাবগুলি আলিভাইদের ও মুসলিম-গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করলেও অন্যদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে। চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, অ্যানি বেসান্ট, মদনমোহন মালভিয়া, মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতিরা গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রধান হিন্দুনেতাদের মধ্যে কেবল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু তাঁর সমর্থক ছিলেন। এখানে লক্ষ্য করার মতন বিষয়টি হল যে তখনো পর্যন্ত জিন্না মূলস্রোতের রাজনীতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চলেছেন। অনেক পরে সেটা অবশ্য আর থাকবে না। দীর্ঘ বিতর্কের পরে গান্ধীজী 'প্রগতিশীল' ও 'ক্রমশ' শব্দ দুটি যুক্ত করতে রাজি হলে অনেকটা বিরোধ কেটে যায় ও প্রস্তাবটি ১৮৮৬-৮৮৪ ভোটে গৃহীত হয়। জেতার জন্য অবশ্য গান্ধীজী তৈরি হয়েই এসেছিলেন এবং তাঁর কৌশল কাজে লেগেছিল। তিনি এই অধিবেশনে প্রায় তিনশো খিলাফতীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের ছাড়াও কলকাতার বহু মাড়োয়ারিদের অর্থসাহায্য অনেকাংশে ভাড়াটে সদস্যের ভোটে প্রস্তাবটি পাশ করানো হয় বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। রাজনীতি যে তখনও কলুষিত ছিল এই তথ্য তারই প্রমাণ। আর ব্যক্তি গান্ধীজীর যে ভাবমূর্তি ছিল তার থেকে রাজনৈতিক গান্ধীজীর বিচক্ষণতা ছিল একেবারেই ভিন্ন। তবে গান্ধীজীর সৌভাগ্য যে এর আগেই তিলকের জীবনাবসান হয়ে গিয়েছিল, না হলে এই প্রস্তাব গৃহীত না হতেও পারত। এবং সেটা ঘটলে গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। তাই এই কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকেই গান্ধীজীর কংগ্রেস অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা রূপে উত্থান হয়েছিল।

তবে কলকাতার এই বিশেষ কংগ্রেসে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলেও সম্পূর্ণ দেশবাসীর মধ্যে তখনই তার কোনও বিশেষ প্রভাব দেখা দেয়নি। তখন আজকের মতন মিডিয়ার দাপট না থাকায় ব্যাপারটি চাঞ্চল্যকর রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। আর তাছাড়া সাধারণ মানুষের কংগ্রেসের ওপর একটা বিশ্বাস ছিল যে নেতারা যা করবে তা দেশের ভালর জন্যই করবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে গান্ধীজীর পথ নিষ্কণ্টক ছিল না। দেখা গেল চিত্তরঞ্জন সহ ২৪ জন নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন। মোতিলাল নেহরু প্রভৃতি কয়েকজন উপাধি ত্যাগ করলেও আদালত বর্জন ইত্যাদি কার্যক্রমে বিশেষ সাড়া দেননি। মোতিলাল ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ। তাঁর পসার ছিল চোখে পড়ার মতন। যদিও তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের

বাকি সব ব্যাপারগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী একেবারেই দমে যাননি। তিনি আলিভাইদের নিয়ে আলিগড়ে যান এবং সেখানে ১২ই অক্টোবর বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের প্রভাবিত করেন। এইভাবে ২৯ শে অক্টোবর আলিগড়ে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে তিনি আহমেদাবাদে ১৫ই নভেম্বর প্রথম রাষ্ট্রীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে অক্টোবরের আগে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সেরে গান্ধীজী বিশ্রামের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর পত্নী কস্তুরবা ও পুত্র দেবদাসকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। কিন্তু মহাত্মাজী নিজের পরিবার সহ এলেও, তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা করবার জন্য খিলাফত খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সওকত আলি সাহেবও আশ্রমে আসেন। গান্ধীজী বিশ্রামের জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে স্বাস্থ্যোদ্ধারেও রাজনীতি ব্রাত্য হয়নি। বিদায়কালে তিনি ধর্মকে অবলম্বন করে রাজনীতির কথাই বললেন,—

...'For me, personally, there is only one religion and that is Hinduism ... that is why you see me engaged in defending Islam with the same energy and passion with which I would defend my faith ...

I, for one, have offered my closest co-operation to this government for a number of years and, at the end of it all, I had some bitter experience. It is owing to them that I have undertaken this terrible, but noble and glorious fight and have been trying to induce you all to Join it.'

নিউ ইয়র্কে বসেই এই সব খবর রবীন্দ্রনাথের জানা হয়ে থাকে। মৌলবাদী কট্টরপন্থী সৌকত আলির আশ্রমে আগমন ও ছাত্রদের কাছে তাঁর দেয় ভাষণ রবীন্দ্রনাথ ভাল মনে নিতে পারেননি সে কথা আমরা জানতে পারি ৪ঠা নভেম্বর অ্যান্ড্রুজকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। চিঠিটিতে গান্ধীজীর কোনও উল্লেখ নেই ; খুব সম্ভব ছিল, কিন্তু চিঠিটি ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায় ; তাই শেষ কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

'Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know that, political problem is growing in intensity in India and its encroachment is difficult to resist. But all the same we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics I do not belong to Santiniketan–I do not mean to say that there is anything wrong in politics but only that it is out of harmony with our Ashram.'

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শকে কবি দু-হাতে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন যাতে রাজনীতির ঝড়ো হাওয়ায় তা উড়ে না যায়। কবি অনেক কষ্টে তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-নীতি সহ এই আশ্রমকে গড়ে তুলেছেন কারণ কবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে এটাও দেশ গঠনেরই অংশ। কবির রাজনীতিতে বিরাগ নেই কিন্তু সেই নীতিকে হতেই হবে মানুষের অন্তর্মনের বিকাশের সহায়ক। কোনও চটজলদি পন্থাতে কবির বিশ্বাস নেই। কবি সততার সঙ্গে মানুষ গড়ে তুলতে চান যে মানুষ অত্যাচারী শাসকের অপসারণের পথ প্রশস্ত করবে। কিন্তু এ যে ভীষণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কংগ্রেস যে ততদিনের অপেক্ষা করতে রাজী নয়। রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেসের ত্বরিত পথকে বাধা দিতে যাচ্ছেন না; কিন্তু তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের জগতে কেউ অনুপ্রবেশ করে

হস্তক্ষেপ করলে ; সেটাই বা কী করে সহ্য করেন কবি। তবুও গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব থেকে শান্তিনিকেতন-কে মুক্ত রাখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, দিনেন্দ্রনাথ, অনিলকুমার মিত্রের মতন রবীন্দ্রনাথের কাছের লোকেরা পর্যন্ত গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যান। এঁরা সকলেই কোনও না কোনও ভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ গণতান্ত্রিক মনোভাবের মানুষ ছিলেন তাই এঁদের সমালোচনায় বিরক্তি প্রকাশ করেননি। সবটাই সহজ ভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের কথা স্পষ্টভাবে বলতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না।

যাইহোক, ১৯২০, সালের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাগপুরে সি. বিজয় রাঘবচারিয়ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৩৬ তম বার্ষিক অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে যে কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবের বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাকে এই অধিবেশনে পুনরায় সেই অবস্থান প্রাপ্ত না হোক, এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য অর্থাৎ 'কাউন্সিল প্রবেশ' প্রস্তাবটিকে গৃহীত করার জন্য অসন্তুষ্ট চিত্তরঞ্জন দাস অসম ও বাংলা থেকে ২৫০ প্রতিনিধিদের নিয়ে নাগপুরে যান। তিলকের সহযোগী মহারাষ্ট্রের অসন্তুষ্ট খাপার্দে ও জিন্নাও গান্ধী নীতির বিরোধী ছিলেন। খাপার্দে ও নরসিংহ চিন্তামণিও নিজের সঙ্গে অনেক সমর্থকদের নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নাগপুর যাওয়ার পরেই রহস্যজনকভাবে চিত্তরঞ্জনের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। মহম্মদ আলির দৌত্যে ২৯শে ডিসেম্বর এক গোপন বৈঠকে গান্ধীজী, মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জন মিলিত হন। সেখানে ঠিক হয়, লক্ষ্যের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীকে সমর্থন করবেন কিন্তু তাঁর নির্ধারিত কার্যক্রম মেনে নিতে.হবে গান্ধীজীকে। এইভাবে নেতারা একটি আপোস-মীমাংসায় আসেন। প্রস্তাব গ্রহণে ১৬ বা তার উর্ধে বয়সের ছেলেদের বিদ্যালয় বর্জনের আওতায় আনা হয়। উকিলদের তখুনি আদালত ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। অর্থনৈতিক বয়কটের সীমা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিক সংগঠন গড়ার প্রস্তাব হয়। সত্যাগ্রহের সব অস্ত্র শেষ হলে আইন অমান্য শুরু করা হবে ; এমনটাই বলা হয়।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের বিপুল পরিবর্তন হয় এই অধিবেশনে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রতি গ্রাম ও জেলায় কংগ্রেসের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বার্ষিক অধিবেশনের আগে কংগ্রেসে নীতি নির্ধারণের জন্য ৩০০ সদস্যের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C.) গঠিত হবে আর সেই নীতি কার্যকর করার জন্য তৈরি করা হবে ১৫ সদস্যের বিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি। এই সব গঠিত হল প্রধানত গান্ধীজীর কূটবুদ্ধির প্রভাবে। শেষের এই ওয়ার্কিং কমিটিটি হয়ে উঠল গান্ধীজীর মারণাস্ত্র। নানা কৌশলে তিনি নিজের অনুগামীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতেন এই কমিটিতে। এবং তাঁর অঙ্গুলিহেলনে এই কমিটির দ্বারাই পরিচালিত হত কংগ্রেসের কাজকর্ম। প্রমাণ হিসাবে আমরা আরও পরে দেখতে পাব যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেও কিছুদিন পরেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ওই ওয়ার্কিং কমিটির চক্রান্তে। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের যখন খসড়াটি রচনা করেন তখন তিনি শুধু ওয়ার্কিং কমিটির কেন; কংগ্রেসেরও সাধারণ সদস্য ছিলেন না। গান্ধীজীর রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির তারীফ তো করতেই হয়।

গান্ধীজী এর আগে কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে বলেছিলেন যে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ দেশবাসীর মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। এত সহজ পথে স্বরাজ প্রাপ্তির এই প্রবঞ্চক ঘোষণা উৎপীড়িত দেশবাসীকে মোহাচ্ছন্ন করল। এবং সারা দেশে জনসাধারণে প্রচুর উৎসাহ সঞ্চার করল। সেই কারণেই ১৯২০-র এই অধিবেশনে ১৪,৫৮৩ প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং অধিবেশনে গান্ধীজীর পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে অসুবিধা তো হয়ইনি এবং একই সঙ্গে গণমানসে নিজের প্রতি অফুরন্ত বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে নিতে পেরেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের পালটি খাওয়ায় তাঁর কাজ আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল। ইংরাজ যেমন শাসন সংশোধনের নামে আশ্বাসন দিয়ে কংগ্রেসের কিছু নেতাকে নিজের দলে টেনে নিয়েছিল, তেমনই ১ বছরের মধ্যে স্বরাজপ্রাপ্তি আশ্বাসন দিয়ে গান্ধীজীও বিপুল জনসমর্থন লাভ করলেন।

পরিবর্তিত কাউন্সিলগুলির যে নির্বাচন ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার করায় তাতে ৮০ শতাংশ মতদাতারা ভোট দিতেই যায়নি এবং সুযোগ্য প্রার্থীরা নিজে থেকেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। গান্ধীজীর দ্বারা এই কাজটি এত বেশি প্রভাবিত হয়ে যায় যে নির্বাচনকে তামাশায় পরিবর্তিত করতে এক অশিক্ষিত নাপিতকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে বিধায়ক রূপে নির্বাচিত করা হয়। দিল্লীর এক লেমনচুস বিক্রী করা ফেরিওয়ালাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। সে নিজের ঘোষণা পত্রে বলেছিল যে নির্বাচনে জিত হলে রাওলাট অ্যাক্ট আইনের কাগজটিকে পুরিয়া বানিয়ে বিনামূল্যে মেঠাই বিতরণ করবে। এইভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরাজদের নির্বাচনী চালকে ভীষণভাবে অসফল করতে একজোট হয়ে নেমে পড়ে।

নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন তীব্র গতি লাভ করে। এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস পুঁজী নিবেশের প্রয়োজন হয়। সেই পুঁজী জমা হতে থাকে বিভিন্ন পুঁজীপতিদের পুঁজী বিনিয়োগের দ্বারা। জনগণের দ্বারা সঞ্চিত অর্থে যে আন্দোলন চলার কথা ছিল ; অন্তত তিলক ফান্ডের যে ঘোষণা হয়েছিল, খুব শীঘ্রই তার চরিত্র পালটে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বোমানজি প্রতিশ্রুতি দেন, স্বরাজলাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রতি মাসে কংগ্রেসে ১০ হাজার টাকা দান করেন। কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই সেই দলে পুঁজীপতিদের আধিপত্য ছিল। আমরা দেখতে পাব আরও পরে বিভিন্ন পর্বে পুঁজীপতিদের কীভাবে স্বার্থরক্ষা করে চলেছে কংগ্রেস।

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরুর মতন নেতারা তাঁদের লাভজনক আইনব্যবসা ত্যাগ করে তাঁদের জীবন ও সম্পত্তি অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে দান করেন। তবে তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করলেও তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও জীবনাচরণে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি অন্তত গান্ধীজীর তুলনায় তো নয়ই। তবে এইসব ঘোষণায় কলকাতার ছাত্রসমাজে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়।

তখনকার ভারতশাসনবিধি অনুযায়ী কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে আইনসভাগুলি উদ্বোধনের জন্য রানী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় পুত্র Duke of connaught মাদ্রাজে আসেন ১৯২১ সালের ১০ই জানুয়ারি। কংগ্রেসের মিটিংয়ে ঠিক হয় যে ডিউকের ভারত সফরে কোনও রূপ সম্মানপ্রদর্শন

করা হবে না। সেই সূত্র ধরেই সেইদিন মাদ্রাজে হরতাল হয়। কলকাতায় ডিউক আসেন ২৮শে জানুয়ারি এবং সেখানেও একইভাবে হরতাল হয়। ডিউক ভারত থেকে ফেরৎ গিয়েছিলেন অসন্তোষের আগুনের আঁচ পেয়েও যদিও তাঁকে বিক্ষোভের জায়গাগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তিনি খবর পেয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমের দ্বারা।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেসের নামজাদা নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে তিনি সমগ্র দেশে ও বিশেষ করে বাংলায় 'রাষ্ট্রগুরু' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও তিনি গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে হাঁটলেন না। সমসাময়িক রাজনীতিতে তিনি উল্টো পথ ধরলেন। তিনি নতুন আইনসভায় মন্ত্রিপদ গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশ শাসক তো এটাই চাইছিল। কংগ্রেস বিস্মিত হলেও কোনও বাধা দেয়নি। যদিও ব্রিটিশ অনুগামিতা কংগ্রেসের পুরনো নেতাদের মধ্যে বহুবার দেখা গিয়েছিল। তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতা করলেও কয়েকটি ব্যাপরে তাঁদের আস্থা ছিল ; যেমন ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি। যাইহোক ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকে সুরেন্দ্রনাথ পেলেন পুরস্কার স্বরূপ 'স্যার' উপাধি। কিন্তু সম্মান লাভ হলেও জনপ্রিয়তা লাভ হলো না। একজন অবিসংবাদিত নেতার কাছে সম্মান এবং জনপ্রিয়তা দুটোই প্রয়োজনীয় এবং এই দুটোরই-প্রাপ্তি জনগণের কাছ থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় ; বিরোধী প্রতিষ্ঠানের কাছে নয়। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে ; যার অনুমান তিনি করতে পারেননি এবং পরবর্তী নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত নতুন মুখ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এইভাবে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি থেকে তাঁর অবলুপ্তি ঘটে। এই ঘটনায় গান্ধীজীর নেতৃত্ব আরও বেশি সুযোগ লাভ করে বাংলায় ব্যাপ্তি পায় কারণ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত।

গভর্নর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের ৫ বছরের কুখ্যাত শাসনকাল শেষ হয় এবং তাঁর জায়গায় রিয়ুফুস ড্যানিয়েল আইজ্যাক রীডিং আসেন ১৯২১ সালের ২রা এপ্রিল। চেম্‌সফোর্ড ভারত ত্যাগ করায় সকলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল এবং যা হয় নতুনের প্রতি একটা প্রত্যাশা ও ভরসা তৈরি হতে থাকে। বিশেষ করে কংগ্রেসে। যিনি এলেন, তিনি ছিলেন একজন বিচারপতি। তাই তাঁর শাসনে ভারতে ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি পাবে ; এমনটাই আশা করে সকলে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতাকে তাঁকেও কঠোর হাতে দমন করতে হয়েছিল। এঁরা ভুলে গিয়েছিলেন প্রশাসনে Feed back নামে একটি ব্যাপার থাকে যা পূর্বসূরী তাঁর উত্তরসূরীকে দিয়ে যায়।

আমরা আগেই বলেছি যে শান্তিনিকেতনে ও ব্রহ্মচার্যাশ্রমে অনেকেই গান্ধীজী নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এঁরা সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতেও পশ্চাৎপদ হননি। তাই এঁদের কাছ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন হিসাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব এল রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা কোনওদিন ছিল না এবং প্রায় বীতস্পৃহ হয়েই তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই ম্যাট্রিক সম্পর্কেও কোনও মোহ তাঁর ছিল না। তবু

ছাত্রদের ভবিষ্যৎ এবং অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে তাঁকে প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। ১৯২১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে অ্যান্ড্রুজকে লিখলেন,—

'You have asked for my permission to abolish the matriculation classes from our school. Let it go, I have no tenderness for it. In our classical literature it was the strict rule to give all dramas a happy ending. Our matriculation class has ever been the fifth act in our institution ending in tragedy. Let us drop the curtain before that disaster gathers its forces.'

রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যে একধরনের আর্তি ও ব্যাঙ্গোক্তি চোখে পড়ে। সেটা চোখে পড়লেও ধরে নেওয়া হয় যে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ম্যাট্রিক উঠে যায়। তবে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন ১৯২১ সালের ৫ই মে সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে,—

'...ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করিনে ... কিন্তু আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হল না, এটা হল নন্-কোঅপরেশন পর্বের একটা অধ্যায়রূপে। বাহির থেকে পলিটিক্সের ঝাঁটা আমাদের শান্তিনিকেতনের পিঠের উপর পড়ল। তাতে করে তার পিঠের যদি কোনো ময়লা উঠে গিয়ে থাকে তার অনেকখানি চামড়াও উঠে গিয়েচে—তার ব্যথা এবং তার দাগ সহজে মিটবে না।'

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার নিদর্শন স্বরূপ ম্যাট্রিকুলেশনকে রবীন্দ্রনাথ 'ময়লা' হিসাবে উপমায়িত করেছেন কিন্তু তাঁর দুঃখ রয়ে গেছে কারণ এই উঠে যাওয়ার দাবিটি তাঁর শিক্ষার সংস্কার মূলক আদর্শ থেকে আসেনি ; এসেছে বাইরে থেকে রাজনীতির দাবি অনুযায়ী।

১৯২১ সালের ২৬শে এপ্রিল রঁলা আঁদ্রের দিনলিপির বয়ানে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রবাদের বিরোধিতার কথা এবং একই সঙ্গে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ উক্ত বিষয়ে কতটা সাবধান ও সতর্ক ছিলেন। তিনি লিখেছেন,—

তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর দেশবাসীর মধ্যে রাষ্ট্রবাদ অতিমাত্রায় জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা যা কিছু সহ্য করেছেন তার ফলে, ইউরোপের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতায় স্বেচ্ছায় সম্মত হবার পক্ষে জাতবিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র। ...আর এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথকে একদিকে ইংরেজদের সম্পর্কে এতো সতর্ক থাকতে হচ্ছে, তাঁর কাজ যেন ইংলন্ডের একটা হাতিয়ার বলে সন্দেহভাজন না হয়, এবং এই ভয়েই ইংরেজদের উপর নির্ভর করাটা তাঁকে এড়াতে হচ্ছে।'

দেখা যাচ্ছে ভারতে যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন চলছে এবং ব্রিটিশের সব কিছু পরিত্যাজ্য ঘোষণায় তিনি আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকেও বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছেন ; তখনই রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ শুধু নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ; মুখরিত হচ্ছে বিদেশেও। এমনকি ১৯২১ সালের ২৭শে মে সুইডিশ অ্যাকাডেমিতে নোবেল-বক্তৃতা প্রদান অনুষ্ঠানেও। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন,—

... 'I do not think that it is the spirit of India to reject anything, reject any race, reject any culture. The spirit of India has always proclaimed the ideal

of unity ... It comprehends all, and it has been the highest aim of our spiritual exertion to be able to penetrate all things with one soul, to comprehend all things as they are, and not to keep out anything in the whole universe--to comprehend all things with sympathy and love, this is the spirit of India. Now, when in the present time of political unrest the children of the same great India cry for rejection of the west I feel hurt. I feel that it is a lesson which they have received from the west. Such is not our mission. India is there to unite all human races.

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রথমদিকে কিছুটা হলেও অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২১ সালের ২২শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন। সেইদিনই তিনি তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন,—

...'কি করব এখনও ঠিক করতে পারিনি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে বোলপুরে যাব।

আসলে ১৯১৪ সালে ছাত্র অবস্থায় অল্প বয়সে যখন তিনি অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন তখন কবি তাঁদের পল্লীগঠনের কথা বলেছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন যে তখন একদিকে বিপ্লবী দলের আদর্শ ও অপরদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁদের আকর্ষণ করত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লীগঠনের কথা সেই ১৯১৪ সালে ছিল একেবারেই নতুন।

তারপর ১৯২১ সালের ২রা জুলাই কেমব্রিজ থেকে ফেরার পথে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই জাহাজে সহযাত্রী হন। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গঠনমূলক কাজের কথাই বলেন।

কিন্তু দেশে ফিরেই সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জন দাসের প্রভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য ঘটতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় অ্যান্ডরুজের সঙ্গেও তাঁর একই বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন অ্যান্ডরুজ, কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ ও ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগের নীতি তিনি খোলা মনে সমর্থন করতেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমরা দেখেছি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি বয়কট এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের মতন নেতিবাচক পন্থাগুলির বিরোধিতা করে এসেছেন।

এই ব্যাপারে তাঁর মতান্তর ঘটে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। শরৎচন্দ্র তখন একজন কংগ্রেস নেতা এবং চিত্তরঞ্জন দাসের প্রস্তাবে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন,—

'কবি বিদেশ থেকে ফিরে এলে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর কাছে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন ও চরখা–খদ্দর প্রচারের কথা নিবেদন করলেন। কবি কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না। এতে শরৎচন্দ্র একরূপ রাগ করেই কবির কাছ থেকে চলে এলেন।'

সীতা দেবীর স্মৃতি কথায় দিনটি ছিল ২৩শে জুলাই।

এই মতান্তরের কারণে শরৎচন্দ্র অন্তত কিছু সময়ের জন্য অন্যতম রবীন্দ্রবিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরে অবশ্য অনেকটাই ; অন্তত চরখা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতামত বদলে যায়।

তবে একথাও ঠিক যে রাজনীতিক মতামতের তৎপরতার কারণে রবীন্দ্রনাথের অনেক ঘনিষ্ঠ ও স্নেহের মানুষদের সঙ্গে তাঁর তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

বিদেশ থেকে ফেরার পর এই বিষয়টি কবিকে মানসিকভাবে বিরক্ত ও উত্তপ্ত করে রাখে অনেক দিন। একদিকে ছিল অমোঘ বিশ্বাস ও অন্যদিকে ছিল যুক্তি-তর্ক। ১৯২১ সালের ২৬শে জুলাই কবির এমনই এক অবস্থার কথা প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ জানিয়েছেন এডোয়ার্ড টমসনকে। চিঠিতে তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে জানিয়েছিলেন যে কীভাবে রাজনীতিকরা কবিকে উত্তপ্ত করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে,—

... 'জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেসী নেতা) দু-তিন দিন এসে অসহযোগ ও চিরন্তন চরখার আদর্শ বোঝাবার জন্য দীর্ঘ বিতর্ক করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, ছয় মাস চরখা ঘুরিয়ে স্বরাজ লাভ করা যাবে। জিতেন্দ্রলাল বলেন, এটি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, কেউ যদি তাঁকে এসে বলে কোনো পান্ডার দুটি পা তিনদিন ধরে পূজা করলে সে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবে তাহলে তিনি পূজা করবেন বটে, কিন্তু এভাবে স্বর্গে যেতে তাঁর আপত্তি আছে। ছ'মাস চরখা ঘুরিয়ে যে স্বরাজ পাওয়া যায় তা স্বরাজই নয়।'

আসলে, রবীন্দ্রনাথ স্বরাজ চান ; তার দাবিও যুক্তি সংগত কিন্তু কংগ্রেস নির্দেশিত পথে নয়। কোনো পৌত্তলিকা বা অলীক বিশ্বাসের হাত ধরে নেয়। দেশবাসী এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরাশ হলেন না। নানাভাবে দেশবাসীকে বোঝাতে চাইলেন। ১৯২১ সালের ৬ই আগস্ট তিনি আশ্রমবাসীদের কাছে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ছিল দেশবাসীর মনোভাবের পরোক্ষ সমালোচনা। যে মনোভাবে দেশবাসী গান্ধীজীর ফতোয়াকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে চলেছে ; তারই ওপর প্রশ্ন তোলেন রবীন্দ্রনাথ। 'চরখা' কে তিনি ব্যক্তি-বিশেষের খেয়াল বা কল্পনা বলে উদ্ধৃত করেন। তিনি বললেন,—

...'পশ্চিমদেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্র নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। ... কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিকাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই।'

বিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে পশ্চিমের মনীষীরা আশঙ্কিত হয়ে বলেছেন, যে-দুর্বুদ্ধি থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের মতন বিনাশের উৎপত্তি এত দুঃখ-কষ্টের পরেও তার 'নাড়ি বেশ তাজা' আছে। তারপরেই বলছেন,—

... 'এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টো দিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান।'

এর প্রতিকারের পথ তিনি নির্দেশ করেছেন—

'স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।'

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবাদকে চিনতে পেরেছিলেন এবং যুগের বাণী হিসাবে ঠিকই বলেছিলেন। তিনি একথা বলতে পেরেছিলেন কারণ নিজের দেশে তিনি ছিলেন সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। রাষ্ট্রবাদকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রবাদের পরিণতি যে সাম্রাজ্যবাদে সেটা তখন তাঁর গোচরে আসেনি। তিনি তার কাছাকাছি পৌছতে চাইছেন 'রিপু', 'লোভ', 'অহমিকা' ইত্যাদির দ্বারা। যে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ ডেকে আনে ; তাকে বুঝবেন আরও পরে। ততদিন পর্যন্ত তাঁর অন্বেষণ চলতেই থাকবে। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে চরখার প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত না করে স্বরাজ প্রাপ্তির উপায় হিসাবেই প্রচার চালাতে থাকবে। মাঝে-মাঝে চেষ্টা হবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরকে চেপে দেবারও। কিন্তু কবি থাকবেন অবিচলিত।

এমনই ঘটনা ঘটেছিল যখন ১৯২১ সালের ১৫ই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরিষদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পাঠ করতে উঠলে জনতা 'বন্দেমাতরম্' 'মহাত্মাগান্ধী কি জয়' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকে। শ্লোগানের মাধ্যমেই যেন তারা বুঝিয়ে দিতে চায় যে তারা কবির কাছে কী শুনতে চায়। রবীন্দ্রনাথও জনতার এই মনোভাব বুঝে নেন। তিনি বুঝতে পারেন এ এক উত্তাল ঢেউ যা শান্ত হবে তার নিজস্ব নিয়মেই। তাই অবিচলিত থেকেই প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করে দেন। কিন্তু এই কংগ্রেসীদের ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন না। তিনি প্রবন্ধ পাঠের আগেই তাঁদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন তাঁর প্রবন্ধ পাঠের মাঝখানে করতালি না দেন ; কারণ তিনি জানেন শ্রোতারা সবরকম বিদেশী জিনিস পরিত্যাগ করেছেন, আর করতালি দেওয়াটা স্বদেশী প্রথা নয়। এমনটাই জানিয়েছেন রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল। এই বক্তৃতা সভার কিছুটা আঁচ আমরা পেয়ে যাই ১৯২৬ সালের ২৭শে জুন তারিখে রম্যাঁ রলাঁর ডায়রি থেকে। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছে শুনেছেন,—

... 'সাধারণত কবিকে বিরাট জয়ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হতো, কিন্তু তার বদলে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এক জমাট বাঁধা স্তব্ধতা। যদি পুরনো প্রভাব, কবি হিসেবে তাঁর মহাগৌরব না থাকতো, তিনি খুন হয়ে যেতেন, তাঁকে ছিঁড়ে ফেলতো।' ...

অসহযোগ ও বয়কট সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা প্রচার হতে থাকে। বাংলায় এর মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেয় রবীন্দ্র-বিরোধী অসহযোগী কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের পত্রিকা 'নারায়ণ'। বাংলায় উল্লেখযোগ্য বিরোধটি এল জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এর আগে একবার তিনি কবির বাড়িতে গিয়ে এই বিষয়ে কবির সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে বিরোধে উঠে চলে আসেন। এবার তিনি শিক্ষার বিরোধ নামে প্রবন্ধ লেখেন এবং সেটি 'নারায়ণ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথও দমবার পাত্র নয়। আলফ্রেড থিয়েটারে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ১৮ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে আর একটি ভাষণ দেন। সেখানে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অবদানকে স্বীকার করে নেওয়ার কথা আছে এবং সেই সঙ্গে আছে স্বরাজ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা। স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে ঘৃণা কোনোদিনই ভারতের মানসিকতায় ছিল না। ঐতিহাসিক দেশপ্রেমে তাঁর বিশ্বাস নেই। পুঁথি পড়া রাষ্ট্রবাদের কোনো আবেদনও তাঁর কাছে নেই। স্বরাজের আদর্শ যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখতে হবে শিক্ষাও স্বরাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। শিক্ষার দুটি দিক আছে—বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক। প্রথমটির জন্য আমাদের অবশ্যই পশ্চিমের দ্বারাস্থ হতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণটি মাদ্রাজের New India পত্রিকাতে মুদ্রিত হয় ২০শে আগস্ট তারিখে।

যাইহোক শরৎচন্দ্রের মত পরিবর্তন হয় এবং আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে ছিল,—

...'এসব নিশ্চই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্বের সে স্নেহ মমতা আর নেই। চরখা নন-কোঅপরেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক।

আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জনা করিবেন।'...

গান্ধীজী নিজপথে এগিয়ে চললেও, কোথাও যেন একটা রিক্ততা অনুভব করতেন। এই রিক্ততা ছিল চরখা, স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কবির নিঃশর্ত সমর্থন না পাওয়া। একজন রাজনৈতিক হিসাবে বিপুল জনসমর্থন পেলেও রবীন্দ্রনাথের মতন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করতে না পারাটা ছিল তাঁর এক ব্যর্থতা। তাই তিনি নিজে এ বিষয়ে সচেষ্ট হলেন।

সীতা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল অসহযোগ ও খিলাফত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি আদায় করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আমাদের জানা। তাঁর পক্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে খিলাফতের মতো সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দাবিকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাঁর তাত্ত্বিক সমর্থন থাকলেও পদ্ধতিগত অর্থাৎ বিদেশী কাপড় পোড়ানো, বিদেশী শিক্ষা বর্জন এবং চরখায় সুতো কেটে স্বরাজলাভের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাই গান্ধীজীকে বিফল মনোরথ হয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কৌতুক করে বলেছিলেন,—

'আপনি আসিবেন জানিলে একটা খদ্দেরের পোষাক জোগাড় করিয়া পরিয়া থাকিতাম।'

সীতা দেবী লিখেছেন 'মহাত্মা গান্ধী শুনিয়া খুব খুশি হইয়াছেন।' কিন্তু তিনি সত্যই খুশি হইয়াছেন কিনা আমাদের জানা নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সফল

হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সোজাসুজি কোনও মন্তব্য না করলেও প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে লোকে মোটামুটি ওয়াকিবহাল হন এবং তারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও নানান আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করা হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মনে হলো এই দিগ্‌ভ্রান্তদের তাঁর অবস্থান আরও সঠিকভাবে বোঝানো উচিত। তাই তিনি 'সত্যের আহ্বান' নামক আর একটি প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে একটি সভায় পাঠ করলেন। সীতা দেবী লিখেছেন,—

...'বক্তৃতার আরম্ভে বা শেষে গান-টান কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সময় হইবামাত্র মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধটি তীব্র-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কিছু কড়া সমালোচনা ছিল ইহার মধ্যে।

শ্রোতাদের ভিতর হইতে দুই-তিনবার রব উঠিল, 'গান্ধী মহরাজকি জয়'। কিন্তু একটু ক্ষীণভাবেই, বিশেষ জোর যেন আপত্তিকারীরা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সে সব যেন গ্রাহ্যই করিলেন না।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে প্রথমেই গান্ধীজীকে স্বীকৃতি জানালেন এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর কারণের ব্যাখ্যা করলেন। কবি লিখেছিলেন,—

... 'বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকাননি, ... এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। ... তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে।'...

আসলে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন যে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ নয়। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভাল এবং তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধাস্বরূপ তিনি যে কথাগুলি বললেন তা সেই সময়ে ছিল একেবারেই নতুন। তখনো পর্যন্ত কোনও গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এইরকম কথা বলেননি যা কবি বলতে পারলেন। তাই সভায় স্লোগানের ধ্বনি ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এর পরেও তাঁর কথা বললেন তাঁর মতন করেই,—

...'কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।' ...

রবীন্দ্রনাথ এবার বলতে চাইলেন দুঃখের বিষয় হলেও এই মন্ত্র প্রদান গান্ধীজীর এবং মন্ত্রপ্রাপক অধিকাংশ দেশবাসী। গান্ধীজী এই উপদেশ দিয়েছেন কোনও যুক্তি আশ্রিত বিচার-বিবেচনার দ্বারা নয়, বরং তাঁর অন্তরের বাণী বা খেয়াল-খুশীই এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। বিদেশি বস্ত্র ইংরাজের তৈরি সুতরাং তা অপবিত্র তাই সেই বস্ত্রকে পুড়িয়ে ফেলে চরখায় সুতো কেটে নতুন বস্ত্র তৈরি করতে হবে। সকলে মিলে এই উপদেশ পালন করলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটবে ; এমনটাই গান্ধীজী বিশ্বাস করেন। এটা যে অন্ধবিশ্বাস সে কথা কবি বলতে চাইলেন। তবু, অন্ধবিশ্বাস হলেও, গান্ধীজীর ডাক দেশের মানুষ শর্ট-কাটের প্রলোভনে চিন্তা-ভাবনা না করে সাড়া দিয়েছে এবং যারা ভিন্ন মতের পথিক তাদের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে,—

'স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য ও কালসাধ্য ; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই।'

রবীন্দ্রনাথ আর একটি কথা বললেন ; সেটি গান্ধীজীর বিদেশী কাপড়কে 'অপবিত্র' বলা প্রসঙ্গে,—

'অপবিত্র' কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা, তাকে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্র-শাস্ত্রের মধ্যে টেনে আনা বুদ্ধির ব্যাভিচার।'

তবে একথাও ঠিক ; রবীন্দ্রনাথের পথ ছিল বিলম্বিত পথ ; যে পথ নির্ভর করে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিকাশের ওপর। রাজনীতি কোনও বিলম্বিত পথে যেতে চায় না সে তাৎক্ষণিক ফল চায় আর তা পাওয়া না গেলেও সে অন্তত তাৎক্ষণিক ফল-লাভের আশ্বাসটুকু চায়। পরিস্থিতির নির্মাণে, পরিস্থিতির চাপে এবং নেতৃত্বের সুযোগ লাভে ও তাকে কায়েম রাখতে গান্ধীজীর কাছে ওই ছলনাটুকু ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। নাহলে উত্তাল জন-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণহীন দিশাহীন হয়ে আরও বেশি হিংস্রক পথে নিজেদের অবলুপ্তি ঘটাত। ব্যারিস্টার গান্ধী 'মহাত্মা' হওয়ার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনে যে পথে এগিয়েছিলেন ভারতে তিনি তাঁর থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ খোলা-মনে সমর্থন জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী বিলক্ষণ জানতেন যে ভারতবর্ষ একটি ধর্মপ্রাণ দেশ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ধর্ম পৌত্তলিকতা নির্ভর। সেখানে বিশ্বাসটাই বড় কথা অবিশ্বাসটা নয়। তাই নিজে সহজাত দক্ষতায় প্রেরণাসঞ্চারী শক্তি হয়ে ওঠার পর জনতার কাছে জনতার দ্বারা সেই যুক্তিহীন বিশ্বাসটুকুই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন জনতা একটা বিশ্বাস নিয়ে একটা কাজে, আবদ্ধ থাকুক। তিনি নিজেকেই সেই বিশ্বাসের অন্তর্গত রেখেছিলেন নাহলে জনতা সেটিকে গ্রহণ করত না। আর দৃঢ়চেতা গান্ধীজী একবার যে কথা বলে ফেলেছেন,—তার থেকে সরে আসা বা পশ্চাৎপদ হওয়া গান্ধীজীর ধাতে ছিল না। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন তাঁর নিজস্ব রীতিতে। সেটি ছাপা হয়েছিল ১৯২১ সালের ১৩ই অক্টোবর Young India-তে। প্রবন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল যে দেশে ব্যাপক আকারে এরূপ অন্ধ আনুগত্য দেখা দিয়েছে (তাঁর প্রতি) বলে তিনি মনে করেন না। তিনি সর্বদা দেশবাসীর যুক্তি বুদ্ধির কাছেই আবেদন জানিয়েছেন এবং সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে চরখার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি অনেক চিন্তা ও দ্বিধার পরেই প্রচার করেছেন।

এই বিতর্কের কোনও অবসান বা সমাধান হয়নি। কংগ্রেস গান্ধীজী নির্দেশিত চরখা ও খদ্দরের পথকেই গ্রহণ করেছে। এবং কবি থেকে গেছেন প্রত্যন্তে। এমনকি কবির আত্মীয়-পরিজনেরা যাঁরা কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে ছিলেন ; তাঁরাও কবির মনোভাবকে অনুসরণ না করে খদ্দর-চরখার পথেই ধাবিত হন। সেক্ষেত্রে তাঁদের ওপর বর্ষিত হয় কবির তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ বাণী। অবশ্য সেসব সোজাসুজি তাঁদের না বলে অন্যত্র প্রকাশ করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন,—

'সরলা (সরলা দেবী চৌধুরী) কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ঘোরতর মিশনারিগিরি করে গেছে। নারী-মিশনারীরা কি পদার্থ তা ত জানই—তারপরে সরলা আবার যে-সে নারী নয়। এখানকার

পাচ্ছিল। যদিও এই ডিনার পর্ব থেকে একজন অন্তত বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে উঠে বেরিয়ে আসেন। তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বাসন্তী দেবী সহ অন্যান্য মহিলাদের মুক্তি দিয়ে দেয়। আইন অমান্য আন্দোলনে ভাটা পড়েনি। শহরে জেলগুলি ভর্তি হয়ে গেলে সরকার ক্যাম্প জেল প্রবর্তিত করে এবং সেখানেও জায়গা না হওয়ায় আন্দোলনকারীদের ওপর বেটন চার্জ করে। যুবরাজের কলকাতা আসার কথা ছিল ২৪শে ডিসেম্বর। কিন্তু বিপর্যস্ত আইন-ব্যবস্থা দেখে লর্ড রোনাল্ডশে কিছুটা দমে গিয়ে চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করতে। শর্ত রেখেছিলেন সমস্ত অসহযোগীকে মুক্তি দেবেন। চিত্তরঞ্জন অসম্মত হলে অবশেষে ১০ই ডিসেম্বর অন্যান্য কংগ্রেস ও খিলাফত নেতাদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্থানে সেনা মোতায়েন করে যুবরাজের শোভাযাত্রা বেরয়।

এইরকম উত্তেজনা ও আলোড়নের মধ্যে কংগ্রেসের ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশনটি ১৯২১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে আহমেদাবাদে আরম্ভ হয়। অন্যান্য অধিবেশনগুলির মতন এই অধিবেশন তিনি দিবসিয় না হয়ে দুই দিনই সমাপ্ত হয়ে যায়। এই অধিবেশনটি ছিল যেন নিয়মরক্ষারই প্রয়োজনে। কারণ অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন সেই সময়ে জেলে ছিলেন। তাঁর জায়গায় কার্যনির্বাহী সভাপতি করা হয় হাকিম আজমল খানকে। এই অধিবেশনে শুধুমাত্র ৪৭৬২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন কারণ সভাপতিসহ প্রায় ৪০,০০০ কংগ্রেস কর্মী অসহযোগ আন্দোলনের কারণে বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন। অধিবেশনে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি ছিল যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হোক এবং বর্তমানে এই অসহযোগ আন্দোলনকে পরিবর্তিত করে 'সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলন (Civil Disobedience) রূপে সরকরের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আরম্ভ করা হোক। আশা করা হয়েছিল যে সরকার এবার এই নতুন আন্দোলনের স্বরূপে বিচলিত হয়ে কথা-বার্তা আরম্ভ করতে চাইবে কারণ গান্ধীজী 'কর প্রদান না করার' প্রচার অভিযান চালানোর প্রসঙ্গও এতে যুক্ত করেন। চিত্তরঞ্জন রচিত সভাপতির অভিভাষণের খসড়াটি গান্ধীজী কয়েক জায়গায় সংস্কার করেন এবং নিজে একটি ভূমিকাও সেখানে যুক্ত করেন। দেখা গেল আহমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ বাদ গেল না। এবার আলোচনার পালা কংগ্রেসের।

চিত্তরঞ্জনের লেখা ভাষণটি সভায় পাঠ করা হয়। ভাষণের প্রথমেই চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতার সমালোচনা করেন। শুধুমাত্র সেখানেই থেমে থাকেননি চিত্তরঞ্জন। তাঁর কারারুদ্ধ অবস্থাতেও ভাষণটির শুধুমাত্র সেই অংশটি যেখানে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা হয়েছিল, বাংলা অনুবাদে তাঁর 'নারায়ণ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একই সঙ্গে ছাপা হয়েছিল একটি ব্যঙ্গ কবিতা। লেখক তাঁর ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন 'দরবেশ'। আসলে কবির যে সমালোচনা কংগ্রেস মঞ্চ থেকে পঠিত হয়েছিল তাতে ছিল গান্ধীজীর সম্মতি কারণ চিত্তরঞ্জনের লেখা সভাপতির অভিভাষণটি গান্ধীজীকে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং গান্ধীজী লেখাটির কয়েক জায়গায় সংস্কারও করেন। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই সমালোচনাটি কংগ্রেস কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের প্রথম আনুষ্ঠানিক সমালোচনা। এতদিন রবীন্দ্রনাথ

একপাক্ষিকভাবে কংগ্রেসের সমালোচনা করেছিলেন। যাইহোক, চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন তাঁর এই সমালোচনাটি বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হোক তাই তিনি সেটা তাঁর নারায়ণ পত্রিকায় ছাপেন। এর আগেও এই পত্রিকা কিছু রবীন্দ্র বিরোধী লেখা ছেপেছিল। কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলা হয়েছিল—

...'We stand then for freedom, because we claim the right to develop our own destiny along our own lines, unembarrassed by what western civilization has to teach us unhampered by the institutions which the west has imposed on us. But here a voice interrupts me, the voice of Rabindranath, the poet of India. He says 'the western culture is standing at our door ; must we be so in hospitable as to turn it away, or ought we not to acknowledge that in the union of the cultures of the east and the west is the salvation of the world?' I admit that if Indian Nationalism has to live, it cannot afford to isolate itself from other nations. But I have two observations to make to the criticism of Rabindranath :-

First, we must have a house of our own before we can receive a guest; and secondly, Indian culture must discover itself before it can be ready to assimilate western culture. In my opinion, there can be no true assimilation before freedom comes, although there may be, as there has been, a slavish imitation. The cultural conquest of India is all but complete ; it was the inevitable result of her political conquest. India must resist it. She must vibrate with national life ; and then we may talk of union of the two civilizations.'

কংগ্রেসের তো বটেই এবং চিত্তরঞ্জনেরও রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন পাশ্চাত্যের কোনও অতিথিকে তাঁর বিশ্বভারতীতে আসতে আহ্বান জানাতেন তখন তাঁর একটা উদ্দেশ্য থাকত। উদ্দেশ্যটি হল প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বা পদ্ধতিতে সঠিকভাবে চর্চার আয়ত্তে নিয়ে আসা। যে সব অতিথিরা এখানে আসতেন তাঁরাও কবির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনও নতুন জিনিস শিক্ষা করবেন; এমনটাই তাঁদের প্রত্যাশার মধ্যে থাকত। মনের মধ্যে এই আশা পোষণ করেই তাঁরা আসতেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সৃজন করতে পেরেছিলেন পরাধীনতার মধ্যেই রাষ্ট্রবাদকে পরিহার করে কোনও অন্ধ মোহ বা সংস্কারের বশে নয় ; কারুর প্রতি অনুগত হয়ে তো নয়ই। তাঁর এই মহৎ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে কারুর কোনও বাধা ছিল না। ইংরাজদেরও নয়। এই কাজে তিনি তাঁর সর্বস্ব পণ করেছিলেন। অর্থাভাব ছিল কিন্তু উদ্যমের অভাব ছিল না। চিত্তরঞ্জন যে সময় তাঁর ভাষণটি লিখেছিলেন সে সময়ে ফরাসি প্রাচ্যবিদ সিলভ্যাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন। অভিভাষণে 'Guest' শব্দটি তাঁর উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছিল।

গান্ধীজীর ঘোষণা করা এক বছরে স্বরাজ প্রাপ্তির সময়সীমা নানান ব্যর্থতায় পেরিয়ে গেল। আলি ভাইদের মুক্তির চেষ্টায় তাঁর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান ও পরিশেষে ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে দেখে তিনি ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকারকে

কিন্তু উক্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে রেল ও স্টিমার ধর্মঘটে মাড়োয়ারি বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জেনে তিনি ধর্মঘট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করেন। আসলে তিনি মনে করতেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশে যে কোনও বড় মাপের আন্দোলন দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ছাড়া হতে পারে না। তাঁদের সমর্থন পাওয়ার জন্য তাঁদের স্বার্থও তাঁকে দেখতে হত। স্বার্থটা অবশ্যই ছিল অর্থকরী লাভ-লোকসান নির্ভর। তাঁরাও অন্যান্য নেতাদের তুলনায় গান্ধীজীর ওপর নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাঁরা মনে করতেন যে কংগ্রেসে যদি বামপন্থী মনোভাব মাথাচাড়া দেয় তাহলে একমাত্র গান্ধীজীই তার থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করতে পারবেন। তাঁরা এক ধরনের মসৃণ কংগ্রেস চেয়েছিলেন যেখানে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন। তাঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন স্বরাজের মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজীকে সরিয়ে এদেশীয় পুঁজীর স্থাপনের। অসহযোগ ও বয়কটের কারণে মিলমালিকেরা প্রচুর লাভ করে। অনেক মিল সুতির মোটা কাপড় বুনে তা খাদি বলে চালায়। খাদিবস্ত্রের ঘাটতি হওয়ায় গান্ধীজী নির্দেশ দেন যে দেশীয় মিলে প্রস্তুত বস্ত্রও ব্যবহার করা যাবে। ধনতন্ত্রের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত ছিল প্রথম থেকেই এবং ক্রমে ক্রমে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে সেটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রবণতা কম-বেশি অন্যান্য রাজনীতিক দলগুলিতেও দেখা যায়।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনকে তার দুর্বলতা থেকে টেনে তুলতে কিছু গরম-গরম বক্তৃতা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ জরুরী হয়ে পড়ে। আলি ভাইরা আবার থেকে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁদের ভাষণে ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে মুসলিমদের উস্কানিমূলক বক্তব্য থাকত। যেমন তাঁরা বলেন যে তাঁদের বর্তমান নীতি গান্ধীজীর মতানুযায়ী হলেও তাঁদের ধর্মমত তাঁর থেকে আলাদা। তাই অহযোগ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে তাঁরা পশ্চাৎপদ হবেন না। এইসব ভাষণ থেকেই শক্তি পেয়ে পাঁচশো উলেমা এক ফতোয়া জারি করে বলেন যে ইসলামি আইনানুযায়ী অমুসলিম সরকারের অধীনে চাকরি করা নিষিদ্ধ আর তাই তাদের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীতে কাজ করা পাপের সামিল। সেই সঙ্গে প্রস্তাব নেওয়া হল যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কোনও মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করা বা যোগদানে উৎসাহ দেওয়া ধর্মীয়ভাবে অনৈতিক।

গান্ধীজী যা চাইছিলেন এঁদের বক্তব্যও ছিল তাই, শুধু তফাৎটি হল এখানে দেশের জায়গায় ধর্ম স্থান গ্রহণ করল। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই গান্ধীজীকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিন্তু আলি ভাইদের এবার আর ছেড়ে কথা কইল না। ১৯২১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর এঁরা গ্রেপ্তার হলেন ও দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের সঙ্গে-সঙ্গে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বিশেষ করে দেশের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে এই বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। দিল্লী, লখনৌ, কানপুর, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

গান্ধীজী এই সুযোগটি লুফে নেন ও নিজের রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যবহার করেন। গান্ধীজীর বিবৃতি উক্ত বিবৃতি থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। সেখানে শুধু 'মুসলিম ধর্মে'র কথাটি ব্যবহার হয়নি। তিনি বললেন এই সরকার আমাদের দেশের আর্থিক, রাজনৈতিক ও

নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী অতএব এই সরকারের অধীনে ; সামরিক বা অসামরিক কোনও ক্ষেত্রেই দেশবাসীকে কাজ করা চলবে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ৫ই অক্টোবর বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও একই প্রস্তাব গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময়ে কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ারদের কাছে বিদেশী বস্ত্রের দোকান থেকে কাপড় লুঠ করে এনে আগুনে নিক্ষেপ করা একটি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। গান্ধীজী এই কাজকে অনৈতিক মনে করেননি।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বোম্বাইতে অবতরণ করলে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হরতাল পালন করা হয়। গান্ধীজী নিজে বোম্বাইতে একটি সভায় স্বহস্তে বিদেশী বস্ত্রের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করেন। কিন্তু এমন নয় যে সকলেই যুবরাজের আগমনে হরতাল করেছিলেন। বিশেষ করে পার্শি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনেকে যুবরাজের শোভাযাত্রা দেখতে যান এবং সেই কারণে অসহযোগীদের সঙ্গে তাঁদের হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্ত হয়। গান্ধীজী কংগ্রেসীদেরই এই ঘটনার জন্য দায়ি করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১৮ই নভেম্বর থেকে পাঁচদিনের জন্য অনশনে বসে যান।

কলকাতায় কিন্তু এই উপলক্ষ্যে ব্যাপক হরতাল পালিত হয়েছিল। হরতালের প্রভাব দেখে সরকারের পক্ষ থেকে কংগ্রেস ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক সংঘকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। শহরে জনসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস মহলে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেওয়া হল। ২৭শে নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির গোপন বৈঠকে চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনকে চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমে দায়িত্ব নেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের পাঁচটি দলে বিভক্ত করে খদ্দর বিক্রয় করতে ও হরতাল প্রচার করতে পাঠানো হয়। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। পরের দিন আবার দশটি দল পাঠানো হলে, কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। কিন্তু পরের দিন চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন এই কাজে গেলে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ৭ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবী, বোন উর্মিলা ও সুনীতি দেবী খদ্দর বিক্রয় করতে গেলে পুলিশ তাঁদেরও গ্রেপ্তার করে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সংবাদ কলকাতার রাজনীতিক মহলে ও জনতার মাঝে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করল। আসলে সরকার যেন আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল যে কাকে গ্রেপ্তার করা হবে আর কাকে নয়। ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে তাদের জানা ছিল কারা-কারা সক্রিয় কর্মী, কে নেতৃত্ব প্রদান করছেন এবং কারা কারা নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন। এইভাবে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে আন্দোলনকে নেতৃত্ব বিহীন করে দিশাহারা করে তোলা এবং জনসাধারণকে ত্রাসিত করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য।

কিন্তু কংগ্রেসে যখন এইরকম সাহসিকতাপূর্ণ গ্রেপ্তার বরণের উদ্যোগ চলছে তখনই কংগ্রেসের একটি অংশ লর্ড রীডিং-এর সম্মানে এক ডিনারের আয়োজন করেছিলেন। এইসব কংগ্রেসী নরমপন্থীরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকের নেক-নজরে থেকে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে যতটা পারা যায় সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নিতে। শাসকের কাছে এই কংগ্রেস ছিল অত্যন্ত প্রিয়। এটা খুবই আশ্চর্যের যে একই সময়ে একই রাজনৈতিক দলে দু-ধরনের মতামত প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'গান্ধীজী, আমি কবিতা, গান আর নাটক বয়ন করতে পারি, কিন্তু আপনার মূল্যবান তুলো দিয়ে আমি কি গোলমেলে বস্ত্র (mess) তৈরি করব।'

রবীন্দ্রনাথ যে গান্ধীজীর আন্দোলনে যুক্ত হননি, সেই খবর জনতা ভালভাবেই জেনে গিয়েছিল। কংগ্রেসের গান্ধীভক্তরা এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে কোনও দিন ক্ষমা করেননি।

আমরা যদি এই সময়ে দেশের নানা ঘটনাবলির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব গান্ধীজীর ঘোষিত এক বছরে স্বরাজের সময়সীমা ব্যর্থতায় পেরিয়ে গেল। যদিও তিলক স্মৃতিরক্ষা তহবিলে এক কোটি পনেরো লক্ষ টাকা তোলা হয়, কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যাও পঞ্চাশ লক্ষ অতিক্রম করে এবং প্রায় কুড়ি লক্ষ চরখায় সুতো কাটা হয়। এই পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন। অর্থাৎ লোকবল, অর্থবল ও মনোবল তিনটিই বিদ্যমান ছিল ; তবু কেন স্বরাজ এল না? এর উত্তর খুঁজতে গেলে ; গান্ধীজী দ্বারা নির্দেশিত সেই সময়ের গঠনমূলক কাজকর্মগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা জরুরী হয়ে ওঠে। যেমন বিদেশী বস্ত্র বর্জন তো করা হল কিন্তু দেশে বস্ত্রের যে চাহিদা সেটা মেটানো গেল না অধিক পরিমাণে সুতো কেটে খদ্দর প্রস্তুত করে স্বদেশী বস্ত্রের দ্বারা। মদের দোকানে ধর্মঘট তো করা হল এবং তার জন্য প্রথম দিকে বিদেশী মদ বিক্রী কিছুটা কমেও গেল কিন্তু মদ্যপানের অভ্যাসেও বিপুল চাহিদার কারণে সেটা সম্পূর্ণ রোধ করা গেল না। একইভাবে বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ বর্জন প্রথম দিকে সাফল্যলাভ করলেও ; তার প্রভাব বেশি দিন স্থায়ী হল না কারণ শিক্ষার্থী হিসাবে দেশী স্কুল-কলেজগুলির সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং সেখানে শিক্ষার মান উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাস ও মোতিলাল নেহরু তাঁদের অত্যধিক পসারযুক্ত লাভজনক আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করলেও তাঁদের সঙ্গী হওয়া আইনজ্ঞদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। নিজেদের উপার্জন ছাড়তে সহসা কেউ রাজী হননি। সালিশী আদালত কয়েক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থায়ী হয়নি কারণ সালিশী সভার নির্ণয় ও নির্দেশ আইন প্রদত্ত না হওয়ায় এবং বাধ্যতা না থাকায় বাদী ও প্রতিবাদীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি।

এতসব নেতিবাচক কার্যকারণের জন্য গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে।

কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় গান্ধীজীর প্রিয় আলি-ভাইরা। বিভিন্ন স্থানে তাঁদের দেওয়া বক্তৃতায় নীতিগত ভাবে গান্ধীজী নির্দেশিত অহিংসার পথে চলার আহ্বান ছিল না ; এমনকি কংগ্রেসের অন্যান্য নীতিগুলিকেও তারা উপেক্ষা করে। খিলাফত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেও ; খিলাফতের অন্তর্গত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক স্বরূপটি অচিরেই প্রকাশ পায়। মাদ্রাজে মুসলমানদের মধ্যে দেওয়া একটি বক্তৃতায় মহম্মদ আলি বলেছিলেন, তিনি প্রথমত মুসলমান এবং আফগানিস্তানের আমির যদি কখনও ভারত আক্রমণ করেন তাহলে এখানকার প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হবে তাঁকে সাহায্য করা। মালাবার মোপলা মুসলিমদের সভায় আবার তিনি বলেন, গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ না হলে তারা যেন অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।

এর ফলে যখন ১৯২১ সালের ২০ আগস্ট মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ শুরু হয় তখন সেখানে প্রধানত হিন্দুদের ওপর নৃশংস অত্যাচার ও ধর্মান্তকরণের ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে।

পরে বৃটিশ সরকার এই বিদ্রোহকে কঠিন হাতে দমন করে। আলি ভাইদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত সেই সময়েই নেওয়া হয়ে যায়। চতুর লর্ড রীডিং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গান্ধীর দলে ফাটল ধরানোর একটি কূট কৌশল গ্রহণ করেন। মদনমোহন মালভিয়া লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হতে পারে যদি তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় বসে কিছু দাবি মেনে নেন। এইভাবে পুরো ব্যাপারটি পুনরায় আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতার ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। মালভিয়া ও অ্যান্ডরুজের ডাকে গান্ধীজী সিমলায় গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে ১৩ই মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত ছ-দিন আলোচনায় বসেন। গান্ধীজীর চেষ্টায় ও তাঁরই লিখিত বয়ানে যা সরকার দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন; আলি ভাইরা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনকে দুর্বল করতে কূট কৌশলী লর্ড রীডিং এমনটাই চাইছিলেন। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে খিলাফত ও পাঞ্জাবের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং নিজে পাওয়া সমস্ত উপাধিগুলিও বর্জন করেন কিন্তু সেই ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁরই দোসর আলি ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁদের দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে কিছুটা হলেও গর্বিত হন। এইভাবে অসহযোগের মূল আদর্শের অবমাননায় দেশের মানুষ যে গুঞ্জন তোলে তাতে গান্ধীজীর আন্দোলনের ভিত অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায়।

১৯২১ সালে আসামের চা বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে একটি ভুল খবর ছড়িয়ে পড়ে যে দেশে গান্ধীরাজ স্থাপিত হয়ে গেছে। এইসব অত্যাচারিত শ্রমিকরা মালিককে না জানিয়ে দলবদ্ধ ভাবে ঘরে ফেরার জন্য স্টিমারঘাটে জমা হন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে এবার বোধহয় দুঃখ-কষ্টের অবসান হল। কিন্তু টিকিট কাটার পয়সা না থাকায় তাদের স্টিমারে চড়তে দেওয়া হয়নি এবং ভিড়কে সরিয়ে দিতে সেখানে গোর্খা রেজিমেন্ট গুলি চালায়। পূর্ববঙ্গে এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একই সময়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে অসাম-বাংলার রেল ও স্টিমার কোম্পানিগুলিতে ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটের ফলে চা-বাগানের শ্রমিকদের নিজেদের দেশে ফিরতে খুবই অসুবিধা হয় এবং চাঁদপুরে আটক চা-শ্রমিকদের মধ্যে মহামারী রোগ কলেরা দেখা দেয়। আসামের এই ধর্মঘট ছিল অসহযোগ আন্দোলনেরই অঙ্গ। সেই সময় যদি অসহযোগের নির্দেশ মানবিক কারণে প্রত্যাহার করে নেওয়া হত এবং দ্রুত এই জনতাকে সেখান থেকে সরানোর জন্য রেলপথ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হত তাহলে এই মহামারী থেকে গরীব কুলী মজুররা অনেকটাই মুক্তি পেত। কিন্তু বাস্তবে তা হতে পারল না কারণ চিত্তরঞ্জন দাস আন্দোলন প্রত্যাহার করতে তাঁর অসম্মতি জানালেন। অ্যান্ডরুজ সেখানে ছিলেন। তাঁর অনুরোধে গান্ধীজী সহানুভূতি জানালেন এবং ব্যথিত হলেন কিন্তু নিজে কোনও মতামত বা নির্দেশ দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ এর খবর পেয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি রমাঁ রলাঁর কাছে এই ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। 'বিনা সহযোগিতায় বিনা সাহায্যে হাজার হাজার মানুষের যন্ত্রণার উপরে অসহযোগের নির্দেশ বহাল' থাকা রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করতে পারেন নি।

মেয়েদের খুব ধিক্কার দিয়ে গেছে। আমাকে জানিয়েছে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সরলা নিজে চরখা কাটে না (তাঁর অবশ্য চরখা-কাটা ছবি আছে)—সে মনে করে তার পক্ষে ওটা জরুরি নয়। চরখা যদি নাও কাটে তাহলে অন্তত ওর উচিত প্রতিদিন চরখা কেটে যে আয় হয় তাতেই জীবিকানির্বাহ করে তার বেশি সমস্তই দেশকে দান করা।'

সেই সময় চরখা কাটা ও অসযোগ আন্দোলনের যে উন্মত্ততা সারা দেশে দেখা গিয়েছিল তার বিরুদ্ধাচারণ করা বা তার থেকে বেরিয়ে আসা খুব একটা সম্ভব ছিল না এবং সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছিল এক বিজাতীয় ঘৃণা ; বিশেষ করে ইংরেজদের ওপর যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ারও উপায় ছিল না। সব মিলিয়ে দেশে ছিল এমনই এক উন্মাদনা যার দ্বারা বিদেশি মাত্রই অসম্মানিত বা অপমানিত হতে পারে। এই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য অবশ্যই দায়ী ছিল ইংরেজ সরকার যা আন্দোলনের জোয়ারে আরও বেশি বর্দ্ধিত হয়। দেশের সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা হয় যখন অমিয় চক্রবর্তী H. G. Wells-কে যে চিঠিটি লিখেছিলেন সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে যে চিঠিটি লেখেন,—

...'আমার ইচ্ছা আছে একসময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করব। সম্প্রতি আমাদের দেশের লোক বিদেশের লোকের প্রতি যে রকম বিমুখ হয়ে আছে ঠিক এই সময়ে কারো এসে কোনো ফল হবে বলে মনে করি নে।'

চিঠিটির পরবর্তী অংশে আছে গান্ধীজীর আদর্শ ও দর্শনের প্রতি কবির তীব্র ও কঠিন মন্তব্য। কবি লিখেছিলেন,—

...'গান্ধী বলেন, পৃথিবীর লোক Science-এর নাম করে অনেক পাপ করছে। কিন্তু ধর্মের নাম করে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপ করে। আমাদের দেশে যে Untouchability নিয়ে তিনি কিছুদিন লড়েছিলেন সেও ত ধর্মের উপরে টিকে আছে—আরো এমন হাজার হাজার পাপ আছে। সতীদাহও ত ধর্মানুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তাই বলে ধর্মটাকে ত কেউ অন্তত মহাত্মা — ঝাড়েমূলে উপরে ফেলতে পরামর্শ দেন না।'

কিন্তু 'মহাত্মা' তাঁর 'গুরুদেবের' সমর্থন আদায় করতে পরিশ্রান্ত হলেও হাল ছেড়ে দিতে চাননি একেবারে। তিনি বারংবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁর সাধ্য মতন। ১৯২১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আবার তিনি জোড়াসাঁকোয় এলেন রবীন্দ্রনাথকে অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ বুঝিয়ে সমর্থনের আশায়। আসলে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পাওয়ার তাঁর কাছে খুব জরুরি হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি চাইছিলেন এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেন একটি শব্দও ব্যয় না হয়। রাজনীতির নিয়মই হল বিরোধির অবলুপ্তি ঘটানো। বিরোধিকে নিজের দলে টেনে নিয়ে সেটা ঘটানো যত সহজ ; তত সহজ বোধহয় অবলুপ্তির ব্যাপারে আর কিছুই হতে পারে না। গান্ধীজী জানতেন রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ; তাঁকে রাজনীতিতে টানলে কাজের কিছু হবে না কিন্তু একবার যদি তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারা যায় তাহলে সেটাই হবে তাঁর দলভুক্ত হওয়া। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ক্রমাগত বিরোধী বিবৃতিতে আন্দোলনে একটা প্রশ্নচিহ্ন উঠতে আরম্ভ

করে দিয়েছিল বিশেষ করে বিদ্বৎ সমাজে। শুধু বিবৃতি বা প্রবন্ধ লিখেই নয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিশেষ করে 'ঘরে-বাইরে' সমাজে তুমুল আলোড়ন তোলে।

তাই জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের দোতলায় অ্যান্ডরুজের উপস্থিতিতে প্রায় চার ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যান গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাঁরা দুজনেই চাননি যে তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক। এই গোপনতার কারণ অনুমান করা যায়। হয়ত তাঁদের মনে হয়েছিল যে এই আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে পরিণতি তিক্ততায় পর্যবসিত হতে পারে এবং জনমানসে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এই ব্যাপারে দুজনেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে উভয়ের আলোচনা যখন চলছে, তখন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগী অনুগামীরা জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণেই বিলিতি বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে পৈশাচিক উল্লাসধ্বনিতে মেতে ওঠেন।

১৯২১ সালের ২৭শে নভেম্বর লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর শান্তিনিকেতনে আসার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার বিবরণ তাঁর কাছে বিবৃত করেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বিবরণটি তাঁর দিনলিপিতে লিখে রাখেন এবং অনেক দিন পরে তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৭৫ সালে 'Poet & Plowman' নাম গ্রন্থে তা প্রকাশিত হয়। এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর লেখা বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেদিনের আলোচনা অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ, চরখা ও অহিংসা বিষয়ে হয়েছিল। আলোচনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন শানিত যুক্তি সহ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে আক্রমণ করেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে,—

'গান্ধীজী বললেন, 'গুরুদেব আমি ইতিমধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য আনতে সমর্থ হয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি একমত নই। আপনি হিন্দু ও মুসলমান-কে এক রাজনৈতিক মঞ্চে পাশাপাশি বসিয়ে ব্রিটিশ রাজের উদ্দেশে চাবুক আস্ফালন করাতে পেরেছেন। আপনি জানেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য আমার কোনো দরদ নেই। কিন্তু আপনার মুসলিম ও হিন্দু অনুরাগীদের হৃদয়ে ও মনে আপনি এই ঐক্যের অনুভূতি কতটা গভীরভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন? যদি ব্রিটিশরা চলে যায় বা যেতে বাধ্য হয়, হিন্দু ও মুসলমানরা কি শান্তিতে বাস করবে? আপনি জানেন, তা হবে না।'

গান্ধীজী বললেন, 'কিন্তু, গুরুদেব, আমার স্বরাজের আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে অহিংসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই শান্তিবাদী কবি হিসাবে আপনি এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করে এর পক্ষে কাজ করতে পারেন।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'গান্ধীজী, আমার বারান্দায় এসে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনার তথাকথিত অহিংস অনুগামীরা কি করছে। তারা বাজার থেকে কাপড় চুরি করে এনেছে। এখন তারা আমারই উঠোনে সেগুলি জ্বালিয়ে উৎসব করছে, তারা এখন আগুনের চারদিকে উন্মত্ত তান্ত্রিকের মতো চিৎকার করছে। গান্ধীজী, এর নাম কি অহিংসা?'

...গান্ধীজী বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনার সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। আপনি যখন আমার জন্য কিছুই করতে পারবেন না, তখন এইটুকু করুন ... গুরুদেব, আপনি সুতো কাটতে পারেন। আপনি কেন সমস্ত ছাত্রদের আপনার চারপাশে বসিয়ে সুতো কাটেন না?'

ব্রিটেনের পঞ্চম জর্জ এসেছিলেন তখন সেখানে মোতিলালাজীও আমন্ত্রিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পরার জন্য তিনি স্যুট-হ্যাট ইত্যাদি লন্ডনের বিখ্যাত দর্জীর কাছে তৈরি করিয়েছিলেন। সেগুলি সেসময়ে লন্ডনে থাকা জওহরলাল দেশে পাঠিয়ে দেন। একই কথা চিত্তরঞ্জন দাস সম্পর্কেও বলতে হয়। জনশ্রুতি আছে ওঁর জামাকাপড় প্যারিসের লন্ড্রি থেকে কাচিয়ে আনা হত। তবে এঁরা গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে নিজেকে অনেকটাই বদলে ফেলেছিলেন এবং বিলাসমুখীন জীবন এঁদের আর কাম্য ছিল না। তবে আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে গান্ধীজীর মতন হয়ে উঠতে এঁরা কেউই পারেননি। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব ছিল কিন্তু সেটা ওপর থেকে চাপান ; স্বতস্ফূর্তভাবে নয়।

যাইহোক, কংগ্রেসের ৩৮তম অধিবেশনটি গয়ায় (বিহার) ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২২ থেকে ১লা জানুয়ারি ১৯২৩ পর্যন্ত ৭ দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে এত দীর্ঘস্থায়ী কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন কখনও হয়নি ; এবারই সেটা প্রথম হল। হয়ত নেতারা আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে আলোচ্যসূচিতে এমন কিছু আছে যা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা হতে পারে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাস। ইংরাজীতে Sister and Brothers' বলেই সম্বোধন করেন চিত্তরঞ্জন। তাঁর ভাষণে অত্যধিক আগ্রহ সৃষ্টিকারী ও সাহিত্যিক গুণের হয়েছিল। ভাষণের প্রথমেই তিনি গান্ধীজী ও তাঁর ওপর চলা মোকদ্দমা বিষয়ে বলেছিলেন। ভাষণের বাকি অংশে ছিল আইন-ব্যবস্থার ইসুগুলি। ভাষণটিকে সেই অর্থে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। তিনি অনেকগুলি দৃষ্টান্তসহ ব্রিটেনের আইন ব্যবস্থার বিবেচনা করেন। ভারতে ইংরাজদের দ্বারা লাগু করা আইনগুলির প্রতি তিনি মন্তব্য করেন। 'রাষ্ট্রবাদ' সম্পর্কে তিনি দেশের ঐক্যকেই ভিত্তি হিসাবে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি স্বরাজের দাবিকে পুনরায় উত্থাপন করেন। ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া এবং ইতালীর বিপ্লব-বিক্ষোভগুলিরও তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর ভাষণে আর একটি কথা বলেন যে নরমপন্থী উদারবাদী ও মডারেটরা চরমপন্থী, গরম দল বা রাষ্ট্রবাদীদের ওপর প্রায়ই এই অভিযোগ করেন যে তাঁরা যুব-শ্রেণীকে দিকভ্রষ্ট করার জন্য উত্তেজিত করতে থাকেন। এইখান থেকেই চিত্তরঞ্জনের ভাষণে একটি ভিন্ন ধর্মী সুর শুনতে পাওয়া যায়। কংগ্রেসীরা নড়ে-চড়ে বসেন। তারপর বলেন এঁরা আসলে নিজেরাই 'হিপোক্রেট'।

চিত্তরঞ্জন তাঁর ভাষণের পরবর্তী অংশে 'সরকারের যোজনা' এবং 'ভবিষ্যতের সরকার কেমন হোক?'—এই পর্যায়ে বড়ই দার্শনিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্তুত করেন। তিনি বলেছিলেন,—

'আমি এমন সরকার চাই না যে গোরাদের হাত থেকে বেরিয়ে ভারতীয় মধ্যবিত্ত আমলাদের হাতে তা চলে যাক। এটা 'স্বরাজ্য' হবে না। প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে ছোট ইউনিটিটিও নিজস্বতায় স্বাধীন হবে তখনই বাস্তবে স্বরাজ আসবে।'

শ্রীদাস 'বারদৌলী আন্দোলন' প্রসঙ্গে স্কুল-কলেজ এবং সরকারি চাকরির বয়কটের বিষয়টিও তোলেন। তিনি বলেন রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের গঠন শিক্ষামূলক না হয়ে রাজনৈতিক ছিল। যদি কংগ্রেস স্কুলের ছাত্রদের সরকারি ফাঁদ থেকে ছাড়াতে চায় তাহলে ওদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সংস্থাগুলিতে পাঠাতে হবে, রাজনৈতিক ডেরাগুলিতে নয়। সাধারণ বয়কটের জন্য জনসাধারণ এখনও মন থেকে তৈরি নয় এবং এই ভাবনাটিও অব্যবহারিক বলেই মনে হয়।

তিনি বলেন সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যগুলির অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন যে—'খাদী আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের প্রতীক। স্বরাজের প্রতীক খাদী। একথা মনে করে আপনারা সকলে খদ্দর ধারণ করুন। 'স্বরাজ এবং খাদী' আমাদের উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির সাধন বলেই মনে হয়। চরখা চালোনোটা কোনও ব্যবসা বা কারবার নয়। একটা উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্যই আমরা একে বাছাই করেছি।'

সভাপতির অভিভাষণের পর কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণই ছিল এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কাউন্সিলে নির্বাচনপন্থী ও নির্বাচনবিরোধী সদস্যদের মধ্যে কোনও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাউন্সিল প্রবেশ-এর প্রস্তাবটি যেখানে সভাপতির দ্বারা অন্তঃকরণ থেকে সমর্থিত হয় সেখানেই কংগ্রেসের বহুসংখ্যক মতের দ্বারা এক সার্বিক বিরোধ হয়। এই বিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি। অন্যদিকে স্বরাজপন্থীদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস। কাউন্সিল প্রবেশের ইসু সম্পর্কে জামীয়ত-উল-উলেমারা একটি ফতোয়া জারি করেন এবং বলেন যে কাউন্সিল প্রবেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। শেষ বাজি রাজাগোপালাচারি জিতে যান। তিনি 'কাউন্সিল প্রবেশ' -এর বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি অধিবেশনে পাশ করিয়ে নেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারি গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করেন ও নতুন সভাপতি নির্বাচন করার জন্য সদস্যদের আহ্বান জানান। একই দিনে বিকেলে তিনি নির্বাচন-পন্থী গোষ্ঠীকে নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের ভিতরেই কংগ্রেস-খিলাফত-স্বরাজ পার্টি নামে একটি উপদল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে-সঙ্গেই পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খান, বিটঠল ভাই প্যাটেল, এন. সি. কেলকার, এম. আর জয়াকর, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতি প্রায় ১১০ জনের স্বাক্ষর করা একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেখানে চিত্তরঞ্জনকে সভাপতি এবং মোতিলাল নেহরু, বীরেন্দ্র শাসমল, বিটঠলভাই প্যাটেল ও চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয়।

এছাড়া গয়া অধিবেশনে অকালিদের শৌর্য ও অহিংসার জন্য প্রশংসা করা হয় এবং তুরস্কের কামাল পাশাকে অভিনন্দন জানানো হয়। চিত্তরঞ্জন আর বিলম্ব না করে মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে মিলিতভাবে বসে 'Civil disobedence ? Committee-র কয়েকটি ইসু নিয়ে আলোচনা করেন। চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন যে ইংরাজ সরকার দ্বারা তৈরি করা কাউন্সিলগুলিতে প্রবেশ করা যাক এবং সেখানে নিজেদের কথা জোর দিয়ে বলা হোক। কিন্তু এইভাবে কংগ্রেস পার্টিতে একটি ফাটল ধরে যায়। বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় বক্তা চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্ব এবং পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর সাংগঠনিক শক্তি এই কাজকে ত্বরান্বিত করে।

কংগ্রেসের এই নতুন পার্টিতে অনেক নেতারা সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেসের এই ভিন্ন পার্টিটির পরিকল্পনা ছিল বিধানসভার ভেতরে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আইনের সাহায্যে লড়াই করার। আসলে চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল দুজনেই ছিলেন সেই সময়কার দুঁদে ব্যারিস্টার। পরবর্তীকালে এই স্বরাজ পার্টিটি যা কংগ্রেসে ভিন্ন ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তৈরি করা হয়, মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদও প্রাপ্ত করে।

অন্যদিকে গুজরাটের কবি দলপতরাম অসহযোগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য জানার জন্য যে চিঠিটি লিখেছিলেন এবং কবিকে পাঠানোর আগে সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথও একটি চিঠি লেখেন এবং চিঠিটি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত করেন এবং তারপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি দলপতরামের হাতে পৌঁছয় ১২ই ফেব্রুয়ারি। চিঠিটি পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি দায়িত্ব বিমুখতার অভিযোগ করে ১৮ই ফেব্রুয়ারি আর একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠান। তিনি বলতে চেয়েছিলেন দেশের সংকটাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন না করে অন্য কথা ভাবছেন যা পরে ভাবলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ নানালাল দলপতরামকে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লেখেন,—

'I am afraid you have misunderstood me. I never harbour in my mind the mood of Asahakar with my people. I follow the path by which I can be of service to them and which I believe will lead us to permanent benefit. All political methods mostly deal with the immediate and have success for their aim, but I have faith in a patient pursuit of the good which can afford to fail and yet through the obscurity of failure take its own time to reveal itself. The growth which is real is not a product of magic or hypnotism, but of life which wins its future by its own inherent truth. I have chosen my own practical field of work–not mere turning out of verses–and through it I hope the idea which I consider to be true and vitally needful for my country will one day be realised.'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তব্য নানাভাবে নানাজনকে বারংবার বলেছেন ; লিখিতভাবে প্রকাশও করেছেন কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক দশায় রবীন্দ্রনাথকে ভুল বোঝাবুঝির পালা সাঙ্গ হয়নি কখনও। যাইহোক, ১৯২২ সালের ২৮শে জুলাই বিশ্বভারতী সম্মিলনীর ব্যবস্থায় কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন,—

...'কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। ... অসহযোগ আন্দোলনের তাড়নায় একদল ছেলে সুরুলে পল্লিসেবা করতে এসেছিল, যতদিন কলকাতা ও কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে তাদের যোগ ছিল ততদিন কাজ চলেছিল আর সেই যোগ ছিন্ন হতেই সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আসলে তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ঘরে সমস্ত মন নিয়ে প্রবেশ করতে পারেননি, পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে দীর্ঘকালসাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হননি—কারণ তাতে কোনো উন্মাদনা নেই।' ...

রবীন্দ্রনাথ খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন যে কংগ্রেসের রাজনীতিতে উন্মত্ততা ও উন্মাদনা যতটা আছে দেশকে প্রকৃত ভালবাসা ও দেশবাসীর দুঃখ মোচনের সত্য নেই। তাই

তিনি বলেছিলেন উন্মত্ততার কারণটি চলে গেলে দেশ আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমরা এই দৃশ্য উপলব্ধি করেছি।

কিন্তু আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বহু কংগ্রেস কর্মীদের কাছে থেকে গেছেন এক প্রাণের মানুষ হিসাবে। পেয়েছেন বহু আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সম্মান। পুণা থেকে বাঙ্গালোর রওনা হবার পথে ১৯২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বেলগাঁও স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে বিপুল জনতা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন অ্যান্ডরুজ এবং মাদাম লেভি। খিলাফত কমিটির সভাপতি মৌলবি কুতবুদ্দিন, জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে মালা পরানো হয়। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবোধের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে মাতৃভূমির জন্য যে গুরুভার দায়িত্ব তাঁর গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁর সহমর্মী। কিন্তু তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি নয়। শিক্ষা হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়। এই কাজে তিনি সকলের সহায়তা প্রার্থনা করেন। কংগ্রেসের সেক্রেটারি মোরেদকর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মারাঠি ভাষায় শ্রোতাদের কাছে বুঝিয়ে বলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'আধ্যাত্মিক' ও 'ধর্মীয়' শব্দ দুটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন কারণ পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতীতে তাঁর কাজকর্মই সেটা বুঝিয়ে দেয়।

দেশের রাজনীতিতে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্র ও শিক্ষা বর্জন প্রভৃতি কারণে রবীন্দ্রনাথ বহুবার গান্ধীজীর মতাদর্শের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও তাঁর ত্যাগ ও কষ্টবরণের প্রতি কবি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ১৯২২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কবি নিজের অন্তরের টানেই অ্যানডরুজকে সঙ্গে নিয়ে সাবরমতী আশ্রমে যান। এর আগেও তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ২রা এপ্রিল ; তখন গান্ধীজী সেখানে উপস্থিত। কিন্তু এবার গান্ধীজী কারাগারে। তাঁর অবর্তমানে আশ্রমে এসে বললেন,—

'মহাত্মাজী আজ আপনাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মা আপনাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। মহাত্মাজী আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই আত্মশুদ্ধিতেই আপনাদের মুক্তি নিহিত L..ত্যাগের দ্বারাই সৃষ্টি হয়—কখনও ধ্বংস হয় না। আমরা সেই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মহাত্মার হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় এক যোগসূত্রে বাঁধিতে পারিব এবং তখন প্রকৃত মহাত্মার কর্মের অংশী বলিয়া গণ্য হইব।'

রবীন্দ্রনাথ সেখানে অল ইন্ডিয়া খাদি বিদ্যালয়তেও যান। নীতিগতভাবে গান্ধীজীর বিপক্ষে থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অকৃত্রিমতা, সাদাসিধেভাব, সহজ জীবনযাত্রা, শ্রমমুখিনতা ও ত্যাগ স্বীকারজনিত কঠোর জীবনযাপন কবিকে আকর্ষণ করেছিল এবং কবির হৃদয়ে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার বীজ বপন করেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে দলগতভাবে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক ছিল না। উল্টে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা রাজনীতির দিক থেকে গান্ধীজীর অনুগামী হলেও মানসিকতা ও আচার-আচরণে ছিলেন একেবারে ভিন্ন। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা সর্বমান্য বরিষ্ঠ নেতা মোতিলাল নেহরুর দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে উনি পাশ্চাত্য জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। উত্তরপ্রদেশে আসা প্রথম মোটরকারটি তাঁর কাছেই ছিল। ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে যখন

কারণ তিনি চাইছিলেন না যে যুবরাজের ভারত আগমনের সময় কোনও বড় রকমের অপ্রীতিকর বিক্ষোভ ঘটুক ও যার জবাবদিহি তাঁকে করতে হোক। তাই তখন তিনি গান্ধীজীর কার্যকলাপ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তিনি আসলে মনের মধ্যে এটা রেখে দিয়েছিলেন উচিত সুযোগের ব্যবহারের জন্য। আর এবার সেই সুযোগ তাঁর হাতে এসে যায়। মুসলিম নেতাদের গ্রেপ্তার ও হিন্দু গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার না করে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ কিছুটা হলেও বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া তিনি চাইছিলেন অসহযোগ আন্দোলন দুর্বল করে তোলার জন্য মুসলিমরা এই আন্দোলন থেকে সরে আসুক। তার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসলিমদের সমর্থন আদায় করার জন্য লর্ড রীডিং ভারতসচিব মন্টেগুকে বারংবার অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হোক। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতা মহম্মদ শফিও তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছিলেন তুরস্কের সঙ্গে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করার জন্য। অবশেষে ১৯২২ সালের ২রা নভেম্বর তিনি ভাইসরয়কে একথা জানাতে ভোলেননি যে মিত্রশক্তি যদি পবিত্র তীর্থগুলি খলিফার হাতে তুলে দেয়, তাহলে তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন থেকে মুসলিমদের সরিয়ে আনতে পারবেন। একইসঙ্গে তাঁর দাবি ছিল মিত্রশক্তিকে ইস্তাম্বুল, ত্যাগ করতে হবে এবং স্মার্না ও থ্রেস তুরস্ককে ফিরিয়ে দিতে হবে। ভাইসরয় শফির যুক্তিকে সমর্থন দিতে অযথা দেরি করেননি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এইভাবেই স্বরাজপন্থী ও খিলাফতপন্থীদের আলাদা করে অসহযোগ আন্দোলনের ভিত নড়বড়ে করে দেওয়া যাবে। ১৯২২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি এই উদ্দেশ্যে সরকার ভারতসচিবকে একটি বিশেষ তারবার্তা পাঠায়। কিন্তু শুধু তারবার্তা পাঠিয়েই লর্ড রীডিং সন্তুষ্ট ছিলেন না। মুসলিমদের কাছে তিনি এই বার্তা তুলে ধরতে চাইছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের কথা ভাবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কাজকর্ম করতে চায়। প্রমাণ হিসাবে কিছু একটা তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল যাতে তারা ব্রিটিশ সরকারকে বিশ্বাস করে। তাই মন্টেগুর কাছে ওই পাঠানো তারবার্তাটি জনসম্মুখে প্রকাশ করার সম্মতিও আদায় করে নেন রীডিং। রীডিং-এর এই চতুর পদক্ষেপকে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সম্মতি প্রদান করার জন্য পার্লামেন্টে রক্ষণশীল সদস্যরা মন্টেগুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন এবং তার পরিণামস্বরূপ ভারতসচিব মন্টেগু ১৯২২ সালের ৯ই মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

মন্টেগুর উদারনৈতিক মনোভাবের কারণেই রীডিং এতদিন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করতে পারছিলেন না। একদিকে সেই বাধা সরে যাওয়া এবং অপরদিকে চৌরিচৌরার কারণে গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা হারানোর অমূল্য সুযোগ তিনি হাতে পেয়ে গেলেন। কিন্তু গান্ধীজীকে সরাসরি গ্রেপ্তার করার জন্য একটি অজুহাত অন্তত তাঁর দরকার ছিল। সেটি তিনি নিজেই খুঁজে নিলেন। Young India পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীজীর লেখা চারটি প্রবন্ধকে তিনি রাজদ্রোহমূলক ঘোষণা করেন। অবশেষে সাবরমতী আশ্রম থেকে তাঁকে ১০ই মার্চ গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনায় দেশবাসী দুঃখিত হলেও দেশে কোনও বিক্ষোভ দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই খবর পেয়ে শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমায় 'বসন্তোৎসব' ও 'মুক্তধারা' অভিনয় তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেন।

অথচ এই বিক্ষোভ ও আইন শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার এতদিন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করতে গড়িমসি করছিল। আহমেদাবাদের জেলা জজ সি. এন. ব্রুমফিল্ড-এর আদালতে তাঁর ওপর মোকদ্দমা চালানো হয় এবং তিলকের মতনই তাঁকেও রাজদ্রোহের অপরাধে ৬ বছরের সাজা শোনানো হয়। গান্ধীজী কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে নিজের সব অপরাধ স্বীকার করেছিলেন এবং একই সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক দর্শন-প্রণালীরও বিবেচনা সম্মত বক্তব্য জজের সামনে রাখেন। জজ এবং জুরিরা তাঁর বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে শুনেছিলেন। এই বিচার প্রক্রিয়ায় জজ বলেছিলেন যে আমি আজ পর্যন্ত যে সব শ্রেণীর মানুষের বিচার করে এসেছি অথবা আজ যাঁর ওপর বিচার করব সেই গান্ধীজী যদিও সর্ব অর্থেই সেই শ্রেণী থেকে ভিন্ন ; তবুও একথা মনে রাখতে হবে যে আইন কোনও ব্যক্তির সম্মান করে না। এই বিচারের অভিনব দিকটি হলো গান্ধীজী নিজেই আইন অনুযায়ী নিজের প্রতি কঠিন থেকে কঠিনতর সাজার দাবি জানিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জজ তাঁর প্রতি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে ৬ বছরের কারাদণ্ডটি নমনীয় হয়ে 'বিনাশ্রমে' করে দেন। গান্ধীজীকে পুণার ইয়ারওয়াদা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার করে দেশবাসীর প্রতি গান্ধীজী যে অন্যায় করেছিলেন, তার সমালোচনা, ধিক্কার ও অপমান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর এই কারান্তরালের সুযোগে সময় ক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। হয়ত তাই তিনি বিচারের সময়ে সমস্ত দোষ স্বীকার করে নেন। তাঁর এই দোষ স্বীকার করে নেওয়াটাও রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দ হয়নি। কিন্তু এই একজন ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলন নির্ভর করছিল বলে গান্ধীজীর কারারুদ্ধ অবস্থায় বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটল। নেতারা যদিও একটা চেষ্টা করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন নেতা জেলের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে আগামী ১৯২৩ সালের আইনসভার নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এবং এইভাবেই সরকারি প্রস্তাবগুলিকে বাধাদান করে শাসনযন্ত্রকে অচল করার চেষ্টা করবেন। একই সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা দখল করে তাঁর যথাসম্ভব গঠনমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে স্বায়ত্তশাসনের পথ খুলে দেবেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর অন্ধভক্ত নেতারা যেমন রাজাগোপালাচারি, বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডা. এম. এ. আনসারিরা এই কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করলেন, অথচ দেশবাসীকে কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি দিতেও পারলেন না।

অতঃপর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের একটি বৈঠক নভেম্বর মাসে ডাকা হয়। মিটিং-এ সেই রিপোর্টটির ওপর নির্ণয় নেওয়ার ছিল, যাতে এই খোঁজ করার জন্য সম্পূর্ণ দেশে ঘুরে বেড়ানো হয়েছিল যে 'অসহযোগ আন্দোলন' পুনরায় আরম্ভ করা উচিত কি না। দ্বিতীয় ইস্যু ছিল কাউন্সিলে কংগ্রেস প্রবেশ করবে কি না। নেতারা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় নির্ণয়টি অধিবেশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় যা আগামী মাসেই হওয়ার ছিল। অধিকাংশ প্রধান কংগ্রেস নেতারা তখন জেলে, তবুও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির মতো যেসব নেতা বাইরে ছিলেন তাঁর, বেদনা পেলেন কিন্তু কোনও সক্রিয় আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পারলেন না।

চরমপত্র দিলেন যে সরকার যদি অবিলম্বে তার নীতি পরিবর্তন না করে তাহলে তিনি 'আহমেদাবাদ অধিবেশনের' নির্ণয় অনুযায়ী অসহযোগীদের নিয়ে গুজরাতের সুরত জেলার এক ছোট তহসিল বারদৌলী থেকে খাজনা বন্ধের মাধ্যমে সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলন আরম্ভ করবেন। ভাইসরয় গান্ধীজীর কোনও শর্ত মানে রাজী হলেন না। ওঁরা গান্ধীজীর দুর্বল সময়টিকে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে গান্ধীজীও নতুন আন্দোলনটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সাফল্য-অসাফল্যের মাপকাঠিতে আন্দোলনটি কতটা জনপ্রিয় হবে; সে বিষয়ে কংগ্রেস নেতাদের মনে দ্বিধা ছিল। তাই গান্ধীজীর নিজের প্রদেশের একটি ছোট জায়গাকে বেছে নেওয়া হয় যার জনসংখ্যা তখন মোটে ৮২০০ ছিল। গান্ধীজী জানতেন যে অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গায় কম জনসংখ্যার ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রভাব বেশি হতে পারে।

কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা ও আয়োজনকে মুলতবী করতে হল। কারণ উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের কাছে চৌরিচৌরা গ্রামে ঘটে যাওয়া এক দুঃখজনক ঘটনা। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিকরা 'দুর্ঘটনা' বলে অবহিত করেছেন। জনতার মাঝে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের এটি ছিল পরীক্ষার প্রথম সোপান। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরায় আন্দোলনকারিদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। যখন পুলিসের গুলি শেষ হয়ে যায় তখন তারা একটি অট্টালিকায় আশ্রয় নেয়। উত্তেজিত ভীড় সেই অট্টলিকায় আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সেই ২২ জন পুলিস কর্মীদের যারা গুলি চালিয়েছিল আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। একই দিনে বেরিলিতেও দাঙ্গা বাধে এবং সেখানকার ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতর আহত হন ও প্রতিহিংসা বশত পুলিশ গুলি চালিয়ে বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে।

এইসব ঘটনার কথা জানতে পেরে গান্ধীজী দেশে অহিংসক আন্দোলনের ব্যবহার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হন। তিনি ৯ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাই এসে পণ্ডিত মদন মোহন মালভিয়া, জিন্না, জয়াকর প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর ১১ই ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে কংগ্রেস ওয়র্কিং কমেটির অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনার পর ১২ই ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীজী চৌরিচৌরা ও বেরিলির ঘটনার জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ পাঁচদিনের অনশন আরম্ভ করেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাটের কবি নানালাল দলপতরামের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসলে গান্ধীজী যখন বারদৌলী তালুকে খাজনা বন্ধের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তখন নানালাল দলপতরাম ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চেয়ে একটি খোলা চিঠি বোম্বাই অঞ্চলের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর এইরূপ আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ নিরুত্তর থাকেননি। তিনিও ৩রা ফেব্রুয়ারি একটি খোলা চিঠি লিখে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠান। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সংবাদপত্রগুলি তাঁর চিঠি ছাপেনি। তারপর রবীন্দ্রনাথ দলপতরাম ও তাঁর চিঠি দুটি নিজস্ব মন্তব্য সহ ছাপাবার জন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে দুটি চিঠিই 'The Bengalee' এবং অন্যান্য ইংরেজি পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি লিখেছিলেন চৌরিচৌরার ঘটনার আগে এবং সেটি ছাপা হয়েছিল ঘটনাটির পরে; কিন্তু

চিঠিটিতে সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কিত কবির পরোক্ষ মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছিল যা কবি পূর্বেও কয়বার বলেছেন এবং নিজ বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতে নিজ বিশ্বাস অর্পণ করেও তার ব্যবহার সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা উক্ত ঘটনাটির বিশ্লেষণ করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

...'But like every other moral principle 'Ahimsa' has to spring from the depth of mind and it must not be forced upon man from some outside appeal of urgent need. The great personalities of the world have preached love, forgiveness and non violence, primarily for the sake of spiritual perfection and not for the attainment of some immediate success in politics or similar department of life...No doubt through a strong compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclination for a limited time, but when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I cannot think it possible of attainment. The conditions of South Africa are not nearly the same, and fully knowing the limitations of mine I restrict myself to what I consider as my own vocation, never venturing to deal with blind forces which I do not know how to control'.

অহিংসা বিষয়ে কিছু কথা রবীন্দ্রনাথ গুজরাটের কবিকে লিখলেও এই চিঠিতে তাঁর গান্ধীজী সম্পর্কিত সমালোচনার সুরটি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি লেখার দু'দিন পরেই চৌরিচৌরার ঘটনাটি ঘটে।

১৯২১ সালে 'আহমেদাবাদ অধিবেশনে গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ১৯২১ সালে আরম্ভ হওয়া আন্দোলনটিকে ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালেই স্থগিত করে দেওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে অনেক নেতা গান্ধীজীর ওপর রুষ্ট হন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ভারতের মতন বিশাল একটি দেশে চৌরিচৌরার মতন সামান্য ও ব্যতিক্রমী ঘটনায় বিচলিত হয়ে এমন একটি আন্দোলনকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দুঃখভোগ সহ কষ্ট নিবারণের সম্পর্ক ছিল। দেশবাসীর আশাভঙ্গ হওয়ায় মুসলমিরাও আলি ভাইদের প্রশ্নে তাঁর থেকে সরে যাচ্ছিলেন। এমনই সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের একটি বৈঠক দিল্লীতে হয় যেখানে গান্ধীজীর প্রতি অবিশ্বাস প্রস্তাব আনা হয়েছিল। যদিও সেই প্রস্তাব পাশ করানো যায়নি, কিন্তু জনতার সামনে গান্ধীজীর ভাবমূর্তি আর আগের মতন অতটা উজ্জ্বল থেকে যায়নি। দেখা গেল গান্ধীজীর অনেক একনিষ্ঠ ভক্তও তাঁর কাজের আলোচনা করতে লেগেছেন।

চতুর ভাইসরয় লর্ড রীডিং এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। শরিয়তের নামে মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিরোধিতা করতে প্ররোচনা দেওয়ায় ফতোয়াধারীদের সঙ্গে আলি ভাইদের গ্রেপ্তার করে কারাবাসে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীরা সেই সময়ে সব সম্প্রদায়ের কাছে একই আহ্বান জানালেও রীডিং তখন তাঁদের গ্রেপ্তার করেননি।

সারা ভারতে প্রাথমিক প্রচার ও মতামত গঠনের পর এলাহাবাদে মোতিলাল নেহরুর বাসভবনে ১৯২৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি স্বরাজ পার্টির কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি ছিল তাঁদের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে তাঁরা যে কর্মসূচি নির্ধারণ করেন; তার মধ্যে প্রথম ছিল আইনসভায় প্রবেশ করে সমস্ত সরকারি কার্যের বিরোধিতা করা। দ্বিতীয়ত সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান করা। তৃতীয়ত নানাবিধ বিল ও প্রস্তাব উত্থাপন করে রাষ্ট্রীয়তাবাদের অগ্রগতিতে সাহায্য করা এবং চতুর্থ হল সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে বিদেশী শোষণ বন্ধ করা। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে শাসনব্যবস্থাকে ভেতর থেকেই অচল করে দেওয়া স্বরাজ পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

স্বরাজ পার্টির জন্ম হওয়ায় নরমপন্থীরা (লিবারেল) একা হয়ে যায়। কাউন্সিলে প্রবেশ করা হোক অথবা না হোক এই ইসুতে কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় হিতসাধনের বিপক্ষে কাজকর্মগুলিকে রুখতে কাউন্সিলে প্রবেশ ছিল অনিবার্য এবং অন্যদিকে যদি কাউন্সিলে প্রবেশ না করা হয় তাহলে আগামী ৩ বছর পর্যন্ত এর বাইরে থাকতে হবে। গয়া অধিবেশনে কংগ্রেস-কাউন্সিল বহিষ্কার বিষয়ক প্রস্তাবটি ১৯২২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর রাজাগোপালাচারি তুলেছিলেন এবং ডা. এম. এ. আন্সারী অনুমোদন ও সরোজিনী নাইডু সমর্থন করেছিলেন। প্রস্তাবটির পক্ষে ১৯৪০ টি মত ছিল এবং পরিবর্তনপন্থীদের পক্ষে ৮৯০টি মত পাওয়া গিয়েছিল। এইভাবে অপরিবর্তনপন্থীদের নেতারা ছিলেন রাজাগোপালাচারি, সারদার বল্লভভাই প্যাটেল, ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং ডা. এম. এ. আন্সারী। পরিবর্তনপন্থীরা কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফতের দ্বারা স্বরাজ পার্টি তৈরি করেছিলেন। পরের দিন 'কংগ্রেস' ও 'খিলাফত' শব্দ দুটিই তাঁরা সরিয়ে দেন। শুধু 'স্বরাজ পার্টি' নামেই এই দলটি বিখ্যাত হয়।

স্বরাজ পার্টির আবির্ভাবের কারণ শুধু অসহযোগ আন্দোলনের অসাফল্যই ছিল না, বরং গান্ধীজীর কার্যকলাপ এবং কার্যপদ্ধতির প্রতি অবিশ্বাসও ছিল। কারণ স্বরাজ দলভুক্তরা অসহযোগের কার্যপদ্ধতিকে রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের জন্য সময়োচিত মনে করতেন না। এমনিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসে কাজকর্মগুলিকে নিয়ে মতপার্থক্যজনিত হালকা বিভাজন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়াতে এক ধরনের বিরোধের পরিস্থিতি খোলা-খুলিভাবে সামনে এসে যায়। এইসব কারণে কংগ্রেস সদস্যদের মনে হতাশা ও কুণ্ঠা স্থান করে নেয়। ১৯২২ সালে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন, তখনই তিনি একটি নতুন দল গঠনের পরিকল্পনা করে নেন। ডা. পট্টভিসিতারমাইয়া এই ব্যাপারে একটা খুবই জুতসই কথা বলেছিলেন,—

'যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'গয়া কংগ্রেসের' সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর কাছে দুটি দলিল ছিল—এক হাতে ছিল তাঁর সভাপতির ভাষণ, দ্বিতীয় হাতে ছিল সভাপতির পদত্যাগ পত্র এবং স্বরাজ পার্টির গঠন ও স্থাপনা সম্পর্কিত নিয়ম ও উপনিয়ম।'

এবার একটু কংগ্রেসের নরমপন্থীদের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। তাঁরা লিবারেল ফেডারেশন নামে একটি সংস্থা গঠন করে এবং ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে অন্যান্য কংগ্রেসীরা সেই নির্বাচন বয়কট করে। সুতরাং

নরমপন্থী মডারেটরা খুব সহজেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব পেয়ে যায়। এঁরাও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রিপদ নেন। এঁর মনে করেছিলেন যতটুকু ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকবে তারই যথাযথ ব্যবহারে তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের দ্বারা নিজেদের জনপ্রিয় করে তুলবেন এবং সরকারের কাছে আরও সংস্কার দাবি করে ধীরে-ধীরে ঔপনিবেশিক আওতার মধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের পথ প্রশস্ত করবেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রধানত লিবারেল দলের সমর্থন ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক রকম থাকেনি। মন্টেগুর পদত্যাগ ও গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নতুন ভারতসচিব লর্ড পীল যিনি এলেন, নীতিগত দিক থেকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মানসিকতায় দৃঢ়চেতা ছিলেন। ১৯২১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইনসভায় যখন ভাইসরয়কে অনুরোধ জানানো হয় যে তিনি যেন ভারতসচিবকে ১৯২৯-এর আগেই শাসন সংস্কার পুনর্বিবেচনা করতে বলেন তখন কিন্তু সরকারেরও তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর গ্রেপ্তার হওয়ায় অসহযোগ আন্দোলন এমন দিশভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং অবশেষে সমাপ্তির পথ ধরল যে লর্ড পীল মডারেটদের কোনও অনুরোধ-উপরোধকে আর বিবেচনাযোগ্য মনে করেননি। ১৯২২ সালের ২রা আগস্ট ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ তাঁর ভাষণে ইংরাজ আই.সি.এস. দ্বারা শাসিত ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে প্রশংসা করে সিভিল সার্ভিস ও সৈন্যবাহিনীর অধিকতর ভারতীয়করণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এই রকম মত প্রকাশে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না কারণ ঔপনিবেশিক শাসনকে বজায় রাখতে গেলে এই ব্যবস্থাই তো নিতে হবে বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষ দুর্বল ও প্রতিবাদহীন।

সব মিলিয়ে মডারেটদের সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। ভারতে দ্বৈতশাসন প্রণালীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি যেসব দপ্তরের দায়িত্ব ভারতীয় মন্ত্রীরা পেয়েছিলেন, সেখানে দেখা গেল বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করেনি সরকার। ফলে সেই সব মন্ত্রীরা প্রয়োজনমত কাজকর্ম করতে পারছিলেন না। সেই কারণে জনতার কাছে তাঁদের অযোগ্যতার অপবাদ ও কাজ না করার অভিযোগ শুনতে হচ্ছিল। একথাও ঠিক যে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কারণে মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব কমেছিল এবং তুলনামূলক ভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় অনেক বেড়েছিল। এইসব কিছুকে অতিক্রম করতে লবণশুল্কের প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব সরকার করে এবং দেশীয় সদস্যরা আইনসভায় তা দুবার প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ভাইসরয় তাঁদের আপত্তির প্রতি বিশেষ কর্ণপাত না করে নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে তা পাশ করিয়ে দিলে জনসাধারণের চোখে মডারেটদের মর্যাদা অনেক কমে যায়। আমরা আগেও দেখেছি যে ১৯২৩-এর নির্বাচনে তরুণ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন এলেমদার ব্যক্তি এবং আরও অনেক বিখ্যাত মডারেট নেতাদের পরাজয় তাঁদের রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। এঁরা আর কোনও দিন কংগ্রেস রাজনীতিতে মাথাচাড়া দিতে পারেননি। তার জন্য তাঁদের দুঃখ থাকলেও ব্রিটিশ আমলে অবশ্য তাঁদের অনেকে সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হননি।

অসহযোগ আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই খিলাফত আন্দোলনও সংকটের মুখে পড়ে এবং তারও অবলুপ্তি ঘটে। এর কারণ হল প্রথমত এই আন্দোলনের প্রধান নেতা আলি ভাইরা তখন জেলে; দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় সারির নেতাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর তেমন প্রভাব ছিল না এবং তৃতীয়ত তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও মুস্তফা কামালপাশার দ্বারা সেখানে রাষ্ট্রবাদী সরকারের স্থাপনা।

দেশে যখন কংগ্রেস রাজনীতির এমনই ডামাডোল অবস্থা তখন ১লা আগস্ট ১৯২২ সালের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমেই বিধুশেখর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। সংগীতবিভাগের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ কর তিলক সম্পর্কে কবিতা 'তিলক তর্পণ', গঙ্গাধর খন্দকার তাঁর জীবন কথা ও অনুজান আচান তাঁর অসামান্য বিদ্বতার কথা উল্লেখ করে দুটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অ্যান্ডরুজ ও কালীমোহন ঘোষও তাঁর চরিত্র ও দেশসেবা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়।

এছাড়া ১৯২৩ সালের ১৮ই মার্চ গান্ধীজীর কারাবাসের মেয়াদ ১ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বিধুশেখর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন হয় শান্তিনিকেতনে। সভাপতির বক্তব্য ছাড়াও মেয়েদের গান ও গিরিধারীলাল নামক জনৈকের প্রবন্ধ পাঠ ও নেপালচন্দ্র রায়, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, পিয়ার্সন প্রভৃতির আলোচনাও সেখানে হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছিলেন না। কাশী, লখনৌ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের কারণে বাইরে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও কংগ্রেসের কিছু নেতৃত্বের সঙ্গে যে আন্তরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল শান্তিনিকেতনে উক্ত অনুষ্ঠানগুলি সেই বার্তাই বহন করে। কবি তাঁর শান্তিনিকেতনে সমকালীন রাজনীতির ছোঁয়া লাগার বিরোধী ছিলেন কিন্তু ব্যক্তির ত্যাগ স্বীকার, সত্য-নিষ্ঠা ও দেশের দুঃখ মোচনে সংগ্রামের আন্তরিকতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন।

তবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যাই হোক না কেন, তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল দেশে ভিন্ন ভাবে ঘটে যাচ্ছিল যার ওপর কংগ্রেসীদের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমরা দেখেছি স্বরাজ দলের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তাঁদের বিরোধীরা দেশের জন্য কোনও গঠনমূলক কার্যসূচি সামনে আনতে পারেননি এবং গান্ধীজীর প্রতি অন্ধ ভক্তিতে অটল থেকে কার্যত রাজনৈতিক সন্ন্যাসের পথ ধরে নেন। তুরস্কে খলিফা পদের উচ্ছেদ ও কামাল পাশার রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠনে খিলাফত আন্দোলন অবান্তর হয়ে পড়ে। এই অবসরে হিন্দু মহাসভা শক্তি সঞ্চয় করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে শুদ্ধিযজ্ঞ দ্বারা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনায় ব্রতী হন। ব্যাপারটির মধ্যে অস্বাভাবিক বা অনৈতিক কিছু মনে হয় না অন্তত এর বাহ্যিক রূপ দেখে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন সংস্কারপন্থী আর্য সমাজের নেতা। তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে এঁদের জন্য শুদ্ধিযজ্ঞের প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু সমাজে ফিরে আসার পথ প্রশস্ত করেন। কিন্তু এইরকম কাজ করতে গিয়ে তিনি একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিয়ে ফেলেন। কারণ মুসলিমরা এর প্রতি তীব্র আপত্তি জানায়। গান্ধীজী যে অদূরদর্শিতায় অবাস্তব ও একান্তভাবে সাময়িক হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ঘটিয়েছিলেন; খিলাফতের মতো অবান্তর দাবি আদায়ের প্রচেষ্টায়; সেই ঐক্য এবার ভেঙে পড়ল। এর পরিণতি ঘটে দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দু ও মুসলমানদের

মধ্যে দাঙ্গায়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়। ১৯২৩ সালের ১১ই এপ্রিল অমৃতসরে, ২৮শে এপ্রিল মুলতানে, ২৩শে জুলাই আজমীরে এবং ২৬শে জুলাই মীরাটে ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দেয়। এপ্রিল মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত দাঙ্গা অব্যাহত থাকে। দাঙ্গার এই ধারাবাহিকতা ও সময়ের এই কালানুক্রমিকতা প্রমাণ করে যে এই দাঙ্গা কোনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। একে পূর্বপরিকল্পিত ভাবেই ঘটানো হয়েছে। জওহরলাল নেহরু সেটা বুঝেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর গ্রন্থ আত্মচরিত-এ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সহ উত্থাপন করেন—

...'সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে সেটাই সম্ভবতঃ দেশে এক নতুন বিপদের সৃষ্টি করল। রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিষ্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হলেও অবরুদ্ধ হিংসা বের হওয়ার পথ খুঁজতে লাগল এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী কয়েক বছরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ এর ফলেই তীব্র হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসংঘ-সমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, এই অবস্থার সুযোগে তারা বাইরে এসে পড়ল।'...

আমরা দেখেছি অতীতে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন এবং এই দুটিকে মিশিয়ে ফেলে আন্দোলন প্রভৃতিকে সমর্থন জানাননি। এবং বারংবার তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের যে আশঙ্কা ছিল সেটাই সত্য হল আন্দোলনগুলির পরিণতিতে।

যাইহোক, এইসব পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু ১৯২৩ সালে ১৯শে আগস্ট জোড়াসাঁকোয় গিয়ে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন ও তাঁর মতামত 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকার ৩১শে অগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশ করেন। সেখান থেকেই মতামতটি চাঞ্চল্যকর হওয়ায় বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশ পায়। আসলে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর সমকালে সারা বিশ্বে ঘটে যাওয়া যে কোনও ঘটনার প্রতি সজাগ ছিলেন এবং নিজে যা বুঝেছেন তা স্পষ্ট বলতে দ্বিধা করেননি। ঘটনার চরিত্র যাই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপাত সেখানে হতই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণও করতেন তাঁর ঘনিষ্ঠরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন পিয়ার্সন, এলমহার্স্ট, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতিরা। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও তাঁর ভাবনা-চিন্তায় ছিল একধরনের যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক প্রসার যার অন্তরালে ছিল মানবদরদী মন। তাই ওঁরা ঘটনার ভাল-মন্দ নির্বিশেষে কবি মনের নির্যাস পেতে চাইতেন। কবি যেন একাধারে হয়ে উঠেছিলেন অভিভাবক। এটা শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই ছিল না, সারা দেশেই মানুষ কবির মনোভাব ও মন্তব্য জানতে চাইতেন।

সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসুর সাক্ষাৎকারে কংগ্রেসে দলাদলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে ভিন্ন দলের উদ্ভব হতেই পারে কিন্তু তা যেন পারস্পরিক দোষারোপের পর্যায়ে না যায়।

অর্থাৎ কংগ্রেসে ভিন্ন দল গঠনকে কবি খারাপ চোখে দেখেননি, উল্টে মনে করেছেন সেটা মত প্রকাশের স্বাধীনতারই নামান্তর। দল গড়া, দল ভাঙা, দলাদলি সবই কবির কাছে গণতন্ত্রেরই

বহিঃপ্রকাশ। গান্ধীজীর খেয়ালখুশি মতন একপেশে ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ও খিলাফতকে সমর্থন কবি মেনে নিতে পারেননি। মেনে নেননি চরখা সম্পর্কে তাঁর সংস্কারও। তাই গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে আন্দোলনেরও সমাপ্তি ঘটল। যদি সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলে মেনে নিত তাহলে এমনটা ঘটত না। কিন্তু কবি নতুন দল গঠনকে সমর্থন করলেও 'পারস্পরিক দোষারোপ' করাকে নিষেধ করেছেন। কবি মনে করতেন এইভাবে পরস্পর কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়িতে কুৎসা ও নিন্দার পথ প্রশস্ত হবে এবং বিচ্ছেদ ও বিভেদ বৃদ্ধি পাবে যাতে উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য প্রতিহত হতে পারে। কিন্তু রাজনীতিতে বাস্তবতা হল এটাই যে পারস্পরিক দোষারোপ না হলে রাজনীতিই হয় না। একজনকে হেয় না করলে অন্যজন উৎকৃষ্ট বা মহার্ঘ হয় না। সেকাল থেকে একালেও এটাই দেখতে অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু কবি এক আদর্শায়িত গণতন্ত্রের পথ ধরেই রাজনীতি চেয়েছেন। স্পষ্ট করে না বললেও কবি যেন চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ দল গঠনে তাঁর সায় আছে এমনটাই উক্ত মন্তব্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কংগ্রেসের কাউন্সিলে প্রবেশ করা বা না-করা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,—

কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই, কিন্তু কোনও একটা জিনিস চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে দেশের উন্নতি করার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। গড়ে তুলতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। আমাদের নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, গাঁয়ে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজেদেরই স্থাপন করতে হবে।

আসলে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ দল যে কারণে কাউন্সিলে প্রবেশ করতে চেয়েছে সেই কারণগুলি কবিকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। তিনি চেয়েছেন ব্রিটিশের প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতার চেয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অনেক ভাল। কিন্তু নিজেদের হাতে স্বাধীন ক্ষমতা না এলে সব কিছু গোড়া থেকে গড়ে তোলা যায় না। স্বায়ত্তশাসনে যে ক্ষমতাটুকু পাওয়া যায় তার দ্বারা অভীপ্সা পূরণ হয় না কারণ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ থাকে বিদেশী শাসকের হাতে। সেখানে সব অনুরোধ উপরোধই শাসকের করুণা নির্ভর। চিত্তরঞ্জনরা চেয়েছিলেন শাসকের আইনের দ্বারাই শাসকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় নামতে। কবির তাতে সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না।

কবি জানতেন যে নতুন ভারতশাসন আইনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি স্বায়ত্তশাসন পেয়ে কাজ করে জনসাধারণের মনে যে প্রভাব বিস্তার করছে তা সরকারের পক্ষেই যাচ্ছে। তাই তিনি বললেন,—

'সাধারণের অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে, লোকের মনের উপর সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তার হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে। ... তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।'

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,—

'একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে, একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোনো ভাবে যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট। ... হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে-পল্লীতে যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি

গড়ে উঠে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলি ক্রমশঃ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে যা আর কোনো মতে সম্ভবপর হবে না।'

কংগ্রেস রাজনীতির প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এক সমস্যা রূপেই দেখা দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় তা বিকট রূপ ধারণ করে এবং তার জন্য দেশকে চরম মূল্য দিতে হয়। নিষ্কৃতি যে আজও পাওয়া গেছে তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। তবে যখনি তা সাধিত হয়েছে তখনই ব্রিটিশ শাসককে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সেটা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ হোক কিংবা অসহযোগ বা খিলাফতই হোক না কেন। শাসক তাই কোনক্রমেই চায়নি যে এই ঐক্য গড়ে উঠুক। তারা নানা কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বও এই ঐক্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন কৃত্রিম উপায়ে। গোঁড়া ধর্মীয় অন্ধ-মৌলবাদী কারণগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তুলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়েছেন তারপর সেই ঐক্য ভঙ্গুর হয়েছে নিজস্ব নিয়মেই। পথ দেখিয়েছেন গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে। তারপর যেই সে প্রয়োজন মিটেছে ঐক্য ভঙ্গুর হয়েছে এবং তার পরিণতি দাঁড়িয়েছে হিন্দু-মুসলমানের রক্তাক্ত দাঙ্গায়।

আসলে ভারতে দীর্ঘ দিনের মুসলিম শাসনের অবসানে ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হলে তাদের বড় একটা অংশ ইংরাজদের সংস্পর্শে ও ইংরাজি শিক্ষা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষার অন্ধকারে নিজেদের নিক্ষিপ্ত করে। অন্যদিকে এতদিনের মুসলিম শাসনে শাসকের অনুগ্রহ কিংবা বিগ্রহের অনিশ্চয়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবনযাপনে অভ্যস্থ হিন্দুরা প্রথম থেকেই ইংরাজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যরক্ষায় অন্যতম সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্যই হিন্দুদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু হীনমন্যতা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যে উৎপীড়িত মুসলমানরা হিন্দুদের সহমর্মী প্রতিবেশী না ভেবে এগিয়ে চলা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখতে অভ্যস্থ হল। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা যখন ব্রিটিশ শাসকের কাছে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিল, তখন ইংরাজ শাসকগণ নিজেদের অবস্থান সুবিধাজনক করে তুলতে বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই মুসলিমদের অন্যায় সুবিধার ব্যবস্থা করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করল। তারপরে এলেন গান্ধীজী। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লোভে এবং নিজের আন্দোলনের সাফল্যের লোভে তিনি খিলাফতের মাধ্যমে ভারতীয়দের পক্ষে অবান্তর দাবি আদায়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত অভিমতে কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উপায়ের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন কোনও ধর্মীয় আবেগ বা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নয়।

তবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে আর্যসমাজের শ্রদ্ধানন্দের প্রচেষ্টার কথাও ওঠে যেখানে তিনি ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফেরৎ আনতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং মুসলমানরা তাতে আপত্তি জানিয়েছেন। হিন্দু মহাসভাও এই ব্যাপারে কিছু কাজকর্ম করছে জেনে কবি বলেছিলেন যে হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে বলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে

দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ, হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কাজে তারা চিরকালই সক্রিয়, তাই হিন্দুরা সেই কাজ করতে গেলে তারা কেন বাধা দেবে তিনি তা বুঝতে পারেন না। তিনি অবশ্য একথাও বলেন যে সামাজিক ভেদনীতির ফলে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হওয়াও খুবই কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে অল্প কয়েক মাসের জন্য হিন্দুত্ববাদীদের সংস্পর্শে এসে পড়েন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলা দাঙ্গা এবং এর রাজনীতিক উৎস যা গান্ধীজীর ভুল নীতির পরিণতি বলেই মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ ; তাঁকে হিন্দুত্ববাদীদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। তখনো তাঁদের কণ্ঠে সাম্প্রদায়িক বিষোদ্‌গার হয়নি। অন্তত কবি তা প্রত্যক্ষ করেননি। অপেক্ষাকৃত উদার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তাঁর পত্রিকা 'বঙ্গবাণী'-র জন্য কবিতা লিখছেন। এই কবিতা লেখার অনুরোধ কবির কাছে করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র এবং তার আগে প্রশান্তচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। শ্যামাপ্রসাদ কবির অনুমতি না নিয়েই বিজ্ঞাপনে এই সংবাদ ছেপে দিয়েছিলেন আগামী সংখ্যার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠিয়েও ছিলেন এবং কবিতাটি ছিল সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনও লেশ মাত্র ছিল না।

সেই সময়ে হিন্দুত্ব-র একটা ঢেউ আসে। বড় বড় হিন্দু পুঁজীপতিরা চেয়েছিলেন হিন্দুত্বর শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে প্রচার হোক বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম ও তার দর্শন সম্পর্কে। কংগ্রেসের কিছু নেতৃত্বও সেটা চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মদন মোহন মালভিয়ার একটি বড় ভূমিকা ছিল।

বিশ্বভারতীর জন্য কবির টাকার প্রয়োজন ছিল। কবি যাকে 'ভিক্ষা বৃত্তির অগিদ' বলেছেন— সেই কাজ তিনি করছেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে-ঘুরে। তারপর ঠিক হয়েছে আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দিতে চীন যাওয়া। চীনে তখন যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবির সেটা সঠিকভাবে জানা ছিল না। তাই সেখানে কবির বক্তৃতা গণমানসে ভালভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু কবির চীনে যাওয়ার অর্থ যোগাড় করার লোকের অভাব এদেশে হয়নি। ১৯২৩ সালের ৮ই অক্টোবর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন,—

...'কাল বিকালে যুগলকিশোর বিরলা (বড় ভাই) কে সুধীরবাবু আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘন্টাখানেক কথাবার্তা হল। যুগলকিশোর বাবু বেশ রীতিমত Interested হয়েছেন কিন্তু ইংরেজি বা বাংলা না জানায় খুব অসুবিধা হয়েছিল। হিন্দীতে কথাবার্তা বলতে হল ব'লে আপনার বাবার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। China Trip-এর কত খরচ হবে জিজ্ঞাসা করায় আপনার বাবা বলেন ৫-৭ হাজার ; Birla নিজে থেকে China Trip-এর জন্যে ৭০০০ দেবেন বলেছেন— নন্দলালবাবু আর ক্ষিতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে—Siam ঘুরে যেতে হবে—দরকার হয় ১০-১২ হাজার দেবেন অর্থাৎ China Trip-এর সমস্ত খরচটা পাওয়া যাবে।...অন্যান্য কথাবার্তাও হয়েছে ; Mainly Hindu Philosophy সম্বন্ধে—Birla জিজ্ঞাসা করলেন কত টাকা হলে চলে? ওঁকে বলা হয়েছে যে Hindu Philosophy-র জন্য মাসে ৩০০০ হলে আপাতত চলবে। উনি তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন যে এখন ৫ বছরের মত যদি এই টাকা পাওয়া যায় তাহলে কাজ আরম্ভ করা যায় কি না ইত্যাদি। ... Birla আপাতত বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০০ দিয়েছেন কাল Cheque পাব।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগলকিশোর বিরলার আলোচনা যে এখানেই থেকে যায়নি তার প্রমাণ ১৯২৩ সালের ২২শে অক্টোবর বিরলার বকলমে লেখা বাংলা চিঠি যার স্বাক্ষর বিরলা হিন্দীতে করেছিলেন,—

...'আপনার চীন, জাপান ও শ্যাম গমন বিষয়ে আপনার সহিৎ আমার যে কথা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমি পণ্ডিত মদন মোহন মালবীজীর নিকট লিখিয়াছিলাম। আপনার যাওয়ার কথায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যায় প্রতিনিধি আমরা আর কোথায় পাইব।...তিনি আরও লিখিয়াছেন যে আপনি হিন্দুজাতির বর্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু মহাসভা, তাহার নেতাগণ এবং আরও অনেক সমধিক বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন—পণ্ডিতজী আশা করেন যে আপনি চীন, জাপান ও শ্যাম যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি আপনার সহিৎ সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে পারিবেন।'

এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছিলেন তা আমাদের জানা নেই।

হয়ত রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে তারই প্রত্যুত্তরে ২৪শে অক্টোবর যুগলকিশোর বিরলা লেখেন,—

...'আমার ভ্রাতা ঘনশ্যামদাস...আপনি কবে বেনারসে যাইবেন সংবাদ পাইলে তাহাকে লিখিব। আমার অন্য ভ্রাতা রামেশ্বরদাস...আপনি কবে বোম্বাই যাইবেন জানাইলে যদি তিনি তখন বোম্বাইয়ে থাকেন তাহাকে আপনার বিশ্বভারতীর জন্য তথাকার হিন্দুসমাজের নিকট হইতে সাহায্য দেওয়াইবার জন্য লিখিয়া দিব।'

আমরা দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান প্রভৃতি যাত্রা প্রসঙ্গে যুগলকিশোর বিরলা তাঁকে লিখেছিলেন যে তাঁর কাশী যাওয়ার দিনক্ষণের সংবাদ পেলে তিনি তাঁর ভাই ঘনশ্যামদাসকে লিখবেন, আর হিন্দু মহাসভার সভাপতি মদনমোহন মালভিয়া এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর অন্য ভাই রামেশ্বরদাসের সঙ্গে বোম্বাইতে রবীন্দ্রনাথের আলাপের প্রসঙ্গও ছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এঁদের যোগাযোগেই রবীন্দ্রনাথের কাশীযাত্রা সম্পন্ন হয়।

বঙ্গীয় হিন্দুসভার মন্ত্রী শ্রী রামশর্মা আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কাশীর সংবাদ শিরোনামে জানিয়েছিলেন যে,—

'মালব্যজীর সভাপতিত্বে এ স্থানে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক অধ্যাপক এবং বহুসহস্র ছাত্রের সমক্ষে রবিবাবু 'আর্য্য ধর্মের মহত্ত্ব' বিষয়ক বক্তৃতা করেন।'...

আমরা জানি যে মালভিয়াজী সারা জীবন কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি বেশ কয়েকটি হিন্দু ধর্ম ভিত্তিক সংস্থা গড়ে তোলেন। যেমন ১৯১৬ সালে 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' যা পরে 'বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' নামে বিখ্যাত হয়। এছাড়া এলাহাবাদের হিন্দু হস্টেল, ঋষি কুল হরিদ্বার সেবাসমিতি, হিন্দু বয় স্কাউট, গোরক্ষা সমিতি প্রভৃতি এবং অবশ্যই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। অনেক বছর ধরে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (Chanceller) ছিলেন এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতিও। অন্যদিকে ১৯০৯, ১৯১৮, ১৯৩১ এবং ১৯৩৩-এ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

আসলে কংগ্রেসের মধ্যেই যে ধর্মভিত্তিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে সংস্থা নির্মাণের বীজ লুকিয়ে ছিল উক্ত ঘটনার ঐতিহাসিকতাই তার প্রমাণ। যদিও কংগ্রেস নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলেই দাবি জানায় কিন্তু কংগ্রেসের অন্তর্গত যেসব রাষ্ট্রবাদী নেতারা ছিলেন তাঁদের কয়েক জনের হিন্দুধর্মের প্রতি একটা সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যা সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে এবং অনুরূপ ভাবে মুসলিম নেতাদের সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। নাহলে মালভিয়াজী ও মৌলানা মোহম্মদ আলির মতন নেতাদের কংগ্রেসে সহাবস্থান হয় কী করে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খিলাফত নেতা মোহম্মদ আলি কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হন এবং কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে মালভিয়াজীর মতনই সভাপতিত্ব করেন।

একথা ঠিক যে কোনও ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করা বা আস্থা রাখাই সাম্প্রদায়িকতা নয়। কিন্তু রাজনীতিকরা যখন ধর্ম সম্পর্কিত সংগঠন গড়ে তোলেন তখন ধর্ম একটা রাজনৈতিক অর্থ পেয়ে যায়। এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হতে থাকে কিংবা রাজনীতি ধর্ম-নির্ভর হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ঠিক সেই সময়ে জানা ছিল না যে আর দু'বছর পরেই ১৯২৫ সাল থেকে কীভাবে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও মুসলিম লীগ নিজেদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে ফেলে এবং পুঁজিপতিরা সেই দাঙ্গায় কী ভূমিকা নেয়?

যাইহোক, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষতার কথা চিন্তা করে যদি দেখা যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের এই অনুগ্রহ নেওয়া অনুচিত বলেই বিবেচিত হতে পারে এবং রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যাও ঠিক মনে না হতে পারে। অতীতে আমরা দেখেছি যে কবি নৈতিকতার কারণ দেখিয়ে তাঁর আমেরিকা যাত্রার সময়ে পার্সি বণিক বোমানজী কৃত ও তিলক দ্বারা প্রস্তাবিত অনুদান গ্রহণ করতে অসমর্থ হন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে চীনে যাওয়ার সময়ে কবি হিন্দুধর্মের ওপর বক্তৃতা করতে ও সেই কারণে বড় মাপের সাহায্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নন। আমরা দেখেছি মৃণালকান্তি বসুর সাক্ষাৎকারে হিন্দু থেকে পরিবর্তিত মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার শ্রদ্ধানন্দ ও হিন্দু মহাসভার প্রচেষ্টাকে কবি সমর্থন করে স্বাগত জানিয়েছেন। কবির এই মনোভাবে হিন্দুত্বের গন্ধ পেয়ে মদন মোহন মালভিয়া, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বিরলারা কবির প্রতি সদয় হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁরা যেরকমটি চেয়েছিলেন কবি সেইভাবে তাঁদের আশা পূরণ করেননি। কবি কাশীতে যে বক্তৃতা করেছিলেন সেটি আচার-আচরণ বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ অর্থে হিন্দুধর্মের ওপর নয়। কবির বক্তৃতা ছিল বৃহৎ ও ব্যাপক অর্থে 'আর্য ধর্মের মহত্ত্ব' বিষয়ে। আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ, জৈন, জরথ্রুষ্টীয়, খ্রিষ্টীয়, ইসলামী প্রভৃতি সকল রকমের ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত ছিল ; সেখানে হিন্দু দর্শন নিয়ে আলোচনার নিষেধ থাকবে কেন? এবং একই কারণে অর্থের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে কবি হয়ত সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেননি। তবুও সময়ের নিরিখে একথা বলতেই হয় যে কবিকে একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কবির যাই মনোভাব থাকুক না কেন অসহযোগীরা কিন্তু তাঁকে ছাড়েননি। তাঁরা কোনও না কোনও ভাবে কবির কাছ থেকে 'অসহযোগ' বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইতেন ও মনে-মনে আশা পোষণ করতেন যে সমর্থনসূচক কিছু কথা তাঁরা শুনতে

পাবেন। কবি এই ব্যাপারে খুবই কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শ্রোতারা তাই অনেকাংশে হতাশ হতেন এবং তাঁদের সমস্ত উদ্যোগ-উদ্দীপনার সেখানেই অবসান ঘটত। আমরা এমনই একটি ঘটনা দেখতে পাই ১৯২৩ সালের ১৩ই নভেম্বর রাজকোট থেকে রবীন্দ্রনাথের লিমডি যাওয়ার পথে। ঘটনাটি জানতে পারা যায় এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর ডরোথিকে লেখা একটি চিঠি থেকে,—

রাজকোটের পর লিমডি যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ বাধাবন জংশন স্টেশনে এলে সেখানকার অসহযোগীরা তাঁকে একটি ভাষণ দিতে অনুরোধ করলে তিনি তীব্রভাবে তাঁদের তত্ত্বকে আক্রমণ করে বলেন, আত্মপীড়ন, ত্যাগের উদ্দেশ্যেই ত্যাগ প্রভৃতি যে ব্রতগুলি তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়, সেগুলি ভারতীয় গ্রীষ্মের শুষ্কতার প্রতীক হিসেবে মূল্যবান হলেও তিনি যেহেতু কবি তাই বসন্তের অগ্রদূত রূপেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

দেখা গেল গান্ধীজীর প্রচার করা আদর্শগুলির তিনি বিরোধিতা করলেন গান্ধীজীরই নিজের প্রদেশে। কবি কখনওই নিজের মতামত জানাতে দ্বিধা করেননি।

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেসব ব্যক্তি ওকালতি বা সরকারি স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার সেখানে ফিরে এলেন। চরখা-কাটা, খদ্দরের ব্যবহার বা অস্পৃশ্যতানিবারণের মতন সামাজিক কাজকর্মগুলি চলতে থাকে কিন্তু এসব ছাড়া কংগ্রেসিদের কাছে আর কোনও গঠনমূলক কর্মসূচি ছিল না। কংগ্রেস 'পরিবর্তনপন্থী' (স্বরাজ দল) ও 'অপরিবর্তনপন্থী (লিবারেল) দলে বিভাজিত হয়ে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ নেতৃত্ব মনে করেছিলেন যে দেশের স্বার্থে এবং কংগ্রেসের নিজের স্বার্থে এই দুটি দলে একটা আপোষ-মীমাংসা হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁরা চাইলেই তো সেটা হতে পারে না। তাই কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতারা রাজনৈতিক ভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথম চেষ্টা হল ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর দ্বারা। তিনি জেল থেকে বেরিয়েই বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্য সমিতির বৈঠক ডাকেন। কিন্তু সেই বৈঠক কোনও মীমাংসা হতে পারেনি।

তবু নেতারা হাল ছেড়ে দেননি। ১৯২৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি প্রয়াগে (এলাহাবাদ) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের একটি বৈঠক চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে হয়। সেখানেও কোনও বোঝাপড়া হতে পারল না। কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে গান্ধীজীর দর্শন এবং কাজকর্মের বিরুদ্ধে অনেক সদস্যরা উঠে দাঁড়ালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বরাজ দলে ভিড়লেন।

আপস রফার তৃতীয় প্রচেষ্টা বোম্বাইতে হয়। ২৫ থেকে ২৮শে মার্চ বৈঠক হয়। পুরুষোত্তমদাস টন্ডন প্রস্তাব করেছিলেন যে ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি এবং 'কাউন্সিল প্রবেশ বর্জন'কে নিবৃত্তি দেওয়া হোক। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। কিন্তু লোকেরা শঙ্কা ব্যক্ত করেন যে 'গয়া অধিবেশনে' আগেই স্বীকৃত হয়ে যাওয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নতুন করে পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তুমুল বিরোধ সত্ত্বেও এর স্বীকৃতি পাওয়া গেল। সুভাষচন্দ্র বসু, কেলকর এবং সত্যমূর্তিরা কাউন্সিল প্রবেশের দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। রাজাগোপালাচারি এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যথারীতি এর বিরোধ করেন। কিন্তু যখন প্রস্তাবটি স্বীকৃত হয়ে যায় তখন উক্ত দুজন সদস্য ছাড়া বল্লভভাই প্যাটেল, কৃষ্ণকিশোর, দেশপান্ডে এবং জমনালাল বাজাজরা কংগ্রেস কার্য সমিতি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। এর পরে টী. প্রকাশম, সরোজিনী নাইডু এবং এম. এ. আনসারিরাও সমিতি ছেড়ে দেন।

তারপরে আবার একটি আপসে নিষ্পত্তির জন্য ডাঃ আনসারির সভাপতিত্বে নাগপুরে বৈঠক হয়। কিন্তু সেখানেও 'স্বরাজ পার্টি'র পাল্লা ভারী ছিল।

শেষে ১৯২৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন দিল্লীতে ডাকা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন। সেখানে মৌলানা মোহম্মদ আলির সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেল। তিনি জানালেন যে গান্ধীজী জেল থেকে তাঁর কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন যাতে কংগ্রেসের কাজকর্মগুলির পরিবর্তন করার অনুমতি উনি দিয়ে দিয়েছেন এবং প্রার্থী ও মতদাতাদের বিবেকসম্মত নির্ণয় করার ছাড়পত্রও দিয়েছেন। এর পরে আর কিছু বাকি থাকে না। প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

উক্ত বিবরণটি দীর্ঘ হওয়ার কারণ থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ দলের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি অন্তর্বিরোধের কারণে নতুন দল গঠন করলেও সেই দলকে কারুর অলিখিত নির্দেশে কাজ করতে না দেওয়ার নানান অজুহাত খাড়া করা হয়েছিল। নানা ভাবে নানান জায়গায় মিটিং-বৈঠক ডেকে চেষ্টা করা হয়েছিল কোনওভাবে এই সংখ্যারগরিষ্ঠতায় চিড় ধরানো যায় কিনা। কারণ স্বরাজদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া মানেই নীতিগত দিক থেকে গান্ধীজীর পরাজয় এবং নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জনের হাতে চলে যাওয়া। তাই অন্ধ-গান্ধী ভক্তরা বরাবর এর বিরুদ্ধে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। গান্ধীজী জেলে থাকলেও সব খবরই রাখতেন। শেষে যখন দেখলেন চিত্তরঞ্জনকে আর নাড়ানো গেল না তখন তাঁর নির্দেশটি এলো মহম্মদ আলির কাছ থেকে। 'স্বরাজ পার্টি'কে ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার এবং কাউন্সিলের মাধ্যমে 'অসহযোগ' করার অনুমতি কংগ্রেস থেকে পাওয়া গেল। সম্পূর্ণ দেশে আস্তে-আস্তে পরিবর্তন পন্থীদের (স্বরাজ) পক্ষে পরিবেশ তৈরি হতে লাগল।

ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালেই 'কেন্দ্রীয় পরিষদ' এবং রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচন হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদে ৪৮টি সীট পেলেন স্বরাজিরা। বাংলার বিধানসভায় তো তারা একমাত্র সর্বাধিক স্থান পেয়ে যায়। ১৯২৩-এর নির্বাচনে বাংলা কাউন্সিলে ১৩৮ জন সদস্যের মধ্যে সাধারণ আসন সংখ্যা ছিল ৩৯, সংরক্ষিত মুসলিম আসন ৪৩। এই নির্বাচনে মডারেটদের হারিয়ে স্বরাজ দল অধিকাংশ আসন লাভ করলেও কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে না পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভব নয় বলে চিত্তরঞ্জন তাঁদের সঙ্গে ১৮ই ডিসেম্বর একটি চুক্তি (Bengal Pact) করলেন। এই চুক্তিতে ঠিক হয় যে স্বরাজ লাভের পর সরকারি চাকরির ৫৫ শতাংশ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত হবে ও যতদিন সংখ্যানুপাতে সেই হারে না পৌছয় ততদিন ৮০ শতাংশও নিয়োগ হতে পারে। এছাড়া আইন পরিষদে মুসলিম আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট হবে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন চালু থাকবে। মসজিদের সামনে গানবাজনা নিষিদ্ধ হবে ও ইদের মতন পরবে গোহত্যা বজায় থাকবে।

চিত্তরঞ্জন এখানে যে কৌশল অবলম্বন করলেন তাতে কিছু মুসলিম ধর্মান্ধ ও মৌলবাদীরা খুশি হলেন। আর খুশি হলেন চিত্তরঞ্জন ও তাঁর স্বরাজ পার্টির সদস্যেরা। কারণ খুব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমরা স্বরাজদলকে সহযোগিতা করে। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কতটা কার্যকর হবে সেকথা চিত্তরঞ্জন বা তাঁর দল চিন্তা করলেন না। রাজনৈতিক অভিসন্ধী এইভাবেই তাৎক্ষণিক লাভের জন্য চিরকাল কাজ করে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে সর্বথা ভিন্ন ছিল। তিনি বারবোর সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। অতীতেও আমরা দেখেছি ; পরের বছরগুলিতে যখন অবস্থা সংকটাপন্ন হবে তখনও আমরা দেখতে পাব।

যাই হোক অসম, উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে স্বরাজিরা ভাল ফল করে কিন্তু উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজে তারা কম সীট পায়।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনটি কোকনদে মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে মহাত্মা গান্ধীকে 'খোদার' পাঠানো মহান ব্যক্তি হিসাবে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে—

'বন্ধুগণ। আপনাদের নেতৃত্ব যে একজন ব্যক্তিটি দিয়েছেন, তিনি আপনাদের অমৃতসর, কলকাতা, নাগপুর এবং আহমেদাবাদেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের আগামী দিনগুলিতেও নেতৃত্ব প্রদান করবেন। সংবিধান সম্মতভাবে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার কারণে সব রকমের সাহায্য করতে থাকব—বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ইসুতে।'

তিনি আরও বলেন যে,—

আজ ; গান্ধীজীর দর্শন ভারতীয় রাজনীতি এবং জনজীবনে নতুন দিশা প্রদান করছে। আমি নিজে স্বয়ং অহিংসায় বিশ্বাস করতে লেগেছি। অহিংসা এবং অসহযোগের পথেই আমাদের চলতে হবে।...আমি কাউন্সিলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিনা (শ্রোতাদের মধ্যে হাসির রব ওঠে) ...অহিংসা ও অসহযোগ বলিদান চায়, স্বরাজ তো আরও বেশি বলিদান চাইবে।'

মৌলানা মোহম্মদ আলি তাঁর ভাষণে বাইবেল, কোরান এবং অন্যান্য ধর্মীয় বইগুলি থেকে দৃষ্টান্ত দেন।

মনে হচ্ছিল না যে তিনি একটি রাজনৈতিক অধিবেশনে বক্তৃতা করছেন। এছাড়া তাঁর বক্তৃতায় ছিল,—

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথ ফুল বিছানো নয়। এক মহৎ কাজের জন্য মৃত্যুর পথ। 'কংগ্রেস-কার্য-সমিতিকেও এই নির্ণয়ের প্রস্তাব পাশ করতে হবে যে একদিন আমাদের সবাইকে মরার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি এই নির্ণয় নেওয়া হয় তাঁহলে আমি গ্যারিন্টি দিচ্ছি যে এক বছরের ভেতরেই 'স্বরাজ' পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন কাউন্সিলে প্রবেশ নিয়েই কংগ্রেসওয়ালারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে (শ্রোতাদের মধ্যে হাসির কলরব)। আমাদের সেই পুরনো স্লোগান 'মহাত্মা গান্ধীর জয়' আবার দিতে হবে।'

মোহম্মদ আলির বক্তৃতাটি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে তিনি এখানে বিপুল সমর্থন পাওয়া নেতৃত্ব প্রদানকারী ও কংগ্রেসের মধ্যে নতুন দলের জনক চিত্তরঞ্জন দাসের নাম ভুল করেও নেননি। সমস্ত বক্তৃতাটিতে তিনি গান্ধীজীর প্রতি ভক্তির চরম স্তাবকতা করে গেছেন। গান্ধীজীকে তিনি খোদার পাঠানো দূত হিসাবে বর্ণনা করেছেন যদিও নীতিগতভাবে গান্ধীজী সারা দেশে ব্যর্থ হয়েছেন এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। ব্রিটিশ সরকারও সেই সুযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তাহলে কী ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই অধিবেশন আসলে ছিল

গান্ধীজীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অধিবেশন। যাতে তিনি জেল থেকে বেরিয়েই কংগ্রেসে সেই আগের মর্যাদা ফিরে পান। আর এর মধ্যে কি লুকিয়ে ছিল সেই সংশয় বা ভীতি যা কংগ্রেসের ভারসাম্য নাড়া খেয়ে সরে যাবে বাম ঘেঁষা বাংলার নেতৃত্বের দিকে। এই ভয় নিছক অমূলক ছিল না দক্ষিণপন্থীদের। সেটা আমরা দেখতে পাব পরবর্তী সময়ে যখন চিত্তরঞ্জন শিষ্য সুভাষ বসুর সক্রিয় উপস্থিতি কংগ্রেসে ঘটবে।

যাইহোক, তাঁর ভাবণে আলি সাহেবও কিন্তু গান্ধীজীর মতনই একটি অলীক সম্ভাবনা তুলে ধরলেন—এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তি। গান্ধীজী শর্ত রেখেছিলেন 'চরখা' কাটার আর ইনি শর্ত রাখলেন চরম বলিদান ও মৃত্যুর।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের বাংলা-চুক্তিটি অগ্রাহ্য করা হয়। আসলে চিত্তরঞ্জনের মুসলিম তোষণের নীতিটি কংগ্রেসের ভেতরে মালভিয়াদের মতন হিন্দুত্ববাদী শক্তিরা মেনে নিতে পারেননি। চুক্তিটি স্বীকার না করার আরও একটি কারণ হয়ত ছিল এই যে চিত্তরঞ্জনের সহজ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকে তাঁরা খোলা মনে মেনে নিতে পারছিলেন না। তবুও ১৯২৫ সালে বাংলার সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের বাংলা-চুক্তিটি অনুমোদিত হয়।

১৯২৪ সালের ২৩শে জানুয়ারি ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ দলের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর অনুযায়ী বিনা বিচারে আটক রাখা কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। একইদিনে দুটি দমনমূলক আইন বাতিল করে জেলে থাকা ব্যক্তিদের মুক্তির প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়। মন্ত্রীদের বেতন ও বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করার ফলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে গভর্নর হস্তান্তরিত বিষয়গুলির শাসনভার নিজেই গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

এর আগের ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজটি ছিল মিউনিসিপ্যাল আইনের সংস্কার। নতুন আইনের অন্তর্গত শতকরা ৮০ জন করদাতা ও মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মেয়র ও প্রধান কার্যাধক্ষ্যের জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচন। স্বরাজদল কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-গুলিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল।

এদিকে বাংলায় গভর্নর লর্ড লিটন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জনকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। শেষ পর্যন্ত লিটন ফজলুল হক, গজনভি ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যদিও আদালতের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নির্বাচন খারিজ হলে দুজন মুসলিম মন্ত্রীই সেখানে রয়ে যান যাঁদের ইউরোপীয় সদস্যরা সমর্থন করতেন।

বাংলা সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করলেও চিত্তরঞ্জন মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হন ও তাঁর শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রধান কার্যাধ্যক্ষ করেন। এঁদের নেতৃত্বে অনেক জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এবং এঁরা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় আইসভাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে স্বরাজ দল একই নীতি অনুসরণ করে এবং শাসকদের শাসনকার্যে নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের

মতন প্রতিবাদ জানানোর জন্য সদলবলে সভাত্যাগের দৃষ্টান্ত তাঁরাই ভারতে প্রথম স্থাপন করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজদলের সংদস্যসংখ্যা ছিল ১০১টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৪৫টি এবং স্বতন্ত্র সদস্য ও মহম্মদ আলি জিন্নার ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল মিলে বিরোধীপক্ষে ছিলেন ৭০ জন। স্বরাজ দলের নেতা মোতিলাল নেহরুকে বুঝে-সুঝে পা ফেলতে হয়েছিল কারণ জিন্নার সমর্থন পাওয়া বা না পাওয়া নিয়ে সবসময়েই একটা সন্দেহ থাকত।

অসুস্থতার জন্য গান্ধীজীকে ব্রিটিশ সরকার পুনার যারবেদা জেল থেকে নিঃশর্ত মুক্তিদান করে। রবীন্দ্রনাথ পরের দিন তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানান,—

'We Rejoice/Rabindranath.'

গান্ধীজী জেল থেকে বেরিয়েও নিজের মত পরিবর্তন করেননি। বর্তমানে তাঁর মত ছিল কাউন্সিলে প্রবেশ করা সরকারে অংশগ্রহণেরই সমান। এবং সেখানে বাধাদানের নীতি একপ্রকার হিংসাই। এর দ্বারা দেশে গঠনমূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে প্রবেশের অর্থ খিলাফত-এ পাঞ্জাবের পক্ষ ত্যাগ করা।

তাঁর এই উক্ত কথায় একটা প্রশ্ন ওঠে যে তিনি কি তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তন, কামাল পাশার উদয় ও খলিফা পদের উচ্ছেদ বিষয়ে কিছুই জানেন না, নাকি জেনেও তাঁর পুরনো অবস্থানে অনড় থাকতে চাইছেন। খিলাফত আন্দোলন যে এখন অচল ; সে কথা কি এই অভিজ্ঞ রাজনীতিকের গোচরে নেই? আর পাঞ্জাবের পক্ষ ত্যাগের কথা যে তিনি বলছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁর অসহায় মৌন ভূমিকার কথা দেশবাসী কী বিস্মৃত হয়েছেন।

যাইহোক, আপাতত মনে করা হচ্ছিল যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সন্ত্রাসবাদ কমে গেছে ; তা কিন্তু হয়নি, চার্লস টেগার্ট ভেবে জনৈক ইংল্যান্ডবাসীর হত্যায় গোপীনাথ সাহার ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ ফাঁসী সেই কথাই প্রমাণ করে। নিরপরাধ একজনকে হত্যা করার জন্য গোপীনাথ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে টেগার্ট এই যাত্রায় বেঁচে গেলেও তাঁর অসমাপ্ত কাজ অন্য কেউ সমাপ্ত করবে। তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু ঘরে-ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে। গোপীনাথের এই সংকল্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে দেশে সন্ত্রাসবাদের ভিত কত মজবুত।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আত্মবলিদানে রত যুব-সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করলেও সন্ত্রাসবাদকে মেনে নিতে পারেননি। এই ঘটনার দেড় মাস পরে চীনের নানকিং শহরে সু সী-মোর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—

...'তোমরা যে বেড়াপাকে পড়েছ, তা থেকে কেবলমাত্র কোনরকমে মুক্তি পেতে চেষ্টা না করে সেই মুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষকে মস্ত শিক্ষা দিতে পার যদি Non-violent Non-co-operation নীতি তোমরা একবার প্রয়োগ করে দেখ ; যারা তোমাদের কাপুরুষের মত ঘিরে লুঠ করছে, মারছে,—তাদের শিক্ষা যদি তোমাদের হাতে হয়—তাহলে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে—দুটি জিনিস তোমাদের মনে রেখে সাধনায় নামতে হবে—যা কিছু মন্দ অসুন্দর তার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বর্জন করে তার বিরুদ্ধে লড়া—অবশ্য জানোয়ারের

যন্ত্রে নয়, মানুষোচিত যন্ত্রে—পশুবলে নয়—অধ্যাত্মবলে, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা দিয়ে নয়, ক্ষমা, পরিপূর্ণ ক্ষমা দিয়ে—তবেই সার্থক হবে সাধনা—এই যুদ্ধে যদি প্রথম ক্ষয়ও হয় তবু জেনো জয় তোমাদেরই'...

রবীন্দ্রনাথের উক্ত বিবৃতিটি আমরা জানতে পেরেছি কালিদাস নাগের ডায়রি থেকে।

ভারতে কিন্তু গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তার কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেও গান্ধীজী এই আন্দোলনের আবর্তে টেনে এনেছিলেন। নাহলে অহিংস আন্দোলনে যে তাঁর সানন্দে সমর্থন ছিল তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত তাঁর লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী নামক চরিত্রটিকে গড়ে তোলা ও তার প্রচারিত আদর্শের বিস্তারিত বিবৃতি।

১৯২৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সমাবেশে তিনি বলেন,—

...'বাংলাদেশের অনেক দুর্বলতা আছে, অনেক দৈন্য আছে—কিন্তু অর্থের দারিদ্র্য, রাষ্ট্রীয় অধীনতা তার সবচেয়ে বড় দুঃখ নয়, তার সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে চিত্তের দীনতা যা দূর করতে হবে, বিদেশের সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন করতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের উক্ত দুটি বক্তব্য থেকে তাঁর সমকালীন মানসিকতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত সময়টা জুড়ে বিদেশ যাত্রায়। কিন্তু তাঁর মনে পড়ে রয়েছে দেশে। দেশের খবরে তিনি উদ্বিগ্ন। ১৯২৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি জাহাজে লোহিত সাগর দিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি লিখলেন,—

'ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। ...এই জন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ-ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাস ক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে...কেননা, ওই ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায়নি, তার মোটা মুনাফার ওপরে বাংলাদেশ আড়ালে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখদুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, এ কথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দারোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনাফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দারোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা ; সিমপ্যাথি অ্যান্ড রেস্‌পেক্ট হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের রীতি।...

রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা রাষ্ট্রবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন ; বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব ; তাঁরা জানেন না যে দেশের জন্য তাঁর কী পরিমাণ কাঁদে। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমকে রাষ্ট্রবাদের আওতায় বোঝা যায় না ; তাঁর দেশপ্রেম মিলিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ ও বিশ্বমানবিকতার সঙ্গে। ব্রিটিশ শাসকের শাসননীতি ও তার সাম্রাজ্যবাদীলিপ্সা তিনি এতদিনে পরিচিত। তিনি এখনো ভরসা করেন কংগ্রেস নামক দলটির ওপর এবং তার নেতৃত্বের ওপর যে এঁরাই দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে, অনেক বিষয়ে নীতিগতভাবে তাঁর মতান্তর থাকলেও। কিন্তু কংগ্রেস যে ব্যস্ত আত্মকলহে ও দলাদলির রাজনীতিতে।

১৯২৪ সালের ২৭ শে জুন থেকে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজদলকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশে গান্ধীজী চার দফা কৌশলগত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথমটি হল বার্ষিক চার আনা চাঁদা দেওয়া, কংগ্রেস সদস্যের পরিবর্তে প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চরখায় কাটা সুতো জমা দিতে হবে, তা নাহলে তাঁদের দল থেকে বহিষ্কৃত করা হবে এবং শেষ প্রস্তাবটি ছিল বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার সন্ত্রাসমূলক কাজের নিন্দা। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে স্বরাজদলের সদস্যরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। মোতিলাল নেহরু প্রথম প্রস্তাবটিকে সংগঠনের বিরোধী বলে অবহিত করেন। মোতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জনের প্রভাবকারী ভাষণের পরে গান্ধীজীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। গান্ধীজী কান্নায় ভেঙে পড়েন। গান্ধীজীর এই কারণে অশ্রুমোচন দেখে অনেকেই অবাক হন।

২৮শে জুন বিষয়টি একটি ঘরোয়া সভায় পুনরায় আলোচিত হয়। গান্ধীজী এই বাধ্যতামূলক সুতো-কাটার প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করতে মোতিলাল তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন যে তিনি মনে করেন এই খামখেয়ালি প্রস্তাব গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। গান্ধীজীর কান্নার কথা স্মরণ করেই কংগ্রেসিরা প্রস্তাবটি ৮৩-৬৯ ভোটে গৃহীত করেন।

২৯শে জুন গান্ধীজী স্বীকার করে নেন যে তিনি প্রস্তাবগুলি তুলে সংবিধানবিরোধী কাজ করেছেন, এ কথা সত্য ; কিন্তু সংবিধান তো সংগঠনকে সাহায্য করার জন্য তাই স্বরাজ আনার জন্য প্রয়োজন হলে সংবিধানকে লঙ্ঘনও করতে হবে। মোতিলাল নেহরু কিন্তু নিজের কথায় অটল থাকেন। তিনি গান্ধীজীর যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, কেবল চরখা কখনই স্বাধীনতা আনতে পারবে না এবং তাঁকে বাধ্য করা হলে তিনি এক ইঞ্চি সুতোও কাটবেন না। গান্ধীভক্তদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলুন গান্ধীজী জেলে থাকার সময়ে কতটা সুতো কেটেছেন?

স্বরাজদলের নেতৃত্বের পক্ষে জানানো হয় যে কংগ্রেসে শান্তি কায়েম করার জন্য তাঁরা গান্ধীজীকে সংবিধান অধিক ক্ষমতা দিতেও প্রস্তুত কিন্তু যেহেতু গান্ধীজী তাঁদের বহিষ্কার চান বলে তাঁদেরও লড়াই চালাতে হবে। তাঁরা এখন সাময়িকভাবে স্থান ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁরা অবশ্যই ফিরে আসবেন আরও শক্তি সঞ্চয় করে। এইকথা বলে সকলকে অবাক করে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে স্বরাজদলের সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদ আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং তাতে শামিল হন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরাও। তাঁরা গান্ধীজীর প্রতি দোষারোপ করে বলেন যে তিনি কংগ্রেসকে ধ্বংস করছেন।

এঁদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতন নেতারা। কিন্তু এই সবেতেও গান্ধীজীর বিবেক জাগ্রত হয়নি। সুতো না কাটলে শাস্তি মুকুবের প্রস্তাবটি ৬৭-৩৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয় এবং মূল প্রস্তাবটি ৮২-২৫ ভোটে গৃহীত হয়। কিন্তু বিরোধী শূন্য অবস্থাতেও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ৩৭টি ভোট দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে এই ভোট তাঁর অনুগামীদের এবং সেখানে বিরোধীরা থাকলে তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। তখন তিনি শাস্তিমূলক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। যাঁরা কাউন্সিলে প্রবেশ করেছেন তাঁদের বহিষ্কারের ধারাটিও গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার কাজের নিন্দা করে গান্ধীজী যে চতুর্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন সে বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব চিত্তরঞ্জন তুলে ধরলেও সেটি সেখানে গৃহীত হয়নি।

এর পরের সময়গুলি দাঙ্গায় কেটে গেছে। ১৯২৪ সালের ১১ই জুলাই ও ১৫ই জুলাই দিল্লীতে, ১২ই আগস্ট হায়দ্রাবাদের গুলবর্গা শহরে এবং ৯ ও ১০ই সেপ্টেম্বর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে, ভয়াবহ দাঙ্গায় হিন্দুরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গান্ধীজী এই কারণে একুশ দিনের অনশনের দ্বারা আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হন। মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে দিল্লীতে একটি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন ডাকা হয়। সেখানে দাঙ্গাকে বর্বরতা ও ধর্মবিরোধী ঘোষণা করে বিরোধের কারণ দূর করার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি সালিশি পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। গান্ধীজীকে অনশন ত্যাগের জন্য অনুরোধ করলে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে একটি উদ্ভট কথা বলেন যে,—

'The fast was a matter between God and himself.'

যদিও ৮ই অক্টোবর তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে ফ্রান্সের পথে জাহাজে ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছেন।

সন্ত্রাস সম্পর্কে গান্ধীজীর কড়া বিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাহীন ও ক্ষমাহীন মনোভাব দেখে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদীদের দমনের কাজে বিপুল উৎসাহ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই আক্রমণ যদিও সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার জন্য বলা হলেও এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ দলের শক্তি হরণ। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বাংলা গভর্নমেন্ট একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং ১৯২৫ সালের ৭ই জানুয়ারি এর ধার্য সময় ৫ বছর বাড়িয়ে The Bengal Criminal Law Amendment Act নামে আইনে পরিণত করা হয়। এই আইনে বলা হয় যে বিচারের জন্য কোর্টে যেতে হবে না। তিনজন সদস্য নিয়ে তৈরি কমিশনেই এঁদের বিচার হবে। কেবলমাত্র সন্দেহের কারণেই বিনা কোন প্রমাণেই যে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ন্ত্রিত বা কারাগারে আটক রাখার ক্ষমতা সরকারের থাকবে এবং ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কোনও বাড়িতে তল্লাসি ও যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে জেলে পাঠাবার ক্ষমতাও সরকারের থাকবে।

কিন্তু এর আগে এই বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় ৬৬-৫৭ ভোটে পরাজিত হয়েছিল। অসুস্থ চিত্তরঞ্জনকে চেয়ারে বসিয়ে সভায় আনা হয়েছিল। তবুও গভর্নরের নিজস্ব ক্ষমতায় বিলটি আইনে পরিণত হয়। অর্ডিন্যান্স জারির সঙ্গে-সঙ্গেই যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই ঘটল। সন্ত্রাসবাদীদের

তো তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা গেল না ; কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু সহ অনেক স্বরাজপন্থীদের গ্রেপ্তার করা হল।

খবরটি রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে দিনেন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'চিঠি' কবিতায় লেখেন,—

'প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।'

দেখা গেল এই দমনমূলক আইনের কারণে গান্ধীজী ও স্বরাজপন্থীরা সব বিভেদ ভুলে অনেকটা কাছে চলে এলেন। গান্ধীজী স্বরাজিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অপবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এাকে শাসকের ষড়যন্ত্র বললেন। গান্ধীজী কলকাতায় এলেন এবং ১৯২৪ সালের ৬ই নভেম্বর স্বরাজ দলের সঙ্গে একটি চুক্তি করলেন। স্বরাজ দলের কাউন্সিলে প্রবেশের নীতি তিনি মেনে নিলেন এবং পরিবর্তে স্বরাজিরাও প্রতিদিন সুতো কাটার কর্মসূচিকে কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হিসাবে মেনে নিলেন। এইভাবে গান্ধীজী ও স্বরাজপন্থীরা এক পা এগিয়ে, এক পা পিছিয়ে নিজেদের জিদ বজায় রাখলেন। বাইরের সংকট মোকাবিলায় কংগ্রেস এবার একদল ও একমত হল।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও-এ কংগ্রেসের ৪০ তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গান্ধীজী। তাঁর ভাষণে যেসব ব্যক্তির শোক ব্যক্ত করা হয় তাঁরা হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডা. সুব্রামনিয়ম আইয়ার এবং দল বাহাদুর গিরি। গান্ধীজী তাঁর ভাষণে খোলাখুলি বলেন যে আমরা কোনও ভাবেই এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করব না। গান্ধীজী বলেন 'সবথেকে বেশি বয়কট হবে হিংসার বয়কট'। 'এক সময় এমন মনে হয়েছিল যে আমাদের সব কাজকর্ম সম্পূর্ণতঃ সফল হয়েছে, কিন্তু খুব শীঘ্রই জানা গেল যে অহিংসা শুধুমাত্র উপরিস্তরেই ছিল। এই অহিংসা অসহায় এবং নিষ্ক্রিয় সাধনসম্পন্ন প্রবুদ্ধ লোকদের দ্বারা হয়নি। তার পরিণাম সেই সব লোকেদের প্রতি অসহিষ্ণুতায় প্রকট হয়ে পড়ে যাঁরা অসহযোগে অংশগ্রহণ করেননি।'

গান্ধীজী আরও বলেন যে,—

ব্রিটেনের প্রধান আগ্রহ ভারতের সঙ্গে লঙ্কাশায়-রের ব্যবসায়। যে কোনও অন্য বস্তুর তুলনায় ভারতীয় কৃষকদের ধ্বংসের জন্য একে দায়ী করা যায় এবং এই ব্যবসাই ওঁদের আয় বৃদ্ধির সাধনগুলিকে লুপ্ত করে ওঁদের আংশিকভাবে অলস করে তুলেছে। যদি কৃষকদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে বিদেশী কাপড়ের বহিষ্কার নিতান্ত প্রয়োজন।...আমাদের কুটীর শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত অন্যায়পূর্ণ বিনাশ বন্ধ করতে হবে...হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য চরখা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চরখা আমাদের জন্য জীবনের প্রাণ।...স্বরাজ্যের কথা যদি বলি, তাতে সবচেয়ে বড় বাধা হল অস্পৃশ্যতা। এটি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

স্বরাজ্যের জন্য গান্ধীজী ১২ দফার কার্যকরী প্রস্তাব রাখেন। যেমন সর্বোচ্চ বিচারালয়টি লন্ডনে নয় দিল্লীতে হোক, মাদক পদার্থের দ্বারা আয় বন্ধ হোক, উচ্চ বেতন কম করা হোক, ভাষা ভিত্তিক রাজ্যগুলি পুনঃবিতরণ হোক, ধর্মের ক্ষেত্রে সব ধর্মের সমান স্বাধীনতা ও পরস্পর সহিষ্ণুতা রাখা হোক, সমস্ত প্রান্তের সরকার বিধানসভা এবং আদালতের সরকারি ভাষা একটি নিশ্চিত সময়ের ভিতর সেই রাজ্যের ভাষা হয়ে যাক, কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় আদালত এবং বিধানসভাগুলি ভাষা দেবনাগরীযুক্ত হিন্দুস্তানী হবে, আন্তর্জাতিক এবং কূটনীতির ভাষা ইংরাজি হবে ইত্যাদি।

এই ভাবে গান্ধীজী আগামী ভারতকে তিনি কেমন দেখতে চান তার একটি রূপরেখা প্রস্তুত করেন।

এছাড়া গান্ধীজী তাঁর ভাষণে স্বরাজ দলের কাউন্সিলে প্রবেশ ও সেখানে তাঁদের কাজকর্মের প্রশংসা করে চরখা ও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যাবলির সঙ্গে স্বরাজিদের সহাবস্থানও মেনে নেন।

কিন্তু খিলাফতের সময়ে যে মুসলিম লীগ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে সেটি পুনঃ প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে এবং এর সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় দেশে প্রাণঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা আমরা আগেই দেখেছি। গান্ধীজী যে সময়ে বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতি হন; সেই সময় পর্বেই মোহম্মদ আলি জিন্না ও 'মুসলিম লীগ'-এর 'সদর' বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি নিজের দাবিতে একটি প্রস্তাব রেখে বলেন যে সংবিধানে কিছু কথা মৌলিক রাখা হোক। এর অন্তর্গত তাঁর দাবি ছিল ভারতে ভাবী সংবিধানের স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) হোক এবং প্রদেশগুলিতে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বতা (Autonomy) দেওয়া হোক। তিনি এই পদ্ধতি মুসলিমদের অল্পসংখ্যক হওয়ার কারণে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে পাঞ্জাব, সিন্ধ এবং বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং এই প্রদেশগুলিতে তাঁরা অন্তত হিন্দু ভোটের তুলনায় নিজেদের কথা বলতে সক্ষম হবেন। জিন্নার এই দাবির কারণেই ভারতের ভাবী সংবিধান ফেড্রল কথাটি যুক্ত হয়। তিনি আরও দাবি জানান যে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলী এবং সেই প্রদেশের বিধানসভাগুলিতে কিছু গুরুত্ব দেওয়া হোক, মুসলিম প্রতিনিধিদের জন্য আলাদা মতদাতা হোক, ইত্যাদি।

অন্যদিকে হিন্দু মহাসভাও চুপ করে বসে থাকেনি। তাঁরা মুসলমানদের জন্য বিধানসভায় পৃথক সংরক্ষণ এবং মতের বিরোধ করছিলেন। অগত্যা রাজনীতিক জটিলতা বজায় ছিল এবং আগামী বছরগুলিতে, বিশেষ করে ১৯২৭ সাল আসতে না আসতেই কংগ্রেসে ফের ভাঙন ধরল। গান্ধীজীর কোনও প্রচেষ্টাই সেই ভাঙনকে রোধ করতে পারেনি।

কিন্তু এর মধ্যে স্বরাজ পার্টি ক্রমাগত বিভিন্ন বিধানসভাগুলিতে নিজেদের বাকশক্তি এবং সক্রিয়তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগের সক্রিয়তা হিন্দু মহাসভার কান খাড়া করে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে কিংবা সমুদ্রপথে জাহাজ যাত্রায়। তার আগে এবং পরে উক্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁর মতামত পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজের পরিচয় কবি হিসাবেই

দিয়েছেন রাজনীতিক নয়। তবুও রাজনীতি তাঁর কাছে অস্পৃশ্য ছিল না কারণ পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে রাজনীতিও একটি উপায়। এবং এর জনক ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের বেশ কিছু ন্যায়নীতির সঙ্গে কবির মতের মিল হয়নি ; তবুও তিনি কংগ্রেসেরই ওপর নির্ভর করতেন ; কংগ্রেস ছাড়া কোনও বিকল্প তাঁর কাছে ছিল না। অসহযোগ, অহিংসা, চরখা, স্বরাজ দলের অভ্যুদয়, হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য, দাঙ্গা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কবির মতামত সময়ের নিরিখে অনেকাংশে সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তবুও কবি শুধু তাত্ত্বিক মতামতেই নিজেকে সীমিত রাখেননি। গঠনমূলক কাজে নিজেকে সক্রিয় রেখে নিজের তাত্ত্বিক মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষ করে শিক্ষা পল্লীসংস্কার ও কুটীরশিল্পে কবির অবদান সুবিদিত। এছাড়া ছিল রাষ্ট্রবাদকে অতিক্রম করার তাগিদ। দেশে যখন সকলে রাষ্ট্রবাদের মোহে আচ্ছন্ন কবি তখন ভারত আত্মার সঙ্গে বিশ্বআত্মার মিলনে অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর গড়ে তোলা বিশ্বভারতী। এর মধ্যে তিনি শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদও করছেন যখন বড় বড় নেতারা নিশ্চুপ থেকেছেন।

কংগ্রেস যেমন আমাদের দেশের একটি প্রবাহ রবীন্দ্রনাথও তেমনি সেই প্রবাহে ভেসে চলা এমনই এক নৌযান যা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমত সেই প্রবাহ বা স্রোতের বিরুদ্ধে যায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাজল সেনগুপ্ত

১৮৮০ থেকে ১৯৪১—এই দীর্ঘ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিসহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের এই বর্ণাধারায় আমাদের মাটির কলস ছাপিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এই দীর্ঘ সময়ের ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে রবীন্দ্রনাথের গান রাতারাতি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী গবেষকদের নিঃসন্দেহে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা রচিত এবং সুরযোজিত গানগুলিকে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত আখ্যা দিয়ে থাকি। কারণ সকল ধারার রবীন্দ্রসঙ্গীতই একটি বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের সকল পর্যায়ের এবং সকল অঙ্গের গানেই এই বৈশিষ্ট্য লৌকিকতায় ভাস্বর ঘরানার সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বিশুদ্ধ রাগে নিবদ্ধ বা লোকসঙ্গীত তা চিনে নিতে শ্রোতার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলে নিম্ন লক্ষণগুলো দেখতে পাব।

রবীন্দ্রসঙ্গীত মূলত কাব্যসঙ্গীত। যে-কোনো কাব্যসঙ্গীতের মূল আদর্শ হল কথার সঙ্গে সুরের অবিচ্ছিন্ন মিলন। এই মিলনের সুসমতার উপরেই কাব্য-সঙ্গীতের সার্থকতা নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেই কাব্যসঙ্গীতের এই আদর্শটি এক সমুচ্চ মান অক্ষুন্ন রেখেছে। কথা ও সুর পরস্পরের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, যে একটি ছাড়া অপরটির নান্দনিক তাৎপর্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কথা ও সুরের এই অঙ্গাঙ্গী মিলনের ফলে রবীন্দ্রনাথের গানে এক স্বতন্ত্র শিল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন। তাঁর গানের মধ্যে যে সর্বোচ্চ কাব্যমূল্য আমরা পাই তা অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের গানে থেকে তাঁর কাব্যধর্মীতাকে বাদ দিলে বস্তুত রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক মূল্য হারায়। পদাবলীর আমলের পর থেকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে এমন উচ্চ পর্যাযের কাব্যিকতার সমদৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আমরা আর কোথাও পাই না। রবীন্দ্রনাথের গানের এই উচ্চকাব্যমূল্যের জন্যেই আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে গানের সভায় 'বাঙালী নহে খর্ব'। কবির রচিত গানে কাব্যমূল্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিরর্থক। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা বহু আলোচিত এবং সর্বজনস্বীকৃত একটি সত্য।

আঙ্গিকের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে গানের গঠনে তিনি প্রাচীন ধ্রুপদের চারতুকির রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। স্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী এবং আভোগ —এই চারটি স্পষ্ট অংশ রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন পর্যায়ের, অঙ্গের এবং ভাবার গানে এই গঠনরীতি আমরা অক্ষুন্ন দেখি। রবীন্দ্রনাথের গানে ফর্মের এই সুবদ্ধতা তাঁর গানকে ক্লাসিসিজমের দিকে পক্ষপাতী করে তুলেছে সন্দেহ নেই।

কিঞ্চিদধিক দু-হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে ডুব দিলে যে অরূপরতন আমাদের

হাতে আসবে সেটি হল তার ভাব, ভাষা এবং অনুভূতির ব্যাপকতা। একটি ব্যক্তিমানুষ সারা জীবনে যে সম্ভাব্য মানসিক অবস্থাগুলি ভোগ করতে পারে তার সবগুলির অস্তিত্ব আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে পাই। শোকে, দুঃখে, প্রেমে, আনন্দে, ভক্তিতে এবং উল্লাসে যে-কোনো মানসিক সংকট বা সমৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের মনের অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। একটি ব্যক্তিমনের বিভিন্ন অনুভূতির সার্বিক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন দেখতে পাই তা কোনো দেশের সঙ্গীতে তার সমদৃষ্টান্ত আছে কিনা সন্দেহ। মানবপ্রকৃতির সকল নিগূঢ় ব্যঞ্জনা গানের মধ্য দিয়ে এমন সুরেলা ঝংকারে অনুরণিত হয়ে ওঠায় রবীন্দ্রনাথের গান শুধু ব্যাপকই নয়, মহৎ। শুধু এই একটি মাত্র কারণেই দাবি করতে পারেন যে তাঁর গান বাঙালির না গেয়ে উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের সুরসংযোজনার রীতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, রবীন্দ্রনাথ রূপনির্মিতির চেয়ে ভাবদ্যোতনাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন —পরিণত বয়সের গান রূপ দেবার জন্য নয়, ভাব বাতলানোর জন্য। প্রকাশ করার প্রয়োজনে একদিকে যেমন তিনি রাগরাগিণীর সহায়তা গ্রহণ করেছেন অপরদিকে তেমনি নির্বিচারে রাগরাগিণীর প্রচলিত রূপটিকে ভেঙেছেন। এই প্রয়োজনেই তিনি গ্রহণ করেছেন লোকসঙ্গীতের সুর, বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক সুর, এমনকি বিদেশি সুরকেও অপাঙ্‌ক্তেয় রাখেননি। বিভিন্ন ভাব এবং রসকে প্রকাশ করার জন্য তাঁর সুরসংযোজনায় যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা বিধৃত রয়েছে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রাগে মিশ্রিত গানগুলির মধ্যে। তাঁর রাগমিশ্রণের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা বিষয়ে আমরা অবগত।

রবীন্দ্রনাথের গানের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা নিহিত রয়েছে বিভিন্ন গানে ভাব ও রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছন্দের ব্যবহারের মধ্যে। ছন্দের প্রয়োগ কৌশল এবং অঙ্কের গানের ছন্দ নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা দেখতে পাই। ছন্দ নিয়ে নতুন ভাবনার থেকেই তাঁর সৃষ্ট তালগুলির উদ্ভাবন ঘটেছে। তাঁর গানের ছন্দ, লয় ও তালের দিক থেকে এক নতুন সংযোজক হ'ল মুক্ত ছন্দের গানগুলি, যেগুলিকে আমরা গায়কী বলতে বিশেষ গীতরীতি বুঝে থাকি এবং এই বিশেষ গায়নভঙ্গী রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর বৈশিষ্ট্য হল কাব্য ও সুরের মিলিত ব্যঞ্জনায় গানকে প্রকাশিত করা। এর জন্য প্রয়োজনীয় কণ্ঠপ্রস্তুতি, স্বরক্ষেপণ, শ্বাসনিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি কাব্যমূল্যবোধ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। যে-কোনো সঙ্গীতের প্রাণ হল তার গায়কী। এই গায়কী তার মূল্য হারালে সঙ্গীতের মৌলিকত্বই নষ্ট হয়ে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও এর ব্যতিক্রম নয়। এর একটি নির্দিষ্ট গায়কী আছে বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত একটি স্বতন্ত্র এবং মহিমাময় সঙ্গীতশ্রেণী বলে স্বীকৃত।

ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় সুযোগ ও সম্ভাবনা

অশোক সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইন্সটিটিউট

[বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অশোক সেন এখন *হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইন্সটিটিউট* (এলাহাবাদ)-এর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তাঁর গবেষণার বিষয় *স্ট্রিং থিওরি*। একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত এই বিজ্ঞানী পেয়েছেন *ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ*, সাম্প্রতিকতম *ডিরাক মেডেল*। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা অশোক সেন-এর গবেষণার কেন্দ্র হ'লেও তাঁর ভাবনা ও চর্চায় এড়িয়ে যায় না আমাদের দেশের বিজ্ঞান গবেষণার পরিসরে অনেক সমস্যাও
'পরিচয়'-এর জন্য তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ওই প্রতিষ্ঠানের আরেক অধ্যাপক ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ্ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়।]

বিশ্বরূপ : অশোকদা, এই সাক্ষাৎকার মূলত এমন পাঠক-পাঠিকাদের কথা ভেবে, যাঁরা অনেকেই বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত নন। সেই জন্যে আমরা কিছু ব্যাপকতর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার বেশির ভাগ সময়টা কাটাতে চাই। প্রথমেই বলি, এটা প্রায়ই উল্লিখিত হয় যে আমাদের দেশে অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। এ অবস্থায়, বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা হিসেবে বিজ্ঞান-গবেষণার পেছনে আমাদের ক্ষীয়মান পুঁজি খরচ করার ঔচিত্য নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। এ ব্যাপারে আপনার কী মত?

অশোক : কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঠিকভাবে কখনোই হতে পারে না, শুদ্ধ বিজ্ঞান বা Basic Science-এর বিকাশ না হলে। অন্য সব খাতে অনেক খরচাপাতি আছে, তা তো করতেই হবে, বিশেষ করে Social Work-এর জন্যে। কিন্তু Basic Science-এর দিকে উন্নতি না ঘটলে কোন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিশ্বরূপ : ঠিক কীভাবে? একটু বুঝিয়ে বলুন।

অশোক : ধরো, দেশের শিল্পোদ্যোগের ব্যাপারটা। শিল্পে উন্নতি হওয়ার জন্যে দরকার একটা বিশাল মাপের Scientific Manpower। সে Manpower তৈরি হবে কীভাবে? অবশ্যই, প্রাথমিক ভাবে Basic Science চর্চার মধ্যে দিয়ে।

বিশ্বরূপ : তাই যদি হয়, তা হলে Basic Science-এর জন্যে আর্থিক সাহায্য আসা দরকার। সেটা কি প্রধানত সরকারের থেকে আসা উচিত? হলে কতটা গুরুত্ব দিয়ে?

অশোক : সেটা আগে থেকে সম্পূর্ণভাবে বলে দেওয়া শক্ত। এটা ঠিক যে এব্যাপারে নানা বেসরকারি সংস্থা থেকে অনুদানও পাওয়া যায়। কিন্তু যে কোন

দেশের মত আমাদের দেশেও, এ দায়িত্ব প্রধানতঃ ঘাড়ে নিতে হবে সরকারকেই। বেসরকারি বা ব্যবসায়িক সংস্থা সাহায্য করবে অনেকটাই প্রয়োগের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু প্রয়োগ সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে হয় না। অতএব দীর্ঘমেয়াদী ফল পেতে হলে সেটা সরকারেরই দায়িত্ব। এখন Basic Science-এর জন্যেও কোন এক সময় কতখানি সাহায্য সরকারের থেকে আসবে, তা নির্ভর করে তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর।

বিশ্বরূপ : এই মুহূর্তে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার উত্তর কী হবে?

অশোক : এখনকার অবস্থায়, অবশ্যই social sector has the highest priority। সব দিকেই খরচা কমানোর চেষ্টা হচ্ছে—Basic Science-এর সাহায্য করার ব্যাপারেও তা হতে বাধ্য। কিন্তু এটা দেখতে হবে যে দরজা যেন বন্ধ হয়ে না যায়। কারণ একবার বন্ধ হলে সে দরজা আবার খোলা খুবই শক্ত।

বিশ্বরূপ : এই প্রসঙ্গে একটা কথা এসে যায়, যেহেতু বিজ্ঞানীরা বেশ উন্নত স্তরের বুদ্ধিজীবী, তাই যে কোন আর্থ-সামাজিক ব্যাপারেও প্রায়ই তাঁদের জোরালো এবং যুক্তিচালিত মতামত থাকে। এ থেকে প্রায়ই একটা সংঘাত এসে পড়ে। সরকারের নীতি আর বিজ্ঞানীর নিজস্ব চিন্তাধারার মধ্যে। তাঁরা মনে করেন, সরকার অনেক ব্যাপারেই অনুচিত কাজ করছে। এ অবস্থায় যদি সরকারী সাহায্য নিয়ে Basic Science-এর চর্চা হয়, তাহলে কী বিজ্ঞানীর বিবেকের দিক থেকে একটা সংকট আসতে পারে?

অশোক : সরকারের সঙ্গে মতভেদ, শুধু বিজ্ঞানী কেন, সকলেরই তো প্রায়ই হয়ে থাকে। খুব কম লোকই সবসময় সরকারের সঙ্গে একমত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের কোন বিশেষ ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয় না। সরকারি আনুকূল্যে গবেষণা করলেই সরকারের সঙ্গে আমাদের মত সবসময় এক হতে হবে কেন? এ দুটোর মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা আছে বলে আমি মনে করি না।

বিশ্বরূপ : কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো আমরা দেখি, সরকারি সাহায্য নেওয়ার পর সরকারের বিরোধিতা করলে বিজ্ঞানীদের সমস্যায় পড়তে হয়?

অশোক : এসব ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীদের নিজের মতে অটল থাকাই কাম্য, সরকারি টাকার আসল অংশীদার তো জনসাধারণ। যদি কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে সরকারের নীতি জনস্বার্থ-বিরোধী, তা হলে তিনি সেই মত প্রচার না করে থাকেন কী করে?

বিশ্বরূপ : যদি বিজ্ঞান গবেষণায় বেসরকারি অর্থের ব্যবহার আরো বেশি হয়, তাহলে কি এই সমস্যার কোন সুরাহা হতে পারে?

অশোক : তখন আবার দেখা যাবে যে, Private funding যেখান থেকে আসছে, সেই সব সংস্থার নীতির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মতভেদ আছে। কাজেই সেদিক

দিয়ে যে সমস্যা মিটে যাবে তা মনে হয় না। দেখো, বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা প্রায়শ সরকারি টাকাতেই চলে, সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা কর্মরত, তাঁদের কারুর সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার নেই এমন তো নয়।

বিশ্বরূপ : এবার অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি। ভারতের মতো দেশে যিনি Basic Science-এর চর্চা করছেন, তাঁর দায়িত্ব নিয়ে আপনার মতামত একটু জানতে চাই। এরকম একজন বিজ্ঞানী যদি নিজের গবেষণাটুকু নিয়ে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে থাকেন, সেটা কি সঙ্গত? নাকি আমাদের দেশে তথা সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা সার্বিক ভাবে বাড়ানোর চেষ্টা করাটা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে এসে পড়ে?

অশোক : এটা বিজ্ঞান বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে কর্মরত মানুষের ক্ষেত্রেও বলা যায়। সর্বপ্রথম আসে তাঁর নিজের কাজটা। তার ওপরেও, একজন নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব তো থেকেই যায়, তা তিনি বিজ্ঞানী হোন বা না হোন। সমাজের অন্যদের শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই কর্তব্য। বিজ্ঞানীর এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে এই যে, তিনি মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমি বলব যে এ ধরণের কর্তব্য তাঁর কাছে Secondary। Primary হল নিজের কাজটা ঠিকমত করে যাওয়া।

বিশ্বরূপ : এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীর অধ্যাপনায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারটা এসে যায়। যিনি গবেষণা নিয়ে আছেন, তাঁর সেই সঙ্গে অধ্যাপনা করে যাওয়ার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কতখানি? এটাও কি একটা দায়িত্ব বলে মনে করা যায়?

অশোক : আমি গবেষণা আর অধ্যাপনার মধ্যে তেমন কোন তফাৎ দেখি না। সব জায়গায় দুটো কাজ একসঙ্গেই চলে। এদের আলাদা জিনিস বলে আমার মনেই হয় না।

বিশ্বরূপ : অনেকে মনে করেন, স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে গবেষণাগারগুলোকে শিক্ষণকেন্দ্র, অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তৈরি করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কী মত?

অশোক : এ কথা অবশ্যই ঠিক যে দেশের এখনকার অবস্থায় গবেষণাগার ও অধ্যাপনার কেন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোন উপযোগিতা আমি দেখিনা। কিন্তু স্বাধীনতার সময় হয়তো এটা জরুরি ছিল। হতে পারে যে তখন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর যা অবস্থা ছিল, সেখানে উন্নতমানের গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা যেত না, সে সময়কার পরিস্থিতি আমি ভাল করে জানিনা। কিন্তু বর্তমানে এই বিচ্ছিন্নকরণের কোন কারণ নেই।

বিশ্বরূপ : কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে এই বিচ্ছেদ ঘটানোর ফলে দেশের ক্ষতি হয়ে যায় নি কি? এর ফলে তো অনেকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনেক মেধাবী গবেষকের কাছে পড়ার সুযোগ পেল না?

অশোক : হ্যাঁ, সে ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। তবে আমি বলতে চাইছি, হয়তো গবেষণার অবস্থা স্বাধীনতার সময় এতই খারাপ ছিল যে বিশেষভাবে কিছু গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার দরকার ছিল। কিন্তু এর জের বোধহয় বড় বেশিদিন ধরে চলেছে। এতদিন ধরে গবেষণাকেন্দ্রগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করে রাখার দরকার ছিল বলে আমার মনে হয় না।

বিশ্বরূপ : কিন্তু স্বাধীনতার অল্প পরে দেশের অনেক কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন কিছু গবেষণা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অশোক : কিছু জায়গায় সে-রকম পরিবেশ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সার্বিক ভাবে পরিবেশ হয়তো গবেষণার অনুকূল ছিল না। এবং বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বড় জায়গা, হয়তো তখন সেখানে সেই বড় scaleএ গবেষণাগার গড়ার থেকে কিছু পৃথক কেন্দ্র গড়া আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধের ছিল। তবে এ সবই আমার অনুমান।

বিশ্বরূপ : অশোকদা, এবার আপনার নিজের গবেষণা নিয়ে কয়েকটা কথা শুনতে চাইছি। আপনি যে String theory-তে অবদানের জন্যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন, তা সবাই জানে। ধরুন, এখন একজন সাধারণ পাঠক জানতে চান, আপনার নিজের দিক থেকে পরম প্রাপ্তি (ultimate fulfillment) কিসের মধ্যে দিয়ে আসতে পারে?

অশোক : আমাদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল সমস্ত পদার্থের মৌলিক গঠন ঠিকভাবে বোঝা। সেটা যখন যথাসাধ্য ভালোভাবে বোঝা যাবে, সেটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি হবে।

বিশ্বরূপ : আপনার নিজের চিন্তা যদি এই বোধোদয়ের দিকে আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যায়?

অশোক : সেটাই আমার Ultimate Satisfaction।

বিশ্বরূপ : আপনার যে নিজেকে নিয়ে কথা বলার ব্যাপার অনীহা আছে, তা আমরা জানি। তবু অনুরোধ করছি, একটু যদি বলেন, আপনার নিজের চোখে আপনার সবচেয়ে বড় অবদান কোন্ কাজটা?

অশোক : সেটা সম্ভবতঃ String theoryতে Duality Symmetryর আবিষ্কার। Duality হল এমন এক ধরণের Symmetry বা প্রতিসাম্য, যা সাধারণত নজরে আসে না। এটা এক ধরণের গাণিতিক ধর্ম, যা তত্ত্বটার গভীরে লুকিয়ে থাকে। এটাকে সবার নজরে আনাই আমার সবথেকে বড় কাজ।

বিশ্বরূপ : আর একটু খুলে বলা যায় কি?

অশোক : অনেক সময় পদার্থবিদ্যার একই তত্ত্বকে একাধিক গাণিতিক রূপ দিয়ে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে সবসময় সেটা বোঝা যায় না। একভাবে তত্ত্বটাকে সামনে রাখলে তা থেকে কিছু জিনিস অঙ্ক কষে বার করা সোজা। আবার অন্য কিছু ফল বোঝবার জন্য অন্য একটা Description সুবিধাজনক। তাই Duality থাকলে, বিভিন্ন রূপে তত্ত্বটাকে দেখে, তা থেকে যা যা বলা যেতে পারে,

একটা না একটা রূপ থেকে তা সবই ধরা পড়ে। String theoryতে এই সম্ভাবনার কথা আমার গবেষণার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ্বরূপ : String theory এখন পর্যন্ত একটা গাণিতিক কাঠামোই রয়ে গেছে। পরীক্ষালব্ধ কোন ফলের সঙ্গে এর সম্পর্ক এত বছরেও স্থাপিত হয়নি। এটা কি আপনাকে উদ্বিগ্ন করে? বা এটা কি String theoryর পক্ষে আশঙ্কার কারণ?

অশোক : আশঙ্কার কারণ ঠিক নয়। String theory জিনিসটাই এমন যে সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাই করতে গেলে অত্যুচ্চ মাপের শক্তি প্রয়োজন। অর্থাৎ ইলেকট্রন ইত্যাদি মৌলকণাদের যেরকম বেগে ছুটিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে তার ফল দেখতে হবে, সেই বেগ অর্জন করার ক্ষমতা এখন পর্যন্ত আমাদের নেই।[১] যদি String theory সত্যি সত্যি প্রকৃতির একটা মূলসূত্র হয়, তবে এই সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। এটা ঠিক। তাহলে ভাবা দরকার যে কোন পরোক্ষ উপায়ে এর সত্যতা যাচাই করা যায় কিনা। প্রকৃতি যে ভাবে চলছে, তা মেনে না নিয়ে তো উপায় নেই। অন্ততঃ পরোক্ষ যাচাই এর যত কাছাকাছি পৌঁছন যায়, সেটাই চেষ্টা করতে হবে।

বিশ্বরূপ : আপনি যখন পদার্থবিদ্যার ছাত্র হিসেবে শুরু করেছিলেন, তখন কি প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছিলেন যে এরকম সম্পূর্ণ গাণিতিক বিমূর্ত (abstract) ধরণের বিষয় নিয়ে কাজ করবেন?

অশোক : মোটামুটিভাবে এরকম মনে ছিল যে মৌলকণার তত্ত্ব, মহাকর্ষের রহস্য, এসব নিয়ে গবেষণা করব। তার বেশি নয়।

বিশ্বরূপ : কখন থেকে ভেবেছিলেন? প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়েই?

অশোক : না, প্রেসিডেন্সী কলেজে নয়, যখন কানপুর IITতে M.Sc. পড়ছিলাম, তখনই মোটামুটিভাবে এরকম ধারণা তৈরি হয়েছিল।

বিশ্বরূপ : আর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় কী ভাবতেন?

অশোক : তখন খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তখন কেবল 'পদার্থবিদ্যার চর্চা করব' এটুকুই ভাবতাম।

বিশ্বরূপ : তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় কাজ করবেন, না কোন পরীক্ষামূলক দিক নিয়ে, তাও কি তখন ভাবেননি?

অশোক : নিশ্চিত করে ভাবিনি।

বিশ্বরূপ : একটু ব্যক্তিগত দিকে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি, এই মাপের পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পথে আপনি অনুপ্রেরণা বা Role model হিসেবে কাদের দেখেছেন?

অশোক : খুব নির্দিষ্টভাবে সেটা বলা শক্ত। অবশ্যই, প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছু অধ্যাপকের দ্বারা খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি, যেমন, অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরী তখন পড়াতেন। তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। IIT কানপুরে পড়ার সময়েও

বেশ কিছু উচ্চস্তরের অধ্যাপক ছিলেন—যেমন এইচ এস মানি, টি ভি রামকৃষ্ণণ। এঁদের প্রভাবেই বোধহয় তাত্ত্বিক গবেষণার দিকে গিয়েছি। এছাড়া যখন আমেরিকায় জর্জ স্টারম্যান-এর কাছে পি এইচ ডি-র জন্যে গবেষণা করি, তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে।

বিশ্বরূপ : বাড়িতে, বা নিকটজনেদের মধ্যেও কেউ আপনার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন কি?

অশোক : আমার বাবা তো স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সেদিক থেকে অবশ্যই একটা প্রভাব এসেছে।

বিশ্বরূপ : পদার্থবিদ্যা ছাড়া আর কী কী বিষয়ে আপনার আগ্রহ?

অশোক : আগ্রহ খাওয়াদাওয়ায়, রান্না করায়, বেড়ানোয়...

বিশ্বরূপ : আপনি অন্য জায়গায় কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে আপনি Atheist বা নিরীশ্বরবাদী। মোটামুটি কোন সময় থেকে আপনি এই নিরীশ্বর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন?

অশোক : খুব অল্পবয়সে তো নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। যখন থেকে নিজের যুক্তি জায়গা নিতে শুরু করল, ধরো কলেজে পড়ার সময়, তখন থেকে আমার এই মত।

বিশ্বরূপ : সাধারণভাবে বিজ্ঞানীর চিন্তার সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাসের কোন সংঘাত আছে বলে আপনার মনে হয়?

অশোক : না, তা মনে হয় না, বিজ্ঞানচর্চার বাইরে একজন বিজ্ঞানী ভগবানে বিশ্বাস করবেন কিনা সেটা তো তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। সেই জায়গায় তাঁর ঈশ্বরের বা ধর্মে বিশ্বাস থাকলে আমি তার মধ্যে অনুচিত কিছু দেখিনা, এবং সে বিশ্বাস তাঁর বিজ্ঞানচর্চাকে ব্যাহত করবে এমনও মনে করার কোন কারণ নেই। Historycally সেটা দেখাও যায় না, সকল বিজ্ঞানীদের কথা ভেবে দেখলে।

বিশ্বরূপ : একেবারে শেষে একটা প্রশ্ন করি, আপনার অবদান আমাদের সবাইকে এত গর্বিত করেছে যে শুধু আমরা বিজ্ঞানীরাই নই, সাধারণ মানুষও চান যে আপনি যতদিন পারেন আপনার সু-উচ্চ মানের গবেষণা চালিয়ে যাবেন। তবু, পরিণত বয়সে পৌঁছে যদি কখনো অবসর নেওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে তারপরে আপনি নিজেকে কোন্ ভূমিকায় দেখতে চান?

অশোক : (হাসতে হাসতে) এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন ভাবনা-চিন্তাই করিনি, কাজেই বলা খুব শক্ত...

---

[১] সাক্ষাৎকারটি সাম্প্রতিক কালের নয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী মিঃ সেন জানেন, সার্ন-এর বিশাল হাইড্রন-কোলাইডারের মধ্য দিয়ে অত্যুচ্চ মাপের শক্তি প্রয়োগে মৌলকণাকে দ্রুত বেগে ছুটিয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষে হিগস্ বোসন কণার সন্ধান পেয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণায়। তাই এ-বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে অধ্যাপক পিটার হিগস্-কে।

[সম্পাদক মণ্ডলী 'পরিচয়']

ভরদুপুরে ভ্যাবলা হয়ে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গাঁ-গঞ্জ সব পালটে গেল চোখের সামনে।
দেখছি এমন অনেক কিছু,
চর্মচক্ষে যা দেখা তো দূরের কথা,
জীবদ্দশায়
আমরা কেউই দেখব বলে
ভাবতেও কি পেরেছিলুম?
সত্যভাষণ করতে হলে বলতে হবে :
না, পারিনি।

একটু-অধটু হয়তো চিনি
জায়গাগুলো। কিন্তু তাদের
বাসিন্দাদের
একজনও কি চেনা আমার?
যার কাছে যাই, সে-ই দেখি তার
মুখখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে
অন্যদিকে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

বুঝতে এখন পারছি না আর এদের মুখের
বাংলাটাকেও।
এই ভাষাটাও বাংলা নাকি?
ভরদুপুরে ভ্যাবলা হয়ে সেই কথাটাই ভাবতে থাকি।

বৃক্ষসভা

কৃষ্ণ ধর

মানুষের কথা শেষ হবার পর
গাছপালারা নিজেদের ভাষায়
তা তর্জমা করে নেয়
কোথাও কোনো শব্দে আটকে গেলে
বাতাস এসে তক্ষুনি তার অর্থোদ্ধার করে দেয়
চাইলে তার ব্যুৎপত্তিও জানায়
এভাবেই তাদের সহাবস্থান

বৃক্ষজীবন তা সহজেই মানিয়ে নিতে জানে

বৃক্ষসভায় কোনো সভাপতি থাকে না
হাওয়ায় কান পেতে সব কথা অবিকল
শোনা হয়ে যায় সবার
বৃক্ষদের মাতৃভাষায় রোদজল বাজবিজুলির বিস্তর ঝিলিক
পথচলতি লোকজন বৃক্ষের ছায়ায় জিরিয়ে নেয়
মনের সঙ্গে মীমাংসার সুযোগ পায় নিরিবিলিতে
যখন তাকে খুঁজে নিতে হয় পথের দিশা
ঝড়বাদলার অনির্বচনীয় অন্ধকারে

অ্যালব্রাটস

তরুণ সান্যাল

ক্রম হিমবাহগুলি নেমে আসছে গূঢ় বর্ষে নদী
জল নাকি ফিরে যায় 'যথা হতে আসি'—ইতি জে. সি. বোস,—
এই যে ঘুরপাক প্রাণ আপনায় ভাগীরথী উদধি অবধি
ঘুচে যায় বাষ্প মেঘ মোহানায়, পথাশ্রমে দোষ।
সমান-উদান-ধ্যান। পঞ্চতীর্থে পা ফেলা তখন
পঞ্চপ্রান তোমাকেও নিসর্গ সেজেছে দিতে চেয়ে
জ্যোতি ধূম বলয়ের মরুৎপথে জীবনের উৎসার মোক্ষণ
উহা ব্রজনের নহে, চণ্ডালিকা নৃত্যে সম্মোহন।

উহারে বিজ্ঞান কয়, তরলিত জলাধারে নদী
যেমন বন্দিনী রমা, হরিশ্চন্দ্র দান মুক্ত করে
ঐ যেমন দামোদর তিস্তা বাঁধ গঙ্গা নিরবধি
ঠোকর দিতেছে ক্রুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্যারেজ গোচরে।
তোমার জীবন তারা বহুদূর ধ্রুবতারা সাথী
মধ্য সমুদ্রেও তুমি পথ দেখাও, ঐ যা উত্তরে
ঝড়ে যে মাস্তুল ভাঙে পাল ছিনিয়ে করে মাতামাতি
গর্জমান চল্লিশের নিরবধি সমুদ্রের ঝড়ে।

তবু এক অ্যালব্রাটস সব চেয়ে ব্যাদান যার ডানা
সে তখন নদী দেখছে, বর্ষা দেখছে, দেখছে পেঙ্গুইন
তার পায়ে বেঁধে দিও ভাঙা বোতলে চিঠির ঠিকানা
গঙ্গা হিমবাহ পাবে সত্তার উড্ডীন কোনো দিন।

সহজ

সুখেন্দু মল্লিক

প্রতিটি চলার শুধু ক্ষত
পথিক কি তাকে চেনা যায়
স্পষ্ট অস্পষ্টতা প্রসঙ্গত
ছায়ালীন গোধূলি মায়ায়।

কে চায় মিলিয়ে মুছে যেতে?
কোথা হতে কোথা চলে আসি।
সংশয়ে বিশ্বাস সংকেতে
ঘরে ফিরে চলেছে প্রবাসী।

আমি তো আমি আছি
কোলাহলে আমারি তো থাকা।
সুরের ব্যথায় মৌমাছি
মেলে পাখা—আশার প্রশাখা।

কোন দুঃখে কোন প্রেমে বাঁধো?
ফেরিঘাটে স্টীমারের বাঁশি।
কহত কবীর শুন ভৈ সাধো
সহজে মিলে অবিনাশী।

সমাজবদ্ধ জীবন মানুষ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সমাজবদ্ধ জীব মানুষ, শুনেছি সেই সুদূর শৈশবে, দেখেছিও।
দাঁড়িয়েছে দুঃখী মানুষের পাশে সর্বস্ব হারানো
সেই মুমূর্ষু, রোগে না শোকে
আর্ত জীবনের পাশে বসে
সান্ত্বনা দিয়েছে, তবে
সবার সমানধর্ম সেদিনে দেখিনি।
দেখেছি কি?

আমাদের চারপাশে আজ যে আগুন ধিকিধিকি
জ্বলছে—
তা নেভাবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই কেউ
জিঘাংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, রক্ত-সমুদ্রের নোনা ঢেউ

আছড়ে পড়ছে এই মাটির সংসারযাত্রা জুড়ে প্রতিদিন;
মায়ের চোখের জল
বাবার নিশ্চুপ কান্না
অর্থহীন বলে মনে হয়।

এসব সামান্য মৃত্যু, দুর্ঘটনা বলে পূর্ণচ্ছেদ
টেনে নিয়ে
শক্তিমান, জনতার জয়
বলে ভিন্নপথে হাঁটে
ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় স্মৃতি হতে থাকে
জীবন্ত মানুষ 'শব' হয়ে গেলো কীভাবে সেকথা।

জীবন নিষ্ফল নয়, ভেঙে পড়ে সব নীরবতা।
বিপুল ভাঙন হলে যেরকম নদীর এপাড়
ভেঙে পড়ে, সেই মতো ক্ষয়ে যাচ্ছে মাটি ধীরে ধীরে।
তা লক্ষ করিনি।
আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আজো
ভাঙন ভঙ্গুর নদী তীরে।

সুখদুঃখ

অনন্ত দাশ

একপাশে সুখ আর অন্য পাশে দুঃখের সাহারা
জীবনের পরিসীমা অতিক্রম করে যেতে চায়
কেউ দেয় প্রীতি আর কেউ কষ্ট দিয়েছে যন্ত্রণা
সব কিছু তুল্যমূল্য চেতনার ক্ষুব্ধ আলোড়নে

বৈরাগ্য আসেনি তাই মুগ্ধতায় থাকি প্রীতিরসে
কৌতূহল নিয়ে ভাবি এভাবে রইবো কতকাল
নিরাসক্ত জীবনেও যৌনতা ফুরায় প্রয়োজন
প্রত্যাখানে কি পেয়েছি রয়ে গেছে সেই তো জীবন

টানাপোড়েনের দিন আর এই বিষাক্ত পৃথিবী
মাঝরাতে কাছে এসে পরস্পর করে ঠেলাঠেলি
যত মগ্ন থাকতে চাই সৃষ্টির চকিত অন্ধকারে
টাচস্ক্রিনে ভেসে ওঠে মানুষের যন্ত্রণাক্ত মুখ

যতই সম্মোহে থাকি মুগ্ধতায় রেখেছি জীবন
অবিরত সুখদুঃখ করে দেখি সমুদ্র মন্থন

প্রত্যবর্তনের রং

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

দিন ফেরাবার কথা বলেছিল কেউ
প্রত্যাবর্তনের রং এমনি করে পাল্টে যেতে পারে।
জলহীন নদীখাতে প্রত্যাশার ঢেউ
এপারের মুগ্ধ স্মৃতি ছুঁড়ে দিচ্ছে নদীর ওপারে।

আমাদের বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণার বিবর্ণ পলাশ
মূর্চ্ছিত হওয়ার আগে ম্লান হয়েছিল দিন
ধমনীর গতি যেন মুহুর্মুহু স্খলিত বিশ্বাস
বন্ধুতার বুকে বিদ্ধ বিষমাখা তীক্ষ্ণ আলপিন।

যে-সকাল স্পন্দিত ছিল শ্রাবণী সারঙে
আজ ঘুম ভাঙলো মানুষের তাণ্ডব হুংকারে
আমরা পার্থক্য বুঝি না হিংসা ও প্রশয়ের রঙে
কী করে মানুষ খুঁজবে মানুষকে ঘোর অন্ধকারে।

একদিন ওতপ্রোত রজনীগন্ধার সৌরভ
একদিন দ্বিধাহীন অভিন্ন স্বপ্নচরাচর
আগ্নেয়গিরির তাপে দগ্ধ হওয়া যদি অপার গৌরব
অমৃতের পুত্রেরা আজ কোন মন্ত্রে হল বিষধর।

বদল ঠিকানার মানুষ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

অকস্মাৎ তার ঠিকানা বদলে গেল...
প্রতিবেশীরাও জানতে পারেনি কেউ
গত সকালেও জোগানের দুধের
নিয়মিত সাক্ষাতে কুশল বিনিময়
সময়ের কিছু চর্চা মতামত
সবই ঠিকঠাক; সেই তিনিই
ভোরের প্রাণ-পাখির ডাকাডাকির সাথে
পায়ে পায়ে গৃহত্যাগ...।

অকস্মাৎ একদিন কোন দূর

প্রবাস থেকে এখানে চলে এলেন থাকতে
কোনো প্রস্তাবনা ছিল না...একেবারে
ভূমিকাহীন থাকতে এলেন, মানুষটার
কি খুবই কষ্ট ছিল? গোপন রক্তপাত হত?
পুবে পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে ছিল
তবে এমনই গোপন থাকাথাকি
মধ্যরাতে বাড়ির ছাদে সঙ্গহীন ঘুরতেন।

তিনি কোথায় গেলেন বাঁয়ে না ডানে
উত্তরে-পবে বা পশ্চিমে কোথায় গেছেন??
সেখানে নতুন মানুষের সঙ্গ-স্বাদ
সেখানেও তো সেই পরমাদ বিসম্বাদ
সেই চেনা ঘাম-অভিমান
নতুন ঠিকানার স্বাদ ও সাধ বুকে রাখা থাকে

এমনি করে একদিন মানুষটার
ঠিকানার সীমানা সীমাহীনতার
হাতে হাত রাখে।

সমগ্রে পায় না

দীপেন রায়

মনের কাছে মাথা পেতে, চুপ করে, বিকেলের রোদ
পিঠির ওপর ফেলে আস্তে, ধীরে, উঠে যাচ্ছি,
গল্পের চাতাল ছেড়ে অন্য কোনও দিকে, অসময়ে।
ঠেকে গেছি কোথাও ছোটো বড়ো মিলে স্বখাত ডোবায়,
খাঁড়ির পাশের নদী, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস হারিয়ে
নিরুচ্চার, চলে যাচ্ছি, একা একা মূক ও বধির।
একথা কখনও সত্য হয়নি, কোথাও প্রতিবাদ নেই।
মনের কাছাকাছি পাই না নাগাল তবু মানুষের।
কোথায় কে সন্দেহের রুচিহীন বঁড়শি চোখে
দেখে নিচ্ছে আড়াআড়ি জলের আয়নায়, অন্তরাল থেকেও;
মেপে নিচ্ছে আমাকে, ওদের মতন নিরন্তর জলমাপা শামুক।
মরে না সহজে যে ঘাস, ঘরের বাইরে, দরোজা পেরিয়ে
তার সবুজ শরীর নিংড়ে রস করে খেয়ে নিই প্রতিদিন।

গভীর রাত্রির আলোমোছা গলির মুখের পথ
সুড়ঙ্গ খুলে নিয়মিত, নর্দমার জলের সঙ্গে
কফ পিও বিকারের লালা সমতে, উগরে দিচ্ছে, অতিরিক্ত
জলের চাপ কোনও নির্দেশিকা না মেনে। স্পষ্ট দেখা যায় না,
ছানি কাটা পিঁচুটি লেপটানো আধখোলা চোখ।

সমগ্র পায় না, খণ্ডে খণ্ডে তাই, মাঠ ঘাটে নিমেষের
বজ্র ফেলে, ছোটো ছোটো মেঘ, মুড়িয়ে যাচ্ছে খিদের শরীর।

হাতে-হাতে ফল

রানা চট্টোপাধ্যায়

অনেকরকম ভাবে ভাবতে শেখো
নইলে যা দিনকাল পড়েছে
নিজেই ভুট্টার খই হ'য়ে উড়ে যাবে।

বিবেককে মনে করো বিদেহী আত্মা
সে ঘুরে ফিরে সুপ্তে জাগরণে ভাবাবে
গয়ায় গিয়ে তার দফারফা করবে তা' হওয়ার নয়।

আত্মসম্মান নিয়ে থাকলে কিছুই পাবে না এই সময়ে;
বরং গিরগিটির সঙ্গে মেলামেশা করতে শেখো
কখনো নীল কখনো লাল কখনো গেরুয়া
আলখাল্লায় নিজেকে সাজাও।

তুমি সুখ-ঐশ্বর্য চাইলেই পাবে কেন
বরং গুরুত্ব দিয়ে ভাবো পড়া লেখার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ
শাসকের সঙ্গে বশংবদ হয়ে কাটাতে পারবে তো?
শুধু বাতাসা দিয়ে পুজো করবে? হয় নাকি।
ঠাকুর সন্তুষ্ট হবে কি বরং নিত্য সেবায়ত হও
এ-সময়ের কল্কি অবতারের
ভালোমন্দ তার ঘোড়ার পায়ের নিচে রাখো
দেখো হাতে-হাতে ফল পেয়ে যাচ্ছো।

মৌন মিছিল

রমেন আচার্য

প্রকৃত সত্যের কোদাল শাবল জড়ো করি।
আতঙ্কে শিউরে ওঠে বাগানের গর্বিত ফুলেরা, বলে—
পৃথিবী তো এখনও সুন্দর, তবে তুমি অস্ত্র হাতে কেন?

শাবল আঁকড়ে ধরে বলি—
তাই তো জেনেছি এতকাল।
তবে এতো আর্তনাদ কেন?
দেখে আসি—
কোন গ্রীনরুমে বসে নানা রঙে ঈশ্বর তোমাদের এতো
সুন্দরী বানান। দেখে আসি, কী কৌশলে তিনি
মোহময় সুগন্ধ মেশান ওই কোমল পাপড়িতে।

কোদাল শাবলে শুধু উঠে আসে অন্ধকার।
কালো ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো বর্ণ নেই বুঝি।
ফুলের অজস্র বাহু ছাড়িয়ে নিয়েই আমি
বিপরীত অন্ধকারে যাই। সেখানে এখন—
কয়েকটি নারীর লাঞ্ছিত কান্নার পাশে সহস্রজনের
কালো পট্টি বাঁধা মুখে ভাষা নেই, উচ্চারণ নেই—
অবনত মৌন মুখের মিছিলে ঘন কালো মেঘ হয়ে
এক আকাশ কান্না নেমে আসে।

ঈশ্বর দেখুন, এই জীর্ণ পৃথিবীতে
বহুবর্ণ ফুলের পাশে ঘন কালো হয়ে কত
কান্না ফুটে আছে।

জীবনটা শীতকালে ঠেকলো, ভারতবর্ষ ফুটিফাটা

সত্য গুহ

আলতু-ফালতু শ্রম-দান রক্তদান করতে করতে
প্রাণ দানের জোগাড়
না হল তোমার প্রতিমা গড়া
না হল তোমার যোগ্য একটা কবিতা লেখা

দীনরাম ঘরামি যদি নাম দিতেন বজ্জাতির পিতা
বেশ হত। বুঝতাম, কেন শেকড় শুদ্ধু ঘর গেল
কেন হয়নি ফিরে নিজের ঘরবাড়ি
আকাশ-ছাদী ধর্মশালায় রামদীন জীবন
শুধু পথে পথে হাঁটছি—হেঁটেছি একদা
মাথা দিতে ময়দানে ধার
মানুষের গন্ধ শুঁকে শুঁকে আর মনে মনে ছক এঁকে দিন ফেরানোর
স্বপ্ন না, তা পরিকল্পনা যে
কাঁশালা, কেউই বলে দিতে পারলো না—এমনকি পুরির
ঠুটোটাও, জিজ্ঞাসায়, গোলগোল চোখে চেয়ে থাকে
ফ্যাঃ। নিম জগন্নাথ।
হত্যে দিয়ে পড়ে আছি—মাটি কামড়ে পড়ে আছি
কবে শিকে ছিঁড়বে আর দীনরামেরও জুটবে একছিটে
হলদে দুধ ভারতবর্ষের

অর্থাৎ স্বাধীনতা, যা ভাবতে দেবে না
ফালতু শ্রম, ফালতু রক্ত, ফালতু প্রয়াস—সব ঝুটা ঝুটা ঝুটা
এবং মালুম পাওয়া যাবে আছে ভালোবাসা মানুষে মানুষে
যে উৎপাদনে হয় শ্যাম-শস্যময়ী তোমার প্রতিমা গড়া মর্জি মতন
হয় কবিতা রচনা

জীবনটা শীতকালে ঠেকলো, ভারতবর্ষ ফুটিফাটা

সুশান্ত বসুর তিনটি কবিতা

১. একচক্ষু হরিণ

সমস্ত নিরাশাকরোজ্জ্বল রাগ এবং ঘৃণার ভিতরে,
যাবতীয় নিরাপত্তার বৃত্ত-খোঁজা বলয়ের ভিতরে
জেগে থাকে এক হিসেবি শ্রেষ্ঠীর ছায়া।

এই তো সময়, প্রতিদিনের অজস্র নিউজপ্রিন্ট আর
ধারাবাহিত উগ্‌রে-দেওয়া তথ্যের ভিতর থেকে
বেজে-ওঠা বৈতালিক নিরন্তর ডাক পাঠায়—

চতুর্দিকে ধু ধু বালিয়াড়ি আর
দিগন্তজোড়া মরুপ্রান্তরের ভিতরে ঝিকিয়ে ওঠে সুখ।

এতো প্রসাদ আর প্রসাদ-মহিমার
আঙিনা জুড়ে জেগে থাকে
বিজুবনের রহস্যজটিল মন্দির অন্ধকার।

একচক্ষু হরিণ কি জানে
তার হরিণীর নিলয়ের ঠিকানা?

২. নীলকমল, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

উজ্জ্বল মলিন যতো গার্হস্থ্যের ভিতরমহল থেকে আজ
পা টিপে টিপে রোজ বেরিয়ে আসে হিসেবি উচ্চাশা।
'বাবুদের খোকা হোক মহাজন দেশে ও বিদেশে'
সুখ-পাখি অন্তহীন ডেকে যায় রূপকথার ভাবায়।

ও গ্রাম, তুমি তো জেগে আমাদের সুবচনী জুড়ে।
কে নাড়ছে দরজায় কড়া? নীলকমল ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

৩. বড় সুখে আছি

ঝরা কথাগুলোর ছাই উড়ছে বাতাসে।
অলীকের পতাকা হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
মত্ত মাতঙ্গের দল।

রঙ্গে মাতা মাতঙ্গিনী বাকবিভূতির আতসবাজিতে বিভোর
পতঙ্গের দল সবাইকে বসিয়ে দিয়েছে এক
চতুষ্কোণ বাক্সের সামনে।
না, ঘৃণারও কোনও উপায় নেই। মন্ত্রী ও সান্ত্রীর অদ্বৈতে
এগিয়ে চলেছে হিরণ্ময় দেশ। এগিয়ে চলেছে সময়।

সুখে আছি সখা। বড় সুখে আছি।

না-চেনাই ভাল

বাসব চৌধুরী

না-চেনাই ভাল—
চেনাজানা বেশি হলে পরে
বাঘনখ তীক্ষ্ণতা হারায়,
ছোটাছুটি ভোটাভুটি ব্যর্থ মনে হয়।
অপরিচিয়ের অন্তরালে
শ্বাপদ সঙ্কুল এক অরণ্য নির্মাণ
আধুনিক সভ্যতায় প্রাথমিক পাঠ—
চিতাবাঘের চোখ
অসম্ভব ক্ষিপ্রতা
বিষধর সাপের ছোবল
সিংহের অদম্য জেদ
এইসব মিলেমিশে যা দাঁড়ায়
তা হলে সফল হবার সঠিক রেসিপি।
সহনাগরিক বন্ধু হলে
প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধার কমে যায়,
ছুরিতে আর জোর থাকে না
তেমন।
তাই বলি : না-চেনাই ভাল—
পরিচয় প্রগাঢ় হলে
লক্ষভ্রষ্ট হয়ে
আজীবন নরকের কীট-রূপে
পরিচিত হবার
সম্ভাবনা-ই বেশি।
অপরিচয়ের বলয় তাই
ঢের বেশি নিরাপদ
এই বর্তমানে—।

একটি ভালো কবিতা মানে

রমানাথ ভট্টাচার্য

একটি ভালো কবিতা মানে
মায়ের হাতের কোমল স্পর্শ
একটি শিশুর গালে মধুর চুম্বন
অপরূপ সুন্দরী দর্শন
একটি ভালো কবিতা মানে
ফুলের জগতে পাখির জগতে বাস
শ্যামল অরণ্যে নীলাভ পাহাড় ভ্রমণ
নদীর কুলকুল ধ্বনিতরঙ্গে মনে-মনে বিহার
সাগরের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মানস ভ্রমণ
গৌরীশৃঙ্গে বসে পৃথিবী দর্শন
একটি ভালো কবিতা মানে সুরসপ্তকে বাস
রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীরে বিহার
বিঠোফেনের সিম্ফনি শ্রবণ
সত্যজিৎ রায়ের ছবি দর্শন।

একটি ভালো কবিতা মানে
প্রতিপদের চাঁদ দর্শন
একটি রক্তিম সূর্যোদয়
একটি সৌরজগতের হাতছানি
একটি ভালো কবিতা মানে
জ্যোতির্মণ্ডলের আলোয়-আলোয় বাস।

ভার্চুয়্যাল বাঁচা ও সত্যি-সত্যি মরা

দেবেশ রায়

এক.

সারা রাত হয়তো আকাশে মেঘ জমে উঠেছে। হয়তো। হয়তো শেষ রাত থেকেই বাজখোলা পাথারে বজ্রপাত শুরু হয়েছে। হয়তো।

যদি আকাশের দিকে তাকানো যেত, তা হলে বোঝা যেত মেঘ জমে উঠছে কী না। মেঘ জমে উঠলে তারা দেখা যায় না।

কিন্তু আকাশ-তারা-মেঘ এগুলোর দিকে না তাকালে তো আর তাদের দেখা যায় না। তাকাতে হলে তো ঘরের বাইরে এসে কোথাও দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ খুলে তাকাতে হবে।

রাটাপুরা চা-বাগান তিনচার মাসের ওপর বন্ধ। লেবার-লাইন জনশূন্য। কোনো ঘরে কেউ পড়ে থাকতেও পারে, মরে থাকতেও পারে। কিন্তু সেটা খোঁজ-করার মত কেউ নেই। যদি এমন কেউ-কেউ থেকেও থাকে, ঘরের ভিতর মরছে বা কে মরছে তার খবর নিচ্ছে—তা হলেও তার শরীরে সেই শরীর নেই, যাতে সে বাইরে কোনো খোলা জায়গায় আসতে পারে, গড়িয়েও, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে শুয়ে-শুয়েই, আকাশে মেঘসঞ্চারের গতি বুঝতে পারে, আকাশ বা তারা দেখা যায় কী না সেটা পরখ করতে পারে ও বাজখোলাপাথারে বজ্রবর্ষণের কোনো হিশেবনিকেশ, করতে পারে।

তেমন হিশেব-নিকেশের কোনো কারণও নেই। শ্রাবণ-ভাদ্রে বাজখোলাপাথারে এমন না-ঘটলেই বরং হিশেব-নিকেশের কথা উঠতে পারত।

জলপাই-এর মনে এমন হিশেব-নিকেশের কথাটা যে এসেছে, তার মানে জলপাই এখনো ততটা বেঁচে আছে। ততটা বেঁচে না-থাকলে জলপাই তার ঘর ছেড়ে এই টিউবওয়েলের কাছের ঘরটার বাইরে এসে শুয়ে থাকা শুরু করত না। সে ঘণ্টা দেড়দুই পরপর টিপকলের জল খায় পেটপুরে। সেই জলখেয়েই সে বেঁচে আছে। কিন্তু সেটুকু বেঁচে থাকতে-থাকতেই সে বুঝে ফেলছে—টিপকলের জলের শেষ না থাকতে পারে, কিন্তু তার হাতের জোর শেষ। এক হাতে বা দুই হাতেই হ্যাণ্ডেল মেরে, এক হাতের বা দুইহাতের তেলোয় ভরে, জল আর খাওয়া যাচ্ছে না। টিপকলের জল না ফুরতে পারে কিন্তু তার হাতের জোর ফুরিয়ে যাচ্ছে। হাতের জোর ফুরিয়ে যাচ্ছে মানে, যতটা জল টিপকলের নল থেকে বেরবার কথা, ততটা জল বেরচ্ছে না। ততটা জল বেরচ্ছে না মানে, দুই আঁজলা ভরে যতটা জল সে পান করতে পারত, ততটা জল আঁজলায় পড়ছে না। ততটা জল আঁজলায় পড়ছে না মানে, যতটা জল খেলে আগে জলপাইয়ের পেট ভরা-ভরা লাগত, তার চাইতে অনেক কম জলেই তার পেটটা ভরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অতটা জলে পেট ভরে যাওয়ার মানে, জলপাই-এর জল-খাওয়ার দমও

ফুরিয়ে আসছে। জল-খাওয়ার দম ফুরিয়ে আসার মানে, আগে একবার জল খাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি আবার জল খাওয়ার দরকার হত, এখন সেই সময়টা বেড়ে যাচ্ছে। এখন, সেই সময়টা বেড়ে যাওয়ার মানে, জলপাই-এর বাঁচার সময়টা কমে আসছে। জলপাই-এর বাঁচার সময়টা কমে আসছে এটা বোঝার মানে, এটা জলপাই বোঝার মত বেঁচে আছে। এটা বোঝার মত পরিমাপে জলপাই বেঁচে থাকার মানে, জলপাইয়ের কোনো দুনিয়া নেই, কোনো কোম্পানি নেই, কোনো মালিক নেই, কোনো পার্টি নেই, কোনো বন্ধু নেই, কোনো কমরেড নেই। এমন কোনো কিছুই না-থাকার মানে, জলপাই-এর এমন কী জলপাইও নেই। জলপাই-এর এমন কী জলপাইও না-থাকার মানে, জলপাই-এর শুধু মরণ আছে। মরণপাওয়া মানুষের বেঁচে যাওয়ার কোনো পথ খোলা থাকে না। এখন জলপাই জীবনের বাইরে এসে পড়েছে। দশ মানুষের খিদের খাওয়া যদি এখন তাকে খাওয়ানো হয়, তা হলেও তাকে আর জীবনে ফেরানো যাবে না। সে মরণে চলে এসেছে। এখানো সে শুধু এটুকু বেছে নিতে পারে—সে কী করে মরবে? তার জল-খাওয়া-বাঁচা যত কমছে, বাজখোলাপাথারে বজ্রবর্ষণ শোনা তার তত বাড়ছে।

দুই.

হাতের পাঞ্জা সব সময়ই কড়ে আঙুলের দিকে বেঁকে, যদি বেঁকাতে হয়।

ডান পাঞ্জা বাঁয়ে বেঁকে, বাঁ পাঞ্জা ডাইনে।

ডান পাঞ্জা বেঁকালে করতলটাকে বাজখোলা ধরা যায় আর কনুই বরাবর তিস্তা বা বাঁধ।

বাঁ পাঞ্জাটা বেঁকালেও করতলটা বাজখোলাই থাকে কিন্তু কনুই বরাবর বোদাগঞ্জ ফরেস্ট, পাতকাটা কলোনি, ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৪।

আবার দুই পাঞ্জাই বেঁকিয়ে, মাঝের আঙুল দুটোর আগা ছোঁয়ালে দেখা যায়—যেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪, পাতকাটা হয়ে, বোদাগঞ্জ হয়ে, তিস্তায় গিয়ে পড়েছে।

এখন মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে সব জায়গার নিখুঁত ম্যাপ দেখা যায়। চলতে-চলতেই। সব গাড়িতেও তো ড্যাশবার্ডে ম্যাপ থাকে। যেখান দিয়ে যাচ্ছি, জানলা দিয়ে এক ঝলক না তাকিয়ে, শুধু ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়েই জানা হয়ে যায়—কোথা দিয়ে যাচ্ছি। ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ দিয়ে বিশাল ভোলভো বাস ট্যুরিস্ট বোঝাই হয়ে সব দরজাজানলা আটকে ডুয়ার্সে বা আসামে যায়। সেখানে তো যাত্রীদের চোখের সামনে বিরাট রঙিন ম্যাপে দেখা যায় কী ছেড়ে আসা হল, কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি। এগুলো এসি বাস। তাই দরজা-জানলা বেশ টাইট করে বন্ধ রাখতে হয়। নইলে স্থানীয় তাপ, হাওয়া ও জল বাসের ভিতরের আবহাওয়ার সমতা নষ্ট করে দিতে পারে। একবারও বাইরের আকাশ না দেখে ও হাওয়া না মেখে নির্ভুল জেনে যাওয়া যায় কোথা থেকে কোথায় এলাম, কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি। জানা যতই নির্ভুল হয়, ততই ঠিক জানা হয়। কাজে লাগুক, চাই নাই লাগুক, শুধু নিছক জানারই তো একটা আনন্দ আছে।

আর, জানার আনন্দটা তো নিছক আনন্দ। সে আনন্দে কারো কোনো লাভ নেই বা লোকসান নেই।

হাঁটতে-হাঁটতে মোবাইলে জেনে নিচ্ছি কোথা দিয়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছি। রোজকার চেনা রাস্তা বা জায়গা হলেও মোবাইলের পর্দায় সেই জায়গার নাম, হদিশ, বার্ষিক বৃষ্টিপাত, প্রধান ফসল, প্রধান খাদ্য জেনে যাওয়া যাচ্ছে। শুধু এই সাজানো-গোছানোর গুণে রোজকার জায়গাটা মোবাইলের পর্দায় কেমন বেশি চেনা বা একেবারে অচেনা হয়ে যায়। নিজের গাড়িতে পেরতে-পেরতে ম্যাপ দেখে মনে-মনে তো এই পথের সব হদিশ জানা হয়ে যাচ্ছে। একবারও শ্বাস না, টেনে জেনে যাচ্ছি এখানকার হাওয়া ভারী না পাত্‌লা। এক চুমুক না টেনেও জেনে যাওয়া যাচ্ছে এখানকার জলে নুন বেশি না লোহা বেশি।

মানে, নিজের জায়গায় হাঁটতে-হাঁটতেও, হাঁটাটা কেমন বেড়ানো হয়ে যায়।

গাড়িতে বা বাসে বেড়াতে না বেরিয়েও কেমন বেড়ানো হয়ে যায়।

সেই সব বেড়ানোতে বেড়ানো-বেড়ানো খেলাও কত খেলা যায়।

ঐ দুই হাতের পাতার মাঝের আঙুল দুটির আগা ছুঁইয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ থেকে বোদাগঞ্জ ফরেস্ট পেরিয়ে বাজখোলার প্রান্তরে ঢোকা যেন সম্ভবপর। আর সে-প্রান্তরের শেষে তিস্তার বাঁধে বা তিস্তাতেই পৌঁছে যাওয়াও যেন সম্ভবপর।

এমন বেড়ানোতে একটু-আধটু দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, যেমন কমপিউটার গেমের ফাস্ট ট্র্যাক রেসিঙের সময় আমার গাড়িটাতেই পাশের গাড়ির ধাক্কা লেগে আগুন ধরে গেল। কিন্তু ও আগুনে তো ছেঁকা লাগে না, হাসিই পায়। ও আগুন তো ভার্চুয়াল।

ছবির রঙ কি চোখে-দেখা রঙ হতে পারে? ভেজা শ্যাওলার মত ঘন সবুজের নিটোল বিস্তারে এক থোকা লাল ফুল, আঁকা ছবিতে বা ডিজিট্যাল ক্যামেরায় যেমন সুন্দর বিরোধে মুগ্ধ করে দেয়, চোখের দেখার মুগ্ধতায় সে-বিরোধ থাকে না। ডিজিট্যাল ক্যামেরায় তো ছবি দেখে নেওয়া যায় তোলার পরপরই। ও-রকম সুন্দর-বিরোধও প্রকৃতিতে মিশে থাকে, একেবারে মিশে থাকে। প্রকৃতির বিস্তারের কোনো ফ্রেম থাকে না।

ট্যুরিস্ট বাসের বা ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তমান ম্যাপই হোক, আর লেখাজোখাতেই হোক, আর নাচের মুদ্রায় ডান-বাঁ দুই হাতের পাতার মাঝের আঙুল দুটোর আগা ছোঁয়াছুঁয়িতেই হোক—এটা তো কিছুতেই জানা যাবে না—বোদাগঞ্জ ফরেস্ট কেবলই একটা নাম—এখন সেখানে ফরেস্টের নামগন্ধও নেই, আর বাজখোলা নামটা একই রকম পুরনো হওয়া সত্ত্বেও এখনো সেখানে, সেই প্রান্তরে, ভরা শ্রাবণ ও ভরা ভাদ্রে বাজ পড়ে, সত্যিকারের বজ্রপাত, একেবারে মাটি ফুঁড়ে চলে যায় মাটির ভিতর থেকে কোন ভিতরে। সত্যিকারের বজ্রপাত, ঐ শ্রাবণ-ভাদ্রে। অন্য মাসের ভিতর যদি শ্রাবণ-ভাদ্র ঢুকে পড়ে তা হলে সেই ভুল শ্রাবণ-ভাদ্রেও নির্ভুল বজ্রপাত ঘটে যেতে থাকে ঐ বাজখোলায়।

এমন একটা জায়গায় তো মানুষের বসতি-আবাদ এসব, অস্থায়ীও, হতে পারে না। এমন কী চা-বাগানের নার্সারিও হতে পারে না। বাঁয়ে-ভাঙা ডান হাতের পাতা আর ডাইনে-ভাঙা বাঁ হাতের পাতার খোলা আঙুলগুলোর আগা জোড়া লাগালে, কড়ে আঙুল দুটির তলার ফাঁকটা জুড়ে রাধাপুর চা-বাগান দু-একবার চেষ্টা করেছিল, বাজখোলা আর বাগানের সীমান্ত জুড়ে চা-গাছ লাগাতে। ঐ লাগানোই সার। সে-সব চা-গাছের পাতাগুলো ঝরে গেল, নতুন পাতাও গজাল

না। বাগানের মালিকরা তাকিয়েও দেখল না। তারা তো চায়ের বেড করতে চায় নি। তারা চেয়েছিল তাদের দখল দেখাতে যে বাজখোলার প্রান্তর আসলে চা-বাগানের জমি।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও কয়েক লাইন নানা রকমের গাছ লাগিয়েছিল নাকী দেখতে যে বাজখোলার মাটিতে ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, জুনিপার, ঝোপজঙ্গল কী ধরণের গাছ বাড়তে পারে বা বাঁচতে পারে। এক বর্ষাও কাটে নি—কেউ টেরও পায় নি কখন সে-সব গাছ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুড়ে ছাই হয়ে ধুলোতে মিশে গেছে। কোন একটা ধুপি গাছ হু হু করে এমন বেড়ে ওঠে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও ওটাকে তাদের লাগানো গাছ বলে চিনতে পারে না। চিনতে চেয়েছিল কী না, তাও সন্দেহ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও তো শুধু চেয়েছিল, তাদের দখল দেখাতে যে বাজখোলার প্রান্তর আইনত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জমি।

আইনি জমিই হোক আর দখলি জমিই হোক—যে-জমি ফসলও দেয় না, বসতও দেয় না, ফরেস্টও দেয় না, টি-বেডও দেয় না, লতাও দেয় না, পাতাও দেয় না, সে-জমির আইনি বা দখলি মালিক হয়ে কার কী লাভ?

এ মাটির ওপরে আকাশ থেকে শুধু বাজ পড়ে। পড়ে, মাটির ভিতরে সেঁদিয়ে যায়। গিয়ে, হয়তো জমাও থাকে। থেকে, চা-বাগান—রাধাপুরের মজুর-কামিনদের মধ্যে, চা-বাগানের লাইনের বাইরে রিটায়ার-করা বা ছাঁটাই-হওয়া মজুর কামিনদের মধ্যে, চা-বাগানের বাইরে নিজের জমি বা পরের জমি চাষ-আবাদ করে যারা তাদের মধ্যে, রংধামালির হাটে যে-সব দোকান অন্যদিনও খোলা থাকে বা হাটের দিনেই বসে, তাদের মধ্যে, এমন একটা কথা চালু রেখেছে যে, কোনো দিন, কোনো একদিন, আকাশ থেকে আগুন-ছোটানো বাজ নামবে আর মাটির তলা থেকে আগুন-উগরানো বাজগুলো উঠে আসবে। তারপর কী হবে, সেটা কেউ না-জানলেও আগুনবৃষ্টি আর আগুনবন্যা একসঙ্গে ঘটছে—এই পর্যন্ত ভাবাই যথেষ্ট ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে এখনো, শ্রাবণ-ভাদ্রের অন্তত, এমন কী বছরের অন্য মাসেরও, কাঠকয়লার মত ছাইরঙা মেঘে ওপরনীচ অন্ধকার করে বৃষ্টিপাতে, অন্ধকারকে ফালাফালা করে এক-একটা আগুন যখন বাজখোলা প্রান্তরের মাটির ভেতর সেঁদিয়ে যায় আনুষঙ্গিক বজ্ররবসমূহ সহই। একটা কোনো অনির্দিষ্ট ভবিষ্যে, আকাশের আগুন আর পাতালের আগুন মিলে যাওয়া অলাতচক্রের ভয়ঙ্করতর কল্পনা ছাড়া মানুষজন কী করে পার হবে প্রতি বছরের, তার মানে, প্রতি দিনেরই, এইসব ভয়ঙ্কর দিনগুলো?

অথচ, কী আশ্চর্য। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ট্যুরিস্ট বাসে, বা, নিজেদের গাড়িতে, বা, এমন কী নিজের হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইলের ম্যাপটা কখনোই আমাকে দেশ বা দিক হারাতে দেয় না। সেই ডাইনে-বাঁয়ে ভাঙা দুই হাতের খোলা তালুর মাঝে'র আঙুলের মাথা দুটো ছোঁয়ালে পাতকাটা, মাত্র দেশভাগের পর কলোনি হয়েছে; বোদাগঞ্জ ফরেস্ট, মাত্র দেশভাগের পর ফরেস্টের, শাল-বাবলা-পাকুড়-অর্জুন-খয়ের-লাম্বুনি-শিশু-চাঁপা-ধুপিগাছের দুর্ভেদ্যতা, আর বাঘ-হাতি-বাইসনের ভয়, একই সঙ্গে, ধীরে-ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত, সুগম ও অতীত হয়েছে; আর বাজখোলা যার শ্রাবণ-ভাদ্রের কাল আকাশ থেকে বজ্রপাত আজও ঘটে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ অজানা অতীত থেকে শুরু হয়ে আজও ঘটে যাচ্ছে, সে-অতীতের কোনো হিশেব-নিকেশ নেই, সম্ভব নয় বলেই নেই, কারণ অতীতকে মাপতে সময়ের কিছু চিহ্ন দরকার, যেমন মৌর্য অশোক বা

মোগল আকবর বা শাহেব ক্লাইভ, তেমন কোনো চিহ্ন আকশে বা মাটির তলায় পাওয়া যায় না আর বজ্রপাতের পথ খুব সরল—আকাশের মেঘ থেকে মাটির তলা। এমন এক চিহ্নিত অতীত ও অচিহ্নিত অতীতের মধ্যে বাজখোলার প্রান্তর।

ম্যাপে যেটা আছে, সেটা আসলে নেই। পাতকাটার জঙ্গল নেই, বোদাগঞ্জ ফরেস্ট নেই। যেটা আছে—বাজখোলার পাথার—সেটা যখন ছিল, তখনো ছিল না, যখন আছে তখনো নেই। হ্যাঁ, শুকনো খটখটে দিনে বা শীতকালে সেই পাথার দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করে বটে, কিন্তু অত বড় পাথার দিয়ে কটা মানুষ যাতায়াত করলে সেটা একটা গন্তব্য হতে পারে?

তা ছাড়া ম্যাপে-ছবিতে যতই কেন না বাঁ হাতের তালু ডাইনে বেঁকিয়ে আর ডান হাতের তালু বাঁয়ে বেঁকিয়ে আর তাদের মাঝের আঙুল দুটোর আগাদুটো ছুঁইয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ থেকে পাতকাটা-বোদাগঞ্জ-বাজখোলার পাথার—তিস্তার বাঁধ-তিস্তা জোড়া লাগিয়ে একটা গোল বানানো হোক, যেন ঐ রুটে ঢুকে তিস্তার বাঁধের ওপর দিয়ে দক্ষিণে গেলে উঠতে পারবে সেই একই ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪-এই, আসলে ও-রকম কোনো রুট হয় না। বা, বড়জোর বলা যায়—এমন একটা রুট চোখের সামনে যতটাই স্বাভাবিক, বাস্তবে ততটাই অস্বাভাবিক।

দুই হাতের তালুর সাঁকোটার একেবারে কড়ে আঙুল দুটোর তলায় পুবপশ্চিমে ছড়ানো রাধাপুরা চা-বাগান ছ-মাস না আটমাসের ওপর বন্ধ। যদি খোলা থাকত তাও একটা সংযোগ কল্পনা করে নেয়া যেত, যেন বাজখোলা পাথারে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে পাথারে ঢুকলে, পাথারের ঐ পশ্চিম সীমা ধরে সোজা হেঁটে রাধাপুরায় সাড়ে-সাত-নম্বর ব্লকে ঢুকে পড়া যায়। তারপর তো ব্লকের ভিতের-ভিতরে বাগানের ট্রেঞ্চ আর রাস্তা। হেঁটে হেঁটে রংধামালির হাটের দিকে চলে যাওয়া যায়। বা তারও ওপারে

এদিকে রংধামালির হাটটাই বড় হাট ছিল। রাধাপুর চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে। এখনো এটাই সবচেয়ে বড় হাট। রাধাপুর বন্ধ হওয়ার পরেও।

তিন.

একটা চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কী ঘটে?

ট্রেনে কৃষ্ণনগরের দিকে যেতে-যেতে বা বর্ধমান বা খড়্গপুরের দিকে যেতে-যেতে কত কারখানাই তো উঠে গেছে দেখা যায়। সেই উঠে-যাওয়াটাই একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য হয়ে আছে। মাইলের পর মাইল বেশ উঁচু দেয়াল, কোথাও প্লাস্টার-করা, কোথাও খোলা ইট, ইলেকট্রিসিটির থাম, সেই থাম বেয়ে ওঠা লতা, গুদামঘরের মত টানা টিনের ব্যারাক, টিনগুলো কিছু-কিছু নিয়ে গেছে, কিছু-কিছু নেয়ও নি, চিমনি,—ভেঙে-পড়া, ও ভেঙে না-পড়া, চিমনির কংক্রিট বেদি, কুয়োর ভিতর পাইপ নামানো, কুয়োর মুখটা লতাপাতায় ঢাকা, হঠাৎ একটা বেশ বড় লোহার গেট—অতে ফ্যাক্টরির নাম এখনো পাঠযোগ্য, কোথাও সেই গেটের তলা দিয়ে রেললাইন বেরিয়ে বেঁকে গেছে, দোতলা বা হয়তো তিনতলা গুদামের সবটাই কাচ দিয়ে মোড়া—কোনো-কোনো কাচে সূর্যালোক ছিটকোয় এখনো, বেশির ভাগ জায়গাতেই একটা খাল বয়ে যায় এই দেয়ালগুলির পাশে-পাশে বা এই দেয়াল ও রেললাইনের মাঝখান দিয়ে। আশ্চর্য জনহীনতা, প্রায় ভৌতিকই,

কারণ এই সব জায়গার নামগুলো তো সবারই চেনা, জায়গাগুলোর নাম তো শোনাও বটে, আমাদের মধ্যে অনেকেই তো এইসব জায়গাগুলো থেকে কলকাতায় যাতায়াত করে, এই সব ট্রেনেই, এই সব জায়গায় যাত্রীদের যাতায়াতের জন্যই তো লোক্যাল ট্রেনে এমন অন্ধকূপ হত্যার মত ভিড় নিয়ে ছোটাছুটি করে, প্ল্যাটফর্ম বদলায়, মাইকে নানারকম ঘোষণা চলতেই থাকে, ভিন্ন দিকের অপেক্ষমান যাত্রীদের আপাত দল বেঁধে। বসে-থাকার নিরুদ্বেগের ভিতর দিয়ে সেই মুহূর্তে যে-ট্রেন ছাড়ছে তার যাত্রীদের পড়ি-কী-মরি বেগে ছোটাছুটি, অথচ ট্রেনের জানলায় জানলায় এই অনন্ত সঙ্গী ভগ্নস্তূপ কারখানাগুলির উঁচু পর্বতশিখর তুল্য জনশূন্যতা। শূন্যতা।

বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানের দৃশ্যে এমন নাটকীয়তা থাকে না। নাটকীয়তা তো থাকে যে দেখছে, তার চোখে। সে যদি দেখতে-দেখতে ভাবে নাটক দেখছে, তা হলে নাটক। সে যদি দেখতে-দেখতে ভাবে একটা গল্প দেখছে, তা হলে গল্প। যাই দেখুক, দেখার জন্য রেললাইন থাকা দরকার, রেললাইনের ওপর ট্রেন থাকা দরকার ও সে-ট্রেন ছুটে চলা দরকার। দার্জিলিঙের দিকে ট্রেনে যেতে-যেতে চা-বাগান দেখা যায়, কিন্তু ডুয়ার্সে তো দেখা যায় না—গেলেও আলিপুরদুয়ারের দিকে। কিন্তু ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখে বোঝার উপায় নেই কোন চা-বাগান বন্ধ হয়ে আছে বা গেছে, আর কোন চা-বাগান খোলা আছে। চা-বাগানেও ফ্যাক্টরি থাকে, বয়লার থাকে, চিমনি থাকে বটে কিন্তু সেগুলো চা-বাগিচার বিপুল বিস্তারের ভিতর এমন ঢাকা পড়ে যায় যে কোনো ধ্বংসের চলচ্চিত্র তো তৈরি করেই না, বরং চা-বাগিচার ঘন সবুজ সমতল বিস্তার আর নরম ঢাল এমন মুগ্ধতা সঞ্চার করতেই থাকে, যেন এক অজ্ঞাতবাস বা গোপন নিবাসের স্বসম্পূর্ণতা—তাতে কোনো অভাব থাকতেই পারে না। চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেল্যে চা-বাগিচা, চা-বাগিচাই থাকে। সেই চা-বাগিচার ভিতরে ছায়াবিস্তারের জন্য যে শেডট্রিগুলো আছে, সেগুলো তাদের ছায়াসহ পাতা মেলে খাড়াই থাকে। সেই চা-বাগানের ভিতরে যে-কুলি লাইনগুলো থাকে, সেই কুলি লাইনগুলোও থাকে। সেই কুলি লাইনগুলোতে যে টিউকল থাকে, সেই টিউকলগুলিও থাকে। সেই লাইনগুলোতে লোকজনও থাকে। সেই লোকজন টিউকলে জলও নেয়। কোথাও-কোথাও ঝোরার জলে কামিনরা কাপড়ও ধোয়, স্নানও সারে। অত নির্জনতার ভিতরে কোথাও কোনো নির্জনতা ঘটে না। এতই নিভৃত সেই বন্ধ হওয়া, চা-বাগানের সেই বন্ধ হওয়া, যেন এমন বিভ্রম তৈরি হয় যে চা-বাগান এমনই নিভৃত।

কারখানা বন্ধ করে দেয়া মানে প্রধান গেটটায় তালা আটকে একটা নোটিশ সেঁটে দেয়া। চা-বাগানে তো কোনো গেটই থাকে না, তা হলে বন্ধ করবে কী? নোটিশ একটা টাঙানো হয় বোধহয় কোথাও হাতে লিখে—সে আর কে দেখে?

তা হলে বোঝা যায় কী করে যে বাগান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অফিস খোলে না, ফ্যাক্টরি খোলে না, পাতি তোলার বাবু আসে না, ঝাড়াই-কাটাইয়ের বাবু আসে না।

তাতেও ঠিক বোঝা যায় না।

ভোঁ বাজলে যার যেখানে কাজ, মজুররা সোজা সেখানে, ব্লকেই, চলে যায়—সে পাটি টেপার কাজই হোক আর ঝাড়াই-কাটাইয়ের কাজই হোক। কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ

পর বাবুরা আসে। আবার, তেমন যারা পুরনো বাবু তারা তো অনেক সময় শেষ হওয়ার মুখে একবার সাইকেল মেরে এসে দেখে যায়। তার আগে, বাবুরা অফিসে চা খায়, আড্ডা দেয়। একেবারে নতুন কোনো বাবু কাজে এলে সে হয়তো সরাসরি কাজের জায়গায় চলে যায়, তখনো আড্ডায় তার চেয়ার ঠিক হয়নি। তেমন ছোকরা বাবুদের কোনো পাত্তাই দেয় না কামিনরা। তাকে নিয়ে নানা রকম মজা করে। আর, নালা কাটা, কী কালভার্ট-সারাই, কী তারকাঁটার বেড়া সোজা করা—এ-সব তো মজুরদেরই কাজ। বাবু পুরনো হলে মজুরদের কাছেই জেনে নেয় কাজ কদ্দুর কী হয়েছে, হচ্ছে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কী না। অসুবিধে তো হতেই পারে। নালী তো এত গভীর করে ফাড়তে হয় যাতে হাতি পেরতে না পারে। নালী কাটতে-কাটতে পাথরের স্তূপে অনেক সময় আটকে যায়। কোনো একটা বড় পাথরের স্তূপ নয়—তেমন একটা-দুটো পাথর তো মজুররাই গর্ত খুঁড়ে বের করে তুলে ওপরে রেখে দেয়। কিন্তু একটু বুড়ো ধরণের মজুর দুটো-একটা পাথর দেখেই বুঝতে পারে যে—দুটো-একটা পাথরের ব্যাপার না, ওটা পাথরেরই একটা আল, মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল। মাটির তলার পাথরগুলো কী ভাবে সাজানো আছে সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তখন, বাবুদের ডাকতে হয়, ম্যানেজারকেও ডাকতে হয়। বাবুরা, ম্যানেজারবাবু, বুড়োটে মজুররা কথাবার্তা বলে ঠিক করে—ওখানেই নালীটা খতম করে দিয়ে, একটু ছাড় রেখে, সেই ছাড়ের পর থেকে আবার খুঁড়বে, না কী, শাবল-টাবল দিয়ে নতুন যে নালীটা কাটা হচ্ছে সেটার ঠেকে যাওয়া পাথরের আলটা ভাঙা হবে।

ছোকরা বাবুদের তো এইসব কাজের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাখা হয় যাতে তারা মজুরদের দেখে-দেখে কাজ শিখতে পারে।

পাঁচ-সাতশ একরের চা-বাগান তো ছোট বাগান। পনেরশ কী আড়াই-তিন হাজার একরের চা-বাগান তো একটা রাজত্বের ব্যাপার। তার কোন ব্লকে বা ঝোপে কী কাজ হচ্ছে তা কি সবার জানা থাকে না কী? আর বাগানের সে-সব কাজ তো দিনের হিশেবে হয় না। মাসের হিশেবেও হয় না। খানিকটা ঋতুর হিশেবে হয়। বর্ষার আগে নতুন পাত্তির ব্লকগুলোর গাছের তলায় নোংরা একই সঙ্গে পরিষ্কারও করতে হয়, আবার জড়োও করতে হয়। বর্ষার জলে যেন গাছের গোড়ায় পচন না ধরে তাই পরিষ্কার করতে হয়। আবার কতকগুলো ঘাসপাতা চিনে চিনে গাছের গোড়ায় দাবিয়ে দিতে হয় যাতে বর্ষার জলে পচে সারের কাজ করে। আবার বর্ষা শেষ হতে না-হতেই চায়ের সবচেয়ে দামী প্রথম কুঁড়ির উদগমের জন্য গাছকে তৈরি করতে হয়, শেডট্রির ডালপালা দিক বুঝে ছাঁটতে কাটতে হয়, রোদ যাতে এত বেশি সকালে না আসে যে শেষ রাত থেকে প্রথম ভোরের শিশির শুষে নেয়ার টাইমই পেল না গাছ। ঐ শিশির খাইয়েই তো হাজার-টাকা দর-পাওয়ার মত চায়ের কুঁড়ি গজাবে।

এমন একটা রাজ্যিজোড়া ঘর-সংসারের কাজ রোজ করলেও কি সেই কাজগুলোকে রোজের সীমায় বাঁধা যায়?

বাগানটা যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, লক আউট, সে-খবর এই রাজ্যিজোড়া লোক জানবে কী করে? জানে, জেনে যায় পাকাপাকি, যখন সপ্তাহের টাকা পায় না। তার আগে কানাঘুষো কি আর হয় না—লাইনে, লাইনে? লাইনে তো কত কথাই কানাঘুষো হয়। সে-সব কেউ-বা

কানে নেয়, কেউই-বা বিশ্বাস করে। জেনে নেওয়ার কথা তো ভোঁ বাজানো বন্ধ হওয়া থেকেই। সবাই কি আর ভোঁ শুনে কাজে বেরয়? কাজে বেরিয়ে পড়ে শরীরের অভ্যাসে। আবার, সেই অভ্যাসেই ভেবে নেয়—ভোঁ বেজেছে নিশ্চয়ই, হয়তো সে খেয়াল করে নি। কিন্তু কোনো এক সময় তো জানতেই হয় যখন 'রোজ' পাওয়া যায় না।

তা সত্ত্বেও, সবাই জেনে গেলেও, রোজকার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলেও, চা-বাগানের জীবনটা কিন্তু এক রকম চালুই থাকে, একেবারে থেমে যায় না কোনো সময়ই। বাবুদের দু-একজন হয়তো বাগান ছেড়ে যায়, তাদের হয়তো বাড়ি আছে সদরে। কিন্তু তারা তাদের কোয়ার্টারে তালা লাগিয়ে যায়, কোয়ার্টার ছেড়ে যায় না। বেশির ভাগ বাবুই থেকে যায়, হাট-বাজারও করে, বাবুদের ক্লাবটাও সন্ধেবেলা খোলা থাকে, রাত দশটা পর্যন্ত জেনারেটার চলে, লাইনেও দু-চারটে আলো জ্বলে, বাবুরাই চালান—পয়সা দিয়ে ডিজেল কিনে এনে।

বাগিচাগুলো ধীরে-ধীরে জঙ্গল হতে থাকে।

কিন্তু সে তো বুঝতে পারে বাবুরা আরও মজুররা। তারা গাছ চেনে, তাই আগাছাও চেনে। তারা বুঝতে পারে, কখন কোন ব্লকের গাছগুলোর পাতা চা তৈরি করার বাইরে চলে গেল। তাদের একটা হিশেবও থাকে, একেবারে খাঁটি হিশেব, যার খুব একটা নড়চড় হয় না যে কালও যদি বাগান খোলে, তা হলে, সেই বাগানে বেচার মত চা ফলাতে আরো অন্তত মাস তিন-চার লাগবে। অর্থাৎ কাল বাগান খুললেও, ফ্যাক্টরি খুলবে না।

এই হিশেবটা নির্ভুল কিন্তু সেই নির্ভুল হিশেবটায় পৌঁছুনো খুব রহস্যময়। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ক-দিন খুব ফুর্তি আসে। ভোঁ নেই, কাজ নেই। সারা দিনই ছুটি। সারা দিনই মস্তি। হাড়িয়া খাওয়া বেড়ে যায়। সাজগোছ বেড়ে যায়। হাটে যাওয়া বেড়ে যায়। নাচা-গানা বেড়ে যায়। তার পর কখন এক সময় শুরু হয়ে যায় অন্য সব কাছাকাছির চা-বাগানে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি দেখা করতে যাওয়া। চা-বাগানগুলো তো একটা অনেকখানি বড় এলাকা জুড়ে পাশাপাশি তৈরি হয়। বাগানের জন্য দরকার এমন ঢাল জমি যেখান দিয়ে বৃষ্টির প্রচুর জল বয়ে চলে যায় কিন্তু কোথাও কোথাও আটকে যায় না বা মাটির ভিতরে চলে যায় না। আবার, সে-জমিতে রোদও চাই চড়া কিন্তু সে-রোদে যেন গাছের পাতা বা ডাল না পোড়ে। সেই কারণেই অনেক বড়-বড় ডাল ও পাতাওয়ালা গাছের ছায়ায় ঢেকে দিতে হয় চাগাছকে। দার্জিলিঙের পাহাড়ে সেই ছায়া দেয় মেঘ। অত উঁচু পাহাড় যেখানে নেই, সেখানে ছায়া-দেয়ার গাছ পুঁততে হয়। এমন যে-জায়গা—মাটির ঢাল, আকাশের রোদ, মেঘের বৃষ্টি, আর গাছের ছায়া—সেখানে কি আর মাত্র একটাই বাগান হয়, পাশাপাশি গায়ে গা-লাগানো বাগান কতই থাকে। সব বাগানেই ছড়ানো থাকে—আত্মীয়স্বজন, ছেলে-ছেলের বৌও, এমন কী স্বামী-স্ত্রীও দুই বাগানে কাজ করে। বন্ধ যখন হয়, তখন তো একটা বাগানই বন্ধ হয়। পাশাপাশি বা দূরের আর-সব বাগান তো খোলাই থাকে। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া উপলক্ষে যে-আচমকা ছুটি জুটে যায়, সেই ছুটিতে ঐ সব আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া শুরু হয়।

যারা যায় তারা সবাই ফিরে আসে না। কেউ হিশেবও রাখেনা, জানতেও চায় না কে বা কারা ফিরে এল, কে বা কারা ফিরে এল না। ততদিনে বাগান আরো বুনো হতে শুরু করেছে,

ততদিনে বাগান আরো খালি হতে শুরু করেছে। ততদিনে চায়ের পাতা ছিঁড়ে এনে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে নুন দিয়ে খাওয়া শুরু হয়েছে। পেটটায় অনেকক্ষণ খিদে থাকে না—একটু চলাফেরাও করা যায়। এক সময় দেশলাই কাঠি ফুরিয়ে যায়। গাছের শুকনো ডাল তো হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, চায়ের পাতাও, টিউকলের জলও। কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠি পাওয়া যায় না। আর, নুন পাওয়া যায় না। তাও, তখনো, চায়ের কাঁচা পাতা রাতভর ভিজিয়ে রাখলে জলের রংটা মরচের মত হয়। সকালে সেই জলটা খেয়ে নিলে একটা ঢেকুরও ওঠে, মনে হয় পেট ভরে গেল।

কিন্তু পরের সকালের আগে তো অমন জল আর তৈরি করা যায় না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। ধীরে ধীরে সারা শরীরে ঝিম ধরে, গাঁটে-গাঁটে ব্যথা, কোনো উদ্যম থাকে না। রাতভর ভিজিয়ে রাখতে পাতাও ছেঁড়া হয় না, জলও আনা হয় না। চায়ের পাতার তো শেষ নেই। শুকনো কাঠেরও তো শেষ নেই। টিপকলের জলেরও শেষ নেই। কিন্তু শেষ আছে দেশলাইয়ের কাঠির। শেষ আছে ভাঙাচোরা জলপাত্রের। শেষ আছে, নুনের। শেষ আছে, এইগুলো জোগাড় করার পয়সার। শেষ আছে শরীরের শক্তির।

তখন সেই ভাঙাচোরা ঘরের ভিতর একা-একা শুয়ে থাকা। বা, পড়ে থাকা। কোনো চিন্তাভাবনা নয়। কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নয়। কোনো খিদে পাওয়া নয়। কোনো অনুভব নয়। কোনো খাবার ঠোঁটের কাছে এলেও ঠোঁট ফাঁক করা নয়। চা-বাগানগুলো যেমন প্রকৃতিতে ফিরে যায়, মজুররাও তেমনি প্রাকৃতিক হয়ে যায়। এই হিশেবটা নির্ভুল। কিন্তু সেই হিশেবটায় পৌঁছুনো খুব রহস্যময়।

চার.

মানুষ জল দিয়ে আগুন নেবায়। পেটের আগুনে জল ঢেলে জলপাই বাইরের জলে তার শরীর ভেজায়—ভাদ্রের ধরার নাই কোনো ছাড়া। প্রবাদও মনে আসে জলপাই-এর যখন সে তার জলভারক্লান্ত শরীরটা নিয়ে, টলেটলে হলেও, বাজখোলাপাথারের দিকে দু-পা হাঁটে। এটুকু জল, পেটে কতক্ষণ থাকবে? জলপাই-এর হিশেব আছে, তখন আর সে হাঁটা তো দূরের কথা, দু পায়ের ওপর খাড়াও থাকতে পারবে না। মাটির ওপর শুয়ে পড়তে হবে। বা, শরীর, অকে মাটির ওপর ফেলে দেবে। বা, শরীর, তার শরীরকে মাটির ওপর ফেলে দেবে। যেখানে ফেলবে, সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়েও সে আর টিপকলে ফিরে আসতে পারবে না, তার একমাত্র খাদ্য জল খেতে। তখন সে, মানে, তার শরীর, আর কোনো কিছু ভাবতে পারবে না, এই শরীরের মতই তার একান্ত কোনো প্রবাদও সে মনে করে উঠতে পারবে না। সে মরে যাবে। এমন হতে পারে কী না, জলপাই জানে না যে সে মরে যাওয়ার পর, আটকে থাকা প্রবাদটা তার মনে পড়ল, যেমন, খাদ্যনালীতে কোনো কণা আটকে বিষমটা জল-টল খেয়ে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর খাদ্যনালীটা আবার খুলে গেল।

জলপাই আর জল খেতে চায় না। তার জল খাওয়াও ফুরিয়ে গেছে। এবার সে আগুন খাবে। বাজখোলা পাথারের বাজপড়া আগুন। মরণ তাকে পরিত্রাণহীন কব্জা করে ফেলছে।

মরণকজ্জার বিরুদ্ধে আর-কোনো প্রতিরোধই তার নেই। জল খেয়ে বাঁচার নিরুপায় চেষ্টা থেকে যতদূরে সম্ভব সে সরে আসতে চায়। কাল শেষ রাত থেকেই এত বাজ পড়ছে বাজখোলাপাথারে যে জলপাই-এর শরীরটা নিশ্চেষ্ট যদি ঐ মাঠে গিয়ে পড়তে পারে, তা হলে একটা-না-একটা বাজ নিশ্চয়ই তাকে বিদ্ধ করবেই, আজ, না-হয় কাল।

জলপাই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে হাঁটে। তার দুটো হাত সরু হয়ে গেছে। খেতে না পেলে হাত তো সরু হবেই কিন্তু ছোট হয়ে যায় না। যদি ছোট হয়ে যেত, খেতে না পেলে মানুষের শরীরটা যদি ক্রমেই ছোট হয়ে যেত, তা হলে এত বড় একটা শরীরের ভারতো মানুষকে বইতে হত না। তা হলে, শামুকের মত, বা চা-বাগানের জোঁকের মত, বা চা-বাগিচার নালীর তলার জলের ব্যাঅচির মত, বা কেঁচোর মত, গড়িয়ে-গড়িয়ে নিজেকে নিজেরই পাকে-পাকে জড়িয়ে শীতকালের সাপের মত গুটিগুটি মেরে না-খাওয়া দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারত জলপাই ফের খাওয়ার দিন পর্যন্ত। কিন্তু জলপাই-এর শরীরটা তো খাওয়া না পেয়ে শুকিয়ে ছোট হয়ে যায় না। তার শরীরের যে হাড়গুলো তার জন্মকাল থেকে তাকে খাড়া রেখেছে, সেগুলো খাড়াই থাকে। কী করবে সে এতগুলো হাড়গোড় জোড়া লাগানো এই গোটা একটা শরীর নিয়ে? তার গলাটা এত সরু হয়ে গেছে যে তার মুণ্ডুটা ভারী হয়ে গেছে, খাড়া থাকতে পারে না। মুণ্ডুটা তো আর সরুও হয় নি, হালকাও হয় নি। এত ভারী একটা গোটা মাথা নিয়ে কী করবে জলপাই।

সে বাজখোলাপাথারের দিকে হাঁটছে। তার পেটের ভিতরের জলগুলো কলকলিয়ে উঠছে। এই মাত্রই খেয়েছে তো। তার লম্বা পা দুটো আরো লম্বা হয়েছে। খেতে না-পেয়ে জলপাই-এর হাত পাগুলো লম্বা হয়ে গেছে। বাজখোলাপাথারে কড়-কড়-কড় আওয়াজে বাজ পড়ছে, পড়েই যাচ্ছে। অঝোর বৃষ্টিরও তো একটা আওয়াজ আছে, হাওয়াও তো বইছে একটু-আধটু।

এত সব আওয়াজের মধ্যেও জলপাই শুনতে পায়, চলনের তালে-তালে তার পায়ে নানা রকমের আওয়াজ উঠছে। একটা পা তুলে আর-একটা পা ফেলার সময় বেতালে কট কট আওয়াজ উঠছে গোড়ালিদুটোতে। গোড়ালির আওয়াজটা মিলিয়ে না-যেতেই তার হাঁটুদুটোতে পর-পর খটখট আওয়াজ ওঠে। আর, তার পরই কোমরের পেছনের দুদিকের হাড়দুটো পরপর খটখটাস খট-খটাস করে ওঠে। মনে হয়, খুলে পড়ে যাবে। কিন্তু ততক্ষণে আবার গোড়ালির প্রথম আওয়াজটা ফিরে আসে। নিজের শরীরের এই আওয়াজগুলির ফাঁদ থেকে অন্তত ছাড় পাওয়া যায় শুয়ে থাকলে। যেমন, মরে গেলে মানুষ খাড়া থাকতে পারে না, তাকে শুয়ে পড়তে হয়—সে টিপকলের পাশের রাস্তাটাতেই হোক বা কোনো ঘরের ভিতরেই হোক। যে যত খাড়া, তার তত খিদে। মানুষ সবচেয়ে খাড়া। মানুষের সবচেয়ে খিদে।

তাই, জলপাই বাজখোলাপাথারে যাচ্ছে একেবারে শুয়ে পড়তে। মরা মানুষের মত স্থায়ী শুয়ে পড়তে। মরা মানুষ শোয়া থেকে কখনো খাড়া হয় না। জলপাই-ও আর খাড়া হবে না। এত বজ্রপাতের মধ্যে কোনো একটা বাজ তার সারাটা শরীর মাটির সঙ্গে গেঁথে দেবে।

জলপাই তার শরীরে সেই তিন-চারটি আওয়াজ তুলতে-তুলতে বাজখোলাপাথারে প্রায় পৌছে যায় যখন, তার বুকের ভিতরেও একটা আওয়াজ আসে। সে হাঁ-ও করে কিন্তু সে-আওয়াজটা গলা দিয়ে বেরয় না। গলা দিয়ে না-বেরলেও বুকের আওয়াজ তো বুকেরই আওয়াজ। জলপাই শুনতে পায় সে বলছে, 'হাম্ চলেক হে, বাজখোলাপাথারমে চলেক হে—'

কাকে বলে যাচ্ছে জলপাই? সে কি কোনো জবাবের অপেক্ষা করে বাজখোলাপাথারে ঢুকে পড়ার এই কয়েক পা আগে? নাকী সেই বাজপ্রান্তরে ঢুকে পড়ার আগে সে সঙ্গী চায়? তা হলে কি সে জানে, যে—কুলি লাইনের ভিতর দিয়ে যে সারা শরীরে গোটা তিন-চার আওয়াজ তুলে যাচ্ছে, সেই কুলি লাইনের এখানে-ওখানে, যেখানে-সেখানে, না-খাওয়া সব শরীর শুয়ে আছে—চা-বাগানটা বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ তারা এখনো মারা যেতে পারেনি।

বাজ পড়ার আওয়াজ, হাওয়ার আওয়াজ, শরীরের ওপর অঝোর বৃষ্টিপাতের আওয়াজ, নিজের শরীরের হাড়গোড়ের তিন-চারটি আওয়াজের ভিতরও জলপাই শুনতে পায় তার বুকের ভিতরের আওয়াজ—'বাগান বন্ধ্ হো চুকা, কোম্পনিকো রেশন বন্ধ্ হো চুকা, হামকো খানা বন্ধ্ হো চুকা—'

আরো কয়েক পা এগিয়ে বাজখোলাপাথারের ঢুকে গিয়ে পেছন ফিরে সে বাগানের দিকে তাকিয়ে বলে, সে শুনতে পায় সে বলছে, বুকের ভিতরে বলছে, 'কই জানেমন হ্যায়? কই সাথিমন হ্যায়?' কেউ কি আছো সঙ্গে যাওয়ার, যাবে না কী কেউ আমার সঙ্গে?

একটু কি ভয় পেয়েছে জলপাই—মরে যাওয়ার আগে জ্যান্ত মানুষের শেষ ভয়? নইলে, সেই বাজপ্রান্তরে ঢুকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে তার বুকের ভিতরের এই আওয়াজ শুনতে পাবে কেন—'নাহি, হাম লেট না যাই', শোব না, শোব না, 'হাম বাজ পিয়েগা, আমি বজ্র পান করব, 'আগ পিয়েগা', আগুন খাব, 'জিন্দা রহেগা' বেঁচে থাকব?

ততক্ষণে আকাশের সব বাজ, মাটির ওপর খাড়া ও চলমান এই মানুষটাকে লক্ষ করে তাকে ঘিরে ফেলছে।

গিরগিটির রক্ত

সাধন চট্টোপাধ্যায়

লোকটা বলল, তিন দিমু। দ্যাহেন দেবেন কিনা।

তিন মানে তিন হাজার।

অসম্ভব। ঐ গাছের তিন হাজার দাম হয়?

দ্যাহেন তাইলে। লোকটা উঠে পড়ার ভান করেও, দরদামের বৈঠক ছেড়ে চূড়ান্ত উঠে পড়ে না।

ফের বলল, আপনার দামডা শুনি?

আমার দাম? কিনবেন তো আপনারা? আমার আবার দাম কী গো?

বটকৃষ্ণ দাম বলার ঝুঁকি এড়িয়ে গেল। মুখ ফসকে সংখ্যাটা বেরুলেই তো পার্টি খপাস্ করে পেয়ে বসবে। তা নিয়েই টানা হ্যাঁচড়া—যতটা টেনে কমানো যায়।

তাছাড়া বটকৃষ্ণর কোনো ধারণা নেই বর্তমান বাজার দর—বৃক্ষ, কাঠ বা কাঁচা গাছের প্রকৃত মূল্য—দালালদের কূটকৌশল, ক হাত ঘুরে মালের দর ওঠা-নামা করে ইত্যাদির। বিক্রির উদ্দেশ্যে এই যে গাছটা—কত বছরের আন্দাজে বলতে অক্ষম। সে তো বাড়িটা কিনেছে বছর আট-নয়। তিন কাঠার ভাঙা চোরা একতলা দালানটা সারিয়ে-বাড়িয়ে যুৎসই করে নিয়েছে। পাঁচিলদেয়া বাড়ি, গাছটা একেবারে সীমানায়। আঁটির গাছ। কে কবে আম খেয়ে সুদূর অতীতে ফেলে দিলে, আঁটি ফেটে চারা। এখন তারই পরিণতিতে বৃক্ষ। গুঁড়িটায় নজর পড়লে লোভ হয়—চেরাই করলে ভালো দাম জুটবে। যথেষ্ট ফল দিয়েছে—টক মিষ্টিতে ফি বছর খেয়ে, প্রতিবেশীদের বিলিয়ে, নর্দমায় পড়ে থাকা, ছেলেপুলেদের হৌকহোকানি, গোপনে পাঁচিল টপকানো—উৎপাত চলে। কিন্তু লাগোয়া পড়শি ভটচাজ বুড়ো মানুষটা বাঁকা স্বভাবের, কাউঠ্যা ধরণের। দিনরাত নিজের সংসারেও খিট্‌ খিট্‌, বৃদ্ধা বউকে ধমকানো, জোয়ান ছেলেটার সঙ্গে ত্যাড়ামি। উল্টে ছেলেও মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চ্যাচায়। চোটপাটে পাড়ার লোক প্রথম প্রথম কৌতূহল দেখালেও, এখন সয়ে গেছে। অন্য সংসারের সম্বারের গন্ধ ভেসে আসার মতো, বাপ-ব্যাটার কলহ পরিচিত রুটিন।

সেই ভটচাজ বুড়ো জানলা দিয়ে মনে করাবে, গাছটার কী কল্লে, বটকেষ্ট?

দেখছি!

এদিকে যে ছাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। এ কী অন্যায়!

ভাবছি গাছটা কেটেই ফেলব।

কবে?

খুঁজছি। ... লোক চট্ করে পাচ্ছিনা যে।

সে তুমি যবে লোক পাও ... ডালপাতাগুলো ছাঁটার ব্যবস্থা করো?

অথচ, প্রতিবছর বটকৃষ্ণ বউকে দিয়ে সিজনে বার দুয়েক এক-প্লাস্টিক আম পাঠায়। বুড়োর বাছ বিচার আছে? বরংচ বুড়োর বউ দুগ্গার সঙ্গে আমের স্বাদ নিয়ে কথা বলে, অলস বিকেলে

কোনো কোনো দিন আবহাওয়া নিয়ে আলোচনায় যোগ দেয়, মশার উপদ্রব নিয়ে মন্তব্য রাখে, শরীরের খবর নেয়।

বটকৃষ্ণ ভটচাজ বুড়োকে কী ভাষায় বোঝাবে, গাছে ওঠার লোক ইদানীং মেলে না, খুঁজে পেলেও তিনশ টাকার কমে দু-একখানা ডাল-পাতা ছাঁটতেও অরাজি।

দরদামের আসরে বটকৃষ্ণ মুখ খুলছিল না, কী জানি আনাড়ির মতো অনেক কম বলে ফেলে যদি?

ওদের মূল গায়েন একটা মোড়ায় বসেছিল। ছোকড়া-সঙ্গীটা পেছনে দাঁড়িয়ে চতুর দৃষ্টিতে তালুতে খৈনি বানাচ্ছিল। ছোকড়ার বয়স কম, কথায় খৈ ফোটে।

শেষ কথা। চার। চার এর একটাকা বেশি না। দ্যাখেন এবার।

এ নিয়ে লোকটার সঙ্গেই ছোকড়াটার লেগে যায়। বটকেষ্টর সন্দেহ, বানানো ঝগড়া।

এই গাছ চার হইলে, মোট খরচা? লাভের গুড় পিপড়ার মুখে দেব? লোকটা বটকেষ্টকেই সাক্ষি মানে।

ছোকড়াটা জবাব দেয়, বইলে ফেলেছি যখন...যাক্ গে। ...ওঠেন...দিলে দেবে...এরপর কথা নাই।

কথা নাই। বেতাল কথা ছাড়া বোঝস না তোরা। ... লেবার আর টানার খরচা নিয়া কত পড়ল? হালার পুত।...গাছটায় প্যাকিং ছাড়া টিকের কাঠ কতটুকু?

ছোকরাটা খৈনিটুকু মুখে ঢুকিয়ে বটকেষ্টকে, জবান ইজ জবান।...আপনার নম্বরটা বলেন ...কাল সকালে জেনে নেব...রাতটায় ভাবেন...ওঠো কাকা। নিজের মোবাইলে পট্‌পট্ বটকেষ্টর নম্বরগুলো তুলে নিল।

কাকা ও চতুর ভাস্তে আসর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বটকৃষ্ণও বসে থাকে না। সময় নেই। সাইকেল নিয়ে 'মনসা জুয়েলারি'তে কাজে যায়। সব রকমের সংস্কার ঘোরে মনে মনে চার-য়ে রাজি। একটু যেন পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে। ভটচাজ বুড়ো পাতা-ডাল ছাঁটার ফের তাগাদা দিলে শুনিয়ে দেবে, হয়ে যাবে। অত ব্যস্ত হবেন না।

বুড়োর সঙ্গে আর কোনো পয়েন্ট নিয়ে তর্ক বাঁধাবে? ইচ্ছে করলেই এখন বটকেষ্ট পারে। কী প্রমাণ আমগাছটার জন্যই আপনার ছাদ ড্যামেজ হচ্ছে? বর্ষার আগে ছাদ পোষ্কার করতে পারেন না? ওঠার সিঁড়ি নেই আপনার, আমার দোষ? কাঠের একটা সিঁড়ি বানালেই পারতেন?

বটকেষ্ট সাইকেল নিয়ে বেরুতে গিয়ে একবার ত্যাড়চা চোখে সীমানায় লুক্ দিল। চুলচেরা বিচারে মানতে হবে সামান্য কয়েকটা ডালপাতা ঝুঁকে আছে বটে। তাও কার্নিশ বরাবরই বেশি। বছর দুয়েক আগে তিনশ টাকা কবুলে, বটকেষ্ট এক ছোঁড়াকে দিয়ে মোটা একটা ডাল কাটিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু গাছ তো একটা জীবন—আমাদের নখ-চুলের মতো ওদের সংসারেও ছাঁটতি-পড়তি-বাড়তি আছে। পাতা ঝরে, গজায়, মাঘের শেষে বোল আসে, বাতাসে গন্ধ ছড়ায়, ফি বছর চোত বোশেখে মস্ত মৌচাক ঝোলে। বটকেষ্ট মশালের ধোঁয়ায় কায়দায় মধু আয়ত্ত করতে পারে—করে না। হুলমাছি ভনভনিয়ে পাড়াপড়শির ঘরে ঢুকে কামড়াতে পারে। ঘিঞ্জি বসত হয়ে গেছে, অথচ মধুরও ভাগ পাবে না সবাই। তাই, মক্ষিরাই মধু সাবাড় করে মিলিয়ে

যায়। গাছের সংসারে নিভৃতে কত কিছুর আশ্রয়, কে খবর রাখে? পাখি, বাঁদর, পিঁপড়ে, গিরগিটি, কাঠবিড়ালি, মাকড়শা—এমন কি দু-একবার বৃষ্টির সিজনে থপ করে সাপ পড়ে ড্রেন ভেসে বেরিয়ে যায়। বটকেষ্ট মেদিনীপুরের ভুঁইএল, জানে ও সব বিষবওয়া সাপ নয়। তবু বুড়োর নজরে পড়লে কথা শোনাতে ছাড়ে না। তোমার চাকের ভয়ে পশ্চিমের জানলা খুলিনে—সাপ তো হ্যাঁদা পেলেও ঢুকবে। বদনাম কেটে ফেল গাছটা। শুনচ না।

সত্যিই, গতবারের ঝড়ে মোটা একটা ডাল বুড়োর রান্নাঘর ছুঁয়ে পড়েছিল। তার বেশিটাই বটকৃষ্ণর অংশে, পাতা আর সরু ডালপালায় জানলার পাল্লাটা খোলাবন্ধ করা যাচ্ছিল না। ভাগ্যিস রাতের বেলা, রান্নাঘরের জানলা বন্ধ। সাপ থাকলে সরাৎ করে ঢুকে পড়তে পারত। সে কি ঝড় রে বাবা। বাড়ি ফিরতেই দুগ্গা খবর দিতে, টর্চ হাতে বটকেষ্ট দেখে, বাব্বাঃ। বিপদের খাঁড়া কান ঘেষে বেরিয়ে গেছে। সকাল সকাল উঠে, একরাশ ঘুম চোখে, ভোঁতা দা-খানায় নিজেই জানলার পথটুকু পরিষ্কার করে দিয়েছিল। নইলে বুড়ো হয়তো সালিশ ডাকত।

সকালে ওঠার অভ্যেস নয় বটকেষ্টর। অনেক রাত অবধি তার ঘরে বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা। জোরে ট্রানজিস্টারে গান বাজে, দু চার জনের নানাবিধ আওয়াজ, মটোর সাইকেলের স্টার্ট বা থামার শব্দ। ভটচাজ বুড়োর ঘুম পাতলা। ভাবে, ডেকে বলবে—বটকেষ্ট সংসারে তোমরা চারজন মাত্তর—এত রাত অবধি হল্লোরের লোক জোটে কোত্থেকে? প্রথম প্রথম, নতুন অবস্থায়, ঠারে ঠোরে বলেওছিল। উত্তর এসেছিল, দোকান বন্ধ করে ফিরতেই বারোটা। ... কোনো দিন সঙ্গে বন্ধু চলে আসে ... কোনো দিন দুগ্গার মেজদা ... এক সঙ্গে কাজ করি তো। ভটচাজ বুড়ো চেপে যায়। বউটার বাপের বাড়ি পেছনের পাড়াটায়। জমানা বদলাতে, বুড়ো একবার গুটিগুটি থানায় যেতে, গোঁজেল গোছের মুখ নিয়ে একজন বলেছিল, লিখে কমপ্লেন দিন...তুলে আনব আমরা ...পড়ে সামলাতে পারবেন তো?

ভটচাজ এগোয়নি। উত্তরের বাড়িটার—এখন প্রমোটারকে দিয়েছে—চক্রবর্তী চোখ মটকে বলে, আমি আপনি এ বাজারে বাড়িটা কিনতে পারতাম? ভালোই আছে মশাই।

আঙুলের ডগা ঘষে মাল্লু-কড়ির ইঙ্গিত।

ভটচাজ হেয় ভঙ্গিতে, স্রেফ স্যাঁকরাগিরি করে?

গূঢ় রহস্যে চক্রবর্তী, স্রেফ বলছেন কেন? ঘরে এসে শুধু লুঙ্গিটা ঝারবে। ধুলো ঝাঁটালেই পয়সা।

ওটা চক্রবর্তীর যে কথার কথা—ভটচাজ বুড়ো আন্দাজ করে। তবু যেন তথ্যটা পাঁপড়ি ছড়িয়ে তার চিন্তায় গেঁথেছিল দীর্ঘদিন—যতদিন না একটি ঘটনায় বুড়োর মন করুণায় স্যাঁতস্যাঁত করেছিল।

ভটচাজ কাত্তিক-অঘ্রাণের রাতে খাওয়ার পর বাইরে কুলকুচি করতে গিয়ে দেখত, ঘুটঘুটে অন্ধকারে আদার-আবর্জনায় ছোট্ট যে পাতি টগরের ঝাড়টা—হাজার হাজার জোনাকী ছেঁকে আছে। অলৌকিক অন্ধকারে ঝিন্ ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিনিক। আহাঃ। চোখ জুড়ানো নকশা। দেখেই বুড়োর কল্পনার জগত, বটকেষ্টর কাজ সেরে ঘরে ঢোকা, লুঙ্গি জুড়ে অণু-পরমাণুর মতো কুঁচির

দীপ্তি। অসংখ্য ঝিন্ ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিনিক্। দরজা ঠেসে দিয়ে ব্যাটা ঝারছে লুডি, ফিসফিসিয়ে বউকে বলছে, দুগ্গা, ঝাঁট দে।

অথচ দিনের আলোয় টগরের ঝাড়টার মতো, বটকেষ্টকেও স্বাভাবিক মামুলি ঠেকে বুড়োর।

বটকেষ্ট। ও বটকেষ্ট।

জানলা খুলে বটকৃষ্ণ দেখল ভটচাজ বুড়োর মুখ।

পাকাপাকি দর দিলে কিছু?

বটকৃষ্ণ অবাক। এতক্ষণ বুড়ো আড়ি পেতে সব শুনছিল।

কেঠো গলায় জবাব দিল, বল্লাম তো মাসখানেক দেখুন। বসে তো নেই আমি।

বসে কি কেউ থাকে। যা ঝড়-বাদলার দিন আসছে ... কিছু ঘটলে? তখন তো আদালতে গিয়ে তোমার ফাঁসির আর্জি চাইতে পারব না?

বটকেষ্ট কিছু কটু কথা বিড়বিড় করল। সোজা শুনিয়ে দিয়ে লম্বা ঝাল ঝাড়তে চাইল না। চার পাশের প্রতিবেশীরা পুরনো। তাদের যেন ঘুরিয়ে হুকুমে কথা বলার হক জন্মে গেছে। এই তো বছর চারেক আগে, কালীপুজোয় বাজি পোড়ানো নিয়ে রোগা দুর্বল ছেলেটার হয়ে দক্ষিণের বাড়িটার সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি অবস্থা। দলবল নিয়ে তেড়ে মারতে এসেছিল বটকেষ্টকে। অথচ ও-বাড়ির ছাদ থেকেই উড়ন্ত তুবড়িতে রুগ্ন ছেলেটার চুল পুড়ে, মাথা ফুটে আলু। অমিত। কত দিন পর বটকেষ্টর স্মৃতিতে আজ ভেসে উঠল সন্তানের নামটা।

সে ছায়া হয়ে গেছে। রাত্রি-অন্ধকারের। সে-রাতটা অথচ সকল পড়শিদের দরজাতেই ছিল স্থির নীলরাত্রি। আকাশের নক্ষত্রগুলো অবধি।

সেদিন মধ্যরাত্তিরে সংসারের সকল পরিচিত শব্দকে থামিয়ে দিয়ে, একটা গাড়ি ঢুকে বটকেষ্টর দরজার সামনে থমকে গেছল। কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সাদা একখন্ড কাপড়ে মুখ ঢাকা অমিত। বটর একমাত্র রোগা ছেলেটা। তখন আর বটর নেই। দাঁড়িয়ে থাকা স্তব্ধ পড়শিদের চোখে জল আর বুকে অজানা অস্থিরতা।

টানা দেড়মাস বটকেষ্ট এবং দুগ্গা—কখনো বট এবং রাত্রির সাথীরা—কখনো পাশের পাড়ায় দুগ্গার ভাইরা হাসপাতালে ছুটেছে। অজানা জ্বর আর কমে না ছেলেটার। রোজই ফিরত পরের দিনের আশাটুকু জাগিয়ে আর রোজই প্রতিবেশীরা খবর শোনে সকালে কমেছিল তো বিকেলে জ্বর ধিকি ধিকি হাজির। টাইফয়েড? কর্তৃপক্ষ তা বলছেনা। তবে কি কালাজ্বর? কী জানি, ডাক্তারের নিদেন অজানা জ্বর। ঐ টুকুতো শরীর—হাড় জিরজিরে দুষ্টু দুষ্টু হাত পা—লড়ল দেড়মাস।

বটকেষ্টকে সেদিন কাঁদতে দেখেনি পড়শিরা। নিষ্কম্প কালো একটা শিখা হয়ে গেছে। কাঁচ গাড়ির কর্তব্য সারছিল নীরবে। সাজিয়ে গুছিয়ে রওনা দিতে হবে। ও-বাড়িটার সারা পরিবেশে এমন খটখটে কান্নাহীন শুকনো বাতাস, প্রতিবেশীরা নিজেদের চোখের জল ধরে রাখতে পারছিল না। ভটচাজ বুড়ো তো ফ্যাৎ করে চোখের জল লুকোতে নাক ঝাড়ল। সামান্য কারণে একবার সে অমিতকে গেট্ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

চোর। তুই একটা চোর। এ-বাড়িতে ঢুকবি না কোনোদিন।

দুন্না বলেছিল, না মেশোমশাই, ও আপনার গাছে ওঠে নি।

ওঠে নি? পোয়ারা দুটো এমনি এমনি হাওয়া হল? না, না বৌমা, ওর চুরির দোষ আছে।

ছোকড়াটা বেশি কথা বলত না। চোখ দিয়ে শুনত শুধু। বুড়ো জানে, ছেলেটার ধান্দা হচ্ছে, কখন কোনটা হাতাবে।

সেই-রাতে সাদা কাপড়ে ঢাকা মুখ, শুধু কয়েকগাছা চুল দেখতে পেয়ে বুড়োর ছানিচোখ ভিজেছিল।

গাড়িটার ইঞ্জিনে স্টার্টের আওয়াজ উঠতেই দুন্নাকে দেখা গেল ছিটকে সামনে লাফিয়ে রাস্তায় মাথা ঠুকতে—ছায়া হয়ে থাকা উধাও সন্তানটার নাম ধরে বুক ফাটাতে—এবং নীল রাত্তিরে তার একটাই কণ্ঠ আকাশ অবধি ঠেলে তুলে—যেতে দেব না।

তখনও বটকৃষ্ণ স্থিরবৎ ছায়া। দুন্নার ড্যানাজোড়া টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। গাড়ির শব্দ দূরে চলে গেলে, প্রতিবেশীদের যার যার আলো নিভে গিয়ে, ফের যথারীতি কুকুর, মাতাল, ডাকাত—পাইপগান আর পুলিশী টহলদারির রাত্তিরে পরিণত হয়ে গেল।

সেই রাতটুকু ছাড়া পড়শি মেয়ে-বউরা দুন্নাকে আর কাঁদতে দেখেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে পথটার দিকে তাকিয়ে থাকত, দুপুর রোদে কখনো কখনো রাস্তায় একটা ম্যাক্সি পরে হাঁটত। গন্তব্য ও উদ্দেশ্য টের পাওয়া যেত না। জংলা পাতা ছিঁড়ে টিপে টিপে নাকের সামনে ধরত। কখনো এমন ভঙ্গিতে চোখের ওপর হাতের ছাউনি রেখে তাকাত—দূরটা যেন বহুদূরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ফের সংসার, খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্না এবং দরজায় থাকতে থাকতে—একদিন তারিখের হিসেব জমাল। কথায় কথায় দশ বছরের মেয়েটাকে বিলাপ করত—ওর বদলে তুই মলি না ক্যানে?

মেয়েটার জ্ঞান হয়েছে, বোবো মায়ের মন্তব্যে উত্তর দিতে নেই।

ক্যালেন্ডার ভারি মজার। একমাত্র নিজেই জানে, ঠিক ঠিক কবে শেষ হলেই পাতাটা বদলে দিতে হবে।

বটকেষ্টর বারান্দায় যেদিন গাছটার দরদাম—সেই-ক্যালেন্ডারের বহু পাতা ছুটন্ত রেলপথের পাশে বাড়িঘরের মতো পিছিয়ে গেছে।

দুন্না এখন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসে। কাঁখে একটি কালো গদলা সন্তান—কপালে তার জোড়া কাজলের টিপ, বালগোপালের মতো মাথায় চুলের চুড়ো। বীজের আকাঙ্ক্ষা, জোড়া প্রদীপের মধ্যে ধারণ এবং অঙ্কুর গজানোর মধ্যে—মোটা আমগাছটার আশ্রয়ে দু দুবার মস্ত চাক বেঁধে —মৌমাছিরা উড়ে গেছে। কেবল বাড়ির কার্নিশে পুরনো দুপাটি ছেঁড়া জুতো আর ক্ষয়াটে একটা খ্যাংড়া ঝোলে গোপনে। নতুন যোগ হয়েছে এটা।

(২)

পরদিন ছোকড়াটার কোনো ফোন এল না। চতুর ছেলেটা পট্‌পট্‌ নম্বর নিয়ে যে বলেছিল খোঁজ নেবে দামের ব্যাপারে—কোথায়? দুদিন গত হলে, বটকেষ্টর ভেতরটা খুঁতখুঁত করে। খোঁজ নেবে

একবার? কিন্তু রাত্তিরে যার শরীরের গোপন স্থান ও লুঙি নাড়ালে স্বর্ণরেণু ঝিনঝিনিক্ ঝিনঝিনিক করে, দুম্নাকে ফিসফিসায়, ঝ্যাঁটিয়ে নে সাবধানে—বোঝে দরদামে উজিয়ে কৌতূহল দেখালে উল্টো বিপত্তি। ভাববে ঠেকে গেছে। আবার বুড়োর তাগাদার জন্য উটকো অস্বস্তি। এই বুঝি জানলা খুলে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, বট আছ? কী কল্লে গাছটার?

ইতিমধ্যেই পাড়ায় বেছে-বেছে বুড়ো প্রপাগান্ডা চালিয়েছে, গাছটার জন্য ছাদটার সব্বনাশ। জমানা পেয়েছে, ইচ্ছে করে করছে। ভেতরে ভেতরে কেমন খচ্চর বুঝুন। বুড়ো জানে পাড়ার অনেকেই ভোল পাল্টেছে ইতিমধ্যে। বটকেষ্টও বদলা নয়, বদল চাইবার পক্ষে।

ছোকড়াটার ডুব মারার ব্যাপারে, বটকেষ্ট ভাবে সরাসরি কোনো করাতকলে গেলে হয়। মাঝপথে কোনো দালাল থাকবে না। কিন্তু দোকানে ঢুকলে সব যায় গুলিয়ে। উজ্জ্বল ধাতুটির নানা জটিল শর্তে, মালিকের রোজ রোজ নানা প্যাঁচপয়জার আর ঘরে আসরের আওতায়, আর করাতের দাঁত সকল, চিরবার শব্দ, কাঠের গুঁড়োর গন্ধ, তক্তা-গুঁড়ির কোনো পরিকল্পনাই মনে ভাসে না। বটকেষ্ট বোঝে দালালের ধার্য দাম খুবই মামুলি।

কিন্তু বটকেষ্টর দুর্বলতা—ফোন বাজবে। চার-য়ে সেদিন রাজি হয়ে, আগাম কিছু টাকা রাখলেই হয়ে যেত। শ্যালক তুলসী অবশ্য বলেছে, ও-শালা ঠিক হাজির হবে।...চেপে বসে থাকো।

তা পারি। কিন্তু বুড়োটাকে দেখলেই এখন পিত্তি জ্বলে। বটকেষ্ট বলে।

তুলসী ভটচাজ বুড়োর উদ্দেশে, কিসের পিত্তি জ্বলে তোমার? ওদের জমানা শেষ।... আর ফিরতে হবে না...ওদের কেয়ার কী জন্য?...ভোটের দিন ছেলেটাকে কেমন ক্যালানো হয়েছিল? জানে শেষ করে দিত।...ওদের এখন ভয় করবে কেন?

বটকেষ্ট স্বভাবে নিরীহ গোছের। জীবনে একবারই—উড়ন্ত তুবড়ির কেস্‌টায় অগ্নিমূর্তি হয়েছিল। নইলে মানুষটা এত আস্তে কথা বলে—দু হাত দূর থেকে শোনা অসাধ্য। হাঁচুরে-পাঁচুরে স্বভাব হলে সোনার দোকানে কাজ চলে না।

চারদিনের মাথায় সকাল বেলা মোটর সাইকেলটা বিশ্রী শব্দ নিয়ে থামল। দুম্না ঘরের ঘুম ভাঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে পুরনো ছেলেটা। সঙ্গে আজ মাঝবয়সী লোকটা নেই। বদলে, লাল লুঙি-ফতুয়ার তান্ত্রিকের চেহারায় মোটামতো একজন। চোখমুখটা গেঁজেল ধরণের।

ছেলেটা ঢুকেই বলে, বাবা। গাছটা দেখবে।

দেখে গেলে তো সে-দিন? বটকেষ্টর ধাক্কা লাগে।

ও ছিল কাটবার লোক।...কারবারটা বাবার।

লোকটা ইতিমধ্যে বটকেষ্টকে আগাগোড়া মেপে নিয়ে, আস্তে পা ফেলে ফেলে, পাকা খেলোয়াড়ের মতো পেছন ঘুরে গাছটার কাছে চলে গেল।

বারান্দায় বটকেষ্ট ছেলেটাকে ঢপ দিয়ে বলে, দু-দুজন খদ্দের ফের দেখে গেছে। বললে পরদিনই খবর নেবে...।

কত দর দিল তারা? ছেলেটা চটপট প্রশ্ন করল।

সাড়ে পাঁচ।

বয়না নিয়েছেন?

তোমার জন্য পারিনি। ...

ইতিমধ্যে লোকটা তেমনই নিঃশব্দে ফিরে এলে বটকেষ্ট সবুজ প্ল্যাস্টিকের চেয়ারটা সামনে ঠেলে দেয়। এমন ভঙ্গিতে পাছা ঠেকাল সে, যেন এ-সব পলকা আসনে বসার অভ্যেস নেই।

বটকেষ্টর উদ্দেশে বিচারকের নিদান দিল, ন্যায্য দামের বেশিই দিয়েছে।

এত মোটা গাছ? কী বলেন?

লোকটা যেন জবাবগুলো ছুঁড়ে মারে। ছেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে, আস্ত গাধা তুই। জানিস কী? আমি হলে খুঁতো গাছ...তিনের বেশি উঠতাম না।

খুঁতো মানে? বটকেষ্ট সামান্য চমকায়।

কত বছর আছেন?

কেন?

আপনার বোঝার ব্যাপার না।...গলায় দড়ির গাছ...খোঁজ নেন, এ গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল।

আর বসে থাকতে চাইল না লোকটা। আয়! ছেলের উদ্দেশে, গেট খুলে মটর সাইকেলটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটা তখন বটকেষ্টকে, আমার খেসারত।...জবান দিয়ে ফিলেছি।...যাক্ যাক্। ...কাল সকালেই লেগে পড়ি, কেমন?

বটকেষ্ট শুনছিল না কিছু। কয়েক বছর আগের একটা রাত্তিরে কালো শিখা হবার স্মৃতিতে ঘুরপাক খেতে থাকল। অজানা স্বর, অতীতের গাছটা অজানা, ছেলেটা কোনো ঢপ দিল কিনা —অজানা। কে যেন সংস্কারের মধ্যে নাড়া দিতে অজানা সত্তাগুলো ঝরতে থাকল।

বলেন কিছু?

বটকেষ্ট উত্তর দিল, কাল মঙ্গলবার।

বেশ। শনি-মঙ্গলে গাছ ধরিনা আমরাও।..বুধবার সকালে।

বটকৃষ্ণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো, সম্মতির মাথা কাৎ করল এমন ভাবে—ভটচাজ বুড়ো বৃথাই ভাবে, ঘরে ঢুকে লুঙ্গি আর গোপন শরীরের উজ্জ্বল কণিকাগুলোর ঝিন্ ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিনিব্ মেঝেতে পড়ে জোনাকির ঝাঁক হয়ে মানিব্যাগে ঢুকে পড়ে নিত্য।

আসলে বুড়োর দাপানো-তড়পানোর জমানাটা বদলে গেছে তো। তাই ফিকির ফন্দিতে পাল্টা মঞ্চের পর্দাটা নাবিয়ে দিতে চায়। বুড়ো গোপনে আক্ষেপ করে পাড়াটা নাকি এমন ছিল না; নতুন নতুন গেরস্তরা এসে—আর ফ্ল্যাটবাড়ির কথাই নেই—সব কিছুর প্রথা অনিশ্চিত করে তুলেছে। এমন কি পুজোর তিনদিনও ক'বছর মন্ডপে সময় কাটাতে পারে না।

এতদিন ঠিক ঠিক দরদাম, দালালি, ঠকা-জেতা নিয়ে যতটা সচেতন ছিল বটকেষ্ট, বুধবার সকালেই একটা ভ্যানো, ম্যাটাডোর, কাঠের ভ্যান, তিনখানা কুড়ুল, শাবল, লম্বা একটা কাছি দড়ি ও ডবল করাত গেট দিয়ে ঢুকতে বাকি ঘুমটুকুর জন্য কপালটা ধরে রইল। খোঁয়াড়ি কেন পুরো কাটছে না। টক ঢেকুর।

গাছটা বিদায় হলে স্বস্তি। নানাবিধ সংস্কারের মন খারাপে অস্থির লাগে। যদি কোনো ঝড়ে উল্টে ভটচাজ বুড়োর দালানে বা নিজের রান্নাঘরটার অংশে পড়ত—হুড়মুড় ভেঙে পড়া, চাঙর, মস্ত ফাটল—দুটো বাড়িরই সব্বনাশ। কোনো প্রাণের ক্ষতি হলে হাতকড়া, শ্রীঘর। কি বিশ্রী বিপদ এতদিন শিয়রে শমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মঙ্গলবারই বটকেষ্ট আশপাশের দু-চারজন ছেলে ছোকড়ার কাছে খোঁজ নিয়েছে। দুর্গাকে বলেছে ব্যাপারটা। শুনেই দুর্গা এক ঝমক পুরনো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

ভটচাজবুড়োর বউটি দুর্গাকে বলেছে, আমরা তো বছর তিরিশ আছি।...শুনিনি তো?

চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে বলা হল জানিনা। দু যুগ হল, শুনিনি এসব।

তার ওপাশের ঘোষ গিন্নি দুর্গাকে বলে, যখন কিনেছিলে, তারা বলেনি কিছু?

জানলে কি আর বলে মাসিমা। হয়তো এ-জন্যই বেচে চলে গেছে।

শুনেছিলাম তো সুতো কলটা উঠে যেতে বাড়িঘর বেচে আসাম গেছে।...বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ও-দেশে। শুধু শরৎ সেন—প্রায় ষাট বছর এখানে—বটকেষ্টকে বলেছিল, সে তো আপনাদের তিনটে বাড়ি পেছনে...এখন পোদ্দার বাবুরা কিনেছে যে বাড়িটা...আম গাছ ছিল...বউটা দজ্জাল, স্বামীটা নিরীহ...একবার শীত কালে ঝুলে পড়ল...ভোর রাতে ছেলেপুলেদের চিৎকার... লোকজন কম তখন...আমরা ছুটে গেলুম...পরে সে-গাছ কেটে-টেটে...পোদ্দার বাবুর আগেও একপার্টি কিনেছিল...মনে পড়ছে।

(৩)

ভটচাজ বুড়ো আজ ভোর থেকেই ঘনঘন ছাদে উঠছে। একতলার ছাদটায়। দোতলার ছাতটা অংশত নাকি ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঝরাপাতার জন্য। ঝমঝমিয়ে বর্ষা হলেও নল দিয়ে টিপিস্ টিপিস্ জল পড়ে। নালা হয়ে নামতে পারে না। শ্যাওলা, পাতা, চুঁইয়ে লোহার রডগুলোকে সংগোপনে দুর্বল ও দুর্গম জং ধরানো—তারপর একদিন ঝপাস্ ধসে পড়া।

বটকেষ্ট লক্ষ্য করে নিপুন দক্ষতায় জনা চারেক লোক অস্ত্র সাজিয়ে রাখছে। কুড়ুল, দা, করাত...ইত্যাদি। কত পুরনো যুগের অস্ত্র এ-সব—আজও বাতিল হয়নি। মানুষের হাতে অস্ত্র কত পুরনো? বটকেষ্টর বিদ্যাবুদ্ধিতে হিসেব করতে কুলোয় না।

ভাগ্যিস মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন এবং পাঁচিলটা দুই সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে—নইলে নিত্য ঝামেলা বাধত। বুড়ো হয়তো লাগোয়া প্রটটি বেহাতের বখেরা আজও পুষে রেখেছে।

বুড়ো জিজ্ঞেস করে, বটকেষ্ট। শুরুতেই এ-দিকের ডালটা ছাঁটলে হত না? গাছটা সকালেই বিক্রি হয়েছে, পুরো পেমেন্ট নিয়েই অস্ত্রের কাজ শুরু। তাই বটকৃষ্ণ নয়, লোকটা বলল, দেখা যাবে তা। বটকৃষ্ণ নিশ্চুপ।

সে এখন কিছুটা নিশ্চিত। কিন্তু একটা অজ্ঞাত সংস্কার বিমূঢ় করে রেখেছে। গাছটাকে মনে হচ্ছে জটাজুটধারী কোনো রহস্যপুরুষ। অনেকগুলো হাত ছড়িয়ে রেখেছে। চুল ঝাঁকড়া। গায়ে শক্ত ও কর্কশ বাকল জড়ানো।

দু-দুটো মানুষ মোটা দড়িটা বেঁধে টান দিয়ে রেখেছে। গামছার টংয়ে নেংটির মতো খাটো বারমুডা পরা একজন। দু-চারটে দক্ষ কুড়ুলের আওয়াজ। টানের কৌশলে দেখতে দেখতে ওপাশের কার্নিশ ঘেঁষে মস্ত ডালটা কাৎ হয়ে ঝুলন্ত। তারপর মাপ মতো অভিকর্ষের টানে দেয়ালের ঠিক এ পাশে মোটা ডালটা কার্নিশের স্যাঁদলায় শুধু আঁচড় কেটে বটকেষ্টর মাটিতে নেমে এল। এরই ঝরা পাতারা ও-ছাদে পড়ত। ফের পাতা গজাতো।

কয়েকটা ভাঙা পাখির বাসার চিহ্ন। প্রশাখায় পাখির পায়ের ছাপ। কাঠ পিঁপড়ে, পোকা ও মাকড়শাদের নিশ্চিত সাম্রাজ্য যে সদ্য ভেঙে গেছে—ওরা এখনও জাত নয়। পাতার ঝাড়ে ছেলেপুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল।

একটা ছোট্ট গিরিগিটি বিপদের গন্ধ হয়ে পাতার আড়াল থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। পোকা খাওয়া আর নিরাপদ মনে করছে না।

পাতলা ধারালো দা হাতে, উবু হয়ে যে লোকটা বিড়ি টানছিল, খেলাচ্ছলে বলল, হালার গিরগিট্টা। পালাও কোথায়?

কুচুৎ করে দুটি খন্ড করে দিতে, দু অংশ থিড়িবিড়ি কাঁপতে থাকে। রক্তটুকু ঘাসে মুছে নিয়ে লোকটা ডালপাতা ছাটবার জন্য উঠে পড়ে।

পাতা, পাতা আর পাতার স্তূপ। দেখতে দেখতে বটকেষ্টর পেছনের জমিটুকু সবুজ মেঘে ফুপিয়ে ওঠে। মোটা মোটা ডাল করাতে খন্ড হয়। পুরু বাকলের ভেতর অংশ বেয়ে আঠা। ধীরে ধীরে গড়ায়। খুবই দাহ্য বস্তু। বটকেষ্ট দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল। ঐ আঠাতেই দপ করে আগুনের লেলিহান শিখায় ছায়া-অমিত ডুবে গেছল।

দুপুরে ঝিনঝিনিক, ঝিনঝিনিকের গোপনীয়তায় ঢাকা লুঙ্গিটা পরে বটকেষ্ট খেতে এল। খাওয়া, একটু বিশ্রাম। ফাঁকে কাটাকুটির আসরে হাজির হতে অবাক হয়—বুড়োর কার্নিশে পর্যাপ্ত আলো। সীমানায় শুধু রহস্যপুরুষের মোটা ঠুঁটো গুড়িটা। মাথায় দড়ি বাঁধা। হিসেব করে ঠেলে ফেলতে হবে। সামান্য ভুল হলেই বিপর্যয়, দক্ষযজ্ঞ। দুটো লোক উবু হয়ে বসে ডবল করাতটা চালাচ্ছে।

সা-ব-ধা-ন। উপদেশে লোক দুটো বটকে বলে, কথা কবেন না।

জানলায় মুখ ঠেলে ভটচাজ বুড়ো ফুট কাটে, ভাই বিপদ ঘটলে কি তোমরা থাকবে?

ঘরে ঢোকেন তো। বিড়িফোঁকা লোকটা মিলিটারি মেজাজে হুকুম ছুঁড়ল। ভটচাজ বুড়ো চাপা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সকাল থেকেই এদের তাচ্ছিল্য সইতে সইতে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। ঘরে গিয়ে মোটা গলায় চ্যাঁচায়, তোদের মর্জিতে? ভেবেছিস কী?

কোনো প্রত্যুত্তর নেই এ পক্ষের। নীরবে করাত চলবার গুঞ্জন। কাঠের গুঁড়ো সৃষ্টি। বাড়ির ভিতর তখন বুড়ো-বুড়ির মধ্যে ধমকি-ধামকি শুরু হয়ে গেছে। চাপা হিংস্র হুঙ্কার—না, কিচু বলবে না শালাদের। পুজো করবে?

দুপুরের খাবার খেতে খেতেই টেবিলটা কেঁপে উঠল। গুঁড়ি ভূপতিত। বটকেষ্ট কৌতূহলে একবার উঠে গিয়ে দেখে আসে—সব নিখুঁত ও ঠিকঠাক। পরিকল্পনা মতোই আলিসান গুঁড়িটা উল্টে পড়েছে। ভাবনা থেকে বটকেষ্টর জটিল বোঝা নেমে গেল।

তারপর অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে দেখতে দেখতে বৃহৎটিকে খণ্ড খণ্ড করে গাড়িগুলোর পাটাতনে বোঝাই হল। স্তূপাকৃত হতেই ইঞ্জিন স্টার্টের শব্দ।

অনেক রাতে ফিরল বটকেষ্ট। শ্যালকদের বন্ধুবান্ধবদের আবদার রাখতে হবে আজ রাতে। দুরি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। উনুনে হ্যাঁক ছোঁক পাপড় ভাজছে। যাক্, সীমানার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি। হোক না বদল জমানা—বটকৃষ্ণ বুনো ওলে বাঘা তেঁতুল স্বভাবের নয়।

পরদিন সকালে উঠে দেখে, প্রতিদিনের অভ্যাসগত জটাজুটধারী রহস্য পুরুষটি নেই। কাল প্রত্যক্ষ হয়নি, আজ দেখতে পেল গুঁড়িটা পড়বার সময়ে ঘষা খেয়ে পাঁচিলে সামান্য ফাটল দেখা যাচ্ছে। আর পাঁচিল থেকে ভটচাজ বুড়োর কার্নিশদেয়া ছাদটা এখন দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফাটলটায় চোখ ফেলতেই দেখে দুখণ্ড মরা গিরগিটি দুদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে। পিঁপড়ে ধরা, বাসি খণ্ড দুটি যেন দুই প্রতিবেশীর অবশিষ্ট ভাগের সম্পত্তি।

বটকৃষ্ণর ভাবনায় আসে না, ঘাসে মুছেরাখা রক্তটুকুও ভাগ হয়ে দুই গেরস্থের হৃদপিণ্ডে পাকাপাকি লেপটে গেছে।

দুটো পাতা তুলে নিয়ে, বটকেষ্ট শুধু পাঁচিলটা সাফ করে ঘরে চলে এল।

ফার্স্ট নেচার অফ ম্যান

ভগীরথ মিশ্র

হ্যাবিট ইজ দ্য সেকেন্ড নেচার অফ ম্যান। আমরা সব্বাই জানি তা।

বলেই ভক্তদের দিকে অপাঙ্গে তাকান সন্দীপনদা। ঠোঁটের ও চোখের কোণে একসঙ্গে সামান্য হাসির ঝিলিক, জ্বলেই নিভে যায়। প্রশস্ত ললাটের তাবৎ বলিরেখায় সুললিত ঢেউ তুলে বলেন, বল তো, ফার্স্ট-নেচারটা কী?

সন্দীপনদার প্রশ্নটা শোনামাত্র হকচকিয়ে যায় মনোজিৎ। এমন উদ্ভট প্রশ্ন তো কস্মিনকালেও ঘাই মারেনি ওর মনে, কিনা, হ্যাবিট যদি মানুষের সেকেন্ড নেচার হয়, তবে ফার্স্ট নেচারটা কী? বাস্তবিক, মনোজিৎকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, এমনতরো সৃষ্টিছাড়া প্রশ্নমালা ও তাদের সৃষ্টিছাড়া জবাবগুলো বুঝি কেবলমাত্র সন্দীপনদার মগজেই খেলে। কারণ, মনোজিতের মতে, ওঁর মগজটা ওই কারণেই তৈরি।

কিছু কিছু মানুষ রয়েছেন, প্রথম দর্শনেই তাঁদের সম্পর্কে এক ধরনের সম্ভ্রম তৈরি হয় অন্যদের মনে। তাঁদের মধ্যে এক ধরনের চৌম্বকত্ব থাকে। মাথার পেছনে এক জাতের অদৃশ্য জ্যোতির্বলয়, যা তাঁর মুখমণ্ডলের উদ্ভাসটিকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যকে সদাসর্বদা ওঁর দিকে আকর্ষণ করে। সন্দীপনদাও সেই দলে পড়েন। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় মানুষটি এই ষাট ছুঁই-ছুঁই বয়সেও অসম্ভব রকমের ঋজু। চোখের মণিজোড়ায় অস্বাভাবিক দ্যুতি, আর প্রশস্ত ললাট জুড়ে সারবন্দি বলিরেখাগুলি তাঁর প্রাজ্ঞ ভাবটিকে আরও গভীরতা দিয়েছে। কথা বলেন মেপে মেপে। শোনেন বেশি, বলেন কম। আর, যখন কিছু বলেন; শব্দে, বাক্যে, উপমায়, অলংকারে, এমনই ঋদ্ধ হয়ে ওঠে সেই বক্তব্য, শানিত যুক্তিজালে এমনই অকাট্য হয়ে ওঠে, চারপাশের সবাইকে একেবারে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয়। ওই মুহূর্তে শ্রবণেন্দ্রিয়ের একাগ্রতাকে ষোলোআনার জায়গায় আঠারো আনা করতে হয়, কারণ, সন্দীপনদার শ্রোতারা বিশ্বাস করে, সন্দীপনদা বক্তব্য রাখবার বেলায় কেউ সামান্যতম অসতর্ক হলে মণি-মাণিক্যতুল্য একটি কি দুটি মহার্ঘ শব্দ কিংবা উপমা কানের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে শ্রোতাকে একেবারে নিঃস্ব করে দেবে। এমনকি, সাধারণ খোসগল্পের সময়ও সুনির্বাচিত শব্দ চয়ন করে করে সন্দীপনদা তিলতিল গড়ে তোলেন এক-একটি বাক্যের শরীর। আর, যে-কোনও বিষয়কে এমন ক্ষুরধার যুক্তি সহকারে সাজান, ঘোর অবিশ্বাসীও ওই মুহূর্তে একেবারে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সব বিষয়েই ভালো পড়াশোনা রয়েছে সন্দীপনদার। কিন্তু পঠিত বিষয়গুলিকে নিয়ে এতটাই ভাবেন, এতটাই পরিপাক করেন, জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপ্তি দিতে তিনি এতটাই দক্ষ ও সক্ষম যে যখন ওই নিয়ে কিছু বলেন বা লেখেন, শ্রোতা-পাঠকের এমনটা মনে হতে বাধ্য যে, ওইসব বিষয়ে অগাধ ব্যুৎপত্তি না থাকলে এমনটি বলা কিংবা লেখা যায় না।

কাজেই, অন্য কেউ প্রশ্নটা করলে গোটা আড্ডা হাত নেড়ে মাছি উড়িয়ে দিত, কিনা, ফার্স্ট নেচার আবার কী? ওটা একটা কথার কথা। একটা ইডিয়ম্যাটিক ইউজ, কিনা, হ্যাবিট ইজ দ্য সেকেন্ড নেচার অফ ম্যান। তার মানে, একটা ফার্স্ট নেচার থাকতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি

কেউ দেয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা যেহেতু সন্দীপনদার মুখনিঃসৃত, আড্ডার কারোর ক্ষমতা নেই যে, প্রশ্নটাকে তিলমাত্র হালকাভাবে নেয়, কিংবা আন্ডার-এস্টিমেট করে। কাজেই, জীবনের একেবারে মহার্ঘ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রখানে ভাবনায় ডুবে যায় সবাই। একটা জুতসই জবাবের জন্য মগজের এ-পাড়া ও-পাড়া প্রবল খোঁজখুঁজি জুড়ে দেয়। এমনকি, সুকোমল, অর্দ্ধেন্দুও, যারা কিনা সারা জীবনেও কোনও ভারী বিষয় নিয়ে এতাবৎকাল এক সেকেন্ডও মাথা ঘামায়নি, আড্ডার কেউ ওই নিয়ে মৃদু অনুযোগ করলে তার জবাবে বলে উঠেছে, ভেবে ভেবে ভেবে দেখলাম, ভেবে কোনও লাভ নেই, কেন কী, ভাবতে ভাবতে আমি ভাবুকদাস হয়ে গেলে বেচারা বউটার কী হবে? কাজেই, এই দুনিয়ার অধিক ভাবনা ভেবে ভেবে কাহিল হওয়ার চেয়ে বেশি বেশি ঝাল-মসলা দিয়ে দুটো বেশি ফুচকা খাওয়া ঢের ভালো, তাতে করে বুকের কফ-শ্লেষ্মা সাফ হয়।

কিন্তু উপস্থিত, সন্দীপনদার প্রশ্নটা শুনে তারাও গভীর ভাবনায় ডুবে যাবার ভান করে।

আজ 'সব্যসাচী' পত্রিকার কার্যালয়ে সন্দীপনদাকে ঘিরে একেবারে চাঁদের হাট বসে গিয়েছে। ফি-শনিবার জমায়েতটা বেশি হয় বটে, কিন্তু আজ যেন একেবারে ভরা-কোটাল। মনোজিৎ আন্দাজ করে নেয়, 'সব্যসাচী'র বর্তমান সংখ্যাটাকে ঘিরেই আজ এমন উদ্দীপনাময় জমায়েত। এমনকি, সুখময়, চন্দন, রাজীবের মতো অনিয়মিতরাও এসেছে আজ।

মনোজিৎ অবশ্য আগেই বলে দিয়েছিল, 'সব্যসাচী'র এই সংখ্যাটা প্রবল আলোড়ন তুলবে। কেন কী, এই সংখ্যায় বহুদিন বাদে প্রবন্ধ লিখেছেন সন্দীপনদা। আর, এমনই প্রবন্ধটার বিষয়, সন্দীপনদার কলমের গুণে এমন মার-মার কাট-কাট হয়েছে, 'সব্যসাচী'র পাঠক-সমাজ একেবারে মুগ্ধ, আপ্লুত হয়ে উঠবেই। বিষয়টা হল, বহুরূপী শোষণ : যুগেযুগে।

সন্দীপনদা 'সব্যসাচী' পত্রিকার কেবল প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকই নন, ওই নামে তিলতিল একটি প্রকাশনাও গড়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে না-হোক পনেরোটা বই বেরিয়ে গিয়েছে। এবং বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ভারী হওয়া সত্ত্বেও বইগুলোর বিক্রি অবিশ্বাস্যভাবে ভালো।

আজ মনোজিতের কোনও অবস্থাতেই 'সব্যসাচী'র আড্ডায় আসার কথা ছিল না। ঘাড়ের ওপর এমন একটা ধারাল খাঁড়া নিয়ে সাহিত্যের আলোচনা-সভায় আসা যায় না। কিন্তু তবুও এসেছে, নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই এসেছে, ওই সংখ্যাটা নিয়ে আলোচনার টানে নয়, শুধুমাত্র ওই খাঁড়াটার তাড়নায়। বাস্তবিক, আজ অন্তত হাজারখানেক টাকা নিয়ে যত জলদি সম্ভব ফিরে যেতে না পারলে, সংসারে একটা বড়সড় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

আসলে, ওর বাবা, একজন বন্ধ কারখানার শ্রমিক, এই মুহূর্তে বলতে গেল মৃত্যুশয্যায়। ডাঃ ত্রিবেদী বলেছেন কালকের মধ্যে অন্তত গোটা-তিনেক টেস্ট না করালে চিকিৎসা শুরুই করা যাবে না, আর রোগীর যা হাল, প্রতিটি দিনই ভাল্‌নারেব্‌ল।

আজ প্রথম থেকেই সন্দীপনদা চুপ করে বসেছিলেন। যা-কিছু বলার বলছিল চন্দন-রাজীবরা। সন্দীপনদা নিঃশব্দে শুনছিলেন। আর, উপভোগ করছিলেন সবাইয়ের সন্দীপন-বন্দনা। একসময়, একেবারে হঠাৎই ছুঁড়ে দিলেন ওই উদ্ভট প্রশ্নটা।

একেবারে হঠাৎ হয়তো নয়, বরং বলা চলে, সন্দীপনদার এমন উদ্ভট প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। ওঁর প্রবন্ধটা নিয়েই চলছিল আলোচনা। আপামর মানুষের শ্রমশক্তিকে একদল মানুষ যুগ যুগ ধরে কতভাবে শোষণ করে চলেছে, ইতিহাসের খাঁজেভাঁজে ঢুকে পড়ে

অনেকানেক উদাহরণ এবং তৎসহ মানুষের আচরণের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে করে সন্দীপনদা তিলতিল প্রমাণ করেছেন যে, কেবল কলকারখানা কিংবা কৃষিক্ষেত্রেই মালিকপক্ষ শ্রমিকপক্ষকে শোষণ করে, তা নয়, জীবনের প্রতিটি শাখায়, অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষেত্রে অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষের অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে শোষণের অকাট্য প্রমাণ। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে সন্দীপনদা একেবারেই আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, কিনা, হ্যাবিট যদি মানুষের সেকেন্ড নেচার হয়, তবে ফার্স্ট নেচারটা কী?

উপস্থিত সবাই যখন প্রশ্নটার জবাব খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, সন্দীপনদাই একসময় নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে জানিয়ে দেন জবাবটা, কিনা, হ্যান্ড-ইট ইজ দ্য ফার্স্ট নেচার অফ ম্যান।

হ্যান্ড-ইট কথাটা অন্যদের কানে হ্যাবিট-এর মতোই শোনায়। ফলে, উপস্থিত সবাই মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত, কিনা, সেকেন্ড নেচারও যা, ফার্স্ট নেচারও তাই? আর, সেই মুহূর্তে, পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর ভঙ্গিতে সন্দীপনদা শব্দটাকে একটু একটু করে খুলতে থাকেন, ভাঙতে থাকেন, কিনা, হ্যাবিট নয়, হ্যান্ড-ইট। অর্থাৎ সবকিছুকে করায়ত্ত করা, ইংরেজিতে যাকে বলে, গ্র্যাব করা, অর্থাৎ গ্রাস করা। ওটাই মানুষের ফার্স্ট নেচার। আর, যুগে যুগে মনুষ্যসমাজে ওটাই শোষণ-প্রবৃত্তির বীজস্বরূপ।

অন্যের শ্রমশক্তিকে ঠিক কবে লুণ্ঠন করতে শুরু করেছিল একদল মানুষ, ইতিহাসের সেই আদিম পর্যায়ে ঢুকে সবাই যখন উচ্ছ্বসিত আলোচনায় মত্ত, যখন দক্ষিণ আফ্রিকা আর রাশিয়ার হিরের খনিগুলোতে কর্মরত অর্ধনগ্ন শ্রমিকগুলোর প্রতি খনি-মালিকদের বর্বর শোষণ নিয়ে আসর তোলপাড়, ঠিক সেই মুহূর্তে মনোজিৎ একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। সন্দীপনদার নির্দেশে হাজার টাকার একটা নোট 'সব্যসাচী' পত্রিকার অ্যাকাউনট্যান্ট-কাম-ক্যাশিয়ার গগন সরকারের ক্যাশবাক্সো থেকে উড়ে এসে মনোজিৎ-এর পকেটে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল। আর, তাই দেখে মনোজিৎ শয্যাশায়ী বাবার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, চলো বাবা, টেস্টগুলো করিয়ে নিয়ে আসি। ডাঃ ত্রিপাঠী বলেছেন, যত জলদি সম্ভব টেস্টগুলো করিয়ে চিকিৎসা শুরু না করলে তোমার কেসটা আরও জটিল হয়ে উঠবে।

কিন্তু মনোজিৎ-এর স্বপ্নটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ, স্বপ্ন স্বপ্নই। গগন সরকারকে নির্দেশ দেওয়া তো পরের কথা, এখনও অবধি সন্দীপনদার কাছে কথাটা পাড়তেই তো পারেনি মনোজিৎ। আসলে, সন্দীপনদাকে ঘিরে আজ এমনই তাত্ত্বিক আলোচনার বান ডেকেছে, মনোজিৎ কথাটা পাড়বার সুযোগই পাচ্ছে না। অথচ কব্জির হাতঘড়িটা তো থেমে নেই। সময় যতই বয়ে যাচ্ছে, বাবার কথা ভেবে ততই অস্থির হয়ে উঠছে বেচারা।

ইস্, দেখতে দেখতে সাতটা বেজে গেল। এখনই বেরোতে পারলে আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে বাবাকে নিয়ে রয়-ডায়েগনিস্টিক'এ পৌঁছে যাওয়া যেত।

'সব্যসাচী' পত্রিকায় মাস ছয়েক আগে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল মনোজিৎ। সেই প্রথম। সেটা একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল ওর কাছে। 'সব্যসাচী'র মতো পত্রিকায় প্রবন্ধ বেরোনো চাট্টিখানি কথা নয়। বন্ধুমহলে তার ইজ্জত একলাফে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এযাবৎ ওই খাতে কোনও সম্মানদক্ষিণা পায়নি মনোজিৎ। পায়নি মানে, টাকাটার জন্য এযাবৎ সন্দীপনদাকে

কোনোদিন বলেনি সে। খুব বেধেছিল কথাটা বলতে। আর, সন্দীপনদা না বলে দিলে গগন সরকার নামের পত্রিকার কেরানি-কাম-অ্যাকাউন্ট্যান্ট-কাম ক্যাশিয়ার তো দিতে পারেন না টাকাটা।

আজকের সমস্ত উত্তেজিত আলোচনার মধ্যেও মনোজিৎ তাই সারাক্ষণ উসখুশ করছিল। বন্ধুদের উত্তপ্ত আলোচনাগুলো ওর মগজ অবধি পৌঁছচ্ছিল না। তার বদলে কানের কাছে সমানে বাজছিল ডাঃ ত্রিপাঠীরও কথাগুলো, যত জলদি সম্ভব টেস্টগুলো করিয়ে চিকিৎসা শুরু না করলে তোমার বাবার কেসটা আরও জটিল হয়ে উঠবে।

আলোচনাটা তখন তুঙ্গে, ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা উঠে দাঁড়ান সন্দীপনদা। সম্ভবত মূত্রত্যাগের প্রয়োজনে পত্রিকা-অফিসের চিলতে টয়লেটের উদ্দেশে পা বাড়ান তিনি।

কথাটা সন্দীপনদার কাছে উত্থাপন করবার জন্য ওই সময়টাকেই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হয় মনোজিতের। একসময় উঠে দাঁড়ায় সেও। পায়ে পায়ে সন্দীপনদাকে অনুসরণ করে।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে সন্দীপনদা সবে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, মনোজিৎ পায়ে পায়ে দাঁড়ায় ওঁর সামনে।

সসঙ্কোচে বলে, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল সন্দীপনদা।

—হ্যাঁ, বলো না কী কথা? সন্দীপনদা সামান্য ঝুঁকে পড়েন মনোজিতের দিকে।

ওর মতো একজন অতি জুনিয়র লেখকের কথা শোনার জন্য সন্দীপনদার এমন আকুতি দেখে মনে মনে একেবারে আপ্লুত হয়ে ওঠে মনোজিৎ। কাঁচুমাচু গলায় বলে, বাবা খুব অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন; এক্ষুনি কয়েকটা টেস্ট করানো খুবই দরকার। অন্তত এক হাজার টাকা লাগবে তার জন্য। তো, বলছিলাম, আজকে যদি আমার টাকাটা পেতাম—।

মনোজিতের শেষ কথাগুলোতে সন্দীপনদার ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়ে, কোন টাকার কথা বলছো?

সঙ্কোচে মাথাটা নুয়ে আসতে চাইছিল মনোজিতের। তাও প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, আমার যে প্রবন্ধটা 'সব্যসাচী'তে বেরিয়েছে, ওই বাবদ পারিশ্রমিকটা যদি পেতাম আজ—।

মনোজিতের মুখমণ্ডলের ওপর এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলেন সন্দীপন। চোখেমুখে বিস্ময়টা সামান্য গাঢ় হয় বুঝি। একসময় বলেন, সব্যসাচী'তে লিখলে টাকা পাওয়া যায়, এমনটা কে বলেছে তোমায়?

—কেউ বলেনি, তবে আমি ভেবেছিলাম, প্রকাশিত প্রবন্ধটার জন্য একটা পারিশ্রমিক তো আমি পাবই।

সন্দীপনের ঠোঁটের কোণে এতক্ষণে খানিক হাসির আভা জাগে। খুব মিষ্টি করে বলেন, তুমি প্রথম লিখলে তো, তাই এমনটা ভেবেছ ভাই। আসলে, লেখালেখির জন্য 'সব্যসাচী' কাউকেই কোনও পারিশ্রমিক দেয় না।

সন্দীপনের কথায় মনোজিতের সারামুখে গাঢ় হতাশার পাশাপাশি কিঞ্চিৎ বিস্ময়ও ফুটে ওঠে।

সেই বিস্ময়টাকে অনুসরণ করেই বুঝি সন্দীপন বলে ওঠেন, মৌলিক লেখালেখি কি শ্রমের পর্যায়ে পড়ে? সম্ভবত না। শ্রম হল, দিনরাত কলিজা ফাটিয়ে, ঘামরক্ত ঝরিয়ে, বুর্জোয়াদের

ক্ষেতে-খামারে-কারখানায় ...। কোনও সৃষ্টিশীল কর্মকেই তাই 'সব্যসাচী' উৎপাদিত পণ্য বলে মনে করে না। কোনও সৃষ্টিশীল মানুষকেই তাই শ্রমিক বলে মনে করে না। যারা সৃষ্টিশীল রচনাকে পণ্য বানিয়ে বাজার-জাত করে, 'সব্যসাচী' কোনওকালেই সেই গোত্রে পড়ে না ভাই।

সন্দীপনের কথায় যারপরনাই বিস্মিত মনোজিৎ বলে ওঠে, কিন্তু একটা প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এক ধরনের শ্রম তো হয়ই সন্দীপনদা। সেই শ্রমটা যত না শারীরিক, তার চেয়েও ঢের বেশি মানসিক, বৌদ্ধিক। সেই মানসিক শ্রমেরও তো একটা মূল্য রয়েছে সন্দীপনদা।

—ওটা তোমার মত হতে পারে, কিন্তু আমরা তা মনে করি না। আমাদের মতে, সমাজের স্বার্থে সুস্থ চেতনার স্বার্থে যাঁরা লেখেন, তাঁরা পারিশ্রমিকের জন্য লেখেন না।

—কিন্তু আমি তো শুনছি—। একপ্রকার মরিয়া হয়ে বলে ওঠে মনোজিৎ, হীরেন সান্যাল, প্রিয়কুসুম মুখোপাধ্যায়দের নিয়মিত পারিশ্রমিক দেন আপনি।

মনোজিতের কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন সন্দীপন। শুনতে শুনতে তাঁর কপালের বলিরেখায় কিছু বাড়তি ভাঁজ পড়ে।

একসময় খুব মৃদু অথচ শাণিত গলায় বলেন, আমরা ওঁদের সাম্মানিক দিই। সম্মানদক্ষিণা।

এতক্ষণে প্রবল আশায় পুনরায় দপ করে জ্বলে ওঠে মনোজিতের চোখদুটি। বলে, সরি দাদা, পারিশ্রমিক কথাটা বলা ঠিক হয়নি আমার। আমি আসলে ওই সাম্মানিক বাবাদ টাকাটা চাইছিলাম।

মনোজিতের মুখের দিকে মাত্র এক ঝলক তাকান সন্দীপন। ওই ফাঁকে রুমাল দিয়ে মুখ-মোছার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তারপর খুব স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করেন, তুমি হীরেন সান্যাল নও, প্রিয়কুসুমও না।

—তা হয়তো নই ... তবে একই পত্রিকার সূচিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কি আর দুজন লেখককে দুই দৃষ্টিতে দেখা উচিত, দাদা?

সহসা ভেতরের চাপা বিরক্তিটা সরাসরি উগরে দেন সন্দীপন। খুব বিচ্ছিরি গলায় বলে ওঠেন, এই জায়গাটা কি এমন বিষয় নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত বলে মনে হয় তোমার? আমি টয়লেট থেকে ফিরছি মনোজিৎ।

মনোজিতেরও সহসা মনে হয়, একটা ক্ষুদে টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমের মূল্য এবং শ্রমিকের প্রকারভেদের মতো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কোনওরূপ আলোচনা করা একেবারেই অনুচিৎ হয়েছে তার। খুব লজ্জিত গলায় বলে ওঠে, সরি দাদা, ভেরি সরি। ওইখানে, ওই আলোচনার আসরেই আমার কথাটা বলা উচিত ছিল। ওখানেই প্রসঙ্গটা মানায় ভালো। চলুন, ওখানেই বলি।

বলতে বলতে সন্দীপনের বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ায় মনোজিৎ।

ততক্ষণে আলোচনাটা পুরোপুরি জমে উঠেছে।

এবং উপস্থিত সবাই একবাক্যে সহমত হয়েছে, কিনা, সত্যি, মানতেই হচ্ছে, একটা অতি সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়কে অতি মুন্সিয়ানার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন সন্দীপনদা। এমনটা বুঝি আর কেউই পারত না।

অলৌকিক ঘেরাটোপ

সমীর রক্ষিত

লেটেস্ট নিউজ নিয়ে আসে পুঁচকেটা। নাম তার জাদা। সবচেয়ে পুঁচকেটাই সবচেয়ে টেটন। তার নাকের ফুটো আর আর ভাইবোনের মতোই, একই রকম। একটুও বড়ো না, ছোটোও না। কিন্তু কাদায় পাঁকে মুখ ডুবিয়েই নানান খবুরে গন্ধ পায় জাদা। আসলে ধূর্ত, চৌখস। মানুষের চালবোল থেকে তাদের অনেক মতলব টের পায় জাদা। ওর এক ঠাকুন্দা বলে—শালা জাদাটা মাইনষের চেয়েও টেট্‌না।

সেই জাদাই খবরটা নিয়ে আসে পাড়ায়—মশারি। মশারি। মশারি। সে আবার কী জিনিস। শুয়োর সমাজে ভূকম্পের মতো হুলাহুলি পড়ে যায়। কাদা পাঁকে গড়াগড়ি খায় অনেকে। নতুন জিনিস তো বটেই। তাই নাকি আসছে। একথা কানে আসতেই জাদাকে ডাকে সেই ঠাকুন্দা, ধমকায়, বলে—ব্যাটা, মাইনষের স্বভাব পেয়েছ—গুমার ছড়াচ্ছ? একে আমাদের শত্তুর বেড়ে যাচ্ছে। তার উপরে আমার নিজের জ্বর চলছে তিনদিন। এরপর চাউড় হয়ে গেলে।

জাদা ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলের টিস্কুলের নর্দমার ভক্ত। সে ওদিকেই চরেবরে। কানখাড়া তার অ্যান্টেনার মতো। সে বলে—রিউমার না দাদা, খাস খবর সচ্। আমি চ্যালেন (জ) করে বলতে পারি—মশারি নামছে।

—ইস্ কী আমার উস্তাদ। ঠাকুন্দাকে চ্যালেন করে—তিনদিনের ধুম জ্বরে এই ঠাকুন্দার বোধহয় মাথার রক্ত চড়ে যায়। পাঁকজমি থেকে ধাঁ করে উঠে সে তেড়ে যায় জাদার দিকে। জাদা কিন্তু ছুটে পালায় না। বীরদর্পে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। এজন্যই সে সবার থেকে আলাদা। এভাবেই তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ফলে। আর যা প্রায়ই হয়, বিপদ ছুঁতে পারে না জাদাকে। কপাল জোরে এ যাত্রাও সে বেঁচে যায়। ওর কপাল নাকি জন্ম থেকেই জোরদার। ওর বাবা বলে—কর্মরাশিতে জন্ম আমার জাদার। বুদ্ধির বৃহস্পতি তুঙ্গে। ফলে ওরই ভাগ্যগুণে ওদের অনেক প্রাপ্তি যোগ ঘটবে, উন্নতি হবে, ঠাট্টা করতে পারে এমন আত্মীয় বন্ধুরা বলে—এ ছেলে বাঁচলে হয়।

ওর বাবা নাকু ব—বাঁচবে না মানে? জাদাকে মারে কে। রাহুর গ্রাস থেকে ওকে বাঁচাবে স্বয়ং শনি। শনি রাহুকে গিলে নেবে।

আসল ঘটনা যা এই মুহূর্তে বাঁচায় জাদাকে তা হল রামচেতনও খবরটা নিয়ে আসে বস্তিতে। মাথার ওপরে হাত তুলে তালি বাজাতে বাজাতে গান গাওয়া নাচের ভঙ্গিতে বলে—আমাদের বরাহদের কী সৌভাগ্য, তারা এখন থেকে মশারির মধ্যে থাকতে পারবে। হরির লুট লাগাও ভাই, কভি খুশি কভি গম।

নাকুর মালিক রামচেতন। অতএব ছুটে আসে নাকু, মালিকের কাছাকাছি। ঘুরঘুর করে। বলতে থাকে—আমার জাদার ভাগ্যে ঘটল এ ঘটনা। ওর ভাগ্যে লেখা আছে, ওর চার বছর বয়স থেকে ঘুমন্ত ওকে ঘিরে থাকবে মাথার ওপরে চাঁদোয়া আর চারপাশে জাল। একথা বরাহ কুলপুরোহিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ওর জন্মের পরেই। তিনি আর কারো সম্পর্কে এমন

কোনা বাণী দেন নি। কিন্তু জাদাকে দেখেই তার দিব্য ভাব-উদয় হয়েছিল, চোখ বুজে বলেছিল—এ ছেলে তো বরাহকুলের আদি পিতার জিন পেয়েছে গো। বহুৎ ভাগ্যশালী।

এত কথা কি নাকু জানত। সে তো বরাহকুলের সবচেয়ে বোকা-বুদ্ধু। তার মাথার ভেতরে কিচ্ছু নাই। একদম ফাঁকা। তবে তারই সৌভাগ্য বলতে হবে যে জাদার মতো ছেলের বাপ সে।

—ধ্যেৎ ইডিয়েট। তারই সমবয়সী কুনা তাকে ধমকে ওঠে। সে সর্বক্ষণ নাকুর সঙ্গে ঝগড়া করে, পেছনে লাগে। এর মালিকও রামচেতন। একই মালিকের দুই ফলা। কুনা বলে—কবে গুরুদেব আমার ছেলেকে দেখে বলে গেছে—এই তো, এরই ভাগ্যে রবি জ্বলছে। সামনে পেছনে যা কিছু ঘটবে, জানবি—এরই দৌলতে ঘটছে। সেজন্যই গুরুদেব নিজে ওর নাম দিয়েছিল খোড়া। খোড়া মানে জানিস? খোড়া হচ্ছে বহুৎ বহুৎ জাদা।

এই নিয়ে দুজনে তখন গুঁতোগুঁতি শুরু হবার উপক্রম হয়। আর তখন রামচেতনের গানের মধ্যেই বস্তিতে ঢোকে গণেশ। সে বলে—কভি খুশি কভি গম, ঠিক বলছ বন্ধু। যব ওপরওলা দেতা হ্যায় তব ছাপ্পর ফাড়কে দেতা হ্যায়। গণেশের একথা রামের কানে হেঁয়ালির মতো ঠেকে, তবে কি তাদের, তাদের বরাহদের ভাগ্য ফিরছে?

—কী ব্যাপার গণেশদা, মশারি নিয়ে যে জনরব চলছে, তুমিও তা শুনলে নাকি? রামের উদগ্রীব প্রশ্ন।

—শুনলাম মানে। চোখির উপুর দেখে আলাম—শূন্য হতে মশারি নামতিছে। আহ্ কী ফাইন ফুটা রে রাম, বোঝাই যায় না। মশা ফশা গলবে নি। তবে হ্যাঁ, মশারির চার দেয়ালে কী বাটি পিরিন্টের কাজ রে ভাই। রাজবাড়ির যেমুন হয়।

—সত্যই? নিজে চোখে দেখছ? দু কদম এগিয়ে যায় রাম, বলে গণেশদা তবে কি আমাদেরও কপাল খুলে গেল? আর আমাদের এই বরাহ-ঘোঁৎনাদের? বলে কিক মারবে বলে নাকুর দিকে পা তুলছিল, হঠাৎ উপুড় হয়ে রাম দু'হাত জোড়া করে। পাপ হলে মাফি করে দিও বাবা।

গণেশ হেসে বলে—হ্যাঁরে ভায়া, এখন থেকি এদের আর শুয়ার মুয়ার বলে হেলা তুচ্ছ করোনি। এদের তোয়াজ টোয়াজ করো রে ভায়া। পর মুহূর্তে উঠোনে নেমে গণেশ হাঁকে—ওরে আমার বকু, ওরে আমার ঝকু, আবু, বানু—মুখের ওপরে হাতের তালুর চাপড়ে চাপড়ে আহ্লাদী শব্দে কাছে ডাকে—আ আ-আব তো আজা—মেরা দিল কা ধড়কন। ওরে আমার বচ্চর বিয়ানো—মাগ্—মেয়েছেলিরা—আঃ।

রামচেতনের বুক চিড়বিড় করে ওঠে, তার তো খুব বেশি শুয়োর নেই। তার যে ক'টা আছে সেই নাকু-কুনা, জাদা-খোড়া, ঠাকুদ্দা-ঠানদি, আর গোটা পাঁচেক গ্যাপ—নেই এমন বিয়ানির দল।

গণেশের নাকটা বেশ লম্বা। সেটাই টান করে দিয়ে বলে—ওরে রামু, তোর কি আর অত ঝামেলি পোষায়?

চমকে ওঠে রামচেতন বলে—আমার আবার কীসের ঝামেলি।

—এই যে সব নোংরা ঘোঁৎনার দল। তবে তর যেক'টা আছে আমি কিনি নেবানে, কী দোস্ত্ —রাজি তো? গণেশের নাকের ফুটো আরো গোল হচ্ছে। দেখতে পেয়ে রামের বুকটা

ধক ধক করে ওঠে। গণেশের মুখ মিষ্টি কিন্তু ভেতর ভেতরে সে মতলববাজ। রাম চেঁচিয়ে ওঠে—হঠাস গণেশদা বেচাকেনার কথা উঠছে?

—উঠবে না। দিন তো ফিরছে রে। গণেশের কথা শেষ হয় না। হঠাৎ চারদিকে বস্তির সর্বক্ষণ ঝগড়ায় ব্যস্ত মেয়েছেলে-ছেলেবুড়ো চোখ তুলে আকাশে তাকায়। জীবনে এরা কতদিন ওপরের দিকে তাকায়? ওপরে হঠাৎ একটা আবছা কালো মেঘ শূন্যে ফুঁড়ে ডানা ছড়ায় যা এক মুহূর্ত আগেও ছিল না। অকস্মাৎ সেই মেঘের ছড়ানো জরায়ু থেকে হাল্কা সাদা ফিনফিনে এক বিশাল মশারি ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে যেতে যেতে নিচে নামতে থাকে। যেন কোনো অলৌকিক আশীর্বাদের মতো আশায় উজ্জ্বল। যেখানে শুয়োর আর তার বস্তি সেই এলাকা, কাদা পাঁকের মাটিতে এসে বসে যায়। হাল্কা কিন্তু প্লাস্টিকের মতো শক্ত সে মশারি।

বস্তিবাসী আর বরাহকুল আবিষ্ট চোখে এ দৃশ্য দেখে। মশারির দেওয়ালে 'বাটি-পিরিন্টের' কী সুন্দর কারুকাজ। চাঁদোয়ায় রঙ বাহার রঙিন ফুল ফুটে উঠল এইমাত্র।

সহসা নাকু বলে—এই তো আমাদের পুরুত ঠাকুর, দ্যাখ দ্যাখ, চাঁদোয়ার ওপরে বসে আছেন না? আয় রে জাদা, নম কর।

জাদার মগজটা চতুরতার রসে টাপুটুপু। সে তড়াক করে নাকুর কাছে ছুটে যায় চারপায়ে। তারপর তৎপর লেজ আর ডানার মতো কান দ্রুত বেগে নাড়তে থাকে এবং মাথা মাটির দিকে নুইয়ে দেয়। কাদার গন্ধে সে টের পায় একটা কীট তাতে দংশন করল।

পুরুত ঠাকুরকে প্রণাম জানায় নাকু, বলে—এই যে আমার সেই ছেলে, কর্দমরাশিতে জন্ম —ওকে আশীর্বাদ করো ঠাকুর, ওর জাদা উন্নতি হোক।

পুরুত চাঁদোয়ার ওপর থেকে বলে—হবে রে হবে। ওর অনেক বালবাচ্চা হবে। তাদেরও। সব মিলে তোদের অবস্থা ফিরে যাবে। মশারির মধ্যে তোরা সুরক্ষা পাবি।

এবারে যেন রামচেতন কিছুটা তার নাকুর সংলাপ বুঝতে পারে। উৎকর্ণ হয়ে থাকে সে।

নাকুর বদলে এবার জাদা বলে—ঠাউর, তালে আমরা হঠাৎ এই মশারির মধ্যে বন্দি হয়ে গেলাম কেন? বলো ঠাউর?

—আরে বালখিল্য, তোরা জানিস না। পৃথিবীটা যখন মারী মরকে ভরে যায়, কীট পতঙ্গে রোগে মরণে ভরে যায়, যখন পাপে গরলে ডুবে যায়, এ ওকে খায়—সে তাকে খায়, যখন নারীর ইজ্জত থাকে না, যখন রক্তে চোখের জলে বান ডাকে—পৃথিবী যখন তলিয়ে যায়—তখন তোদের জন্ম। তোরা জানিস না, ভুলে বাস—তোদের জন্মকথা।

—পরন্তু কী আমাদের জন্মকথা? নাকু-জাদা মাথা নোয়ায়।

—তখনই তোদের জন্ম, জানিস না বালখিল্যের দল—পৃথিবীর সেই দুর্যোগে বরহ্মার নাসা—মানে কী? নাক থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, মানে কী, আঙুলের সমান তোদের জন্ম। আরে মহাপ্লাবনের মধ্যে তোরাই এই স্থলভাগকে ধরে রেখেছিস রে। ওরে নির্বোধ—

—কিন্তু ঠাকুর। আপনার একটুকখানি পারশিয়ালিটি হচ্ছে না? কুনা ফুঁসে ওঠে।

—কোনটা?

—এই যে আপনি তো আমার ছেলে খোড়াকে বলেছিলেন ভাগ্যশালী। এখন পুরোটাই আপনি জাদার দিকে ঢলে পড়েছেন। আমার খোড়ার রবি তুঙ্গা।

—আরে আরে সব সমান। পুরুত ঠাকুরের কথা শেষ হয় না, কুনা প্রবল চিৎকার ওঠে—না, শালা নাকু নিজের ছেলেকে হিরো বানিয়ে ফেলেছে। আমি তা হতে দেব না। বলেই মহাবিক্রমে কুনা নাকুকে আক্রমণ করে। দন্তযুদ্ধ, আক্রমণ প্রতি আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এবং জাদা-খোড়াও যোগদান করে।

এদিকে রামও ঝাঁপিয়ে পড়ে গণেশের ওপর, বলে—শালা, আমার সব ক'টা অ্যাসেট তুই কিনে নিবি, এত বড় সাহস? তোর মতলব আমি অঙ্কুরেই বিনাশ করব রে শয়তান।

গণেশও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সেও উন্মত্তের মতো ঝাঁপায়। দুজনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। হাতে পায়ে দাঁতে পেটে পিঠে। খামচা-খামচি থেকে কামড়া-কামড়ি কিছু বাদ যায় না।

ঝিনঝিনে মশারির বাইরে তখন হাজার হাজার ক্ষুধার্ত কীট-পতঙ্গ, জীবাণু পরমাণু, মাছি মশা—এনকেফিলিস-কিউলেকস, ভাইরাস-জার্ম সশব্দে পোন পোন শব্দে ঝাঁপিয়ে মশারির গায়ে।

নাকু-কুনা, জাদা-খোড়া, রাম-গণেশের নখদন্তের ধারালো অস্ত্র শুধু পরস্পরকে রক্তাক্ত করে না, বিদ্ধ করে মশারির সূক্ষ্ম চিত্রিত দেওয়াল। ইতস্তত ফুটোফাটা কি ঈষদ্দৃষ্ট হতে থাকে? অন্দরে-বাহিরে?

ভস্মগুণ্ঠনে গিরিলোক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

হিমালয়ে মৌনী নবদিনের যাত্রারম্ভে। তুষারাবৃত শৃঙ্গশ্রেণী প্রতীক্ষারত অগ্নিদেবের দূর গমনে। রথাশ্বের ক্ষুরধ্বনিতে জাগরুক তটিনী আর সবাক পক্ষীশ্রেণী, মৃগশাবক, বৃক্ষগহ্বর, দিনারম্ভের ঘোষক গিরিকেশরী। কণ্ঠময় প্রভাতবায়ুও দিনযাত্রার স্বস্তিবাচনে। বিগত ও বর্তমান আত্মাস্থিতি শিলায়, বৃক্ষে, নাগে, মানবে, গন্ধর্বে দেব ও দেবীতে। করজোড়ে উচ্চারিত হোক—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। ত্রিলোকের কল্যাণে আমার কল্যাণ, ত্রিলোকের সুখে আমার সুখ, ত্রিলোকের আনন্দে আমার আনন্দ। অন্তর্যামীর আসনটিও ওই কল্যাণ, সুখ, আনন্দের ত্রিগুণে নির্মাণ।

যামিনীগতে জগতের এই দিনযাত্রা বড় নন্দময় কিন্তু আশৃঙ্গ ভস্মাবৃত। যেমন চরাচর বারিবিন্দুময় মেঘাগমে, হেমচূর্ণময় তুষারাগমে, পরাগরেণুময় মধুকালে তেমনই এক ভস্মগুণ্ঠন হেমন্তদেশে। গুণ্ঠন তো ব্রীড়ার লক্ষণ—সলজ্জ নয়ন ঢাকে নেত্রপল্লব, কেশু অঙ্গে আবৃতি গড়ে কঞ্চিকা, নগ্ন কূর্ম দেহে আচ্ছাদন দেয় কচ্ছ, তন্বীর ঊর্ধ্ব ও অধোদেহের সন্ধিতে বন্ধনী বাঁধে কটিসূত্র। কিন্তু ভিন্ন মতি এ-ভস্মের। ব্রীড়া নয়, ক্রীড়াতেই তার স্থিতি। তাই ভস্মাবৃত বৃক্ষপর্ণে মর্মরধ্বনি, নৃত্যময় সরোবর বারি, নিদাঘে বাত্ময় বসতী। অনলস্পর্শে যে পবিত্র অবশেষ, তারই রেণুময় অঙ্গবস্ত্র তোমার দেহে। এবার তোমার নৃত্যগীতে দোহার তটিনীতরঙ্গ, নির্ঝর, পক্ষী, ছাগশিশু।

কিসে কী উপার্জন সে ভিন্ন প্রশ্ন। কী হেতু এই ভস্ম আর কোথা তার উৎস, আদি জিজ্ঞাসা সেটিই। সে অতীত-ভস্মে হৃদয় ভঙ্গ হয়েছিল ত্রিলোকের, সে মদনের। চতুরানন ব্রহ্মা বরে তারক হল ত্রিভুবন ত্রাস আর সে-দানব হননে সহায় ওই হর। কিন্তু সে ধ্যানমগ্ন গিরিদেশে। ইন্দ্র মতিতে, হরধ্যানভঙ্গে মদনের যাত্রা। কামগীত আর রতিপতির পুষ্পধনুটঙ্কারে বন-উপবনে বিকশিত হয় কমল, মল্লিকা, শেফালিকা, চম্পক, নীপ, করবী, কলাবতী আদি সহস্র পুষ্প। দ্বাদশ তিলকবতী পার্বতীও ধূপ-দীপ-পুষ্প-ফল সঙ্গে হর সম্মুখে। হর-পার্বতী নিবিড় নৈকট্যে মদন-বাণ হর হৃদয়ে। কিন্তু ললাটলিখন, ওষ্ঠে হাস্য প্রকাশের আগেই হর ক্রোধে মদন ভস্মরূপ। তারপর মদনপত্নী রতি ও হরহৃদয় পার্বতীর সমবেত তপস্যা গঙ্গাতটে বিল্বতরুমূলে মদনের প্রাণভিক্ষায়। ত্রিবর্ষ গতে হর স্থিতি জপস্থানে। কিশোরী কেশে বটজটা দর্শনে হরহৃদয়ে হাহাকার। কর্কশ বাকলে কিশোরীযুগলের কুচ-অঙ্কুর বুঝি নাশ হয়। কী বাসনা এ-দুই নবযৌবনার? অবলাযুগ্মের ভিক্ষা মনোহর তনু মদনের প্রাণ। নবজন্ম রতিপতির, যে কামনা পূর্ণ হর ইচ্ছায়। নবজন্মে নবরূপে কামদেব। সে হেমন্তগিরিবাসিনী বালাদলে সহাস্যে বলে, মদনের ভস্মরূপে কি কম বিড়ম্বনা। কন্দর্পবিনা স্ত্রী-পুরুষ বিরাগ বিরোধ বিয়োগ। নিত্যকলহে গৃহগুলি দাহভূমি আর হৃদয় রণক্ষেত্র। কে যে হনন করে কাকে আর কী তার কার্যকারণ যোগ, তা না হতের বোধে না হত্যাকারীর। হর হল সত্য ও সুন্দর, তাই সে দৃশ্যে তাঁরও চিত্তবিষাদ। আকস্মিক হর-সমুখে করজোড় পার্বতীর বক্ষবন্ধলটি পদতলে। পয়োধর অধর জঘনে কামের সৃষ্টি হল হর হৃদয়ে। কন্দর্পেরও নবজন্ম, নবকাম, নবরঙ্গ।

হেমন্তদেশে বৃক্ষ, শিলা, গৃহগাত্রে ভস্মরেণু দর্শনে প্রৌঢ়া-অনূঢ়া সঙ্গে মেনকা যাত্রা করে মদনগৃহ উদ্দেশে। কোনো নবযোগীর ধ্যানভঙ্গ কারণে মদন বুঝি ভস্মরূপ পুনর্বার। যত সন্নিকটে মদনগৃহ, তত ঘন বামা কণ্ঠধ্বনি। আকস্মিক সে স্বর স্তব্ধ গৃহদ্বারে। টঙ্কার ধ্বনি পুষ্পধনুতে।

মূর্তিমান মদনে সশরীরের স্থিত দেখে মনঃপীড়ায় মেনকাবাহিনী। বিপরীতে রতিও অগ্নিময়ী তার পতিভস্ম সন্ধানে মেনকা আগমনে। কিন্তু সে তো রতি, যার স্থিতি প্রীতিতে। রাগ নয় অনুরাগে তার মতি। সে মধুপ স্বরে মেনকায় বলে, ওগো শ্বশ্রূসমা গিরিমহিষী, চন্দ্রের ষোড়শকলা ক্ষয়বৃদ্ধিতে অমন ভস্ম ঝরে ধরণীতে। অমৃতা মানদা পুষা তুষ্টি পুষ্টি শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি জ্যোৎস্না শ্রী প্রীতি অঙ্গদা পূর্ণা পূর্ণামৃতা রতি ধৃতি ধারণ করে সেই রেণু আপন দেহে। যৌবনে সে কলাযাপন। প্রৌঢ়ত্বে কলাহীন অমানিশা। পার্বতী পরিণয়ে তুমিও নবকুমারী, হে গিরিমহিষী। শোনো, রতিরঙ্গ হল সুরতপ্রার্থী, রতি-রসরঙ্গ হল শৃঙ্গাররস, রতিচাটু হল সুরতচতুর আর রতিবন্ধ হল রমণে স্ত্রীপুরুষের ষোড়শবিধ অবয়বসংস্থান ভেদ। যেমন ষোড়শোপচারে দেবপূজা, যেমন শ্রাদ্ধকর্মে ষোড়শদান প্রেত উদ্দেশে তেমনই এই ষোড়শ রতিবন্ধ। ওহে মহিষী, তোমার কন্দর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল কবে যে তুমি কামভস্ম পাবে। যে রতিগৃহের স্থিতি অন্তরে, সেথা নিশিযাপন কতযুগ আগে। দেখো, দাহ হল কিনা, সেই গৃহ। ওহে গিরিমহিষী, যতকাল বৃক্ষে রতিবন্ধ লতা, কুসুমে কুন্তলা যোগ, রতিদলে তুষ্ট রতিমতী, ততকাল অবিনাশী কামদেব, অনশ্বর কন্দর্প।

মদনভার্যার বাক্যশরে জর্জরিত মেনকা প্রত্যুত্তরে বলে, কামদেবের গেহিনি তুই কিন্তু কামধেনু তো নোস। তার আবার এতো বাকবিস্তার কিসের।

কামদবৃক্ষের একটি শাখা আকর্ষণে রতি বলে, কী নিমিত্ত কামধেনু হে গিরিমহিষী। সে ধেনুর দুগ্ধ পান কেবল সুরতযাপনের ক্লান্তিতে। যে রমণী কামদেবের ভস্মসন্ধানী তার রমণ তো স্মৃতি, কাম ভস্মীভূত। সে ভস্মে কামধেনুর দুগ্ধ ঢেলে কি লাভ।

বৃথা তর্কে আয়ুক্ষয় আর তাই মেনকা গৃহমুখী। ভস্মের সন্ধানে এসে এমন অগ্নিযোগে মেনকা দেহে বহ্নিজ্বালা। শতপদ যাত্রা অন্তে আচম্বিৎ পশ্চাৎমুখে চিন্নকণ্ঠে মেনকা চিৎকার, চারি ধান্যে এক রতি/গুঞ্জাফলের সুরতপ্রীতি।

অচিরে দৃশ্যমান পাংশুবর্ণ শত-সহস্র চলমান পুচ্ছ অরণ্যপথে। ঈষৎ নৃত্যময় সেই উত্তোলিত চমরকেতন। কি রঙ্গে এমন বিভঙ্গগমন আর কিবা সেই রসময়যোগ, সে জিজ্ঞাসা কামিনীকুলে। এই নব জীবদলের কবে আগমন এ-গিরিতে, ললাটকুঞ্চনে সে সন্ধান। কিন্তু বৃক্ষশ্রেণী মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ লতা, তৃণ, গুল্মে আর তাই অদৃশ্য ধ্বজাধারীগণ। নিরুপায় অগ্রগমন। এক তুষারাবৃত শিলা উপরে আচম্বিৎ স্বপ্রকাশ এক পুচ্ছধারী। জীবটি মহিমাহীন নীলগাভী আর সেই পুচ্ছের বর্ণপ্রাপ্তি ভস্মগুণে।

গাভীদলের আগমন পথখানি ধরে বামাদলের উপস্থিত গমন। সে গমনে বিস্ময়ে নির্বাক নিত্য জিজ্ঞাসু বউ-কথা-কউ, সদাবাক অজ্ঞাশিশু, সতত ধ্বনিময় বনবাসী বরাহ। গিরিনন্দিনীদের পদসঞ্চারে যে এমন নন্দধ্বনি, কটি-কাঞ্চিতে যে এমন মধুর শিঞ্জন, দেহবস্ত্রে যে এমন মর্মর ভাব কে জানত। কিন্তু অচিরেই নিশ্চল ধনিদল আর সে কারণে পথটিও নির্ধনী। দূরে দৃশ্যমান

তুষারশুভ্র শতাধিক গিরিকেশরী। স্কন্ধকেশে ভস্ম মেখে গিরিশৃঙ্গযাত্রী। চলনমুদ্রাটি যেন যজ্ঞমুখী ঋত্বিকের মাঙ্গলিক পদসঞ্চার। কিন্তু কী মঙ্গল এ ভস্মে তার কোথায় বা তার স্থিতি, কোন কণ্ঠে সে উত্তর।

কেশরী পশ্চাতে ভস্মবর্ণ এক সুবিস্তারী মেঘমালা ধীরলয়ে গমন করে সম্মুখ হতে পশ্চাতে। তখনই সুদূরে মেনকা বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করে বিশ্বকর্মা নির্মিত রম্য উদ্যানের অপরূপ দারুগৃহখানি ভস্মীভূত। সুউচ্চ ভবন স্থানে এক এখন ভস্মস্তূপ। নির্বাক গিরিমহিষী, বাকরুদ্ধ বামাদল। রম্য উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম সকলই প্রতিষ্ঠিত স্বস্থানে, কুসুমগুলিও রূপ-গন্ধে আপন মহিমায় শুধু রম্যগৃহখানি অগ্নিযোগে ধরাশায়ী, ছাই রূপে বিদ্যমান। ভূমিবাসী কন্দের পত্র উন্নত মস্তক আর শেখরবান দারুগৃহটি অদৃশ্য। না অরণ্যবহ্নি না তড়িৎযোগ, তবে কোন মন্ত্রে কিবা তন্ত্রে এই অমোঘ বিনাশক্রিয়া।

মেনকা চক্ষুদ্বয়ে যে অপার শঙ্কা তারই সমবেত ত্রাস বামাদল অন্তরে। এ কি অভাবিত দৃশ্য যেখানে তমালস্পর্ধী গৃহ পদতলে আর পদদলিত তৃণ বর্ণময় শ্যামলীমায়, স্পর্শময় কোমলতায়, বৈভবী তুষারকণায়, নৃত্যময় গঙ্গাপতঙ্গের পদসঞ্চারে। কোন বিভ্রমে মেঘমালা, গিরিকেশরী, নীলগাভী, বরাহদল ধারণ করে ভস্মবর্ণ, কি রঙ্গে শশীর ওই ধূসর কলঙ্ক গ্রহণ? শেষ সত্য কি বিশ্বকর্মা বিপরীত ওই ভস্ম। তৃণই আত্মগতি পরমস্থিতি।

মুঞ্জ, কুশ, বেতসে অবস্থান আর শাগ, নল, চোরকণ্টকি সঙ্গে নিত্য বিনিময় চিন্তায় বিলাপময় কামিনীদল। গিরিশিখর স্পর্শে যে বিশ্বকারিগরের পুরী, প্রাসাদ, সৌধ সে বিপরীতে এ-কার বিধান ভূমি সঙ্গে সহবাস। বামাদলের বক্ষবাদ্যে উত্তুঙ্গ রোষধ্বনি। যার এই কৃৎকর্ম সেই অদৃশ্য প্রতি হুঙ্কার। বীর্যবান হলে দৃশ্যমান হও। কিন্তু অচিরেই সকল কণ্ঠ কলহীন। তুষারাবৃত একটি শিলার পশ্চাৎ হতে ঈষৎ উত্থিত এক কার্মুক প্রান্ত। কয়েকটি পক্ষীপর্ণে প্রান্তটি বর্ণময়। সে-শোভায় হাস্যময় জলকুসুম, লাস্যময় তটিনীতরঙ্গ। দৃশ্যমান ভূর্জ-তমাল শীর্ষে। অতৃণে সে নিদ্রিত বাসুকীর মতো শীতল, তৃণযোগে ঐরাবতের মতো মত্ত। তূণাধারাটিও ধীর প্রকাশিত অর্ক, খদির, পীলু বৃক্ষ মধ্যে। দারু নির্মিত সে তূণাধার। গিরিবালার প্রতিপক্ষে আচম্বিৎ দর্শন করে এক প্রস্তরবর্ণ কিরাতকিশোর। সে ধীরপদে উচ্চশিরে গিরিবালা সন্নিকটে। বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, অম্বু ও অম্বর এক অসম রণদৃশ্য প্রতীক্ষায়। ধীর পদে সর্পসদৃশ সে কিরাতকিশোর স্পর্শ করে তূণাধার। উৎকণ্ঠিত গিরিবালা। কিশোর হস্ত ধীর নির্গত অন্দর হতে। সেখানে শতসহস্র গুলঞ্চপুষ্প। কিশোর গোলোককুসুম অর্পণ করে কিশোরীদল করতলে। সে করস্পর্শে প্রসূন সুবাসে দারুস্পন্দে উতলা মন। ওহে বনবাসী নবীন বৃক্ষ, তোমার শাখে আশ্রয়, তোমার পত্রে অন্নভোজন, তোমার ব্যজনে নিদাঘ শীতলতা, তোমার বল্কলে দেহাবরণ, তোমার অবকলে নিশিযাপন।

কোথা বোধ কোথা বুদ্ধি, কিশোরীদলের প্রগলভায় বীতশ্রদ্ধ রাজমহিষী আদি প্রৌঢ়াসকল। ইশারানির্দেশ—ও কিরাত, ও গমন করে কিলকিল ধ্বনিতে, ওরা ক্রূরশস্ত্রধারী, ওরা অশ্বরক্ষক, ওরা চর্মবসনধারী। কিন্তু কে শোনে কার সুবুদ্ধি, কোন শুভকথা। গিরিকিশোরীবৃন্দ পুষ্পপ্রাপ্তিতে নৃত্য করে কিরাতকিশোর সঙ্গে সমবেতে আর গীত গায়। ডাক দেয় অকাল বসন্তী, গীত গায় তটিনীতরঙ্গ, বাদ্য বাজায় কাষ্ঠকুট। এমন সুরময়, ধ্বনিময়, রসময় দৃশ্যে কুশবাহী এক মুনি দ্রুত

ভস্মকূট কাছে। কুশস্তম্বখানি মস্তকে স্থাপন করে শুভ্রকেশ মুনি নৃত্য করে 'আনন্দ' 'আনন্দ' ধ্বনিতে। কুশ-কুশীলব সংযোগে সুরময় গিরিবায়ু। সে সুরের উদারায় বৃক্ষপত্রে মর্মরধ্বনি, মুদারায় দোদুল্যমান তমালশাখের বর্বরীবাস, তারায় চঞ্চল ভস্মকূট। সেই অগ্নিসিদ্ধ ভস্মে অচিরেই আবৃত তৃণগুল্ম, বৃক্ষ-বল্লরী, প্রৌঢ়া-অনূঢ়া, প্রবীণ মুনি ও নবীন ধানুকা।

সময় গতে ধীর দৃশ্যমান গিরিশিখর, বৃক্ষচূড়া, বৃক্ষশাখের মক্ষিকাগৃহ, কদলীপুষ্প, মেনকা আদি কামিনী। কণ্ঠও ধীর ধ্বনিময় গৃহমুখী যাত্রায়। কিন্তু আগমন পথের অপ-উত্তাপ হ্রাস কিশোরী মনের কুসুমতুষ্টিতে। প্রৌঢ়া স্বরে সতর্ক বাণী, দারুগৃহ দাহে দিনগতে নবগৃহ কিন্তু বনবাসীকে মন দানে যে অগ্নিযোগ তার না কোন গতি না স্থিতি। অনূঢ়া মন কবে ভবিষ্যে চিন্তামতি। তাই করপুষ্প সুবাসে মোদিত হওয়া প্রতি পদে আর কার্মুক কলবিলাস।

অচিরে গিরিমহিষী সম্ভাষণ অলকানন্দা তীরবাসী বামাদলের। জিজ্ঞাসা বিগত যামের অগ্নিবাণের পরিণতি। মধ্যপ্রহরে আচম্বিৎ তমসবর্ণ চরাচর আর আচম্বিৎ এক অগ্নিযাত্রা গিরিরাজের রম্যকানন মুখে। সে অগ্নির উৎস ঊর্ধ্বে নাকি অধে সে সত্য জ্ঞাত নয় কিন্তু গন্তব্য নিষ্প্রমাদ। শ্মশানবিহারী এক গৃহস্বামীর অবশ্য ভিন্ন ভাষ্য—অগ্নির উৎস অলকানন্দা বারি। অবশ্য গঞ্জিকা-সিদ্ধ গণের ঊর্ধ্বপদ নর্তনীর স্থিতি, তাই সত্যের বদনখানি আবৃত থাকার সম্ভাবনা মায়ারূপ ধূম্র-জালে। কিন্তু উৎস বিপরীত অগ্নিতৃণের লক্ষ কিন্তু ওই রঙ্গগৃহ। কি গতি সে গৃহের? অনূঢ়াদের সমবেত জ্ঞাপন, দারুকীর্তিটি ভস্মীভূত আর সে চন্দনভস্মে সুবাসিত এই দেহ। সে সুগন্ধ এই কপোলে। ভস্মগৃহ পার্শ্বে এক অরণ্য-কিশোর যার তৃণাধারে গোলোককুসুম। সে কুসুমে দেহগাঙ্গে জলতরঙ্গ, তরীদলের উজানযাত্রা।

গাঙটি যখন বিদ্যমান তখন কিবা নব কিবা আদি। তাই অনূঢ়া সঙ্গে প্রৌঢ়াও নৃত্যময় তরঙ্গে। উদ্‌ভ্রান্ত শুধু রাজমহিষী। দারুগৃহ ভস্মের এ-উদ্‌যোগ কার কর্ম কোন কলদর্পীর। হেমন্ত হিমারণ্যে এ কোন দুরাত্মার অশুভ প্রকাশ। রাজমহিষীর জিজ্ঞাসা গিরিরাজ উদ্দেশে কিন্তু পশুপতি হস্তে কন্যা সমর্পণে তিনি কর্মবন্ধনহীন ভ্রমণবিলাসে। উমাপতি মেনকার সখেদ বিলাপ. বিশ্বচরাচরে সকল পতি বিবেচক, বিচক্ষণ, কূটবুদ্ধি আর তার ললাটলিখন মতিভ্রান্ত শৃঙ্গধর। কি কার্যসিদ্ধি এ শৃঙ্গে, এর তুল্যে শ্রেয় ছিল শিলাখণ্ডে মেনকার শিরচূর্ণ।

শিলা নয়, সিংহদ্বারে গিরিরাজের রথ। জগৎ পরিক্রমে সে যানের কোনো কেতুতে জলধিচিহ্ন, কোথাও বালুস্পর্শ, কোথাও বা লোহিত ধূলিবর্ণ। সজীব বিশ্বকলতা আর শুষ্ক পীতসাল-পত্রও রথ মধ্যে। গিরিরাজের অশ্বগুলি তৃণগতি আর সারথী স্থবির, মেনকা রোষ হেমযানখানি তাই এমন বিচিত্র বর্ণ। কিন্তু রথপ্রশ্ন ভবিষ্যে, রথপতির সকাশে তার জিজ্ঞাসা গিরিমালা অবদ্ধনে হেমন্তের বিশ্বপর্যটন কি বোধে কিবা বিবেচনায়। না অশনি না উল্কাপাত অথচ রম্যগৃহ ভস্মীভূত। এবার কি পন্থায় এ-অশুভের বহিষ্কার। মেনকা সঙ্গে কামিনীদল প্রশ্নময় এবং অচিরে হেমন্ত সকাশে প্রাসাদ অন্তরে। অধোমুখ হেমন্ত মগ্নচৈতন্য একখানি অঞ্জনযষ্টিকা নিরীক্ষণ। এ-অঞ্জনে চক্ষুযুগলের প্রতিটি দৃষ্টিনিক্ষেপে নবদর্শন, প্রতিটি দর্শন রসময়, প্রতিটি মণি-যোগ শুভদৃষ্টি। সমতল পরিব্রাজনে হেমন্তের এ এক অচিন্তিত উপার্জন। নিত্য পরিবর্তমান এ-জগতে কিন্তু নয়ন কখনো স্মৃতিময় কখনো ভাবীভাবিত। এ কজ্জলে নয়নাচ্ছন্ন সদা বিদ্যমান নিত্যে, অনিত্যে, নৃত্যে।

নৃত্যটি বাম না দক্ষিণের সে বোধ কি জাগরুক হেমন্তের? মেনকা স্বরে উত্তেজিত গিরিরাজ শৃঙ্গ। তার্মার লোহিত চক্ষু, রুক্ষ দৃষ্টি, পাংশু কেশ আর বঙ্কিম কণ্ঠে ঈষৎ সন্দিহান হেমন্ত। নিশ্চিৎ কোনো বিড়ম্বনা গিরিমালায়। কিন্তু কি সে অভাবিত যে-কারণে এমন রমতৃর্যা মেনকা। কিন্তু সে কারণ ভবিষ্যে বিচার। উপস্থিত এক রাত্রি বিলম্ব আগমনের দোষস্খলন তাই হেমন্ত বাচন, 'গিরিমহিষী, সপ্তদীপা ধরণীতে...।' মেনকা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন জম্বু-কুশ-প্লক্ষ আদি সপ্তদীপ জলধি নিমজ্জিত। সেই সপ্তজলধি প্লাবনে, অদৃশ্য অষ্টকুলাচল হেমন্ত নেত্রে দৃশ্যমান শুধু মেনকার দক্ষিণ কর আর বাসুকী ফণসদৃশ করতল। ফণীরোষে রাজমহিষী উচ্চারণ, 'তুমি সপ্তদীপা ধরণী পরিক্রমার রঙ্গময় আর তোমার রম্যগৃহটি গগনবিহারী ধূম্ররূপে।' দারাবাক্যে গিরিরাজ স্বস্তিবোধে। সপ্তদীপা ধরণী পরিভ্রমণ বর্ণন অন্তে বিগত যামিনীর অনল বৃত্তান্তে গমন করতেন গিরিরাজ কিন্তু মেনকা বড় অধৈর্য, তুচ্ছে অগ্নিময়ী। মেনকার হস্ত অবতারণে আনন্দময় হেমন্ত জাপন, 'কি অভাবিত সে দৃশ্য। একখানি অশনিবৃক্ষ শতসহস্র শাখে বিস্তারিত অন্তরীক্ষে আর সে তাপে স্থবির তটিনী জঙ্গম, কলধৌত গিরিশৃঙ্গ, নৃত্যময় শীতকাতর নাগদল।' বিস্ফারিত নেত্রে মেনকা জিজ্ঞাসা, 'কে সেই কর্মকারী?' সকৌতুক হেমন্ত উত্তর, 'ও অগ্নিযোগ পার্বতী রঙ্গে।' সবিস্ময় মেনকা জিজ্ঞাসা, 'পার্বতী কারণে রম্যগৃহ অনল উদরে। ওহে গিরিরাজ, এ প্রমাদ-প্রমাদ। তুমি নিশাঙ্ক তাই রাজেন্দ্রনন্দিনীর অগ্নিযোগ অপবাদ।' হেমন্ত স্বধর্মে অধোস্বরে বলে, 'না অভিযোগ, না অপবাদ। জামাতা হরজীবনের দক্ষিণ ও বাম নয়নে পার্বতী করযুগের নিবিড় বন্ধন আর সে কারণে হর ললাটনয়নে অগ্নিযোগ।' মুহূর্তে শিখাবতী মেনকা, 'গিরিরাজের হরজীবন বেদিয়া আর ও ললাটনেত্রখানি চিতাবহ্নি। মদনভস্ম পরে অগ্নিযোগ রম্যগৃহে। পর লক্ষ বুঝি শশ্রু মেনকা যার চক্ষু দুটিতে না শূল না বল্লরী, বা জাত তোমার ওই জাদু-বেদিয়া।' মেনকার ক্রোধাগ্নি নির্বাপণে হেমন্ত বলে, 'রম্যগৃহে আর কি উপার্জন, ওহে মেনা। আমাদের রম্যজীবন অতীত আর হর-পার্বতীও গমন করবে কৈলাসে।' পতির 'গমন' শব্দে পরম স্বস্তিতে মেনকা। ও বহ্নি থেকে নিষ্কৃতি পাবে হেমন্ত গিরিমালা। কিন্তু সে যাত্রা কবে?

মেনকা লক্ষে হরগমন কিন্তু হেমন্ত চক্ষে পার্বতীযাত্রাও। হর্ষ ও বিষাদের দুই বিপরীত মুখোমুখি অবস্থান গিরিমালায়।

শব্দার্থ :

কন্দর্প : কামদেব মদন	কামদবৃক্ষ : কামনাপূরক বৃক্ষ	গুঞ্জাফল : কুঁচফল
অর্ক : আকন্দগাছ	খাদির : খয়ের	পিলু : বৃক্ষবিশেষ
ধানুকা : ধনুকধারী	ব্যজন : পাখা	বল্লরী : লতা
কার্মুক : ধনুক	কপোল : গাল	ফণী : ফণধর সাপ

বাসনা জনপদমূলে

অজয় চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশ ঘিঞ্জি এবং ঘিনঘিনে। শ্বাসপ্রশ্বাস সহনীয় করতে সবুজ নাকে মুখে রুমাল চাপা দেয়। দুর্গন্ধে ম ম করছে সংকীর্ণ গলি। রোদ আলো এবং বাতাস প্রবাহে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। ছায়া এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার আধিপত্য সংবৎসর। যুগ্ম আবহাওয়ার দৈন্য মোচন করেছে হৈ চৈ উচ্চকিত নিনাদ। চায়ের গুমটি আছে। চা-পান-বিড়ি বিক্রি হচ্ছে। জ্বলন্ত দড়ি থেকে কেউ কেউ আগুন ধরাচ্ছে বিড়ি-সিগারেটে। হরেক রকম বাহারী চিপস সুদৃশ্য মোড়কে মালার মতো ঝুলছে। হাতের টানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিক্রি হচ্ছে বিবিধ পান মশলা হজমোলা জোয়ানের মোড়ক। ঠাণ্ডা বাক্স আছে। যার ভেতর বিয়ার-হুইস্কি-কোকোকোলার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। অর্ডার আসছে। খিপ্র হাতে মাল পাচার হচ্ছে।

দৃষ্টি ভূমিবদ্ধ করে যুবকটি সাবলীল ঢুকে যায় ঢুলিতে। সার সার ঘর। কোনো ঘরে টালির ছাউনি, পুরনো ঘরে আর সি ঢালাই ছাদ, বিভিন্ন আর্থিক কাঠামোয় গায়েপড়া পর পর ঘর, ছাঁদে ঐক্য নেই। রুচি এবং বৈভবে বৈষম্যের দ্যোতক। ঘরগুলো তৈরীর পর আকৃতিতে এসেছে ইউ ছাঁদ। সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। বাইরে যে দৃশ্য এখানটা তার বিপরীত। অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন। দু-একজনের গলা ভাসছে। সুর চড়া। একজন মহিলা তোলা উনুনে রুটি সেঁকছে। সবকিছু আলগা দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে যুবকটি এক নির্দিষ্ট ঘর তাক করে উপস্থিত।

পায়ে হাওয়াই চটি। কোমর থেকে নেমে এসেছে মালকোঁচা করে পরা মিলের ধুতি। গায়ে হাফহাতা পপলিন মুখ নির্বিকার আর্ট। গলা খাঁকারির নোটিশ দিয়ে উঁকি ঝুঁকির ছায়া ছটফট করে। পর্দা ঝুলছে তাই ভেতরে ঢুকতে দ্বিধা। সে বোঝে ভেতরে সাজের আয়োজন চলছে।

কানের লতিতে ঝুমকো আটকাতে রত চাঁপা, সে পর্দা ফাঁক করে। মুখটা উঁকি দিলে লোকটা বলে,—পাখি এসেছে। তোমাকে খোঁজ করছে।

সংস্কার সংকট। বউনির খদ্দের হাতছাড়া করা মানে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, আবার পরিপাটি না হয়ে রাতপরী হওয়ার অর্থ আখেরে মন্দা বাজার ডেকে আনা। দ্বন্দ্বে চাঁপা দোলাচল। সাতপাঁচ ভেবে সবশেষে ইতস্ততর অবসান। চাঁপা সুধোয়,—পার্টি কেমন? শুড্ডা।

—না, লকক্কা।

—খরচে।

—ড্রেস চেকনাই।

—রুচি?

—বাবু ক্লাস।

তথ্যে খুশি হয়ে নির্দেশ দেয়,—বসা।

প্রসাধনে ঘামতেল পর্ব। এই পর্বে আরসি সঙ্গতা আপনজন। বিরলে, আরসির সামনে পাক দিয়ে দিয়ে নিজেকে পরখ করে চাঁপা। মনে হয় প্রদর্শনযোগ্য।

একমালি অপেক্ষা ঘরে যুবকটি বসে আছে। সস্তা সোফাটাতে হেলান দিয়ে। একজন ফেরিওয়ালা হেঁটে হেঁটে হাঁকছে, মনমোহিনী খিলি বাবু—মনমোহিনী খিলি—যে বয়সে যে খাবে সে সেই বয়সে থাকবে। বাইরে থেকে গলা ভেসে এলো। কে যেন বিকৃত উচ্চারণে গাইছে : পীরিতের একী লীলা মনের আগুন শরীলে ছাপায়।

ধ্বনি তরঙ্গ বার্তা দিচ্ছে ফুটি ফুটি করে বিবিপত্ররা এখন ফুটন্ত। পায়ে পায়ে চাঁপা পর্দা ঠেলে অপেক্ষাঘরে আসে। মদালস স্বরে শুধোয়,—নমস্তে বাবুজী।

চকিত হয় যুবক। মুখ তোলে। দেখে সামনে দীঘল নারী কাঠামো, কঙ্কনপরা দুহাত বুকে স্থির। উঠে দাঁড়ায় সে। প্রতি নমস্কার করে। চাঁপা ডাক দেয়।—ভেতরে আসুন।

চাঁপার পিছু পিছু যুবক খাস ঘরে ঢোকে। দামী সোফাসেটে বসে। বাইরে থেকে ঘরগুলোর আদল যেমন দেখায়, দুস্থ দুস্থ—ভেতরটা তেমন নয়। সম্পন্ন ছাপ আছে। খাট আছে। সেগুন কাঠে বাটালি দিয়ে খোদাই করা শঙ্খলাগা সাপ। পায়ার নীচে ইট দিয়ে খাট উঁচু করা। ভেতরে হরেক জিনিস ঠাসা। জানালায় জানালায় উজ্জ্বল বর্ণ পর্দা ঝুলছে। আলমারি আছে। আলনা আছে। সাজ টেবিল আছে। আসবাবপত্র প্রচুর। রুচি এবং দামে সামঞ্জস্য নেই। জবরজঙ্গ আঙ্গিক স্টীল, প্লাস্টিক, কাঠ, বিবিধ প্রকার কাঁচা মালে তৈরী আসবাব স্থান পেয়েছে। অর্থের যোগান এবং ফ্যাশনের তালে তাল রেখে খরিদ। ফলে সমকাল এবং বিগতকাল মিশ্র রুচির ছাপে স্পষ্ট।

যুবকটির পর্যবেক্ষণ চোটগ্রস্ত।

—বাবুজী মাফ কিজিয়ে। পাঁচ মিনিট সময় চাইছি। ভিক্ষুকের প্রার্থনায় ব্রীড়বদ্ধ মুখ।

গ্রাহক পরিষেবায় ঈষৎ লেট—ওর যে অজুহাত নয় যুবক তা প্রত্যক্ষ করে। সে দেখতে থাকে তার সামনে ঘটে যাচ্ছে আচার। বানিজ্যের সূত্রপাতে লোকবিশ্বাসে প্রসার পরিচর্যা।

অগত্যা যুবকটির নিরীক্ষণে প্রত্যাবর্তন।

একগুচ্ছ কাগজ লুকিয়ে মেয়েটি বাণ্ডিল করে। গোড়া মুঠিতে চেপে ধরে। আগাতে আগুন জ্বালায়। দেওয়াল জুড়ে ফ্রেমে বন্দি বহু দেবদেবীর ফটো। নানান ভঙ্গিমায় কৃষ্ণ ফটোর আধিক্য। রামকৃষ্ণর ফটোও আছে। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পট। তার সামনে তিরতির করে কাঁপছে জ্বলন্ত প্রদীপ শিখা। ছোট কাঁসার থালায় বাতাসা। বাতাসার ওপর মাছি ভনভন করছে। কড়িকাঠে ঝুলন্ত লেপের বস্তা। সিলিং বরাবর দরজার ফ্রেমে সুতোয় গাঁথা গাঁদাফুল এবং পাতিলেবু।

জ্বলন্ত বাণ্ডিল তাপ মুঠিতে চেপে প্রত্যেক ফটোর সামনে প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ শেষ হলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন নেবায়। নিবন্ত বাণ্ডিল দরজার বাইরে রেখে আসে। এবার ফটোর চরণে মাথা ঠোকে। সবশেষে লক্ষ্মীর পালা। লক্ষ্মীর জন্য সময় বরাদ্দ বেশি। চাঁপা গড় হয়। কয়েক পল অবিচলিত মুদ্রা। অসম কাঠাম। নম্র-উদ্ধত প্রবাহ। মাথা নত, পশ্চাৎদেশ উত্তাল। ফলে কলসি পাছার জাহির। পর পর মাথা ঠুকে ছিন্ন করে আচার।

যুবকটির চোখ তন্ন তন্ন খেলছে ঘরের সর্বাংশে। যে বিস্ময় তাকে ধাক্কা দেয় তা হচ্ছে

গৃহস্থের বাড়িতে যে পুঁজিপাটা মজুত থাকে—দামের দিক দিয়ে হেরো হলেও এখানেও সেই সম্ভার।

ফুরসত পেয়ে হাঁপ ছাড়ে চাঁপা। মুখ তোলে। ভাপে নাকের ডগা, গাল ও ঠোঁটের ওপর অস্পষ্ট গোঁফের রেখায় দানা দানা ঘাম। ওড়নার খুঁট চেপে চেপে চাঁপা জমা ঘাম মোছে। শোষণে মুখ ঝকঝকে হয়। চাঁপা বসে। যে গদিআঁটা চেয়ারটা মুখোমুখি বসবার। বকবক শুরু করে।

—এখন আমি ফুললি অন টিউটি। বলুন কী আনাব। বীয়ার না হুইস্কি।

—যা খুশি।

—হুইস্কি হোক। অ কানাইদা—আ...। হাঁক পাড়ে।

সেই গোল নির্লিপ্ত মুখ উদিত। যুবকটির দিকে চোখ রেখে কানাইদাকে নির্দেশ ছোঁড়ে।—সিগনেচার আনো। যোগ করে ফলাফল ব্যাখ্যা।—মাইল্ড কিক। মৌতাত চারিয়ে দেয় কোষে কোষে ধীর গতিতে। আমেজ টেকসই হয় অনেকক্ষণ। হলে শুধোয়,—ফুড কী আনবে—কাটলেট, চিলি চিকেন আর পকোড়া।

নিস্পৃহ জবাব।—যা খুশি।

অর্ডার হয়ে গেছে। কানাইদা অপেক্ষায়—। চাঁপা যুবকটিকে ইশারা করে কেনাকাটার খরচ দিতে।

যুবক পার্স বের করে। নোটের ওপর আঙুল স্থির। খরচ ধার্য হয়েছে কত জানতে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

—চারশো। চাঁপা অংক ঘোষণা করে।

নোট শুনতে শুনতে যুবকটি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়। শরৎচন্দ্রের বারবনিতা হলে এমন মুখফুটে টাকার কথা পাড়ত না। টাকা হাতে পেয়ে কানাইদা চলে যায়।

ফার্স্ট রাউণ্ড জয় পেয়ে চাঁপা উৎফুল্ল। জয় বৈকি। কারণ পানীয় এবং ভোজ্য মোটা অংকের বিক্রিবাটা হলে নাফা। বন্দোবস্ত মোতাবেক মোট বিক্রির ১০ শতাংশ তার প্রাপ্য। এটা উপরি আয়। অর্ডার পর্ব চুকে যেতে গ্রাহক মজাতে আসর উজ্জ্বল করতে চাঁপা চতুর আলাপ ধরে।—ইস্ আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি।

—আমি কামাক্ষী প্রসাদ ভাদুড়ি।

—নাম ভাঁড়াচ্ছ।

—মাইরি বলছি জন্মগত। পুরসভায় রেজিস্টার্ড। অফিসের হাজিরা খাতায় টোকা আছে।

—নামটা খটমট। কিন্তু ভারি সুন্দর লাগছে শুনতে। মানে কী—।

—সুন্দর নয়ন।

—বাঃ। নামের সঙ্গে চোখের মিল আছে। চাঁপা তারিফ করে।

—ধ্যাৎ। আমার চোখ ছোট। কটা। লাজুক আপত্তি জানায় কামাক্ষী।

—ধেড়ে ছেলে। প্রশংসা শুনতে খুব লোভ। তবে শোন তোমার চোখে ভাষা আছে।

ইত্যবসরে কানাইদা হাঁটি হাঁটি পা পা হাজির হচ্ছে। তার হাতে ঢাউস ট্রে। বরণডালা ভঙ্গিতে বহন করে আনছে। কাছাকাছি এসে ঝুঁকে নীচু টেবিলে ট্রে-টা রাখে। ট্রের ওপর মদের

বোতল জলের বোতল কাচের দুটো কাটগ্লাস। সেউ, বাদাম ভাজা সহ অন্যান্য ভোজ্য শোভা পাচ্ছে। নেশা সুখের উপাচার টইটম্বুর। পরিবেশ ফুটে ওঠার প্রেরণা প্রস্তুত।

চাঁপা উদাসী হয়। ট্রে-র দিকে হাত বাড়ায়। প্রথমে মদের শিশিটা তুলে আলগা দৃষ্টিতে লেবেল পড়ে। পড়ে ছিপি খোলে। কাত করে দু ইঞ্চি মতো ঢালে উভয় গ্লাসে। বোতল কাত করে জল পাইল করার প্রাকমুহূর্তে ঘাড় তেরছা করে। দৃষ্টি ড্যাবড্যেবে হয়। শুধোয় :—জল বেশি না কম।

—বেশি। শুনে মাহ্‌ চোখ গ্লাসে রেখে জল ঢালতে থাকে চাঁপা। বিশ্রামান্ত বৃষ্টির টুপটাপ ধ্বনির প্রপাত। এছাড়া অপার নিঃশব্দ। মদেজলে পূর্ণ হচ্ছে গ্লাস। একটা গ্লাস বাড়িয়ে দেয় কামাক্ষীর দিকে। কামাক্ষী গ্লাসটা নেয়। চাঁপা বলে,—চিয়ার্স।

প্রতিধ্বনি হয়,—চিয়ার্স।

মদজলে মিলমিশ হলে শুরু হয় পানাসক্তি। প্রথম রাউন্ডে উৎসাহের তোড় থাকে। ঘন ঘন ঢোক ঢোক চুমুকে নিঃস্ব হতে থাকে উগ্র তরল। দ্বিতীয় ক্ষেপে ছন্দ ভিন্ন। ধীর চুমুকে উগ্র তরল ক্ষয়িষ্ণু। প্রলম্বিত চুমুক হলেও দেখতে দেখতে গ্লাস শূন্য হয়।

কামাক্ষী লক্ষ করে ঢোক গেলার সময় এবং টেবিলে গ্লাসটা ঠক করে রাখার সময় চাঁপার মুখের রেখা বিকৃত হচ্ছে। কষ্টে যেন ব্যথাতুর হচ্ছে মুখশ্রী। কামাক্ষীর বোধে ছলাৎ করে একাগ্রকার অনুভূতি। কষ্ট বোধ হয় এমন বিধ্বস্ত অনুভব কোনো শরীরে একবার ঘাঁটি গাড়লে আর সরে না। অস্তিত্ব হয়ে ফুটবেই।

চাঁপা দেখল কচি বাঁশপাতার মত সবুজ ছাউনির গাল আলোড়িত। বাঙময়।

—আমার খুব ইচ্ছে হয় জানতে এ লাইনে কী ভাবে এলে। কেমন করে কাটে দিনরাত। দ্বিতীয় দফা ঢালতে ঢালতে চাঁপা ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে। মেরেছে। এযে দেখছি কাঁচা পিস। না ছোকরা না প্রৌঢ় বয়সীরা ভোগায় বড্ড। সময় নেয় প্রচুর। আরে বাবা এসেছিস খা-দা। যা করবার চটপট কর। তা না ভ্যাজ ভ্যাজ। সময়ের অপচয়। একজনকে নিয়ে বহুক্ষণ নয় বহুজনকে দিয়ে কিছুক্ষণ বরাদ্দ হচ্ছে লাইনের গূহ্য সিলেবাস।

চাঁপা বিরক্তি হজম করে। নিরুত্তর থাকে। উত্তরের বাঁধা ছক নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ক। মেলার ভিড়ে কেউ ফুসলে নিয়েছে। খ। অভাবে বিক্রি করে দিয়েছে বাবা। গ। একজনের প্রেমে পড়েছিল। সে প্রেম নিল না। ব্যবসায় নামাল।

বিবিধ ফাঁদের কাহিনী এদিক ওদিক করে দুঃখের পুরে চুবিয়ে সেল করলে চড়া দাম পাওয়া যায়। দেবে না—কি বেদনার বারমাস্যা গলগল করে উগরে—। মুনাফা লোটা যাবে ঢের।

চাঁপা প্রসিদ্ধ চল এড়ায়। দু হাতে জড়ো করে কোলের কাছে আনে।

বলে,—আমি হচ্ছি জন্ম বেদেনী। মনটা সদাই উড়ু উড়ু! কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারিনা।

না সংগীত। না আবৃত্তি। খিচুড়ি স্টাইলে উচ্চারণ করে :

ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কৃপায়।
মা নাই বাপ নাই, নাই সহোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেন ভেসে বেড়াই।

কী ঢাকনি রে বাবা। কোন তথ্য ফুটে ওঠে না। এ শুধু আমির আবরণ। অঙ্গ ঈষৎ ঢলঢল। মৃদু দোলনে প্রচুর মাই কাঁপছে। হতে পারে পেশাদারী ভঙ্গি। সবই ছলনা। তবু আঙ্গিকের বৈচিত্র বেশ লাগছে দেখতে। মনটা ভরাট হচ্ছে। হক অর্থের যোগানে শোভার অনুদান—তবু কী পাওয়া যায় আপন স্ত্রী পরাধীন নারীর কাছে? সংসার কী সেই বিচরণ-ভূমি উপভোগের বিকাশ যেখানে অবাধ?

পান আসরের রীতি হচ্ছে প্রথমে খেপে চুমুক ঘনঘন। দ্বিতীয় খেপে বিলম্বিত। ক্রস্ততা—মন্থরতার সফরি। এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের ঘোর। শ্রান্ত অভিমুখ, তাড়া নেই, ধীর চুমুকে নিঃস্ব হচ্ছে গ্লাস।

কামাক্ষী লক্ষ করে চাঁপা উসখুস করছে। মাঝে মাঝে বাইরে যাচ্ছে। ফিসফাস কথা ছিটকে আসছে। চাঁপা সুস্থির হয়ে বসতে, প্রশ্নের স্রোত কামাক্ষীকে ঠেলে দেয়।

—গ্রামের বাড়ি—মায়ের আদর—গাব গাছে লুকোচুরি—পুকুরঘাট—গোপনে নভেল পাঠ—সখীদের সঙ্গে খুনসুটি; এ সব মনে পড়ে। কষ্ট হয়।

হয় না আবার। চকিতে চাঁপা মনে বাঁধ দেয়। উন্মনা হয়েছিল বৈকি। নিমেষে রাশ টানে। লোকটা দেখছি বড্ড ভোগাচ্ছে। বংশের গাভু পয়দা, পেটের ভেতর সরস্বতী খালি হাম্বা হাম্বা করে।

চাঁপার মনস্তাপ আসে। কিন্তু মাথা নোয়ায় না, ভাবে থাকে। যে আছো অন্তরে। সময়ের হিসেবে যুবকটির অস্তিত্ব বাসি, অথচ এখন শব্দের খাঁচায় সাঁতার দিচ্ছে। অর্থাৎ চাগছে না। চাঁপার ধিক আসে। বিভঙ্গ...শব্দ থেকে কাম, উত্তরণের এই যে দীর্ঘক্ষণ...। তার মানে উদ্দীপনা সঞ্চারে পটুত্ব ভোঁতা। এর মধ্যে সে কী হয়ে যাচ্ছে না অপমানিত অংশ।

হায় বোধ উদ্ভ্রান্ত করতে প্রেরণা জোগাতে চাঁপা উদ্বুদ্ধ হয়। কামাক্ষীর গা ঘেঁষে পাশে বসে। ঢলানে হয়। বাসনা গরম করা। ঘনিষ্ঠতা ফল দেয়। অঞ্জলিতে মুখটা টেনে কামাক্ষী চুমু দিতে উদ্যত—এ হেন কালে দরজায় ঠেলা এবং উঁকি দেয় গোল মুখ। গলায় ঝোলান ফুলের ডালি। হাত কপালে ঠেকায়,—রাম রাম বাবু, বেল-যুঁই-গোলাপ সব ফুল—মালা আছে। খোঁপায় পরান। গলান ঝোলান। হাতে জড়ান।

চাঁপা সর্বে পায়ে ধেয়ে যায়। মালা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। গন্ধ শোঁকে। দুটো মালা নিয়ে হাতে রাখে। খরিদ করে। মালাকার অপেক্ষায়। চাঁপা কামাক্ষীকে চোখ মারে। কামাক্ষী ইঙ্গিত আঁচ করে। শুধোয়।—কত?

—আশি। মালাকার দাম হাঁকে।

পকেট থেকে পার্স বের করতে করতে কামাক্ষী বিস্ময় ঝরায়।—সে কী? এত?

—ফুলের দাম আগুন, লগন চলছে।

চাঁপা সমর্থন জোগায়।—তা ঠিক। এখন জোড় লাগার সিজন। কাকতাড়ুয়ার মত হাত নড়ে চাঁপা মিটিয়ে দিতে ইশারা করে।

ছোট নোট বাড়ন্ত। অগত্যা একশোর একটা নোট বাড়িয়ে দেয়। মালাকার কপালে হাত ঠেকায়। অর্থাৎ লেনদেন চুকল। ফেরুত বলে কিছু নেই।

গচ্ছা। মনে মনে কামাক্ষী রুষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ মানে অসন্তোষের খাল কেটে তিক্ততার কুমির বয়ে আনা। আখেরে লস। তার চেয়ে কামাক্ষী শ্রেয় মনে করে :

আমার হরিনামে রুচি
কারণ পরিণামে লুচি।

উসুলে ঘাটতির পরিণাম ভেবে ধামা চাপা দেয় অর্থ দণ্ডের খিঁচ। ঝোঁক দেয় ফুল নিয়ে চাঁপা কোন খেলা খেলছে দেখার। খোঁপা বা বিনুনির চল অস্তাচলে। পার্লার দিদিমণির হস্তশিল্পে থোকা থোকা চুল ঘাড় অবধি এসে লুটোপুটি। আঙুলের পাকে পাকে মালা চুলের ভাঁজে ভাঁজে গুঁজে দিচ্ছে। মুখ নীচু করে একটা মালার গন্ধ শোঁকে। ঘ্রাণ নিয়ে টেবিলে রাখে। ফাঁকা ঘর। বাইরের বুট আড়াল করতে দরজা বন্ধ করে চাঁপা।

আবগারি ক্রিয়াকর্ম শেষ। মহলা পরিপাটি। ত্বক চর্চার উর্বর ক্ষণ প্রস্তুত। তবে কেন অপেক্ষা। অপেক্ষার তর সইছে না চাঁপার। এই পাট চুকলে তার ছুটি। ছুটি মানে একজনের কাজ থেকে ছুটি। তারপর আর একজনের কাছে নিয়োগ। বকেয়া রাত যদি হয় শুভরাত তো সারারাত চলবে চড়ানোর পালা। কামাগ্নির ইন্ধন যোগাবে এই দেহ। চেয়ার ডিঙিয়ে চাঁপা খাটে বসল, পা ঝুলিয়ে। গ্রাহক মজাতে পরিবেশ রসস্থ করতে চাঁপা চপল আলাপের পথ ধরে।

—নাচ দেখবে।

নাচ? তার মানে হিন্দি ফিল্মের সিডি সিডি প্লেয়ারে চাপিয়ে শরীরী হিল্লোল। ভাবা যায়।

কামাক্ষী আপত্তি জানায়।—না।

—গান শুনবে। রবীন্দ্রসংগীত ভালবাস।

—বাসি। যদি তা দূর থেকে ভেসে আসে।

এড়িয়ে যাওয়ার তাল আন্দাজ করে চাঁপা চাপ দেয়।—যদি কাছে বসে গাই।

কথা ও সুর নিয়ে সে হবে এক বীভৎস কচলাকচলি। কামাক্ষী বলে।—না।

—নাচ দেখবে না। গান শুনবে না। ফষ্টিনষ্টির দিকে খুব যে ঝোঁক তাও মালুম হচ্ছেনা। তুমি কেমন নাগর গো—।

কামাক্ষী নিরুত্তাপ।—বোস না। অত তাড়া কীসের

রগড়ে চাঁপা চলে। ঢলাঢলিতে সর্বাঙ্গ উত্তাল হয়। লাস্যময়ী হয়ে বলে,—গদ্য পদ্য মদ্য নিয়ে আমাদের কারবার। তুমি সেবা নিচ্ছ না।

পরিষেবা নিতে গ্রাহক উদাস, সে আছে ভাবের ঘোরে, শোয়ার খেলা দূর অস্ত। ওদিকে সন্ধ্যা অবক্ষয়ে। চিন্তার খোরাক বৈকি। চাঁপা আনচান করে। পুরুষটিকে জাগাতে সক্রিয় হয়। সহসা কামিজ খসায়। লটপটে সালোয়ার নিম্নাঙ্গে। অন্তর্বাস ছাড় দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গে ব্যাপক ছাড়। উলঙ্গ ত্বকের ধু ধু বিস্তার। আঙুলে আঙুল জড়াজড়ি করে খাজুরাহ, ভাঁজ করা হাত স্তন বিভাজিকায় এনে ব্লাউজের হুকে ঠেকায়, কটাক্ষ হানে। প্রশ্নবোধক হয়।—খুলি?

যৌবন হাট। হলে কী। আবেদন নিষ্ফল, পুরুষটি কাবু হয় না, অনাসক্ত, চাঁপার বিলাপ আসে ভাবে কী লাভ। এও যে ছলাকলা। সেপ্‌টি প্রশ্রয়। যদি না পুরুষের আড় ভঙ্গ করতে সক্ষম।

পরাজয়ে চাঁপা আর্ত। তবু রণচ্যুত হয় না। গোঁয়ার হয়। যৌন সত্তার যতটুকু আছে সবটুকু মেলে ধরে। বিছানা তাক করে লাস্য আহ্বান জানায়।

—এস, রাস করি।

ফন্দন খাঁ খাঁ।

চাঁপার ধৈর্য গলে। বিয়ন্ত বাঘিনীর মত গর্জায়,—তোমার কি গতর নেই। তুমি মরদ নও। না-কী খোজা। কেন আস এখানে। রাশি রাশি খেদ ওথলায়।

পৌরুষ নিয়ে ধিক্কার কামাক্ষী উপেক্ষা করে। প্রশ্নের দিকটা মান্যতা দিয়ে জবাব দেয়।—আমি আসি গল্প করতে। গল্প শুনতে। মৌতাত উপভোগ করতে।

প্ররোচনামূলক জবাব, চাঁপা ক্ষিপ্ত হয়। চকিতে অন্য একপ্রকার সন্দেহ মনে দানা বাঁধে। নিম্নাঙ্গ লক আউট রাখার উৎস কী বিশেষ আতঙ্ক। অনুমান উদ্‌গার করে চাঁপা।—ভয় পাচ্ছ। এড্‌স্ হবে। দূর বোকা। বুলাদি আছে না। মজাসে ফূর্তি লোটো—আচ্ছাসে কন্ডোম লাগাও। বিপদ বুঝলে টোল ফ্রী কল ১০৯৭ আছে। ফূর্তিতে কাঁচি কন্ডি নেহি।

কথার খেলা বহতা। তবু অন্তর্গত পীড়নে চাঁপা ছটফট করে। প্রতীক্ষা কাতরতায় উন্মনা হয়। ভঙ্গি যে ভাল নয় টের পাওয়া যায় দরজায় টোকা পড়তে। ত্রস্তে চাঁপা এগিয়ে যায়। দরজা ফাঁক করে মুখ গলায়। ফিসফিস কথা চালাচালি হয়। ফিরে আসে। বলে,—বাইরে পার্টি অপেক্ষা করছে। ঝটপট যা করবার করো।

গলা ধাক্কার ইশারা। ব্যক্তিত্ব আহত। কামাক্ষী ফোঁস করে।—সে কী। আমি তোমায় বুক করেছি। আমার পালা চুকলে অন্যজন ছাড়পত্র পাবে ঢুকতে। উল্টো হলে চুক্তি খেলাপ।

চাঁপা অবিচলিত। প্রাঞ্জল করে অবস্থান।—না, চুক্তি ভঙ্গ হয়নি, যে আসছে সে তৎকাল পার্টি। তোমরা আস আলেকালে। সৌখিন খদ্দের। এস জন বস জন। রোজকার খদ্দের ভাতকাপড় যোগায়। তারাই জাতি—তাছাড়া আপতকালীন ব্যবস্থাও আছে। সেক্ষেত্রে মূল্য বিপুল। খাঁই চড়া। রোজকার খদ্দের খোরাকি আর তৎকাল খদ্দের পুঁজির যোগানদার। এখানে থোক বলে কিছু নেই। টোটাল মজার কোন প্যাকেজ নেই। পিস মিল সিসটেম। মিল সিসটেম চালু আছে হাড়কাটা গলিতে। আড্ডা—খানাপিনা—স্ট্রোক প্রত্যেক পদের জন্য এক এক রেট। ফূর্তি ভাগ ভাগ করে বেচা হয়। যার যেমন সামর্থ ও চাহিদা সে সেই অংশ কেনে। আমোদ বাবদ তৎকাল খদ্দেররা নর্মাল রেটের চেয়ে তিন গুন বেশি দাম দেয়। জামাই আদর পাওনা বৈকি। ব্যবস্থার মধ্যেই তারা খাপ খাচ্ছে। চুক্তি ভঙ্গের দায় নেই।

কামাক্ষী থ। বিস্ময়ে নিনাদিন করে।—তৎকাল, এখানেও তৎকাল। স্ট্রেঞ্জ।

—হ্যাঁগো মশাই। হ্যাঁ। এখানেও জরুরী বিভাগ আছে।

অর্থাৎ তৎকাল খদ্দের উদয় হলে গণ খদ্দের পঁচন, কামাক্ষীর বোধগম্য হয় টক এড়াতে সে ঠাঁই নিয়েছে তেঁতুলতলা।

॥ তিন ॥

থানার বড়বাবু এত্তেলা পাঠিয়েছেন। ডাক উপেক্ষার নয়। তোলা নিয়ে হিসেব নিকেস নয়। টুলির অস্তিত্ব নিয়ে বৈঠক। সুতরাং গরহাজির মানে নিজের পায়ে কুড়ুলের ঘা।

সুড়কি বর্ণ। দেওয়ালে আস্তর নেই। পয়েন্টিং করা বাড়ি খানেই থানা বাড়ি। থানার সামনে রিক্সা থেকে মাসি নামে। গেট সর্বদাই খোলা। বাঁধান উঠোনে পা রেখে থপথপ পায়ে মাসি এগোতে থাকে। বড়বাবুর খাস কামরার কাছে এসে থমকায়। দরজা খোলা। মাসি ইতস্তত করে ঢুকবে কী ঢুকবে না। দেখে বড়বাবু নাকের গর্ত থেকে লোম ছিঁড়তে মগ্ন। হাঁচি আসে। হাঁচি সেরে মুখ তুলতে নজর কাড়ে মাসি। সাথে সাথে টেবিলে থাবা পড়ে।—পড়ন্তি বয়সে চাকরি খোয়াব? ঘটিবাটি বেচে পথে দাঁড়াব এই চাও।

মাসি অবিচলিত। গায়ে কড়া ইস্তিরির উর্দিপরা থাকলে প্রার্থীদের রোয়াব দেখান চালু প্রথা। আইন বলবত রাখতে আইনকে কলা দেখাতে তোলা আদায়ের ফিকিরে দাপট। চেনা আছে।

—বোস। কথা আছে।

মাসি বসতে দারোগা বলেন,—কেস জন্ডিস, চাপ আসছে টুলি কেন টিকে আছে? ঝাঁপ কেন খোলা? যেকোন দিন টুলি গুঁড়িয়ে যেতে পারে। পুঁজিপাটা যা আছে সরাবার সুযোগ পাবে না।

—আমরা এক হয়ে যদি প্রতিরোধ করি।

—কোন লাভ হবে না। প্রতিরোধে প্রমোটারের একগাছি বালও ছেঁড়া যাবে না।

কপাল পুড়বে। মাসির কপালে ভাঁজ পড়ে।—পেট চলবে কী করে।

—তা ঠিক। দুনিয়াটা চলছে পেট আর পেটকা নীচের খেলায়।

মসকরা মাসিকে আলোড়িত করেনা। সংকট বোধহয় চরিত্রে ভাবুকতা দান করে। শ্রান্ত স্বরে মাসি শুধোয়,—কী করা যায় বড়বাবু। কিছু তো একটা করা দরকার। তরী কূলে ভেড়াতে মাসি উৎসুক।

আদবানী গোঁফে বড়বাবু হাত বোলাতে থাকেন। তার চিন্তাতে সহানুভূতির ছায়া। গূহ্য কারণ হচ্ছে গঠন এবং লোপ উভয় উদ্যোগের খেলাটা ওপর মহলের। সেই খেলায় থানার কোন ভূমিকা নেই। তার অবস্থান স্বার্থবিযুক্ত। দারোগা নিরপেক্ষ পরমার্শ দেন,—টুলি উচ্ছেদ নিয়তি, এলাকার বাবুসমাজ সামাজিক পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রজেক্ট তৈরী হয়েছে, বিবি বাজার ধ্বংস হবে। ভগ্নস্তূপে গড়ে উঠবে বহুতল বাড়ি। গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান, এ টি এম, ক্লাবঘর, গ্যারেজ থাকবে। দোতলায় দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, সরকারী অফিস বসবে। তিন আর চারতলা আবাসন। আমি বলি কী,—বলে তিনি থেমে যান।

মাসি খেই ধরায়,—বলুন কী বলছিলেন।—এম এল এ-র সঙ্গে দেখা করো। উনি জনদরদি। তোলাবাজ উঠাইগিরি নেতা নন। জনকল্যাণ দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। ওপর মহলে ওঠাবসা আছে। একটা কিছু উপায় বাতলে দিলেও দিতে পারেন।

মাসির ত্রাস যায় না।—যদি বলেন উঠে যাও। তখন?

—তাহলে বুঝবে অন্য কোন উপায় খোলা নেই। বিচক্ষণ মানুষ। দরিদ্রের সেবা তার ধর্ম।

মাসি সংশয়ী।—কিন্তু ভদ্রসমাজের চাপ আছে। ভোট আছে। টাকার খেলা আছে। আমাদের দিকটা যদি পাত্তা না দেন।

—দেবেন। গরিবদের প্রতি তার নজর আছে। যদি এমন হয় জনস্বার্থ এবং টাকার চাপে

বিবিপাড়ার ভোগে যাওয়া বিধিলিপি সেক্ষেত্রে উৎখাত বিনিময়ে মোটা ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করবেন।

মাসির জিজ্ঞাসা তবু রয়ে যায়।—উৎখাত হলে আমাদের যে কী হবে।

—কী আর হবে। গাঁয়ে তোমার একটুকরো জমি আছে। যা সঞ্চয় আছে সোনায় নগদে তা দিয়ে এক কামরায় কোঠা ঘর হবে। ক্ষতিপূরণ বাবদ যা পাবে আর পড়ে থাকা জমা টাকা সব জড়ো করে এম আই এস স্কিমে ভরে দাও। মাসিক সুদে মাসকাবারি ভাতকাপড় জুটে যাবে। একটা তো পেট—তাও আমিষাশী। দুবেলা দুটো ফুটিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে ড্যাং ড্যাং কেটে যাবে দিন—আর মেয়েগুলো—ওরা যে কে কোথায় ভেসে যাবে। মাসি শঙ্কা ফোটায়।

বহু ঘাটে জল খাওয়া দারোগা বিজ্ঞ হাসি হাসেন।—Self preservation is the first law of the Nature. মাসির ভ্যাবাচাকা মুখ লক্ষ করে তার জ্ঞান হয় মাসি ইংলিশে উইক। তৎক্ষণাৎ বাংলায় তর্জমা করে দেন।

—আগু রাইখ্যা ধর্ম,

তবে পিতৃকর্ম।

—একসঙ্গে বহু বছর সুখে দুঃখে লেপটে আছি। মায়া পড়ে গেছে।

—ঢং। লঙ্কায় রাবণ মলো। বেহুলা কেঁদে রাঁঢ় হলো। আরে বাবা ওরাও কিছু বখরা পাবে। বখরা নিয়ে লেবুতলা ছেড়ে অন্য কোন খেঁজুর তলায় ডেরা বাঁধবে। শরীর আছে। যেখানেই যাবে সঙ্গে নাভি যাবে। নাভির নিচে যা আছে ভেঙে ভেঙে খাবে।

আদিরসাত্মক মজলিসি রগড়। জমে যায়। কিন্তু মাসির মুড অফ। সাড়া নেই। ওসি-র বাচাল পরামর্শর বাণীতে,—এম এল এ-র কাছে ধর্না দাও। এমন কাউকে নিজেদের মধ্য থেকে মুখিয়া করো যে বলিয়ে। পেটে বিদ্যে ধরে। ছলাকলায় পটু। চালাক চতুর। গেরস্থ ভাব আছে দেখতে। কাজ হবে। বলতে বলতে চেয়ার থেকে পাছা বিচ্ছিন্ন করেন। ইঙ্গিত এবার এস।

॥ চার ॥

ছিন্নমূল হবে, আতঙ্কের ছায়ায় এক বিহ্বল সমাবেশ। সংগঠক নিজেরা। শ্রোতা নিজেরা, মঞ্চ নেই। সভাপতি নেই। সঞ্চালক নেই। এমনকী নোটিশ জারী হয়নি। শুধু মুখে মুখে চাউর। তাতেই রেন্ডিটুলিতে আজ ধর্মঘট। কামাই বনধ। সকলে জড়ো হয়েছে সভার আকারে। এমন কেউ নেই যে গরহাজির। মুখগুলো বাকরহিত এবং থমথমে। বধিরতা দান করেছে রাগ বিদ্বেষ ছাপান এক সমৃদ্ধ বিবাদ। দলবদ্ধ ভাবে মেয়েরা এবং পেশার অনুষঙ্গ হিসেবে জড়িত কিছু পুরুষ ঘিরে আছে মাসিকে। শলা পরামর্শ হবে।

সন্ধ্যে থেকে রাতভোর মূল ফটকে টুলের ওপর বসে থাকে এক প্রহরী। তার হাতে বুকের ওপর আড়াআড়ি ধরা থাকে লম্বমান বাঁশ। তেল চকচকে বাঁশের ফলা লোহায় বাঁধান। প্রবেশের মূল দরজা বন্ধ করে খালি হাতে সে-ও সভায় হাজির।

রিপোর্ট পেশ, প্রস্তাব পাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ—আনুষ্ঠানিক কিছুই হয় না। অথচ ছাড়া ছাড়া কথাবার্তায় বোঝাপড়া হয়ে যায়; প্রকল্প স্থির। মাসিকে উন্মনা দেখে রেখা তাড়া দেয়।

—ও মাসি কী এত ভাবছ।

—ভাবছি যাবি কোন চুলোয়।

কলকল করে সমাবেশ।—সে পরে ভাবব। এখন থাকব তোমার চুলোয়।

কর্মসূচী নিয়ে কিছুক্ষণ মত চালাচালি হয়। শেষে সাব্যস্ত হয় সকলে একসঙ্গে যাবে। ভেতরে ঢুকবে চাঁপা। চাঁপা প্রতিনিধি হয়ে দাবী জানাবে।

চাঁপা আপত্তি জানায়, আপত্তির ভাষা হিসেবে হাত পা ছোঁড়ে। ধ্বনি ভোটে আপত্তি ধোপে উড়ে যায়। চাঁপা নির্বাচিত মুখিয়া।

অন্য সব মেয়ে নাকচ। চাঁপা গৃহীত কেন? কারণ আছে। চাঁপা বলিয়ে। পেটে বিদ্যে আছে। রসিকা। আনুষঙ্গিক যোগ্যতা আছে। যেমন মেজাজ ফুরফুরে থাকবে দু এক কলি গেয়ে দেয়। হক ভারত নাট্যমের অপভ্রংশ তবু প্রয়োজনে নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম, ছলাকলায় পটু, সর্বোপরি বিভঙ্গ প্রিয়বরেষু। ঈদৃশ গুণে চাঁপা প্রসিদ্ধ। ফলে যখন সময় আসে অন্য মেয়েদের ব্যবসা ঢিলে, চাঁপার ঢগবগে। এমনকী মন্দার চাপে কারো কারো স্বেচ্ছাবসরের দিকে ঝোঁক। কেউ কেউ ঝাঁপ বন্ধ করে ঝিগিরির কথা ভাবছে। চাঁপার কারবারে লক্ষ্মী স্থির। গ্রাহক আনুকূল্য মাগনা নয়। পুরুষরা বৈধ নারীর কাছ থেকে সভ্য আদব জর্জরতায় যখন ক্লান্ত, অবদমন পীড়নে প্রবৃত্তি হাঁসফাঁস, বক্র আকাঙ্ক্ষায় কোষ ব্যোমে উথাল পাথাল, অনুশাসন পিঞ্জর থেকে বিধ্বস্ত সত্তা সন্ন্যাস নিতে আঁকুপাঁকু। প্রার্থনা হয় উদার আশ্রয়। লজ্জাঘৃণাভয় বিজয়িনী নারীর আশ্রয় হয় শস্যশ্যামল চর। এই ক্ষণে চাঁপার শুশ্রূষা অনবদ্য উপশম। হাহাকার বা উপোস ভঙ্গে চাঁপার শরণার্থী হলে যদিবা পকেট রিক্ত হয়; মনে করে না ঠকেছি।

সবদিক খতিয়ে চাঁপাকে নির্বাচন বিবেচনাপ্রসূত। দ্বিতীয় এবং শেষ এজেন্ডা গান, বিনোদন, আতঙ্কের প্রতীক্ষা। তাতে কী। রুক্ষ জীবন শিল্পের লাবণ্যে মাখামাখি হয়ে। থাকে টিকে থাকার প্রেরণায় সঞ্জীবনী।

খোল করতাল হারমোনিয়াম তবলা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বসে যায় গায়েনরা। শিল্পী সম্প্রদায়ে নর প্রাধান্যে। একজন নারী, গায়েন গান ধরে, "ধনী তোমারে কি ভোলা যায় গো"—।

লাইনটি গেয়ে গায়ক ক্ষণিক অবসর দেয়। অবসর ছিন্ন হয় সেই লাইনটির জোটবদ্ধ ধুয়োয়। বিরতি। বিরতি খণ্ডন করে মূল গায়েন অন্য লাইন ধরে।—আকাশের তারা বর্ষার ধারা ধনী তোমারে কি ভোলা যায় গো—বিরাম। ফের ধুয়ো।

ঝুমুর গান। এই গানে কাঁসর ঘণ্টা বাহুল্য। তবু ঠাঁই পেয়েছে। এক বালক ঘুরে ঘুরে কাঁসর বাজাচ্ছে। সুর এবং কথার ফাঁক ভরাট হচ্ছে কাঁসর ধ্বনিতে। সুর এবং যন্ত্র বাতাসে অশ্রান্ত তাণ্ডব চালাচ্ছে। টাকমাথা, চুলমাথা, কালোমাথা, সাদামাথা বিপুল আবেগে দুলছে। বিপন্ন মাথার ঝাঁকড়া চুল উড়ছে। টাক ঘামছে।

দলপতি হওয়ার পর চাঁপা উদ্বিগ্ন। বুকটা ধুকধুক করছে। দায়িত্ব পালন বা আস্থার মর্যাদা রাখতে পারবে তো। এতো আর আবোল তাবোল মন মজান বকা নয়। শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে ভদ্রভাবে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হবে। সাজিয়ে গুছিয়ে দাবী পেশ করতে হবে। আদায় করতে হবে সুরাহা।

শক্ত প্রশ্নপত্র হাতে পেলে যেমন হয়, ছাত্রীসুলভ বিমূঢ় হয় চাঁপা। অজ্ঞতার ভারাক্রান্ত। বিষাদে গ্রস্ত। অবশ্য দুঃখময় মুহূর্ত স্থায়িত্ব পায় ক্ষণকাল। বিষাদ হাঁটি দিয়ে হর্ষ দখল নেয় অন্তর্লোক। ক্ষুন্নতার গোড়ায় রস যোগাচ্ছে এক সন্ধ্যার পটভূমি।

রাজীব গান্ধী মারা যাবার পর যে ভোট আসি আসি—। বরোড় মাঠে মজা। ভদ্র পাড়া আর বিবিপাড়ার সন্ধিস্থলে। মাঠ থৈ থৈ মানুষ, ভদ্র পাড়ার ভোট বাঁধা। ভোট কুড়োনিদের এখন লক্ষ্য বিবিপাড়ার সব ভোট চেঁছে কুড়োন। সাধারণ আলোচনা সেরে বক্তা বিশদ হন নারী সমস্যায়। বারবধূদের প্রসঙ্গে এসে তিনি বেশ আবেগ মন্ত্রিত, এমন এক সমাজের ছবি মূর্ত করেন যে সমাজে দেহ ব্যবসা নিরুদ্দেশ, প্রতিষেধকের চাপে বাণিজ্যের অকাল প্রয়াণ। উৎপত্তি-বিকাশ-বিদায় অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন। ভাষা পরদেশী। ধোঁয়াটে। উদাহরণ প্রবাদ ব্যাখ্যা অভিজ্ঞতা এবং দিনযাপনের সঙ্গে আড় আড়। তাতে কিছু এসে যায়নি। মুগ্ধতা সমৃদ্ধ ছিল। কারণ অনুভব টোকা দিচ্ছে বক্তা তাদের হয়ে বলছে। তাদের আপন ভাবছে। আশ্বাস দিচ্ছে ক্ষমতায় এলে যৌবন বাণিজ্য কোণঠাসা হবে। বেশ্যাদের ত্রাণ হিসেবে ক্ষমতার অস্ত্র প্রয়োগ হবে।

বিভোরতা চোট খায়। মুখে সর্বদা শব্দের খইফোটে কোকিলার—সে এখন কথা স্থগিত রেখে থেই থেই নাচতে শুরু করে—ধর্না হবে। কেলো হবে। মাসি ধমক দেয়।—ছেমড়ি থামবি, বড্ড বাড় হয়েছে না। বাড়িওয়ালার বাড়ি নয়। উঠোনওয়ালার ছটফটি।

মানুষ বাঁচে স্মৃতি সত্তা স্বাস্থ্যে, চাঁপাও স্মৃতি সুখে প্রাণিত। আশ্বাসের আবেদন এমনই সংক্রামক, বৌপে চোখের পাতায় ভর করে আবেশ। পুনর্বাসনের আকুতিতে ছিন্নভিন্ন মনোভূমি শ্রান্ত।

আছে গ্রাহকদের দয়ামায়া উপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর ছোট আশীর্বাদের মতো মাসির আশ্রয়ে। নেতার শব্দমালায় মনটা যেন উড়ে যায় পৃথিবীর ধুলো থেকে অনেক উপরে এক অনাদি মেঘলোকে।

উত্তরণের ঢেউ চাঁপাকে আদর দিচ্ছে। সে হয়ে পড়ছে মোহের শিকার। অদ্ভুত এক ছিন্নতার আহ্বান। আয়...আয়...আয়। ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়।

প্রার্থনা বিধুর পবিত্র আলোয় ছেয়ে যাচ্ছে চাঁপার মুখশ্রী। বক্তার আশ্বাসে এমন বিশ্বাস এবং আস্থা টলটল করছে যার সাঁকো বেয়ে মন তরতর করে পৌঁছে যাচ্ছে অন্য তটে। সে তট ভালবাসার ফসলে পূর্ণ। আমি আমার প্রার্থনার ধনকে নিয়ে বসবাস করবো। যেমন খুশি থাকবো। কোন হিংসুটে পড়শীর কোন মূর্খ প্রতিবেশীর কোন পরশ্রীকাতর সামাজিক নীতিবোধ যদি ঘা খায়—গেল গেল রব উঠে স্থিতাবস্থা যদি টাল খায় তো গ্রাহ্যে আসবে না। জনরুচি যদি ধাক্কা খায় খাক। নতুন মূল্যবোধে ব্যক্তি রুচি স্বাগত। বক্তা উসকে দিচ্ছে ভালবাসার রক্তকে।

যে বীজ বুনন হয়েছিল আশৈশব মনে, বাস্তব চক্রে, যা বাঁজা হয়ে যায়—বক্তা যেন সেই অনুভূতিকে পাম্প দিয়ে দিয়ে জীবন্ত করছে। উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট যা টোকা ছিল খেরোর খাতায়, অডিট তাড়নায় উন্মুক্ত হল। নবজাত কল্পনায় ফিকে হয়ে আসে পেশাগত অস্তিত্ব। চাঁপা আলপথে ঘুরে বেড়ানো আনাড়ি কিশোরী হয়ে ওঠে।

॥ পাঁচ ॥

"পৃথিবী সত্যিই অনাথ হবে যেদিন শব্দের মৃত্যু হবে।"

জলপাই রঙ। যে রঙ কালোর দিকে টাল। আবার কেউ কেউ উপমা খোঁজে, মেঘের। একটা বিষয়ে মতের ঐক্য আছে। সেটা হচ্ছে রঙটা চোখ টাটায় না। স্নিগ্ধ করে। এই বিবেচনায় চাঁপা নিজের ম্লান রঙ কিন্তু সিল্কের কুনন অর্থাৎ ঝলমলে; যা নম্র এবং চটকের পাইলে আকর্ষণী শাড়ীর শাসনে নিজেকে সাজায়। অন্য সব মেয়েরাও ভব্য সাজে তৈরী।

পরিপাটি নারী সংকলন উঠোনে একত্র। সাজে চাঁপা টেক্কা দিয়েছে যে সবাইকে তা দৃষ্ট হয় সখীদের দৃষ্টিতে। প্রত্যেক দৃষ্টি আবিষ্ট। এমনকী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বৃন্দা ভুলে যায় রেষারেষি। চাঁপার সলজ্জ কাঠামোর কাছে ঘন হয়। আঁচলটা মাথায় টেনে দেয়। বধূবরণ ভঙ্গিমায় মুখটা উঁচিয়ে নিরীক্ষণ করে। অন্য মেয়েরা একা দোকায় চঞ্চল হয়। মুখে রা করে।—ওমা এযে লক্ষ্মী ঠাকরুণ গো—। একদম পিতিমে।

বৃন্দা কিঞ্চিত দূরত্বে এসে নিবিড় তাকায়। পলকহীন। চোখের পাতায় ভর করে আছে সম্ভ্রম এবং মুগ্ধতা। দেখায় আশ মিটছে না। সহসা সে তালি বাজায়। কলকল করে।—মাইরি বলছি কোন হারামি বলবে খানকি। একদম কুলবধূ।

জোট জনপদে। সকালবেলা। রোদ হানা দিয়েছে শান্তরূপে। জোট হাঁটছে। ক্ষিপ্র গতি। দেখে মনে হতে পারে অভিমুখ জনসভা, মিছিল ট্রেন বা ময়দানমুখি বাস ধরবে। যদি কোন পথিক তির্যক পর্যবেক্ষক হয় তার মনে হতে পারে হাঁটার ছন্দে যে বেগ তা দেখে যে ওরা কাজ করে। যাচ্ছে বাবুবাড়ি। ঘর মুছবে বাসন মাজবে রান্না করবে বলে। সাজের ঘটা অবশ্য কাউকে সংশয়ী করতে পারে। থাকগে, প্রকৃত হচ্ছে নারীবাহিনী চলেছে নেতা সমীপে।

রাস্তা জুড়ে শিব মন্দির। পাড়ায় ঢুকতে শরীর জড়সড় করে এর পাশ দিয়ে যেতে হয়। ভিন্ন ছাঁদ রুচি এবং সামর্থের বৈচিত্র নিয়ে নতুন এবং প্রাচীন বাড়ি হয়লাপ। এক তলা দু তলা বহু তলা। কিছু বাড়ি ডিঙিয়ে ডানহাতী একটা বাড়ি, এক তলাটা জীর্ণ, দোতলাটা ঝাঁ তকককে, হালকা সমুদ্র নীল বাড়িটা এম এল এ-র, আমদরবার ফুটি ফুটি। টুকটাক উমেদাররা আসছে। এম এল এ উমেশচন্দ্রের চোখে পড়ে বন্ধু তারকের প্রতি,—আরে, তারক যে, আছো কেমন।

—আছি ভালই। কষ্ট বলতে বাত। হাঁটুর যন্ত্রণা, অমাবস্যা এলে সওয়া যায় না।

—ও সারবে না; অপারেশন করিয়ে নাও।

—খোঁজ নিয়েছি। এক লাখ কুড়ি বলছে।

পাশে বসে ছিল সতীন। বিস্তর খবরাখবর রাখে। সে মুখ খোলে।—সঞ্জীবনীতে চলে যান। ৭০ হাজারে করে দেবে।

—৭০ হাজার হাঁটু রিপ্লেস। বলেন কী।

—৭০ হাজার। এক পয়সা বেশি নয়। এমন ভাবে তথ্যটা দিল অপারেশন যেন বিক্রি হচ্ছে জলের দামে।

আমদরবার শব্দটি গণসংযোগের অর্থ বহন করে। যে বৈঠকে নাগরিক এবং প্রার্থীদের প্রবেশ অবাধ। তর্ক বিতর্ক, শলাপরামর্শ, সাফল্য—সুরাহা নিয়ে কারবার। ঘোষণায় যতটা উদার

কার্যত তা নয়। নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। যার জের;নারী বাহিনী ছিল চলিষ্ণু, বাধা পায়, কর্মীদের প্রহরায় গতি স্তব্ধ হয়। কথা কাটাকাটি চলে। অবশেষে বিনয়, ছলচাতুরি, জেদ ইত্যাদির প্রয়োগে চাঁপা জয়ী হয়। ছাড়পত্র পায়।

চাঁপা ভেতরে ঢোকে। উমেশচন্দ্রের নিকটতম হয়। উমেশচন্দ্র সুধোন,—কে আপনি? কে পাঠিয়েছে? থাকেন কোথায়?

কমন প্রশ্ন নয়। কোনক্রমে একটি প্রশ্নের জবাব দেয়,—বিবিবাজার।

এই নামে কোন এলাকা সনাক্ত করতে উমেশচন্দ্র ব্যর্থ। বিভ্রান্ত মুখের ভাবা লক্ষ করে অতীন অবহিত করে।—রেন্ডিটুলু।

উমেশচন্দ্রর গা ঘিনঘিন করে। সকাল বেলা নোংরা মুখ দেখে দিনটা অসূচী হয়ে গেল। রাগে গা জ্বলে। ঘিনঘিন করে।—পার্টি অফিস আছে। সেখানে যা। এখানে এলি কোন আক্কেলে।

সম্বোধনের অবনতি নিয়ে চাঁপার ক্ষোভ নেই। অভ্যেস আছে। মুখোমুখি কথা বলতে পারছে এই ঢের।

বড় বিস্ময় লাগে লোকটা তার সাহসের উৎস ভুলে যাচ্ছে। মুখস্থ বিদ্যেয় দুর্বল হয়ে এত বড় নেতা হল কী করে। তার সাহসের উৎস তিনি স্বয়ং। নিজেই ছিনতাই করছেন স্বপ্রদত্ত শক্তি। ভন্ড না-কি।

চাঁপার দখলে কোন অভিজ্ঞান নেই যা উপস্থিত করলে নেতার সম্বিত আসে। তার সম্বল স্মৃতি।

চাঁপা উমেশচন্দ্রর মুখের কাছে হাত খেলায়। মুখ নাড়ে। মুখ থেকে ওথলায় স্মৃতি। জনসভার স্মৃতি।—আপনি আশা দিয়েছিলেন বেশ্যাগিরি করতে হবে না। কাজ পাব। সংসার করব। সমাজে বাস করব। হরিজন হয়ে থাকব না। মনে পড়ে।

উমেশচন্দ্র উন্মনা। হল ঘরে নেমে আসে স্তব্ধতা। সমাবেশ উৎকর্ণ। কী উত্তর আসে শুনতে আকুল।

উমেশচন্দ্রর স্মৃতি ওথলায়। মনে পড়ে মেয়েটি এক বর্ণ মিথ্যে বলেনি। সেদিন সে প্রকৃতই ছিল ভাবুক। বোধ এবং বিদ্যার চর্চা ছিল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিবিষ্ট কথা নিবিষ্ট দেশ বিশ্বাস পুঁতে দিয়েছিল যা তিনি উগরে দিয়েছিলেন মাঠে। আবেগের স্রোত ছিল প্রবল।

স্বীকার করেন আপন অবস্থান।—হ্যাঁ মনে পড়ে।

চাঁপার স্পর্ধা চড়ে।—কথা রাখেননি। আজ আমরা বিপদে। টুলি উচ্ছেদ হবে। কাজ না দিন। নিজেরা যেভাবে করে খাচ্ছি করতে দিন। বাঁচান। মনে পড়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুখে দুঃখে পাশে থাকবেন।

উমেশচন্দ্রর ভেতরটা পুড়ে পুড়ে খাক হচ্ছে। মনে পড়ে। সব মনে পড়ে। পাদ্রীরা যেমন বরাভয় দেয় আমার কাছে আইস। আমি তোমাদিগকে সুখ দিব। শান্তি দিব। রোগ মুক্ত জীবন দান করিব। আমার ভাষ্যেও অভয় ছিল, আশ্বাস ছিল। যে আশ্বাস গুরুজী মাচান বাবা পির বাবারা দিয়ে থাকে; আমি তোমাদিগকে সংসার দিব। কাজ দিব। সমাজ দিব। বিনিময়ে আনুগত্য দাও।

কথা কথাই। কত্তা কথাই তো প্রচার হয়ে থাকে। কটা কথা আর কথা রাখার দায়বন্দি। ওরা কথা রেখেছে। আনুগত্য দিয়েছে। আমি কথা রাখিনি। বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। কথা রাখার গুরুত্ব কোন নারীর মনে এমন পরিচর্যা পেতে সক্ষম জানা ছিলনা।

আফশোস শান্ত হয় যুক্তির চাপে। সেই সমাজ, সেই সংস্কৃতি সেই রাজনৈতিক মানচিত্র আজ নির্বাস। সবকিছু ওলট পালট। মানুষের কষ্টে মানুষ কাঁদে এমন মানুষের সংখ্যা কমতির দিকে। বিশ্বাসের বদঅভ্যেস উমেশচন্দ্রর নেই। তন্ত্রের শব বহন করা তার ধাত নয়। সে বোঝে নতুন জ্ঞানে বিগত ধ্যান আস্তাকুঁড়ে। নতুন জ্ঞানে কোন রাজনৈতিক দল, এন জি ও, কোন প্রকার সমাজ সংস্থা বেশ্যাগিরি প্রথার বিলুপ্তি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনা। কষ্টসাধ্য এবং অন্যান্য বিবেচনা যেমন আছে সামাজিক ভারসাম্যের দিকটাও ধর্তব্যে এসেছে। সবদিক খতিয়ে ত্রাহি অবস্থায় প্রসঙ্গটি শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে এমনকী 'দুর্বার'-এর মত সংগঠন পতিতাদের মধ্যেই যাদের কর্মকাণ্ড তারাও দেহ বাণিজ্য লুপ্ত করার দাবি জানায় না। মূল্যবোধের ভাববিলাস বর্জন। প্রবৃত্তির বাস্তবতা স্বীকৃত। নিরিখ বদলে গেছে। অবলুপ্তির সে কল্পলোক একদা ভাবনার জগতে ছায়া মেলেছিল সে জায়গা দখল নেয় পুনর্বাসন তত্ত্ব। ব্যবসার সামাজিকীকরণ হয়। চাহিদা আসে দেহপসারিনীদের নাগরিক পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ভাবনার অভ্যেসে জড়িয়ে পড়া উমেশচন্দ্রর প্রিয় অভ্যেস। তার ভাবনায় ভর করে বেশ্যাবৃত্তির অবসান প্রশ্নটা পিছলে গেছে বহু শতাব্দী এবং বহু মনীষীর কোর্টে। সমাজের কোর্টে ঠাঁই নিয়েছে প্রতিভাদের জীবন সাবলীল এবং সৃজন করার দায়িত্ব। সর্ত কি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার। জল সরবরাহ, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড—যাবতীয় পরিচয় দিয়ে নাগরিক স্বীকৃতি দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। পুলিসি রেড চলবে না। চাঁদা বাজির অবসান চাই। মালকিনদের জুলুম চলবে না, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। সামাজিক নিগ্রহ রুখতে হবে। যেমন মেয়েরা দল বেঁধে নদীতে চান করতে যাচ্ছে—পাড়ার ছেলেরা প্যাক দেয়। দেখ-দেখ রাস্তা আটকে মাগিরা যাচ্ছে। খায়, না-খায় সকাল নায়। জলকেলি করে। বৈদ্যে না পোঁদ মারে।

খিস্তি বড় কথা নয়। বড় কথা হল পেশা তুলে মস্তানি করা। পুলিশকে বলা মানে কুমিরের হাঁ থেকে বাঘের খপ্পরে পড়া। পুলিসকে বললে বলে মাগিকে মাগি না বলে কী দিদিমণি বলবে। মুটেকে মুটে না বলে কী পাইলট বলবে।

বোঝ কাণ্ড। রাস্তা দিয়ে কেরানি হাঁটলে কী বলা হয় এই যে কেরানি...। লাইসেন্স দিতে হবে। ভাড়ার রসিদ দিতে হবে। পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চাইলে আটকান চলবে না। বাসনমাজা ঝি যদি রাঁধুনি হতে পারে, আয়া যদি নার্স হয়, কেরানি যদি অফিসার হতে পারে, রিক্সা চালক যদি ভ্যানচালক হতে পারে ত বেশ্যা কেন ঝি আয়া দোকানদার হতে পারবে না? একবার ছায়া পড়ে গেলে তা হবে ধ্রুপদী। দুফলা নীতি হয়ে যাচ্ছে না। চুক্তির বাইরে নারীকে ইচ্ছাপূরণের যৌন পণ্যে ব্যবহার করা চলবে না।

দাবী সমূহের মধ্য দিয়ে কী বুনন হয়ে যাচ্ছে না প্রথা সংরক্ষণ-বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব। পার্টির নির্দেশনামার প্রথার অন্ত্যেষ্টির দিনক্ষণ স্থির করার ভার ছেড়ে দাও মহকালের ওপর। গণচিন্তার মূল স্রোতে অবশেষে লঘুচিন্তার নিবৃত্তি।

এ এমন এক পরিস্থিতি, উমেশচন্দ্র ভেবে কূল পান না কোন খেলা যে খেলব। মনে হয় রাজনীতি নয় সামাজিক আলোকে দেখলে সত্যের ঝলক দেখা দিলেও দিতে পারে। সামাজিক অভিজ্ঞান হচ্ছে খিদেই আসল। পেট প্রকৃত। শোন শোন সাধুগণ, সবকিছু দেখা যায় রুটিতে।

না কুছ দেখা ভাব ভজন মে
না কুছ দেখা পোথিমে
কঁহে কবীর শুনো ভাই সান্ত
যো দেখা সো রুটিমে।

ঝলসান রুটির মধ্যে দিয়ে যদি সমাজকে দেখা যায় দেখা যাবে মানুষ হচ্ছে পাপ-পুণ্যের সঠিক এক সত্তা। অবস্থার খেলনাপাতি। লতাগুল্মময় চিন্তা, উমেশচন্দ্রর নিজেকে মনে হয় সংখ্যালঘু। তার ভাবুকতার কোন চারা নেই। জমি নেই, চাষ নেই। ব্যাপ্তি নেই। হাহাকার আসে তার। মেয়েটির কাছে ভাবনার অংশ হাট করতে না পেরে দুঃখ হয়।

উমেশচন্দ্র অপমানের অংশ হয়ে নুয়ে পড়েন। অবশ্য ক্ষণিক ভাবান্তর। পরক্ষণে পেশাদারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যাকুল হন। ভাবছি কী করা যায়। কিছু একটা করতে হবে। তুমি যাও—।

চোখ মুদিত ছিল ভাবনার প্রচ্ছায়ে। স্ফুরণ হতে দেখেন মেয়েটি নেই। খাঁখাঁ। ধাঁধা লাগে স্বস্তিও পান। আপদ গেছে; বাঁচা গেছে। উমেশচন্দ্র হাঁক পাড়েন,—পদ্মা ও পদ্মা...। ক্রম হাঁকে পদ্মা হাজির।—জল ঢাল ভাল করে। মোছ মোছা হলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে। খাবার সরিয়ে নে।

পদ্ম বোঝে ঘর এবং খাদ্য অসূচী হয়েছে। সে আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়। সাবান জল ফিনাইল আনে। ন্যাতা চুবিয়ে উবু হয়ে মেজে মোছে। ঘটি বয়ে আনে গঙ্গাজল, আঁজলায় ছিটিয়ে দেয় সর্বত্র। শুদ্ধতার ব্যবস্থা পরিপাটি হতে নজর কাড়ে টেবিল। টেবিলের ওপর চিনেমাটির থালায় দুপিস কড়া টোস্ট, সেদ্ধ ডিম, টেনিশ বল সাইজ ঘরে কাটা ছানার গোল্লা পড়ে আছে—অনশন ভঙ্গের অপেক্ষায়। পদ্মার খাবার প্লেট জলের গ্লাস এক কাট্টা করে। ঘর ছাড়ে, সমাবেশ স্তব্ধ। কোন মুখে রা নেই। নেতা বনাম নারী তরজায় নীরব উপভোক্তা। মেয়েটি চলে যেতে মাসি ঘর ছাড়তে নীরবতার ছুটি। রুটিন কাজ, আলোচনা-নিদান ইত্যাদিতে দরবার মুখর হয়।

হলঘর কূটকাচালি এবং হালকা আড্ডার মেজাজে টগবগে। উমেশচন্দ্রও খোশ মেজাজে। মেজাজ বিগড়ে যায়। কানে আসে হৈচৈ। শব্দের খাঁচা থেকে চোখ পড়ে বাইরে। কটু দৃশ্য চোখে ভাসে। সেই মেয়েটি ভেতরে ঢুকবে। এক গুচ্ছ কর্মী বাধা দিচ্ছে। এমন ধাতানিও কানে এল, এই মাগী ফের এসেছিস। কেলানি খাবার সখ হয়েছে না। মেয়েটি বাধা মানছে না। ধাক্কা ধাক্কি হচ্ছে। ঠ্যাটা মেয়েটিকে বাগে আনতে এক কর্মী মেয়েটির পিঠভাসী চুল খামচে ধরে, মেয়েটিও নাছোড়বান্দী। ছল বল গর্জন লাস্যবিধির অস্ত্রে অবরোধ ভাঙতে সচেষ্ট।

একদিকে মন আর একদিকে হিসেব। উমেশচন্দ্রর মন দোলাচল। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা—: এটা আমদরবার। দলীয় সভা নয়। গণজমায়েতে। প্রার্থীরা এসেছে প্রার্থনা নিয়ে। উপস্থিত আছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বাঘাই মাথারা, সাংবাদিকরা আছে, আছে ফটোগ্রাফার। ঘাপটি

মেরে আছে ছদ্মবেশী প্রতিপক্ষ। প্রতিটি আচরণ লক্ষ করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পাড়াময় চাউর করে দেবে আচরণবিধি। ঝড়ের বেগে সেই বার্তা রটে যাবে কেন্দ্রময়।

সময়টা বড় মূল্যবান। প্রতিটি পদক্ষেপের অভিমুখ দিল্লী। লোকসভা ভবন, আসন্ন ভোটে সে এম পি প্রার্থী। এখন সে সংবাদপত্র, টিভির খোরাক। লাখ লাখ ভোটার চোখ তার প্রতিনিবদ্ধ। সামাজিক ভূমিকার খোপে খোপে নম্বর বসাচ্ছে। ভুল পদক্ষেপ মানে হঠকারিতা। জনপ্রিয়তার ভরাডুবি। কবর খোঁড়া হবে ভাবমূর্তির। ক্যাডারদের কিছু এসে যায় না। ওরা বসন্তের পাখি। আজ এ দল ত কাল ও দল। অনেকে ঝরে যাবে। কিন্তু ও দলদাস, দলে লেপটে থেকে করে খেতে হবে।

উমেশচন্দ্র ধর্মসংকটে। আজ তিনি বিখ্যাত। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে গড়ে তোলা ভাবমূর্তি। সে এখন ঘোড়ার পিঠে। নামা মানে সমূহ পতন। সুতরাং গতি হচ্ছে গন্তব্য।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতে উমেশচন্দ্র ওস্তাদ। কখন উদ্যত হতে হয় কখন গুটিয়ে থাকতে হয় এ জ্ঞান তার টনটনে। তিনি বোঝেন এখন সেই ক্ষণ উদ্যত হতে হয়।

উমেশচন্দ্র উদ্যত হন। পার্শ্ববর্তি অধীনকে ফিসফিস করেন; কিন্তু যেন সকলে শুনতে পায় এমন স্বরে বলেন,—সাতাত্তরের পর ক্যাডার লটগুলো ভূবিমাল। আদর্শবাদ ছুটি দিয়ে কামাওবাদের পোঁ ধরেছে। অস্থিরতায় তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন।

মার্বেল বসানো পা পিছলে যায় এমন। মেজে। খাঁটি চামড়ায় চীনা কারিগরের হাতের আদরে গড়া পাদুকা ঘসটে ঘসটে সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন। দৃঢ় পদাঘাতে চরণ চিহ্ন এঁকে এঁকে তার বা মুদ্রাদোষ, বাতাসে হাত খামচে ধরা, সেই মুদ্রায় লাল শালু দুলিয়ে রেলের পয়েন্টম্যান যেমন শান্টিং করায় সেই ভঙ্গিতে উমেশচন্দ্র ভীড় কেটে কেটে এগোতে থাকেন। ভরাট গলায় বলেন, মুখে বিরক্ত বাঘিনীর গর্জন—ওর হাত ছাড়। কী বলতে চায় বলুক। ছি-ছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি এই সহিষ্ণুতা এই ব্যবহারবিধি নিয়ে মানুষের কাছে যাবে। মানুষকে আপন করবে। দল বড় করবে। হয়।

দৈহিক প্রহরা থেকে মেয়েটি মুক্ত। পথশ্রম, দাহ, শরীর দোলা—মিশ্র প্রতিক্রিয়ার প্রসাধন গলছে। মুখ ঘাম জর্জর। পাখার বাতাস শ্রান্ত ঘাম এবং গলিত প্রসাধন শোষণ করে নিচ্ছে। চাঁপা ফুরসত পায়। কোমর থেকে রুমাল বের করে মুখে ঘসে। মুখের আদি ত্বক মাজা কাঁসার মত ঝকঝক করে।

পায়ে পায়ে, আস্থার পদপাতে উমেশচন্দ্র চাঁপার নিটকতম হন। কন্যাসম স্নেহে চাঁপার মাথায় হাত রাখেন। বলেন,—মা, তুমি বোস, জিরোও, শান্ত হও। বলো কী বলতে চাও–।

"মা"—ডাক শুনে চাঁপা তড়িতাহত। আপনি—তুমি—তুই; পরিক্রমণ সেরে অবশেষে "মা' তে ঠেক। ঢ্যামনা না-কি। না-কি উঁচু দরের ঢপ কারবারী। হয়তো আবরণ। তাতে কী। শব্দটাতে ঠাঁই নেই। আছে মাধুর্য। কোমলতায় টসটসে। উপমাবন্দির বাইরে অনন্ত এক অনুভূতির আস্বাদে ভরাট হয় মন। চাঁপা বসে। বিশ্রাম নেয়। চোখ মোছে। চুল গুছোয়। সর্দি টানে, কিছুক্ষণ অবকাশ দিয়ে উমেশচন্দ্র শুধোন,—বল মা কী বলতে চাও।

স্পষ্ট উচ্চারণে চাঁপা দাবী পেশ করে।—আমাদের খেদিয়ে দিন।

উমেশচন্দ্র মজা পান। এসেছিলে ঘর রক্ষা করতে। এখন পালটি খাচ্ছ। ভেবে দেখেছ উদ্বাস্তু হলে যাবে কোথায় থাকবে কোথায় খাবে কি। মাঠে মরবে।

সিনথেটিক ফাইবারে তৈরী চেয়ারে বসেছিল চাঁপা। পায়া পলকা। বিকট শব্দ হতে মনে হয়েছিল পায়া হড়কে কিছু একটা পতন হয়েছে। তা নয়, চাঁপা খাড়া। চেয়ার সরতে এই আওয়াজ। টান টান কাঠামো, রক্তোচ্ছ্বাসে কপাল এবং গাল রাঙা। বুক কাঁপছে। নাকের পাটা ফুঁসছে। আচম্বিতে ছিন্নমূল বনস্পতির ধরনে লুণ্ঠিত হয় উমেশচন্দ্রর পায়ে। উমেশচন্দ্রর পা ছটফট করে। বেকার। লাবণ্যময়ী দুহাতের বেড়ে বন্দি থাকে, ঠেলাঠেলিতে কিছুটা পিছলে যায়। ফলে কপাল পা কখনও কখনও পায় না। পায়ে-মেজেতে কপাল ঠুকছে আর গোঙাচ্ছে চাঁপা। যার সরলার্থ হল : আমাদের নিয়ে অত ভাববেন না। হতভাগীদের জীবন হচ্ছে পদ্মপাতায় জল। এই আছি এই নেই টুলি ভেঙে দিন। উচ্ছেদ করুন, যে যেখানে পারি কোন না কোন ঝুপড়িতে ঠেক নেব। সমাজে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকব। পথেঘাটে থিকথিক করছে পুরুষ। মেয়েছেলে ভোগ করা ছাড়া যাদের জীবনে উপোষ। বেছে বেছে উপবাসী মরদ গেঁথে তুলব। ছোঁয়াচে রোগ আমাদের সঙ্গে লেপটে থাকে। সুরক্ষা হিসেবে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেব না। বহন করব রোগ। প্রতিটি খদ্দেরের রক্তে চারিয়ে দেব মরণ রোগের বীজ। যত পারি, দশ-বিশ, তিরিশ, শ-শ পুরুষের রক্তে বুনে দেব রোগ। বেটারা এগিয়ে যাবে শেষের দিকে। ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

এক অপার্থিব আলোয় চাঁপার মুখ ঝকঝকে। সে আরো বলে,—যতদিন বাঁচব পুরুষ খুন করব। দয়া করুন। টুলি গুঁড়িয়ে দিন। ছত্রভঙ্গ করে দিন জোট।

উমেশচন্দ্র হতবিহ্বল। একেই কী বলে সভ্যতার প্রতিশোধ।

হরির লুট পড়েছে...

সুদর্শন সেনশর্মা

গত তিনদিন ধরে এপাড়ায় দিবারাত্রি মাইক বাজছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘোষণাও চলছে। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা হয়না দীপুর, কিন্তু রাতে ফিরে আসার পরে বা সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত মাইকের তাণ্ডবে দীপুর নাজেহাল এবং ঝালাপালা অবস্থা।

এ তল্লাটের বিখ্যাত ইমারতি দ্রব্য বিক্রেতা এবং হাল ফিলের নেতাদের খুব কাছের লোক অর্থাৎ অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্র রবিচন্দ্র সোমের তৈরি 'পদ্মিনী আবাসন'-এর কাছেই তিনি আবার একটি জবরদস্ত শনিমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন এবং সেই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্ভাব্য তালিকা সারাদিন ধরে অবিশ্রান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে...এলাহি ব্যাপার। কে নেই? কে থাকবেন না সেটাই খুঁজতে হচ্ছে। পুরো মহকুমার পৌরপিতা পৌরমাতারা তো থাকবেনই... এমন কোনো ব্যাপারই নয় সেটা। চার চারজন বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং নানাবিধ উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে। সবচাইতে আশ্চর্য হল দীপু এই সংবাদে যে সাংসদ শ্রীযুক্ত উদ্‌গত মহাবোধিও শনি বিগ্রহের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান এবং মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনে বিশেষ ভূমিকা নেবেন। শ্রী উদ্‌গত মহাবোধি লেখাপড়া জানা লোক। এলে বেলে হালফিলের হঠাৎ জাঁকিয়ে বসা মঞ্চ-অসফল অভিনেতা-নেতা নন। অধ্যাপনা করা লোক। তাঁর রাজনীতি দীপু না মানলেও তাঁর পাণ্ডিত্যকে সে অস্বীকার করেনা...কিন্তু রবি সোমের শনিপুজোয় তাঁর উপস্থিতি দীপুকে ভাবাচ্ছে বইকি। একজন সাংসদ...

দীপুর আজ ছুটি। এবং আজকেই সেই উৎসব সূচনার দিন। মাইকের ঘনঘন অনুষ্ঠান ঘোষণা ও তারস্বরে পীড়াদায়ক সংগীত নামক কিছু দুর্দান্ত রোদন বিলাপ থেকে নিজের দু'কান বাঁচাতে সে তার ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়েছিল, আজকাল যে কত কি হচ্ছে। অফিসের মিসেস ভদ্র কুমোরটুলির ওদিকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত একটা সেবামূলক প্রচেষ্টা চালান। তিনি হাসতে হাসতে এই শনিমত্ততার খবর শুনে বললেন—সার্বজনীন শনিপূজা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল বলে। শুধু শনিবারে, শনিবারের নয়, ঘটা করে দুর্গাপূজা, কালীপূজার মত করে দেখবেন দু'তিনদিন ধরে হবে। শনিদেবের বাহন তো এখন প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে...ইকোলজিকাল ভারসাম্য-র জন্যও শনিপুজোটাকে বোধহয় ছড়িয়ে দিতে হবে। দীপু বহুদিন আগে একটা লেখা পড়েছিল, 'সব কার্তিক শনি হচ্ছে'...পড়ে বেশ মজা পেয়েছিল...চিন্তিতও হয়েছিল।

দীপু প্রাণপণে একটা বই-এ এখন মননিবেশ করার চেষ্টা করল। অনেকটা পড়াও হয়ে গিয়েছিল গতকাল রাতে। আধুনিকা এক কবির লেখা। রবিঠাকুরের নতুন বউঠানকে নিয়ে লেখা। এলেবেলে প্রকাশনা নয়। জাঁদরেল প্রকাশনার বই। কিন্তু হায় কেচ্ছায় পেয়ে বসেছে সবাইকেই। আজকাল কাগজে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিয়েও মিথ্যে কথা লেখা

হচ্ছে, কেচ্ছা কলামে তা অবলীলায় ছাপাও হয়ে যাচ্ছে তথ্য প্রমাণাদি ব্যাতিরেকেই। আমাদের যুগ যুগান্তের আবহমানের কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর এতদিন পড়েও ছাড় পাবেন না? এ বইএর একটা জায়গায় তাজ্জব হয়ে দীপু পড়ল লেখিকা লিখছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে বলছেন : জানলে মধুসূদনের মেম-বিধবার পেছনে লোকে বেশ লাগতে শুরু করেছে। মানুষের মানে পুরুষের

যা স্বভাব। কাদম্বরী ভ্রূকুটি হেনে স্বামীকে বলছেন : সে দলে তুমি নেই তো? এ বই-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তিজনক, চরম আপত্তিজনক যা যা লেখা হয়েছে সে তথ্যও তিনি কোথায় পেলেন অবশ্যই প্রশ্ন করা যায়। মামলাও করা যায় বোধহয়। কত কি নিয়েই তো মামলা হয়। দীপু মাইকের বিরক্তির মধ্যেই বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে...লেখিকার এই ন্যূনতম পড়াশুনোটাও নেই যে অভাগী হেনরিয়েটা মধুসূদনের মৃত্যুর তিনদিন আগেই হাসপাতালে ভর্তি স্বামীকে ফেলে ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন। হায় প্রকাশনা। হায় কেচ্ছা শিল্প।

মিসেস ভদ্র বলেছিলেন কেচ্ছাও দাদা একটা ভূষণ। মহাপুরুষদের নামে একটা কেচ্ছা খেলিয়ে দিতে পারলেই পাবলিক চেটেপুটে খায়। বেস্ট সেলার...ভালো বই-এর বিক্রি নেই... অনন্যার আত্মহত্যার প্রতিবেদন পড়েন নি?

দীপু হনহন করে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। দীপুর বউ শ্রীময়ী বলল—চললে কোথায়?

ঘরে বসেই তো মাইকের তর্জন গর্জনে কর্ণপটহ ফাটবার অবস্থা হয়েছে। রাস্তা থেকেই ঘুরে আসি বরং।

এর মধ্যেই মাইকে তুমুল হর্ষধ্বনির শব্দ কানে এল দীপুর। আমাদের মাননীয় সাংসদ চারবাতির মোড়ে এসে গেছেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি আশা করি এখানে পৌছে যাবেন। আপনারা সারিবদ্ধভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়ান। দীপু সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন...দোতলার ল্যান্ডিং থেকে শ্রীময়ী হাসি আড়াল করে বলল নেমতন্ন খেতে যাবেনা?

দীপু ব্যাজার মুখেই মাথা উঁচু করে ম্লান হেসে...ছোটবেলায় শনিপুজোর সিন্নি খেয়েছি গাছতলায় দাঁড়িয়ে...তারপর হাতপা ধুয়ে ঘরে ঢুকতে হোত। এখন শনিদেবই গটগট করে গৃহস্থের ঘরে ঢুকে যাবেন...গৃহস্থ উঠোনে বেরিয়ে যাবে।

তুমি না হয় একদম নাস্তিক, কিন্তু নতুন কিনে আনা বইটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিলে কেন?

চিৎকার করে উঠল দীপু...মিথ্যুক...লেখিকার কাছে চিঠি লিখেছিলেন বিনোদিনী যে তাঁর গর্ভের শিশুটি...

ওপর থেকে ঝুঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শ্রীময়ী বলল এই চুপ...

—চুপ করে থাকব কিভাবে বলতো—দীপু গর্জায়, আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্যে যারা পুরোধা ব্যক্তিত্ব, অনতিক্রম্য এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁদের নিয়ে যদি নির্জলা মিথ্যে কথা লেখা হয়...

যাও যাও মাথা গরম না করে বাইরে থেকে ঘুরে এসো...শ্রীময়ী এখন গম্ভীর...

সাংসদ পৌছে গেছেন। শনিপুজোয় দুর্গোৎসবের মত, শ্যামা পুজোর মত আলোয় সেজেছে দীপুদের এই সর্বদহ শহর প্রকল্পের একদশকের পুরনো পাড়া। বড় ঝিলটার পাশ দিয়ে এগিয়ে পার্কের পাশের রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে আলোর মালা দেখতে দেখতে দীপুর আবার মনে পড়ে

'সব কার্তিক শনি হচ্ছে'...

কার্তিকের কাঁধে হাত আরও দুটো বসাতে হয় এই যা। ময়ূর কে শকুন বানানো কুমারটুলির দক্ষ শিল্পীদের কাছে জল ভাত। পরিসংখ্যান বলছে গতবছর বিশেষ এক শনিবারে সার্বজনীন শনিপুজোর জন্য মাত্র শ'তিনেক বড় শনিমূর্তি বানাতে হয়েছিল কুমোরটুলিতে। এবার সেটা তিন হাজার ছাড়িয়েছে। পন্ডিতেরা বিচারে বসেছেন প্রতি শনিবারে রাস্তায় রাস্তায় শনিপুজোর মত নাকি সার্বজনীন শনি উৎসবের জন্য একটি বিশেষ দিন বা তিথি ঠিক করা হবে? বলা যায় না শনিবার ছাড়াও অন্য কোনো দিনে গ্রহরাজ শনি তার অধিকার কায়েম করবেন।

গ্রহরাজ হয়ে যখন বসেই পড়েছেন, শনিকে কে ঠেকায়। শনি বলে কথা।

দ্বারোদঘাটনে বাউল সংগীত পরিবেশিত হল। পীরিতি কাঁঠালের আঠা। শুধু দীপু বুঝতে পারলনা শনি পুজোর ফিতে কাটায় পীরিতি, কাঁঠাল বা তার আঠার কী সম্পর্ক?

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মহাবোধি মহাশয় তাঁর ভাষণ শুরু করলেন...

বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী কিন্তু দরিদ্র বৎসল শ্রীরবি সোম শনি-তে মেতেছেন বলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হচ্ছি। ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ছে আমার, আপনাদেরও মনে পড়বে আশাকরি; বালকবেলায় তুলসী তলায় পূর্ণিমার পুজো আর হরির লুটের কথা। হাততালি দিয়ে সবাই গান গাইতুম বেশ মনে পড়ে। 'হরির লুট পড়েছে- লুটের বাহার লুটে নে রে তোরা—চিনি সন্দেশ ফুল বাতাসা মণ্ডা জোড়া জোড়া...

বলা হোত বটে, সন্দেশ লুটে কোনদিন তুলতে পারিনি...নকুলদানা বা বাতাসাই লুট দেয়া হোত...আমরা আনন্দে তাই কুড়িয়ে নিতুম। রবি সোম এখন শনিমন্দির গড়ে তুলেছে খুব ভালো কাজ। রবি সোমের দরাজ হাত। আমাকে বলতে হবে যে এই শনিপুজোর একটা সামাজিক দিকও আছে।

দীপু একটু এগিয়ে এসেছে...দেখল মঞ্চের একপাশে কপালে বড় একটা টিপ কেটে সাংসদের একপাশে জোড় হাত করে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের পাড়ার রবিচন্দ্র সোম। ডাক নাম...

থাক...দীপু আবার সাংসদের বক্তৃতায় মন দিল...

শনির বাহন হল শকুন। যে পাখির প্রজাতি এখন বিপন্ন। আগে শহর প্রান্তের সব উঁচু গাছের মাথায় এই কালো পাখির দল কিলবিল করতো। গড়েরমাঠে, রাজভবনের ধারে, ভিক্টোরিয়ার পাশের বড় গাছগুলির মাথায়। এরা ঝাড়ুদার, মেথর ভাইদের মত সমাজবন্ধু পাখি। আপনাদের বলি এরা আকাশে দু কিলোমিটার উচ্চতা থেকেও মাটিতে পড়ে থাকা খাবার শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যায় মাটির খাবার এবং নিজেদের দিকে নজর রাখতে রাখতেই। মৃত এবং পচনশীল পশুর, আপনারা জানেন, দেহাবশেষ খেয়ে এই 'স্ক্যাভেনজার'রা পচন প্রক্রিয়ায়, বিলীন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে যা স্বাস্থ্য ও সামাজিক ভারসাম্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

মজার ব্যাপার হল তাদের নিজেদের কে প্রতিযোগিতায় নিরন্তর এগিয়ে রাখতে হয় খাবার খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে, অন্য অনেক স্বজাতি পাখি খাবারে ভাগ বসাতে জুটে যাবার আগেই।

প্রথম লক্ষ্যে নেমে আসার জন্য তাদের এই হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি শকুনদের জন্য অত্যাবশ্যক কেননা বড় শব অল্প এবং অনেক দূরে দূরে মেলে বা মিলতে পারে। আর এখন যখন শব অনেব ...তাদের প্রজাতি...বিলুপ্ত প্রায়।

শকুনদের দৃষ্টি বলার মত, কিন্তু অন্য পাখিদের যা নেই—অনেক শকুনের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল...

ওম্মা পচার মা বলল, দীপু শুনতে পায়, ছাংহুদের বাহনের দিকে অত নজর ক্যান গা?

...উত্তর আমেরিকার তুর্কি শকুনের ঘ্রাণশক্তি প্রখরতম।

আপনাদের জানিয়ে রাখি ইথাইল মার্কাপ্টান নামে এক রাসায়নিক শব পচনের ফলে নির্গত হয়...বায়ুমন্ডলে মেশে...এর ঘ্রাণেই তারা উড়তে উড়তে...

আপনাদের আর একটা তথ্য দেই পঁচিশ মাইল দূর থেকেও এরা খাবারের সন্ধানে এসে জমায়েত হতে পারে...

শকুন বিষয়ে আমার বক্তব্য দীর্ঘ করবনা, আরও অনেক কিছু বলার আছে...শনির বিষয়েও কিছু নিজস্ব ভাবনা আছে...

পাড়ার নিয়োগীবাবু পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন দীপুর এবং হঠাৎ চাপা স্বরে বলে উঠলেন ইনি তো ভাল্চার বিষয়ে একদম ফুটবলের ভালদেরামা...

মানে...?

বক্তৃতার মত আমার কথারও কোন মানে নেই। কী বুঝলেন।

দীপু চমকিত হল...সাংসদ প্রসঙ্গান্তরে যাননি এখনও বললেন এই সমাজবন্ধু শকুনদের প্রজাতি বিলুপ্ত হবার কারণও আমাদের ডাক্তারবাবুরা। মুড়ি, মুড়কির মত এরা ভল্তেরান নামের ওষুধ লেখেন। এতে ডাইক্লোফেনাক আছে। এই ওষুধ মৃত পশুদের লিভারে ডাক্তারবাবু মারফত জমা হয়। আর মেটে আপনার আমার মত প্রিয় বলে শকুনও প্রথমে লিভারটাই খায়...

ব্যাস হয়ে গেল...একটা প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল।...

দীপুর মনে পড়ল পশুপাখিদের নিয়ে লেখা একটা বিদেশী বইএ সে পড়েছিল আফ্রিকায় একটা খাবার নিয়ে চাররকম শকুন ধাক্কাধাক্কি করতে পারে নিজেদের মধ্যে। যখন এরকম ঘটে তখন এক একটি প্রজাতি, মৃত দেহের এক এক অংশে বৃত হয়।

কালো শকুন চামড়া ফেড়ে ফেলে, লম্বা গলার গ্রিফন শকুন লম্বা গলা নিয়ে মৃত দেহের গভীরে প্রবেশ করে, অনেক ছোট ইজিপ্টের শকুন পেছনে পড়ে থাকে ছাঁট বা বর্জিতাংশের জন্য। আর খুব বড় শরীরের দাঁড়িঅলা শকুন বাকি অংশের সদ্ব্যবহার করে। এরা রোদে শুকিয়ে যাওয়া শুকনো চামড়া ও মাংস ছিঁড়ে ফেলে নিখুঁতভাবে এবং এক সহজাত প্রবৃত্তিতে হাড় তুলে পাথরে ফেলে চূর্ণ করে মজ্জা বের করে...

...ডাক্তারবাবুদের ভুলে একটা প্রজাতি শেষ হয়ে গেল। এই ভুলের দায় কে নেবে? অবশ্য শায়েস্তা ভবনে গিরগিটির মত প্রকৃতির কিছু লোককে এনে বসানো হয়েছে। তারা রাবণ পুত্রের মত, কিন্তু মেঘের আড়াল নয় ফাইলের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে। এরাও একই প্রজাতির। যাদের পদোন্নতি হকের পাওনা...তাদের ফাইলের আড়াল থেকে অবনতি করে দেয়া

হয়...এই যোদ্ধারা আবার যখন যেমন তখন তেমন...এদের গিরগিটিরাও হিংসে করে...

এসব থাক একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি...প্রথমেই হরি লুটের কথা আমি বলেছি...আমি আশা করব...আমরা আশা করবো রবি সোমের মত আরো আরো অনেক রবি সোম, মঙ্গল, বুধ এগিয়ে এসে শনিতে মাতুন। দীপু দেখে রবি সোম হাতজোড় করে গলবস্ত্র মঞ্চে এখন দাঁত বের করে হাসছেন।... শনিপুজো ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ছড়িয়ে দিতে হবে...বাহন বেচারিরা শনির, পশুর শরীরের জমানো ডভেরান খেয়ে খেয়ে মরে গেল অকালে ঝড়ে গেল...রবি সোমের মত হরির লুট দিন...যেখানে নকুলদানা নয় টাকার বাণ্ডিলও হরির লুট হবে...

অহ্ দাদা ছাংহদ মরা শকুনের জন্য এত মরা কান্না কাঁদতিছে কেন...বলেন তো...নেত্যর মেয়েটা যে হাড় গিলেদের অত্যাচারের পরে খেয়া ঘাটে উলঙ্গ মরে পড়েছেল...ছেবেলা...কেউতো কাঁদতি আসেনি তহন...কেউ...

...আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে...রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে পরের লাইনে লিখেছেন...সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?...

তিনিও লুটের প্রবক্তা ছিলেন...কিন্তু পারেন নি...

দীপু কাঁপতে শুরু করল...লোকটা কী বলছে...এটা বিশ্বাস যোগ্য নয় পূজা পর্য্যায়ের বিখ্যাত গানটির ভাবার্থ এই দুঁদে রাজনীতিক অনুধাবন করতে পারেননি...এটা কী দলের সংশ্রবের ফল?

নিজেরই খেয়াল নেই দীপুর...ভিড় ঠেলে কখন সে একদম মঞ্চের সামনে চলে গেছে পায়ে পায়ে...দীপু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল...

দীপুর চিৎকারে কে কর্ণপাত করবে...কেউ তাকে চুপ করতে বলল...পেছন থেকে কেউ...

সাংসদ বলছেন...বলে চলেছেন...আপনারা কাড়াকাড়ি করুন শকুনের মত সুশৃঙ্খলভাবে করুন...রবিঠাকুর লিখেছিলেন সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে...

মন সরেনা যেতে, ফেলিলে একি দায়ে...

নানা আমাদের কারোর কাছে কোনো দায় নেই। জোটবদ্ধ ভাবে সর্বস্ব কাড়ুন...সুশৃঙ্খলভাবে করুন...যাতে বেশি ট্যা ফো না হয়...

বক্তা এখন বাচনভঙ্গি পাল্টে, স্বরের তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে পেছনে দুই হাত নিয়ে গিয়ে গলা দুলিয়ে বলছেন বিশ্বকবির ইচ্ছামত আমরাও একটা লুটের ভুবন গড়ে তুলতে চাই...জনমত গঠন করে আপনাদের উদার চিত্তকে সেদিকেই ধাবমান করুন। ঘরে ঘরে শনি ঢুকিয়ে দিন। বড় গাছে নয়, ঘরে ঘরে, ছাদে ছাদে বাহন শকুন পঁচিশ মাইল দূর থেকে উড়ে আসুক— হাততালি দিতে দিতে বলুন লুট পড়েছে লুটের বাহার...

দীপু পড়ে যাচ্ছিল...মাথা তার ঝিমঝিম করছে...ভিড়ের মধ্যেই কে একটা পেছনে সজোরে তাকে লাথি মেরেছে...মাথায়...মালটা কী করে। বুদ্ধিজীবী? ক্যালা না ...কে বলল

হায় রবীন্দ্রনাথ...তোমার অমন সুন্দর গানটাকে...

পুলিস জিপের আওয়াজ না? দীপুকে তুলে নিয়ে যাবে? অফিসার এসে হুঙ্কার দিলেন...দীপুর নাম তো বলছে না...বললেই বা কে আটকাবে?

রবি চন্দ্র সোম কে আছেন?

পানের রসে ভেজা দু'পাটি দাঁত বের করে শনিমন্ত তাকে আরও সম্পৃক্ত করে অতীব ভেজা গলায় বলল...স্যার এসে গেছেন...আসুন,

—আমি আসবনা...আপনি আসুন...

—কোথায় আসব? দেখছেননা সবশেষ হয়নি...একটু পরে...

...সব শেষ হবে...আমার তাড়া আছে...ওপর মহলের নোটিশ পেয়েছিলেন তো...কোর্ট আমাদের আজকেই সব...হোম ডিপার্টমেন্ট চেনেন তো...ওপরের...

বিধায়ক তেড়ে যাচ্ছিলেন...নাচার হেসে কমিশনার বললেন ব্যাপারটা আর থানায় নেই...যে আপনার হানায় থেমে যাবে...অ্যাই মন্দিরে তালা মারো...কুইক...

পুরমাতা পিতাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু কেউ দাঁড়াল না। বিধায়ক নমস্কার ঠোকার আগে সাংসদও ওপর মহলে দেখছি বলে গাড়ি নিয়ে ভো...

একটা লোক মঞ্চের কিছু দূরে উপুর হয়ে একধারে পড়েছিল...কনস্টেবল দেখতে পেয়ে ছুটে গেল জল আনল...সবাইকে ডাকল...ডাক্তারবাবুও এলেন...এ...কী...

লোকটার চরাচর ঝাপসা তখন। ঝাপসা আলোয় সে পাখার ঝাপটানি শোনে। কাঁদতে কাঁদতে কারা ছুটে আসছে...

পঁচিশ কিলোমিটার দূর থেকে নানা প্রজাতির শকুন কাঁধে শনি নিয়ে নেমে আসছে...

কালো শকুনদল তার চামড়া ছিঁড়ে ফেলল একটানে। লম্বা গলা শকুন তার বুকের বাদিক খুবলে দিয়েছে গলা ডুবিয়ে।

দৈঁড়ে ভীম শকুন সবে তার হাড় খুলে বিল পাড়ের শানে থেতলে ভাঙতে যাবে লোকটা কঁকিয়ে উঠল...

অ্যাই দীপু বাবু অ্যাই দীপুবাবু...কান্নাভেজা গলায় কেউ বলল আপনি কেন যে এখনও প্রতিবাদ করেন...মানে হয়?

লোকটার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে কেউ নাম ধরে ডাকছিল...

লোকটা ঝাপসা দেখল নিয়োগীবাবুর মুখটা—কিন্তু দৃষ্টির চরাচর জুড়ে দিগন্ত কালো করে বিপন্ন শকুন কুল ত্রস্ত নেমে আসছে কী...

অ্যাম্বুলেন্সও এসে পড়ল বলে—

ইঁদুরকল

শঙ্খ ঘোষ

ইঁদুর ধরার কল পেতেছি
ভাবছি এবার জব্দ হবে
এক্ষুনি এর কাঠের দরজা
বন্ধ হবার শব্দ হবে
ভাবছি এবার টপটপাটপ
ঢুকবে কলে ইঁদুরগুলো
দেখব এবার কীভাবে আর
দেয় বাছারা চক্ষে ধুলো।
কিন্তু ইঁদুর ধূর্ত ইঁদুর
দিব্যি স্বতঃস্ফূর্ত ইঁদুর
দেখছি সবার সব আয়োজন
দিচ্ছে করে ব্যর্থ বিধুর
কাঠঠোকরার মতন ওরা
কে জানত সব ঠুকরে খাবে
এবং আমরা সাদরে ফের
ঝাপটে নেব এ-কিংখাবে।
যা হচ্ছে সব খোলাখুলিই
কিচ্ছু কি অজান্তে হবে?
ইঁদুর নিয়ে ঘর করছি
সেই কথাটা মানতে হবে।

এখন চাঁদের আলোয়

উৎপলকুমার গুপ্ত

আজকাল কেউ আর চাঁদের দিকে তাকায় না, বরং চাঁদের আলোয়
রক্তপাত ঘটায়
চাঁদ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে, যে মানুষ আগে মলা গাঁথত ফুলের
তার হাতে উদ্যত অস্ত্র ঝলসে উঠছে
তার ভালোবাসার মানুষকে খুন করবার জন্য—
ভালবাসার মানুষের চোখে অগাধ বিস্ময়, এই মানুষকে সে
ভালবেসেছিল?

ভয়ে সে ছুটতে আরম্ভ করে, এবং নদীতে ঝাঁপ দেয়—
নদী তাকে কোলে তুলে নেয়।
রাগে গর্জন করে ওঠে জোয়ারের জল এবং দু-কূল ভাসায়।

পরদিন পাওয়া যায় মেয়েটির দেহ, আটকে আছে ভাসানের
প্রতিমার হাতে,
যেন ত্রিনয়নী তাকে রক্ষা করছেন সর্বভয় হতে। পাশেই
বিলের কালো জলে ফুটেছে হাজার পদ্ম,
উড়ে উড়ে আসছে পাপড়ির দল
তাকে প্রণামের জন্য। আর মা দুর্গা যেন ফিরে পেয়েছেন
তাঁর মেয়েকে,
যে গতরাত্রে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল এবং নেচে নেচে
আরতি করেছিল।

চাঁদ এসব দৃশ্য দেখছে আর ভাবছে, ভালোবাসার জন্য এ যুগে কেউ
ধূপের সুগন্ধী হয় না
তাই মৃত্যু আসে তাকে নিয়ে যেতে।

বাঙলা শায়েরি

জিয়াদ আলী

(কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত স্মরণে)

সন্ধ্যা এলেই প্রার্থনাতে শামিল হওয়ার ধুম পড়ে যায়
আমি তখন চাতক পাখি, দৃষ্টি আমার পান পেয়ালায়।
সারা দিনের শ্রমের পরে ক্লান্তি ঘোচাই শরাবখানায়
যার বুকেতে তৃষ্ণা অনেক এই রসে সে হৃদয় ভেজায়।

বাদশাজাদী তোমার সঙ্গে প্রেম করবার ছিল খায়েশ
আমি করি দিনমজুরি, তোমার শুধু আরাম আয়েশ।
এসব ভেবেই তোমার ডাকে দিইনি সাড়া মধ্যরাতে
কাটলে নেশা মন-মদিরার ভোরের আগে ঠিক তাড়াতে।

যে-মানুষের গতরখাটা ফসল ছাড়া দিন চলে না
তাদের কথা ফেরেশতারা দেয় না কোনও দিনই আমল,
ফেরেশতাদের সঙ্গ ছেড়ে তাই চলেছি শরাবখানায়
ফতোয়াধারী সব ব্যাটারাই আস্ত গাধা বদ্ধ পাগল।

এক টুকরো স্বাধীন ভূমি হয়নি কেনা নিজের জন্য
প্রাণ পাখিটা উড়ে গেলে ঝুলিয়ে দিও গাছের ডালে,
এক পেয়ালা শরাব দিয়ে মুছিয়ে দিও চোখের পাতা
মোল্লা-পুরুত নমাজীদের আমার সঙ্গে না-ই জড়ালে।

বাসনা

পঞ্চানন মালাকর

আগুন নিয়ে আজীবন ছুটছি অবিরাম
যদিও তাকে জ্বালাতে পারি না অকাতরে
আঁচটুকু তার অলক্ষ্যে বুকের মধ্যে সঞ্চারিত
করতে গিয়ে তোমার কাছে পৌছে যেতেও পারি।

এসব নিছক তোমার কোনো জানার কথা নয়
কারণ তুমি আগুন হতে পারোনি কখনো তাই
জলের বুদবুদ তুলে ভাসিয়ে দিয়েছ অভিমান
আর আমার সমস্ত শখ সযত্ন প্রয়াসে প্রতিবার।

জানি সকলেই সব কিছু পারে না শুধুই
অকারণ কসরৎ করে যায় অবিরাম ভ্রমে।
তবুও বৃথাশ্রমে কেউ কেউ আমার মতন
বুকের আগুন জ্বেলে বাসনা জাগাতে ভালোবাসে।

দুই পেয়ে জীব

অমিতাভ চক্রবর্তী

কাকেরা যদিও সর্বভুক
তবু স্বজাতি কখনো খায়না
কিন্তু মান হুঁশে গড়া
জীবকুলে সেরা বলে হকদার মানুষেরা
স্বজাতি নিধনে কোনো রেয়াত করে না
সৃষ্টিলগ্ন পার হয়ে ধাপ থেকে ধাপ
নানা বিবর্তন থেকে ক্রম উত্তরণ
নৃতত্ত্বের অনুপুঙ্খ নানা উপকথা
অসভ্য তকমা ছেড়ে সভ্য?
আদিমতা শেষে মানবতাবোধি?

এইসব গালভরা বুলি—স্রেফ বাচালতা
যখনই খোলসা সব জল্লাদ অতীত
হানাহানি খুনোখুনি যুদ্ধ মহাযুদ্ধ
নরহত্যা শুশুহত্যা সন্ত্রাস বীভৎসা
গণকবরের অযুত নারকীয় গাথা
স্বধর্ম স্বমত গরিমায় একচেটে ফতোয়ায় জেনোসাইড হলকস্ট্
তুলে ধরে আমাদের বেবাক কুকীর্তি
দেখি অন্য কোনো ভাবে নয়
মানুষ কোতল হয় সোল্লাসে মানুষেরই হাতে।

আমাদের দিশারী চার মহাকাব্য
রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসি
তা তো কাম ও ক্রোধের ভিতে গড়া
মনে হয় তার ভূতসই ধারক-বাহক
আদি অন্তহীন আমরা সবাই
তাই সেই পথে দানব স্পৃহায়
ঐ যে চলেছে দ্যাখো নিরন্তর কাল
লাজহীন কাঁধকাটা সভ্যতার মদগর্বী দুই পেয়ে জীব।

ডোম

আবদুস সামাদ

আঙুর আপেল আঁকি
ওরা বলে আঁকড় বা আতা।
কী করে বোঝাবো এ তো ছবিটবি নয়
একান্ত আমারই
আত্মজীবনীর ছেঁড়া পাতা

তবু আঁকা সাঙ্গ হলে যেন রাজ্য জয়।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি
অদ্ভুত অমেয় সুখ হয়।
ভুলে যাই অন্নকষ্ট
মন বলে, ওম্ শান্তি ওম্।

তখনি ছবিটি হাতে হামলে পড়ে এসে
খই-ভাজা অনাকয় পরাক্রান্ত ডোম।

তুমি তো আমার কাছে

স্বপন সেনগুপ্ত

এই সেই সংশ্লিষ্ট পালের হাওয়াটি
যে দিক থেকে আসছিল
সেদিকেই ফিরে যাচ্ছে।
চাঁদ কি সৌদামিনী? ইন্দু?
এত নাকফুল পরানো নাম কেন?

তুমি বলবে, নামে কি আসে যায়
চাঁদ তো চাঁদই
আমাদের বঙ্গনগরেও চাঁদ ওঠে
ভিক্টোরিয়ার ওপরও ওঠে।
কারও কাছে চাঁদ পোড়া রুটি
কারও কাছে বজ্রযোগিনী।

কারও কাছে নদীতে পালের হাওয়া
নদীতে ফুলে ওঠা গোল জোয়ার,
ঢাকঢোল বাজিয়ে চলেছি
চাঁদকে আকাশ থেকে পেড়ে আনবো
ভেবো না, কাউকে নয়—
তোমাকেই দেব,
তুমিই তো আমার কাছে
সংশ্লিষ্ট পালের হাওয়া।

ভোরের খবর

শ্যামল সেন

আধোঘুমে ত্রাসের বাতাস চোখের পাতায়,
উড়ছে যেন রক্তভেজা ভোরের খবর,
বিরহ-প্রেম সুসংবাদের স্বস্তি নয়
নিত্যদিনের ফাটা-কপালজোড়।
কেই বা জানে পোড়াভিটের কলজে-ছেঁড়া নোনাজলের স্বাদ
বাস্তুঘুঘুর দিনদুপুরের যুদ্ধজয়।

ছড়িয়ে পড়ে অচেনা সংশয়,
ঘুম ভেঙে যায় নিশিরাতে।
কলম হাতে—
আঁকছি যত হিজিবিজি খণ্ড-খণ্ড নারী-পুরুষ
ছন্নছাড়া ঘর-দুয়ার; পিণ্ডাকারে মানবশরীর,
ধড়-মুণ্ডের নেই ঠিকানা, কালচে-কালো রক্তমাংসে
নীল মাছিদের বেমক্কা ভিড়।
দেখছি নিথর ধ্বস্ত মুখের মরা-ফেনা মাথার খুলি
ফাঁসা-উদর খাবলা-স্তনের ছিন্ন বোঁটা চোখের মণি
লিঙ্গভেদে ছোটো-বড়ো মনুষ্যধন; নয়ানজুলি
লোপাট যত মানবজনম স্বর্ণখনি।

এইভাবে কি চিরকালীন পদ্য বাঁচে,
সাড়া দিতে কাছাকাছি মানুষরতন কেউ কি আছে?
ভোরের আগে চণ্ডাচাঁড়াল রাগে
কবির কলম পুড়ছে দ্যাখো আদ্যিকালের শ্মশানঘাটে

শীত এলে জীর্ণ পাতাস্তূপ

অপূর্ব কর

শীত এলে মনে হয় মরণের ধুম এসে নামে
বাতাসে যখন-তখন দুঃসংবাদ
কালও তো দুপুরে ফোনে কেউ কথা বলেছিল

বেদনার একটুকু রেশ ছিল বটে
এ শহরে কত স্থানে একদিন কী দারুণ হৈ রৈ
বলেছিল কতকিছু কেটে সবই বুঝি রেখে আসা বনে, বিহ্বল হিসাব

কতকিছু আমাদের জীবনের, এমনকি প্রেমের গানগুলিও বা মুগ্ধতা নিয়ে
মাঝে মাঝে কারো সাথে খুব কথা হত
এক সময় দীর্ঘশ্বাস, শেষ বাস চলে যাবে,—ওঠ

কত যে চেনা বাড়ি, প্রতিষ্ঠানঘর, এমনকী
চৈত্রের রোদে ঠা ঠা পথ, কোথাও গুলিরও শব্দ
আমাদের পায়ে দারুণ অশঙ্কুর, কী দামাল বেশ আজ ধূসর খুব দূর।

সব আজ দূর, মনে হতে থাকা নির্বাক স্মৃতির মিনার
হতে থাকা জাদুঘর তার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে আমরা ঠাসা
কেউ আধ্যাত্মিক ভাবে বলে বাসা বদল রে—বাসা

কে জানে, আমি শীতে জানালার পাশে বসে
দেখি পাশের গাছটির নিচে অগণিত পাতাস্তূপ
একসময় কেউ ঝাঁট দিয়ে নিয়ে ফেলে—কাছে আস্তাকুঁড়

হায় জীবন কী আস্তাকুঁড়।

সৃজন

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

কয়েকটি সাদাসিধে অক্ষর,
কয়েকটি এলোমেলো তুলির টান,
দূর থেকে ভেসে আসা একটু মেঠো সুর

হয়তো তৈরি করে দিতে পারে
একটি আশ্চর্য কবিতা,
একটি অনবদ্য ছবি,
কিংবা প্রাণজুড়ানো একটি গান।

এমনটা হতেই পারে, যদি অক্ষরগুলো
জড়িয়ে থাকে ভালোবাসা।
তুলির রঙে লেগে থাকে অনেক স্বপ্ন,
আর মেঠোসুরের প্রতিধ্বনি ওঠে হৃদয়ে।

ছোটো ছোটো কয়েকটি মাত্র বিন্দু
প্রতিদিন সৃষ্টি করে মৃত্যুহীন শিল্পের সম্ভার।

পাগল ঈশ্বরী

আরণ্যক বসু

অনেক চলার শেষে থমকে গিয়েছে নীলতারা
যেখানে ঘাসের বুকে পড়ে আছে কয়েকটা ছেঁড়াপাতা
অচেনা রুমাল হয়ে রয়ে গেছে প্রথম প্রেমের বিস্মৃতি
যে খাতায় লেখা ছিল কুড়ি আর একুশের মগ্ন পদাবলী

চন্দন গন্ধের বনে তুমি নারী, তখন বিকেল হয় হয়...
নজর করোনি তুমি আমাকে, তবুও ছিলাম আমি
বেভুল উন্মাদ কবি পাদানিতে ভুলে ফেলে যায় অসমাপ্ত কবিতাকে
যেখানে ডুকরে লেখা ছিল—তুমি কি আমার নীলতারা।

লক্ষ করোনি, ছিন্নকাব্য চোখেও পড়েনি
তখন তোমার চোখে অন্য আলো, অন্য আয়োজন
এক ঝাঁক বন্ধু নিয়ে গড়ে ওঠা বাইপাসে,
অথবা বোটানিক্যালে।
সন্ধ্যার সম্পৃক্ত আয়োজনে। সবার আড়ালে হাতে হাত, চোখাচোখি;
তখনও ছিলাম নীল, ছিলাম তখনও; বাদাম ছড়ানো ঘাসে।
না লেখা কাব্যের কাছে মাথা ঠুকে বলতে চেয়েছি—
তুমি কি আমার নীলতারা।

এলাহাবাদের সেই সুরের দুপুরে
কথা বলা তবলার ত্রিতালে, ঝাঁপতালে আর দাদরা কাহারবায়
যখনই তোমার চোখে ঝিলিক দিয়েছে উচাটন রোদ্দুর
সোনালি ডানার চিল হয়ে, কান্না চলকে দিয়ে আকুল বলেছি—
তুমি কি আমার নীলতারা।

তুমি তো তখন, চন্দন গন্ধের বনে পাগল ঈশ্বরী
তবুও ছিলাম আমি, আকুল ইচ্ছে হয়ে ছিলাম, ছিলাম...
আমাকে দেখতে পেয়েছিল।

অকথিত

অলোক সেন

সহজ সরল প্রশ্নে
তুমি জানতে চেয়েছ—

কী আর বলব "হ্যাঁ" ছাড়া।

ভেবেছি বলব কথা
নখ ঘুরিয়ে—যা,
এতদিন বলিনি, সেসব
হিমেল হাওয়ার কথা

তুমুল তুষারপাত আর
রাত্রির অসীম উদারতা

সহজ আর সরল উত্তরে
কী করে বলব বলো
খিদের সীমাহীন দুঃখের কথা
অন্তহীন লড়াইয়ের কথা
অপূর্ণ স্বপ্নের কথা
ভালোবাসার কথা
মেঘে ঢাকা তারাদের কথা...

বিভক্ত

সুনন্দ অধিকারী

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মেট্রোয়—
চোখ মেললাম যখন
দূরে বিন্দু বিন্দু আলো দ্যাখা যাচ্ছে...
মানে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে
আমি এখন খোলা আকাশের নিচে।

যদি এ গহ্বর শেষ না হতো
অথবা ফাটল ব্যাপারটাই
থাকত না জীবনে।

কিছু না হওয়ার যেমন।
হওয়ারও তেমনই দুঃখ আছে।
প্রথমটি একমাত্রিক হলে
দ্বিতীয়টি সেখানে বিভক্ত বহুধা...

শিল্পাঞ্চল

কৌশিক ঘোষ

সময়ের বাইরে থাকে বিস্তৃত মাঠ
একটা বড় ঘর, পাশে চিমনির খোল—
একটি বড় শিল্পাঞ্চল, যেটি আজও থাকে বসে
ছেলেদের ধরে আনে ফুটবল মাঠে

ব্যস্ত ফাগুন, এখনও এখানে রক্ত দেয় তরুণীর
সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে।

এখানে, সময় আসে বারবার
দুর্গা পুজোর মতো সংবৎসর
কুয়াশা কামড়ে ধরে সবুজ মাঠ
সাপ যেন শিকার ধরেছে এক গভীর
অরণ্যে-মাটি তার আলুনি হয়েছে কয়েক বছর
ধোঁয়ায় উড়ে যাওয়া সময়ের গার্হস্থ্য জ্বালানি
এখন তলানি।

শিল্পাঞ্চল ঘিরে রোদ বাড়ে সকাল ও দুপুরে
রোদে তাপে নিশ্চিহ্ন ট্রপিক্যাল জীবাণু—
আবার বর্ষার পর তারা ডানা মেলে
রোগ-শোক ঘিরে তার বালকের করুণ সংসার
জীবন যেমন থাকে জীবনের আয়ত গণ্ডিতে
শিল্পাঞ্চল থাকে তাকে ঘিরে বছরে বছরে।

ইস্কুল বড় হয়, স্কুল থেকে লেখা হয় বোর্ডে
শিল্পাঞ্চল বাড়ে, আগাছায় বসে পড়ে, টিন ভাঙে
মেশিনের ঘরে।

কবি নয়, কবিতা

সুদীপ কর

বরফের চাঁদে গোবি মরুভূমি
আলহ্লাদে শরীর দিয়াছে বিছায়ে।
রেলগাড়ির ঝিক্‌ঝিক্
তাকে প্রেমিক করেছে আবার।
মুখাবয়বে, নরম আলোয় বরফের
  আবিরের ছোঁয়া।
ভালোবাসার কবিতা পাঠ নয়,
দুলকি চালে লেখনীতে গেঁথে গেল
কবিতার পাণ্ডুলিপি।

যুদ্ধে যা ঘটেছিল

অমর মিত্র

মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়,

কোচবিহার জেলা

পশ্চিমবঙ্গ

ভারত।

বিষয় : মশালডাঙ্গা, মুন্দির ছিট, বাতৃগাছি, গয়াবাড়ি...ছিটমহলের নাগরিকগণের নিবেদনপত্র।

মহাশয়,

যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দা এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে গত শতাব্দীর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হইতে কী এক অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত উল্লেখিত মৌজাগুলিকে পাকিস্তান বলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী কালে সেই পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দাগণ বাংলাদেশি হইয়াছি। কেন হইয়াছি, তাহা আমাদিগের কপাল। কপাল না হইলে পাশের গ্রাম মদনাগুড়ি ইন্ডিয়া হয়, সেইখানে গ্রাম পঞ্চায়েত হয়, ভোটার কার্ড হয়, জল, কল আলো হয়, ঠিকানা হয়, চিঠি হয় কিন্তু আমাদের কিছুই হয় না। অথচ আমাদের পুরানো মসজিদে তাহারা, মদনাগুড়ি ইন্ডিয়ার বাসিন্দারা নমাজ আদায় দিতে আসেন। আমাদিগের মসজিদের আজান তাঁহারা শুনেন, ইমামের ঘর মদনাগুড়িই বটে। মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়, আমাদের জেলা শাসক আমাদের জেলা শাসক হইতে পারেন না। আমরা তাহা মানিব না। কেন না সে বহুদূর। একটা দেশ পেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে আর একটা দেশ। আমরা বাংলাদেশের ছিটের বাসিন্দা হইলেও সেই বাংলাদেশ অন্য দেশ। আমরা তাহা দেখি নাই। এই কারণে আপনার নিকটে আমাদের এই একান্ত নিবেদন।

মহাশয়, আমাদিগের কপালে পাকিস্তান হইয়াছিল কেন তাহা লইয়া কত কথাই না শুনা যায়। শুনা যায় মোগলদিগের সহিত কোচবিহারের মহামান্য নৃপতির যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগলের প্রতিনিধি রংপুর ঘোড়াঘাটের নবাব সৌলৎ জং এসে আমাদিগের মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণকে ঝাড় সিংহেশ্বরের প্রান্তরে লড়াই করে হারিয়ে দিল এক কালে। সেই যুদ্ধে আমাদিগের মহারাজার অন্দরমহলের বিভীষণ এক জ্ঞাতি ভাই দীনেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনের লোভে মোগলদিগের সহিত গোপনে যোগাযোগ করেন। সেই লোভী জ্ঞাতিভাই দীনেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসায় মোগল সম্রাটের তরফে ঘোড়াঘাট-রংপুরের নবাব সৌলৎ জং। কিন্তু পরের বছরই আমাদিগের পরাজিত মহারাজা আবার যুদ্ধ করেন ভুটান রাজার সাহায্য লইয়া। এবং তাঁহার জয় হয়। জয় হয় বটে কিন্তু কিছু মৌজার প্রজা নাকি সাবেক শাসক মোগলদের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বজায় রাখেন। কেন, না তাঁহারা নাকি মোগল সৈন্য ছিলেন। প্রথম যুদ্ধের পর মোগলের হাতে কোচবিহার

গেলে এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে মোগল সৈন্যদের কিছু অংশ এবং মোগল প্রতিনিধি রংপুরের নবাবের নিকট তাঁহারা খাজনা দিতে থাকেন। কোচবিহারের মহারাজা তাঁহার উদারতায় এই বিষয়ে আর দৃকপাত করেন নাই। সামান্য কয়েকটি গ্রাম যদি খাজনা না দেয়, কী যায় আসে? আমাদিগের পূর্বপুরুষ মোগল সৈন্য ছিল কি না জানা নাই, কিন্তু কৃষিই ছিল তাঁহাদের মূল জীবিকা তা আমাদিগের অজ্ঞাত। স্বাধীনতার পর রংপুরের নবাব যেহেতু পাকিস্তানের মত দান করেন, সেই কারণে ভারতে থাকিয়াও আমরা পাকিস্তানি হইয়া গেলাম। ইহাতে আমাদিগের দোষ কী? আমাদিগের কাহারো কাহারো নিকট রংপুরের নবাবের প্রজা হিসাবে খাজনার রসিদ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা স্বাধীনতার আগের কথা। স্বাধীনতার পর আমরা আর খাজনা দিই নাই রংপুরে গিয়া। আমরা কোচবিহার রাজাকেও খাজনা দিতে পারি নাই, কেন না রাজার প্রজার তালিকা হইতে আমরা বাদ ছিলাম সত্য।

মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়, আমরা কোচবিহার রাজার রাজত্বের সীমার ভিতর থাকিয়াও কী করিয়া রংপুরের জমিদারের প্রজা হইলাম, তাহা লইয়া বিস্তর গোলযোগ রহিয়াছে। কেন না আমাদের পূর্বপুরুষ যে যুদ্ধ করিতে ভিন দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনো কথা শোনা যায় না আমাদিগের দাদি বা নানি হইতে, নানা বা দাদা হইতে। বরং আমাদিগের নানি বা দাদি অন্য কথা কহেন, সেই কথা হইল কপালের কথা, ভাগ্যের কথা। শোনা যায় কোচবিহারের মহামান্য মহারাজা এবং রংপুরের নবাবের খেয়ালে ইহা ঘটিয়াছে। আমরা মহামান্য কোচবিহার রাজার প্রজা ছিলাম। আর রাজার প্রজা হিসাবে সুখে দুঃখে দিনপাত করিতাম। রংপুরের নবাব তথা ঢাকার নবাবের সহিত আমাদিগের কোনও সম্পর্ক ছিল না। রংপুর কোথায় অহা আমাদিগের পূর্বপুরুষ জানিতেন বলিয়া শুনা যায় না। শুনা যায়, রংপুর আর কোচবিহারের দুই ভাগ্য বিধাতা যুদ্ধ যুদ্ধ পাশা খেলিতে খুব ভালবাসিতেন। তখন তো ব্রিটিশ শাসন। সে আমলের মতো রাজায় রাজায় যুদ্ধ নাই। ইংল্যান্ডেশ্বরী যাহা কহিবেন, তাহাই হইবে। কিন্তু যুদ্ধে যেমন হয়, এক পক্ষ অন্য পক্ষের ভূমি দখল করে। অন্য পক্ষ তা উদ্ধার করে যুদ্ধ করিয়া। প্রজারা একবার ওপক্ষের দখলে যায়, আবার ফিরিয়া আসে পুরাতন প্রভুর নিকটে। অহাতে প্রজার জীবন বিড়ম্বিত হইলেও, প্রভুর জীবনে রোমাঞ্চ থাকে। সেই রোমাঞ্চ আর ছিল না তাই তাঁহারা পাশা খেলিতে বসিলেন, দুই ভাগ্য বিধাতা। ভাগ্য বিধাতাই কহিব, তাঁহাদের খেয়ালে আমাদিগের এই ভাগ্য রচিত হইয়াছে।

মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়, আপনি কি দ্যুত ক্রীড়া ভালবাসেন? আমরা জানি মহাভারতের যুগে ইহা ছিল বিনোদনের মস্ত উপায়। ইহা তো রাজা-রাজড়ার খেলাই বটে। বাজি রাখিয়া খেলা হয়। মহাভারতে পাশার চালে পাণ্ডবগণ সর্বহারা হন, নিজেদের রাজ্য হারাইয়া স্ত্রী দ্রৌপদীকে বাজি ধরিয়া হারিয়া যান। ভূমি এবং নারী, উভয়ই সম্পদ বলিয়া পণ্য হইত সেই সময়। আর এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া জানা নাই। শুনা যায় কোনো এক সুফসলের সুভিক্ষার বছরে রংপুরের নবাব কোচবিহার আসেন সৌজন্য সাক্ষাৎকারে। সেই সাক্ষাৎকারের কথা আমাদিগের দাদির মুখে শুনিয়াছি। দাদি কহিতেন, এমনিতে তাঁহারা দুই মহারাজা হইলেও তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্য সুখেই রাখিয়াছিলেন। ঢাকার নবাব খাজনা লইতেন

রংপুর হইতে। ঢাকার নবাব কর দিতেন মহামান্য মহারানিকে। মহারানির শাসনে তখন এই দেশ। কোচবিহারের রাজাও কর দিতেন মহারানি তথা ব্রিটিশ সম্রাটকে। তখন দুই রাজার ভিতরে যুদ্ধ ছিল না, প্রজার জীবনে অনিশ্চয়তা ছিল না, যুদ্ধে যাইতে হত না ঢাল তলোয়ার লইয়া।

রংপুরের নবাব আসিয়াছিলেন ঘোড়ায়। সঙ্গে কত ঘোড়সওয়ার। কোচবিহার রাজা হাতির পিঠে চাপিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন নিজ রাজধানীতে। তূর্য, ভেরি বাজিয়াছিল। প্রজারা খুশি হইয়াছিল। রাজ্যে কোনো আড়ম্বর ঘটিলে প্রজাদিগের আনন্দ হইয়া থাকে। তাহাদের ভাগ্যে তখন কিছু জুটিয়া যায়। তখন ছিল শীতকাল। হিমালয় পর্বত হইতে হিম কুয়াশা নামিয়া আসিত বেলা পড়িতেই। কিন্তু দিনমান ছিল সুন্দর, রৌদ্রকরোজ্জ্বল। আমাদিগের সৌভাগ্য যাইবার পথে এই স্থানে তাঁবু ফেলিয়াছিল নবাবের লোক লস্কর। শোনা যায় লোকলস্কর লইয়া রংপুরের নবাব কোচবিহার রাজার নিকট যাইবার কালে এইখানে গরিব দুঃখীদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। আসলে তিনি পবিত্র রমজান মাস ও ইদলফেতর শেষ হইবার পর আসিয়াছিলেন। লোকজন দুহাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিল রংপুরের নবাবকে। ইহাতে কি আমাদের মহামান্য প্রভুর মান গিয়াছিল? কে জানিবে তাহা? দাদি কহিতেন, সেই সময়ই আমরা রংপুরের প্রজা হইয়া যাই। কী করিয়া তাহা হইল? দুই প্রভুর দেখা হইবার পর তাঁহারা ক'দিন ধরিয়া নাকি পাশা খেলিতে থাকেন। আনন্দ খুব এই খেলায়। ধন-সম্পত্তি, ভূমি ও নারীকে বাজি রাখা যায়। শোনা যায়, কোচবিহারের রাজা এবং রংপুরের জমিদার যুদ্ধ নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন পরস্পর পরস্পরের নিকটে। কামান বন্দুকের ব্যবহার নাই, ইহা বড় দুঃখের তাহা বলিয়াছিলেন রংপুরের জমিদার। ইহা শোনা কথা। ইহার কোনো ভিত্তি নাই। কিন্তু দাদি কহিতেন ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে। রংপুরের নবাব ঢাকার নবাবের সুরে কহিয়াছিলেন, যুদ্ধ নাই, বড় দুঃখের কথা। যুদ্ধে কত কী ঘটিয়া থাকে, বাজিতে রৌপ্যমুদ্রা শেষ হইলে আমার মাটি তুমি দখল করিয়া লও, তোমার মাটি আমি দখল করিয়া লই। উত্তেজনা থাকিবে জীবনে। তাহা আর নাই যখন দুই প্রভু পাশা খেলিতে লাগিলেন। কহিলেন উহাই একমাত্র যুদ্ধের বিকল্প হইতে পারে। পাশা খেলিতে খেলিতে রৌপ্যমুদ্রা আদান-প্রদান করিয়া নাকি নিঃশেষ হইয়াছিলেন। তখন উভয়েই তাঁহাদের অধীনস্ত মৌজা বাজি ধরিলেন।

ইহা শুনিয়া থাকি বটে, কিন্তু বাজিতে উভয়পক্ষ নিঃশেষ হইলে রৌপ্যমুদ্রা গেল কোথায়? তখন রংপুরের নবাব কহিলেন : আমি রাখিলাম অঙ্গারপোতা।

কোচবিহারের রাজা কহিলেন : আমার বাজি মশালডাঙা।

নবাব কহিলেন : দহগ্রাম।

রাজা কহিলেন : বাতৃগাছ...

এক প্রকার যুদ্ধের মতো হইলো তাহা। কোচবিহারের রাজার মৌজা রংপুরের নবাব জিতিয়া লইলে, রংপুরের লোকলস্কর ভেরি বাজাইয়া উল্লাস করিল। আকাশের মেঘের দিকে তাক করিয়া গুলি ছুড়িল। শুনা যায় ইহার ফলে সেই শীতকালেও নাকি আকাশের মেঘ ভেদ করে গুলি এবং মশালডাঙায় বজ্রপাতসহ বৃষ্টি নামিয়েছিল। তাহাতে ঘরে আগুন লাগিয়াছিল, মানুষ বজ্রাহত হইয়া মরিয়াছিল, ফসল নষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধে যেমন হইয়া থাকে। ইহার পরে রংপুরের

নবাবের মৌজা কোচবিহার-রাজা জিতিয়া লইলেন পাশার মোক্ষম চাল দিয়া। উল্লাসে তিনি আকাশের দিকে নাকি কামান দাগিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজার বাড়ির মাথায়ও নাকি মেঘ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। শীতের তামাক চাষ, সরিষা চাষ নষ্ট হইয়াছিল। নীল আকাশ ফাটিয়া বজ্র নামিয়াছিল। মানুষ হত হইয়াছিল কম নহে। যুদ্ধে তো অমন ঘটিয়া থাকে। মানুষ হত হয়, ফসল নষ্ট নয়। দাদি কহিতেন যে যে মৌজায় অকালে বৃষ্টি নামিয়াছিল, সেই সেই মৌজায় ভাগ্য বদল হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে রংপুরের নবাব তথা ঢাকার নবাবের জমি কোচবিহার রাজা অধিকার করিলেন এবং কোচবিহার রাজার জমি রংপুরের জমিদার অধিকার করিলেন। তবে একটি কথা সত্য, রংপুরের নবাব পাশা খেলায় তেমন কৌশলী না হওয়ার কারণে তিনি পাইলেন কম আর কোচবিহার রাজা পাইলেন বেশি। রংপুরের নবাব সঙ্গে আনিয়াছিলেন গাদা বন্দুক, তাহা আর কতখানি মেঘ ফাটাইতে পারে, তাহার ফলেও তিনি জিতিলেন কম। আর কোচবিহার রাজায় জয়ে হস্তির বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা এবং কামানের গুমগুম একই সঙ্গে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অকাল বরিষণে মৌজাগুলি ভাসিয়া গেল। তখন অঘ্রান মাস। ধান কাটা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাঠের ধান ঘরে আসে নাই। পাকা ধান মাঠেই ঝরিল। চাষীরা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শোনা যায় দুই বিধাতা পাশার চাল দিতে আরম্ভ করিলে, দিবসেই মশালডাঙা, বাতৃগাছ, অঙ্গারপোতা গ্রামে অন্ধকার নামিয়াছিল। পেঁচা বাদুড় শৃগালের ঘুম ভাঙিয়াছিল।

মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়, ইহা দাদিরা কহিতেন বটে, কিন্তু এও কহিতেন সমস্তটা যে সত্য হইবে এমন নহে। ইহা বদ মানুষের রটনা মাত্র। রাজচন্দ্রে কলঙ্ক স্বরূপ। কিন্তু সেকালে প্রভুরা আকাশের মেঘ ফুটো করিয়া বৃষ্টি নামাইতে পারিতেন ইহা শোনা যায়। দক্ষ বন্দুকবাজ আর কামানবাজ ছিল নবাব আর রাজার হেফাজতে। যাহা হউক, আমাদিগের ভাগ্য সেই পাশা খেলায় নির্ধারণ হইয়া গিয়াছিল। এখন যে আমরা ভারতের ভিতরে বাংলাদেশ হইয়া আছি এবং ওপারে অনেক মৌজা বাংলাদেশের ভিতরে ভারত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ সেই সেই বন্দুক এবং কামানের উল্লাস। অশ্বের হ্রেষা ও হস্তির বৃংহিত। তাঁহাদের সেই খেলা খেলা যুদ্ধে আমাদের কপাল পুড়িল।

মাননীয় মহোদয়, আমাদিগের দেশ নাই। দেশ নাই তাই কিছুই নাই। হাসপাতাল, ইস্কুল, ব্লক আপিস, পঞ্চায়েত, থানা, চৌকি, রেশনকার্ড, ইলেকট্রিক, জল কিছুই নাই। মোবাইলের সিমও নাই। ফলে গ্রাম হইতে বাহিরে ইন্ডিয়া গেলে ভয় হয় কখন অনুপ্রবেশের দায়ে ধরা পড়ি। অথচ আমরা তো ইন্ডিয়াই হইতাম, ভাগ্যের ফেরে হই নাই। অকাল বৃষ্টি আমাদিগে এই করিয়াছে। ইন্ডিয়ার ইস্কুল কলেজে পড়ার কোনো উপায় নাই মিথ্যা পরিচয় গ্রহণ করা ব্যতীত। ছিটমহলের কন্যার জন্য ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশ, কোথাও পাত্র পাইবার উপায় নাই। ছিটমহলের পাত্রকে কেহ কন্যাদান করিতে চাহে না। যাহার কোনো দেশ নাই, তাহার চালও নাই, চুলাও নাই, তাহাদের মাথার আকাশ ফুটো হইয়াই আছে, ফলে গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্র, বর্ষায় প্রবল ধারাপাত হইয়াই থাকে। জানি দেশ পাইলে ইহা আর থাকিবে না। অনাথের নাথ হইবে।

আমাদিগের পাশের গ্রাম মদনাগুড়ির সব রহিয়াছে। সেই যুদ্ধের সময় মদনাগুড়ির আকাশ ভেঙে অকাল বৃষ্টি হয় নাই। তাই ফসলও মরে নাই। এখন মদনাগুড়ি যাইতে বাতৃগাছ পার

হইতে হইবে। বাতৃগাছ বাংলাদেশ, মদনাগুড়ি ইন্ডিয়া। তাহার পাশে সিঙ্গিমারি নদী ইন্ডিয়া। নদী লইয়া বাজি ধরেন নাই প্রভুগণ। কেন না নদীর ভিতরে প্রজা নাই। খাজনা দিবে কোনজন? মানুষ সমেত গ্রাম হস্তান্তরে সুখ অনেক।

অভিযোগ এই যে গত দুই সপ্তাহ আগে তিন ব্যক্তি আসে এখানে মোটর সাইকেলে করিয়া। তাহার ইন্ডিয়ার বাসিন্দা। দিনহাটায় ঘর। তাহারা অপরাহ্নবেলায় সঙ্গে করিয়া একটি তরুণীকে লইয়া আসিয়াছিল। ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতেছিল কিনকিন করিয়া। কী করিয়া আনিল কে বলিবে? পুলিশ সীমান্তরক্ষী থাকিতেও ইহা হইয়া থাকে। আমরা সেই তরুণীর মুখ তখন দেখি নাই। তাহারা গ্রামে পৌঁছিয়াই ফসলের ক্ষেতের দিকে চলিতে লাগিল। একজন পকেট হইতে চীনা পিস্তল বাহির করিয়া নির্মেঘ আকাশের দিকে তাক করিয়া গুড়ুম করিল। ইহাতে আমাদিগের বুক হিম হইয়া গেল। দিবসেই রাত্রি নামিল। শৃগাল প্রহর ঘোষণা করিল। দাদি নানিরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। যুবতিরা ঘরের কোণে গিয়া আত্মগোপন করিল। পুরুষেরা কপাল চাপড়াইতে লাগিল। আবার যুদ্ধ। মানুষ মরিবে বজ্রাঘাতে। অকাল বৃষ্টি নামিল প্রায়। মেঘ ফুটো হয়ে গেছে নিশ্চিত। ফসল আর থাকিবে না।

ক্রমে অন্ধকার নামিল। মাঠ হইতে স্ত্রী কন্ঠের আর্তনাদ শুনা গেল একবার। তারপর সব চুপ। পরদিন ভোরবেলায় আমরা এক তরুণীকে দেখি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ক্ষেতের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে যে তিন ব্যক্তি অপহরণ করিয়া আমাদের ছিটমহলের গ্রামে আনিয়াছিল। সমস্ত রাত ধরিয়া ধর্ষণ করিয়া অতঃপর হত্যা করিয়া মধ্য রাতে চলিয়া যায় তিনটি মোটর সাইকেলে। মহাশয়, এই ঘটনা ঘটিবার পর আমরা চারদিন ধরিয়া দেখিলাম সেই লাশ পচিতে লাগিল, খবর পাওয়া গেল কিন্তু ইন্ডিয়া ঢুকিতে পারিল না বাংলাদেশে। ইহা আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞাত রহিয়াছে যে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের পুলিশ ও কর্তাব্যক্তিদের লইয়া ইন্ডিয়ার পুলিশ ভিতরে আসিয়া লাশ লইয়া গেল। এবং সঙ্গে লইয়া গেল ছিটের নিরীহ তিন যুবক, নইম, রহিম আর মইনকে। তাহাদের বর্ডারের নিকট অবধি লইয়া গিয়া কী মনে হওয়ায় ছাড়িয়া দিতে ইন্ডিয়ার পুলিশ ধরিল অনুপ্রবেশকারী হিসাবে। তাহারা কী করিল যে আলিপুরদুয়ার জেলখানায় বন্দী রহিল? ইহার সাতদিন পর দুই ব্যক্তি আসিয়া শাসাইয়া গেল, যদি কিছু বলি কাহাকেও, গ্রামে আগুন দিয়া ঘর পুড়াইয়া দিবে। 'ডবকা মেয়েছেলে' যা আছে কেউ রক্ষা পাবে না। তুলে নিয়ে যাবে অন্য ছিটে। ইতিমধ্যে সেই লাশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে দিয়া গিয়াছে কেন না সেই তরুণী ভারতেরই। ক'দিন আগে হইতে উধাও হইয়াছিল। যেহেতু ঘটনাটি বাংলাদেশ ছিটে ঘটিয়াছে বিচার বাংলাদেশের আদালতে হইবে। অপরাধী যেহেতু ইন্ডিয়ার অথবা বাংলাদেশের তা পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, সেই কারণে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদিবে।

মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়, সেই তরুণীর পিতা নীলকণ্ঠ আঁধিয়ার একদিন আমাদের গ্রামে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, ইহা যদি ইন্ডিয়া হইতো, তবে বিচার ইন্ডিয়ায় হইত। ইহা যদি ইন্ডিয়া হইত, তবে তাহারা এইখানে আসিয়া পরম নিশ্চিন্তে মেয়েটিকে ধর্ষণ ও হত্য করিতে পারিত না। পুলিশ খবর পেয়েছিল মেয়েটিকে নিয়ে দুষ্কৃতিরা ছিট বাতৃগাছ এ প্রবেশ করেছে। কিন্তু ছিটমহল যেহেতু বাংলাদেশ, অন্য রাষ্ট্র, পুলিশ প্রবেশ করিতে সাহস পায়

নাই। ছিটে প্রবেশ করা পুলিশকে যদি হত্যা করে কেহ, ইন্ডিয়ার পুলিশ কিছু করিতে পারিবে না ভিন্ন রাষ্ট্র বলিয়া। অথচ আমাদিগের রাষ্ট্র কোথায়? আমাদিগের না আছে ইন্ডিয়া, না আছে বাংলাদেশ। শঙ্কিত হইয়া আছি কবে তাহারা আসিয়া আমাদের ঘর পুড়াইয়া স্ত্রী ধন লুট করিয়া আর এক ছিটে প্রবেশ করে। নীলকণ্ঠ আঁধিয়ার এখন ছিট বাতৃগাছ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। ইন্ডিয়ার লোক তাহার ভোটার কার্ড পরিচয়পত্র নিজ দেশে রাখিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মা মরা মেয়েটির জন্য রোদন করে। তাহার সহিত আমাদিগের বিবি ও মেয়েরাও রোদন করে। আপনি আসিয়া দেখিয়া যান পুরাকালের নকল যুদ্ধ, পাশাখেলার যুদ্ধের পরিণাম কী? কুরুক্ষেত্রে আঠারো দিনের যুদ্ধের পর যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছিল জগতবাসী, তাহাই শুনিতেছে ছিটের মানুষ।

অতএব মহোদয়, আপনি বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইয়া আমাদিগের ক্লেশ দূর করিবেন সেই আশায় এই পত্র লিখন। পুরাকালে যে যুদ্ধ, না যুদ্ধের মহড়া, না নকল যুদ্ধ, না কি শুধুই আনন্দ প্রকাশের জন্য আকাশের মেঘ ভাঙা হইয়াছিল কামান বন্দুকে তাহা জানা নাই, কিন্তু আমাদিগের নিকট তাহা অনন্ত এক যুদ্ধক্ষেত্র দিয়া গিয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না সত্য।

নমস্কার লইবেন।

ইতি

মনসুর মিঞা, হাতেম মিঞা, কোরবান আলি ইত্যাদি ও নীলকণ্ঠ আঁধিয়ার।
সাকিন ছিট বাতৃগাছ, মুনসির ছিট, মশালডাঙা...।

পুনশ্চ নিবেদন এই যে, সেই ব্যক্তি নীলকণ্ঠ আঁধিয়ার সেই গ্রামেই রয়ে গেছে। তাহার ভারতীয় ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড সব ভারতেই রয়ে গেছে। মেয়ে মরেছে যেখানে সেখানে সে পরিচয়হীন হয়েই মরবে। মরবেই। সে জানে সেই ধর্ষক তিন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া যাইবে একদিন না একদিন। কেন না সে হত্যাকারীদের চেনে। আর নীলকণ্ঠ আঁধিয়ার হত হইলে সেই চারদিন ধরিয়া তাহার লাশও পচিবে এখানে। সে তো ইন্ডিয়ার লোক, কিন্তু বাংলাদেশে যাইয়া মরিবার অধিকার তাহার আছে কি? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক ইহাতে মত দান করিবে জানি, কিন্তু আমাদিগের নিকট এই বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। আমরা সেই সিদ্ধান্তের জন্যই অপেক্ষা করিতে থাকিব, এত বছর তো অপেক্ষাই করিলাম। নীলকণ্ঠের অপেক্ষা আরম্ভ হইল সবে। হত হইবার জন্যই সে দেশত্যাগ করিয়া দেশহীন রাষ্ট্রহীন হইয়াছে।

তিনি আসবেন, বলে গিয়েছেন

শচীন দাশ

এইমাত্র এসে তিনি ফিরে গেলেন। বেশ খানিকটা ছিলেন কিন্তু। ঠোঁটে সেই মৃদু হাসি ও হাতটা মাঝে মাঝে নিজের মাথায়। টাকের ওপরে ঘষছেন। আর ঘষতে ঘষতেই আজ আবার কথায় কথায় নানারকম সুখাদ্যের বিবরণ। বিশেষ করে জানাচ্ছিলেন বড়োবাজারের সেই হোটেলটার কথা। নিরামিষ হোটেল। কত রকমের যে নিরামিষ খাওয়াবে সেখানে। আর কী পরিষ্কার। অথচ দেখুন খুব একটা দূরে নয়। বিবাদি বাগ থেকে এগিয়ে ফ্লাইওভারের মুখে নামবেন। সোজা যাবেন। তারপর ডাইনে। এরপর বাঁয়ে। একটু হাঁটলেই এরপর লম্বামতো বহু পুরোনো একটা দোকান। সাইনবোর্ডে নাম একটা ছিল বটে তবে এখন আর সেটা পড়া যায় না। রোদে পুড়ে ও জলে ভিজে অক্ষরগুলো সব উঠে গিয়েছে। কিন্তু লোকে আর সেদিকে তাকায় না। জানে, না চিনলেও অসুবিধে নেই। কালিবাবুর ভাতের হোটেল বললেই কেউ না কেউ ঠিক দেখিয়ে দেবে।

তা আপনি গিয়ে হয়তো বসেছেন। বসতেই ধোওয়া কলাপাতা, নুন ও লেবু। আর তারপরেই সুগন্ধী চালের ভাত। দেরাদুন আতপ। ভুরভুর করে গন্ধ উঠছে। গরম ভাতের গন্ধ। সেই গন্ধের ওপরেই প্রথমে ঘি আসবে। তারপর শুক্তো। বড়ি দিয়ে বেশ জমিয়ে করে কিন্তু বুঝলেন। এরপর পটলের দোরমা। আর তারপরেই তো ওদের বিখ্যাত সেই ধোকার ডালনা। না না, এখানেই শেষ নয়। এরপরেও তো আছে আবার আর-একটা আইটেম। কী বলুন তো? চাটনি। শেষপাতে চাটনি। কী যে স্বাদ তার। আমের দিনে কাঁচা আম দিয়ে। সঙ্গে একটু আলুবোখরা। অন্যসময়ে যখন যেটা পাওয়া যায় চাটনির উপকরণ হিসেবে। অথচ দেখুন, রেট কিন্তু বেশি নয়। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও একদম নিরামিষ। কিন্তু ওই যা সমস্যা।

কী সমস্যা?

বেলা একটার পরে গেলে আর পাবেন না।

কেন। খদ্দের থাকে না বুঝি?

উরি বাপ্‌স। থাকে না মানে? প্রচুর আসে। কিন্তু ওদের ওই একবেলার ব্যাপার। সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা।

এইরে, তাহলে তো বারোটার মধ্যেই যেতে হবে।

তাই তো যাবেন। আমিও তো তাই গিয়েছি। নাহলে আর আবিষ্কার করলাম কী করে—

তাহলে তো যেতেই হয়।

নিশ্চয়ই যাবেন। এমন একটা সুখাদ্যের সন্ধান দিলাম...

তা অবশ্য ঠিক। তাহলে কালই চলে যাই—

হ্যাঁ, যান না। কালই চলে যান। বললে আমিও না হয় সঙ্গ দিতে পারি আপনাকে।

তাহলে তো চমৎকার। কোথায় দাঁড়াবেন বলুন—

এইমাত্র তিনি এসে ফিরে গেলেন। তীব্র বাদানুবাদ চলছিল আমাদের মধ্যে। আলোচনাটা ছিল ডাক্তার অবিন চৌধুরীকে নিয়ে। প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট। কিন্তু ভীবণ মুডি। নানান খামখেয়ালিপনা আছে তাঁর। কিন্তু হলেও অসাধারণ ডাক্তার। পেট ধরলেই বলে দিতে পারতেন পেটের কোথায় কী বাঁধিয়ে বসেছ। তিনি এসে শুনলেন কথাটা। এবং শুনেই বেশ জমিয়ে বসলেন।

আরে শুনুন তবে। হয়েছিল কী...

আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের দিকে। এবারে তিনি হয়তো নতুন কিছু বলবেন। নতুন কোনো সংযোজন। যা আমরা জানি না। অথবা জানলেও এমন সুন্দর করে শুনিনি। তিনি শুরু করলেন। জানেন তো সেই ঘটনাটা? উজ্জ্বল মুখে ঝকঝকে চোখে ঠোঁটের কোনায় একফোঁটা হাসি খেলিয়ে তিনি জানালেন, কোণা এক্সপ্রেস হাইওয়ে হওয়ার সময় সার্ভে-রিপোর্টে দেখা গেল রাস্তাটা রয়েছে তাঁর বাড়ির ওপর দিয়ে। অতএব নোটিশ পড়ল বাড়ি ভাঙার। ডাঃ চৌধুরী নোটিশটা নিলেন। নিয়েই জ্যোতিবাবুকে ফোন। এবার এ রাজ্য থেকে তিনি বিদায় নিচ্ছেন। অনেক হয়েছে আর নয়। সেকি, কেন! জ্যোতিবাবু জানতে চাইলে তিনি জানালেন, তা কী করব। আমার বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা গেলে আমি কি আর বসে থাকতে পারি। আমি আর এদেশে থাকব না। আরে না না, জ্যোতিবাবু বললেন, আপনার মতো ডাক্তার বাইরে চলে গেলে আমার রাজ্যের গরিব মানুষগুলোর কী হবে। আপনিই তাদের ভগবান। আমি দেখছি। আপনাকে কি ছাড়া যায়?

রাস্তা সরে গেল। ডাক্তার অবিন চৌধুরী আবারও বহাল তবিয়তেই সেখানে তাঁর পেশেন্টদের দেখতে লাগলেন।

বাহ্! এটা তো জানতাম না—

জানতেন না, না? তিনি হাসছেন তখনও। মিটমিট করে।

এইমাত্র তিনি এসে ঢুকলেন। ঢুকলেন বড়োই কুণ্ঠা নিয়ে। আজ একটু দেরি করেই এসেছেন। আবার চলেও যাবেন তাড়াতাড়ি। কে একজন আত্মীয়া আছেন তার হাসপাতালে। খুবই অসুস্থ। তাকে দেখে এসেছেন। আবার তার জন্যে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরবেন। তবে জানালেন, হয়তো তাকে এরই মধ্যে ছেড়ে দেবে। ফলে পরেরদিন থেকে তিনি শেষপর্যন্ত থাকবেন না। না থাকলে সবার সঙ্গে দেখা হয় না। এমনকি ওই চায়ের আড্ডাটায়ও পর্যন্ত যাওয়া হয় না।

চায়ের আড্ডা।

হ্যাঁ, কানুর চা। অসাধারণ করে। ওপরে একটু মালাইও থাকে। আবিষ্কার করেই একে একে অনেককেই তিনি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। সম্পাদকীয় দপ্তরে আড্ডাটা শেষ হতেই আবারও ওখানে একটা মিনি আড্ডা। ভাঁড়ে ভাঁড়ে মালাই চা হাতে নিয়েই শুরু হত জমাটি আড্ডা। সে আড্ডায় উঠে আসত কত যে মানুষ। কত যে ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া কত যে প্রসঙ্গ উঠে

আসত হুটহাট। আর কত যে বিষয়। মধ্য ষাটের ছাত্র আন্দোলন, অমুক সালের প্রেনাম, তমুক সালের সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে কণিকা, সুচিত্রা, দেবব্রত বিশ্বাস, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন, দীপেন্দ্রনাথ আসতেন না বুঝি? না না, খুবই মিস করছেন এসব। তিনি আক্ষেপ করলেন এদিন।

আমরা তখনও অনেকে ঢুকেছি। কেউ বা ঢুকছি। কাঁধে প্রায় সবারই ঝোলা। কেউ বা পাঞ্জাবি পরনে কেউ বা প্যান্ট-সার্ট পরা। ঢুকে যে যার মতো গুছিয়ে বসব এই সময়েই তিনি। পরনে সেই আদি ও অকৃত্রিম সাদা হাওয়াই সার্ট ও সাদা প্যান্ট। একটা সামান্য ঝোলা ব্যাগ কাঁধে। সে ব্যাগে বই, দু-একটাও ম্যাগাজিন।

কী হল, এত দেরি—

আর বলবেন না। বলেই তিনি গুছিয়ে বললেন তার সমস্যাটা।

আমাদের মধ্যে কেউ বুঝি গলা নামিয়ে *বহুরূপী*-র নাটক নিয়ে আলোচনা করছিল। গতকালই তাঁদের একটা শো গিয়েছে। 'নানাফুলের মালা'। কেউ হয়তো সদ্য দেখে এসেছে সেটা। এবং সে যে ওই নাট্যদলের সব নাটকই দেখেছে সে কথাও সগর্বে জানাচ্ছিল। এই সময়েই তিনি। কানে গেল তাঁর কথাটা। আর যেতেই তাঁর মুখে দেখি সেই মিটমিটে হাসিটা। অর্থাৎ কিছু বলবেন। কিছু একটা জানাবেন তিনি এখন।

এবং জানালেনও। বললেন ওই নাটকটা তিনি প্রথম শো-রেই দেখেছেন।

প্রথম শো-এ।

হ্যাঁ, কেন আমি তো *বহুরূপী*-র সব নাটকই প্রথম প্রোডাকশান দেখেছি। মানে যেদিন থেকে আমি ওদের নাটক দেখছি আর কী—

সব নাটকেরই?

হ্যাঁ। একবার শুধু মিস হতে হতে বেঁচে গিয়েছি—

কী রকম? আমরা ততক্ষণে উদ্‌গ্রীব। তিনি শুরু করলেন :

আরে *রাজা অওদিপাউস* দেখব বলে লাইন দিয়েছি। কী ভীড় কী ভিড়। মানুষ মানুষের মাথা খায়। কলকাতায় ছিলাম না। ফলে আগে কাটতে না পেরে শো-এর দিন লাইন তো দিয়েছি... কিন্তু দিলে কী হয়। কটা আর টিকিট থাকে সেদিন। ফলে পাওয়ার আশা খুবই কম...কী করি কী করি...আমার আগে অন্তত শ'খানেক লোক। বুঝলাম বৃথাই দাঁড়ানো। যে কোনো মুহূর্তেই কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই হল। একসময় কাউন্টার বন্ধ হয়ে যেতেই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষজন। পাগলের মতো চারপাশে তাকাচ্ছে। তা আমিও খোঁজ করেছিলাম। আচমকা চোখে পড়ে মতিন। আমার বাল্যবন্ধু। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে কাকে খুঁজছে। 'এই মতিন' চেঁচিয়ে উঠলাম। ওর নাম ধরে ডাকতেই ও আমাকে আবিষ্কার করল। এরপর চটপট কাছে এসে জানাল, কী ঝামেলায়ই না পড়েছে সে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম, সে দুটো টিকিট কেটেছিল। বান্ধবীকে নিয়ে দেখবে। কিন্তু হঠাৎই বান্ধবী আসতে না পারায় সে এখন একটা বেচে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা হল, যার কাছে বেচল খুচরো না থাকায় সে টাকা খুচরো করতে গিয়েছে। এখনও ফেরেনি। এদিকে শো-এরও আর দেরি নেই। আগে গিয়ে

ঠিকঠাক হয়ে না বসলে...আমার মাথায় চকিতেই কী খেলে গেল। জানতে চাইলাম, তা টিকিটটা কোথায়—

কেন, আমার কাছে।

তাহলে চল—

কোথায়?

চল না।

হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওকে নিয়ে সোজা প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার দরজায়। ভেতরে ঢোকার লাইনে।

এই রে, চলে তো এলাম। এদিকে উনি যে আমাকেও দাঁড়াতে বলেছিলেন। বয়স্ক লোক—

ঠিক আছে, ঠিক আছে আপাতত তো এখন ভেতরে চল—

কিন্তু। মতিন তখনও চঞ্চল।

লাইন এগোচ্ছিল। বললাম, নে টিকিট বার কর। দুটোই বার করবি—

মানে?

মানে আর কী, আমার টিকিটের ব্যবস্থা হয়নি...

ও তাই বল। মতিনের মুখে দেখি হাসি।

অতঃপর দুই বন্ধু গিয়ে ভেতরে বসলাম আমরা।

যাঃ, এটা বোধহয় ঠিক হল না। মতিন বলছিল তখনও।

কিন্তু আমি ফিরে যাওয়ার চেয়ে যে দেখতে পাব এটা কি ঠিক হয়নি? দাবিটা কার আগে বল।

প্রায় অন্ধকারেই টাকাটা বার করে মতিনকে ধরাতে যাচ্ছিলাম। মতিন আমার হাতটা ঠেলে দিল, ঠিক আছে এসব রাখ এখন। শো-এর পরে দেখছি—

আর কী দেখবে। আমরা সবাই স্তম্ভিত। নির্বাক। নিশ্চল। কী বলব?

কিন্তু বললেন তিনিই। জানেন তো, সেদিন ওই ঘটনার পর আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল?

সেই ভদ্রলোক।

হ্যাঁ। কী করে ধরলেন?

অনুমান করলাম।

হ্যাঁ, হাফ-টাইমে আর বেরোয়নি। সাধারণত টয়লেটে যেতে না হলে বিরতিতে আমি বেরোই না। কিন্তু শো শেষ হতেই হঠাৎই চোখে পড়ল মতিনকে কে একজন এসে তার জামা ধরে টেনেছে।

কী মশাই, কতদিন ধরে এই বিজনেসটা চালাচ্ছেন? টাকাটা খুচরো করে এসে দেখি আপনি হাওয়া। কত ব্ল্যাকে ঝাড়লেন—

ব্যাপারটা বুঝতে আর অসুবিধে হল না। নিমেষেই মতিনকে ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জানালাম, যা বলার আমায় বলুন। ওকে এসব কথা বলে লাভ নেই।

আপনি? ভদ্রলোক ততক্ষণে মতিনের জামা ছেড়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আমি বললাম, আমিই ওর সেই বন্ধু যার জন্যে টিকিটটা কেটেছিল ও। কিন্তু প্রথমে অসুবিধে

আছে জানিয়েও শেষমুহূর্তে ঠিক এসে পড়েছিলাম। তা আমাকে পেয়ে কী আর আপনাকে টিকিট বেচে...বলুন তো। তবে আপনার লাকটা কিন্তু খারাপ মশাই—

খারাপ।

তা নয়তো কী। টিকিটটা পেয়ে আগে তো হলে ঢুকে পড়বেন। পরে বেরিয়ে এসে না হয় খুচরোর ব্যবস্থা করে...তা আপনার কপাল খারাপ হলেও আমরাটা কিন্তু খুবই পয়া। শেষমুহূর্তে এসেও দেখুন কেমন পেয়ে গেলাম—

ভদ্রলোক মুখ চুন করে এগিয়ে গেলেন। খারাপ লাগছিল কিন্তু উপায় কী।

বলতে বলতেই দেখি তাঁর চোখ হাতের কব্জির দিকে। সময়টা দেখছেন। নাহ্, এবারে উঠি বুঝলেন। এখন না গেলে দেরি হয়ে যাবে। ডাক্তারের আর টিকিটিও পাব না—

তিনি উঠলেন ও বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

এইমাত্র তিনি নামলেন। আর নামতেই আমার মুখোমুখি।

একি, আপনি—

এখানেই তো নামলাম। নাটক দেখব।

কার?

দেবশংকর হালদারের...

ও, হো। কিন্তু সে তো সন্ধে ছটায়। আর এখন ঠিক তিনটে। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা...

কেন ঘুরব। এটা ওটা দেখব। চা খাব। কচুরি খাব। ঠিক কেটে যাবে। এখানে এক জায়গায় ভালো কচুরি পাওয়া যায় জানেন। এই ছোট্ট ছোট্ট। আগের দিনের রুপোর কয়েনের মতো। খাবেন?

এখন?

না না, এখন তো ভাজে না। ভাজতে ভাজতে সেই পাঁচটা—

কিন্তু ততক্ষণ? চলুন না আমার ওখানে—

কোথায়।

চলুন না এখানে একটা বসার জায়গা আছে আমার—

মানে কথা বলা যাবে তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ নেই। নির্জন।

তাহলে চলুন যাই। একটা লেখা আছে। শোনাই আপনাকে—

চলুন।

তিনি আমাকে তাঁর একটা গল্প শোনালেন। সদ্য লেখা।

'যৌবন বেলাশেষের ছায়া ফেলেছে। দর্শন এখন প্রবীণ। সবকিছু গুছিয়ে গোলায় তুলতে ব্যস্ত। বৃদ্ধ বয়সের পাথেয়। ব্যস্ততার ফাঁক বিনোদনের হাতছানিতে সাড়া দেয় না তা নয়। দেয়। স্মরণ নেয় আমোদ-প্রমোদের। কিন্তু বিনোদনের প্রকৃতি অন্যরূপ নিয়েছে। অনুষঙ্গ হিসেবে

উপকরণ হয়েছে ভিন্ন। মানসিকতায় স্থিতাবস্থার ধর্ম। সংসারধর্ম এবং জীবিকার ধর্ম আদি কারণ। অস্ত যৌবন-সামাজিক অবস্থান-জীবিকার দায়, যৌথশক্তি ভোঁতা করে দিয়েছে যাপিত জীবনের প্রণালী। উদ্দামতা স্তিমিত। ফাঁকফোকরে যেটুকু কর্মসূচির ভূমিকা তা সতর্কতা মূলক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। সংযম মন এবং অবদমন গুরুত্ব পায়। সমাজ...সমাজ...। সমাজের একাধিপত্যে নিষেধাজ্ঞার জেরে স্বীয় প্রবাসে।...'

পড়তে পড়তে কখন যে শেষ হয়ে গেল। বললাম।

চমৎকার। খুব ভালো গল্প। কী মেদহীন ভাষা। আর কী আবেগহীন। তবে বড়ো কম লেখেন আপনি—

কম লিখলেই তো ভালো।

বিশ্বাস করি না। লিখতে লিখতেই কলমে ধার আসে। তবে তাই বলে মুড়িমুড়কির মতো ছড়াতে বলছি না—

এই রে।

কী হল?

পৌনে-ছটা।

তা কী আছে বেরিয়েই গেটটা পার হয়েই তো দেবশংকর...

কিন্তু ওই কচুরি? আপনাকে তো খাওয়ানো গেল না—

আরেকদিন হবে।

ঠিক তো?

একদম ঠিক।

তিনি উঠলেন।

এইমাত্র তিনি এসে ফিরে গেলেন। তবে আবারও আসবেন জানিয়েছেন। বলে গেছেন তাঁর ঝোলায় একটি গল্প আছে। কালই লিখেছেন। আজ তিনি সবাইকে শোনাবেন। এ-গল্প তাঁর, এ-গল্প তাঁর সমাজের, এ-গল্প আজকের দিনের। এমন গল্প তিনি আগে লেখেননি। কী করে তাঁর ভেতরে এসে গেল।

তা তিনি এসে শোনাবেন। কাছেই গেছেন। দেরি হবে না আসতে বলে গেলেন। ততক্ষণে বাকি সবাইই এসে পড়বে আশা করা যায়। এইসব বলে এইমাত্র তিনি গেলেন। তবে একটু পরেই আসবেন জানিয়েছেন। আর একটু পরেই। এবং এসেই ওই গল্পটি শোনাবেন। আমরা যেন একটু অপেক্ষা করি।

তা সে অপেক্ষায়ই আছি আমরা। আমরা অনেকেই।

নীচের ভাঙা সিঁড়িতে ততক্ষণে কয়লা ভাঙার আওয়াজ। জল তোলার ছর্ছর শব্দ। আরও নীচে পচা ও ভ্যাপসা গন্ধটা পার হলেই ট্রাম লাইন। বাস রাস্তা। ট্রাম লাইনে ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম আসছে। বাস দাঁড়াচ্ছে থমকে। কন্ডাক্টরের উঁচু গলা, যাত্রীদের হুড়োহুড়ি ও তারই মাঝে ভেসে

আসা গরম সিঙ্গারার মনমাতানো গন্ধ। এসব নিয়েই তিনি আসবেন এখুনি। আমরা তাকিয়ে তাই এখনও দরোজার দিকে। ওই বুঝি তিনি এলেন।

কিন্তু তিনি আসেন না এখনও। এদিকে রাত ক্রমশ ঘন হয়। একে একে ঘর ক্রমশ ফাঁকা। দূরের যাঁরা তাঁরা পা বাড়িয়ে ওঠেন। কিন্তু আমরা তবুও বসে। তাঁরই অপেক্ষায়। কথা যে দিয়ে গেছেন তিনি। আমাদের থাকতে বলেছেন।

তা কথা যখন দিয়ে গেছেন এই এসে পড়লেন বলে।

হয়তো তাই। কিন্তু রাত বাড়ে তবুও তাঁর দেখা নেই। তবে কথা যখন দিয়ে গেছেন...

আর একটু। আর খানিকটা সময়...আর একটু সময় না হয় দেখি...বলে যখন গেছেন এই তিনি এসে পড়লেন বলে...

আবু যে ভাবে ইনডিয়ান হয়ে যায়

কিন্নর রায়

শেখ আবু আলি কীভাবে কীভাবে মোতালেব শেখ হয়ে উঠল ইনডিয়ায় এসে সে এক ধুরন্ধর কিস্যাই বটে। বাংলাদেশের বাংলাদেশী আবু আলি আদতে চট্টগ্রামের মানুষ। তার বাড়ি মায়ানমার বর্ডারের কাছাকাছি। বান্দরবন, খাগড়াছড়ি—ঠিক নির্দিষ্ট করে কিছুতেই বলা যাবে না কোন খানে, কোন জায়গায় ছিল আবু আলি, এখনকার শেখ মোতালেবের ঘর, তার কারণ এতসব জানাজানি হলে রাষ্ট্র ঝামেলা করতে পারে।

রাষ্ট্র শালা মহা ঝামেলিবাজ। তার গ্যানজাম অনেক। মনে মনে বলতে থাকে আবু। একেবারেই লম্বা নয়, বরং তাঁকে চট করে দেখলে বেশ একটু গ্যাঁড়াপানাই মনে হতে পারে। পরনে ফুটপাতিয়া দোকান থেকে কেনা বারমুডা, পায়ে হাওয়াই চটি।

হাঁটুঝুল বারমুডা হাওয়াই চপ্পল না হয় হল কিন্তু ওপরে—গায়ের ঠিক ওপর দিকে—উর্ধ্বাঙ্গে কী থাকছে? এমন জিজ্ঞাসা কারুর মনেই হয়ত হয় না। আর প্রবল রোদে, ছায়ায়, রাত্তিরে হ্যালোজেনের হলুদ প্রবাহের ভেতর সাইকেল রিকশা বাইতে বাইতে যেটুকু 'নাচ মেরিজান ফটাফট' ছায়া না-ছায়া, তাকে দেখে আবুর জামা কেমন, তা ঠাওর করা যায় না কিছুতেই।

ফুটপাতিয়া বারমুডা কখনও হাঁটু ঝুল। কখনও বা ছাড়িয়ে যায় হাঁটু। সেই ঝুলে থাকা কাপড় বেড়ার নিচে তার নির্লোম, সরু বলশালী পা, যেটুকু পায়ের গোছ দেখা যায়, সেসব মিলিয়ে টিলিয়ে মরুচর উটপাখির কথা মনে হতে পারে। যে উটপাখি অসম্ভব মরুঝড়ের বালুপ্রহার অনায়াসে অগ্রাহ্য করে মুখ গুঁজে দেয় বালিতে। তারপর সেই ঝড়-তুফান থামলেই দৌড়তে থাকে পায়ের ভরসায়। জোরে, দ্রুততায়, দ্রুততম হয়ে ওঠার তাগিদ নিয়ে। আবু আলি অথবা নব নাম প্রাপ্ত মোতালেব শেখ প্যাডেল মারলেই সাইকেল রিকশা তো রীতিমতো হেলিকপ্টার। সেই 'চেতক'-এর ওড়নবাজিতে সাধারণভাবে খুশিই থাকে প্যাসেঞ্জাররা। সময় মতো অফিস টেইমের মেট্রো, চার্টার্ড বাস, ভাড়ার গাড়ি ধরিয়ে দিয়ে কাঁধের গামছায় গলা, ঘাড়, মুখ মোছে আবু। তখন তার দিকে তাকালে খুব ছোটো ছোটো করে চুল কাটানো, শরীরের তুলনায়, সামান্য ছোটো মাথাটি, প্রায় মাকুন্দ খাপটা গাল, বসা চোখ—সব মিলিয়ে রিকশা ড্রাইভার আবু আলি। তার এই বসে যাওয়া গালের গর্ত দেখে কেউ কেউ বলে, আবুর গালে তো দু-কিলো চার কিলো তেল রাখা যায়।

ব্রহ্মপুর বাদামতলায় যে সাইকেল রিকশা ইউনিয়ন, তার মেম্বার আবু অথবা মোতালেব। এখানে তার নাম মোতালেবই। মোতালেব শেখ ভোটের কার্ডের ছবি, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড—সবেতেই মোতালেব শেখ হওয়ার কথা। কিন্তু ভোটের ছবিতে কেবল শেখ মোতালেব। আর তা নিয়ে গড়বড়ি হচ্ছে খুব। অসুবিধেও।

আবু জানে শেখ মোতালেব থেকে মোতালেব শেখ হওয়া কত ঝৈঞ্জতের। একবার তো সে শেখ আবু আলি থেকে মোতালেব শেখ হয়েছে কোর্টে এপিট ওপিট করে। এসব ভাবতে

গিয়ে মাঝে মাঝে শেখ মোতালেবের অথবা মোতালেব শেখের জংলা ফৌজি রঙের বারমুডা পরিশ্রমের ঘামে সম্পূর্ণ লেপটে যেতে চায় গায়ের সঙ্গে। আর প্যান্ট এক বার যদি ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে মিশে যায় থাই, পোঁদের সঙ্গে তখন সেই প্যান্ট নিয়ে রিকশা টানা বেশ কঠিন কর্ম। সিটে বসে চালাতে চালাতে অজায়গায়, কুজায়গায় ঘষা লাগে। তাতে ছড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় যেমন, তেমন একই সঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণা, ঘামের নুনটুকু শরীরের ধর্মেই গড়িয়ে যায় নুনছালের থেকে পাতলা কিছু উঠে যাওয়ার পর।

১৯৮৯-এর আগে বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনের ভোটের ছবি, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড হয়ে গেলে সে তো দিব্যি নিরুপদ্রব ইনডিয়ান। কিন্তু বাংলাদেশী থেকে ইনডিয়ান হয়ে ওঠার ঝামেলা অনেক। টাকাকড়ি খরচ করতে হবে বহু।

তা আবু করেছে। মোতালেব শেখ হওয়ার জন্য তার যা যা করণীয় সবই পর পর করে যাওয়া। কলকাতার পেটের ভেতর আর একটা নতুন কলকাতা ব্রহ্মপুরে এসে আবু সাড়ে সাতশো টাকার মাস জমায় মালিপাড়ার টোকন দাসের রিকশা নেয়।

টোকন দাস আগে সি পি এম করত। এখন তিনোমূল। বারো, চোদ্দ খানা রেশকা তায় সেই সঙ্গে ভাড়ার গাড়ি আছে। ঘন্টা, নয়ত কিলোমিটারের হিসাবে গাড়ি ভাড়া দেয় টোকন। সব সময় তিনটে মোবাইল বাজছে। কত কত টাকার কার্ড ভরে রে বাবা। তিনটে মোবাইলে কথা বলার জন্যে। রেশকা, গাড়ি—সব গাড়ির ড্রাইভারদের বলা আছে মিস কল দেবে যদি কোনো লাফড়া হয়। তারপর আমিই ফোন কেটে কথা বলব।

দিন রাত বকছে টোকনবাবু। সব সময় চালু তিন তিনটে মোবাইল। একটা ঝকঝকে ফোন। খুব ইচ্ছে আবু মানে মোতালেব শেখের। কাগজপত্তর সবই আছে। কিন্তু কেনার টাকা কে দেবে। তাই এই চায়না মাল নিয়েই চালাতে হচ্ছে। যখন-তখন ব্যাটারি গরম হয়ে যায়। কথা ঠিকঠাক শোনা যায় না। বেশ ক-বছর ধরে ব্যবহারের পর যথেষ্ট পুরনো হয়েছে। তাই কথা সবসময় কিলিয়ার শোনা যায় না। আগে আগে এফ এম-এ গান শুনতে পারত আবু তার ফোনে। ছবিও তুলে নেওয়া যেত ইচ্ছে হলে। মাস ছয়েক হল সব এক এক করে বাদ চলে গেছে।

মুর্শিদাবাদে কমবেশি চারকাঠা জমি কিনেছে আবু। বিয়েও করেছে সেখানেই। চক ইসলামপুর থেকে খানিক দূরে—একটু ভেতরের দিকে তার গ্রাম।

আবুর ছায়া সব সময় দৌড়য় আবুর সঙ্গে সঙ্গে। গড়িয়ে যায়। আস্তে আস্তে চলে। কখনও তো বেশ জোরে জোরেই ছোটাছুটি করে।

ছায়া জানতে চায়, ও আবু, এখন তোমার নাম কী?

আবু জবাব দেয়, এখন আর তখন আবার কী। আমার নাম সব সময়ই মোতালেব শেখ।

ফুঃ। ফুঃ। মোতালেব শেখ। মোতালেব শেখ, না শেখ মোতালেব? নাকি আবু?

না, না। মোতালেব শেখই। মোতালেব শেখ।

তালে ভোটের ছবিতে নাম তোলার সময় নাম ভুল হল কেন?

সে শালা দালাল জানে। আমি কি অত ফরম ভরতে পারি? লেখাপড়া জানি নাকি?

কেন, টিটাগাংয়ে যে কেলাস ফাইভ অব্দি পড়লে।

দুর। দুর। সে সব পড়া কি আর মনে থাকে? অত মনে রাখলে তো গ্যাট-ম্যাট-ফ্যাট করে ইংলিশ কইতাম আর ম্যাস্টর হইতাম। ম্যাস্টর।

আবুর সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই যে এমন, তা তো নয়। কথায় কথায় আবুর মুখ থেকে কখনও কখনও চাটগাঁইয়া ভাষা, কখনও বা মুর্শিদাবাদের বুলি বেরিয়ে আসে। সেসব কথার ভেতর আর গিয়ে কাজ নেই। আমরা বরং দেখি আবু কেমন করে ২০০৪ সালে ইনডিয়ায় এল।

ফ্ল্যাটের দোতলা থেকে যে রোগা রোগা, ফরসা, সোন্দরপানা, আপিস দিদিমণি নামে, সে তো খুব পছন্দ করে আবুর রিকশা। আবু—মানে শেখ মোতালেব রোগারোগা দিদিমণিকে নিয়ে জোরে প্যাডেল মারে। রোগা বলে এই আপিস দিদিমণির বয়স বোঝা যায় না তেমন করে। গায়ে-গতরে রোগা যেমন, বুক দুটোও তেমন খুব একটা উঁচু নয়। হবে কী করে। সব কিছুই তো মাপ আর মানানসই হয়ে ওঠার ব্যাপার আছে। অবিশ্যি আজকাল তো সবই হয়। আবু শুনেছে টাকার জোর থাকলে সবকিছু বদলে দেওয়া যায় শরীরের। যেমন চোখ, দাঁত বদল করা সম্ভব, তেমনই তো বুকের দুদ দুইখান, হেইয়াও তো ইচ্ছা মতো ছুটো, বড় করন যায়। এসব অবশ্য আবুর শোনা কথা। লোকে বলে। পেপারে নাকি অ্যাড দেয়। আপিস দিদিমণির মুখখান অখনো টুলটুইল্যা, বয়স বোঝন যায় না সেইভাবে। কিন্তু হেয়ার দুদ দুইখান যদি আর একটু ক্যান, একটু বেশি বেশিই বড় হইত—ভাবতে ভাবতে বেশ জোরে জোরেই প্যাডেল মারতে থাকে আবু। তার দুপায়ের ঘষটানিতে, দলাইমলাইয়ে প্রায় নিদ্রিত পুং অঙ্গ খানিকটা যেন তাগদ ফিরে পায়।

২০০৪-এ বাংলাদেশ থনে আইলাম। ট্যুরিস্ট পার্টি—বাচ—বাস লইয়া। হেই যে বর্ডার ক্রস করসি। তারপর আর ফিরি নাই।

আবুর বেঁটে হয়ে যাওয়া ছায়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়য়। তাকেই তো বারে বারে নানা কথা বলতে থাকে আবু অথবা মোতালেব শেখ। ছায়া জানতে চায়, তুমি কী করে বাংলাদেশী থেকে ইনডিয়ার হলে বাপু।

হেই তো মেজিক।

মেজিক। আবুর সঙ্গে দৌড়ে বেড়ায় তারই ছায়া। এসব বিলকিছিলকি শুনতে শুনতে বিস্মিয় হয়।

কোনহান থিকা আইল জাদুকর?

আসমান থিকা। উত্তর দেয় আবু অথবা মোতালেব শেখ।

দুই হাজার চাইরে তো ইনডিয়ায় ঢোকলাম। দালালদের পয়সা দিয়া নয়। গামসা নাড়াইন্যা দালাল। হ্যা রা তো বর্ডারে দাড়াইয়া থাকে। বি এচ এফ—বি এস এফ, বি ডি আর হগগলের লগে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। দালাল বাংলাদেশ বর্ডারে দাড়াইয়া গামসা দোলায়।

আবুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলা ছায়া তখনই দেখতে পায় সীমান্তে গামছা নাড়ানাড়ি চলছে। গলা নয়ত হাতের গামছা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সংকেত বিনিময়। অর্থাৎ লাইন বিলকুল কিলিয়ার। হিলি, বনগাঁ, গেদে—একটু একটু করে, পায়ে পায়ে পায়ে এগোলেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত। বেনাপোল, পেট্রাপোল—সে সবই তো বনগ্রামের দিকে। বড় বড় লরি ঢুকছে, ট্রাক। মাল আসছে

ওপার থেকে। আবার যাচ্ছেও এপার থেকে। সেই সঙ্গে মানুষজন, পাবলিক। এই যাওয়া-আসার মধ্যেই বৈধ-অবৈধ। অনুপ্রবেশ। পাসপোর্ট, ভিসা, ইমিগ্রেশান। কাঁটাতার। চোরাচালান। সবকিছু নিয়ে নানা রকম টানা-পোড়েন। তার মধ্যেই এপারে, ওপারে দালালদের সংকেতময় গামছা ওড়ানো।

গরু, 'ফেনসিডিল', 'বোরোলীন', নানারকম মেডিসিন, লুঙ্গি—এইসব যাওয়া-আসার কোনো রকম হিসাবই নেই। কিংবা হয়ত আছে কোনো গূঢ় হিসাব-নিকাশ, যার সবটা রাষ্ট্র জানে না। জানতে চায়ও না।

হিলি বর্ডার, বেনাপোল, পেট্রাপোল, গোদাগাড়ি হাট—সব জায়গাতেই চেনা-অচেনা এমনসব ছবি জেগে ওঠে।

নিজের ছায়ার কাছেই বাংলাদেশী থেকে ইনডিয়ার লোক হয়ে ওঠার গল্প করতে থাকে আবু।

কীভাবে নাম বদলালে?

সবটা এপিট ওপিট।

ছায়া বোঝে আবু আসলে এফিডেবিটের কথা বলছে।

কোর্টে দাঁড়ায়ে জজ সাহেবরে আমার শাশুড়ি মা বলল, এ আমার হারানো ব্যাটা। খুব ছোটোবেলায় হারিয়ে গেছিল।

ছায়া বুঝল আবু আসলে মুম্বাইয়া সিনেমার মেলে যে অচানক বিছড়ে হয়ে দুই ভাইয়ের গল্প বলছে না। মেলার প্রবল ভিড়ের মধ্যে আচমকাই অলগ হো যাতে হ্যায় দো দোনো—

মেলায় দু-ভাই প্রায়ই হারায় মুম্বাইয়া হিন্দি টকিজে। কিন্তু এখানে আবুর শ্বশ্রূমাতা আবুর হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে। একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। তখন এফিডেবিট করে নতুন নাম নেওয়া হয়। নবজন্ম হয় আবু আলির। সে এখন থেকে—মানে এ দিন থেকে মোতালেব শেখ।

জলঙ্গী দিয়ে বয়ে যায় কত কত কিউসেক জল। গঙ্গার জল, পদ্মার পানি, ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে হতে থাকে নানা বহাস—তর্ক-বিতর্ক। তিস্তার পানি চুক্তি হবে না হবে না, তা নিয়ে কাজিয়ায় মাতে দু-দেশের রাজপুরুষ অথবা রাজনারীরা।

আবু—বর্তমানে মোতালেব শেখ এসব কথাই হালকা হালকা শোনে অথবা শোনে না। তার পায়ের চাপে উড়তে থাকে সাইকেল রিকশা। পঁকপঁক—প্যাঁকোর প্যাঁকোর করে বাজতে থাকে হর্ন। সেসবই তো আবুর হাড়ের পাঁচ আঙুলের কেরদানিতে।

আকাশ থেকে গায়েবি আশমানে আড়াল থেকে নেমে আসে সেই জাদুকর। যে কিনা বিড় বিড় করে নয়, বেশ চিৎকার করেই বলতে থাকে—আব তো খেল খতম। পয়সা হজম। তুমি ইনডিয়ান হয়ে গেলে।

আবু বুঝতে পারে না সে এখন ঠিক কী কী করবে বা তার কী করা উচিত। আবুর বউ রাহেলা, শাশুড়ি মনোয়ারা বিবি, শ্বশুর এনায়েত আলি—সকলেই নতুন এক মানুষকে পেয়ে ভারি খুশি। ঠিকঠাক জায়গায় পয়সা-কড়ি খরচের পর আইনের প্যাঁচ আবুর এখন নতুন মা,

নতুন আব্বা। কিন্তু তাহলে রাহেলা কি তার কুন হবে? কুন। ছি। ছি। তওবা তওবা। এ দিকটা তো ভেবে দেখা হলই না সেভাবে। তার আগেই শ্বশুর-শাশুড়ির মেয়ে বোন হয়ে গেল তার, আইনের ফেরে। এপিট ওপিট করা কাগজের দাপটে।

আবু এখন কী করবে?

মায়ের পেটের বোনকে কি শাদি করা যায়?

এসব ভাবনা, যোগ-বিয়োগ, মাথার ভেতর কারণে-অকারণে ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে দেয় মাঝে মাঝেই। আবু তখন থম ধরে থাকে।

রাহেলার দুটো মাই বেশ বড় বড়, অফিস দিদিমণির যেমন ছোটো ছোটো, তেমন নয়। কিন্তু রাহেলাকে দেখে, ছুঁয়ে এখন আর তেমন করে শরীর জাগে না আবুর। দু-দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে। দুটোই ছেলে। আর তারা দুজনেই ইনডিয়ান।

কতদিন খাগড়াছড়ি বান্দরবন যাওয়া হয় না। পাসপোর্ট তো নেই আবুর। বর্ডারে দালালের গামছা নাড়ানাড়ির সুযোগে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে যাওয়া, আবার সীমান্ত পার করে এপারে চলে আসা—সবই সম্ভব আবুর কাছে। একটু বেশি পয়সা খরচ হবে এই যা। তাতে কী। আবু—মোতালেব শেখ তো এখন ভালোই কামায়। সেই ইনকামে মন্দ চলে না। যদিও জিনিসের দাম ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু খাটতে পারলে এখনও তো পয়সা আছে। কুঁড়ে হয়ে বাড়ি বসে থাকার চেয়ে গতর খাটানো ঢের ঢের ভালো ব্যাপার।

২০০৪-এ বাস কোম্পানির সঙ্গে ইনডিয়ায় ঢুকে পড়ার পর আবু আর ফেরত যায়নি। ফিরে যেতে চায়ও নি কোনো ভাবে। বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, কর্ণফুলি নদী, নিজের বাপ-মা, ভাই-বোন, এসবের কথা, এদের কথা যে একেবারে মনে পড়েনি, তা নয়। কিন্তু পেটের ধান্দায় থেকেই তো যেতে হয় ইনডিয়াতে। বান্দরবনে অনেক অনেক জল সমেত বি-ই-ই-শা-ল এক জায়গা। সেই জল দেখতেই তো যায় অনেকে। ইনডিয়াতে এসে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে একবার রিকশা ড্রাইভার বন্ধুদের সঙ্গে গেছিল আবু। ততদিনে সে রীতিমতো মোতালেব শেখ। বাপের নাম এনায়েত্ আলি শেখ। মায়ের নাম আনোয়ারা বিবি।

মুকুটমণিপুরের অনেক, অনেকটা জল দেখে বারে বারে বান্দরবনের কথা মনে পড়েছে আবুর। বিকেল বিকেল, নয়ত বিকেলের আর একটু পরে সূর্যাস্ত বেলায় আকাশের গায়ে তখন দিন শেষের খুন-খারাপি। সময়টা জাঁকিয়ে শীত পড়ার একটু আগে। এই যে হিন্দুদের বড় পুজো—দুর্গাপুজো, তারই সামান্য পরে পরে। বেলা ছোটো হচ্ছে ক্রমেই। আবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে, বেশ খানিকক্ষণ। বান্দরবনের পানির গায়েও হয়ত সূর্য খানিক আগেই ডুব মেরেছে। কেবল তার লালচে আলোটুকু পানি ঘোলা হয়ে জেগে।

বাংলাদেশে একটা মা, একটা আববা—বাপ, একটা বিবি, দুটো ছেলে একটা মেয়ে আছে আবুর। সেই বিবি-বাচ্চাদের মুখও তো আর মনে পড়ে না কোনোভাবেই। সব কেমন যেন ঝাপসা কাচের ওপারে একটা ছবি।

দেশে গেলেও আবু খাবে কী? টাকা ইনকাম করবে কীভাবে? তার এই চল্লিশ বছরের হায়াতে দুনিয়াদারির কমকিছু দেখা তো হল না।

শেখ আবু আলি অথবা মোতালেব শেখ, নয়ত শেখ মোতালেব—এরা কি আসলে একটি লোক। নাকি তিন তিনটে আলাদা আলাদা এনসান। মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন কি নিজেকেই নিজে করে থাকে আবু। করে কী?

মুকুটমণিপুরে পানি আর পানি। আবুর সামনে পানির পাথার। এমন তো বান্দরবনেও। কত, কত বছর আগে বান্দরবনের সেই পানি আবুকে বেশ বিস্মিতই তো করেছে। উরি বাপরে বাপ। বাপ মোর। কত পানি রে বাপু। ইয়া আল্লা। কত কী কুদরতই না আছে আল্লার। তার কুদরতের শেষ দেখে, এমন সাধ্য কার। ফুটপাতিয়া বারমুডা, যা কিনা সারা বছরই হেটো পর্যন্ত ঢেকে রাখে আবুর, আর তাতে বেশির ভাগ সময়ই জংলা ছাপ ফৌজি ডিজাইনের। সবুজ—মিলিটারি সবুজের ওপর শাদা, নয়ত হালকা হলদে ছাপছোপ। আবু কিন্তু মুকুটমণিপুরে আসে ফুলপ্যান্ট আর শার্ট গায়ে, দিব্যি সাজুগুজু করা ভদ্দরলোক হয়ে। যেমন ভদ্র বাবুভায়ারা সব পরেটরে আর কী।

দূরে—মুকুটমণিপুরের আকাশে ফুটে থাকা আলোয় হঠাৎই ব্রেক মেরে দেয় কেউ। অন্ধকারের টি রি রিং টিং—টি রি রিং টিং—কেমন এক কেটে যাওয়া সাইকেলের বেল হয়ে বাজতে বাজতে বাজতে কীভাবে কীভাবে যেন উড়ে যেতে থাকে দিগন্তে।

পরপর এতসব মনে পড়ে না আবুর। আবার হয়ত মনে পড়েও যায়। বান্দরবনের সেই পানি পাথারে ছায়াল অন্ধকারে নেমেছে একটু আগে। তারপরই তো ছায়াচ্ছন্ন আঁধারিমা নেমে এল বান্দরবনে।

চট্টগ্রাম, টেকনাফ, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, মায়নামার,—পাহাড়, সমুদ্র, নদী, অরণ্য—এসবের কথা ভাবতে ভাবতেই হয়ত বা কলকাতার রাস্তায়—পিনকোডে কলকাতার অন্দর কিন্তু আসে কলকাতার অনেক অনেক বাহির—ব্রহ্মপুরের রাস্তায় রাস্তায় সাইকেল রিকশার প্যাডেল দাবিয়ে দাবিয়ে প্যাসেঞ্জার সমেতই তাকে রীতিমতো উড়ুক্কু হেলিকপ্টার করে ফেলে আবু। তখন তার কোমরের বল, পায়ের পেশীতে তীব্র গতিবেগ সঞ্চারের আকাঙ্ক্ষা।

আবু দেখতে থাকে তার পায়ের চাপে ডানা ছাড়াই উড়তে দিগন্তমুখী হচ্ছে তার সাইকেল রিকশা। এই ওড়ন পর্বে মোতালেব শেখ বা আবু, তারা দুজনে নয়, একজন হয়ে খুঁজে বেড়ায় সময়-আত্মসাতের মনোভূমি।

তখন হয়ত নয়, একটু পরেই আকাশ থেকে নেমে আসে সেই জাদুওয়ালা। তার হাতে অতি বিখ্যাত জাদুদণ্ড। সে এই ম্যাজিক লাঠিটি দিয়ে গিলি গিলি গে—হোকাস পোকাস—এইসব শব্দমালা নিজের উচ্চারণ মহিমায় ভাসিয়ে দিতে চায় শূন্যে।

আকাশপথে তখন তখনই উড়ে যেতে থাকে কত কত কালো পায়রা। সেইসব কালো কবুতরেরা কোনো রকম বর্ডার, ভিসা-পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন, কাঁটাতার, ভোটের ছবি, প্যান কার্ড কিছুই মানে না। তারা পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই অবলীলায় উড়ে যেতে থাকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

শূন্যে ম্যাজিসিয়ানের উষ্ণীষটি ভাসে। সেই রঙদার পাগড়িতে থাকে সময়ের কলা, না-কলা নানান ঘাত-প্রতিঘাত।

জাদুকর বলতে থাকে আবু দ্য ইনডিয়ান। আবু দ্য ইনডিয়ান।

আবু এত সব ইংরেজি মিংরেজি বোঝে না। কেবল তার ভাবনা মায়াগগনে একটি আধ-খাওয়া বান রুটি হয়ে জেগে থাকে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হতে চাওয়া চাঁদ।

আবুর আর কিছু করার থাকে না। বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, টেকনাফ, মায়নামার বর্ডার, রাখাইনদের পাড়া, রাখাইনদের বাজার, সেখানে বিক্রি হওয়া বর্মা মুলুকের লুঙ্গি, ছেলে-মেয়েদের পোশাক-আশাক, নাপ্পি—শুঁটকি মাছ, অন্য অন্য আরও অনেক অনেক কিছু—সাত সতেরো।

পুরনো দেশ, যেখানে জন্মেছে আবু—সেই গ্রাম, আব্বা-মা, গ্রামের বাড়ি, বিবি-বাচ্চারা ক্রমশ একটু একটু করে যেন মুছে যেতে চাইছে আবুর সামনে থেকে। নদী, পুকুর, পাহাড়, সমুদ্র—কক্সবাজারের অসাধারণ সমুদ্র সৈকত, সবই তো শেখ আবু, মোতালেব শেখ, নয়ত শেখ মোতালেবের সামনে থেকে ক্রমে মুছে যেতে থাকে।

আবু অথবা শেখ মোতালেব ঠিক এখনই কী করবে?

তার চারপাশে এখনও অনেক অনেক কাঁটাতার। আস্ত একটা দেশ। তার ভেতরে আবারও অন্য এক দেশ। সম্পূর্ণ নতুন কোনো পরিচয়।

জাদুকর বলেছে, তার নামটা শেষ পর্যন্ত শেখ মোতালেব থেকে মোতালেব শেখ হয়ে যাবে। তার জন্য পোড়াতে হবে কিছু কাঠখড়। করতে হবে খরচপাতি। এসব ব্যাপারে একপায়ে না হলেও দু-পায়ে খাড়া আবু।

মাথার মধ্যে অনবরত সাইকেলের ঘন্টি বাজে। সাইকেল রিকশার পঁক পঁক পঁক পঁক—এই হর্নবাজি তাকে কেমন যেন মাঝে মাঝেই বিহ্বল করে দিতে থাকে। তবু সাইকেল রিকশার প্যাডেলে খুব জোরে জোরে চাপ দিতে থাকে আবু। তাকে যেভাবেই হোক মোতালেব শেখ হয়ে উঠতেই হবে।

একেবারেই কোনো চিন্তা করতে নিষেধ করেছে জাদুকর। তার কাছে জাদু ছড়ি আছে। তা দিয়েই সব ব্যবস্থা করে দেবে ম্যাজিসিয়ান।

আবু আপাতত সেই জাদুকরের কথাতেই ভরসা রেখেছে। সে জানে, জাদুকর—একা একাই সবকিছু বদলে দিতে পারে।

নকুলচন্দ্রের একদিন

মলয় দাশগুপ্ত

॥ এক ॥

যেখানে নতুন বিলিতি মদের দোকান হয়েছে তার পাশেই জেরক্সের দোকান। কাছেই একটা কলেজ আছে, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের জেরক্স করাটা এখন আবশ্যিক হয়ে দেখা দিয়েছে। মদের দোকানটা যখন লাইসেন্স পায় তখন হাল্কা ধরনের একটি প্রতিবাদ হয়েছিল, প্রতিবাদ সমবেতই ছিল। কাছাকাছি কলেজ থাকাটা প্রতিবাদীদের একটা পয়েন্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হল না। মদের দোকানের মালিক-পুলিশ-পাহারায় দোকানের শুভ উদ্বোধন করেছে। অন্যদিকে তিনি বলেছেন বলে শোনা যায়, উটকো ঝামেলার ফলে তাঁর লক্ষাধিক টাকা বাড়তি গচ্চা গিয়েছে।

এখন জেরক্স-এর ব্যবসা এবং মদের ব্যবসা দু'টোই রমরমিয়ে চলে। সময়টার যে বদল হয়েছে তা বুঝতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেও সকলে পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে। মদের দোকানে লাইন পড়ে, জেরক্স-এর দোকানের লাইনটা অপেক্ষাকৃত ছোটো হলেও ভিড় থাকে সব সময়ে। দুই দোকানই রাস্তা-সংলগ্ন, রাস্তার ওপর অটো-স্ট্যান্ড, সেখানেই লাইন থাকে। রাস্তা থেকে দু'টি ধাপ সিঁড়ি উঠে মদ বা জেরক্স-এর দোকানে যেতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই রাস্তা, আর রাস্তার পাশে সারি দেওয়া অটো। অর্থাৎ জায়গাটায় গ্যাঞ্জাম ভালোই হয়। মদ কিনতে যারা আসে তারা অধিকাংশই বাইক নিয়ে আসে, লাইনে দাঁড়ানো যাত্রী বা অটোঅলাদের সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকে, তবে বড় মাপের কোনও ঝুট ঝামেলা হয় না।

নকুলবাবু এসেছেন জেরক্স-এর দোকানে। দরকারি কিছু কাগজপত্র জেরক্স করাতে। তাঁর বয়স তিরাশি ছাড়িয়েছে, ১৯৪৭ সালের ম্যাট্রিক নকুলবাবু। দু' ধাপ সিঁড়ির সামনে এসে একটু থামতে হয়, সোজা পা ফেলার আগে একটু ভাবনা। নকুলবাবুকে অনেকেই চেনে। অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে বলে। নকুলবাবু শীর্ণ হাত সরিয়ে নিয়ে বলেন, 'থাক বাবা, তুমি বেঁচে থাকো। আমার এখনও লাঠি ধরার মতো অবস্থা হয়নি।' ছেলেটি হাত সরিয়ে নিলে ধীরেসুস্থে নামতে নামতে নকুলবাবু স্বাগতে বলেন, 'যতদিন পারি নিজের হাতে পায়ে চলাটা রপ্ত রাখি। নইলে খাটে শোয়ার দিন তো এগিয়েই আসছে।'

নকুলবাবু জেরক্স নিয়ে বাজারে যান। ফুলের দোকানের ছেলেটা জানে প্রতি শুক্রবার শাদা ফুলের মালা নকুলবাবুর চাইই চাই। রেডি করেই রাখা থাকে তা।

হাত বাড়িয়ে শালপাতায় মোড়া মালা নিতে নিতে নকুলবাবু শুধোন, 'হ্যাঁরে মালি আজকাল আর আসে না। এলে আমায় একটু খবর দিবি?'

ফুলদোকানি ছেলেটি ভালো, এর আগেও অনেকবার বলেছে, শুক্রবার শুক্রবার আপনার মালা লাগে, আপনি কষ্ট করে আসেন কেন, আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতে পারি

না? আজও সে বলে, 'গঙ্গাদা এলে আপনার বাড়িতে যাতে সে যায় তাই বলে দেব। আপনি আর কষ্ট করে—'

নকুলবাবু অন্য অন্য দিনের মতোই বলেন, 'যতদিন পারি, হাত পা সচল থাকে আমার কাজ আমায় করতে দাও না বাপু।'

ছেলেটি জানে, ছেলেটি কথা বাড়ায় না।

এখন প্রখর রৌদ্রের কাল। শাদা ফুলের মরশুম না। জোগান কম বলে দামও বেশি। নকুলবাবু তা জানেন, জানেন বলেই নিজে থেকে বাড়তি দাম চুকিয়ে দেন, দোকানিকে কিছু বলতে হয় না। 'বাপু, একটা শুদ্ধ কাজের মালা এটি, তোমায় ঠকাতে চাইলে উদ্দেশ্যই অশুদ্ধ হয়ে যাবে। দু'মাস বাদেই বৃষ্টিধারার সঙ্গে সঙ্গে যখন বেলি, রজনীগন্ধা, কামিনীরা হৈহুল্লোড় করে গাছে গাছে গন্ধের মাতলামো শুরু করে দেবে তখন তো মালার দাম কমিয়েই দেব, এখন দাক্ষিণ্য চাইব কেন?' এমনধারা কথাই নকুলবাবুর।

আকাশের দিকে তাকালেন। গনগনে সূর্য তাপের আকাশ। ফুলের মালাটি ঝোলানো কাঁধের ব্যাগে রেখে ওই ব্যাগ থেকেই ছাতা বার করলেন। দশ বছর আগে পর্যন্তও খুব একটা ছাতা ব্যবহার করতেন না, তাঁর ছিপছিপে শরীর রৌদ্রে ভিজে চলেছে, বর্ষায় নাকাল, দেখে অন্যরা অস্বস্তি পেয়েছে, নকুল নির্বিকার। কিন্তু দশ বছরে বদলেছে শরীর, বদলেছে স্বাস্থ্য, বদলেছে সংসারের অবসরও। ছাতা নেওয়া-না নেওয়া নিয়ে খিটিমিটি করার লোক চিরদিনের মতো অন্তর্হিত। তার দাবি, আবদারকে মান্যতা দিতেই কি নকুলবাবু এখন ছত্রধর? কথাটা ভাবলে মন সত্যই বিষন্ন হয়ে যায়। শান্তি নেই আজ পুরো দশটা বছর।

ছাতা খুলে মাথায় দিয়ে চলতে চলতে জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, গ্রীষ্মের রংটা তবে কী, বলো তো বাপু।

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেন, লাল, টকটকে লাল। দেখো না রঙ্গনে, কৃষ্ণচূড়ায়, পলাশে কেমন আগুনের খেলা। বড় লড়াই করে ফুটতে হয় যে বাপু। সংগ্রামের আর সংরাগের রং, রক্তিম কিংশুক। সোহাগী গন্ধ মাখার সময় কোথায়, শীতের শীতলতার পরেই প্রখর রৌদ্রের চ্যালেঞ্জ তো নিতে হবে কারোকে না কারোকে। তাই রক্তরাঙা ফুলেরা প্রস্তুত। ঝাঁঝালো রৌদ্রের প্রতিবাদে রক্তিম লালের উদ্ধত শাখার প্রতিস্পর্ধা।

কাকে বলছেন, নিজেকেই নিজে বলছেন পথে চলতে চলতে। ছাতার ছায়া এখন হ্রস্বতম, ছাতা সরিয়ে নকুল দেখলেন সূর্য মধ্যগগনে, বাড়ি ফেরার তাড়নায় পায় অতএব। গৃহেও তো নানাবিধ কাজ জমে আছে, নিজেরই কাজ, শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। না, এমন অনাচার করা ঠিক না। ধারে কাছে অনুযোগ করার কেউ নেই বলে সময়ের নিয়ম ভাঙার অধিকার কে দিল। এ ভাবেই জন্ম নেয় আত্ম অহংকারের, তা থেকেই স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচারী হতে তো চাননি নকুলচন্দ্র কোনও দিনই।

নিজের মনেই নিজে বুঁদ হয়ে আছেন। স্ত্রী-কন্যা না থাকলেও অন্য একজন যে রয়েছে তা বেমালুম ভুলেই আছেন। ঘরে ঢুকতেই সেই তিনি সরব হন, 'বেলা কত হলো দেখলে?' লক্ষ্মীর কণ্ঠ খবরদারির।

পায়ের চটি সরাতে সরাতে নকুলচন্দ্র অপরাধীর ভঙ্গীতে বলেন, 'ঠিকই বলেছিস, বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত।'

'ওরে বাবা, আবার ভাবায় কথা বলা হচ্ছে। লক্ষ্মী না হয় পরের ঘরের মেয়ে। তোমার নিজের কেউ না। কিন্তু তোমাকে দেখভাল করার ভার যিনি দেছেন তিনি এসে এমন অরাজক দেখলে আমি কোন মুখে তার সামনে দাঁড়াব?'

ঠিকই তো লক্ষ্মী কোন মুখে তার সামনে দাঁড়াবে। নকুলবাবুর একমাত্র মেয়ে শর্মি থাকে বম্বে শহরে, জামাই এখনও রিটায়ার করেনি। জামাই থাকবে বোম্বেতে—আর মেয়ে শর্মিকে বাপ হয়ে তিনি নিজের কাছে রেখে দেবেন, এমন বে-আক্কেলে কথা মঞ্জুর করা তো দূরের ব্যাপার, ভাবতেও পারেননি। উপায়ান্তর না দেখে, মায়ের মৃত্যুর পরে শর্মি লক্ষ্মীকে বহাল করে বাবার দেখাশোনা করার জন্য।

দশ বছর তো হয়ে গেল, লক্ষ্মী একগুঁয়ে এই দাদুটার সঙ্গে টিকে আছে। এবং একধরনের অধিকারবোধ গড়ে ওঠায় দাদুটার ওপর খবরদারি করতেও আটকায় না। ভারি আন্তরিক এই দুঃখী মেয়েটা, আশ্রয়হীনা, স্বামী-ত্যক্তা মেয়েটার মধ্যেকার বিষাদ প্রতিমাকে মাঝেমধ্যে দেখতে পান বলেই নকুলচন্দ্র লক্ষ্মীকে মেনে নিয়েছেন। আশ্রয় চাইতে এসে লক্ষ্মীও একপ্রকার আশ্রয়দাত্রী হয়ে উঠেছে। একেই কি বিশ্বস্রষ্টার লীলা বলা চলে? ঘোর সংশয়ী জিজ্ঞাসা নকুলবাবুকে আবিল না করে পারে না। তাঁর স্বাবলম্বনের প্রতিজ্ঞা এই একলা মেয়ে চুরমার করে দেয়। জীবনধারণে নকুলবাবুকে লক্ষ্মীর প্রয়োজন যতটা লক্ষ্মীকে নকুলবাবুর ততটাই না হলেও একটা নির্ভরতা তো রয়েইছে। অস্বীকার করবে কীভাবে?

তপ্ত মধ্যাহ্নের দীর্ঘশ্বাসে চরাচর স্তব্ধ। নকুলবাবু কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে স্নান সারেন। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ স্নান, এমন ব্যবস্থা তাঁর নয়, শান্তি থাকতে এসব ব্যবস্থা সেই করে গিয়েছে। শান্তি ছিল তাঁর শান্তিলতা, গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জন্মান্তরের বন্ধন।

'তুমি চলে গিয়েও আমাকে নিরবলম্ব করতে পারোনি। মাটির ওপর আমার পা আরও শক্ত হয়ে থাকে। অনমনীয় মেরুদণ্ড দিনকে দিন দৃঢ়। শান্তি, তোমার দিকে পা বাড়িয়ে আছি, তুমি হাত বাড়িয়ে দাও।'

স্ত্রী শান্তিময়ীর ফটোতে শাদা ফুলের মালা পরাতে পরাতে নকুলচন্দ্র এমত মন্ত্র জপ করেন। এক শুক্রবারের মধ্যাহ্ন বেলায় শান্তি তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। জীবনের বাকি দিনগুলির প্রতি শুক্রবার শাদা ফুলের মালা পরাতে ভোলেন না তাই।

কোনো পুজোপাঠ, ঠাকুর বিগ্রহে বিশ্বাস ছিল না কোনও দিন। আজও নেই। কিন্তু শান্তি চলে গিয়ে এ কোন নতুন বিগ্রহ গড়ে দিয়ে গেল, ভাবেন তিনি। দশ বছর আগের সেই বিষাদ যেন আবার ঘিরে ধরতে চায়। লক্ষ্মী জানে শুক্রবারে বুড়োদাদুর এই পত্নীপ্রেমের কথা। তার মতো করে সে ব্যাখ্যা করে বিষয়টির, ফটো-পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও কথা না, কোনও কাজও না।

বুড়োদাদুর ফটোপুজার অবসরে লক্ষ্মী তার কাজ গুছিয়ে নেয়। তার নিজের কোনো পূজা-আচ্চার বাই নেই। পথে হাঁটতে চলতে শনির থান, শেতলা মন্দির, কালী মন্দির, শিবলিঙ্গ দেখতে পেলে অবশ্য মাথায় হস্ত উঠে আসে। লক্ষ্মীর আপন দেশ, জন্মাবধি যেখানে সে মানুষ, সেখানে জটাধারী বাবার থান আছে, নাকি জাগ্রত দেবতা, সকাল-বিকাল যাওয়া-আসার পথে সেখানে মাথা ঠোকাটা যে এমন—সারা জীবনের অভ্যাসে দাঁড়াবে কে বুঝতে পেরেছিল তা। লক্ষ্মী জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে নির্মম সত্যটা জেনে গিয়েছে তা তাকে শিখিয়েছে : ঠাকুর নাই, ঈশ্বর-ভগবান নেই, আছে মানুষের অমানুষতা। বিয়ে করা বৌকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য মাগি ঘরে তোলার মর্দানি। ঠাকুর নেই, ভগবান নেই, তবু পথে পথে গজিয়ে ওঠা থান, মন্দির আছে। সেসবের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কপালে হাত ওঠাও আছে। এখানে, এ বাড়িতে পুজো নেই, ঠাকুর নেই, হাত উঠলেও কপালে ঠেকাবার বালাইও নেই। আছে দাদুকে খাইয়ে পরে নিজের খানা।

'লক্ষ্মী—ই-ই' ডাক শুনে বুঝতে পারে দাদুর ফটো-পূজা শেষ।

'গাছে জল দিয়েছিস?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায় লক্ষ্মী।

'দুলি আর ভুলিকে খাইয়েছিস?

আবার ইতিবাচক মাথা নাড়ে। 'এবার নিজে খেতে এসো তো। লক্ষ্মীর কাজ লক্ষ্মী ফেলে রাখে না।'

এগোতে এগোতে তবু প্রশ্ন, 'কোনও ফোন এসেছিল? পোস্টাফিসের কোনও চিঠি?'

'নারে বাবা না। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে উঠে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে না?'

'হ্যাঁরে তুই যে দিনদিন মাস্টারনি হয়ে উঠছিস, অ্যাতো খবরদারি সইবে তো আমার?'

লক্ষ্মী, লক্ষ্মীও এবার লজ্জা পায়, ভাতের থালা টেবিলে রাখতে রাখতে ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করে, 'অমন কথা বলোনি। বলতে নেই। তোমার ভালমন্দ দেখাটাই কি আমার ডিউটি না?'

কথাগুলে নির্বাক নকুল, এতটা গুছিয়েও কথা বলতে জানে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী যে ধীরে ধীরে তাঁর কন্যা-বিকল্প হয়ে উঠছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

॥ দুই ॥

দুপুরে খাবার পরে একটু ঘুমিয়ে নেবার অভ্যাস হয়েছে কিছুকাল যাবত। নকুলবাবুর বাড়ির সামনেটায় কাঠাখানেক জমিতে ছোট্ট একটি বাগান আছে, বেশিটাই ফুলের, দেশি ফলের গাছও দু'চারটে রেখেছেন বাড়ির কর্তা। দ্বি-প্রাহরিক নিদ্রার বিছানা এমনভাবে সেট করা যে বালিশে মাথা রাখলে ওই বাগান দেখতে দেখতে ঘুমোনো চলে। এখন যেমন থোকা থোকা রঙ্গন ফুলের সমারোহ চোখে নিয়ে শুয়ে নকুলবাবু। দুর্বল শরীরের দু'চোখে তন্দ্রার প্রলেপ। আবেশ নিয়েই ঘুমের সাম্রাজ্যে যাওয়া।

এখন এই বয়সে এসে নতুন একটা উপসর্গ দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন ঘুম না হওয়া। ঘুমও গভীর না, স্বপ্নের দেখাও স্থায়ী না, ছেঁড়াছেঁড়া অনুভূতি, ভাসাভাসা স্বপ্নের আসা-যাওয়া। এ সময়ের

বাড়তি সমস্যা গ্রীষ্মকালীন আবহ, যত জোরেই মাথার ওপর ফ্যান ঘুরুক কলেবর ঘর্মাক্ত হবেই। শীর্ণদেহ নকুলবাবুও এই নাজেহাল করা গরমের হাত থেকে রেহাই পান না।

এবং ঘুমের মধ্যেই শান্তিময়ীর ক্লান্ত চোখদুটির নির্নিমেষ চাহনি ঘুরে বেড়ায়, যেমনটা রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে। শান্তি নকুলের জীবনে এসেছে নির্ধারিত সময়েরও পরে। নকুলবাবুর বিলম্বিত বিবাহ, চল্লিশ পেরিয়ে শান্তির সঙ্গে ঘর বাঁধা। সন্দেহ ছিল মনে, বাঁধনটা তেমন শক্ত হবে কিনা। দশ বছর বিপত্নীক থাকার পরে বোঝা যাচ্ছে বাঁধনটা আলগা ছিল না। ভালবাসা তো পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছাড়া টেকে না, উভয়কেই সুভদ্রও হতে হয়, ওদের ক্ষেত্রে জীবনযাপনের মাত্রাতে ভদ্র-শ্রদ্ধাটার অভাব ঘটেনি বলা যেতে পারে।

শান্তির ক্লান্ত-বিষন্ন চোখ তো তার প্রৌঢ়ত্বের প্রাপ্তি। নকুলবাবুর দেওয়ালে যা এখনও বিরাজ করছে। একসময় কিন্তু স্বচ্ছ উৎফুল্ল শান্তিকেও পেয়েছেন তাঁর স্বামী। ঝকঝকে ঝলমলে ছিল মুগ্ধতা জাগানো হাসি। দুঃখ একটাই, সে সময়ের কোনও ছবি নকুলবাবুর মন ছাড়িয়ে ফটোগ্রাফিতে ধরা নেই। ছিন্ন মেঘের মতো স্মৃতিতে বিদ্যুতের ঝিলিক হয়ে আসে সেই যুবতী-রহস্যের সান্নিধ্যের দিনগুলি। নকুল বড় কাতর হয়ে পড়ে একাকী গৃহে। কিন্তু অসহায়ত্বকে কাছে ঘেঁষতে দেন না, অসহায়ত্ববোধ তো মৃত্যুরই অন্য নাম, যেচে মৃত্যুকে আনতে চাওয়ার বান্দা নকুলচন্দ্র নয়।

এমন হাল্কা ঘুমের মধ্যেই ঘামে ভিজে হাসফাঁস করতে থাকেন, একটা অব্যক্ত বেদনা গোঙানি হয়ে বেরোতে চায়। ঘুম ভেঙে গেলে সে কষ্ট প্রশমিত হতে সময় লাগে। পাশের ঘরে লক্ষ্মী ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। নকুল উঠে নিজের হাতে একগ্লাস জল গড়িয়ে খান। কীজন্য তার ত্রাস, মনের কোন ব্যথা তাঁর ঘুম ভাঙানোর কারণ এসব এখন আর মস্তিষ্কের কোষ অধিকার করে নেই। বরং পড়ন্ত বেলার ছায়া চৌধুরীদের কার্নিশ ছাড়িয়ে কেমন চুপিসাড়ে তাঁর বাড়ির বাতাবি লেবুর পাতা স্পর্শ করছে তা দেখতে থাকেন।

কিন্তু মাথার ভেতরে তো চিন্তার বুদ্‌বুদ রয়েছেই। মগ্ন চৈতন্যে থাকা ভালবাসার যে মুখ সাঁতরে সাঁতরে জল ভাঙতে ভাঙতে মনের উপরিতলে উঠে আসে, এসে বিহ্বল করে দেয় তাঁকে। শিউলির সেই মুখ কি আজও উঠে এসেছিল স্মৃতিস্বপ্নে। আজও ভিক্ষুকের মতো চেয়ে থাকা স্মৃতির গলিতে?

নকুল যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই শিউলির অন্বেষণ বজায় থাকবে। যে বিপর্যয় ধ্বংসকালীন দান তাতে কি ব্যক্তিক ভূমিকার গুরুত্ব থাকে? সেই ১৯৪৮-এর ভাঙা জীবনে শিয়ালদহ নামের রেলস্টেশনের আশ্রয় থেকে চতুর্দশী শিউলির হারিয়ে যাওয়াটাকে আজ আর কেউ অস্বাভাবিক ভাবে না। তার উপর মেয়েটি ছিল সত্যিই শিউলি ফুলের মতো নির্ভার সুন্দরী। ভাঙা বাংলার রিফিউজিরা কী দুঃসাহসীভাবে যে শিউলিদের ঝরে পড়তে দেয়নি তার ইতিহাস লেখা নেই। আবার নকুলচন্দ্রের ছোটোবোন শিউলি যেমন একদিন হারিয়ে গেল, হাহাকার বা অশ্রুর ধারা যেমন তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারল না, তেমন ঘটনারও অন্ত ছিল না সেদিন।

দাদার বয়স আঠারো আর বোনের চোদ্দ, ছিল না মা-বাবা। ছিল না ঘরবাড়ি এক চিলতে জমিও। যেখানে দু'পা ছড়িয়ে বসা যায়। বাস্তুহারার দলের কনিষ্ঠ সদস্য শিউলিকে ধরে রাখতে

পারেনি মা, বাবা, দাদা। মেয়েকে হারিয়ে মা ছিল প্রকৃতই উন্মাদ। আর সেদিনের আরম্ভ যৌবনের দাদা চিরকাল বুকে একটা আশা নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, শিউলির সঙ্গে আবারও একবার দেখা হবে, হবেই।

জীবনটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল নকুলের। চিরকাল তো ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়ানো যায় না। চিরকাল তো কোনও মা কন্যা শোকে উন্মাদ হয়ে থাকে না। নকুলের জীবনের ঝড়ও যখন থামল তখন পড়ে রইল অজানা ভবিষ্যৎ, আর অদম্য উঠে দাঁড়াবার আশা। আঘাতে আঘাতে জীর্ণ হয়ে যাওয়া মানুষেরা ক্রমে নতুন মানুষ হতে চাইল। নকুলচন্দ্র মেট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৯৪৭-এর গোড়ায়। তখনও লালকেল্লায় তেরঙ্গা পতাকা ওড়েনি। 'তখনও নারায়ে তক্‌দির, আল্লা হো আকবর', আর 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির লড়াই মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার করেই চলেছে। গ্রামের হেডমাস্টার মশাইয়ের হাতে একটা লিস্ট এসেছিল, তা দেখেই নকুলচন্দ্রর পরীক্ষা পাসের বার্তা পাওয়া গিয়েছিল, অধিক কোনও তথ্যপ্রমাণ হাতে পাওয়াই যায়নি।

১৯৪৮-এ যখন বাস্তুচ্যুত হয়ে ওরা ওপার থেকে এপারে আসে তখন নকুলচন্দ্র রায়ের পিতা ভবানী রায়ের হাতে সঞ্চিত কিছু টাকা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। শিউলি হারিয়ে যাবার পরে বছর দুই স্বাধীন দেশের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে, ডোলের টাকায় উদরপূর্তিতে ঘৃণা ধরে যায় অবনীবাবুর। ভিক্ষের দানে কি মানুষ বাঁচে? মন বিদ্রোহ করতেই অবনী সঞ্চিত অর্থ খরচ করে পাঁচ কাঠা জমি কিনলেন, টালির চালা আর মুলি বাঁশের বেড়ার ঘরে থেকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ অবনী সকল দুঃখ মনের গভীরে জমিয়ে ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে লেগে পড়লেন।

ছেলে নকুল বাবার পাশে দাঁড়াতে চাইলে বললেন, 'শক্তপোক্ত হয়ে দাঁড়াতি হবে বাপ। মেরুদণ্ডী প্রাণী হতি হবে। যাও খোঁজখবর নিয়া কলেজে ভর্তি হও। ভাঙা মানুষ দে বড় কিছু হয় না জানবা।'

চোখেমুখে জল দিয়ে গামছায় তা মুছতে মুছতে লক্ষ্মীর খোঁজ করে দু'চোখ। দেখতে পান না। অগত্যা ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে পরতে বাইরে বেরোনোর প্রস্তুতি নেন।

'চা না খায়া যাবা না।' লক্ষ্মী রান্নাঘরে।

'এট্টু ঘুরে আসি না।'

'না।' সোজা, স্পষ্ট নিষেধ।

কথা অগ্রাহ্য করার মানসিক বল না পেয়ে নকুলচন্দ্র বসে পড়েন। সকালে না এই বিকেলে দুটি থিন এরারুট বা ক্রিম-ক্র্যাকারের সঙ্গে বেশ বড় এককাপ চা বরাদ্দ। তারিয়ে তারিয়ে খেতে ভালই লাগে, এক ধরনের আসক্তি আসে স্বাদে। নকুলচন্দ্র তৃপ্তি নিয়েই চা পান করেন।

।। তিন ।।

বৈকালিক ভ্রমণেও সঙ্গী জুটে যায়। সকলেই সমীহ করে তাঁকে। বেশির ভাগ বুড়ো নতুন রাস্তায় দু-চাক্কার ঘুরে রাস্তার পাশে বাঁধানো রোয়াকে বসে। তারপর খিদ আর নিন্দার বার্তা বিনিময়।

নকুলের এসব ভাল লাগে না একেবারেই, এ সঙ্গ সাধু নয় বুঝে গিয়েছেন তিনি। দু'চারজন যাঁরা ব্যতিক্রমী আছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে ভাল লাগে। নইলে আপন মনেই হাঁটেন। এই শহরের প্রতিটি রাস্তা তাঁর চেনা। ষাট বছরের বেশি—দেখতে দেখতে গ্রাম থেকে শহর হওয়া। ধানক্ষেত লোপ পেয়ে সোজা রাস্তা, এক হাঁটু কাদার বদলে কালো পিচের মসৃণতা, সব তো চোখের ওপরই হওয়া। প্রতিদিনই এই পরিবর্তন আবিষ্কার করার মধ্যে যে আনন্দ তা সবাই পান না, নকুল পাওয়ার চেষ্টা করেন।

এ ভাবেই আজ চলতে চলতে ঘুরতে ঘুরতে কায়েতপাড়ায় ঢুকে পড়েন নকুল। কায়েতপাড়ায় ঢুকে পড়েই মন তাঁর চঞ্চল হয়। অরবিন্দ ঘোষের বাড়ির দিক থেকে একটানা বিলাপের সুর, আর হা হা কান্নায় মন তাঁর ব্যথিয়ে ওঠে। পথে জটলার পর জটলা, মুখচোখে ভয় আর বিষাদ মাখানো। নিজেদের মধ্যে চুপচাপ কথা বলছে মানুষগুলি। নকুলকে দেখে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ায় ওরা। অরবিন্দর বাড়ি পর্যন্ত পৌছনোয় মানুষের ভিড় ঘন হতে দেখেন। ঘরের মধ্য থেকে নারী-পুরুষের সমবেত কান্নার প্লুতস্বর। এ কান্নার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, হয়ও না নকুলচন্দ্রের।

ঘরের একপাশে পড়ে আছে অরবিন্দর ছোটোমেয়ে কুসুমের শব। মুখ মাটির ওপর গোঁজা। আত্মহত্যার শরীর কেউ ছুঁতে চায় না, পুলিস কেস, পুলিস এসেই যা করার করবে। ততক্ষণ চোখে আগুন নিয়ে মানুষের দেয়াল গড়ে তোলা।

বিচলিত নকুলচন্দ্রের পা আর চলতে চায় না। শিরদাঁড়া আর সোজা রাখতে পারছেন না তিনি। রাজ্যজুড়ে এই মৃত্যুর মহামারি কায়েতপাড়ার কুসুমকেও ছাড়ল না?

ঘরে ফিরে প্রথমেই বোম্বাইতে ফোন। ধরেছে মেয়ে।

'মা, তিতলিকে দাও।'

ওপারে নাতনি তিতলি ফোন ধরলে নকুলচন্দ্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'মা, ভাল আছিস তো মাগো।'

তিতলি দেখতে পায় না। নকুলচন্দ্রের সকল প্রতিরোধ ভেঙে গিয়ে দু'চোখে এখন অশ্রুর ধারা, কিছুতেই বাধা দেওয়া যায় না।

কোমল পুষ্প

কুলদা রায়

গীতাদির বাড়িতেই আমরা প্রথম বেড়াতে গিয়েছিলাম। এর আগে কোথাও যে যাওয়া যায়—যাওয়ার আছে, সে ধারণাই আমাদের ছিল না। আমরা দেখেছি কুসুম-কুটিরে লোকেরা বেড়াতে আসে। আসে সেজে গুজে। একটা উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে। কলধ্বনি শোনা যায়।

এইভাবে আমাদের মাকে একদিন রাতের বেলা ঘুমুতে যাওয়ার কালে ছোটো বোনটি শুধালো, হ্যাগো মা, আমাগো কি কেউ কোথাও নেই?

মা তার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল, ক্যান রে ছোটো?

বোনটি প্রথমে কিছু বলল না। তার ঘুম আসছে। হাই তুলছে। তার মধ্যে আস্তে করে বলল, বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করে।

মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এ শহরে আমাদের কোনো কাকা-জ্যাঠা নেই। মামাবাড়ি বেশ দূরে। তারা কালেভদ্রে হাট করতে আসে। এসে তাদের বোনটিকে দেখে যায়। বেড়াতে আসে না। রাস্তা থেকেই মায়ের নাম ধরে ডাক দেয়। মা তখন ছুটতে ছুটতে আসে। আঁচলে মশলা মাখা হাত মুছতে মুছতে বলে, বাড়ির মইদ্দে আইসোগো ভাইডি? মামারা নড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ব্যস্ততা জাগে। বলে, এখন আর সুমাই নাইরে বুন। বেলা বইয়া যায়। আরেকদিন আসপো। তুমি ভালো আছো তো দিদি?

মা উত্তর দেয়, আছি ভালো, বাবা আর মা কেমন আছে?

তারপর করমচা গাছটির কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখে ভাই চলে গেছে। তাদের ছায়া মিলিয়ে যায়। পিসিদের মধ্যে বড় পিসির দুটো ছেলে-মেয়ে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। তারপর পিসিকে ছন্ন-স্বভাবে পেয়েছে। আনাচে কানাচে থাকে। তার থই পাওয়া যায় না। পিসেমশাই আরেকটা বিয়ে করেছেন। আর ছোটো পিসি মাঠে মাঠে ঘোরে। ধান কুড়ায়। শামুক কুড়ায়। আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কবে মেঘ নামবে। কবে বৃষ্টি ঝরবে। জল বাড়বে। বাদা বন থেকে ছোটো পিসেমশাই ফিরে আসবে। তার নাও গড়ানোর কাজ শেষ হবে। টাকি মাছ দিয়ে শুষনি শাকের চচ্চড়ি খাবে। তারপর দুজনে ডোমরাসুর যাবে। সেখান থেকে তালতলায় ফেরা পাগলার বাড়ি। তারপর পাখিমারা গ্রামেও যেতে পারে—ঠিক নেই।

আতিপাতি করে খুঁজে মা অবশেষে বলল, আছে। তোগো গীতাদিদি আছে।

—কোন গীতাদিদি?

—চেচানিকান্দির গীতাদিদি। বদ্যি বাড়ির গীতাদিদি।

শুনে আমাদের হর্ষ জাগে। মেজো বোন জিজ্ঞেস করে, গীতাদি কোথা থাকে?

এ প্রশ্নে মা একটু চুপ করে থাকে। ছোটো বোনটির শ্বাস ধীর হয়ে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মাথার বালিশটি মা ঠিক করে দেয়। একটু দূরে দাদা শুয়ে আছে। কান খাড়া করে জেগে

আছে। দাদা কথা বলে না। নড়ে চড়ে ওঠে। মা সেদিকে তাকিয়ে বলে, শুনছি সাহাপাড়ায় থাকে। শ্রীমন্মথ বিশ্বাসের বাড়ি।

চেচানিকান্দি খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের বাড়ির পিছনে বড় মাঠ। পাটের সময়ে পাট আর বাইটা আউশ ধান ফলে। তারপর মাঝখানে কান ছেড়া বাড়ি। তারপর হরিক্ষেত। এটা পার হলেই বদ্যি বাড়ি। তাদের কেউ একজন ভূত আনতে পারত কোনো এককালে। সেই থেকে এ বাড়ি বদ্যিবাড়ি। দূরে সেই বদ্যি বাড়িটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভেজে। জলে ভাসে। কুয়াশায় ডোবে। শীতে কাঁপে।

এই বদ্যি বাড়ি যে গীতাদিদির বাড়ি—সেটা হয়তো আমরা জানি। হয়তো জানিই না। জানার দরকারই হয় না। এই বাড়িতে আমরা গেছি। বাড়িটা পার হয়ে গেছি। এ-রকম পার হয়ে যাই অনেক বাড়ি। কেউ কখনো বলেনি যে আমি তোদের গীতাদি হই। তোরা আয়। বেড়িয়ে যা।

আমাদের পাড়ার শেষে গার্লস স্কুল। তারপর পাথুরে কালি বাড়ি। ডানদিকে মিয়াপাড়া। বামদিকে বাইদাপাড়া। মাঝখানে সাহাপাড়া। সাহাদের বাড়ি। সাহাদের ঘর। সাহাদের মন্দির। সাহাদের দুর্গাপূজা হয়। আলো জ্বলে। মাইকে মানবেন্দ্র গান করেন—আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি। এ-গানটি শুনে যুবকেরা এ পাড়ায় যেতে ভালোবাসে।

পরদিন ছোটো বোনটি একটু তিব্বত স্নো মেখে নিল মায়ের কৌটো থেকে। মেজো বোনটি লাল রিবন।

দাদা বলল, যাওয়া তো যায় গীতাদির বাসায়, খালি হাতে যাই কী কইরা।

কথা সত্যি। বেড়াতে গেলে কিছু নিয়ে যেতে হয়। কুসুমকুটিরে যারা বেড়াতে আসে তারা কিছু নিয়ে আসে। আবার যারা বেড়াতে যায় তারাও কিছু নিয়ে যায়। আমরা কি নেবো? মুখ চাওয়া-চাউয়ি করি আমরা। এই ফাঁকে ছোটো বোনটি দুটো পেয়ারা নিয়ে আসে। এ বাড়ির গাছের। তখনো পাকেনি। ডাঁসা। খুব ভোরে পেড়ে রেখেছিল। বিকেলে খাবে। বলল, এই দুটো নিয়া যাইতে পারি।

মেজো বোনটির মুখ আলো হল। বলল, নেওয়া যাইতেই পারে। সে একটা পুঁতির মালা বের করল। তখনো আধ-গাঁথা। পুঁতিগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিল বটতলায়। সুতো দিয়ে মাঝে মাঝে গাঁথে। পুরোটা গাঁথতে হলে আরো কিছু পুঁতি দরকার। তাহলে আরো বড় হবে মালাটি। গলায় পরা যাবে। আধ-গাঁথা মালাটি সবার সামনে এনে একটু ম্লান হল মেজো বোনটি। বলল, এটা গীতাদিকে আজ দেব। গীতাদি রাখবে। যখন আরো কিছু পুঁতি খুঁইজা পাব সেদিন গীতাদির বাসায় যাইয়া গাঁইথা দিয়া আসব। তারপর একটু থেমে আবার বলে, গীতাদি বুঝতি পারবে। রাগ করবে না। গীতাদি তো আমাগোই। দাদা এসবে খুশি নয়। কী ভেবে ঘরের মধ্যে গেল। ফিরে এলো কিছু খুদ-কুড়া চাল নিয়ে। মা চাল ঝাড়ার সময়ে জমিয়ে রাখে এই খুদ-কুড়া। আধ-ভাঙা চাল। কিছু কালো কালো। কিছু কাঁকরযুক্ত। দুপুর ঝিমিয়ে এলে এ চালগুলো মা ঝাড়ে —বাছে। শনিবারে ভোরবেলা রান্না করে খুদে ভাত। শুকনো মরিচ দিয়ে খাই। সঙ্গে একটুকু লবণ। কিছু কুঁচো পেঁয়াজ। ডলে ডলে খেতে ভালো লাগে।

দাদা বলল, দাঁড়া, এগুলো বেইচা দিয়ে আসি। তারপর কিছু কিনে আনব।

মেজো বোনটি একটু কেঁপে উঠে বলল, বেইচা দিলে শনিবার ভোরে কী খাব?

দাদা বলল, একদিন ভোরে না খাইলে কিছু হবে না। আমরা শনিবার কিছু খাবই না।

ছোটো বোনটির মুখ কালো হয়ে যায়। তার খিদে পায় ভোর ভোর। সেদিকে তাকিয়ে মেজো বোনটি বলল, ঘুম্নি বাড়ি থেইকা ডুমুর পাইড়া আনবো। তোরে দই বানায় দেবো।

ছোটো বোনটি এবার খুশি হয়। বলে, দইয়ের মধ্যে চিনি দিও দিদি।

মেজো বোনটি বলে। চিনি নয়। মুক্তি পাটালীর গুড় দেব।

সেদিন দুপুর। ঠিক দুপুরেও নয়। আরো একটু আগে। আমরা ক'জন হাঁটতে হাঁটতে সাহা পাড়ায় রওনা করেছি। কতদিন পরে চুলে একটু তেল মাখা হয়েছে। চিরুনি পড়েছে। খালি পা। কিন্তু ধোয়ামোছা। কাদার দাগ নেই। দাদাই খুঁত খুঁত করছিল। তার একটু সুগন্ধ হলে ভালো হত। যেতে যেতে বলল, পরে কখনো সুগন্ধি পাওয়া যাবে। তখন সেটা মেখেই গীতাদির বাড়ি যেতে পারবে। আর কোনো খুঁত খুঁত থাকবে না। আজ এভাবে যাওয়া যাক।

দাদার পকেটের মধ্যে এক প্যাকেট গ্লুকোজ বিস্কুট। লাল কাগজে মোড়া। গায়ে এক থোকা অঙুরের ছবি। গীতাদির জন্য কেনা হয়েছে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি। মেজো বোনটি বলে, সাবধানে রাখিস। পইড়া যেন না যায়। পইড়া গেলে বিস্কুট গুড়া গুড়া হইয়া যাবে।

ছোটো বোনটি একবার দাদার খুব কাছে গিয়ে বলল, বিস্কুট।

তার দিকে তাকিয়ে মেজো বোনটি বলে, গীতাদির হাতে দেব। গীতা নিশ্চয়ই খুশি হবে। প্যাকেট খুইলা আমাগোরেও দেবে।

ছোটো বোনটি একটু হাসে। বলে, আমারে দুইখান। দুইখান চাইয়া নেব।

দাদা বলে, চল চল। দেরি করিস না।

সাহাপাড়ায় যে বাড়িটি সাহাদের নয় লোকে সেই বাড়িটিকেই মন্মথ বিশ্বাসের বাড়ি বলে ডাকে। বাড়িটিতে লম্বা দোচালা টিনের ঘর। ছোটো ছোটো জানালা। কোনোটিতে পর্দা ওড়ে। কোনোটি ফাঁকা। বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায়। এর মধ্যে একটি জানালাটি আধখোলা, আরেকটি পাল্লা বন্ধ। পাল্লাটির নিচে কাঠ কয়লা দিয়ে লেখা—গীতা আউর সীতা। হেমা মালিনী মেরা জান। লেখা দেখে দাদাই বলল, এটা গীতাদির বাড়ি। এই জানালাটিই গীতাদির বাড়ি।

এই জানালায় টোকা দিতে হবে। টোকা দেবে কিনা দোনামোনা করে দাদা। মাথার উপরে রোদ চড়ছে। মেজো বোনটি মাথা নাড়ে। বলে, টোকা দেওয়ার দরকার নাই। গীতাদি শুনতি পাবে না। হয়তো মনে করবে বাতাসে নড়ছে। হয়তো মনে করবে গাছ থেকে একটা মরা ডাল পড়েছে। হয়তো মনে করবে ব্যাঙ্ক পাড়ার অন্ধ পাগল পাড়া পার হচ্ছে। পার হতে হতে লাঠির শব্দ করে যাচ্ছে। হয়তো কোনো রোঁয়া ওঠা ক্লান্ত কুকুর জানালার নিচে এসে শুয়ে পড়েছে। তার ঠেস দেওয়ার শব্দ হয়েছে। হয়তো গীতা ঘরেই নেই। হয়তো রান্না ঘরে। ডালে ফোঁড়ন দিচ্ছে। ভাতের হাঁড়িতে টগবগ শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দে আমাদের টোকা শুনতে পাবে না। তার চেয়ে ডাক দেওয়া ভালো।

আমরা তাকিয়ে আছি—দাদা হয়তো ডাক দেবে। দাদা তো আমাদের সবার চেয়ে বড়। দাদা ছাড়া আর কে ডাক দিতে পারে। দাদা ছাড়া এই সাহস আর কার থাকতে পারে। কিন্তু দাদা মেজো বোনটিকে ইশারা করে বলল, তুই ডাক দে। মেজো বোনটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে কারা কারা যায়। তারা যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। তারা হয়তো আমাদের দেখতে পায়। হয়তো দেখতে পায় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই। মেজো বোনটি তাদের দেখে ডাক দিতে ভুলে যায়। তার ভয় ভয় করে। সে তাকিয়ে থাকে বোনটির দিকে। ছোটো বোনটি তাকিয়ে আছে দাদার দিকে। দাদার দিকে নয়। তার পকেটের দিকে। পকেটের দিকেও নয়। পকেটের মধ্যে থেকে উঁকি দেওয়া গ্লুকোজ বিস্কুটের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে বলে, আমি ডাক দেবো? আমি ডাকবো?

দাদা ফিসফিস করে বলে, ডাক। তুই ডাক। ছোটো বোনটি দাদার গা ঘেঁষে ডেকে উঠল, গীতাদি, গীতাদি। আমরা বেড়াইত্তি আইছি। এভাবে ছোটো বোনটি ডাকল রিনরিনে গলায়। দুবার নয়। চারবার। চারবারও নয়। ছয়বার। আটবার ডেকেও যখন গীতাদি জানালা খুললো না—তখনো বোনটি ডেকে চললো।

তার ডাক শুনে একটা রোয়া তোলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। বাইদ্যা পট্টি থেকে কে একজন মুন্সীগঞ্জের ফেরীওয়ালা হেকে উঠলো, চাই ছিট কাপড়। একজন পাগলের ঠা ঠা করে হাসির শব্দ শোনা গেল বহুদূরে। আর একটা পাতা সরসর করে ঝরে পড়ল—শিরিষের, অথবা আমের—জামের।

আমরা ভয় পাই। আমরা তাকিয়ে থাকি। নড়ি না। বুঝতে পারি জানালাটি খুলবে না। গীতাদি উঁকি দেবে না। হেসে বলবে না, আয়।

ছোটো বোনটির মুখ কালো হবে। মেজো বোনটি ব্যথা পাবে। দাদা মাথা নিচু করে ফেলবে। আমরা ফিরে যাব। যাবই যখন তখন দুটো কাক ওড়ে মাথার উপরে। কা কা করে ডাকে। কে একজন বুড়ি খনখনে গলায় কোথাও বলে চলেছে—হাউস দেইখা আর বাঁচি না। তিনকালে যাইয়া এককালে ঠেকছি। হাউস দেইখা আর বাঁচি না।

আর তখন গীতাদির আধখোলা জানালাটি বন্ধ হয়ে যায়। ছোটো বোনটি হাহাকার করে ওঠে। বলে, গীতাদি আমরা। আমরা আইছি। বেড়াইতে আইছি। তখন আবার বুড়িটার গলা আরো খনখনে গলা শোনা যায়। আর জানালাটি খুলে যায়। ছোটো বোনটি এবার হেসে ওঠে। জানালাটির খুব কাছে গিয়ে আরো জোরে বলে, গীতাদি আমরা। বেড়াইতে আইছি।

জানালার ওপাশে পর্দা। সামান্য ফাঁক করে একটা মুখ দেখা যায়। পুরোটা নয়। চোখ, নাক আর ঠোঁট। ঠোঁটে আধা লিপিস্টিক—পুরোটা দেওয়া হয়নি। হয়তো লিপিস্টিক দিচ্ছিল। দিতে দিতে আমাদের ডাকে আয়নার সামনে থেকে উঠে এসেছে। আমরা এই আধখানা মুখটিকে চিনতে পারি না। এই আমাদের গীতাদি কিনা বুঝতে পারি না। আসলে আমরা গীতাদিকে কখনো দেখিনি। দেখলেও মনে রাখিনি। মনে রাখার দরকারও হয়ও না। তবু জানালার মুখটিকে দেখে মনে হল—কখনো কখনো চেনা মুখটিকে চিনে রাখা দরকার।

মুখটি জানালার ভেতর থেকে আমাদেরকে চিনতে চেষ্টা করছে। সময় নিচ্ছে। মুখটা

গম্ভীর। কিন্তু হঠাৎ করে জলের মত ছলছল করে উঠল। চোখদুটো উজ্জ্বল হল। আমাদেরকে অবশেষে চিনতে পেরেছে। আমাদের চেহারা সবার মত। না চিনে উপায় নেই। গীতাদি বলল, কী কাণ্ড। তোরা আইছিস। খুব ভাল হইছে। আমার এখানে কেউ আসে না। তোরা আইলি।

আমরা কাঁচা এলাচের ঘ্রাণ পাই। গীতাদির ঠোঁট লাল। পান খেয়েছে এলাচের দানা দিয়ে। কথা বলতে বলতে চুলের বেণী খোলে। এখন খোঁপা বাঁধবে। এখানে ওখানে ক্লিপ খুঁজবে। ঘরের মধ্যে যায়।

হাওয়ায় পর্দা উড়লে দেখা যায় বেড়ার গায়ে ছোটো একটা হরদেও এন্ড কোম্পানির আয়না। সেখানে বার কয়েক মুখ দেখল। লিপিস্টিকটা পুরোটা ঠোঁটে টেনে দিল। আবার ফিরে এলো জানালার কাছে।

মেজো বোনটি এগিয়ে যায়। ছোটোকে ইশারা করে বলে, রেডি হ। এবার দরোজা খুলবে গীতাদি। আমাদেরকে ঘরে নেবে। ইশারা করে আধা গাঁথা মালাটি বাম হাত থেকে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে চালান করে। দাদার দিকে চায়। দাদা মাথা নাড়ে। এই নাড়ার মধ্যেই দাদা আবার জানালার নিচে কালো কাঠকয়লার লেখাটির দিকে তাকায়। লেখাটি অনেক আগে করা। গীতা আউর সীতা। হেমা মালিনী মেরা জান। লেখাটি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। যিনি লিখেছিলেন তার হয়তো এখন চুল পেকে গেছে। দাঁত নড়ে গেছে। কিন্তু লেখাটি আছে। আরো কিছুকাল থাকবে। থাকুক। দাদা বিড় বিড় করে কিছু বলে। শোনা যায় না।

গীতাদি দরজার কাছে যায়। দাদা কিছুটা চঞ্চল হয়। পকেটের মধ্যে হাত রাখে। আবার বের করে। আবার হাত রাখে। ছোটো করে ছোটো বোনটিকে ডাক দেয়, ছোটো।

ছোটো বোনটি গীতাদির বন্ধ দরোজার সামনে চলে গেছে। এবার খুট করে দরোজা খোলার শব্দ হবে। আমাদের কান খাড়া হয়ে ওঠে।

কিন্তু কোনো শব্দ হয় না। দরোজা খোলে না। আমরা বাইরে ঘেমে উঠি। গীতাদি আবার আয়নার কাছে যায়। কাজলদানি হাতে নেয়। জানালার কাছে ফিরে আসে। বলে, আজ তোগো গোপাল দাদা আসবে।

কোন গোপাল দাদা আমরা বুঝতে পারি না। গীতাদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। এরপর হয়তো গীতাদি গোপালদাদা কে, কোথা থেকে আসবে, কেনো আসবে এসব কথাই খুলে বলবে। বলতে বলতে বন্ধ দরোজাটি খুলে দেবে। এবার আমাদের উত্তেজনা কমে আসে। ঘরে গেলে আমরা আরাম করে বসে নেব। কিছুক্ষণ জড়িয়ে নেব। আমাদের খিদে বোধও জাগে এ সময়। দাদা খুক খুক করে একটু কাশে। দরোজার দিকে এগিয়ে যায়।

গীতাদি দরজা খোলার আগে বলে ওঠে, তোরা তো ঘরের ভেতরে আসবি?

আমরা মাথা নাড়ি। বেড়াতে গেলে ভেতরে যেতে হয়। আমরা ঘরের ভেতরে যেতে চাই। ভেতরের খাটে পা ঝুলিয়ে বসতে চাই।

শুনে গীতা গীতাদি হাসে। হাসতেই হাসতেই বলে, আজ থাক। কাল আসিস। তোগো গোপালদাদার জন্য আমি রেডি হচ্ছি।

তারপর বলে, বুঝলি—কাল নয়। পরশু আসিস। আসিস কিন্তু।

এবার জানালা বন্ধ করে দেবে বুঝতে পেরে ছোটো বোনটি দাদার পকেট থেকে বিস্কুটের প্যাকেটটা নিয়ে আসে। জানালা গলিয়ে এগিয়ে দেয়। গীতাদি অবাক হয়। বলে, কী এইটা কী রে?

ছোটো বোনটি আর কিছু বলার আগেই মেজো বোনটি বলে, বিস্কুট। তোমার জন্য নিয়া আইছি। গীতাদি এবার জানালাটি পুরোটা খোলে। তাকে পরীর মতো লাগে। হাওয়ার চুল ওড়ে। থুতনির নিচে একটি তিল আছে।

তবু জানালার কাছে গীতাদি দাঁড়িয়ে থাকে। দরজার কাছে যায় না। বিস্কুটের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে গীতাদি বলে, তোরা কী ভালো। বলে হেসে ওঠে। বুকে চেপে ধরে। ভেতরে মুখটি হারিয়ে যায়। পর্দা নামে। পরীর মতো মুখটি মুছে যায়।

ভেতর থেকে গীতাদির গান শোনা যায়। মাঝে মাঝে পুরোটা শোনা যায়। মাঝে শোনা যায় না। গীতাদি গাইছে—

যাওরে ভ্রমর উড়িয়া
রাধার বন্ধুরে কইও বুঝাইয়া
কোমল পুষ্প ফুটিয়াছে গ্রীষ্ম গেল চলিয়া
আইলা নারে প্রাণের বন্ধু
বিরহী যায় কাঁদিয়া—

গানটি পুরোটা শুনতে মেজো বোনটি জানালার গায়ে কান চেপে ধরে।

জানালার পাল্লাটি বন্ধ হয়ে যায়। ছোটো বোনটি কেঁপে ওঠে। দাদার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায়—দাদা কাছে নেই। রাস্তার ওপাশে দূরে সরে আছে।

সাহাপাড়া অকস্মাৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেউ নেই। রোদ মাথার উপরে চড়ে বসেছে। আমরা এদিক ওদিক তাকাই। খনখনে গলার বুড়িটিকে খোঁজ করার চেষ্টা করি। নেই। তার খনখনে গলাটা শোনা যায় না। কেউ বলছে না, হাউস দেইখা আর বাঁচি না। তিনকালে যাইয়া এককালে ঠেকছি। হাউস দেইখা আর বাঁচি না।

বাড়িতে তখন মা খোলা উঠোনের হেলেঞ্চা শাক রান্না করছে। টাকি মাছ দিয়ে। গোটা গোটা রসুনের ঘ্রাণ ভাসছে চরাচরে। আমাদের দেখে হাসে। বলে, তোরা বেড়াইয়া আইলি?

দাদা কিছু বলে না। মেজো বোনটি একটা থাল নিয়ে বসে। আর ছোটো বোনটি পিঁড়ি পেতে বসেছে। মাথা নিচু করে বলে, হ মা।

মা রায়েন্দা চালের ভাত বেড়ে দেয়। আর তার সঙ্গে কচি ঢেঁড়শ সিদ্ধ। বলে, কী দিয়া খাইলি?

দাদা কথা বলে না। কাঁচা মরিচ লবণ মিশিয়ে ডলে। এরপর দুটো লেবু পাতা নেবে। ছোটো বোনটি কী বলতে যাবে তার আগে মেজো বোনটি বলে, মেলা কিছু।

মা চুলাটি নিভিয়ে দেয়। আঁচলে মুখ মোছে। ছোটো বোনকে বলে, ভালো করে মাখাইয়া নে। এরপরে টাকি মাছের তরকারি খাবি। জিজ্ঞেস করে, ভাত দিছিলো?

—দিছিলো। লক্ষ্মীদিঘা চালের ভাত।

—মাছ দিছিল?

—রায়েক মাছের ঝোল।

—মাংস দিছিল?

—রাওয়া মোরগের মাংস।

শুনে মা হাসে। বলে, গীতার রান্না ভালো। ওর মা সাত গাঁয়ের নেমতন্ন রান্ধে। আমিও যাব একদিন গীতার বাড়ি। খাইয়া আসব।

ছোটো বোনটি টাকি মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে ভুল করে বলে—বিস্কুট।

সেদিন রাতে চাঁদ ওঠে দেরি করে। তবে ওঠে মেঘের মধ্য থেকে। ফুটফুট আলো ছাড়ে। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোটো বোনটি হা করে আছে। একটু। চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপে। স্বপ্ন দেখছে। বিছানায় নেই দাদা। বাইরে গেছে। দরোজা খোলা। মেজো বোনটি তার যাওয়াটি দেখতে পেয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সেও উঠে পড়ে। বিছানায় মাথা নিচু করে বসে থাকে। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

উঠোনের একপাশে হাসনুহেনা ফুটেছে। দাদা সেখানে বসে আছে। দেখে বলে, তোরা ঘুমাসনি? মেজো বোনটি মাথা নাড়ে। বলে, ঘুম আইতাছে না।

আমরা চুপ করে বসে থাকি। টিনের চালে শিশির পড়ার শব্দ শোনা যায়।

মেজো বোনটি আস্তে করে গাইতে শুরু করে—

> যাওরে ভ্রমর উড়িয়া
> রাধার বন্ধুরে কইও বুঝাইয়া
> কোমল পুষ্প ফুটিয়াছে গ্রীষ্ম গেল চলিয়া
> আইলা নারে প্রাণের বন্ধু
> বিরহী যায় কাঁদিয়া—

পুরোটা গায় না। গাইতে পারে না। দাদা বলে, গা না। পুরোটা গা।

মেজো বোনটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই মুখটাই গাইতে থাকে বার কয়েক। তারপর মুখ কালো করে থেমে যায়। জানায়, পুরোটা সে জানে না। সেদিন গীতাদির গলায় এইটুকুই শুনতে পেয়েছিল। এইটুকুই সে নিজের গলায় তুলে নিয়েছে। বাকিটুকু শুনতে পারেনি। আরেকদিন গীতাদির বাড়ি বেড়াতে যাবে। পুরো গানটা শুনে আসবে। পুরোটুকু শুনতে পারলে সে নিজে পুরোটা গাইতে পারবে।

দাদা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল বলে গীতাদির গাওয়া গানটি সেদিন শুনতে পায়নি। আজ মেজো বোনটির গলায় শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। পুরোটা শোনার তৃষ্ণা বেড়ে গেল। মনে

হল একুণি আবার সাহাপাড়ায় ছুটে যায়। গীতাদিকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আসে। এই উঠোনে হাতিম তলার নিচে বসতে পিঁড়ি দেয়। বলে, গীতাদি কোমল পুষ্পর গানটি পুরোটা শোনাও।

গীতাটি একটু মুখ আলো করে গানটি ধরবে। সঙ্গে মেজো বোনটি। ঘর থেকে বাবা উঠে আসবে। মা দুটো মুড়ি নিয়ে আসবে। ছোটো বোনটি ঘুম ঘুম মাখা চোখে অপেক্ষা করবে কখন গীতাদি গান শেষ করবে। তার দিকে বাড়িয়ে দেবে গ্লুকোজ বিস্কুটের প্যাকেটটি। বলবে, আমি আসতি কইনি বলে তোরা বাড়ির মইদ্দে ঢুকলি ক্যান? তোরা ফিরে যাবি ক্যান?

গান শেষ হওয়ার আগে কী মনে করে দাদা বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মেজো বোনটির দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, ওরে মেজো, আমরা কি সত্যি সত্যি আজ গীতাদির বাড়ি গেছিলাম?

মেজো বোনটির গান থেমে যায়। হাওয়া এসে চুলে লাগে। তিরতির করে কাঁপে। দূরে রাতচরা শিয়ালের ডাক শোনা যায়। মেজো বোনটির গা শিরশির করে ওঠে। বলে, আমরা সাহাপাড়ায় মন্মথ বিশ্বাসের বাড়ি গেছিলাম। ওখানে গীতাদি থাকে। আমরা সবাই আজ গীতাদির বাড়ি বেড়াইতে গেছিলাম।

—ওটা কি সত্যি কি গীতাদির বাড়ি ছিল?

—মা যে কইছিল, সাহাপাড়ায় গীতাদি থাকে।

—মা কি কইছে সাহাপাড়ায় কোন বাড়িটা গীতাদির বাড়ি?

এর কোনো উত্তর নেই। মাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো এর ঠিক উত্তরটি পাওয়া যাবে। কিন্তু মা এখন ঘুমিয়ে আছে। বাবা ঘুমিয়ে আছে। ছোটো বোনটিও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এখন মাকে ডাকা যাবে না। কাল হয়তো বলা যাবে না। হয়তো মনে থাকবে না। মনে থাকলেও আর দরকার হবে না। অন্য কোনো কাজ ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

মেজো বোনটির চোখ ভরে আসে জলে। তার অস্থির লাগে। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

দাদা বলে, মা এই কথা কয় নাই। মা তো জানেই না গীতাদির বাড়ি কোথায়। হয়তো কোনোদিন কারো কাছ থেকে শোনেনি। বানায় কইছে।

—মা বানায় কথা কয় না। ফুঁসে ওঠে মেজো বোনটি।

কিন্তু একথাটি দাদাকে বলে না। মাথা নিচু করে নীরবে বসে থাকে। তার পা ভিজে যায় ফোঁটা ফোঁটা জলে।

আজ বাবার সঙ্গে গীতাদির মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছেন—গীতা এখানে নেই। গত চার মাস আগে ফরিদপুর গেছে। রেল ইস্টিশানের কাছে কমলাপুরে আছে। অনাথের আচারের দোকানটির পাশে তার শশুরবাড়ি। এখন তাদের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে সব ঝামেলা। তারা গীতাদিকে মেনে নিয়ে নিয়েছে। দাদা জানে। বাবার কাছে শুনেছে।

গীতাদিকে দেখতে ফরিদপুর গিয়েছিল তার মামা। দিন তিনেক ছিল। আজ ফিরেছে।

ছেলেপুলে হওয়ার পরে গীতাদিকে তিনি ফরিদপুর থেকে নিয়ে আসবেন।

দাদা বলে, বুঝলি মেজো, সাহাপাড়ার গীতাদি আমাগো গীতাদি নয়। উনি অন্য কেউ। আমাগো অচেনা মানুষ। আমরা আজ সাহাপাড়ায় গীতাদির বাড়ি বেড়াইতে যাই নাই।

এই কথাটি বলার সময় মেজো বোনটি ছুটে এসে দাদার মুখ চেপে ধরে। বলে, না। না। গীতাদি এখানে এ শহরেই আছে। সাহাপাড়ায় মন্মথ বিশ্বাসের বাড়িতেই থাকে। আমরা গীতাদির বাড়ি আজ বেড়াইতে গেছিলাম।

আমরা আবার বেড়াতে যাব। যাবো গীতাদির বাড়ি।

সাং সাহাপাড়া। কেয়ার অফ মন্মথ বিশ্বাস।

পূর্বাভাস

অনিল ঘোষ

বরদাকান্তর চোখ সিলিং ফ্যানের দিকে। বড্ড আস্তে ঘুরছে। ভ্যাপসা গরম। চিটপিট করছে শরীর। বরদাকান্তের একবার ইচ্ছে হল বলেন, চলুন বাইরে বসি—। ইচ্ছেটা কোঁৎ করে গিলতে হল সূর্য ঘোষকে দেখে। যেমন বিরক্তির মুখ নিয়ে বসে আছেন, বললেই হয়তো খেঁকিয়ে উঠবেন, আপনার আর কী, আছেন তোফা আরামে। আপনার বাড়ি অ্যাটাক হলে বুঝতেন। গরম ঠান্ডা সব পিছন দিয়ে বেরিয়ে যেত।

বরদাকান্ত 'হুউম' করে একটা আওয়াজ করলেন। প্রায় নিস্তব্ধ পরিবেশে ওই শব্দটা প্রায় বোমার মতো ফাটল। চমকে উঠল সবাই। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার ফিরে গেল যে যার অবস্থানে।

বরদাকান্তর ডান পাশে লম্বা বেঞ্চে সনৎ চক্রবর্তী, মদন সাউ, বিকাশ ব্যানার্জী, গোপাল মণ্ডল পর পর বসে। বাঁ-দিকের বেঞ্চে নিরঞ্জন ঘোষ, সুবিমল দে, মন্টু মুখার্জী, বিজয় সেন। সামনে সতরঞ্চির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে তীর্থ রায়, রাজেশ দাস, কনক শিকদার, সুনীল ধর, প্রকাশ রায়, সুরজিৎ চৌধুরী। সূর্য ঘোষ বসেছেন সকলের মাঝখানে। তিনি যেহেতু মধ্যমণি, তাই মাঝখানের আসন তাঁর প্রাপ্য। বরদাকান্তর একবার ইচ্ছে হল মধ্যমণিকে খোঁচা দেন। কিন্তু সামলে নিলেন। আজকের মিটিং সূর্য ডেকেছেন। অতএব মাঝখানের আসন ওরই প্রাপ্য।

বরদাকান্ত দেখলেন, পাড়ার প্রায় অর্ধেকটাই উঠে এসেছে ক্লাবঘরে। পাড়াটা নতুন। সবে গড়ে উঠেছে। প্লটে জমি কিনে বাড়ি। দেখতে দেখতে কেমন জমজমাট হয়ে গেল। লোকের মুখে নাম হয়ে গেল নতুন পাড়া। এখানে সূর্য ঘোষ অবশ্য নতুন নন। তিনি এই পাড়ার আদি বাসিন্দা। বরদাকান্ত ছিলেন ওঁর সহকর্মী। সেই সূত্রে এখানে জমি কেনা, বাড়ি করা। বাকিরা এসেছেন তার পর। বরদাকান্ত, সূর্য ঘোষের সূত্র ধরে। পারস্পরিক সম্পর্ক খুব গাঢ় না হলেও পাড়াতুতো একটা ব্যাপার থেকেই যায়। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পারিবারিক পুজো, উৎসবে আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ অব্যাহত। বিপদ আপদে সবাই কাছাকাছি, পাশাপাশি। আর তার সমাধানের চিন্তাভাবনা চলে এই ক্লাবঘরকে কেন্দ্র করে। ক্লাবঘরটা বলতে গেলে নতুন পাড়ার কমিউনিটি সেন্টার।

সূর্য ঘোষ ঘড়ি দেখলেন। বিরক্তি ফুটে উঠল চোখে মুখে। আটটা বেজে গেছে। সময় দেওয়া হয়েছিল সাড়ে সাতটা। এখনও সকলে আসেনি। এদের কারও কি দায়িত্ববোধ আছে! নাকি ভাবছে, এটা যেহেতু তাদের ব্যাপার নয়, তাই—।

সূর্য ঘোষ বিরক্তির গলায় বললেন, আর পাঁচ মিনিট দেখব, তারপর শুরু করে দেব।

বিকাশ ব্যানার্জী বললেন, সবাই তো আসেনি।

না এলে কী করব। সূর্য ঘোষ প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, সকাল থেকে সবাইকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা হয়েছে, কেউ তো কালা নয়।

বরদাকান্ত সূর্য ঘোষের সমর্থনে বললেন, জ্বালাটা কেউ বুঝছে না। আজ চারটে বাড়ি অ্যাটাক হয়েছে, কাল আরও চারটে বাড়ি অ্যাটাক হতে পারে।

গোপাল মণ্ডল বললেন, আসলে ঘাড়ে না পড়লে কেউ বুঝবে না। আমাদের পড়েছে, আমরা বুঝছি।

বিজয় সেন এক টিপ নস্যি নিলেন জোরে। ঘরময় ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল। এটা বিজয়ের একটা সংকেত। কথা বলার আগে নস্যি টানার সিগন্যাল দেন।

রুমালে নাক মুছতে মুছতে বিজয় সেন নাকি সুরে বললেন, আজকাল সবাই ভীষণ সেলফ সেন্টারড্ হয়ে গেছে। ইউনিটির মাহাত্ম্য কেউ বুঝল না। ইউনিটি ইজ স্ট্রংগার—।

মন্টু মুখার্জী হাত তুলে থামালেন বিজয়কে, অ্যাই থামুন তো মশাই। কোথায় ইউনিটি। দিনকাল পালটে গেছে। আগে বিপদে পড়লে সবাই এগিয়ে আসত, এখন সটকান দেয়। দেখেন না, রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট হলে কেউ আর এগিয়ে আসে না—।

রাজেশ দাস মাথা নাড়িয়ে বিষন্ন ভঙ্গিতে বললেন, বিষ জমেছে মশাই। বিষে বিষে নীল হয়ে গেল সবকিছু। চারদিক থেকে আমরা আক্রান্ত। মুক্তি নেই কোথাও। এই যে মুক্তির খোঁজে সবাই গলা ফাটিয়ে পরিবর্তন চাইল, এখন তো সেই পরিবর্তন বাঁশ হয়ে ঢুকছে পিছনে।

বিকাশ ব্যানার্জী ফোড়ন কাটলেন, আর আপনারা। আপনারা তো দেশটাকেই বেচে দেবার তাল করেছিলেন। উফ, কত বড়ো বড়ো চোর সব পয়দা করেছেন—পাঁচশো কোটি, হাজার কোটি আপনাদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। এবারের ভোটে তো ঝাড়ে বংশে প্রায় নির্বংশ হয়ে গেলেন।

আপনারা কি সব ধোয়া তুলসীপাতা নাকি। আপনার পার্টির এত টাকা কোথা থেকে আসে মশাই?

শুনুন, মুখে বললে তো হবে না, প্রমাণ করুন। সবই তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এই যে এত চিৎকার করা হচ্ছে হ্যান করেগা ত্যান করে গা, কেউ তো বারণ করেনি, পারলে প্রমাণ করুক।

প্রকাশ রায় বললেন, চুরির আবার প্রমাণ হয় নাকি। বিকাশবাবুরা খেতে পারেন পাঁচ লাখ, কিন্তু সুন্দরবন থেকে দিল্লি পর্যন্ত তার ভাগ পৌঁছে যায়। সেইজন্য বিকাশবাবুদের দলে সব শেয়ালের এক রা। আর আপনাদের মশাই খাওয়ার ক্ষমতা পাঁচশো আর সেটা একা ভোগ করবেন। তাইতো এত কোন্দল, মারামারি, গোষ্ঠীবাজি।

বিকাশ ব্যানার্জী আর রাজেশ দাস প্রায় একযোগে হামলে পড়লেন, আপনারা ভাবছেন আচ্ছে দিন এসে গেল। ওসব বড়ো বড়ো লেকচার দিয়ে মাঠ ময়দান গরম করা যায়, মানুষকে সামলানো অত সোজা নয়। ভেবেছেন এবার বাংলা দখল করবেন, ওই স্বপ্ন দেখুন। আপনারা তো সব গেরুয়া হাঙর।

প্রকাশ রায় হেসে বললেন, যতই আপনারা একসঙ্গে গলা ফাটান, আমাদের রুখতে পারবেন না। আর আমরা মশাই আপনাদের মতো ছুঁচোর দল নই যে হাত গন্ধ করতে যাবো।

বরদাকান্ত জোরে গলা খাঁকারি দিলেন। আলোচনা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। এর পর পার্টি, রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি, শেষে হবে চিৎকার চেঁচামেচি। চাপা পড়ে যাবে আসল-ব্যাপার।

বরদাকান্ত বললেন, আমরা এখানে এসেছি একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে, কথাবার্তা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভালো নয় কি।

ঘরের আবহাওয়া আবার আগের মতো শান্ত নীরব হয়ে গেল। সিলিং ফ্যানের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আর ভ্যাপসা গরম।

বরদাকান্ত নীরবতা কাটাতে সূর্য ঘোষের দিকে ফিরে বললেন, নাও, শুরু করে দাও।

ডানদিকের বেঞ্চ থেকে মদন সাউ বললেন, মিটিং যখন, তখন একজন সভাপতি ঠিক করলে হয় না?

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে সুবিমল দে ফোড়ন কাটল, অ্যাই শুরু হল জিলিপির প্যাঁচ।

মদন ঘুরে বললেন, কী বললেন?

বরদাকান্ত হাত তুলে বললেন, আহ্, থামুন তো। বসুন মদনবাবু। এটা কোনও ফর্মাল মিটিং নয়, তাই সভাপতি বা ওই জাতীয় কিছু করার দরকার নেই। সমস্যাটা সবাই জানেন, সমাধান কী করে হবে তাই নিয়েই কথা হোক। সূর্য তুমি শুরু করে দাও।

সূর্য বললেন, শুরু তো হয়েই গেছে। এখন বলুন কী করা যাবে।

সুরজিৎ বলল, এ তো চোর ডাকাতে নয় যে থানা-পুলিশ করলাম, রাত জেগে পাহারা দিলাম। এ তো দেখছি অদ্ভুত আক্রমণ। নিঃশব্দে অ্যাটাক করছে। একেবারে গেরিলা ওয়ার। লাখে লাখে পিঁপড়ে আসছে এক-এক বাড়িতে। দেওয়াল বেয়ে উঠছে নিঃশব্দে। পুরো দেওয়ালটা লাল হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো।

বিজয় সেন এক টিপ নস্যি টেনে বললেন, সুনামি টুনামি হবে নাকি।

বিকাশ ব্যানার্জী বললেন, এর সঙ্গে আবার সুনামির কী সম্পর্ক?

আছে মশাই, আছে। মাটির তলার জীবরা আসলে খুব সেনসিটিভ।

মন্টু মুখার্জী বললেন, এটা ঠিক বলেছেন। আমি একটা বইতে পড়েছি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর সবার আগে জানতে পারে মাটির তলার জীবরা।

রাজেশ দাস ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে বললেন, আপনি বলতে চান, জাপানের সুনামির খবর ওরা আগে পেয়েছিল।

বিজয় সেন মন্টু মুখার্জীর সমর্থন পেয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন রাজেশের উপর, পেয়েছে কি পায়নি তার খবর আপনি রাখেন? আপনি কি জানেন, কয়েক বছর আগে এ দেশে যে সুনামি হয়েছিল, তাতে আন্দামানের জারোয়ারা কেউ মরেনি।

কনক শিকদার অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিলেন। এবার সুযোগ পেয়ে বললেন, তার মানে আপনি বলতে চান, আন্দামানের জারোয়া আর মাটির তলার জীবরা এক।

বিজয় সেন তর্কের গন্ধ পেয়ে তেড়েফুঁড়ে বললেন, আপনি জানেন না, জারোয়ারা আসলে মাটির সন্তান। সেজন্য ওরা এখনও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

গোপাল মণ্ডল বলল, সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে ওদের দেখে শিক্ষা নিয়েছি। ওরা যখন মাটির তলা থেকে উঠে আসছে, তখন কিছু একটা ঘটবেই।

নিরঞ্জন ঘোষ উদাস ভঙ্গিতে বললেন, এ হল প্রকৃতির প্রতিশোধ। সমস্ত সবুজ খেয়ে ফেলছেন, জল শুষে নিচ্ছেন, জমি লুঠছেন, বুদ্ধিজীবীদের ভেড়া বানাচ্ছেন, হাসপাতাল মানে তো নরক, স্কুল-কলেজ মানে গিনিপিগের আখড়া—এসবের একটা রিটার্ন নেবেন না। প্রকৃতি কোনও-না-কোনওভাবে শোধ নেবেই। আর প্রকৃতি যখন মারবে, তখন কোনও ইনকিলাব স্লোগান দিয়ে, মিটিং-মিছিল-বনধ্-অবরোধ করেও নিস্তার পাবেন না।

আলোচনা আবার অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে বরদাকান্ত বিরক্তমুখে গলা খাঁকারি দিলেন। এরা কেউ যদি সিরিয়াস হয়। বিরক্তির গলায় বললেন, আমরা কিন্তু আমাদের এখানকার সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে অন্যদিকে যাবেন না। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমাদের এই নতুন পাড়ায় সবকিছু আমরা একসঙ্গে শুরু করেছিলাম। যে-কোনও সমস্যায় আমরা পাশাপাশি থেকেছি, সমাধান করার চেষ্টা করেছি। তাইতো সবাইকে ডেকেছি।

মদন সাউ বললেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন না কী করতে চান?

বরদাকান্ত বললেন, জানেন তো সবই।

হ্যাঁ জানি, তবু আলোচনার পয়েন্টগুলো তো ধরতে হবে। গত সাতদিন ধরে লাখে লাখে পিঁপড়ে আসছে, এক-এক বাড়ি অ্যাটাক করছে—।

সনৎ চক্রবর্তী বাধা দিয়ে বললেন, অ্যাটাক শব্দটায় আমার আপত্তি আছে। ওরা এক-একটা বাড়িতে আসছে ঠিকই, কিন্তু কাউকে কামড়াচ্ছে না বা কিছুই করছে না। এক-একদিন এক-এক বাড়ির দেওয়াল বেয়ে উঠছে, আবার চলেও যাচ্ছে।

সূর্য ঘোষ খেঁকিয়ে উঠলেন, এটা অ্যাটাক নয় তো কী। শোয়ার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর এমনকী বাথরুমেও লাল পিঁপড়ে থিকথিক করছে। এভাবে পিঁপড়ে নিয়ে বাস করা যায়। আপনারাই বলুন।

সুরজিৎ বলল, আবার তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলেও যাচ্ছে।

বিজয় সেন বললেন, কিন্তু আসছে কেন, এটা তো জানতে হবে।

মণ্টু মুখার্জী বললেন, এ হল জীবজগতের রহস্য। নইলে কোথাও কিছু না এইসব নতুন নতুন বাড়ির দেওয়াল বেয়ে উঠবে কেন? মাটির তলার জীব মাটিতেই থাকা উচিত। পাতাল ছেড়ে ওঠার বাসনা যখন দেখা দিয়েছে তখন বুঝতে হবে মাটির তলায় কিছু একটা ঘটছে, যা আমরা উপরে বসে টের পাচ্ছি না।

নিরঞ্জন ঘোষ বললেন, ভূমিকম্প-টম্প হবে নাকি, ও মশাই—।

হতে পারে।

বিকাশ ব্যানার্জী বললেন, আবহাওয়া কেমন পালটে গেছে দেখছেন। এখন প্রায় সারা বছরই গরম। সুজলা সুফলা বাংলা তো এখন ইতিহাস।

কনক শিকদার বললেন, নারকেল গাছের চেহারা দেখেছেন। কেমন ঝোড়ো কাক। ডাবগুলো দেখুন, কেমন কম্যাটে চেহারা। চড়ুই পাখি দেখতে পান? কী যে হচ্ছে। আর কী গরম। এটা যে শ্রাবণের শেষ কে বলবে। মনে হচ্ছে বৈশাখ মাসে বাস করছি। একফোঁটা বৃষ্টি নেই।

প্রকাশ রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, হবে আর কী। মা মাটির পার্টি সব বিষাক্ত করে দিয়েছে। মাটির উপর নিচ, কিছুই আর বাকি রাখল না। পশ্চিমবঙ্গে এখন একমাত্র শিল্প তোলাবাজি। যতই হিল্লি-দিল্লি সিঙ্গাপুর ঘুরুন না কেন, এখানকার কলকারখানা সব বাপ বাপ বলে পাততাড়ি গুটোচ্ছে। যে হারে খুনজখম-ধর্ষণ—শিল্পায়নের নামে ধাষ্টামো—সিন্ডিকেট রাজ-পার্টিবাজি—বিচারের নামে অবিচার চলছে তাতে মা মাটি কেন, কীটপতঙ্গের পর্যন্ত এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

সুনীল ধর এবার মুখ খুললেন, অ্যাই শুরু করলেন তো। আমি কিন্তু কোনও কথাই বলিনি। তা ঢিল মারলে কিন্তু পাটকেলটা খেতে হবে। আমাদেরও কিছু বলবার আছে। আপনি মিডিয়ার কাঁদুনি শুনে নাচবেন, তা আমাদের শুনানিও তো শুনবেন। একতরফা বলে গেলে তো হবে না।

আপনাদের আবার কী কথা। আপনাদের এখনও মুখ আছে বলার। লোকে তো আপনাদের স্বরূপ দেখে ফেলেছে।

সে তো আপনাদেরও দেখেছে তিন দশক ধরে। একেবারে চিবিয়ে চুষে ছিবড়ে করে দিয়ে গেছেন, তার দায় এখন নিতে হচ্ছে না।

বিকাশ ব্যানার্জী প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, কী বলতে চান! আমরা কি কারও দয়ায় ছিলাম নাকি। মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে।

সে তো আমরাও আছি ভোটের জোরে। আপনারা প্রত্যেকবার বলেন ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যে দাঁড়াচ্ছেন সে তো সবাই দেখছে। এই তো লোকসভা ইলেকশনে কেমন ঝাড়টি খেলেন, এখনও বুঝি ব্যথা মরেনি।

মরেছে কি মরেনি সেটা টের পাবেন। গোকুলে বাড়ছে।

ওই আনন্দে প্যান্ট খুলে নাচুন। আমরা মশাই আপনাদের মতো চুরি করে নেই।

আর থাকবেন না। আপনাদের এই তুঘলকি সরকার এবার ঝাড় খেল বলে। ক্যালানো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। পিঠে বস্তা বেঁধে তৈরি থাকুন। এক চিটফান্ডই সব প্যান্ট খুলে দেবে।

আপনি কিন্তু ভোট, রাজনীতি এসব নিয়ে আসছেন।

বেশ করছি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর জুড়ে একটা হইচই শুরু হয়ে গেল। গোটা ঘর প্রাই দুই-তিনদিকে বিভক্ত। সবাই চিৎকার করছে। কারও কথা প্রায় শোনা যাচ্ছে না। শুধুই চিৎকার। সূর্য ঘোষ কেমন হতভম্বের মতো বসে রইলেন। বরদাকান্ত বার দুয়েক বলার চেষ্টা করলেন, কী করছেন আপনারা—। প্রবল চিৎকারে ওঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

তীর্থ দেখল ওর এখানে আর কিছু করার নেই। সমাধানের নামে সমস্যা এখন বেড়েই চলবে। ও ফাঁক গলে বেরিয়ে এল। ওর পিছু পিছু সুরজিৎ। দুজনেই সমবয়সি। আসলে ওদের এখানে আসার কথা ছিল না। তীর্থর দাদা আর সুরজিৎ-এর বাবা দুজনেই অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় ওদের আসতে হয়েছে। বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে বলল, জানতাম, পাঁচটা বাঙালি এক জায়গায় হলে কাজের কাজ কিছুই হবে না, পার্টি পলিটিক্স করেই শেষ হবে। এখন কোথায় গিয়ে ঠেকে দ্যাখ। শেষে না মারামারি বেধে যায়।

তীর্থ মাথা নেড়ে বলল, ব্যাপারটা কিন্তু ভালোই ছিল, আমরা সবাই মিলে পাড়ার সমস্যা পাড়ায় বসে সমাধান করতাম। কোথা থেকে রাজনীতি ঢুকে সব শেষ করে দিল। এখন সব আবার ভাগাভাগি, আমরা ওরা—এসব চলবে।

এটাই ইতিহাসের নিয়ম। পিছন থেকে কনক শিকদার বললেন। দুজনে চমকে তাকাল। কনক শিকদার কখন বেরিয়ে এসেছেন ওদের দেখাদেখি। তীর্থ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। কনক শিকদার অধ্যাপক মানুষ। স্থানীয় কলেজে পড়ান। তীর্থ ওনারই ছাত্র ছিল। সে হেসে বলল, স্যার, আপনিও পারলেন না টিকতে।

ক্লাবঘরের সামনে ফাঁকা চত্বরে কংক্রিটের বেঞ্চ পাতা। তাতে বসে পড়লেন কনক। মাথা নেড়ে বললেন, কী করে পারব। এ তো ইতিহাসেরই শিক্ষা। চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস' দেখেছ?

তীর্থ মাথা হেলিয়ে জানাল, দেখেছি।

কনক বললেন, তা হলে প্রথম দৃশ্যটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই।

শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢোকার দৃশ্য?

আমরা কি ওর থেকে বেশি কিছু? আমরাও তো কোন-না-কোনও শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকছি আর বেরুচ্ছি। নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করছি, করেই চলেছি। অথচ বিন্দুমাত্র বুঝছি না ভিতরে ভিতরে কোথায় ধস নেমেছে।

সুরজিৎ বলল, স্যার, আপনি কিন্তু কায়দা করে জবরদস্ত গালাগাল দিলেন।

কী রকম? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন সুরজিতের দিকে।

সুরজিৎ বলল, ওই যে শুয়োর বললেন।

কনক হা হা করে হেসে উঠলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, শুয়োর কোনও গালাগাল নয়। ওটা প্রাণীবাচক একটা শব্দ, সমাজের উপকারী বন্ধু। কিন্তু আমি যাদের শুয়োর বলে চিহ্নিত করতে চাইছি তারা সামাজিক প্রাণী বটে, কিন্তু পুরোপুরি ব্লাস্ট। ওই ক্লাবঘরের দিকে তাকাও, বুঝতে পারবে।

সুরজিৎ এবার শব্দ করে হেসে উঠল। তীর্থও আর চুপ করে থাকতে পারল না। সেও হাসিতে যোগ দিল। কনক বললেন, আসলে কী জানো, ইতিহাসের সঙ্গে এর একটা সংযোগ আছে। তোমরা নিশ্চয়ই সত্যজিতের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' দেখেছ?

দুজনেই মাথা হেলাল। কনক বললেন, তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি। আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরছি আর বাইরের শত্রু বিনা বাধায় এসে আমাদের বেঘর করে দিচ্ছে, আমরা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নই। এ দেশটা বারেবারে পদানত হয়েছে ঠিক এই কারণে। সে তুমি মহাভারতের কালেও দ্যাখো, যদুবংশ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হল আর বাইরের শত্রু এসে লুটপাট করতে শুরু করল। তখন থেকেই বাইরের শক্তি এই দেশটার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে আর আমরা নির্বিবাদে সেটা মেনে নিচ্ছি। সেটা পৃথ্বীরাজের সময়েও দেখতে পাবে, ইব্রাহিম লোদির সময়েও পাবে, বাংলায় লক্ষ্মণ সেন, সিরাজদ্দৌলার সময়েও পাবে। এখনও কত সত্য দ্যাখো। পিঁপড়েগুলো হয়তো তেমন কোনও সর্বনাশের কথাই জানাতে উঠে আসছে পাতাল খুঁড়ে, আমরা কেউ খেয়ালও করছি না।

তোমরা কি জানতে হিটলার যখন জার্মানির ক্ষমতায় বসে, সেই সময়ে প্রায় ইউরোপ জুড়ে লাখে লাখে ইঁদুর গর্ত ছেড়ে পথে উঠে এসেছিল। ইউরোপে প্লেগ দেখা দিয়েছিল।

তীর্থ বলল, আপনি বলতে চান ওই ইঁদুরগুলো ফ্যাসিজিমের কথা বলতে এসেছিল?

হতে পারে। প্রাণীদের অনেক লক্ষণ আছে যেটা আমরা ধরতে পারি না।

এই যে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেল, তারও কি সংকেত কেউ দিয়েছিল?

কনক হেসে ফেললেন, দিয়েছিল কিনা জানি না, তবে কাগজে পড়েছি ওই সময় মস্কোর রাস্তায় প্রচুর পাগলা কুকুর দেখা দিয়েছিল, মানুষ দেখলে তাড়া করত।

সুরজিৎ বলল, এ স্যার আপনার অতি কল্পনা।

অস্বীকার করছি না, তবে কিছু কার্যকারণ সূত্র তো আছেই। সেটাকে উড়িয়ে দেব কী করে। আসলে, যে-কোনও ঘটনার প্রাথমিক বার্তা পৌঁছয় কিন্তু মাটির তলায়। আমার তো বারবার মনে হচ্ছে পিঁপড়েগুলো কিছু একটা জানাতে চাইছে, আমরা বুঝতে পারছি না। এখন কেউ একে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে, আবার কেউ ধর্ম দর্শন দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

ওদের কথার মাঝখানে দমকা হাওয়ার মতো একটা চিৎকার উড়ে এল রাস্তা থেকে। তীর্থ চমকে দেখল পাড়ার একমাত্র পাগল গগন মণ্ডল বুকে চাপড় মারতে মারতে চিৎকার করে বলছে, এসে গেছে এসে গেছে, হুঁশিয়ার খবরদার—।

গগনের চিৎকার এতই জোরে হচ্ছে যে, ক্লাবঘরের হইচই মুহূর্তেই থেমে গেল, সমবেত কণ্ঠে 'ইসসসসস' শব্দ উঠল। ঘরে যেন হিমশীতল নীরবতা নেমে এল। সুরজিৎ বলল, কী ব্যাপার বল তো?

গগন ততক্ষণ চিৎকার করতে করতে দৌড়ে চলে গেছে মাঠের দিকে। ওর বিকৃত গলার হাসির শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছিল। ক্লাবঘর কিন্তু নিশ্চুপ। মদন সাউ শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু সুনীল ধর, রাজেশ দাস। সকলের চোখেমুখে কী এক আতঙ্কের ছাপ।

তীর্থ বলল, চল তো দেখে আসি।

ওরা প্রায় ছুটেই গেল ক্লাবঘরের দিকে। দেখল সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আছে। তীর্থ দেখল পিছনের সাদা দেওয়ালে আধখানা চাঁদের মতো আকার নিয়ে উঠে আসছে লাখে লাখে লাল পিঁপড়ে। একটু একটু করে জায়গা বাড়াচ্ছে নিঃশব্দে। পুরো দেওয়ালটা লাল হয়ে উঠছে। তীর্থ বুঝতে পারছে না ওরা কী বলতে আসছে? এ কীসের ইঙ্গিত? কীসের পূর্বাভাস?

এবং ভিত্তি পাশবতা

হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে আগামী এক সপ্তাহ ধরে, সাতটি জেলায়, বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর বীরভূম কলকাতা হুগলীতে তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে। রঞ্জন শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসেও ঘামতে থাকে। সে একটা কনসালটেন্সি ফার্মে কাজ করে। রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট উইংসে। গতমাসে হায়দ্রাবাদের একটা স্টিল ফ্যাকট্রির জেনারেল ম্যানেজার মি. কে. এল রেড্ডি এসেছিল স্পেসিম্যান নিয়ে। জুনিয়ারদের ইনস্ট্রাকশান দেওয়া ছিল, যা-রিপোর্ট পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে সে একটা 'কেস স্টাডি' করে দেয় সঙ্গে একটা পেপার। বিশেষতঃ সি-টুয়েন্টি মিডিয়াম ম্যাঙ্গানীজ সি-ফিফটিন, টি এম টি ফাইভ হান্ড্রেড, টি এম টি ফোর ফিফটিন এবং টপ পোয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মূলত স্কেল হিটে ফসফরাস, সালফার এবং সিলিকনের রেঞ্জটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা। এত বড় সাফল্য যে সে এবং তার টিম পাবে, অতটা কল্পনা করার আগেই ফের হায়দ্রাবাদ থেকে মি. রেড্ডি নিজে কলকাতায় উড়ে এসে রঞ্জনকে ধন্যবাদ শুধু নয়, পার্টিতে আহ্বান গ্যাতে সেই সঙ্গে গিফট শুধু তার জন্যে নয়, ভাবির জন্যে— ভাবি হয়েছে কী না তা জানারও প্রয়োজন বোধ না করে। এবং গোপনে 'স্যার, আপনি ব্রিলিয়েন্ট। এরকম ট্যালেন্টেড পার্সন উই নিড, উই রিকোয়ার্ড স্যার। হাউ মাচ য়্যু এক্সপেক্ট পার মান্থ স্যার বলে অপেক্ষা করতে থাকে।

—নো, অলরাইট। দিস ইজ নট দ্য টাইম টু টক অ্যাবাউট বলে হাসতে থাকে রঞ্জন কিন্তু 'ভাবি' শব্দটায় উৎপ্রেক্ষা তাকে কয়েকটি দৃশ্যের প্রতি ধাবিত করে। তখন সমাজ সংসার অদৃশ্য হলেও মিলির সমর্থনে তার তৃতীয় আত্মা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ট্রেনিং-এ থাকাকালীন রঞ্জনকে, সবার মতোই এরকম ম্যানেজম্যান্ট ক্যাডারে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়তে হয়। আর কেরিয়ারের টেকিতে পা দেওয়া মাত্র সেই যে সে চলা শুরু করে, 'চরৈবেতি', তা অনবরত ফিস্তে দৌড়ানোর এক অনন্ত ম্যারাথন ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে পরিস্ফুট হয়। কেননা অভিজ্ঞতা চিরকালই বড়ো মহীয়ান।

মিলি তখন ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে পড়ছে সি. ইউ-তে। এত সুন্দর চোখ সাধারণত দেখা যায় না। 'আইব্যাঙ্ক' লুফে নেবে। স্বচ্ছন্দে 'নয়না' কিংবা 'শ্রীময়ী' নামকরণ যথার্থ হোত। তখন আরেকটা কথাও মনে এসে মিলিয়ে গেছিল 'জিনস্ আর পোর্সানস অব দ্য সিনিয়র-ইউনিট অব লণ্ডনাও ডি এন এ'।

মিলির মুখ নিচু। প্রথম আলাপে চোখের পাতায় শিশিরের জল। কলকাতা-ক্রোমোজোম। সে কী তবে গাঁইয়াভূত।

—স্যার, একটু ভেবে দেখবেন। রেড্ডির সপ্রতিভ আকৃতি।

—ও হ্যাঁ, ও. কে। আই উইল টক টু য়্যু ইন দিজ রিগার্ড।

—স্যার প্লিজ। সিরিয়াসলি থিংক অ্যাবাউট ইট।

রঞ্জন ভাবে লেখক, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, বিজ্ঞানী এদের মধ্যেও কেউ কেউ অন্যরকম তো থাকেই। গবেষকদের মধ্যেও আছে। আছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। সে একজন ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি রসায়ন শাস্ত্রের গবেষক ধাতুবিদ্যাপারদর্শী বিশেষত স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন গ্রেডের স্টিল তৈরীতে ধাতু ও অধাতুর। ক্রিয়া ও নতুন নতুন পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত একথা অনস্বীকার্য কিন্তু সে যে একজন পুরুষ, আর পুরুষ মানুষের যে পৌরুষ তার পরীক্ষা হয় সংঘাতের দ্বারা বিশেষত একজন নারী যখন এসে দাঁড়ায় তাঁর সর্বস্ব নিয়ে কিন্তু শত পুরুষের আকাঙ্ক্ষার আকর হয়ে। এইসব ক্ষুদ্র বৃহৎ আঘাত মনে মনে তাকে যতোই ব্যথিত করুক বাইরে বিচলিত করতে পারেনি কখনো। প্রথম প্রথম গ্রামের ছেলে হিসেবে ভেবেছিল একটা স্নিগ্ধ, পেলব সাহচর্য ছাড়া মেয়েদের কাছে আর কী পাবার আছে, আর এ বিষয়ে তার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। নিজের শরীর স্বাস্থ্য আর কামনায় বাসনাকে ব্রহ্মচর্যের আগলে বেঁধে রাখা এবং নিজের কাছেই অক্ষুণ্ণভাবে গচ্ছিত রাখাই ছিল তার এবং তাদের পরিবারের বৈশিষ্ট্য অন্ততঃ বিয়ের আগে আলিঙ্গন চুম্বন এবং সঙ্গম তো নয়ই শিষ্টাচার হিসেবে সাত পাকে বাঁধার পর এই অটুট অবস্থানের অবসান হবে তাও এক এবং অদ্বিতীয়া সহধর্মিনির কাছে। কলকাতায় এসে, বিশেষত মিলির সংস্পর্শে এসে তার সেই অবস্থান কিছুটা শিথিল হয়েছিল বা সংক্রামিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কিংবা আমূল আদর্শচ্যুত করেছিল বলা যায় না। তবু যখন আচমকা মিলির আহ্বান, জীবনে প্রথম ললিতলবঙ্গলতা এক নারীর ডাক, সেকী তবে যাই হরিণী ছিল; নিজের স্বভাব এবং আদর্শ আসপথে চালিত করতে সক্ষম হল। এতদিনের সংযম লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়ে মনে হল যে আহ্বান মেসোপটেমিয়া কিংবা বাহরিন থেকে। আরও দূর দূর জলমলে বন্দর-নগর থেকে। পার্কবাড়ি, চওড়া রাস্তা, জলাশয়, নিকাশিনালা বাজার হাট, খেলাধূলাসহ বিবিধ আহ্লাদ উৎসবের নমুনার সঙ্গে সুন্দরী সুকেশা যুবতী নর্তকীদের স্খলিত ঘুঙুর সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন নিয়ে তার পৌরুষকে টালমাটাল করে দিল।

প্রথম আত্মঘোষণা করল মিলি 'বাঃ আমি কি জানতাম, তুমি আসবে? কিন্তু তোমার হাবভাব বলছিল 'মাকড়সার জালে পড়েযাওয়া পতঙ্গের মতো'

—কী করে বুঝলে?

—সে আমি বুঝেছি।

—বুঝেছ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, মানলাম; কিন্তু, কী করে?

আবার ফিসফিসিয়ে এল মিলির গলা 'সেকি রোখ। যেন অ্যাডোলোশেন পিরিয়ডে ফিরে গেছ।

—তোমাদের অ্যাড এজেন্সির ছেলেরা আসত আমাদের কোম্পানীর অ্যাডের ম্যাটারটা নিতে কিন্তু সেদিন হঠাৎ তুমি?

—কী করব। সব ডুব মেরেছিল সেদিন। আর মি. রঙ্গনাথন বলল, তুমি যাবে, তুমি যেতে পারবে না মিলি।

—আমি রাজী হয়ে গেলাম এককথায়। আর গেলাম বলেই তো...

মিলি হাসতে লাগল সজোরে।

তারপর বলল প্রথম আলাপেই সে কী জেরা তোমার—

—বাড়িতে কে কে আছে?

—বাবা, মা, তবে বাবা মূলত পরবাসী দিল্লীতে অফিস হলেও এক একদিনে তিনটে বা চারটে মেট্রোতেও মিটিং করতে হয়

—মা?

—মা সকালে অফিসে বেরোয় ফিরতে ফিরতে তা প্রায় আটটা।

আমার অফিস সম্পর্কেও জানতে চাইলে, বস সম্পর্কে প্রমোশন সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি। এমনকী পড়াশুনো। ইউনিভার্সিটি...ঘুড়ির যেমন লাটাই থেকে সুতো ছাড়ে আমি ছাড়ছিলাম সুতো হঠাৎ এর ফাঁকে আমি বলে ফেলেছিলাম আমি কিন্তু আপনার চেয়ে দশ বছরের ছোট।

—দশ নয়, অন্তত বারো। কিন্তু এটা কোনও কথা নয়।

—এটা কোনও কথা নয়?

—না।

—আপনি কি আমায় প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেললেন?

—না

—না?

—তাই নাকি?

—তুমি কি ভাল না বেসে যেকোনো ছেলেকে বিয়ে করতে পারো?

—কথাটার আমার কাছে কোনও মানে নেই।

বুক খালি করে একটা নিঃশ্বাস পড়ে রঞ্জনের। রঞ্জন আর একটা কথাও বলেনি।

সে যেদিন স্বপ্নে দেখল মিলির সর্বাঙ্গে ঝরে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি ফোঁটার মতো নববিবাহের সিঁদুর এবং কী আশ্চর্য তারপর থেকেই মিলির উদ্দেশে দ্রুত হাঁটা শুরু করল। সার্চ লাইটের মতো যত্রতত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ, সে যেন রিমোট কন্ট্রোলের পুতুল ছাড়া কিছু নয়। রাগারাগি, কিংবা কথা কাটাকাটি হয়েছে, কখনোবা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছে ঠিক তক্ষুণি মিলি হাওয়া। সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না তো। যার মন নেই, সে তো শুধু বেসিক ইনস্টিংটে গাঁথা। মিলিকে হাতের কাছে পেয়েও হারানোর এক খেলা যেন দুর্মর ও দুর্নিবার নিয়তির দিকেই তাকে দিনকে দিন ঠেলে দিয়েছে। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে মিলিকে শুধু অকপট সারল্যে হাসতে দেখছে। সে-হাসি এতদূর বিস্তৃত এবং বাঁক নিতে থাকে যে মিলিকে তখন অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ ছাড়া কিছু মনে হয় না। কখনো ডেকেছে মিউজিয়ামের সামনে, কখনো অ্যাপয়েনমেন্ট টিফিন আওয়ার্সে অফিস থেকে বেরিয়ে চিড়িয়াখানায়, পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোঁরায়, মিলিয়েনিয়াম পার্কের বেঞ্চে। সবসময় যে মিলি এসেছে, ধরা দিয়েছে তা নয় কখনো কখনো প্রত্যাখ্যান করেছে। আসলে মিলি যে-গলি থেকে বেরোয় কিছুটা এগিয়ে তার উল্টোদিকে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির পাশে চায়ের দোকানটিতে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে, নিজের মোবাইল থেকে নয়, পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে মিলির গলা শোনা এবং পার্শ্ব থেকে পুরুষ কণ্ঠ 'হ্যালো, হ্যালো

কে বলছেন' তাকে ক্রুদ্ধ সিংহের কেশর ফুলিয়ে আঁচড়ে কামড়ে দেওয়ার বদলে, বলেছে আর নয়, আর নয় ঢের এরপর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

এরপর আর দেরি না করে মিলিকে রাজি করিয়ে চণ্ডীগড়। দু-ঘণ্টার একটা মিটিং ছিল সেখানে তারপর সিমলা। কালীবাড়ির উল্টোদিকের তাজ গ্রুপের হোটেলে, সান্ধ্য আহারের পর যখন মিলি বলতে থাকে তার জীবনের অনুপুঙ্খ কাহিনী, হেরিডিটি, রক্ত, ডি.এন.এ.এ, ক্রোমোজোম। যদিও সবটা জিন থেকে হলে মানুষের আর কিছু করার থাকত না। ভূত হয়ে ঠেলতে ঠেলতে সব কিছুই করিয়ে নিত ঘেঁটি ধরে। যদিও 'জিনস্ আর পোর্সান অব দ্যা মিলিয়ন ইউনিট ডি এন এ মলিকুলস্, দ্যাট এনকোডস্ দ্যা জেনেটিক হেরিটেজ অব লিভিং থিংস্

—বহু পুরুষ মা-য়ের পা ধরে কেঁদেছে, মা গলেনি। শুধু বাবাকে পছন্দ ছিল। গাঁয়ের ছেলে ক্যাবলা, ব্রিলিয়ান্ট হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করা...'

রঞ্জন থ' মেরে যায়। শুনতে থাকে। মানুষ স্নানের সময় নিজেকে যেমন করে দ্যাখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীর বৃক্ষ, তেমনি মিলিকে দ্যাখে। 'তারপর বিয়ে, এক মাসের মধ্যে প্রেগন্যানসি।'

—মার মুখেই শোনা। 'একটা কিস পর্য্যন্ত করেনি। সব কিছু ডেস্ট্রয় করতে চাইছিল। গুঁড়িয়ে দিতে। তুলে আছাড় মারার মতো শাবল গাঁইতি ছেনি হাতুড়ি যেন শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে একবার। সে কি রোখ, সে কি আক্রোশ। পুরো ভারত পাকিস্থান করে ফেলল ব্যাপারটাকে। যেন খুন করবে। গলা টিপে ধরেছে। চোখ বড় বড় হয়ে বেরিয়ে আসছে। আর ওদিকে প্রকৃতিও খেপে গেছে। মুষলধারে বৃষ্টি। মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে। লাইটনিং হচ্ছে। তারপর বড় বড় শিল। কলকাতার রাস্তায় যানবাহন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সাদা হয়ে গেছে সবকিছু। যেন পৃথিবী ধ্বংস হতে চায় নিজের ইচ্ছায়। সুইসাইড করতে চায়। প্রকৃতি যেন বলছে 'আর নয়, আর নয় জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়।' ক্ষান্ত হও শান্ত হও হে রাজাধিরাজ...' আর সেদিনই তুই এলি পেটে...

একটা কথাও বলল না রঞ্জন। শুধু শুনল। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। টি.ভিতে কী একটা নাচের প্রোগ্রাম হচ্ছিল। একটা ফিসফিস আওয়াজ সেই সঙ্গে সুরের হিজিবিজি। এবার রঞ্জন রিমোট দিয়ে অফ করে দেয়।

যে চরম আকাঙ্খা, দুর্দমনীয় কামনা বাসনা, আগ্রহাতিশয্যে ভরপুর মন নিয়ে মিলিকে রচনা করেছিল। এক লহমায় নিভে গেল। আগুন আর আগুন রইল না। মিলিকে এখন স্পর্শ করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা।

খাটহোক উঠে বসে চুল গোটাতে শুরু করল মিলি। উত্তেজনায় এত বড় নিঃশ্বাস নিল। অন্তর্বাসের হুক খুলে গেল।

জীবনের প্রথম স্কচের বোতলটি খুলে রঞ্জন ঢক ঢক করে জল বা আইসবিহীন গলায় নিঃশেষে ঢেলে কিছুটা, আরেক পেগ ঢালতে গেলে মিলি-ই 'এই কী করছ, একী করছ!'

রঞ্জন হাত সরিয়ে একটি সিগারেট ধরায়। মিলিকে লাগে অক্ষিপক্ষহীন মাছ। জাঁ পল সার্ত্রের 'ইন্টিমেসি' বইটির প্রচ্ছদেআঁকা নায়িকা লুলুর উর্দ্ধাঙ্গের নগ্ন দৃশ্যটির মতো মিলিকে দেখতে

দেখতে তার বুকে জুড়ে দেওয়া, ঈশ্বরপ্রদত্ত দুটি মাংসে পিণ্ড অদ্ভুতভাবে কোনও কামনার জন্ম দিল না। এমনকি উদ্ধত এবং উদ্যত লিঙ্গটি, কার্বলিক অ্যাসিড সংস্পর্শ সাপের মতোই কুণ্ডলীকৃত হয়ে গর্তে ঢুকে গেল আশ্চর্য নিপুণতায়। মনে হল এই সেই নারী যে দ্রৌপদী, সীতা অহল্যা থেকে বীরভোগ্যা, না বহুভোগ্যা তার গবেষণা এখনো চলছে। আসলে বন্দুকের নল এমনিতেও গুলি না পেলে ঠাণ্ডা, হিম। শরীরের বারুদ হল নেশা। চোখ বুজে আসছে রঞ্জনের, ঘোরে। আবার তার ভুলে যাওয়া বাক্যটি মনে পড়ে 'অভিজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রে বড়ো মহীয়ান'।

মাঝরাতে এই পাহাড়েও খুব মেঘ ডাকাডাকি। কিন্তু ঘুম ভাঙেনি তার। একটি বিকট চড়ার শব্দে বজ্রপাতের ধুন্ধুমার আলো সে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে।

বলে, চোখ কচলিয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলে তাকিয়ে দ্যাখে, মিলি নেই। বাথরুমে নেই। বারান্দায় নেই। সিঁড়িতে নেই। লিফট বেয়ে ছাদে উঠে দ্যাখে সেখানেও নেই। নিচে নেমে আসে পাজামা আর গেঞ্জি পরেই। সিকিউরিটি বলে মেমসাব বেরিয়ে গেছেন। এই চিঠি দিয়ে গেছেন। সে ছিনিয়ে নেয় সাদা কাগজটি উর্দ্ধশ্বাসে পড়তে থাকে। রঞ্জন দ্যাখে, যা ভেবেছিল তা নয়। 'সুইসাইড নোট' না। সে একটু হাঁফ ছাড়ে, নিশ্বাস নেয়। তারপর পড়তে থাকে 'কোট' করা মিলির চিঠিটি। বিস্ময়ে হতবাক রঞ্জন চার্জ হয়। আরে! এতো সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'কুকুর সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমি জানি' উপন্যাস থেকে কয়েকটি লাইন মাত্র : '...মানুষকে যদি একটা মূর্তিভাবি, তাহলে তা নিঃসন্দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে পশুত্বের বেদীর উপর। এ ধারণা নতুন না। কেউনা, বৈজ্ঞানিকরা এতদিন চুপ করে বসেছিলেন না। এঁরা স্বপক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ রেখে গেছেন।...দৈবতাড়িত অয়দি পাউসের জীবনে সব ঘটনাই ঘটে যায়, তাঁর অজ্ঞাতসারে। তার ভাগ্যহীনতা, বিশেষতঃ সেই কারণে, এক অতি আবেগে কেঁপে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত ভেঙে পড়ে এক মহান ট্র্যাজিডি হিসেবেই।...সেই থেকে আজ আড়াই হাজার বছর পরে, সম্পূর্ণ মানবিক বলেই মেনে নিই নতুবা স্বীকার করি, আমাদের উর্ধ্বাঙ্গ কুকুরের। মেনে নিই নতুনবা স্বীকার করি; উর্দ্ধ না অর্ধ তা আমি এখনো জানি না। সত্যিকথা বলতে কী?

রঞ্জন হতবাক, স্থির, স্থানুবৎ। সে ভেবেছিল বারবার ব্যর্থ বিপ্লবের আগুন থেকে একটি সার্থক বিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে একদিন। কিন্তু কই? হল কই? তবে কি প্রতিটি মানুষ সময় চিনতে ভুল করে। গলদ ছিল জমি তৈরীতে। নাকি এটাই হয়। এটাই ভবিতব্য। সে দেখতে পায়, শীতে দ্বারকেশ্বরে জল নেই। ধু ধু বালিয়াড়ি। সূর্য ওঠার আগেই গাঁইতি শাবল ঝুড়ি কাস্তে হাতুড়ি নিয়ে সারি সারি মানুষের দল পেরিয়ে যাচ্ছে নদী। এবার শুরু গ্রামের পর গ্রাম। অবন্তিকা, দ্বারিকা, গোপালপুর, মধুপুর, বসন্তপুর, রাধানগর, বিষ্ণুপুর, জামডরো, আগড়দা...

কুয়াশার আস্তরণে তার মুখ ঢাকা পড়ে যায়। সে চলতে থাকে। চলতেই থাকে। সে যেন তার জন্মের কাছে না পৌছে এই পরিভ্রমণ থামাবে না। কিছুতেই না। এইসব চাপাকান্না বিলাপকথন প্রাণহীন সত্তার অস্তিত্বে সমগ্র আধার জুড়ে ছড়িয়ে যায়। যার কোনো পুনর্বাসন নেই, পরিবর্তন নেই। জীবন যে কতরকমের, কত কষ্টের, কত দুঃখের কত যন্ত্রণার তখন বোঝা

যায়। নিঃসঙ্গতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এও এক বাস্তবতার মায়া। অথচ মানুষ কীভাবে প্রেম-ঈর্ষা-ঘৃণা-সোহাগের এক অদ্ভুত বাতাবরণ গড়ে তোলে। মিলি যে একটা সাধারণ মেয়ে সেই তাকে নিয়েও।

রঞ্জন এখন বুঝতে পারে মস্কোর দোকানপাট থেকে কেন লুপ্ত করা হয়েছিল পাস্তের নাকের কবিতা। কেন তাকে পশুপালনের কাজ নিয়ে দূর কিথাইরোনের অরণ্যে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। পেরেডেলকিনো গ্রামে, যেখানে জীবনের শেষ কুড়িটা বছর তাকে কাটাতে হয়েছিল যতক্ষণ না শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয় দেহ থেকে। জানলা দিয়ে শুধু দেখা যেত একটি গ্রাম্য কবরখানা, আর কিছু নয় শুধু চোখে পড়ত নীলবর্ণের গির্জার এক ক্রুশ চিহ্ন।

সে ক্রমশ আরও বুঝতে পারে গ্যালিলিও তাঁর ছাত্র আনদ্রেয়া কে 'সত্য'কে কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখতে বলেছিল। কোনো বৃদ্ধ গ্যালিলিও তার সুযোগ্য ছাত্রকে বলেছিল এই বয়সে আর লড়াই করার ক্ষমতা তার আর নেই।

আসলে মানুষের এই জন্ম যে সত্যিই আকস্মিকের খেলা আর অনিবার্য মৃত্যু, যা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু এই দুইয়ের মাঝখানে যে জীবন সেখানে যৌনতা অমোঘ, লাটিমের মতো ঘোরাতে থাকে তারপর একদিন স্থির হয়, স্থিতু হয় আর ঠিক তক্ষুনি প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ব্লাডগ্রুপ, আইডেনটিটি কার্ড, হাসি, উল্লাস রাশিচক্র রক্তকণিকায় চৈতন্য এবং স্নায়ুজাগার ভীতিকে দিনকে দিন হাড়িকাঠে তুলতে থাকে, তুলতেই থাকে যতক্ষণ না কেউ এসে তুলে নিয়ে যায়।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আচমকা রঞ্জন অনুভব করে তার গায়ে সুতোটি মাত্র নেই। পোশাক-আশাক গেল কোথায়? ভয়ে যে চোখ বন্ধ করে। মুখে হাত চাপা দিয়ে একটা প্রবল চিৎকার করতে যায় কিন্তু আওয়াজে শুধু ভু ভু একটা বিকট শব্দের কোলাজ নির্গত হয়।

সে শুনতে পায় এক নারী কণ্ঠ—ওকে ধরো, ওকে ধরো...রিসেপশ্যানিস্ট নিশ্চিত স্বরে বলে, ব্যাটা যাবে কোথায়? ও যে বঁড়শিতে গাঁথা। বঁড়শির চোখ নেই মুখ নেই হাত নেই—যা আছে শুধু আকৃতি, আকর্ষণ করার দুর্মর ক্ষমতা। আর আছে প্রাণ, ঠিক টেনে নিয়ে আসবে।

নারীকণ্ঠ বলে ওঠে হাঁটতে হাঁটতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে...ওকে ধরো...বাইরে যদি কিডন্যাপ হয়ে যায় তাহলে আরেক কেলো। থানা পুলিশ...এসব তো আছেই হোটেল না সিল করে দেয়। আর তাছাড়া গাড়ি চাপা পড়লে আরেক বিপদ।

বঁড়শির সুতো টানতে থাকে রিসেপশ্যানিস্ট। তারপর গোল্লা গুটিয়ে অবশেষে সাবধানে ডেস্কের নিচে রেখে দেয় যেখানে তার আদরনীয় ভ্যানিটি ব্যাগটি আছে।

রঞ্জন ধীর গতি। পায়ে সাড় নেই। একটু একটু করে একজিট গেটের দিকে এগোতে থাকে। তার চোখের তারাদ্বয় চঞ্চল হয়। কত প্রশ্ন কত উত্তর রোমশ বাইসনের মতো ছুটে আসে, ধাক্কা মারে। এইসব ভাবনাগুলো ছিঁড়ে যায় যখন পরম বন্ধুর মতো হাত তুলে নমস্কার করে সন্তোষ বলে, ভাল আছিস? ভাল আছিস রঞ্জন। কতদিন পরে দেখা...

রঞ্জন বিস্ময় বিমূঢ়, প্রশ্ন করে, কে আপনি?

—আরে আশ্চর্য তো। চিনতে পারলি না? তুই আমাকে তো কখনো আপনি বলতিস না? একসাথে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছি আমতলার মাঠে। হাত পা ছড়ে গেছে কতবার, বিশুদার কোচিংয়ে তোর সঙ্গে তো তুই-তোকারির সম্পর্ক।

হঠাৎ স্বর বদলে সন্তোষ বলে চাপা, বরফ জমাট স্বরে। ভুলে গেলি? এত সহজেই। মাধ্যমিকে তোর পাশে বসেছিলাম।

—সন্তু। গাঙ্গুলি পাড়ার। কত করে রিকোয়েস্ট করলাম জিওমেট্রির প্রবলেমটা একটু দেখিয়ে দে, তাহলেই পাশ করে যেতাম। অঙ্কে কম্পার্টমেন্টার পেতাম না। আর দেওয়া হল না। জীবনটা ভ্যাগাবণ্ড হয়ে গেল। এখন একশ দিনের কাজ করি। বৌ-বাচ্চা নিয়ে চলে না। তাও মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ। কী করব, ছেলেটার অসুখ দেখাতে পারলাম না ডাক্তার। গত শ্রাবণে ঝুলে পড়লাম। গলায় দড়ি ছাড়া অন্য কোনভাবে মরার কথা আমাদের গ্রামে কেউ কি ভাবতে পেরেছে কোনওদিন।

রঞ্জন চোখ কুঁচকে দেখে, তারপর কিছু বলতে যায় কিন্তু স্বর বেরোয় না। কত প্রশ্ন কত ঘটনা কত ছেলেমানুষি ভীড় করে আসে চোখের তারায় হঠাৎ উত্তরিয়া ঠাণ্ডা বাতাস তার হাড়ে ঢুকে যায়। কাঁকাতে থাকে। সিমলাপালের জঙ্গল, পাথর মোড়ার খাঁড়ি, মুকুটমণিপুরের বাঁধ। সোনাঝুরির গোপনতম পিকনিক...।

একসময় মুখ খোলে।—সন্তু? সন্তোষ?

—চুপ আস্তে। কেউ শুনবে, শুনলে আর রক্ষে নেই মাওবাদী বলে জেলে পুরবে।

ছুঁচ বেঁধানো বাতাস ছুঁয়ে যায় রঞ্জনের আপাদমস্তক। রঞ্জন বলতে চায় 'প্লিজ, বিশ্বাস কর...'

—বিশ্বাস তোকে, ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার ভালো হওয়া, আসলে স্বার্থপর, বন্ধুত্ব কাকে বলে, তুই জানিস রাসকেল।

—শোন সন্তু। শোন

রঞ্জন সামনের লনের দিকে মুখ করে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে। অদৃশ্য হয়ে যায় সন্তোষের অবয়ব।

রঞ্জন ক্লান্ত পদক্ষেপে সোজা রাস্তাটা ধরে এগোতে থাকে। দুপাশে ঘরবাড়ি, মানুষহীন, অজস্র শিয়াল শকুন। দু-একটা ভিখিরি শান বাঁধানো মেঝেতে ঘুমোচ্ছে। সে খুব চেষ্টা করে কাঁদবার। পারে না। চেষ্টা চালিয়ে যায়। সামনে সুলতা। হি হি করে হাসে। নীল ফ্রক সাদা জামা। সে ঘাড় নিচু করে ফোঁত ফোঁত শব্দ করে। কান্নার ভঙ্গি করে। পৃথুলা নায়িকার মতো। খালুইয়ে ভরা ধৃত মাগুর মাছের মতো খলবল করে ওঠে। কী রঞ্জনদা, চিনতে পারছো?

—তুই, তুই এখানে।

হো হো করে হাসতে থাকে সুলতা।

—জয়কৃষ্ণপুরের সেই মাটির দোতলা বাড়ি মনে আছে তোমার? ছোট্ট কুলুঙ্গিতে বাবার আরাধ্য সরস্বতী মূর্তি। পড়তে আসতে আমাদের বাড়িতে। কোনওদিকে না তাকিয়ে শুধু অ্যালজেব্রা, অ্যারিথমেটিক, সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক, চৌবাচ্চার নলের দু-দিক দিয়ে জল বেরিয়ে যাওয়া। ওঃ সেই সব দিন মনে পড়লে মাথার উপর অল্প আলোয় বিভা সলজ্জে ছিরকুটি কাটে। তুমি

কারোর দিতে তাকাতে না। শুধু পড়তে হবে। অধ্যয়ন আর অধ্যয়ন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া। আমি যে তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তোমাকে চিঠি দিয়েছিলাম। সে চিঠি তুমি পড়েও দেখোনি। শুধু ক্যারিয়ার, ক্যারিয়ার। এইবার হয়েছে তো। এক জায়গায় এসে সবশেষ। শেষেরও শেষ থাকে রঞ্জনদা। মাটি গলে তো পড়বে মাটিতেই।

—তুই, তুই এখানে কেন? কী করে এখানে এলি।

—এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি?

—মানে।

—মানে আমার পাখা গজিয়েছে। শুনবে সে কথা। কলেজে পড়তে পড়তে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলেটা হিসেবে মন্দ ছিল না। মদ গাঁজা চরস কোনও নেশা ছিল না। এমনকি অন্য নারীতে আসক্তি দেখি নি কোনও দিন। কিন্তু ঐ ক্যারিয়ার। প্রোমোশন না হলে পাগল হয়ে যেত। একদিন ওর বস প্রস্তাব দিল আমাকে নিয়ে যেতে ওর কাছে। আমি বুঝলাম ব্যাপারটা। কিছুতেই রাজি হলাম না।

শেষ পর্য্যন্ত ট্রেন থেকে দিল ফেলে। একদিকে ভালোই হল। মানুষ হিসেবে সব কিছু দেখা যায় না। এখন মৃত্যুর ওপর থেকে সব দেখছি। চাকরি গেছে। বন্ধু উন্মাদ। আসলে বর্ণভেদে এইসব চিরকাল হয়। যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে এ-খেলা তোমার জন্যে নয়। তাই না রঞ্জনদা।

রঞ্জন দেখতে পায় গত কুড়ি-পঁচিশটা বছরের রোদে জলে বাতাসে নুনে ঘামে শরীরে শুধু ক্লেদের নদী, পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তার হাত পা নেই। মাথা নেই। ছাদ নেই। ঝাঁকি দিয়ে একটা সাপ এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে চৈতন্যের ওপরে। ক্যারিয়ার সেও দরজার উপর ঝোলানো এক তালা। তার চাবি হারিয়ে গেছে কবেদিন। তলিয়ে গেছে জলের তলায়। খোলা যাবে না কক্ষনো। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে গেছে ট্রেন।

'ARICHAYA FEB.-OCT '14 ISSN NO. 2321-936X Reg. No. 13732 WB / EC-265

বিশ্বকে অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাতে ও
সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসারকল্পে এবং
মানবিকতার অঙ্গীকারে

সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ

পরিষদের সাংস্কৃতিক মুখপত্র

পড়ুন, পড়ান, লেখা পাঠান এবং গ্রাহক হোন।
যোগাযোগ : - ২৩৫১ ৮৬৯১, ২৩৬০ ৮৩০৬, ২৩৫০ ৪০৩৪

CONTACT

Sarbabharatiya Sangeet-O-Sanskriti Parishad
1A, Jadunath Sen Lane, Kolkata-700 006, India
Phone : 2350-4034/2351-8691/2360-8306

E-mail : sss_parishad@yahoo.co.in WEBSITE : www.sssparishad.org

পরিচয় সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭
মূল্য : ১২৫.০০ টাকা
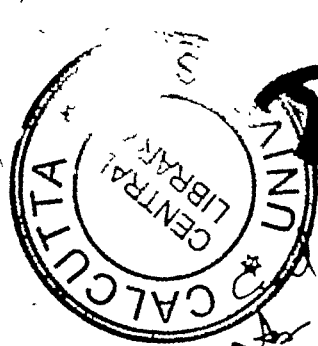
স্বাধীনতা-উত্তর সময় এগিয়ে চলেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত
সৃষ্টির বিবর্তনে। সময় বদলের সঙ্গে সৃষ্টিশীল চিন্ত
জগতেরও যেমন বিবর্তন ঘটেছে, আর্থ-সামাজি
ক্ষেত্রটিও রূপান্তরিত হয়েছে সমানভাবে। প্রতিনিয়
ধারাবাহিক এই বদলে কখনও প্রত
সম্মতি। অর্থনৈতিক প জেছে সম
বিন্যাসে র্তনে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সৃ
ভূমি। নিভৃতে বহমান এই বিবর্তন বর্তমান সংখ
মুখ্য বিষয় ভাবনা।
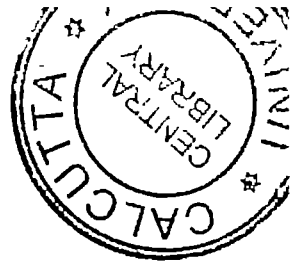
সুকুমারী ভট্টাচার্য

নাদিম গর্ডিমার

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

বিপান চন্দ

তপন রায়চৌধুরী

গৌরী ধর্মপাল

সুধীর করণ

শ্যামল ঘোষ

নবারুণ ভট্টাচার্য

মীনাক্ষী সেন

অনিল ঘড়াই

সত্যব্রত দত্ত

শিশির সামন্ত

প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

কার্তিক-পৌষ ১৪২১

নভেঃ-ডিসেঃ '১৪—জানুঃ ২০১৫

৪-৬ সংখ্যা ৮৩ বর্ষ

কবিতা :

গল্প :

পুস্তক পরিচয় :

সম্পাদকের কথা

পরিচয়-এর গ্রাহক ও পাঠকদের একটা ক্ষোভ ছিল যে, গত বছরে তাঁরা মাত্র দুটি সংখ্যা হাতে পেয়েছেন। পরপর একাধিক শোকের ঘটনা আমাদের খানিকটা বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। সেই কথা মনে রেখেই এবার শারদ সংখ্যার পরই আমরা দ্রুত একটি জানুয়ারি সংখ্যা তাঁদের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সিদ্ধান্তই এবারে কার্যকর হল। বর্তমান সংখ্যাটি বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ। সকলের প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে বিশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রাসঙ্গিক মতামত আমাদের কাজে লাগবে।

এর পরবর্তী সংখ্যাটি পরিচয়-এর চিরকালীন ঐতিহ্য বহন করবে বলেই আমাদের ধারণা। সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজনীতির পর্যালোচনাই হবে এর মূল বিষয়। হয়তো কোনো কোনো রচনায় অতীতের সঙ্গে এর যোগসূত্রটিরও সন্ধান করা হবে। সংখ্যাটি প্রচারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

১ জানুয়ারি, ২০১৫

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট,কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

স্বাধীনোত্তর বিবর্তন

এক. সাধন চট্টোপাধ্যায়

দুই. মনোজ চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর সময় এগিয়ে চলেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সৃষ্টির বিবর্তনে। সময় বদলের সঙ্গে সৃষ্টিশীল চিন্তন জগতেরও যেমন বিবর্তন ঘটেছে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রটিও রূপান্তরিত হয়েছে সমানভাবে। প্রতিনিয়ত ধারাবাহিক এই বদলে কখনও প্রত্যাখ্যান, কখনও সম্মতি। অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রভাব ফেলেছে সমাজ বিন্যাসে। সমাজ পরিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সৃজন ভূমি। নিভৃতে বহমান এই বিবর্তন বর্তমান সংখ্যার মুখ্য বিষয় ভাবনা।

সাহিত্যিক সক্রিয়তা ও বাজারু বয়ান

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক জনগণনায় দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ছিয়াত্তর। যারা লিখতে বা পড়তে সক্ষম। কেরালা একমাত্র রাজ্য—বলা যায় সর্বসাক্ষর। পশ্চিমবাঙলার অবস্থা কেরালার মতো নয় বটে, আশা করা যায় দেশের গড় সাক্ষরতার চাইতে কিছু বেশিই হবে। শুনেছি, দেশ স্বাধীন হয় যখন, সাক্ষতার হার ছিল শতকরা বারো। 'সাক্ষরতা'—সংজ্ঞাটি বলতে কেবলই লিখতে ও পড়তে জানা। এমন নয়, নিয়মিত সাহিত্য পাঠে সক্ষম। তবু শোনা যায়, কাব্য ও কথাসাহিত্যে বাংলায় স্বর্ণযুগ গেছে অতীতে। সমাজজীবনে অভিঘাত কিংবা প্রকাশকদের বাণিজ্যশ্রী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজনৈতিক সমাজে সাহিত্যপাঠ নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকত। আজকের দিনের 'বুদ্ধিজীবী' অভিধাভুক্ত কিছু মানুষজনের ফন্দিফিকির বা রাজনৈতিক তাবেদারির কৌশল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিলাম, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ—তৎকালীন কথাসাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। সম্পর্কটা ছিল পরিপূরক। এর মধ্যে মোহভঙ্গ, জটিলতা, উভয় সমাজের মধ্যে নানা প্রতর্ক, হতাশা—ইদানিংকালের চেহারা না নিলেও—সব কিছুই বর্তমান ছিল। গোষ্ঠী ছিল, আক্রমণ প্রতিআক্রমণ ছিল, কুৎসারও অভাব ছিল না। তবু বারো শতাংশের মধ্যে ওপর স্তরের মধ্যবিত্তশ্রেণী—শিক্ষক অধ্যাপক, উকিল, কেরানি, ডাক্তার, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব—বই পড়তো। বলা যায়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত বা স্বদেশী, কংগ্রেসী, লীগপন্থী বা নানা ধর্মীয়সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাহিত্যিক সক্রিয়তা ছিল।

কেউ কেউ যুক্তি দেবেন, পরাধীনতার যুগে জাতিসত্তাবোধ প্রখর থাকে বলেই, মাতৃভাষা ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিশেষ আবেগ সবল হয়। হয়তো সত্য। কিন্তু পরেও তো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দেখেছি প্রতিটি কলোনি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কুল, একটি গ্রন্থাগার ও একটি কমিউনিটি হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্যিক সক্রিয়তার জন্য তখনও বিয়ের যৌতুক হিসেবে বই দেয়ার প্রচুর রেওয়াজ। দেখেছি, সে-সব বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার নির্মাণের প্রয়াস। গ্রন্থাগারিক হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রম দেয়ার মানুষ—সামাজিক কর্তব্য বিবেচনায়—প্রতি পাড়ায় দু-চারজন এগিয়ে আসতেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলের জন্মদিন পালনে গ্রন্থাগারগুলোর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকত এবং বাঙলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক উপন্যাস, গল্পের বই, নতুন নতুন কবি—সৃষ্টিজগতের খুঁটিনাটি খবর পাঠকদের কাছে পৌঁছে যেত গ্রন্থাগারিকের মধ্য দিয়েই। বছরে বেশ কয়েকবার নতুন বই কেনা হত। জেলাগ্রন্থাগার থেকে ভ্রাম্যমান বিপণি পাড়ার গ্রন্থাগারগুলোকে বই ধার দিত। আজও বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় লেখকের বই—যেগুলো এখন অপ্রচলিত এবং প্রকাশক নতুন করে ছাপছেনা—খ্যাত-অখ্যাত অনেক উপন্যাস আজও খুঁজতে-খুঁজতে শহর মফস্বলের রুগ্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। এ-তথ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলছি।

আর সামাজিকভাবে সাহিত্যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছি নানা স্কুলের বাংলা স্যারদের মধ্যে। আবৃত্তি শেখানো, সুন্দর হাতের লেখার প্রচেষ্টা, এবং হাতেলেখা পত্রিকা থেকে নতুন নতুন সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ও তাদের উপন্যাস-গল্পের খবর বাংলার স্যারই দিতেন। সখি-সখি চেহারা, পোষাক-আসাক, গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে অনেক বাংলা স্যার আমাদের সমাজে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কথা বলছি—তখনও ছোট ছোট সাংস্কৃতিক ও সৃজন অনুষ্ঠানে ভোটব্যাংকের পুরোহিত, অলিগলির মস্তান বা রাজনৈতিক দাদাদের মধ্বদখল শুরু হয়নি। সমাজ ও-ব্যাপারটা যেন শিক্ষা ও সাহিত্যজগতের ব্যক্তিত্বদের ওপর অর্পণ করতেন। শিক্ষার সিলেবাসে স্কুল ফাইনাল বা ইন্টার মিডিয়েট অবধি পড়তে পারলেই কবিতা পাঠ, ব্যাখ্যা, ছন্দ-যতির জ্ঞান, চরিত্র বিশ্লেষণ এবং উপন্যাস-গল্পের আখ্যান পাঠের মধ্য দিয়ে সাহিত্যবোধের মজবুত ভিত্তি গড়ে উঠত। সামাজিক পরিস্থিতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতির অনাগ্রাসী ক্ষমতায়নে সৃষ্টিশীলতার অনুকূল পরিবেশের স্থিতাবস্থা বজায় ছিল।

বাল্যকালে আমি পঞ্চমশ্রেণীর পুরস্কার বিতরণে যাযাবরের 'ঝিলম নদীর তীরে' গ্রন্থটি গোগ্রাসে গিলে বাংলা স্যারের মুখে লেখক সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছিলাম। তাছাড়া, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে—কি সাম্যবাদী ধারা কি জাতীয়তাবাদী দল—সকলের মধ্যে সক্রিয় মূল্যবোধের সবর্তমানের জন্য সমাজে নতুন লেখক, কোনো চিন্তক বা প্রতিভাবান কবি, নাট্যকারের উদয় হলেই, মুখে মুখে যে-যার বৃত্তে খবর হিসেবে ছড়িয়ে দিতেন। মনে পড়ে, অতুল গুপ্ত মশাই ফুটপাথেপাওয়া অযত্নে মুদ্রিত 'জাগরী' উপন্যাসকে প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত করে সতীনাথ ভাদুড়ীকে লেখক হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন। আমি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতেই, কোনো লেখা না পড়েই, তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের কাছ থেকে সমরেশ বসুর উঠে আসার খবর পেয়েছিলাম। পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে-ক্লাবে খ্যাত-অখ্যাত আবৃত্তিকাররা সুভাষ মুখোপধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, সুকান্ত প্রমুখ কবিদের মফস্বল ও গ্রাম বাঙলায় জনপ্রিয় করেছিলেন। রাজনৈতিক সমাজ তখন ভালো গল্প-উপন্যাস পাঠ করলে, জনপ্রিয়করণকে সামাজিক কর্তব্য বোধ করত। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে দেখেছি, সমরেশের 'গঙ্গা', মানিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়ুয়া তরুণদের পড়া হয়েছে কিনা খোঁজখবর নিতেন নেতারা। তাই সাক্ষরকার হিসেব কম শতাংশের থাকলেও, গল্প-উপন্যাস বিক্রিতে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা। সম্প্রতি জনৈক বনেদি প্রকাশনায় খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, সে-সব দিনে কোনো উপন্যাস প্রথম সংস্করণ এগারশ এর নিচে ছাপা ভাবাই যেত না। এখন তা চারশ-পাঁচশতে ঠেকেছে। যদিও সাক্ষরের সংখ্যা এখন শতকরা ছিয়াত্তরের ওপর।

সাহিত্যিক সক্রিয়তার স্বাভাবিক যে-যে ধারাগুলোর সামাজিক উল্লেখ করলাম, একে একে সরকারিকরণের মধ্য দিয়ে, প্রায় সবকিছুই বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি যে-শিক্ষাসূচী—সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়েছে। নিত্যনতুন শিক্ষানীতি বদলানোর ফলে, মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য যে মানুষ হয়ে ওঠা—চাপা পড়ে গেছে। জীবিকাকেন্দ্রিক শিক্ষার অগ্রাধিকারে—শুধু অগ্রাধিকার নয়, মুখ্যত একমদ্বিতীয়ম করে দেয়ার ফলে—কী ভাবে জাতির

মানসভূমি রুখাসুখা ভয়ঙ্কর স্থায়ী খরায় চলে যেতে পারে—যত্রতত্র উপলব্ধি করছি। অবশ্যই শিক্ষাব্যবস্থায় আসবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান পাঠের অগ্রাধিকার। জীবিকাকেন্দ্রিকতা এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সম্প্রসারণ। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান বা মানববিদ্যার অন্যান্য শাখাকে বেঁটে বামন করে দিয়ে নয়। সুস্থ ভারসাম্যের প্রয়োজন ছিল—যা পশ্চিমের প্রযুক্তিসিদ্ধিত-স্পর্শকাতর সমাজও সংরক্ষণ করছে খুবই দক্ষতার সঙ্গে।

সাতাত্তরের পর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে নতুন-স্কুলশিক্ষা-সিলেবাসকে যত বেশি বেশি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেছে, সাহিত্যিক সক্রিয়তার স্বাভাবিক রাস্তাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেছে। বাণিজ্যিক ইংরিজি, শুধুমাত্র দাগানো সাহিত্য—যেখানে পপুলিজম্‌এর লক্ষ্যে শুধুমাত্র পাশকরানোর শতকরা হারই দায়বদ্ধতা, মানবীবিদ্যার মর্মবস্তুকে মেরে ফেলা হল শুরু। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাবার নামে যত্রতত্র বেসরকারি কলেজ স্থাপনের হুজুগ। আর রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে পরিচালন সমিতি, গ্রন্থাগার কমিটি, ক্লাব—সমস্ত সামাজিক স্পেস্‌গুলোকে তৃণমূল স্তরে কব্জাকরণের মধ্যে পুরাতন রক্তবাহী ধমনিগুলোতে চরা পড়ে গেল। যত্রতত্র গড়ে উঠতে থাকল, রাষ্ট্রের মুঠিকরণ বা ক্ষমতায়ণের ছোট ছোট কেন্দ্র। সমস্ত সমাজটার আকার নিল পিরামিডের—যার শীর্ষে একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতারবিন্দু।

এরই মধ্যে শনৈ শনৈ বিশ্বায়ন ঢুকেছিল সরকারি তকমা নিয়েই। বিরোধিতাও হয়েছে। তবে, রাজনৈতিক দল যত বেশি বিরুদ্ধে চেঁচিয়েছে বিশ্বায়নের, সমাজজীবনের খুঁটিনাটি সূ পরিপ্রশ্ন সকল কী কী—অনুধাবন করেনি। সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন বলে যত সোচ্চার হয়েছে নির্বাচনের ময়দানে, সংস্কৃতির অন্যতম নির্ণায়ক সাহিত্য, রস, পাঠাভ্যাস কেন জরুরি আমাদের জীবনে—কোনো অ্যাজেণ্ডার মধ্যেই নিয়ে আসেনি। সাধুবাদ বা হাততালি পেতে কিছু কিছু ভর্তুকি দিয়েছে নানা সময়ে, আকাদেমি-সভাঘর প্রদর্শনব্যবস্থা নির্মাণ করে দিয়েছে—সব কিছুই ক্ষমতার অলিন্দে পরিণত। নীরবে নিঃশব্দে কোথায় যেন শিকড় কেটে ডগায় ক্রমাগত জলসিঞ্চন। আর বহুদলীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার বদল যে সার্বিক পরিস্থিতিকে তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে ঠেলবে—এমন উদাহরণ তো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই ছিল। আজ আমরা তোতাপাখির মতো 'কর্পোরেট' বিশেষণটিকে সর্বত্র উগড়ে দিচ্ছি। আর চেতনে-অবচেতনে সাহিত্যিক সক্রিয়তার বদলে পুলকিত হচ্ছি বাজার সক্রিয়তায়—যার অন্যতম ছায়া 'স্টারডম্‌'। আমরা আজ অবচেতনে 'স্টারডম'-এ খাঁচায় বন্দি।

এখন বাঙলা উপন্যাস-গল্প ছাপতে প্রকাশকরা মরুভূমির মরুদ্যানের মতো—সরকারি ক্রয় ও বিজ্ঞাপনের ওপর হা পিত্যেশ করে থাকে।

অথচ বছর বছর ক্রমবর্ধমান বিপুল সাহিত্যসম্ভার বেরুচ্ছে শরৎকাল কিংবা শীতের মৌজে পিঠেপুলি খাওয়ার সময়। লেখক-কবিরা প্রাণবন্ত, বুকের ছাতিতে বিপুল আশা ভরে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। কে, কী, কোথায় ছাপা হল, কে কে পড়ে প্রতিক্রিয়া জানাল, ভালো লাগল, প্রাণিত হলেন কারা কারা, কোন কোন উপন্যাসে জীবনের নতুন দিশা মিলল, সময়কে পারল ছুঁতে—এসব বাহ্য। পুরনো দিনের সাহিত্যিক সক্রিয়তা বলতে যা বর্তমান ছিল—কর্পূরের মতো উবে গেছে, বলা যায় ক্ষমতার পিরামিডের যুপকাষ্ঠে বলি দেয়া হয়েছে।

অনেকেই নানা দৃষ্টিকোণের যুক্তি দেখাবেন। কেউ বলতে পারেন, সুপার কম্প্যুটারের যুগ নিয়ে স্বয়ং স্টিফেন হকিং মশাই মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব নিয়েই শংকা প্রকাশ করেছেন, তো বাঙালির গল্প-উপন্যাস-কবিতা তো ছাড়।

কেউ বলবেন, সংস্কৃতির পীঠস্থান খোদ প্যারিসেই কবিদের শ্রোতা ডেকে কফি-স্যান্ডুইচ ঘুষ দিয়ে কবিতা শোনাতে হচ্ছে, কলকাতা কোন ছাড়।

কেউ বলবেন আঙুলের ছোঁয়া বা মাউসে ক্লিক করেই যেখানে পৃথিবীর তাবৎ তথ্য এবং নরনারীর ঔৎসুক্য মেটানোর আয়োজন ব্যক্তিগত আয়ত্বে আসছে, মানুষ গল্প-উপন্যাস পড়বে কেন? যা যা চোখে দেখছি, শ্রবনিন্দ্রিয়ে শুনছি—অক্ষর অতিরিক্ত কী দেবে ঔৎসুক্য মেটাতে?

এ-সব যুক্তির পাল্টা জবাবের জন্য আমার এ-লেখা নয়। বলছিলাম, গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে আজ অবধি—প্রায় বিশ বছর ধরে রাষ্ট্রনীতি ও বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে মুক্ত বাজার ও বিশ্বায়ন অনায়াস আসন পেতে নিলেও, দুই দশক জুড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে, দুই থেকে আড়াই হাজার উপন্যাসে বেরিয়েছে বিভিন্ন লেখকের, দশ হাজারের বেশি প্রবন্ধ-ছোটগল্প মুদ্রিত এবং কবিতা সংখ্যাহীন। বিপুল পরিমাণ সৃষ্টির সবটাই যে সারবস্তু—বলা যাবে না। নির্বাচনের প্রয়োজন; যার ভিত্তি সাহিত্য-উৎকর্ষ। নির্বাচন প্রাকৃতিক নিয়ম। সব মুকুলকে প্রকৃতি পক্ক ফলে পরিণত করে না। শিল্পের এই নির্বাচনের পেছনে থাকে সাহিত্যিক সক্রিয়তা। যা সমাজের মানসিকভুবনকে খরা, বন্যা, সুনামিতে প্রতিরোধী করে তোলে।

কেউ কেউ বলবেন, পৃথিবী জুড়েই তো বইকে নিয়ে বাজারি সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। আমাদের সমাজ ব্রাত্য থাকে কী করে? তাদের যুক্তির অনুকূল-বাস্তবতাও লক্ষ্য করি। সাহিত্যিক সক্রিয়তায় উপরিপাত ঘটিয়ে বাজারি বয়ান অনেক বেশি প্রযোজ্য এখন। নইলে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যে রোহিন্টন মিস্ত্রি, অমিতাভ ঘোষ, নয়নতারা সেহগল্ বা অমিত চৌধুরীদের চাইতে বিক্রম শেঠ বা চেতন ভকত-রা অনেক বেশি আদরনীয় তারকা। রুশদি, অরুন্ধতি রায় সাহিত্যসক্রিয়তার আলোকে আবিষ্কৃত হলেও, ক্রমে বাজারি বয়ানের বৃত্তে চলে গেছেন। ঝুম্পা লাহিড়ীকে নিয়ে বাঙলার বাজার যত বেশি হামলে পড়েছে, ছোটগল্পে সাম্প্রতিক নোবেলজয়ী অশীতিপর বৃদ্ধা কানাডার এলিস মুনরোকে ক'জন জানি? কে কটা গল্প পড়েছি তাঁর?

তবে ইউরোপে কিংবা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সাহিত্যিক সক্রিয়তা ও বাজারি বয়ানের স্পষ্ট সীমারেখা বর্তমান। পশ্চিমবাঙলায় সব কিছু ধোঁয়াশা। বাজার বয়ানও এখানে সার্বিক চরিত্র নিয়ে উপস্থিত নয়। বেস্টসেলার নাম নিয়ে সংবাদপত্রগুলো কিছু খাড়া করার চেষ্টা করছে বটে, পড়ুয়া পাঠকরা তার মধ্যে প্রচুর জল খুঁজে পাচ্ছেন। সমান্তরাল বিশ্বাস জন্মে গেছে ঐ-তালিকা কৃত্রিম, বানানো একটা ধাঁচ। এখানে প্রকাশকরা বিদেশের মতো কোনো এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন না—যাঁরা সরাসরি লেখকদের বাণিজ্যিক শর্ত জানিয়ে দেবে। লেখক-প্রকাশকদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক লুকোচুরি চলে এখানে। আর আছে নানা ধরণের দায় ও স্বজনপোষণ—যার মধ্যে গুণ নির্বাচন বা সাহিত্যিক সক্রিয়তার লেশমাত্র প্রয়াস নেই। শিক্ষা-ব্যবস্থাও দলীয় লীলাভূমি হবার ফলে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলগুলোয় পুরনো সাহিত্য-সক্রিয়তা লোপ

পেয়েছে। অথচ, নতুন নতুন পড়ুয়া-প্রজন্ম যে উঠছে, মফস্বল ও গ্রামবাঙলায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে—সেইসব নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলোকে আপন আপন অনুকূলে আনবার প্রচেষ্টাও প্রকাশকদের মধ্যে নেই। যা যা নতুন কিছু করছেন তারা—সবই রাষ্ট্র বা সরকারনির্ভর। কি কলকাতা, কি জেলামেলা—বই কিনবার নির্ধারিত টাকাগুলো সরকার, দল, আমলা নিয়ন্ত্রিত অলি-গলি ধরে আসে। আজও কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশনাগুলো সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেটের দিকে তীর্থের কাক।

পশ্চিমের দুনিয়ায় সাহিত্যিক এজেন্টদের মতো, বই প্রকাশও একটা বাজারগত প্রক্রিয়া। কলকাতা মাঝেমধ্যে প্রথাটি চালু করছে অথচ পরিপূর্ণ অনুসরণ করছে না। খাচ্ছেন অথচ গিলছেন না। পুরনো যুগের সাহিত্যিক সক্রিয়তা লুপ্ত যেমন, পুরোপুরি নতুন যুগের বাজার সক্রিয়তা গ্রহণ করেনি। আজ তাই, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ—যা সময়, জীবনের দিশা প্রদর্শনের মধ্যে নানা মানবীবিদ্যা ও কল্পনা জগৎ জমিয়ে আমাদের প্রাণকে দীপ্ত করবে—রুগ্ন শিল্পে পরিণত। এই হতাশার সামাজিক ঊষর ক্ষেত্রে স্ক্যাম, ক্রাইম, আদিম রিপুর মতো ভূত-প্রেত নৃত্য করবে নাতো কী? গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছে, বৈষম্যমূলক প্রযুক্তির বাড়ন্ত। ফলে, সমাজ আজ শতশত টুকরোয় খণ্ডায়িত। সকলেই গণতন্ত্রে আত্মপরিচয়ের দাবিতে হিংসাত্মক। সৃষ্টিশীল সাহিত্যই পারে হিংসাকে চ্যালেঞ্জ দিতে। পরস্পরের আত্মপরিচয় একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মর্মগাঁথা হতে পারে।

বিগত দুই দশক ধরে, অসংখ্য পত্রিকা, নানা সম্প্রদায়ের লেখকদের পারস্পরিক রচনা, গল্প কবিতার মধ্য দিয়ে অ-হিংসাত্মক বোঝাপড়ার রাস্তা তৈরি করেছে। সাহিত্যিক সক্রিয়তায় অজস্র উপন্যাস, বিপুল সংখ্যক গল্প এবং অসংখ্য কবিতা অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক একটি বিশেষ উপযোগিতার কাজ নীরবে করে গেছে। National Integration-এর স্লোগানকে রাজনৈতিক ও ভোটসর্বস্বতার দৃষ্টিতে বিচার না করে, দলমত নির্বিশেষে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও বিপুল সৃষ্টির ভুবনকে যদি সামাজিক ভাবে জরুরি করে তোলে, মানবীবিদ্যার ওপর শিক্ষা ও পাঠসূচীর নির্ভরতা বাড়ায়, আত্মিক সংকটের মহামারী থেকে আমরা নিষ্কৃতির কিছুটা পথের সন্ধান পাব।

ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ মানবসভ্যতার বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। অতি সম্প্রতি কলকাতায় ইন্‌ফোকম তিনদিনব্যাপি যে-সম্মেলন করল, মুখ্য ভাবনা ছিল, সুপার কম্পিউটার একযোগে অনেক কিছুর রিমোট্ কন্ট্রোল করবে যখন, যথাযথ প্রশিক্ষিত মানুষ চাই। নইলে যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ও জটপাকানো চলবে।

এই সব মানুষদের প্রশিক্ষণ কেবল যন্ত্রের ওপর দক্ষতা বাড়ানো নয়, যথাযথ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মানবজীবনের মূল কর্তব্য মানুষ হয়ে ওঠা। তারপর যন্ত্র নিয়ন্ত্রণে আনা।

মানুষকে মানুষ হতে হলে, সম্পর্কের নানা শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করতে হবে। গ্রন্থ এবং পাঠচর্চা অবশ্যই এর অন্যতম নির্ণায়ক। ইওরোপে এ-নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। ওখানে সমাজ

ও ব্যক্তিমানুষ অনেক বেশি গতিশীল। ভাবনার বৈচিত্র্যও বিপুল। আমাদের সমাজ, দল-গণতন্ত্র-ক্ষমতা নিয়ে অতীব স্পর্শকাতর হলেও, সমাজজীবনের গভীরে লুকনো অনড় জড়ত্ব। বাঁধা পথ এবং স্থিতাবস্থার বাইরে নতুন ভাবনাচিন্তায় এখানে আলস্যপেঁচানো হাজার ধরণের হাই ওঠে। আর দৃষ্টিকটু হয় গোঁয়ার্তুমি, উপেক্ষা ও কূটনৈতিক নীরবতা।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) একবার বলেছিলেন 'যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই তাঁকে বিজ্ঞানী বলতে হবে তা নয়। আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল সত্য'।

মন তৈরি হয় দর্শন, কাব্য ও নিত্যনতুন সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে। আমাদের মন এ-ভাবেই 'হয়ে ওঠে'। 'হয়ে ওঠা'-ই সকল সিলেবাসের মূল মন্ত্র হওয়া দরকার।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আর্থ-সামাজিক বিবর্তন

মনোজ চট্টোপাধ্যায়

ভারতে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে প্রধানত চারটি কালপর্বে বিভক্ত করা যায়। (এক) প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগ, (দুই) ঔপনিবেশিক যুগ, (তিন) সংস্কার পূর্ববর্তী স্বাধীনোত্তর ভারতের চার দশক এবং (চার) সংস্কার পরবর্তী স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রায় আড়াই দশক।

প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগ : খ্রী: পূ: ২৮০০ থেকে খ্রী: পূ: ১৮০০ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিস্তৃত প্রায় হাজার বছরের সময়কালে কৃষিই ছিল ভারতীয়দের মূল উপজীবিকা। আর ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। ছোটোখাটো অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কৃৎকৌশলও ছিল করায়ত্ত। গ্রামগুলি ছিল পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বশাসিত। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক। পর্যায়ক্রমে করনির্ভর নানা আঞ্চলিক প্রশাসনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মুসলমান রাজত্বের শেষের পর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা শাসন করতো পশ্চিম, দক্ষিণ, মধ্য এবং উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ।

ঔপনিবেশিক যুগ : করব্যবস্থা প্রসারিত হল। শুরু হল নগদে রাজস্ব আদায়। দেশবাসীর দারিদ্র্য বাড়ল। কৃষিজীবী জনগণ দুর্ভিক্ষপীড়িত হতে শুরু করলেন। কুটীর ও হস্তশিল্প যা কিছু ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেল। ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত হল ভারত। শুরু হল স্বদেশী আন্দোলন। নেতৃত্বে নিজেদের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠা এবং আত্মবিকাশে আগ্রহী এদেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা। সঙ্গী হলেন তাবৎ স্বাধীনতাপ্রেমী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ।

ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা শুরু হল। রেল যোগাযোগের বিস্তৃতি ঘটল। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটল। গড়ে উঠল প্রশাসনিক কাঠামো। প্রতিষ্ঠিত হল বিচার-ব্যবস্থা। আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটল। কর্মসংস্থানও হল বেশ কিছুটা।

অবশেষে দেশ স্বাধীন হল। দেশ যখন স্বাধীন হল তখন ভারত ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের চিত্রকল্পটি অঙ্কন করতে হলে প্রাক্ স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক চেহারা ছবিটি ঠিক কেমন ছিল, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাটা কিন্তু একান্তভাবেই জরুরি।

সাহেবসুবোরা এদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন কেন?

মূলত: দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ স্বদেশের মাটিতে গজিয়ে ওঠা অত্যাধুনিক কলকারখানাগুলোতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন যোগানকে সুনিশ্চিত করার জন্য, এবং ঐসব কলকারখানায় উৎপাদিত শিল্পপণ্যসমূহের বাজার হিসেবে এই দেশটাকে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেটাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। এককথায় সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের সম্পদের সার্বিক শোষণের পরিকল্পনা নিয়ে।

এটা করতে গিয়ে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাঁদের গড়ে তুলতে হল এমন এক সামরিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, যার সুযোগ তাঁরা নিজেরাই শুধু নিলেন তা নয়, নিলেন এদেশের সামন্ততান্ত্রিক পরিবৃত্তে সৃষ্টি হওয়া শ্রমোদ্বৃত্তকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিগঠনের প্রক্রিয়াটা শুরু করেছিলেন যে উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, তাঁরাও।

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আবহ সৃষ্টি হল কীভাবে?

৫ দেশীয় পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়াটি যখন বেশ জোরদার হয়ে উঠল, তখনই বিরোধ বাঁধল এই জাতীয় পুঁজির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পুঁজির। শুরু হল স্বার্থের সংঘাত। উচ্চাভিলাষী জাতীয় পুঁজির মনে হল, এদেশটাকে শোষণ করার একচ্ছত্র অধিকার শুধু তাদেরই, ব্রিটিশরা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। এল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পুঁজির নিরুচ্চার প্রতিবেদন—আমরা যদি সুবিশাল এই পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাটা গড়ে না তুলতাম, যদি এই সুদক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ও শিক্ষা কাঠামোটাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে কেমন করে ঘটতো তোমাদের এই চেতনার উন্মেষ, কোথা থেকেই বা আসতো তোমাদের আত্মবিকাশের এই উচ্চকাঙ্ক্ষা?

দুপক্ষই ঠিক। অনিবার্যভাবেই গড়ে উঠল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এক বিধ্বংসী আবহ। জাতীয় পুঁজির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী জোরদার হয়ে উঠল। গড়ে উঠল স্বাধীনতার আন্দোলন। তৈরী হল জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগঠন। জাতীয় পুঁজির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির এই দ্বন্দ্বে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বোক্তদের সমর্থনে এগিয়ে এল এদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষের দল। অথবা তীব্র থেকে তীব্রতর হল স্বাধীনতার সংগ্রাম। পাশাপাশি চলল উদ্বৃত্ত-সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে উদ্বৃত্ত ভোগীদের শ্রেণী সংগ্রামও।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির উন্মেষ

এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিই সুনিশ্চিত করল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি। পিছু হটল প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নিরক্ষরতা—সব কিছুই রইল বেশ বহাল তবিয়তেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম মানবমনের প্রায় সবটুকুর পরিসর দখল করে নেওয়াতেই বিভাজনী রাজনীতি ও রণকৌশলের কুচক্রীরা পিছু হটলেন সামগ্রিকভাবে।

স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সংকট কাটতে না কাটতেই বিশ্বজুড়ে দেখা দিল এক প্রলয়ঙ্করী মন্দা। এই মন্দার দাপটে কেঁপে উঠল পুঁজিবাদের ভিত। সেই কাঁপন বন্ধ হবার আগেই শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ব্রিটিশ অর্থনীতি। পুঁজিবাদের ভরকেন্দ্র সরে গেল ব্রিটেন থেকে আমেরিকায়। ছিন্নভিন্ন ব্রিটিশ পুঁজির পক্ষে সম্ভব ছিল না ভারতের মতো বিশাল উপনিবেশগুলির উপর নিজেদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। এইসব উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই রইল না।

খণ্ডিত, খর্বিত স্বাধীনতা

কিন্তু যাবার আগে তারা মেতে উঠল এক নোংরা খেলায়। হিন্দু এবং মুসলমান এই দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে তারা সযত্নে ঢুকিয়ে দিল সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক বিষ। খাড়া করল চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এক 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে "দুই ধর্ম, দুই জাতি, দুই রাষ্ট্র" এই স্লোগান তুলে অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। এল ভারতের খণ্ডিত, খর্বিত স্বাধীনতা।

দেশভাগের কুফল

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হল ভারত। দেশ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। সৃষ্টি হল দুটি পৃথক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র—ভারত এবং পাকিস্তান। শুরু হল ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঝরে গেল অকালে অসংখ্য মানুষের তাজা প্রাণ। রক্তে লাল হয়ে গেল দুদেশের মাটি। স্বাধীনতার স্বাদ নোনতা হয়ে গেল বেশিরভাগ দেশবাসীর কাছে। ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের কয়েকটি রাজ্যের ভালোসংখ্যক অংশ ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে গেলেন সীমানা পেরিয়ে, পাকিস্তানে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও শিখ জনগোষ্ঠীরও বেশিরভাগ মানুষ চলে এলেন এপারে, ভারতীয় ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমানায়। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগ এযুগের ইতিহাসে একটি বৃহত্তম অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যেহেতু অগুনতি মানুষের মূলোচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল দেশভাগের এই নোংরা খেলায়। প্রায় দেড়-দু কোটি মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়েছিলেন এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিণতিতে। আনুমানিক দশ-পনের লক্ষ মানুষ বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হানাহানির বলি হয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যা

স্বাধীন ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যা একটা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ রাজ্য দুটি হল বাংলা ও পাঞ্জাব। পঞ্জাবের ক্ষেত্রে বেসংখ্যক হিন্দু এবং শিখ পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন, প্রায় সমসংখ্যক মুসলমানই ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে। তাই আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে জমি-বাড়ির সমস্যাটা এতটা তীব্রতা লাভ করেনি, যতটা করেছিল বাংলায়। পূব থেকে পশ্চিমে যত মানুষ এসেছিলেন, পশ্চিম থেকে পূবে কিন্তু তত মানুষ যাননি। কারণ একটাই। এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বীভৎসা পঞ্জাবের মতো এমন তীব্র আকার ধারণ করেনি।

এই উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অনেক দিন ধরে, থেকে থেকে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটার পর, অথবা আবার ঘটবে, এই আশঙ্কায়। পঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা সদ্য স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের যে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল, বাঙালী উদ্বাস্তুরা সেটা পারেন নি। সরকারী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কর্মসূচী দেশের পশ্চিমাঞ্চলে যতটা জোরদার ছিল, পূর্বাঞ্চলে ততটা ছিল না মোটেই। তাই বাঙালী উদ্বাস্তুদের অনেক বেশি দিন ধরে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরগুলিতে অমানুবিকভাবে জীবনযাপন করতে হয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

না, শুধু উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসারই মুখোমুখি হতে হয়নি সদ্য স্বাধীন তরুণ ভারতীয় রাষ্ট্রকে। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য জাতি-রাষ্ট্রগুলির মতো ভারতে একটি অভিন্ন সমগোত্রিয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা বহু মানুষ কাছাকাছি এসেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও. একধরনের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাস্তবে কিন্তু যত না ছিল ঐক্য, তার চেয়ে বেশি ছিল বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য

বহু ভাষা-ধর্ম-বর্ণ-জাতিসত্ত্বা বিশিষ্ট মানুষের অধিষ্ঠান এই ভারতভূমিতে যে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, সেটা অনুধাবন করেছিলেন এদেশের আধুনিক শিক্ষিত তরুণ শহুরে অভিজাত সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী মানুষরা। ব্রিটিশ প্রবর্তিত পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল একটি অত্যাধুনিক মনন। এই মনন স্বাধীন ভারত সম্পর্কে বহুবিচিত্র পরস্পরবিরোধী ধ্যানধারণাগুলিকে অধিগত ও আত্মস্থ করতে সাহায্য করেছিল। যার ফলে সম্ভব হয়েছিল একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা।

নোতুন রাষ্ট্রনায়কদের দুর্বল সামাজিক ভিত্তি

১৯৪৭ সালে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনীতিকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হল, তাঁদের সামাজিক ভিত্তিটা ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। তাঁদের বেশির ভাগই এসেছিলেন ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্য থেকে। যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরি করা স্কুল-কলেজে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উপনিবেশিক ভারতে ফিরে এসে নানারকম আধুনিক পেশাগত বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বহুমাত্রিক দেশ ভারত

সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে ভারত ছিল বহুমাত্রিক দেশ। ভাষা-সংস্কৃতির মানদণ্ডে দেশবাসী ছিলেন বহুধা বিভক্ত। কমপক্ষে বারোটি ভাষাগত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল দেশ। প্রতিটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে স্বতন্ত্র। তফশিলী উপজাতি বলে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্ত্বা বিশিষ্ট মানুষকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একটি বিশেষ একটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ছয় শতাংশ মাত্র, যদিও তাঁরা বিশেষ বিশেষ কিছু এলাকায় দল বেঁধে একসাথে থাকতেন, এবং এইসব এলাকায় তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের কথ্যভাষা ছিল হরেকরকম, এবং জীবনশৈলীও ছিল ভিন্নধর্মী। কীভাবে তাঁদের ভারতীয় জনজীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে এতাত্ম করা যায় সে সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা, গবেষণা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় যতটা ছিল, আজও আছে ঠিক ততটাই, হয়তো বা কিছুটা বেড়েছে বৈ কমেনি।

জাতি ব্যবস্থা

জাতিব্যবস্থা ভারতীয় সমাজজীবনকে জটিল করে তুলেছিল। এলাকাভিত্তিতে এই জাতিব্যবস্থার গঠনকাঠামোর তারতম্য ছিল অনেক। গ্রামীন জীবনের রূপান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতিভিত্তিক সমাজ কাঠামোরও রূপান্তর ঘটছিল। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে সুসংহত হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে গ্রামীন সংসদীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারার মতো জায়গায় চলে এল।

ধর্মভিত্তিক বিভাজন

ধর্মভিত্তিক বিভাজন আরও এক ধরনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল। বহুসংখ্যক মুসলিম দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে গেলেন, থেকেও গেলেন অনেকেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ শতাংশ। সেটা অবশ্য এখন খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। খ্রীষ্টান এবং শিখ ছিলেন মোট জনসংখ্যার দুই শতাংশ করে। এ ছাড়াও ছিলেন বৌদ্ধ, জৈন, জোরোষ্ট্রিয়ান এবং এমন কী ইহুদিরাও। মোট জনসংখ্যায় এঁদের অনুপাত বেড়েছে এমন কথা কিন্তু বলা যাবে না। ভারতের বর্তমান মোট জনসংখ্যা ১২৪ কোটির মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ১৭ কোটি।

অমুসলিমরা হলেন ভারতীয় জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যদিও মুসলিম জনসংখ্যার বিচারে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয় (ইন্দোনেশিয়া পরেই)। ভারতের জনবৈচিত্র্য ব্যাপক। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা এদেশে বসবাস করছেন। সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবশ্যই মুসলমান (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ)। তাঁরা শুধুই যে বৃহত্তম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাই নয়, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই তাঁদের অধিষ্ঠান। কিন্তু বিভেদ-বৈষম্যের নীতি, সামাজিক জাড্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রান্তিকীকরণ দেশের বেশির ভাগ জায়গায় মুসলমিদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমশ বেশি বেশি করে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজনকে সব থেকে পিছিয়ে পড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। ফেলে আসা সময়ে বেশকিছু মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি এবং দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুসলমান রমণীদের নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে, এবং তাঁদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়েছে। এসব ঘটনাই ঘটানো হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করে। সংখ্যালঘু মুসলমানরা ক্রমবর্দ্ধমান হিংসার শিকার হয়েছেন। সব ধরনের সমাজেই সংখ্যালঘুদের প্রান্তিকীকরণের কাজটা করা হয় বেশ-সুচারুরূপেই। স্বাধীনোত্তর ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সে প্রক্রিয়া ঘটেছে, তাতে সংখ্যালঘুদের, বিশেষত মুসলমানদের ভূমিকা বা অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে। স্বাক্ষরতা, কর্মসংস্থান, ভূমি মালিকানা, সরকারী চাকরী, স্কুল শিক্ষা শেষ করা প্রভৃতি প্রায় সবকটি মানদণ্ডের বিচারেই প্রমাণিত হয় যে মুসলমানরা এদেশে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের তুলনায়।

পশ্চিমবঙ্গে

রাজ্যভাগের আগে প্রায় ৫০০ বছর পশ্চিমবাংলাকে শাসন করেছিল মুসলিমরাই। তবুও আজ এঁরা একটি সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবেই থেকে গোপন এ রাজ্যেও। শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে পশ্চাত্পদ, অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর ও হতদরিদ্র এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ তাঁরা এই পশ্চিমবাংলায়। কিন্তু তাঁদের শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের ব্যাপারে প্রায় কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাকেই বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা যায় নি।

শিল্পোন্নয়ন ও নগরায়ন

শিল্পোন্নয়ন ও নগরায়ন হল সমাজকাঠামো পরিবর্তনের দুটি অনিবার্য লক্ষণ। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে লক্ষণীয়ভাবে যুক্ত হয় পশ্চিমীকরণ, আধুনিকীকরণ ও অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রক্রিয়া। এইসব পরিবর্তনের হাত ধরেই ঘটে চলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীন সমাজের শিল্পভিত্তিক নাগরিক সভ্যতায় উত্তরণ। মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা এটাকেই প্রাক্ পুঁজিবাদী স্তর থেকে পুঁজিবাদী স্তরে উত্তরণ প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই বিবর্তন বা উত্তরণ প্রক্রিয়ারই অপরিহার্য অনুষঙ্গ হল গণতান্ত্রিক অনুশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশলাভের ঘটনা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে বিকশিত করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে পণ্যবিনিময় ব্যবস্থাকে সুরক্ষিতও প্রসারিত করার প্রয়োজনে বহু বিস্তৃত এক বাজার। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতে বিপুল বৈচিত্রের মধ্যেই গৃহীত হল সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, রচিত হল সংবিধান, সব ধরনের বৈচিত্রকে স্বীকার করে নেওয়া হল, দেওয়া হল আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের অধিকার। পিছিয়ে পড়াদের জন্য রচিত হল সংরক্ষণের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ।

গণতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা

ভারতে প্রায় সাত দশক ধরে চলছে গণতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা। চলছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া। সমাজকাঠামোয় পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ঘটবে সমাজকাঠামোর আধুনিকীকরণ, এই তত্ত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে বিস্তারলাভ করেছিল ও বিকশিত হয়ে উঠছিল, তার কোনো আধুনিক যান্ত্রিক প্রতিরূপ কিন্তু আমরা ভারতের ক্ষেত্রে দেখলাম না। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে সমকালীন ভারতে রাজনৈতিক বিবর্তনের যে প্রক্রিয়া চালু আছে, সেটা ঘটে চলেছে সমাজ এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার সঙ্গে সবরকম সম্পর্কবিহীনভাবে। কিন্তু পরিণামটা অন্য কোনো ধ্রুপদী সমাজবিবর্তনের পথ বেয়ে বা ধারা মেনে আসেনি। মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রীকরণ শুধু সমাজপরিবর্তনের একটি ধারাই নয়। সার্বিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্তও বটে। ভারতীয় সমাজের বাস্তব গতিশীল রূপটিকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে এই কথাটি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

জাতীয় পুঁজির শ্রেণিস্বার্থ

সদ্যস্বাধীন ভারতে উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়ারা আত্মবিকাশের শ্রেণিস্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধিতার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সেদিন দেশের চারপাশে সংরক্ষণের দেওয়াল তুলে বিদেশি পণ্য ও পুঁজির অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়াটাই ছিল জাতীয় পুঁজির শ্রেণিস্বার্থ। নেহেরু নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসই ছিল এই জাতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী রাজনৈতিক সংগঠন। তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার রাজনৈতিক নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন নেহেরু এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস।

ধীরে ধীরে পুঁজিবাদ বিকশিত হল। বিকাশের নিয়ম মেনেই প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হল। ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটল জাতীয় ধনিকশ্রেণির। অন্তর্হিত হল তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার চিত্র ও চরিত্র। এখন আর তারা শুধুমাত্র নিজেদের দেশের বাজারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজি নয়। আন্তর্জাতিক করপোরেট পুঁজির সঙ্গে বিশ্ব বাজারের ভাগাভাগিতে তাঁরাও আজ অংশীদার হতে আগ্রহী। স্বভাবতই তথাকথিত স্বাধীন, স্বনির্ভর, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে উৎসাহী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাটাও আজ আর নেই। তাই এই জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণির জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার বিষয়গত পরিস্থিতিটা আজ আর আছে কিনা, তার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়নটা আজ একান্তভাবেই জরুরি।

মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও দলগুলির সামগ্রিক অতিসক্রিয়তা

দেশি-বিদেশি করপোরেট পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারিত লগ্নীপুঁজির একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা,, আরও বেশি মুনাফা, তার জন্যই চাই শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ, আরও বেশি শোষণ। আর এই শোষণকে জোরদার করার জন্যই প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিগত ঐক্যে ভাঙনে সৃষ্টি করার। এই ভাঙন সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা আজ দেশি-বিদেশি শাসক ও শোষক শ্রেণির হাতে শাণিত এক অস্ত্র, যে অস্ত্রের নির্মম ব্যবহারে তারা সিদ্ধহস্ত। সাম্প্রদায়িকতা একটি মতাদর্শ, যা বলতে চায় কোনো একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সব মানুষের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন, অর্থাৎ হিন্দু শিল্পমালিক এবং হিন্দু শিল্পশ্রমিকের মধ্যে যেমন কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই, তেমনই মুসলমান জোতদার এবং মুসলমান ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের মধ্যেও শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব নেই। তার মানে সম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ-শ্রেণিসংগ্রামের মতাদর্শটাকেই অ-প্রাসঙ্গিক করে তুলতে আগ্রহী। তাই সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রটাকে ভোঁতা করতে হলে একমাত্র উপায় শ্রেণিগত ঐক্য ও সংগ্রামটাকে যতদূর সম্ভব জোরদার করে গড়ে তোলা।

এদেশে আজ ভীষণভাবে সক্রিয় উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি ও দলগুলি। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই এইসব মৌলবাদী শক্তির সামাজিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ভারতের ইতিহাস, বিশেষভাবে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে এরা বিকৃত করতে চায়। তাই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নাম করে এক ফ্যাসীবাদী ধর্মীয় সংস্কৃতিকে এদেশের জনজীবনে এরা কায়েম করার চেষ্টা করে। সংখ্যাগুরু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি চলছে সংখ্যালঘু মুসলিম মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার তালিবানি হিংস্রতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের নামে মধ্যযুগীয় সন্ত্রাসের বীভৎসা।

মনে রাখা দরকার, ধর্মাচরণ এবং সাম্প্রদায়িকতা মোটেই এক জিনিস নয়। ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা মোটেই সাম্প্রদায়িকতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রকৃত ধর্মপ্রাণ একজন মানুষ কখনোই অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে ঘৃণা বা আক্রমণ করতে শেখান না। পরমত অসহিষ্ণুতা এবং সর্বধর্মসমন্বয় সর্বধর্মেরই এক মৌলিক অনুশাসন, হিন্দুধর্মের তো বটেই।

সংখ্যালঘুদের মধ্যে তৈরি হয়েছে সংখ্যাগুরুদের সম্পর্কে এক ধরনের ক্ষোভ বা হতাশা। আর্থিক বা সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং বৈষম্য বিভাজনের শিকার হওয়াটাই এই ক্ষোভ ও হতাশার মূল কারণ। এই পিছিয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় প্রতিফলন পড়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চেতনার আঙিনায়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং কুসংস্কার আপেক্ষিকভাবে সংখ্যালঘুদের মধ্যেই বেশি। সমদর্শী এবং সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে যুক্তি-নির্ভর আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে রোগের উৎস নির্ণয় এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র।

ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে সাড়া দেন, সমাজসংস্কারের কাজে সংগঠকের ভূমিকা নেন। কিন্তু ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সবধরনের সংস্কার কর্মসূচী সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ এবং নিস্পৃহ থাকতেই ভালবাসেন। মানুষের 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' প্রাণ বলিদান দিতে প্রস্তুত থাকেন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মানুষ। আর ধর্মান্ধ যাঁরা, তাঁরা জাত ও ধর্মের নামে বজ্জাতি করে মানুষের মান ও প্রাণ নাশ করতেই ব্যস্ত থাকেন অনুক্ষণ।

কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ধর্মনিরপেক্ষকতার স্বরূপ

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর 'হিন্দু কলস যাত্রা', 'মাচান-বাবার' পায়ের তলায় মাথা ঠেকিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধীর অযোধ্যা থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করা, ভোটের আগে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের পুজা অর্চনার জন্য বাবরি মসজিদের দরজা খুলে দেওয়া, শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় উল্টে দেওয়া, বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রায় প্রকাশে অনীহা—এসবই হল কংগ্রেসের কপট ধর্মনিরপেক্ষকতার কিছু নমুনা।

বামপন্থীরাও ধর্মনিরপেক্ষকতার আদর্শ অনুসরণ করেছেন যত না, বুলি আওড়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। সংখ্যালঘু উন্নয়নকে তাঁরা তাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত এ্যাজেন্ডা করতে পারেননি। এটিকে তাঁরাও ভোটের রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই সংখ্যালঘুরা ছেড়ে গেছেন বামপন্থীদের, আস্থা রাখতে পারেন নি কংগ্রেসের উপরেও, শিকড়হীন সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ তাই আজ শিকড়ের সন্ধানে মুখ ফেরাচ্ছেন সংখ্যাগুরু হিন্দুদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-র দিকেই। তাতেই আজ ইউপি, বিহার এর মতো রাজ্যও বিজেপি-র এত রমরমা, এবং সেই সূত্র ধরেই দেশজুড়ে হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের এই সদম্ভ আস্ফালন এবং উন্মত্ত কলরব।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই জাতীয় কংগ্রেসে বিতর্ক শুরু হয়েছিল ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার

পুনর্গঠন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতার পর প্রথম কাজটাই হবে ভূমি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উৎপাদন সম্পর্কগুলির পুনর্বিন্যাস—এ বিষয়ে মোটের ওপর একটা ঐক্যমত গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের কালপর্বে। গ্রামীন সমাজের গণতন্ত্রীকরণ এবং উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের জন্য এটাকে অপরিহার্য বলে মনে করা শুরু হয়েছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ না কি উৎপাদন সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ—কোন্‌টা বেশি জরুরি, এ নিয়ে একটা বিতর্ক চলছিলই, এমন কী স্বাধীনতার পরেও। সম্ভবত এ তর্কের মীমাংসা হয় নি আজও। একদল মনে করেন ভূমি সংস্কার এবং সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটানোই বেশি জরুরি। আর এক দল বিশ্বাস করেন, নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারটাই হল আসল, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করেই কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

ভূমি সংস্কার ও সমবায় আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

গ্রাম ভারতে আর্থ-সামাজিক জীবনের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রথম প্রয়াসটাই হল ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন। একদল বললেন, ভূমি সংস্কার মানেই হল ভূমিমালিকানার উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা, যাতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাটা কমে গিয়ে প্রকৃত চাষীর হাতেই যায় অধিকাংশ কৃষিজমির মালিকানা। এতে চাষী চাষবাসে উৎসাহিত হবে, বাড়বে জমির উৎপাদিকা শক্তি এবং কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ। এই মতের সঙ্গে সহমত নন এমন অন্যরা বললেন, সব চাষীকে জমির মালিকানা দেবার মতো পর্যাপ্ত জমি তো দেশে নেই, আর থাকলেও প্রত্যেকের ভাগে যা পড়বে, সেটা হবে এতই ক্ষুদ্র, খণ্ডিত জোত, যা মোটেই উন্নত আধুনিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের অনুকূল হবে না। এতে কৃষি উৎপাদন কমবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষিব্যবস্থা। তর্কবিতর্কের টানাপোড়েনটা ছিল এমনই তীব্র, যে ভূমিসংস্কার ও সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পরেও না হল সত্যিকারের কোনো ভূমিসংকার, না গড়ে উঠল দেশব্যাপী শক্তিশালী কোনো সমবায় আন্দোলন। তর্ক করতে করতেই কেটে গেল সাত সাতটি দশক।

বিভিন্ন রাজ্যে পাশ হল ভূমিসংস্কার আইন। জমিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার খর্ব করা হল। খাজনা নিয়ন্ত্রিত হল। ভাগচাষীদের অধিকার সুরক্ষিত হল। মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা হল। অতিরিক্ত জমি গ্রামীন গরিবদের মধ্যে বিলিবন্টন করে দেওয়া হল।

এইসব আইনে ইচ্ছাকৃতভাবেই রেখে দেওয়া হল অনেক ফাঁকফোকর। যেসব ফাঁকফোকরের সুযোগ নিয়ে জোতদাররা নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কাগজে কলমে জমি পুনর্বন্টন করে কার্যত বেনামে নিজেদের দখলেই রেখে দিলেন সিলিং বহির্ভূত অনেক জমি। যেসব অঞ্চলে কৃষকরা রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সংগঠিত হতে পেরেছিলেন, শুধুমাত্র সেইসব অঞ্চলেই (পশ্চিমবাংলা, কেরালা এবং কাশ্মীর) ভূমিসংস্কার কিছুটা কার্যকরী হল।

অন্ধকারে আলো

বহুবিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও গ্রামীন সমাজে অনুপস্থিত জমিদারদের কর্তৃত্বটা কিছু পরিমাণে খর্ব হল। ছোটো ও মাঝারি চাষীদের একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী শ্রেণির জন্ম হল। নোতুন মালিকানা পাওয়া চাষীরা চাষ করতে শুরু করল। ভাগচাষীরা সংখ্যায় গেল কমে।

আগে তাদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছিল গ্রামজীবনে, তাদের হাতে কিন্তু জমি এল না, জমি এল শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীগুলির হাতেই, যারা আগেভাগেই চাষবাসের কাজে নিযুক্ত ছিল। পরগাছা শ্রেণির জমিদাররা কিছুটা দুর্বল হল। ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি কিছুটা প্রসারিত হল আগের তুলনায়।

জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ যেমন গ্রামজীবনে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেল, প্রথমে সমবায় আন্দোলনের কিছুটা প্রসার ঘটিয়ে, এবং পরে ব্যাংক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে কৃষিকাজে ঋণপ্রাপ্তিকে সহজতর করে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের কাজটাকেও অনেকটাই সহজ করে ফেলা হল।

কৃষিঋণ ব্যবস্থার বিবর্তন

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেখা গেল, প্রায় সত্তর ভাগ কৃষিঋণ সরবরাহ করে, চড়া সুদে, গ্রামীন মহাজনেরা। এই অবস্থার হাত থেকে চাষীকে রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হল সমবায় ভিত্তিক কৃষিঋণ ব্যবস্থা। তারপর এল ব্যাংকের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সবশেষে এল ব্যাংকিং ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ। ব্যাংকগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষিঋণ মঞ্জুর করতে বলা হল। ১৯৬১তে কৃষিঋণের ১৮.৪ শতাংশ মেটাতে প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রগুলো। ১৯৮১ সালে সেটা বেড়ে হল ৬২.৬ শতাংশ।

পরবর্তীতে দেখা গেল, সমবায় ঋণ সমিতিগুলো মেটাচ্ছে ধনী চাষীদের কৃষিঋণের চাহিদা, গরিব চাষীদের নির্ভর করতে হচ্ছে সেই মহাজনী প্রভুদের উপরেই। কারণ, ভূমিব্যবস্থায় বৃহৎ ভূস্বামীদের বিদ্যমান কর্তৃত্ব, এবং ঋণসমবায়গুলোর উপর তাঁদেরই সার্বিক নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ কমাতে আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে সমবায়গুলিকে পুনর্গঠন করা হল, তাতে শুধু সমবায়ের দুর্নীতিই বাড়ল, কাজের কাজ হল না বিশেষ কিছুই।

ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের পর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণব্যবস্থার বিস্তৃতি, তার যাবতীয় বিচ্যুতিগুলি সত্ত্বেও, সবুজ বিপ্লবকে সম্ভব করে তুলল। গ্রামীণ ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা সুদখোর মহাজনেরা প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হল। কৃষিতে সেচের সম্প্রসারণ ঘটল, বাড়ল উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার। গড়ে উঠল কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা। কৃষি উৎপাদন বাড়ল কয়েকগুণ বছরে প্রায় ৩ থেকে ৫ শতাংশ হারে। বন্ধ হল খাদ্য আমদানি খাতে বিদেশি মুদ্রার ব্যবহার। সাশ্রয় হওয়া বিদেশি মুদ্রা কাজে লাগানো হল শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল এবং অশোধিত তৈল ও গ্যাস আমদানির কাজে। বাড়ল গ্রামীন জনতার ক্রয়ক্ষমতার বা কার্যকরী চাহিদা। সম্প্রসারিত হল দেশিয় বাজার। গড়ে উঠল শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি।

সবুজ বিপ্লব মানে হল কৃষিতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব। এই প্রক্রিয়ায় মাঝারী চাষী ক্ষুদ্র চাষীতে, এবং ক্ষুদ্র চাষী প্রান্তিক চাষীতে পর্যবসিত হল; প্রান্তিক চাষী পরিণত হল ভূমিহীন কৃষকে। কৃষিতে কৃষকের চেয়ে কৃষিমজুরের ভূমিকাটা বাড়ল, বাড়ল বিনিয়োজিত মূলধন বা পুঁজির ভূমিকা। প্রাক্ পুঁজিবাদী আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের জায়গা দখল করে

ফসল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক। বাড়ল আঞ্চলিক বৈষম্য এবং শ্রেণিগত আয় বৈষম্য। গ্রামীন সমাজে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রিভবন ঘটল।

বলা হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে চুপিসারে বিনা রক্তক্ষয়ে ঘটিয়ে ফেলা গেল এক মহাবিপ্লব। গণঅভ্যুত্থানের যে সামাজিক ব্যয়, প্রয়োজন হল না সেই ব্যয় নির্বাহ করার।

সবুজ বিপ্লব হল ধনী চাষীদের মহোৎসব

সবুজ বিপ্লবে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হল না ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের। বরং এরা সবাই কক্ষচ্যুত হল। এটা হয়ে উঠল ধনী চাষীদের মহোৎসব। ধনী চাষীরা নিজেদের জমানো পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং/অথবা ব্যাংক ঋণ নিয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারলেন। উন্নত প্রযুক্তির ফল পেতে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীরা আবার সেই গ্রামীন মহাজনদের খপ্পরে গিয়ে পড়লেন, কারণ তাঁদের কপালে জুটল না ব্যাংকঋণ। নোতুন প্রযুক্তি সবাইকেই বাধ্য করল বাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে। এখন ছোটোবড় সকলকেই বাজার দামে বাজার থেকে কিনতে হল সবরকমের কৃষিউপকরণ। ধার বাকিতেই করতে হল এইসব কেনাকাটা। ফসল উঠলেই দেখা গেল নিজেদের ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলটুকুও তারা বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে বাজারে, ধারদেনা মেটাতেই।

উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী কৃষিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব ঘটল

কৃষিপণ্যের এই বাজারীকরণের ফলে উদ্ভূত হল নোতুন এক উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী কৃষিজীবী শ্রেণির। এঁরা কৃষি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে গড়ে তুললেন নোতুন ধারার এক আন্দোলন। দাবী করা হল : গ্রাম-শহরের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কমাতে হবে; শহর বা শিল্প গ্রাম বা কৃষিকে যেভাবে শোষণ করে চলেছে অসম বিনিময় হার ও শর্ত চালু করে, সেই শোষণ বন্ধ করতে হবে, গ্রাম বা কৃষির অনুকূলে বিনিময় শর্তগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে।

গ্রামীন সমাজ ও রাজনীতিতে এক নোতুন নিয়ামক শক্তির আবির্ভাব

বড় বড় জোতের মালিকরাই অবশেষে বেশি লাভবান হলেন এই সবুজ বিপ্লবের ফলে। তাঁদের হাতে জমা হল অনেকবেশি বিত্তবৈভব। তাঁরা দেখা দিলেন নোতুন একটি শক্তিশালী সংগঠিত সামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণি বা গোষ্ঠী হিসাবে। সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তাঁরা নোতুন নোতুন লাভজনক ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। তাঁদের কেউ কেউ কৃষি থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়ে গেলেন কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে। এইসব নব্যধনিকেরা অনেকেই বণিকে পরিণত হলেন। কেউ কেউ ঠিকানা পরিবর্তন করে গ্রাম থেকে শহরে এসে পাকাপাকি বাসিন্দা হলেন। এঁদের পরিবারের কেউ কেউ থেকে গেলেন গ্রামে, মুটেমজুর নিয়োগ করে চাষ-বাসের কাজটা চলিয়ে নেবার জন্য। শহরের বাসিন্দা যাঁরা হলেন তাঁদের একটা অংশ পরিণত হলেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে। অন্য অপেক্ষাকৃত মেধাবী অংশটা নিযুক্ত হলেন ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি মেধাভিত্তিক বৃত্তি বা পেশায়। এই পরিবারগুলিই গ্রামীন রাজনীতিতে প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠলেন। এবং এঁরাই সবচেয়ে জোরালো চীৎকার জুড়লেন, শহর গ্রামকে শোষণ করছে বলে।

সবুজ বিপ্লবের পরিণতি নিয়ে বিতর্ক

সবুজ বিপ্লবের পরিণতি বিশ্লেষণে মার্কসবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে শুরু হল নোতুন এক বিতর্ক : ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলো এখন ঠিক কীরকম, তাই নিয়ে। বেশকিছু পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত করলেন, ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক। অন্যরা বললেন, (তাঁদের পূর্ব ভারতের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে) না। এখনও ভারতীয় কৃষি পড়ে আছে সেই প্রাক্-পুঁজিবাদী আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার যুগেই। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, কৃষিকে আগের মতোই নিয়ন্ত্রণ করছে জোতদার-মহাজনেরাই। কৃষক ও কৃষিশ্রমিকরা আগের মতোই বাঁধা পড়ে আছেন এঁদের তৈরি করা ঋণের জালে। কৃষিপণ্যের আকারে শ্রমোদ্বৃত্তকে বাধ্যতামূলক ভাবে বাজারগত করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু প্রচলিত আছে এক স্থবির শোষণমূলক কৃষি কাঠামো, এবং এই কৃষিকাঠামোটাই কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা প্রচলন করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

এই বিতর্ক সত্ত্বেও সহমত তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই যে বিশেষত সবুজ বিপ্লবের সফল পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে যেসব রাজ্যে সেইসব রাজ্যে কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ও বিকাশ ঘটেছে অনেকটাই, যদিও অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কৃষিব্যবস্থা এখনও অনেকটাই সামন্ততান্ত্রিক ধরনের।

চুঁইয়ে পড়া সবুজ বিপ্লবের সুফল?

দেখা গেছে, সবুজ বিপ্লবের পর দেশে কৃষিমজুরদের মজুরী কিছুটা বেড়েছে। বেড়েছে ঠিকই, তবে সেটা শুধুমাত্র টাকার অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে আর্থিক মজুরিবৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রকৃত মজুরি গেছে কমে। এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও যেটা প্রায় তর্কাতীতভাবে সত্য, সেটা হল এই যে এই নোতুন প্রযুক্তির ব্যবহার একদিকে যেমন আঞ্চলিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামাঞ্চলে ছোটো-বড়ো-মাঝারি এবং প্রান্তিক চাষী ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যেও আয় বৈষম্যটা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রচুর। সুতরাং এই চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব যে বাস্তবে কার্যকরী হয়নি, সেটা বলাই বাহুল্য। তাই যদি হতো, তাহলে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে বিশেষ বিশেষ দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজনই পড়তো না।

সত্তর এর দশকে কৃষি-নির্ভর মানুষদের মধ্যে কৃষিশ্রমিকদের অনুপাতটা গিয়েছিল বেড়ে। ১৯৬১ তে ২৬.৩ শতাংশে থেকে ১৯৭১ এ হল ৬৬ শতাংশ প্রায়। নোতুন এই কৃষিশ্রমিকদের বেশিটাই হল জমি থেকে উৎখাত হওয়া ভাগচাষী।

কৃষির এই আধুনিকীকরণ সামাজিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাসকে দিল পাল্টে। কৃষি শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান-নির্ভরতা গেল কমে। ফলে কমে গেল তাদের প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যও। আগের মতো কৃষকের প্রতি কৃষিশ্রমিকের আনুগত্য আর থাকল না। শৃঙ্খলে বাঁধা পুরুষানুক্রমিক আনুগত্যের বাঁধন গেল আলগা হয়ে। ভূমিমালিকদের সঙ্গে গ্রামীন কারিগর ও কৃষিশ্রমিকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নোতুন ধরনের একটা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি হতে শুরু করল। উৎপাদিত পণ্যের একটা

অংশ মজুরি হিসাবে দেওয়ার পরিবর্তে চালু হল নগদ টাকা মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা। চাষীদের সঙ্গে কৃষিশ্রমিকরা ধীরে ধীরে চুক্তিবদ্ধ হতে শুরু করল।

শিল্পোন্নয়ন

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত বাস করতো তার পাঁচ লক্ষ গ্রামে। স্থবির কৃষি-অর্থনীতি জনগণের চাহিদা মেটাতে পারতো না। ফলে অর্দ্ধেকেরও বেশি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্যালরি যোগাড় করতে পারতো না। দুর্ভিক্ষ তো লেগেই থাকতো। ঔপনিবেশিক শাসকেরা নোতুন প্রযুক্তি আমদানি করেছিলেন, রেললাইন পেতেছিলেন, যানবাহন ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন হয় নি তাতে। বরং যাত্রা শুরু হল উল্টোদিকে, যেটুকু যা ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল ইতিমধ্যেই, মুঘল ও মারাঠা শাসনকালে, সেটুকুও ভেঙে একেবারে তছনছ করে দেওয়া হল। ফলে কৃষিজমির ওপর জীবিকানির্বাহের জন্য চাপ বাড়ল।

রাজনীতির নোতুন কর্ণধারেরা বুঝতে পারলেন, ভারতে যদি একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়, তাহলে দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। দেশের মানুষকে খাদ্যনিরাপত্তা দেবার জন্য, এবং অগণতান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সামাজিক সম্পর্ক-গুলোকে পুনর্গঠন করার স্বার্থে ভূমিসংস্কার ও সমবায় আন্দোলন অপরিহার্য হলেও ভারতকে দ্রুত শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হতেই হবে।

এ ব্যাপারেও বিতর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। যেটুকু যা বিতর্ক ছিল, সেটা ছিল শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি-প্রকরণকে কেন্দ্র করে। কেউ বললেন, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত শিল্পায়নই দরকার। অন্যরা বললেন, বেসরকারী পুঁজির মুনাফা-ভিত্তিক, বাজার-চালিত শিল্পায়নটাই পথ। কিন্তু স্বীকার করি বা না করি, বাস্তব সত্যটা হল এই যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কোনো বড়সড় শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেবার মত শক্তি-সামর্থ্য বেসরকারী পুঁজির ছিল না। বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বা সমর্থ নয় এমন সব দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিনিয়োগ করা হোক, এটাই ছিল সময়ের চাহিদা। রাষ্ট্রীয় পুঁজি কীভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব করে তুলেছিল, সেই সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাও জনমানসে রাষ্ট্রীয় পুঁজির নিয়ামক ভূমিকার অনুকূলে মতামত গঠনে সহায়তা করে থাকবে।

গৃহীত হল মিশ্র অর্থনীতির তত্ত্ব

বলা হল, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেই কাজ করতে হবে বেসরকারী পুঁজিকে। বেশ কিছু শিল্পক্ষেত্র সংরক্ষিত করা হল শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বিকাশের জন্যই। কিছু ক্ষেত্রে উভয়েরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও যুগপৎ অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করা হল। বাকী ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারী পুঁজির বিচরণ ক্ষেত্র বানানো হল।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে আবার দুভাগে ভাগ করা হল। কিছু ক্ষেত্রে শিল্পবিকাশ ঘটবে শুধুমাত্র কেন্দ্রিয় সরকারের উদ্যোগেই। বাকি ক্ষেত্রগুলিতে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) বিকাশ ঘটবে রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে। মূলত ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিকেই ছেড়ে রাখা হল এককভাবে

বেসরকারী পুঁজির জন্য। প্রথম ভাগে পড়ল সেইসব শিল্পক্ষেত্রগুলি, যেখানে প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ পুঁজি এবং আধুনিক প্রযুক্তি। বলা হল, বৃহদায়তন শিল্পই হবে এইসব ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের মডেল। বাকি ক্ষেত্রগুলিতে শিল্প বিকাশের দায়িত্ব থাকবে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের হাতে।

রপ্তানীকারক শিল্পোন্নয়ন না কী আমদানি-বিকল্প শিল্পকাঠামো—কোন্ পথে হাঁটবে দেশ? বলা হল দ্বিতীয় পথে, অর্থাৎ রপ্তানী-কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে না উঠে গড়ে উঠুক আমদানি-বিকল্প স্বাধীন, স্বনির্ভর, সার্বভৌম অর্থনীতি।

প্রথম পনের বছরে শিল্পবিকাশ ঘটল ৭.৭ শতাংশ হারে, পরবর্তী পনের বছরে ৪.৪ শতাংশ হারে। ৮০র দশকে আবার বেড়ে হল ৭ শতাংশ।

৫০-৫১ সালে মোট আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে শিল্পপণ্যের অংশ ছিল ১২ শতাংশ মাত্র। ১৯৯০-৯১ এ এটা বেড়ে গিয়ে হল ২৪.৬ শতাংশ। কারখানা-ভিত্তিক উৎপাদনী শিল্পের অবদান এই সময়ে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ২০.৬ শতাংশে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ভোগ্যপণ্য ছিল মোট শিল্পপণ্যের প্রায় অর্ধেক। ৯০ এর দশকের গোড়ায় এটি কমে গিয়ে হল ২০ শতাংশ মাত্র। মূলধনী পণ্যের উৎপাদন ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ২৪ শতাংশে।

কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থানও বাড়ল উল্লেখযোগ্য হারে। প্রথম ১৫ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়ল ১২ শতাংশ হারে এবং বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে। পরবর্তীকালে ঐ বৃদ্ধির ফলে অর্ধেক হয়ে গেল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ১ শতাংশ মাত্র।

কর্মসংস্থানবৃদ্ধির হার কমতেই থাকল। ৮০র দশকে এবং সংস্কার পরবর্তী যুগে এই বৃদ্ধির হার আবারও কিছুটা বাড়ল, কিন্তু সেটা স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম ১৫ বছরের রেকর্ডকে ছুঁতে পারল না। ১৯৯৭ সাল থেকে কর্মসংস্থানবৃদ্ধির হার একনাগাড়ে কমছে তো কমছেই। এক দশকে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৮০ শতাংশ, আর এই সময়কালে কর্মবিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ১.৯৫ শতাংশ। কর্মহীন নোতুন বেকারের সংখ্যাটা সহজেই অনুমেয়। মূল কারণটাই হল শিল্পের কাঠামোগত এবং চরিত্রগত পরিবর্তন, শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তির বিকল্প পুঁজি-নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার। এই ধরনের শিল্পকাঠামোর একটি অপরিহার্য অনুবন্ধ হল স্থায়ী সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যাটা কমে যাওয়া, এবং অস্থায়ী অসংগঠিত চুক্তি শ্রমিকদের সংখ্যাটা বেড়ে যাওয়া। এইসব চুক্তি শ্রমিকদের অনেক কম মজুরিতে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তাদের সহজেই কর্মচ্যুত করা যায়, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জমানো ছুটির বেতন এসব কোনো কিছুই অবসরকালীন দায় না মিটিয়েই।

১৯৮০র দশক থেকে শুরু হয়েছে মূল শিল্পকে কেন্দ্র করে একঝাঁক অনুসারী শিল্পের বিকাশ। বড় বড় কলকারখানায় যন্ত্রাংশ নির্মিত হচ্ছে না, হচ্ছে শুধু জোড়া লাগানোর কাজ। যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ছোটো ছোটো কারখানায়। এইসব ছোটো ছোট কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যাটা খুবই কম। বেশিটাই ভাড়া করা অস্থায়ী শ্রমিক, যাদের না আছে কোনো শক্তপোক্ত সংগঠন, না আছে কোনো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ফলে তাদের শোষণ করাটা খুবই সহজ। উৎপাদন ব্যয়টাও তাই কম। ছোট ছোট কারখানাগুলোতে কম উৎপাদন ব্যয়ে যন্ত্রাংশ নির্মিত

হওয়া সেইসব যন্ত্রাংশ কম দামে কিনে উৎপাদন ব্যয়কে কম রেখে মুনাফা বাড়াতে পারছে বড় কলকারখানার মালিক বা বৃহৎ শিল্পপতিরাও, অথচ তাদের কোনো শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না।

গণতন্ত্রীকরণ ও জাতি ব্যবস্থা

স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধারা দেশকে একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ উপহার দিতে চেয়েছিলেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল জাতিভেদপ্রথার অবসান। সংবিধানে ব্যবস্থাপত্র করা হল, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ ভেদে কোনোরকম বৈষম্য করা হবেনা, করলে সেটা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। স্বাধীন রাষ্ট্র আবার এক ধাপ এগিয়ে এমন এক আইনি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইলেন, যাতে পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীভুক্ত মানুষগুলোও দেশের গণতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষেরাও যাতে চাকুরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে এবং নির্বাচিত প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল গত ছয়-সাত দশকে এই জাতিভেদ প্রথার পরিণতি কী হল।

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতেই জাতিভেদ প্রথার জন্ম বা উৎপত্তি। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যে আবার এই জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ বা বৈরিতা দেখতে পাই। এটাও ঠিক যে হিন্দুদের মধ্যেও এই জাত-বেজাতের ব্যাপরটা ভীষণভাবেই আছে। কিন্তু এদেশের নানা ধর্মের উৎপত্তিও তো এই হিন্দুধর্মের গর্ভ থেকেই। এদেশের মুসলমান এবং খ্রীষ্টানরা বেশির ভাগই তো আদিতে ধর্মান্তরিত হিন্দু। তাই হিন্দুত্বের ভালোমন্দ সবকিছুই তাঁরা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রেই।

শুরু থেকেই ভাবা হয়েছিল, কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়াই শুরু করা যাবে না, যদি গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটানো না যায়। সেই লক্ষ্য নিয়েই শুরু হয়েছিল ভূমি সংস্কার এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী রাজ গঠন।

প্রথম দু-তিন দশকের মধ্যে অবস্থাটার বিশেষ কোনো পরিবর্তন কিন্তু ঘটল না। জোতদার-জমিদার-মহাজনদের হাতেই থাকে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র।

পরবর্তীকালে অবশ্য অবস্থাটার পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। সব রাজ্যে সমানভাবে না হলেও, দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই অস্পৃশ্যতা এখন একটি অতীতের বিষয়। তথাকথিত নীচ জাতির লোকেদের এখন আর আগের মতো অপমানিত বা অত্যাচারিত হতে হয় না উচ্চবর্ণের মানুষদের হাতে। জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির এই গণতান্ত্রিক উপাদানটুকুকে অস্বীকার করে আজকের দিনে কোনো গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার স্বপ্ন দেখাটা নিছকই একটা বাতুলতা। জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা কমে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তন, যদিও এটাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করাটা হবে সংশোধনবাদী ভাবালুতা।

এটা নয় যে জাতিভেদপ্রথা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে এ দেশ থেকে। আছে, বেশ ভালমতই আছে। উল্লেখ করার বিষয় হল এটাই যে জাতিভেদপ্রথা ভারতে গণতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে কোনো অন্তর্ঘাত ঘটাতে পারেনি, কারণ সেই শক্তিটাই সে হারিয়ে ফেলেছে।

হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্য ও সমকালীন বাংলা

আমিনুল ইসলাম

বাংলায় সুলতানী শাসনামলে ১৪৯৩-১৫৩৮ পর্যন্ত হুসেন শাহি বংশের চারজন সুলতান—আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলা রাজত্ব করেন। তাঁদের শাসনকালে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও বাঙালি প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ফলে বাঙালি জীবনে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, বাংলার সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই হুসেন শাহি যুগকে বাংলার ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলা যেতে পারে।

বাংলার সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহই সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর খ্যাতি এই দেশের ঘরে ঘরে জনস্মৃতিতে আজও অম্লান। উড়িষ্যা থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে তাঁর নাম সুপরিচিত। সুশাসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ফলে চৈতন্যের সাথে তাঁর নামও বাঙালি স্মৃতিতে স্থায়ী আসন পেয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলার অন্যান্য সুলতানদের মতো তাঁর প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁর শাসনকালের বেশ কিছু সংখ্যক লিপি পাওয়া গিয়েছে। তবে সমসাময়িক লেখনীতে তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে কেবল বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। আরবি, ফারসি, বাংলা সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমিয়া, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন সূত্রে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লিখিত ফারসি ইতিহাসেও কিছু কিছু তথ্য আছে। এদের মধ্যে একমাত্র 'রিয়াজ-উস-সালাতীনে' কতকটা বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। 'রিয়াজের' তথ্য অনেকাংশে অন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থসমূহেও আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মাদলা পঞ্জি, আসমের বুরঞ্জী এবং ত্রিপুরার রাজমালায় ওইসব দেশের সঙ্গে হুসেন শাহের যুদ্ধের কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে কোনোটিই সমসাময়িক নয় এবং এদের বর্ণনায় পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালেই পর্তুগিজরা প্রথম বাংলায় পদার্পণ করে। ফলে কয়েকজন পর্তুগিজ পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং জোঁ আঁ দ্য বারোস প্রমুখ পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের লেখনীতেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে এসব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকেই আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা যায়। তবে তা কষ্টসাধ্য এবং স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আক্ষেপ করে বলতে হয় যে, আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সভায় একজন আবুল ফজল ছিল না; থাকলে হয়তো তাঁর কীর্তিসমূহের বিবরণ থাকত। তবুও তাঁর কার্যাবলি সম্বন্ধে যতটুকু

জানা যায়, তা তাঁকে নিঃসন্দেহে মহৎ প্রতিপন্ন করে এবং তাঁকে মহামতি আকবরের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময়ে বাংলার চতুর্দিকে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তবে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করার পূর্বে হুসেন শাহ্ অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অরাজকতা সৃষ্টিকারী সৈন্যদলকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকাণ্ডে প্রধান অংশ নিয়েছিল দেহরক্ষী পাইক দল। হুসেন শাহ্ পাইকদের দল ভেঙে দিয়ে নতুন রক্ষীবাহিনী গঠন করেন। হাবশিদের তিনি রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের পরিবর্তে তিনি সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান ও হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন।

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করেন। হুসেন শাহ্ তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি কামতাপুরের খেন রাজ্য দখল করেন, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশে অধিকার বিস্তার করেন, উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের অংশ বিশেষেও তাঁর আধিপত্য ছিল। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে আরাকান ও ত্রিপুরা রাজের বিরুদ্ধেও তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। একমাত্র অসম রাজ্যের বিরুদ্ধেই তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একথা বললেও বোধহয় ভুল হবে না যে, বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে তাঁর রাজত্বকালেই বাংলার শৌর্যবীর্যের সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম প্রকাশ পেয়েছিল।

(২)

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ছাব্বিশ বছর রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫১৯) দেশে নিরাপত্তা সুরক্ষিত ছিল। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মনৈপুণ্য ও তাঁর সরকারের দক্ষতার ফলে সম্ভব হয়েছিল। এমনকি তাঁর রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর প্রজাদের মনে রেখাপাত এবং বহুলাংশে তাদের কল্পনাকে জয় করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বিজয়গুপ্ত 'মনসা-মঙ্গল' (১৪৯৪-৯৫) নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে তিনি সুলতানের কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সুলতান হোসেন শাহ্ হচ্ছে রাজাদের তিলক চিহ্ন। যুদ্ধে তাঁকে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এ কারণে তিনি প্রভাত-সূর্য-সদৃশ। রাজা তাঁর বাহুবলে পৃথিবী শাসন করেন। তাঁর প্রদত্ত নিরাপত্তার ফলে তাঁর প্রজারা নিয়মিতভাবে সুখ ভোগ করে।"[১] পরবর্তীকালে তাঁর সামরিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক সাফল্য বিবেচনা করলে সুলতানের প্রতি কবির এ প্রশংসাবাণী যথাযথ বলে মনে হয়।

হুসেনের ধর্মীয়নীতি সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত ছিল। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর সরকারে হিন্দুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ লাভ করেছিলেন। রাজ্যের প্রধান উজির ছিলেন পুরন্দর খান। গৌড়, ত্রিপুরা অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁকে। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী দুই ভাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কর্মচারী ছিলেন। রূপ ছিলেন সাকের-মল্লিক (মন্ত্রী বিশেষ), এবং সনাতন ছিলেন সুলতানের দবির-ই-খাস (ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ)। রামচন্দ্র খান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটা জমিদারি ভোগ করেছিলেন। হিরণ্য দাস এবং গোবর্ধন

দাসের মজুমদার পরিবারের অবস্থাও ছিল একইরকম। নবদ্বীপের কোতওয়াল ছিলেন জগাই ও মাধাই। আবার তাঁর মন্ত্রী গোপীনাথ বসু, ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, দেহরক্ষীদের প্রধান কেশব খান ছত্রী এবং টাকশাল-অধ্যক্ষ অনুপ ছিলেন হিন্দু। রাজমালা অনুসারে গৌড়মল্লিককে ত্রিপুরা অভিযানের নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৮]

উল্লেখ্য, পনেরো শতকের শেষ দশক থেকে ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত হুসেন শাহি যুগে—বা তাঁর সামান্য আগে-পরে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। মুসলমান শাসকদের সাহায্য ছাড়া তা সর্বতোভাবে সম্ভব ছিল না। এর সূত্রপাত ইলিয়াস শাহি যুগে যারা ত্রয়োদশ শতকের অস্থির সামাজিক অবস্থা দূর করে শান্তি শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনেছিলেন চতুর্দশ শতকে। চৌদ্দ-পনেরো শতকেই চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ওঝা বা মালাধর বসুকে আমরা পাই। আরও একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, বাংলার মুসলমান সুলতানগণ দিল্লীর মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন এবং সেই কাজেই স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব তাদের কাম্য ছিল। প্রয়োজন ছিল বাংলার সামাজিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সুদৃঢ় প্রশাসন গড়ে তুলতে গেলেও। তাই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বন্ধুত্বও দেখতে পাই। হুসেন শাহের সময়েও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

বাঙালি কবি যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এবং শ্রীধর দরবারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস তা না পেলেও হুসেন শাহের প্রশংসা করেছেন। সাহিত্যের বিকাশ ঘটে মঙ্গলকাব্যে, মহাভারত অনুবাদ বৈষ্ণব পদাবলি যোগসিদ্ধ কথা এবং রোমান্টিক কাব্য সব ক্ষেত্রেই।[৯] মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অবশ্য মনসামঙ্গল, চণ্ডী বা ধর্ম মঙ্গল আরও পরবর্তীকালের রচনা। চণ্ডী বা ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবদেবী হিসেবে অবশ্য ছিলেন। চট্টগ্রামে হুসেন শাহের আঞ্চলিক প্রতিনিধি পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খান (আসল নাম নসরত খান, যিনি এক সময়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন) সাহায্য করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে—দুজনেই মহাভারত অনুবাদক। মুনসি আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ অনুমান করেন যে, পরাগল খান স্বয়ং মহাভারতের 'থিম' নিয়ে কবিতা লিখেছেন।[৯] বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে যশোরাজ খান অনন্য। আমরা পাই শেখ কবিরকেও। যোগ সাহিত্যের মধ্যে পাই শেখ জাহিদের লেখা 'আদ্য পরিচয়' এবং রোমান্টিক ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শ্রীধর, বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা। তিনি নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের সাহায্য পেয়েছিলেন। বস্তুত হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সাবিরিদ খান নামে আরও এক মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, শুধু এই কথা বলা দরকার যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মধ্যযুগে হুসেন শাহি রাজত্বের গুরুত্ব কম নয় এবং সাহিত্যিক উপাদানে দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির কথাও যথেষ্ট আছে। গ্রামে তো বটে, নগরেও। হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে, বরযাত্রীদের দলে, এমনকি সংকীর্তনেও বাঙালি মুসলমানদের দেখা গেছে।[৯] শুধু বাংলা নয়, ফারসি সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে এবং তাও হয়েছে দরবারি সহায়তায়। সংস্কৃত সাহিত্য এবং স্মৃতি ও

ন্যায় (বিশেষত নব্য ন্যায়) বাংলায় চর্চা হত যদিও মুসলমান শাসক শ্রেণি সে ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেননি। ফরিবু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা অবশ্য বাংলার সামাজিক জীবনে জোয়ার আনতে পারেনি, যা পেরেছিলেন চৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্ম।

শিল্প, চারুকলা ও স্থাপত্য হুসেন শাহি যুগে যে ইলিয়াস শাহি ঐতিহ্য অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন তার অন্যতম কারণ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। স্থাপত্যের নিদর্শন আছে, শিল্পের পরোক্ষ নিদর্শন মুদ্রায়, লেখতে বিদ্যমান। হস্তলিপিরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল ওই যুগে। তবু সংগীত ও চিত্রকলা বিষয়ে তথ্য অপ্রতুল বলে বিশদ ইতিহাসগত আলোচনা করা কঠিন। স্থাপত্যে অবশ্য আদৌ তা নয়। বহু মসজিদ-মন্দির তার নানা হুসেন শাহি শৈলী নিয়ে আজও বিরাজমান। গৌড়-পাণ্ডুয়া (মালদহ্ জেলায়) সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব প্রগতির সূচনা করেছিল। অভিজাত হিন্দুরা আয়ত্ত করেছিলেন ফারসি ভাষা, জানতে চেয়েছিলেন ইসলামি আরবি-ফারসি ঐতিহ্য, মুসলমান অভিজাত শাসকবর্গ বুঝতে চেয়েছিলেন বাংলার প্রাক্-মুসলিম হিন্দু সংস্কৃতি। বহু মুসলমান কবির হিন্দু পৌরাণিক ঘটনাবলি ও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। যেমন সাবিরিদ খান। তবে অভিজাত উচ্চবর্গীয় সমাজে সামাজিক অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে বিরোধ ছিল অনেক। কিন্তু সমাজের নীচের তলায় দরিদ্র বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তেমন বস্তুগত পটভূমিকার পার্থক্য না থাকায়, লৌকিক সংস্কৃতির দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই আচ্ছন্ন হওয়ায়, সেখানে বিরোধের চেয়ে পারস্পরিক প্রভাব ও সমন্বয় লক্ষিত হয় বেশি পরিমাণে।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে যবন হরিদাস মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করার পরও সেকালে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের মনোভাবের পরিচয় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' হতে জানা যায়। হুসেন শাহ্ হরিদাসকে ডেকে বোঝালেন এবং আবার কলমা পড়ে স্বধর্ম পালন করতে বললেন। এ কথা শুনে হরিদাস বললেন—

'নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।।...
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন।।'

হরিদাসের কথা শুনে 'সন্তোষ হৈল সকল যবন' বৃন্দাবন দাসের এই ধারণা যে অমূলক, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সেকালের মুলুক পতি ও তাঁর সম্প্রদায়ের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি যদি অদৃশ্য বিদ্বেষ থাকত তাহলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমধর্ম বাংলায় অবাধে প্রচার করতে পারতেন কি? হুসেন শাহের রাজত্ব সম্পর্কে হিন্দু কবি মৃত্যুঞ্জয় শর্মা রচিত একটি গান পাওয়া যায়। যথা—

'এমন রাজা আর হবে না প্রজার বহু ভাগ্যবল;
ধনে ধ্যানে জ্ঞানে মানে ভাগ্যলক্ষ্মী সদা অটল।
জাত-ধরমের নাই ঠিকানা, হিন্দু-মোসলেমে জানা যায় না;
কোরাণ-পুরাণ সবই জানা, অঙ্গে ফুটে দেবজ্যোতি।'*

আসলে তুর্কি আক্রমণের পর বিদেশি বিধর্মী মুসলমান রাজাগণ এ দেশ শাসন করলেও বসবাস করতে করতে স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের মাটি মানুষ ও মানব সংস্কৃতিকে ভালোবেসেছিলেন। বিদেশি সকলেই ছিলেন এমনও মনে করা যায় না। তাঁদের অনেকের জন্মই এদেশে। বিদেশি রাজাগণ সে কারণে দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনর্বিকাশে মনপ্রাণ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। এবং এই সহায়তার ক্ষেত্রে রাজাগণ কোনরূপ জাত-বিচার করেননি। তার প্রমাণ মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য। আগেই বলা হয়েছে, এই অনুবাদ সাহিত্য ধারার অপর উল্লেখযোগ্য নজির হল—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত অনুবাদ কার্য। হুসেন শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করে সেখানে পরাগল খাঁকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি তাঁর রাজসভায় জ্ঞানী-গুণীদের নিকট 'ভারতকথা' অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধকাহিনি শোনার পর তা আরও বেশি করে শুনতে আগ্রহী হন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় মহাভারতের বিশালত্ব ও সংস্কৃত ভাষা। পরাগল খান কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বললেন—

'এহি সব কথা সংক্ষেপে করিয়া।
একদিনে শুনিতে পারি পাঁচালি রচিয়া।।'

কবীন্দ্র পরমেশ্বর রাজাজ্ঞায় মহাভারত গ্রন্থকে সংক্ষেপে অনুবাদ করেছিলেন—তাঁর সেই অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'পাণ্ডব বিজয়'। পরাগল খানের নির্দেশে এই কাব্যটি অনুবাদ হয়েছিল বলেই সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ গ্রন্থটি 'পরাগলী মহাভারত' নামে সমধিক পরিচিত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম খণ্ড)-এ পরাগল খানের সম্পর্কে বলেছেন : "পরাগল খান যে অতি উদারমতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তিনি মহাভারত শুনিতে চাহিবেন কেন? কোন ফারসি 'কিস্সা' বা কারবালা কাহিনির অনুরূপ কোন ইসলামি গল্পকাহিনি শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিতেন।" কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর কাব্যমধ্যেই পরাগল খান সম্বন্ধেও বলেছেন—'লস্কর পরাগল খান, মহাদাতা কর্ণসম দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য।' কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর রচনার মধ্যে হোসেন শাহ সম্বন্ধে প্রশস্তি রচনায় লিখেছেন—'নৃপতি হোসেন শাহ হ এ মহামতি।/পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।।/অস্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।/কলিকালে হৈব (হৈল?) যেন কৃষ্ণ অবতার।।" যে যুগে একজন হিন্দু কবি তাঁর মহাভারত কাব্য মধ্যে মুসলমান রাজাকে কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সে যুগে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তা সহজেই বিচারগম্য।

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খান (ছোটো খাঁ) বা নসরৎ খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিও তাঁর পিতার ন্যায় উদার ছিলেন। কবীন্দ্র অনূদিত সংক্ষিপ্ত মহাভারতে তিনি তৃপ্ত হতে না পারার জন্যই বৃহদাকারে মহাভারত অনুবাদ করতে নির্দেশ দেন শ্রীকর নন্দীকে। অনুবাদক শ্রীকর নন্দী জৈমিনী মহাভারতের উপর নির্ভর করে কেবলমাত্র 'অশ্বমেধপর্ব' নিয়ে বিরাট আকারে কাব্য রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থটি সাহিত্যের ইতিহাসে 'ছুটি খানের মহাভারত' নামে পরিচিত। হিন্দু কবি তাঁর মুসলমান পৃষ্ঠপোষক রাজা সম্বন্ধে কাব্য মধ্যে প্রশংসা করেছেন। যথা—

'নসরত শাহা তাত অতি মহারাজা।
রাম বশিষ্ঠ পালে সব প্রজা।।

নৃপতি হোসেন সাহা হেঅ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ড ভেদে পালে-এ বসুমতী।।
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান।।[৭]

মধ্যযুগের সেই সময়ে মুসলমান রাজাগণ যদি ওইভাবে অনুবাদ কর্মে সহায়তা না করতেন তাহলে হয়তো বাংলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত হাতে পেতে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হত। উভয় ধর্মাবলম্বীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনোভাব কেমন ছিল তা আমরা ওই সাহিত্যের অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়েও কিছুটা বুঝে নিতে পারি।

(৩)

হুসেন শাহ্ মাঝে-মধ্যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন বলে কিছু লেখক মত প্রকাশ করেছেন।[৮] তাঁরা সাধারণত চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত সুবুদ্ধি রায়ের উপাখ্যান, উড়িষ্যায় হুসেন শাহের মন্দির ধ্বংস এবং নবদ্বীপের হিন্দুরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণগণ হুসেন শাহের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন বলে জয়ানন্দ যে মতপ্রকাশ করেছেন—এ সবের উপর তাঁদের যুক্তি স্থাপিত বলে মনে হয়।

উড়িষ্যায় সুলতানের মন্দির ধ্বংস অপরিহার্যভাবে প্রমাণ করে না যে তিনি হিন্দু বিরোধী ছিলেন, কারণ যুদ্ধের আনুষঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সময় এরকম ধ্বংসকার্য সংঘটিত হতেই পারে। সব রাজাই চাইবেন তাদের সীমান্ত নিজ অধিকারে থাক ও সুদৃঢ় থাক। দেবমন্দিরাদির ক্ষতিসাধন করা হয়ে থাকলে তাও ওই রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের অন্তর্ভূত। মন্দির, মসজিদ সৈন্যের দ্বারা নানা কারণে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

চৈতন্যদেব নিম্নশ্রেণিকে মর্যাদা দানের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন এবং তাতে যেভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন তাতে সমাজের উচ্চ শ্রেণির স্বার্থে আঘাত পড়ছিল। একই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে কোনোরকম পারস্পরিক সংঘর্ষ না হয় সেজন্য হুসেন শাহ্ কঠোর হতে বাধ্য হয়েছিলেন। জয়ানন্দ যা বলেছেন তার সারমর্ম দেওয়া যেতে পারে : নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা গৌড়ের সিংহাসন জবরদখল করবে বলে সুলতানের অনুচরবৃন্দ তাঁকে সংবাদ দিয়েছিল। ক্রোধান্বিত হয়ে সুলতান নবদ্বীপ ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের জাত অপবিত্র করা হয় এবং তাঁদের বহুজনকে হত্যা করা হয়। হিন্দুদের ধর্মকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং নবদ্বীপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি চরম আকার ধারণ করে যার ফলে তাঁর ভাই বিদ্যা-বাচস্পতিকে গৌড়ে রেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেশত্যাগ করে বেনারসে চলে যান।[৯]

বাংলা মূলপাঠ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণরা যে গৌড়ের সিংহাসন দখল করবেন এটা নবদ্বীপের হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করেছিলেন—এ তথ্য বৃন্দাবন দাসও সমর্থন করেছেন।[১০] এ ধরনের চিন্তার কারণ যাই হোক না কেন এটা সুলতানকে ক্রোধান্বিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি নবদ্বীপের হিন্দু সমাজে ব্যাপ্ত রাজদ্রোহিতার প্রবণতাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। উপর্যুক্ত বিবরণে আমরা অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় বাদ দিয়ে সুলতানকে শুধু ব্রাহ্মণদের উপর

অত্যাচার করতে দেখি কেন এটা তা ব্যাখ্যা করে। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু তিনি যা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল রাজদ্রোহিতা দমন করা এবং এতে সাম্প্রদায়িক বোধ বা ধর্মীয় উদ্দীপনার কোনো ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। উপরন্তু জয়ানন্দ বলেছেন যে, এ ঘটনা ঘটেছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের জন্মের প্রাক্কালে যখন বাংলায় শাসনকারী সুলতান ছিলেন ইলিয়াস শাহি বংশের জালালউদ্দিন ফতেহ্ শাহ। পূর্ববর্তী সুলতান জালালউদ্দিনকৃত কোনো কাজের জন্য হুসেন শাহকে দায়ী করা যায় না।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উচ্ছেদ তথা অত্যাচারের প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে রাজভয়ের বর্ণনা আছে। সে সময় গৌড়ের বাদশা ছিলেন হুসেন শা এবং বৈষ্ণবদের উপর হুসেন শার আক্রোশ ও অনুগ্রহের কথা শুধু চৈতন্যমঙ্গল নয় চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়।"[১১] তাই জয়ানন্দের বর্ণনাকে বলা যায় না পুরোপুরি অসত্য। কিন্তু দেখতে হবে 'ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়'-এর কারণ কী? এ ঘটনা কী সুলতানের হিন্দু বিদ্বেষজনিত? অর্থাৎ সুলতানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিচয়বাহী, না কী তাঁর শ্রেণি স্বার্থের ঐতিহাসিক নিয়মেরই পরিণতি?"[১৮] জয়ানন্দ বর্ণিত ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় :

১. নবদ্বীপে এই রাজভয় ধারাবাহিক নয়, অকস্মাৎ।
২. শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের উপরেই এই রাজরোষ।
৩. পিরল্যাবাসীদের গৌড়েশ্বরের কাছে মিথ্যা সংবাদ প্রদান যে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা সুলতানের বিপদ ঘটাবে। কেননা, শোনা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ রাজা হবে গৌড়ে।
৪. সুতরাং নিশ্চিন্তে বসে থাকলে বিপদ হবে রাজার। এই কথা রাজার গ্রহণীয় মনে হয়েছে, ফলস্বরূপ শাস্তি দিতে শুরু করেছেন ব্রাহ্মণদের।
৫. কিছুদিনের মধ্যেই রাজা ব্রাহ্মণদের আজ্ঞা দিয়েছেন নবদ্বীপে বসবাস করার জন্য। ভয়াল দেবীর স্বপ্নদর্শনে ভীত হয়ে রাজা আরও বলেছেন যে, নবদ্বীপে মুসলমান দেখলে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে, মারতে পারবে যতখুশি।

উল্লেখ্য, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর এই রাজরোষের কারণ অনুমান করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'এক সময় কি নবদ্বীপে যথার্থই একটা রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের কথা ও আলোচনা চলেছিল, যার আভাষ ও ইঙ্গিত পেয়েই হোসেন শাহ্ সেখানকার ব্রাহ্মণদের উচ্ছেদ করবার হুকুম দেয়? রাজা গণেশের মন্ত্রদাতা নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশধর অদ্বৈত গোঁসাই কি এতটুকু রাজনীতিব জ্ঞানশূন্য ছিলেন যে, কেবল 'কৃষ্ণ কোথা' বলে বলে কেঁদে বেড়াতেন?"[১২]

যদি এই অনুমানকে সত্য হিসাবেও ধরা যায় তবুও বলা যায় এই রাজরোষ হওয়ার কথা অদ্বৈত গোঁসাই-এর প্রতি, বড়জোর তার পরিবার পরিজন সম্পর্কে, সেখানে সমস্ত ব্রাহ্মণরা কি দোষ করেছিল? আরও উল্লেখ্য, এই প্রসঙ্গেই বলেছেন রজনীকান্ত চক্রবর্তীও : 'চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে মুসলমানেরা নবদ্বীপের উপর বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিল।...সে সময় হিন্দুদের মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে...কাজী গৌড়েশ্বরকে জানান যে নবদ্বীপবাসীগণ

স্বাধীন হইবার বাসনা করিয়াছে...গৌড়েশ্বর নবদ্বীপবাসীগণের শাসনের জন্য কাজীর প্রতি আদেশ করিলেন।"[১৩]

রজনীকান্তবাবু অবশ্য দিতে পারেননি এই বিস্তর অত্যাচারের প্রমাণ। আরও লক্ষণীয়, আমরা জয়ানন্দের কাব্য থেকে যে তথ্য পাচ্ছি তাতে কাজীদের অভিযোগের কথা নেই, আছে পিরল্যাবাসীদের। তাছাড়াও রজনীবাবু উপরোক্ত তথ্যের পক্ষে উল্লেখ করেননি কোন তথ্য বা সূত্র। যাই হোক, সুলতানকে যে বা যারাই এই খবর দিক না কেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ উচ্ছেদ. তবে এই ঘটনার কারণ নির্ণয়ে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ পলিটিক্যাল, রিলিজিয়াস নয়।"[১৪] প্রমথবাবুর এই ঘটনার 'পলিটিক্যাল' চরিত্র নির্ণয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে আপত্তি নেই কোনো। কেননা, এটা গৌড়েশ্বরের সিংহাসন চ্যুতির সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এঘটনা 'রিলিজিয়াস' নয়—একথাও কি পুরোপুরি সত্য? কারণ, বর্ণনা অনুযায়ী একটা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের উপরই সংঘটিত হয়েছে আক্রমণ। তাসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকেই যায়, ধর্মসম্প্রদায়ের উপর এই আক্রমণ কি ধর্মেরই স্বার্থে, না গদির স্বার্থে? বর্ণনা অনুসারে কি বলা যায় না গদির স্বার্থেই সংঘটিত হয়েছে এই আক্রমণ? আর তাতে ধর্মসম্প্রদায় হয়ে গেছে যুক্ত। তাহলে নিশ্চয়ই বলতে আপত্তি থাকে না যে, সুলতান নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে যে আক্রমণ সংঘটিত করেছেন তাতে কোন ধর্মসম্প্রদায় যুক্ত হলেও তাকে তাঁর বিবেচনার মধ্যে রাখেননি। আবার এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সুলতান রাজ্যচ্যুতির ভয়ে 'ব্রাহ্মণদের জাতিপ্রাণ নাশ করে' সেই সুলতানই আবার ওই ব্রাহ্মণদের শান্ত ও তুষ্ট করার জন্য বলে—'নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ। আপন ইচ্ছাএ মার প্রাণ জানী রাখ।'[১৫] অর্থাৎ একই সুলতান নিজ স্বার্থে আঘাতজনিত কারণে যেমন ব্রাহ্মণদের অত্যাচার করেছেন, তেমনই হিন্দুদেরও উস্কিয়েছেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে। তাহলে নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুলতানের স্বার্থরক্ষাই বড় কথা এবং সেই প্রয়োজনে তিনি ধর্মকেও ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। তবে কথিত আছে যে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেই হুসেন শহরটি লুঠ করেছিলেন।[১৬] জয়ানন্দ মনে হয় এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন যাতে গৌড়ের কিছু হিন্দু হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করা' সম্পর্কে হুসেন শাহের বিরুদ্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য নানাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'চৈতন্য-চরিতামৃতের' মধ্যখণ্ড (২৫ পরিচ্ছেদে) অংশে এই ঘটনা সম্পর্কে লিখিত আছে যথা—

> 'পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিল গৌড় অধিকারী।
> হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরী।।
> দীঘি খোদাইতে তারে মনসীর কৈল।
> ছিদ্র পাএল রায় তারে চাবুক মারিল।।'

হুসেন শাহের পরবর্তীকালে ভাগ্য পরিবর্তন হল। রাজা হয়ে তিনি তার পূর্ব মনিব সুবুদ্ধি রায়কে রাজকার্যে উচ্চপদে নিয়োগ করলেন। রাজা হবার পর হুসেন শাহের স্ত্রী তাঁর পিঠে

বেত্রাঘাতের কারণ জানল এবং সুবুদ্ধি রায়কে মারতে বললেন। একথা শুনে হুসেন শাহ তার স্ত্রীকে বললেন—

'আমার গোষ্ঠী রায় হত পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।।
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইহো নাহি জীবে।।
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সংকটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা।।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর অনুরোধে সঙ্কটের মধ্যে পড়ে বাধ্য হয়ে বদনা বা গাড়ুর সামান্য একটু জল সুবুদ্ধি রায়ের মুখে দিয়েছিলেন মাত্র। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির (প্রতিশোধমূলক) ওই আচরণকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগতভাবে সাম্প্রদায়িক দোষারোপ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত সে বিচার করবেন সুধীবৃন্দ।

বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া চৈতন্যদেবের সমসাময়িক যুগে মুসলমান শাসকদের বা ধর্মীয় নেতাদের হাতে ব্যাপক হিন্দু নির্যাতনের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ খুব একটা নেই। বর্তমানের সাম্প্রদায়িক হিন্দু বা মৌলবাদী মুসলমানদের পছন্দ হোক না হোক ইতিহাস বদলে যায় না। তাই বলা চলে চৌদ্দ পনেরো শতকের বাংলার রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সামাজিক দিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ দরকার। এখানেও একটা ব্যাপার—যত দোষ নন্দ ঘোষের মতন—সবকিছু মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার একটা অনৈতিহাসিক ব্যাপার আছে। 'চৈতন্যদেব' গ্রন্থে ভূমিকা লিখতে গিয়ে দুই পণ্ডিত অধ্যাপক অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছেন, তা বরং ইতিহাস-সম্মত এবং নির্ভুল : "চৈতন্যের সমকালে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত, কঠোর বিধিনিষেধ ও প্রায়শ্চিত্তবিধানের দণ্ডনির্দেশ চালিত, অলঙ্ঘনীয় বর্ণভেদ ও আচারসর্বস্ব যে বাঙালী সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশে আগ্রাসী ইসলামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার পরিণাম, এমন একটি সরল ও সহজ ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইতিহাস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে শূলপানি-বৃহস্পতি-রঘুনন্দন যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও ব্যবহারশাসন আলোচনা ও বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তুর্কী অভিযানের অনেক আগেই বর্মণ ও সেন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। দুটি বংশই ছিল বহিরাগত।"[৩৮] বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তবে সামাজিক দুর্বলতার শুরু আদি মধ্যযুগে—গৌড়ের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের রাজত্বের অবসানের পর পৌরাণিক ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের আমলে। দ্বাদশ শতাব্দীতেই নৈতিক অবক্ষয় ও যৌন-ব্যভিচার, সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি, তীব্র বর্ণভেদ, নানা উপধর্মের সৃষ্টি, তান্ত্রিকতার প্রসার, উচ্চবর্ণের হাতে সম্পদ জমে থাকা, নিম্নতম অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছদের চূড়ান্ত ঘৃণা, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে শূদ্রদের (যাদের মধ্যেও নানা স্তর) চূড়ান্ত উৎপীড়ন ইত্যাদির কোনওটির জন্যই মুসলমানরা দায়ী নয়। বরং ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই অত্যাচারের ফলেই ক্রমে বৃদ্ধি পায় স্বেচ্ছায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া, যার

পিছনে শাসকশ্রেণি অনুগ্রহলাভ ছাড়াও, ইসলামের সাম্যবাদ, সন্ত-পীর-দরবেশের সহজ-সরল আচরণ এবং কিছু সুফি সিলসিলার প্রভাব স্পষ্ট। সমাজের সংহতি কোথায়? পঞ্চদশ শতকে তীব্র জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ আধিপত্যও সেইসঙ্গে ধনসম্পদের কারণে কিছু অব্রাহ্মণের উচ্চবর্ণের মর্যাদা লাভ ইত্যাদির ফলে যে সমাজ দেখি তার চলমানতা রুদ্ধ হবে তো স্বাভাবিক।

(৪)

কাজী ও শ্রীচৈতন্যের বিরোধও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। সে যুগের সামাজিক জীবনে শ্রীচৈতন্য ভাব-বিপ্লবের জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন ব্রাহ্মণদের পক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি প্রচার করলেন জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম ধর্ম, নাম সংকীর্তন। কৃষ্ণ নামে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই অধিকার। হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গকে এক ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন।[১৭] এই প্রয়াসকে আমরা আজকের প্রচলিত ভাষায় গণতান্ত্রিক বলতে পারি।

ব্রাহ্মণদের কৌলিন্যপ্রথা এতই কঠোর ছিল যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে ছোঁয়াছুঁয়িও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং মুসলিম রাজদরবারে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ করার ফলে এই ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা কৌলিন্য রক্ষার চেষ্টা করলেও বিদ্যাবুদ্ধিতে পিছিয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে সেটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধর্মরক্ষা প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। ইসলামের বিশাল প্রভাব থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যে কিছু ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনে এগিয়ে আসেন। এই সময় চৈতন্য বর্ণবৈষম্য বিদূরিত করে কৃষ্ণ প্রেমের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ধর্ম।[১৮] শ্রীচৈতন্যের ধর্মসংস্কারের লক্ষ্য হিন্দু ধর্মকে ইসলামের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হলেও বর্ণবৈষম্য রোধের চেষ্টা ইসলামের সুফী প্রভাবেরই ফল।[১৯] কৃষ্ণনাম ও কীর্তন এসেছে সুফীদের হালকা জিকির থেকে।[২০] বস্তুত চৈতন্যের ধর্ম হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একটা ভূমি প্রস্তুত করেছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভক্ত নর-নারীগণের সাধনার প্রধানতম বিষয় রাধাকৃষ্ণলীলা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ও বন্দনা করা। বৈষ্ণব অনুরাগী ও ধর্মাবলম্বী ভক্ত কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বহু গান বা পদ রচনা করেছিলেন। যার ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এই ধারার পরিচয় পদাবলী সাহিত্যে নিহিত আছে। চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে গড়ে উঠল চরিত্র-সাহিত্য। সে যুগের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি চৈতন্য-জীবনীকার হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

চৈতন্যদেবের নামের সঙ্গে বাংলার সুলতান হিসাবে হুসেন শাহর নামও জড়িত হয়ে আছে সাহিত্যের ইতিহাসে। মুসলমান সুলতান, দেওয়ান ও কাজীর শাসনাধীন আমলে চৈতন্যদেব অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে খোল করতাল মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ডসহ যেভাবে সরবে মিছিলসহ নগরকীর্তন করতেন তাতে সে সময় অবৈষ্ণবগণ তথা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে

উঠতেন। মনে হয় তারই পরিণতি হিসাবে পথে পথে হরিনাম প্রচারকালে নিত্যানন্দ ও হরিদাস ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী দুই ভাই জগাই ও মাধাই-এর হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন। জগাই ও মাধাই-এর ক্রোধের মোকাবিলা করার জন্য স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে হাজির হতে হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে ওই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের গুণগ্রাহী ভক্ত হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

হুসেন শাহ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে তাঁর শাসনকালে হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনে, শিক্ষায় ও ধর্ম প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হয়। সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগুরু শ্রীচৈতন্যের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার প্রতি খুবই বিরূপ ছিলেন। ধর্ম প্রচারের কার্য থেকে তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণগণ সুলতান হুসেন শাহের নিকট বৈষ্ণবগুরুর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ড: ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের সংকীর্তনে কাজীর লোকজন যে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন তার কারণ পণ্ডিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাজীর কাছে অহরহ 'লাগানি'। এ তথ্য বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন।"[২১]

বিচক্ষণ সুলতান শ্রীচৈতন্যের কার্যাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করেন এবং এর ফলে বুঝতে পারেন যে, চৈতন্যের বৈষ্ণব চিন্তাধারা হিন্দুদের কোন ক্ষতিসাধন করছে না, বরং হিন্দু সমাজের উন্নতি বিধান করাই তাঁর চিন্তাধারা ও প্রচারণার লক্ষ্য। হিন্দুর সামাজিক জীবনে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে হুসেন শাহ তাঁর ধর্ম প্রচার কার্যে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেননি।[২২] তার ওপর বৈষ্ণব গুরুর প্রচার কার্যে বাধা না দেওয়ার জন্য হুসেন শাহ সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রতি এক আদেশ জারি করেন। এমনকি তিনি শ্রীচৈতন্যের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করার বিরুদ্ধে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। কাজী দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা'র জন্য কঠোর হতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র। কাজীকে কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে এও বলেছিলেন—চৈতন্যদেব লোক ক্ষেপাচ্ছে, হিন্দুয়ানী জাহির করছে, সুতরাং তাহাকে জব্দ না করলে মুসলমানী রাজত্ব টিকবে না।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কাজীর ও মুসলমানদের কেমন সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে একই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অবৈষ্ণব বিশেষত স্মার্ত ও শাক্তগণ কেমন ধারণা পোষণ করতেন তা জানা প্রয়োজন। তাহলে সে আমলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নির্ধারণ করা সহজ হতে পারে।

হুসেন শাহি আমলে চৈতন্যের নগর সংকীর্তনের উৎপাতে অবৈষ্ণবগণ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তারা এও মনে করেছিলেন যে, এর ফলে হয়তো মুসলমান শাসকগণ ক্ষিপ্ত হয়ে কোনরকম ক্ষতি করতে পারে। সে সময় দেশে গুজব রটনা হয়েছিল বৈষ্ণবদের ধরার জন্য নৌকাযোগে সুলতানের পাইক আসছে—তার পরিচয় যথা—

'কেহো বলে আরে ভাই পড়িলা প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উন্মাদ।।
আজি মুই দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে হেথা।

শুনিলেক, নদীয়ার কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ।।'

কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। এটি নিছক গুজব মাত্র। মুসলমান সুলতান নৌকাযোগে পাইক যদি পাঠাতেন বৈষ্ণবদের ধরার জন্য তাহলে অবশ্যই তার পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওই গুজবে চৈতন্যভক্ত শ্রীবাস পর্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—'ওহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।/শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ-নাও।।/মুই গিয়া সর্ব আগে নৌকায় চড়িমু।/এই মত গিয়া রাজগোচর হইমু।।'

চৈতন্যদেবের ভক্ত পার্ষদদের প্রতি মুসলমান শাসক যত না অত্যাচার করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি অত্যাচার, খারাপ ধারণা ও ঘোরতর বিপক্ষতা পোষণ করেছেন ব্রাহ্মণগণ তথা স্মার্ত ও শাক্ত অবৈষ্ণবগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পর কি বলাবলি করত তার পরিচয় যথা—'এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।/ইহা সবে হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।।/এ বামুনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।/ভাবুক কীর্তন করে নানা ছলা পাতে।...../কেহ বলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে।/তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।।'

এছাড়া বৈষ্ণবগণ যখন রাত্রিকালে শ্রীবাসের ঘরে দরজা বন্ধ করে নামগান করত সে সম্বন্ধে তারা কিরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করত তার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।/সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।।...../কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।/দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল।।/রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।/নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।।/ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।/খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমন।।/ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।/এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।।'

মনে হয় এসব নানাবিধ কারণেই শ্রীবাসের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিপক্ষগণ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,

'শ্রীবাস বামনার এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে।।'

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এটা তাদের নিছক পরিকল্পনা মাত্র ছিল। বাস্তবায়িত করার নানা অসুবিধা ছিল। মনে হয় বাধা ছিল কাজীর সুশাসন। শ্রীচৈতন্যের প্রতি মুসলমান কাজী কি ধারণা পোষণ করতেন সে বিষয়ে জানা যায় যে, পারস্পরিক সম্পর্ক খুব একটা খারাপ ছিল না বরং ভালো বলা যায়। শ্রীচৈতন্যের নাম কীর্তনে মেতে ওঠার ফলে শাক্ত ও নৈয়ায়িকগণ কাজীর নিকট বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে নালিশ করল। কাজী এই নালিশ পেয়ে কীর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন—'সর্বস্ব দণ্ডিয়া তারে জাতি যে লইমু।' এই নিষেধ বার্তাই শ্রীচৈতন্যকে আরও বেশি করে নগরকীর্তন করার উৎসাহ জুগিয়েছিল। ফলে তিনি তিন দলে কীর্তনের আয়োজন করলেন। সামনের দলের অগ্রভাগে রাখলেন যবন হরিদাসকে। মুসলমান কাজী যাতে যবন হরিদাসকে দেখে কোনরূপ অত্যাচার করতে সাহস না পায়। মাঝে রইলেন অদ্বৈত আর শেষের দলের প্রথমেই রইলেন চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। দেখা যাচ্ছে যে, কাজীর

নিষেধকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। এবং এখানেই শ্রীচৈতন্য শান্ত হলেন না। কাজীর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করলেন। তার বর্ণনা পাই বৃন্দাবন দাসের লেখায়। যথা—'ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজি বেটা কেথা।/ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা।।/নির্যবন কঁরো আজি সকল ভুবন।/পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন।।/প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।/ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বোলে বারবার।।'

এরকম ঘটনা সম্ভব নয়। এ বৃন্দাবন দাসের কল্পনা এবং বিক্ষুব্ধ মনের আত্মতুষ্টি মাত্র। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' নামক গ্রন্থে লিখেছে, "তাঁহার আদেশে ভক্তগণ কাজীর ঘর ভাঙিলেন ও ফুলের বাগানের গাছ উপড়াইয়া ছারখার করিলেন। তারপর বিশ্বম্ভর যখন বলিলেন, 'অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়।' তখন ভক্তরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন :

'হাসে মহাপ্রভু সর্বদাসের বচনে।
হরি বলি নৃত্যরসে চলিলা তখনে।।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, "উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।/বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।।/তবে মহাপ্রভু তার দ্বারতে বসিলা।/ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা।।/দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।/কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া।।/প্রভু বোলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।/আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম কি মত।।' নিরুপায় কাজী কি আর করেন। শেষ পর্যন্ত কাজী আত্মীয়তা পাতিয়ে শ্রীচৈতন্যকে বললেন—

'নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।।'[১৩]

এই ছিল সে সময়ের অবস্থা। কাজীরই অত্যাচারের কথা বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। কাজী ধর্মীয় কারণে কীর্তন নিষেধ করেননি। অবৈষ্ণব প্রজাদের আবেদনে তিনি ওই নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাতে অবৈষ্ণবদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের কোনো বড়ো রকমের বিরোধ না বাধে সেজন্য। মনে হয়, কাজী যদি সে সময় কীর্তন করতে নিষেধ না করতেন তাহলে হয়তো অবৈষ্ণবদের সঙ্গে তাদের বড়ো রকমের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হত। সাধারণ মুসলমান ও কাজী যদি কঠোর হতেন তাহলে হয়তো শ্রীচৈতন্যের ওইরূপ আচরণ করা খুব একটা সম্ভব হত না। সে যুগে শ্রীচৈতন্যের ওই বিরোধ ছিল রাজনৈতিকভাবে মুসলমান কাজীর সঙ্গে। সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের তেমন কোনো বিরোধ ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই সে বিরোধের পরিচয় আমরা সাহিত্যের পাতায় অবশ্যই পেতে পারতাম। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের তেমন কোনো বড়ো রকমের বিরোধের বর্ণনা সে সময়ের সাহিত্যে নেই বললেই হয়।[১৪]

বৈষ্ণব ষড় গোস্বামীগণের মধ্যে রঘুনাথ দাসও একজন ছিলেন। মুসলমান উজির রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিযোগ পেয়ে তদারক করতে এসে হিরণ্য গোবর্ধনকে না পেয়ে তাদের

পুত্র রঘুনাথকে বন্দি করেছিলেন। উজির রঘুনাথকে ভয় দেখিয়েছিল—'বাপ জেঠাকে হাজির করে না দিলে শাস্তি পাবে।' উজির ভয় দেখিয়েছিল মাত্র। শাস্তি তো দেনইনি এবং সে সাহসও পাননি। রঘুনাথ সেই উজিরকে যেকথা বুঝিয়েছিলেন তা লক্ষণীয় যথা—"আমার বাপ জেঠা ও তুমি ভায়ের মত ছিলেন। ভাইদের মধ্যে ঝগড়া যেমন আজ আছে কাল নেই, তোমাদের বিবাদও তেমনি একদিন মিটিয়া যাইবে। তুমি আমার বাপ-জেঠার মতো। আমাকে শাস্তি দেওয়া তোমার উচিত নয়।' রঘুনাথের সেই কথায় উজিরের মন গলে গিয়েছিল।"

সাধারণ মুসলমানদের মধ্য হতে যখন হরিদাস বৈষ্ণব মতাবলম্বী হলে পর কাজী তাকে মত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য সাধারণ মুসলমানগণ হরিদাসের তেমন বিরোধিতা করেননি। কাজী এবং সে যুগের মুসলমান যদি তেমনভাবে তার বিরোধিতা করতেন বা তার প্রতি ভীষণভাবে বিরূপ হতেন তাহলে হরিদাসের পক্ষে ওইভাবে বৈষ্ণব ধর্মাচরণ করা সম্ভব হতো কি?

অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানের প্রতি শ্রীচৈতন্য তেমন কোনো বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না। তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, শ্রীবাসের গৃহে শ্রীচৈতন্যের উৎসব উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান হত তাতে শ্রীবাসের পরিজন দাসদাসী সকলেই শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করতেন। এই অনুগ্রহ লাভ হতে শ্রীবাসের মুসলমান দরজিও বঞ্চিত হননি। তার বর্ণনা যথা—

> 'শ্রীবাসের বস্ত্র দিয়ে দরজী যবন।
> প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।'

এছাড়া মুসলমান হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত সুনজরে দেখতেন। হরিদাসকে স্বগৃহে স্থান দিয়েছিলেন এবং সেই হরিদাস ঠাকুর দেহরক্ষার পর তাঁর পদধূলি ভক্তদের নিতে বলেছিলেন। হরিদাসের মৃত্যুতে তিনি শোকাভিভূত হয়ে নিজ হাতে তাকে কবরস্থ করেছিলেন। সুতরাং একথা বলাই যায় যে, শাসক, কাজী ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক পরিলক্ষিত না হলেও তাদের মধ্যে উল্লেখ করার মত বিরোধ ছিল না সেসময়ে। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "হুসেন শাহ যদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা হইলে নবদ্বীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজীর ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন।...হুসেন শাহের রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাট্যশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। ত্রিপুরা অভিযানে গিয়া হুসেন শাহের হিন্দু সৈন্যরা গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করিয়াছিল। হুসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হইলে এসব ব্যাপার সম্ভব হইত না।'

প্রাগাধুনিক চৈতন্যজীবনীগুলি থেকে কখনও মনে হয় না মুসলমানদের বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রাস থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্যই বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল ও ধর্মান্দোলন শুরু হয়েছিল। ড: রমাকান্ত চক্রবর্তী চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।' তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সমাজে কিছু পরিমাণে থাকলেও চৈতন্যের গোড়ার দিকের জীবনীতে তা আদৌ 'মৌল বিষয়' নয়।" বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' খুঁটিয়ে পড়লে হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত সংকটের হেতু যে তারা নিজেরাই, তা বোঝা যায়।

বস্তুত, ওই সংকট থেকে মুক্তির উপায় ছিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক আচরণে মানবিকতাকে ও ঔদার্যকে স্থান দেওয়া। শ্রীচৈতন্য এই মানবিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন ভক্তিবাদের মধ্যে। প্রচলিত ভক্তিবাদকেই তিনি একটি বিশিষ্ট ও শক্তিশালী ধর্মীয় মতাদর্শ হিসাবে নবরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এই সূত্রে ভক্তিবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক প্রসঙ্গ আলোচিত হতে পারে কিন্তু সর্বভারতীয় চিত্র আমাদের উপজীব্য নয় বলে তাতে বিরত থাকা গেল (এ বিষয়ে তারাচাঁদসহ বহু লেখক আলোচনা করেছেন)। আমাদের প্রশ্নটি হল : ইসলামের কাছে কি শ্রীচৈতন্যের ঋণ নেই? মধ্যযুগে ভক্তিপন্থার উপর ইসলামের প্রভাব সুবিদিত। বিশেষত সুফিবাদের। কিন্তু রামানন্দ, কবীর বা নানকের ক্ষেত্রে তা যতখানি সত্য চৈতন্যের ক্ষেত্রে তা নয়। এনামুল হক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলামিক অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্যে কিছু সম্ভাব্য সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও তার সবটা মেনে নেওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কোনও সুফি সাধকের সংস্পর্শের বা তাঁর ইসলামি শাস্ত্র, সাহিত্য পড়ার কিংবা নবদ্বীপে সুফি দর্শনচর্চার কোনও প্রমাণ নেই। তবে সমসাময়িক ধর্ম হিসেবে প্রভাব কিছু থাকতেই পারে। বিশেষত সাম্য ও জাতিভেদবিরোধী মনোভাবে।

চৈতন্যবাদে ইসলামের প্রভাব কম একথা যেমন সত্য, তেমনি তাঁর ধর্মান্দোলন ইসলাম-বিরোধী ছিল না একথাও সত্য। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কোনও রচনায় এর প্রমাণ নেই। উত্তরকালীন চৈতন্যজীবনীতে যেমন অতিরঞ্জনের ঝোঁক স্পষ্ট, তেমনি উত্তরকালের বৈষ্ণব-ধর্মে ইসলাম বিরোধিতা লক্ষণীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন পক্ষপাতদুষ্ট যদিও তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-ই শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ। তাঁর রচনায় বিজুলী খাঁ ও উড়িষ্যার সীমান্ত অধিকারীর ধর্মান্তকরণের ঘটনা আছে, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৈষ্ণবধর্মে মুসলমানদের দীক্ষাগ্রহণ অবশ্যই সীমিত। এমনকি 'যবন' হরিদাসও সম্ভবত জন্মসূত্রে মুসলমান নন, পরে হিন্দুধর্মচ্যুত হন মুসলমান পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। তিনি মুসলমানদের বৈষ্ণবধর্মে টেনে এনেছেন, এমন বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার। তবে বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ ও সংকীর্তন নিম্নবর্ণের মুসলমান বাঙালিদেরও আকৃষ্ট করেছিল একথা সত্য। বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ফলে হিন্দু থেকে মুসলমানে ধর্মান্তর যে কমে গিয়েছিল তাও সুনিশ্চিত।

তবে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলায় 'কাজী দলন' ঘটনাটি সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। নবদ্বীপের কাজী একবার কীর্তন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তাঁর বিরুদ্ধে চৈতন্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশাল শোভাযাত্রা সংগঠিত করেন এবং শেষপর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু এই 'বিজয়' নিয়ে উল্লাস এবং হিন্দু মৌলবাদী ব্যাখ্যার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।[১১] কেউ কেউ একে 'গণ আন্দোলন' এবং 'অহিংস সত্যাগ্রহের প্রথম নিদর্শন' পর্যন্ত বলে ফেলেছেন।[১২] সাম্প্রতিককালেও 'কাজী দলন' নিয়ে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার বিরাম নেই।[১৩] অথচ ধর্মনিরপেক্ষভাবেই রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, 'কাজী দলন' নিঃসন্দেহে চৈতন্যের নৈতিক সাহসের প্রমাণ, কিন্তু তা তাঁর উপরে কোনো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত মুসলমান বিরোধিতার প্রমাণ নয়।[১৪] কাজীর কাজকে আদৌ মুসলমান শাসকের হিন্দুদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ বলা যায় না। কারণ সুলতানি আমলে 'স্বীকৃত' হিন্দুধর্মের আচার-আচরণ-ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতায়

রাষ্ট্রগতভাবে হস্তক্ষেপের কোনও প্রমাণ নেই। হুসেন শাহ্ হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন, ইতিহাস থেকে একথা ভাবারও কারণ নেই। কাজীর কর্তব্যের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নটি জড়িত। নগর সংকীর্তনে কোলাহলময় উন্মত্ত শোভাযাত্রা ব্যাপারটি নতুন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির তা বন্ধ করাও আশ্চর্যজনক নয়। কাজেই অবাঞ্ছিত উপদ্রব মনে করে কাজীর নিষেধাজ্ঞা বোঝা যায়। চৈতন্যের প্রতিবাদও প্রশংসনীয় এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই বৈষ্ণবধর্ম স্বীকৃতি পায়। আবার 'কাজী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে যে সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।'[৩১]

(৫)

হুসেন শাহ্ শ্রীচৈতন্যকে ভগবানের অবতার বলে মনে করতেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[৩২] হিন্দুদের প্রতি তিনি যে দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তা তৎকালীন হিন্দু কবিদের তাঁকে রাজাদের বিশ্বের অলঙ্কার ('জগৎ-ভূষণ') এবং কৃষ্ণের অবতার ('কৃষ্ণাবতার') রূপে আখ্যায়িত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৩৩]

উত্তর ভারতের অধিকাংশ সুলতান হিন্দুর উপর জিজিয়া বা মাথাপিছু কর ধার্য করেছিলেন। কিন্তু হুসেন শাহের সময়ে বাংলায় এ বিধি প্রচলিত ছিল না, কারণ সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের জন্য যথেষ্ট স্থান ব্যয় করলেও এর কোনো উল্লেখই করেনি। মুসলমানদের কাছ থেকে সরকার জাকাত আদায় করেছেন বলে মনে হয় না। বস্তুত হুসেন শাহ্ এক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এটা শাসক শ্রেণি যে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আসীন ছিলেন অনেকাংশে সে কারণে হতে পারে। চারিদিক থেকে গৌড়রাজ্য শত্রুভাবাপন্ন বহু রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে লোদীরা সরে যেতে না যেতেই মুঘল সাম্রাজ্যবাদের উদীয়মান ঢেউ সবকিছু জয় করে নিতে শুরু করেছিল। এ অবস্থায় হুসেন শাহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বনিয়াদ শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[৩৪]

(৬)

হুসেন শাহের পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ্ বাংলার সিংহাসনে বসেন। রাজকার্যে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মুঘল-বাদশাহ্ বাবরের সঙ্গে সংঘর্ষকে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট প্রীতি ছিল। যদুনাথ সরকার 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন—"Like his father he continued to watch with sympathy the progress of Bengali literature. He himself is said to have ordered a Bengali translation of the Mahabharat, which would perhaps be the earliest of its kind. It was to the active interest of one of his officers, Chhutikhan of Chitagong, that we own Srikara Nandis translation of his epic. Another of his officers named Kaviranjan, was himself a poet of repute and has made affectionate mention of his sovereing" ১৫৩২ সালে নসরত শাহ্ আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

নসরত শাহের পর তাঁর ছোটোভাই আব্দুল বদর অল্প সময় সিংহাসনে বসেন। পরে নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩) রাজা হন। অল্প সময়ের রাজত্বকালে তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের ন্যায় কবিপোষক ছিলেন। এ সংবাদ 'কবিরাজ' শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ভণিতা হতে জানা যায়। যথা—

'নৃপতি-নসির শাহা তনয় সুন্দর।
সর্ব্বকাল-নলিনীভোগিত মধুকর।।
রাজা শ্রীপোরোজ শাহা বিনোদ সুজান।
দিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমান।।'

পূর্বরাজা আব্দুর বদর ভাইপো ফিরোজ শাহকে হত্যা করে আবার সিংহাসনে বসেন। এবার তিনি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করেন। তাঁর অকর্মণ্যতার ফলেই তিনি শেরা খা ও পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। এর ফলে সামরিক বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁকে অর্থ সংকটের মোকাবিলা করতে হয়। ১৫৩৮ খ্রিঃ শেরের আফগান বাহিনী গৌড় অধিকার করে। এই সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় হুসেন শাহি আমলের অবসান ঘটল।

তথ্যসূত্র :

১. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিজয় গুপ্ত : মনসামঙ্গল, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪; দেখুন- মমতাজুর রহমান তরফদার, হোসেন শাহি আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৭,
২. মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, আদিখণ্ড, পৃ. ৮, ৮২; মধ্যখণ্ড, পৃ. ২০৫ এবং অন্তখণ্ড, পৃ. ৩১৬ ও ৩৫০; সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাঙালা ও বাঙালী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫২, পৃ. ১৪-১৫; সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শোবছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ২৬৪-৮৪।
৩. দীনেশচন্দ্র সেন, হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার, কলকাতা, ১৯১১, পৃ. ২৩৭-৩৮; সুকুমার সেন সম্পাদিত, বিপ্রদাস পিপলাই; মনসাবিজয়, কলকাতা, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিজয় গুপ্ত : মনসামঙ্গল, ৩য় সংস্করণ।
৪. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২০, পৃ. ১০-১২।
৫. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিজয় গুপ্ত : মনসামঙ্গল, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৭৯; মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, আদি খণ্ড, পৃ. ১৭ ও ৬৭; অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩২৫, আদি খণ্ড, পৃ. ৬৫।
৬. প্রদ্যোৎ ঘোষের 'গম্ভীরা লোকসঙ্গীত ও উৎসব : একাল ও সেকাল' গ্রন্থ হতে গান সংগৃহীত। রচনা তারিখহীন।

৭. দ্র. দীনেশচন্দ্র সেন ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, 'ছুটি খানের মহাভারত', কলকাতা।

৮. আর ডি ব্যানার্জি, বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩২৪, পৃ. ৩০৬-০৭; রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মালদহ, ১৯০৩, পৃ. ১০৩, ১০৬, ১০৭ এবং ১২৩; তমোনাশ দাশগুপ্ত, অ্যাস্পেক্টস্ অফ বেঙ্গলি সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলি লিটারেচার, কলকাতা, পৃ. ৯২।

৯. অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩০৭, পৃ. ১১-১২।

১০. মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, আদি খণ্ড, পৃ. ১৮ এবং ৭৫।

১১. প্রমথ চৌধুরী, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৭।

১১ক. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন ইন্দুভূষণ মণ্ডল, মধ্যযুগীন বাংলার ধর্মীয় চরিত্র, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২।

১২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাংলার ইতিহাস, কলকাতা, পৃ. ১০১।

১৩. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১২।

১৪. প্রমথ চৌধুরী, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৮।

১৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রানা সম্পাদিত, জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল, কলকাতা, পৃ. ১১।

১৬. মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, আদি খণ্ড পৃ. ৩৫।

১৬ক. অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চৈতন্যদেব, সরস্বতী লাইব্রেরি, কলকাতা, ভূমিকা, পৃ. ২৬।

১৭. গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১১।

১৮. এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১১।

১৯. এনামুল হক, বঙ্গে সুফীর প্রভাব, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ১৭১।

২০. এনামুল হক, বঙ্গে সুফীর প্রভাব, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ১৭১।

২১. ক্ষুদিরাম দাস, দেশ কাল সাহিত্য, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪-১৫।

২২. এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৭৪।

২৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ২৬১।

২৪. বিস্তারিত দেখুন-মুসা কালিম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৪।

২৫. নরেশচন্দ্র জানা, বৈষ্ণব ছয় গোস্বামী, কলকাতা, পৃ. ১০৩।

২৬. রমাকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস; দেখুন-অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চৈতন্যদেব, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা।

২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলকাতা, পৃ. ২৭৫-২৭৭।
২৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কলকাতা, ১৯৮৪ পৃ. ১৮৮।
২৯. বিশ্বহিন্দু বার্তা, মহাপ্রভু, সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯১; উদ্ধৃত-রমাকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস; দেখুন-অবনীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চৈতন্যদেব, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ২১৬।
৩০. বিশ্বহিন্দু বার্তা, মহাপ্রভু সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯১; উদ্ধৃত-রমাকান্ত ভট্টাচার্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস; দেখুন-অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চৈতন্যদেব, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ২০০।
৩১. অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, চৈতন্যদেব, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ভূমিকা, পৃ. ৩১।
৩২. মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, অন্ত্যখণ্ড, পৃ. ৩৫০।
৩৩. দীনেশচন্দ্র সেন ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, শ্রীকর নন্দী : অশ্বমেধ পর্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩১২, পৃ. ৩।
৩৪. মমতাজুর রহমান তরফদার, হোসেন শাহি আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৯।

চৈতন্যদেব ও তিনটি সাম্প্রতিক উপন্যাস

পরমাশ্রী দাশগুপ্ত

গৌরচন্দ্রিকা

'মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে'

অক্ষয়কুমার মৈত্রের সম্পাদনায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—

> যাহা তথ্য হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস শুধুমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।[১]

চৈতন্যদেবের জন্মের পাঁচশো বছর পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবকে নিয়ে অথবা তাঁর সময়কে নিয়ে যখন নতুন করে উপন্যাস লেখা হয় তখন আমরা বুঝতে পারি এ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র প্রথাগত ইতিহাস নিষ্ঠার জন্য নয় মানবমনের যে ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন, এগুলো সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসকে নির্মাণেরই প্রচেষ্টা। একটি নির্দিষ্ট কাল পরিসরের মধ্যে মানুষের পরিচয় সীমিত ও খণ্ডিত হয়ে থাকে। মানুষ চায় তার সম্পূর্ণ অতীত সম্বলিত পরিচয়। সে চায় ইতিহাসের বিরাট কালখণ্ডের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে, মানব ইতিহাসের যে পরম্পরা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই পরম্পরার সঙ্গে নিজের জীবনকে মিশিয়ে নিতে। প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের এক অবিচ্ছিন্ন মানসিক ধারা সংযোগ থেকে গেছে। মানুষের জীবন-স্পন্দনের ইতিহাস কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমানের মধ্যে পাওয়া যায় না। আধুনিক মানুষ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমন্বয়ী নিজের ইতিহাস অনুসন্ধান করে। ঐতিহ্য হয়ে উঠতে পারে নতুন করে অর্থময় ও অনন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র। চৈতন্যদেব ও তার জীবন ও সময়কে পুনর্গঠন আসলে মানুষের এই আত্মপ্রবাহমানতার সম্পূর্ণ নির্মাণ।

উনিশ শতকের শেষভাগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে নতুন করে চৈতন্যচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নাটকে, কাব্যে, প্রবন্ধে বিভিন্ন অনুষঙ্গে চৈতন্য প্রসঙ্গ এসেছিল। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে ও চৈতন্যপ্রচারিত ভক্তি ভাবনার আলোকে সাহিত্যচর্চা হতে থাকে। বিশ শতকে মূলত দুটি ধারায় চৈতন্যচর্চা বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে চলতে থাকে চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রচারিত ধর্মান্দোলন নিয়ে অ্যাকাডেমিক গবেষণা অন্যদিকে চলতে থাকে সৃজনশীল লেখালেখি। লক্ষণীয় যে বিশ শতকে চৈতন্যদেব ও তার সময় নিয়ে যে পরিমাণ অ্যাকাডেমিক গবেষণা হয়েছে তার তুলনায় সৃজনশীল লেখালেখির পরিমাণ অনেক কম। আবার বিশ শতকের শেষভাগ থেকে এখনো অবধি যখন মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চার প্রতি গবেষকদের ঝোঁক কমতে শুরু করেছে তখন সৃজনশীল লেখকেরা পুরোনো সময় এবং সমসময়কে জুড়ে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। মানবমনের ইতিহাস তৈরির প্রক্রিয়াটি এভাবেই সক্রিয় থেকে গেছে।

চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষব্যাপী বহু ভক্ত-সাধকেরা রাজা-রাজড়াদের সমান্তরালে নিজেদের ব্যক্তিকীর্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাদের প্রধানতম কীর্তি ছিল তাদের নিজেদেরই জীবন। তারা তাদের মহৎ বিশ্বাস ও অনুভবকে জীবনে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন যে সেই জীবনই হয়ে উঠেছিল ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী এক অবস্থান। সেই জীবনেরই এক উদাহরণ হয়ে গিয়েছিল সেই সময় এক নতুন জীবনাদর্শ। যে সময় ব্যক্তির চরিত্র বিকাশের অনুকূল ছিল না সেই সময়ে এই মানুষেরা নিজেদের জীবন দিয়ে ব্যক্তির গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী কোনো না কোনো ভাবে এই মহৎ জীবনের সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে গেছেন। সেই কাহিনি আরো ছড়িয়ে গেছে, সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সমস্ত জীবন ঘিরে লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকারের সাহিত্য ধারাই পাওয়া যায়। কল্পনার মাঝে তথ্য এবং তথ্যকে ভরাট করতে কল্পনা এই দুই উপাদান মিলে তৈরি হয় এঁদের জীবন। এই জীবন ইতিহাসে অনিবার্যভাবে থেকে যায় পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের বিচিত্র সম্ভাবনা।

চৈতন্যদেবের জীবন ও তাঁর সময় নিয়ে যে বিচিত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্র থেকে গেছে তা নিয়েই তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিককালের তিনটি উপন্যাস। অভিজিৎ সেনের *রাজপাট ধর্মপাট* (২০০৮), শৈবাল মিত্রের *গোরা* (২০১২) এবং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের *পানিহাটা* (২০১৪)। এর আগেও বিশ শতকে এইরকম বেশ কিছু প্রচেষ্টার কথা আমরা জানতে পারি। ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাকা হাতের স্পর্শ লেগেছিল 'চুয়াচন্দন' ছোটোগল্পে। চৈতন্যদেবের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি এই ছোটোগল্পে উঠে আসেনি বরং যুবক নিমাই পণ্ডিতের মানবতাবাদী চেতনা পাঠককে মুগ্ধ করেছে। চুয়া ও চন্দনের প্রেমের সহায়ক নিমাই পণ্ডিতকে আমরা এমনভাবে পাই যার শক্তি আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার, যে শুভবোধের প্রতীক। সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে যে মানুষটি প্রেমের কথা প্রচার করতে বেড়িয়ে পড়েছিলেন যুবক বয়সের সেই মানুষটিকে নিয়ে রচিত এই কাহিনি তার চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে একেবারেই মানান সই হয়েছিল। মানব প্রেমের প্রচারক চৈতন্যদেবকে নর-নারীর প্রেমের সহায়ক হিসাবে গড়ে তুলে চৈতন্যদেবের জীবন সম্ভাবনার এক অনবদ্য সাহিত্যিক নির্মাণ করেছিলেন শরদিন্দু।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও সমরেশ বসুকেও এই সারিতে ফেলা যায়। অচিন্ত্যকুমার বিহ্বল ভক্তের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব জীবন নির্মাণ করেছেন, অন্যদিকে বিগত শতাব্দীতে সমরেশ বসুর উপন্যাসে চৈতন্যদেব কোনো ধর্ম প্রচারক বা অবতার নন তিনি একজন গণআন্দোলনের নেতা। যে মানুষচৈতন্য বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আলোচ্য সাম্প্রতিক তিনটি উপন্যাসে চৈতন্যদেব অবতার না মানব, গণআন্দোলনের নেতা না ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা এই ধরনের কোন বিবাদ বা বিরোধ নেই। চৈতন্যদেবের জীবন তাঁর সময় ও চেতনাকে নতুন সময়ের প্রেক্ষিতে নতুন ভাষ্য দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা মানব ইতিহাসকে অনুসন্ধান করার এবং অখণ্ড মানবসত্তা নির্মাণের।

এক

'মানব মনের ইতিহাস'

রাজপাট ধর্মপাট উপন্যাসের প্রথমেই লেখক জানিয়েছেন অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'মালদহে শ্রীচৈতন্য' নামের একটি প্রবন্ধ তাঁকে প্রাথমিক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। ইতিহাসের নানা সাল তারিখ ও পর পর ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন জেগে উঠেছিল লেখকের মনে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে, ইতিহাস কল্পনাকে মিলিয়ে তিনি নির্মাণ করলেন উপন্যাসটি। যদিও প্রাথমিকভাবে একটা ছোটোগল্প লেখারই পরিকল্পনা ছিল তাঁর। বেশ কিছু চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ও পুরোনো সাহিত্যকে অভিজিৎ সেন প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন যার দৃষ্টান্ত আছে বেশ কিছু অধ্যায়ের সূচনাতে।

বঙ্গদেশের এক টালমাটাল রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখা হয়েছে এই উপন্যাসটি। হোসেন শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করার আগেই নবদ্বীপ এবং তারপর সমগ্র গৌড়বঙ্গে গুজব ছড়িয়ে যায় যে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। এই গুজব এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা পর্যন্ত শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাজশক্তি ব্রাহ্মণদের দমন করে। এই সময় নবদ্বীপ ছেড়ে বহু ব্রাহ্মণ চলে যেতে থাকে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর অদ্বৈতাচার্য যখন তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন জনমানসে এই চেতনা আরও দৃঢ় হয় যে চৈতন্যদেব একদিন গৌড়বঙ্গের রাজা হবেন। স্বাভাবিকভাবেই হোসেন শাহ বিচলিত হয়ে পড়েন যখন তিনি দেখেন রামকেলীতে এক সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে এমনকি তার দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী দবির খাস ও সাকর মল্লিক গোপনে রাত্রিবেলা সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। যদিও রাজ্যজয় করার মত কোনো প্রথাগত অভিপ্রায় চৈতন্যদেবের মনে ছিল না, তবুও বৃন্দাবন যাওয়ার পথে ভক্তশিষ্য সমেত চৈতন্যদেবের রামকেলিতে আগমন রাজা এবং কিছু রাজপারিষদদের মনে উদ্বেগ তৈরি করেছিল।

ইতিহাস ও কল্পনার নানা মিশেলে চলতে থাকে উপন্যাসটি। চৈতন্যদেবের রামকেলিতে অবস্থানের কয়েকটা দিনে সেখানে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হয়। পাষণ্ডী সম্প্রদায়ভুক্ত নারী পুরুষ চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে ভাসতে থাকে। সহজযানী, অঘোর পন্থী; কাপালিক, নাথপন্থীরাও 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্রে মুগ্ধ হতে থাকে এবং জীবনের অন্য অর্থ খুঁজে পায়। যে নারী সমাজচ্যুত, সমাজ সংসারে কোনোখানেই যার আর কোনো প্রয়োজন নেই চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলন তাকেও কাছে টেনে নেয়। আসলে চৈতন্যদেব ধর্মবিভেদের দিনে মিলনের কথা বলেছিলেন। ধর্ম, শাস্ত্র সংস্কারের নামে মানুষ যখন মানুষকে ঘৃণা করছে, একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন এই ধর্ম সবাইকে মেলাতে চেয়েছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সংযোগ আমরা আজও প্রত্যাশা করি বঙ্গদেশে সেই সংযোগের এই সূচনা।

ভক্তি ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি উপন্যাসটিতে এসেছে রাজনৈতিক চক্রান্ত, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, প্রেম সংঘাতের বহু বিচিত্র কাহিনি। এসেছে সমাজ বিরুদ্ধ প্রেমের কথা, যে প্রেম কোনো ধর্মীয় অনুশাসন মানেনি। ধর্ম, সংস্কারের উপরে প্রেমের অপরাজেয় শাশ্বত রূপ এখানে প্রকাশিত।

একদিকে সুবুদ্ধিরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুগত ও কৃষ্ণদাসী তমসার প্রেম অন্যদিকে সুবুদ্ধি রায়ে কন্যা মালতী এবং হোসেন শাহের পুত্র দানিয়েলের প্রেম। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে গৌড় হোসেন শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রবের স্বপ্ন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যদিও চৈতন্যদেবের ম কোনো রাজ্যজয়ের অভিলাষ ছিলনা। তিনি ক্ষমতার দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা মানুষের মন জ করতে চেয়েছিলেন। নিত্যানন্দকে এই উপন্যাসে চৈতন্যদেব স্পষ্টই বলেন যে তিনি এই সবে থেকে দূরে থাকবেন দরকারে গৌড়, উৎকল দুটো জায়গা ত্যাগ করে বৃন্দাবনে থাকবে কোনো সিংহাসন বা ক্ষমতা চৈতন্যের অভিষ্ট ছিল না। নৃশংসভাবে বিদ্রোহ অবদমিত হ চৈতন্যদেব রামকেলী ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন তার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষে ইতিহাসের এই আবর্তের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে কিছু চিরন্তন জীবনসত্য।

প্রথমত : আধিপত্যবাদী রাজশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ জমা হবেই।

দ্বিতীয়ত : নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষমতা ভোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে।

তৃতীয়ত : যে কোনো দেশে যে কোনো কালেই রণ-রক্ত-সফলতার কাহিনিগুলির সবে প্রেম ভালোবাসার চিরন্তন অনুভূতিগুলি জড়িত হয়ে থাকে।

চতুর্থত : ক্ষমতাবান মানুষ ক্ষমতাহীন মানুষকে শোষণ করে।

পঞ্চমত : জনমানসে এক বিকল্প রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার স্বপ্ন জমা হতে থাকে। এ সর্বোপরি চৈতন্যদেবের জীবনচেতনা পাঠককে এই সত্যের মুখোমুখি দাঁ করায় যে বিদ্বেষ বা বৈরীতার পথ নয় প্রেমের পথই একমাত্র পথ। স্বার্থমুখর হিংসা বিদ্বেষময় সমসময়ে এই চেতনা আরো বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে

দুই

'মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি'

ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা শৈবাল মিত্রের শেষ উপন্যাস *গোর* প্রথাগত ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় যদিও এর ঐতিহাসিক পরিধি বিশাল। এটি আসলে উত্তর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নতুন নিরীক্ষণ। আধুনিক উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে গোরা এখানে মুখোমুখি হয় আরো দুই গোরার। ঘটনাক্রমে কলকাতার অত্যাধুনিক নাইটক্লাবে নিয়মিত যাওয়া আস করা, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলা গোরা পড়তে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের *গোরা*। আখ্যানের মধ্যে দিয়ে সে গোরার আত্মানুসন্ধানের সামনাসামনি হয়। আবার টেলিভিশনের জন্য নির্মীয়মান এক মেগাসিরিয়াল প্রযোজনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। যে সিরিয়াল চৈতন্যদেবের জীবনের উপর নির্মিত হবে, যার নাম গোরা। সিরিয়ালের কাহিনি শুনতে শুনতে গোরা পাঁচশো বছর আগের এক গোরার জীবনসত্যের মুখোমুখি হয়। ইতিহাসের গোরা আজকের গোরার মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার করে তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলে, আবার আজকের গোরাও তার আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা দিয়ে গড়ে তোলে ইতিহাসের গোরার নতুন ইতিহাস। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের যে নিবিড় দ্বিমুখী যোগাযোগ আছে তাকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন

বক। ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে ভাবে উপন্যাসটিতে তৈরি হয়েছে তা দেখে ওয়া যেতে পারে—

প্রথমত : চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনি গোরা ছেলেটির মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার করেছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে নেশা করে আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া নিরর্থক জীবনটাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সে। রেডক্রশ নামক এক সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী হয়ে সে দুর্গত, আর্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখে। আধুনিক ব্যক্তি মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতার খোলসটা খসে যায় তার উপর থেকে। মানুষকে ভালোবাসা এবং বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা খুঁজে পায় সে। নিশ্চিতভাবে এই শিক্ষা তাকে দেয় ইতিহাসের গোরা। এখানে গোরা এক হয়ে যায় পাঁচশো বছর আগের গোরার সাথে। সেজকাকা ত্রিদিবনাথের অনুভবে *পাঁচশো বছর আগের গোরার সঙ্গে কাল থেকে কালান্তর হেঁটে চলেছে আরো গোরা, গোরার মিছিল।*[৪]

দ্বিতীয়ত : গোরার সেজকাকা ত্রিদিবনাথ যখন গোরাকে গোরা সিরিয়ালের কাহিনিটা বলতে শুরু করে তখন এই কাহিনি কোথায় শেষ হবে তা সে ঠিক করতে পারেনি। কাহিনি শুনতে শুনতে তার সঙ্গে গোরা নিজেকে এতটাই জড়িয়ে ফেলেছিল যে শেষে সিরিয়ালের দ্বিতীয় পর্বের শেষ পঞ্চাশটির কাহিনি সে নিজেই নির্মাণ করে। তার মুখ থেকে কাহিনিটি রেকর্ড করে নেয় ত্রিদিবনাথ। ইতিহাসের পর্যবেক্ষক ও শ্রোতা নিজেই হয়ে ওঠে ইতিহাসের নির্মাতা। এটাই রবীন্দ্রনাথের কথায় 'জনমানসের ইতিহাস'। যে ইতিহাস আজকের গোরার ইতিহাস চেতনা ও উপলব্ধির দ্বারা নির্মিত হয়।

ইতিহাস আশ্রয়ী ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে গড়ে ওঠা এই উপন্যাসে কিংবদন্তী, ইতিহাস, [না], তথ্য, আকাঙ্ক্ষা, গণচেতনা সমস্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসের কাহিনিসূত্র [অনু]যায়ী দেখা যায় চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন অথবা দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের সময় তার সঙ্গে [স]াময়িক ভক্তি আন্দোলনের সাধক সন্তদের সাক্ষাৎ হয়েছে। কবীর, নানক, তুকারাম, মীরাবাঈ [এ]নকি পর্তুগীজ শাসক আলবুর্কেকের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হওয়া ঐতিহাসিকভাবে [ক]টা সত্য এ প্রশ্নই এখানে ওঠে না। এ হল ভারতীয় জনমানসে লুকিয়ে থাকা এক তীব্র বাসনা। বাসনার থেকে নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে চেয়েছেন শৈবাল। *শৈবাল তার আখ্যানে যে [ক]ল্পনা ব্যবহার করেছে, তাতে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়া গণচেতনার এই সত্যটিতে [প্রবেশ] করতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি।*[৫]

এই চৈতন্যদেবের মৃত্যু নেই। উপন্যাসের শেষের দিকে তিনি চলে যান আর্যাবর্ত থেকে [উত্ত]রো-পশ্চিমে তক্ষশীলা গান্ধার হয়ে মহেঞ্জোদরো হরপ্পা ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে পশ্চিমে [পা]রস্য উপসাগরে। বৃহত্তর পৃথিবীর টানে, প্রেম প্রচারের তাগিদে। এখানেও মানুষের বাসনারই

স্বীকৃতি। অর্থাৎ জনমানসের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে উত্তর ঔপনিবেশিক বঙ্গের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন লেখক। আবার এই ইতিহাসের মধ্যে সুকৌশলে রহস্যময়তা তৈরি করে পাঠকের উৎকণ্ঠাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আগাগোড়া। চৈতন্যদেবের জন্মের যে কাহিনিটি আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেই আছে প্রথা বিরোধী চৈতন্যদেবের চেহারা ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের লেখককৃত এক ব্যাখ্যা। গোরাকে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান হিসাবে দেখাতে চাননি লেখক। এই জন্য শ্রীহট্টে বীর বুরহানুদ্দিনের দরগায় অলৌকিক গর্ভধারণের কাহিনিটি উল্লেখিত হয়েছে। ধর্ম, জাতি তুচ্ছ করে যে মহামিলনের ব্রত চৈতন্যদেব বহন করেছিলেন সারা জীবন সেই মহামিলনের ক্ষেত্র উপন্যাসের মধ্যে তার জন্মসূত্রেই রোপিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গোরা যখন তার জন্ম পরিচয় জানতে পেরেছিল তখন একইভাবে এই মহামিলনের ক্ষেত্রটি তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আর আজকের গোরা যখন আধুনিক জীবনে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, সুখহীন তখনই তার পরিচয় এই দুই গোরার সঙ্গে যে তাকে ঐতিহ্যের সন্ধান দিল শুধু না মহামিলনের ব্রতটি তার জীবনেও প্রতিষ্ঠা করে দিল। *আধুনিকতার কলকানি আর গাঢ় অন্ধকার, গ্রাস গ্রাস খেয়ে যখন তার একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে তখনই তার নামের দুই গোরাকে ঐশী আর সেজকাকা এনে হাজির করে দিতে, কোথা থেকে যেন কি ঘটে গেল। পুরোনো দিনের একজোড়া গোরার সঙ্গে নিজের যোগসাজশ খোঁজার তাগিদ বোধ করল।"* উপন্যাসটি জুড়ে এই যোগসাজশের নানা খেলা চলতে থাকে। আর পাঠক একালের সঙ্গে ফেলে আসা কালের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগকে উপলব্ধি করে চলে।

এই যে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবন নিয়ে গড়ে ওঠা আখ্যান এর সঙ্গে ইতিহাসেরও এক নিবিড় যোগ আছে। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ডি. ডি. কোসাম্বি স্মারক বক্তৃতায় ইতিহাস ও আখ্যানাবলির এক নিবিড় সম্পর্কের কথা জানিয়েছিলেন এবং আখ্যানাবলির মধ্যে দিয়ে ইতিহাস নির্মাণের এক নতুন পদ্ধতি তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ ইতিহাস যেমন আখ্যান নির্মাণ করে আবার আখ্যানের দ্বারাও ইতিহাস নির্মিত হয়। একটি মানুষের জীবনকে কেন্দ্রে রেখে নির্মিত আখ্যানগুলির প্রত্যেকটিই আখ্যানকারের ইতিহাসবোধ ও জীবনবোধের পরিচয় বহন করে। শৈবাল মিত্রের *গোরা* তেমনই চৈতন্যদেবের জীবন এবং লেখকের জীবনবোধ নিয়ে গড়ে ওঠা একটি আখ্যান। যেখানে সময়কে ধরা হয়েছে, সাময়িকতাকে নয়। শিল্পকে মানুষ শুধু ভোগ করতে চায়না তার কাছে মানুষের এক গোপন দাবী থাকে। শিল্পকে মানুষ গ্রহণ করতে চায়। *গোরা* সেইভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

সমস্ত মানুষকে মান্যতা দেওয়ার, দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করার এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলিত করার যে মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে চৈতন্যদেব এসেছিলেন, মানবসভ্যতায় সেই কাজ আজও পরিপূর্ণতা পায়নি। উপন্যাসে গোরা বলেছে কৃষ্ণই রাম, ও রহিম। পাঁচশো বছর পেরিয়েও এই প্রকৃত সত্য কতজন উপলব্ধি করতে পারে? স্বার্থমগ্নতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যেভাবে মানবসভ্যতাকে ক্লান্ত করে চলেছে সেখানে এই গোরা বারবারই প্রাসঙ্গিক। আজকের আমির সঙ্গে সেদিনের সেই মানুষের অখণ্ডতার এই উপলব্ধিও বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তিন

'অখণ্ড আপনার অনুসন্ধান'

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের *পানিহাটা* উপন্যাসে একটি অঞ্চলের ইতিহাস ও ব্যক্তিমানুষের ইতিহাস একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেছে। মানুষ তার চিন্তাস্রোতে ধারণ করতে পারে এক সুবিশাল কালখণ্ডকে এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দধীচী তেমনই এক বৃহৎ কালসীমার মধ্যে মানসিকভাবে যাতায়াত করেছে। উপন্যাসের সূচনায় একটি মৃত্যুসংবাদ দধীচীকে নিয়ে ফেলে অতীতে এবং তারপর থেকে ক্রমশ অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন শুরু হয়। পানিহাটা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিবর্তন, অঞ্চলসংপৃক্ত মানুষগুলোর মানসিকতার পরিবর্তনের আখ্যান কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো স্মৃতিচারণার মাধ্যমে বলতে বলতে আসলে লেখক এক অপরিবর্তনীয় জীবনসত্যে পৌঁছতে চান।

পানিহাটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ের স্রোত বয়ে চলে উপন্যাসটিতে। যেমন উপন্যাসের শুরুতে দধীচীর দৃষ্টি পড়ে ক্যালেন্ডারের পাতায় এই পাতা থেকে পাঁচশো বছর আগের এক সময়ের কাছে টেনে নিয়ে যায়। সে সময় পানিহাটা অঞ্চলে এক বুধবারে চৈতন্য মহাপ্রভুর বজরা এসে ভিড়েছিল। আবার টেলিফোন বেজে উঠতেই দধীচীর কাছে এই খবর এসে পৌঁছায় যে আটবট্টি বছরের রিটায়ার্ড অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ মারা গেছে। এই ঘটনার সূত্রে দধীচীর মনে পড়ে কয়েক দশক আগে পানিহাটার উজ্জ্বল কৃতি ছাত্র জ্যোতিপ্রসাদের কথা। তখনও পানিহাটা শহর হয়ে ওঠেনি, মফস্সল অঞ্চল। তখনকার মফস্সল অঞ্চলের চেহারাটা জেগে ওঠে দধীচীর চেতনায় পাশাপাশি ওই অঞ্চলে কিশোর থেকে যুবক হয়ে ওঠার নানা ঘটনা তার মনে এসে ভিড় করে। স্মৃতির থেকে বর্তমানে ফিরে আসে দধীচী তার মনে হয় আগামী পরশু ছোটো ছেলে সুপ্রকাশ চলে যাবে তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে অথচ সাংসারিক প্রয়োজনের বহু কথা এখনো বলাই হয়নি তার সঙ্গে। দধীচী এসে পড়ে তার বর্তমান পারিবারিক বৃত্তে। অর্থাৎ পর পর তিনটি সময়ের কথা দধীচীর চিন্তাস্রোতের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের প্রথমেই তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি সময় হল—

এক : চৈতন্যদেবের পানিহাটায় বজরায় করে আগমনের সময়।
দুই : দধীচীর কিশোর ও যুবক বয়সের মফস্সল পানিহাটা।
তিন : সাম্প্রতিক কাল।

সাধন দেখিয়েছেন একটি অঞ্চলের-সময়গুলো বদলে যাচ্ছে অথচ সেই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মানুষের ক্ষমতা দখলের লড়াই অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এক সময় এই অঞ্চলে ছিল দুই সম্প্রদায়ের অর্থাৎ বৈষ্ণব ও শাক্তদের বিরোধ আর এখন তা রূপান্তরিত হয়েছে দুই রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দখলের বিরোধে। দধীচী ভাবে *নবদ্বীপে যখন গৌরাঙ্গ হইহই মাতিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছেন ভক্তিভাবে, কৃষ্ণচন্দ্র আগমবাগীশ তন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিরোধী হয়ে উঠছেন। আজও তাই। দশটা বছর আগেও পানিহাটায় যে গোলকেশ ভট্টাচার্য লালপার্টিও একচ্ছত্র শক্তির কেন্দ্র, আজ তিনু ঘোষ ক্ষমতার শাখাপ্রশাখা নিয়ে পানিহাটির সবুজ পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে সকল সমস্যা দেখভালের উপযুক্ত ব্যক্তি।*

পাশাপাশি সাধন এটাও দেখিয়েছেন যে ঐতিহ্য কীভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত হয়। মানুষের ইতিহাস চেতনা ও বোধের অভাবে তাদের নিজস্ব শিকড় কখনো ক্ষয়ে যেতে থাকে। এইরকম অন্তত তিনটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়—

> প্রথমটি, পানিহাটা অঞ্চলে মাত্র দেড়শো বছর আগে এগারো বছরের রবীন্দ্রনাথ এসে কাটিয়ে গিয়েছিলেন তার মুগ্ধ কৈশোরের কয়েকটা দিন। সেই ছাতুবাবুর বাগানবাড়ি হাত বদলে বদলে কোনো এক আমলে অনাথ আশ্রম হয়। হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পরও মানুষের উদাসীনতা ঘোচে না। পাড়ার লোকেরাও চায় এটা অনাথ আশ্রমই থাকুক।
>
> দ্বিতীয়টি, পানিহাটা অঞ্চলের বাসন্তীসুতোকল যা বহুকাল জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। *রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে উদ্বোধন করেছিলেন, সভাপতি হিসেবে পাশে বসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।*[৯] এখন তা আগাছা ও জঙ্গলে ভরা পরিত্যক্ত।
>
> তৃতীয়টি, পানিহাটা অঞ্চলের বৈষ্ণব পাটবাড়ি। যা এখন চলে এসেছে ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে পুরোনো বৈষ্ণব সংস্কৃতির চিহ্নগুলো মুছে এসেছে।

এই সমস্ত ইতিহাস নিতান্ত তথ্যসার হয়ে থাকেনি। ব্যক্তিচেতনার আলোতে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। উপন্যাসটিতে পাঁচশো বছর আগের বৈষ্ণব কেন্দ্র পানিহাটার চৈতন্যদেবের আগমনের যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও তথ্যবস্তুর অসম্পূর্ণতা দূর হয়েছে, নির্মিত হয়েছে রসজগত। *রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি সেখানে এসে ঠেকে যায়, রসজগতের সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয়না।*[১০] তাই এই উপন্যাসে চৈতন্যদেব, গদাদেবী, রাঘব, নিত্যানন্দ, রঘুনাথ, মকরধ্বজ লেখকের প্রাণের স্পর্শে তাঁর চিন্তা, ইতিহাস চেতনার দ্বারা জারিত হয়ে ইতিহাসের জগত থেকে মনোজগতে স্থান পেয়েছে।

কিছু কিছু অঞ্চলের প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া নাম (যেমন শিয়ালদা, শিবাদহ), হারিয়ে যাওয়া রাস্তাঘাটের বর্ণনা দিয়ে লেখক উত্তর ঔপনিবেশিক বঙ্গজীবনের ইতিহাস ও জীবনচিত্র রচনা করেছেন।

দধীচীর পরিবার জীবন, তার সমাজজীবন এবং সেই সমাজের ইতিহাস এই তিনটি স্তরের দ্বন্দ্ব ও মিলনে এগিয়ে চলে উপন্যাসটি। অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে একটা মানুষ পিছনের দিকে তাকাচ্ছে, ঘটনা ধারার বিশ্লেষণ করছে, কখনো আত্মবিশ্লেষণ করছে। এক বিস্তীর্ণ কালপরিসরের মধ্যে এক ব্যক্তিমানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে চাইছে। পানিহাটা সেই উপলব্ধির উপন্যাস।

লেখক এই উপন্যাসে দধীচীর চেতনায় প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক পানিহাটার জনজীবনকে একতারে বেঁধেছেন। প্রাক-ঔপনিবেশিক আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার সঙ্গে এর তফাৎ আছে। এই ধরনের ইতিহাসচর্চায় ব্যক্তি অনুভব গুরুত্ব পায় না। দধীচীর চোখের সামনে পানিহাটা অঞ্চল এবং সেই অঞ্চল সংলগ্ন মানুষদের জীবনধারা খুব দ্রুত বদলে গেছে। এই স্রোতের মধ্যেই পরিবর্তনহীন জীবনসত্যকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন লেখক।

চার

'ওই মহামানব আসে'

রাজপাট-ধর্মপাট, *গোরা* এবং *পানিহাটা* তিনটি উপন্যাসকে আমি এক সারিতে ফেলতে চেয়েছি কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে চৈতন্যদেব এই তিনটি উপন্যাসেরই অন্যতম চরিত্র। তিনটি উপন্যাসেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে লেখকের জীবনচেতনা ও জীবনবোধের এমন প্রকাশ ঘটেছে যে তার মধ্যে দিয়ে মানবজীবন পরিচয় সমগ্রতা লাভ করতে পেরেছে। এবং তিনটি উপন্যাসই উত্তর ঔপনিবেশিক বঙ্গজীবন ভাবনা ও চর্চার সম্ভাবনাগুলোকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেছে।

> *মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে, সে একটা মানবজগৎ বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারি। সে হল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প-বলো' সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো একটা মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি।*[১১]

তিনটি উপন্যাস পাঠ করে তিনটি ভিন্ন দিক থেকে আমরা এই মানবপরিচয়ের মুখোমুখি হই। যা শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ হয়ে থাকেনি।

উত্তর ঔপনিবেশিক বঙ্গজীবনে প্রথম গণজাগরণ এনেছিলেন যে ব্যক্তি সে আজ শুধু প্রথাগত ইতিহাসের গণ্ডীতে থাকতে পারেন না সমাজ মানসে তার নতুন বীক্ষা হবেই। আধুনিক লেখকের জীবনদর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তি জীবন উপাদান মিলিয়ে নতুন বয়নকর্মের মধ্যে দিয়ে সেই বীক্ষা সম্ভব হয়েছে। ফলত এগুলো প্রথাগত ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে থাকেনি। বিশেষভাবে নিজেকে জানা ও অখণ্ড নিজের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। প্রথাগত গবেষণার বাইরে সৃষ্টিশীল মানুষের হাতে এই ধরনের প্রচেষ্টার সার্থকতাও এখানে। যে মানুষটি এক স্থবির সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সচল করে তুলেছিল তাঁর ঐতিহ্যকে শুধু ভোগ করে নয়, তাকে নিয়ে সৃষ্টি করে যে তাকে 'পাওয়া' সেটাই আসল 'পাওয়া'।

সূত্র নির্দেশ ও মন্তব্য :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৪৮৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকে বঙ্গের ইতিহাস সাধনাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির এক অংশে ছিল এইরকম—

"এখন আমরা মোগল রাজত্বের মধ্য দিয়া পাঠান রাজত্ব ভেদ করিয়া সেনবংশ পালবংশ গুপ্তবংশের জটিল অরণ্যের মধ্যে পথ করিয়া পৌরাণিক কাল হইতে বৌদ্ধকাল এবং বৌদ্ধকাল হইতে বৈদিক কাল পর্যন্ত অখণ্ড আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি।" নিজের ইতিহাস সন্ধান রবীন্দ্রনাথের কথায় 'অখণ্ড আপনার অনুসন্ধান'।

৩. "মধুপর্ণী, মালদা জেলা সংখ্যাতে (১৯৮৫) অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাসের লেখা 'মালদহে শ্রীচৈতন্য' নামে লেখা একটি ছোট প্রবন্ধ আছে। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে রাজা হোসেন শাহর হিন্দু অমাত্যদের মধ্যে কি কোনো উচ্চাশা অঙ্কুরিত হয়েছিল, প্রবন্ধটি কুড়ি বছর আগে আমাকে ঈষৎ আলোড়িত করেছিল।...তখন ভেবেছিলাম এই বিষয় নিয়ে একটি গল্প লিখব।"

—অভিজিৎ সেন রাজপাট ধর্মপাট (প্রাককথন), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

৪. শৈবাল মিত্র, *গোরা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৬২৩

৫. ঐ, মুখবন্ধ, পৃ. ৯

৬. ঐ, পৃ. ৫৪

৭. এই নতুন পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায় রোমিলা থাপারের *আখ্যানাবলী* ও *ইতিহাসের* নির্মাণ বইটিতে। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :
রোমিলা থাপার, *আখ্যাবনাবলী* ও *ইতিহাসের নির্মাণ,* নূপুর দাশগুপ্ত অনূদিত, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮

৮. সাধন চট্টোপাধ্যায়, *পানিহাটা,* কলকাতা, করুনা প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ১২৮

৯. ঐ, পৃ. ১২৮

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের পথে,* 'তথ্য ও সত্য', চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৭, পৃ. ৫৭

১১. ঐ, সাহিত্যের তাৎপর্য, পৃ. ১৫২

প্রসঙ্গ শূন্যপুরাণ

আনন্দ ভট্টাচার্য

শূন্যপুরাণ সম্পাদনায় প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হল গ্রন্থকারের পরিচয় সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে একথা বলা আবশ্যক "ধর্ম্মঠাকুরের পুথি পড়িতে গেলেই একজনের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রামাই পণ্ডিত।" তাঁকে ধর্ম্ম পূজার আদিগুরু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন "বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্মপূজার প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্ম্মপালের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।"[২] কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা পরবর্তীকালের গ্রন্থকারদের আলোচনা থেকে কিছুই জানা যায় না যে তিনি বাইতি জাতীয় ছিলেন কি না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজেকে দ্বিজ বলে চিহ্নিত করেছেন। এমনকী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেই স্বীকার করতেন যে রামাই পণ্ডিত দ্বিজ ছাড়া অন্য কিছু নন, অর্থাৎ তিনি নিজেকে অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করেননি।

শূন্যপুরাণ থেকে ধর্মপূজার চারজন প্রধান পুরোহিতের কথা জানা যায় যার মধ্যে রামাই পণ্ডিত একজন। এই চারজনের প্রথম ছিলেন সেতাই বা শ্বেত পণ্ডিত, যাঁর অধীনে ৪০০ শত গতি, দ্বিতীয় হলেন নীলাই পণ্ডিত, যাঁর আওতায় ৮০০ শত গতি, তৃতীয় জন হলেন কংসাই পণ্ডিত। কংসাই পণ্ডিতের আওতায় প্রায় ১২০০ গতির কথা জানা যায়। চতুর্থ জন ছিলেন রামাই পণ্ডিত। রামাই-এর নেতৃত্বে ১৬০০ গতি ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন রামাই চতুর্থ বা শেষ পণ্ডিত বলে চিহ্নিত হলেও তাঁকে প্রধান বলেই দাবি করা হয়।

রামাই পণ্ডিতের জন্মবৃত্তান্ত ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে বারো মাইল পূর্বে ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুর বিদ্যমান। তাঁর সেবাইত ধর্মপণ্ডিতের কাছ থেকে পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ যে বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন তার মূল বক্তব্য হল রামাই পণ্ডিত জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং অব্রাহ্মণ বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাকে তিনি ভ্রান্ত ধারণা বলে ব্যাখ্যা করছেন। রাঢ় বাংলায় দ্বারকাপুরী নামক স্থানে বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের ওপর ধর্মঠাকুরের রোষ আরোপিত হওয়ায় তাঁকে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে সস্ত্রীক বনবাসে আসতে হয়েছিল। সেই বর্ফময় হিমালয় প্রদেশে বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি ভরণী নক্ষত্রে রবিবার শুভদিনে রামাই জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে রামাই-এর বাবা মারা যাওয়ায় তাঁকে এক অনাথ বালক লালনপালন করেন। এই অনাথ বালকের অন্যান্য পরিচয় না পাওয়ায় পদ্ধতিকার তাঁকে ধর্মঠাকুর বলে নির্দেশ করেছেন। রামাই-এর এই পালক পিতা জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণধর্ম বিরোধী ছিলেন। রামাইকে ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক দীক্ষা না দিয়ে তার পরিবর্তে তাম্রদীক্ষা দিলেন। তাম্রদীক্ষা বলতে ব্রাহ্মণ সমাজে যেরূপ উপনয়নের প্রচলন আছে। ডোমপণ্ডিত বা ধর্মপণ্ডিতদের

মধ্যে সেরূপ তাম্রদীক্ষার প্রচলন আছে। সাধারণত বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে তাম্রদীক্ষার প্রচলন আছে। তাম্রদীক্ষার নামে চূড়াকরণ, গনেশাদির পূজা ঘটস্থাপন, শ্রাদ্ধ, পঞ্চশত হোম প্রভৃতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাম্রদীক্ষার পর সেই ধর্মপণ্ডিত নিম্নশ্রেণির কাছে ব্রাহ্মণের মতো সম্মানলাভ করে থাকে এবং যারা তাম্রদীক্ষাপ্রাপ্ত হন তাঁরা ধর্মঠাকুরের পূজার অধিকারী হন। অবশ্য যে কোনো লোক তাম্রদীক্ষার অধিকারী হন না, একমাত্র রামাই পণ্ডিতের বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরাই তাম্রধারণের অধিকারী ও পণ্ডিত হওয়ার যোগ্য। নিম্নশ্রেণি, বিশেষ করে, ডোমের ঘরে শ্রাদ্ধ ও বিয়ে প্রভৃতি কাজে এই ধরনের ধর্মপণ্ডিতেরাই পৌরোহিত্য করে থাকে।

এই তাম্রদীক্ষার পর রামাই ধর্মপূজায় অধিকারী হলেন। ময়ূরভট্ট প্রভৃতির ধর্মপুরাণ বা ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায়, রামাই নিজে পূজাপ্রভাবে এতদূর হয়েছিলেন যে দেবলোক ও নরলোকে সকলেই তাঁকে ভয় করে চলতে থাকে। আরও জানা যায় যে তিনি নিজে ধর্মমত স্থাপন উন্নীত করার উদ্দেশে ও বংশরক্ষার জন্য কেশবতী নামে এক কন্যাকে বিয়ে করেন। এই মহিলার জাত-কুল সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন ওঠায় তাকে ধর্মের দক্ষিণচরণসম্ভূতা অযোনিসম্ভবা বলে ঘোষণা করেছিলেন। যাই হোক না কেন, এই পুত্রই ধর্মদাস বলে পরিচিত। রামাই একথাও নির্দিষ্ট করে যান যে ধর্মদাসের বংশই একমাত্র ধর্মপূজার অধিকারী এবং অন্য কেউ যদি পূজা করে তাহলে ধর্ম নিরঞ্জন সন্তুষ্ট হবে না। বোঝা যাচ্ছে যে ধর্মপূজা রামাই পণ্ডিতের বংশধরেরা একচেটিয়াভাবে পালন করত। এমনকি রামাই পণ্ডিতের বংশবিস্তার ঘটলে এবং তার দরুণ অনেকেই ধর্মপণ্ডিত হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করতে থাকায় ধর্মদাসের বংশধরগণ নিজস্ব বংশপত্রিকা ও কুলপরিচয় রক্ষা করতে থাকেন। ধর্মপণ্ডিতদের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন যে যতদিন ধর্মদাসের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন তাঁরা ধর্মপূজার প্রচলন নিজেদের বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। যার ফলে ধর্মপণ্ডিতগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপূজার বিস্তৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে কারণে তাদের ওপর ধর্মপণ্ডিতরা বিশেষ সন্তুষ্ট থাকায় যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতিতে শোনা যায়—

"অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ধর্মে মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই।।

রামাই পণ্ডিতের আশীর্বাদে কর্ণসেন পত্নী রঞ্জাবতী পুত্রলাভ করে ধর্মপূজার প্রচলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত করেন।

কিন্তু রামাই পণ্ডিত কোন্ ধর্মপালের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সে সময়ে গৌড়বঙ্গের ধর্মনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তা ব্যাখ্যা করতে গেলে 'গুপ্ত বারাণসীর' কথা বলতে হয়। এই স্থানটি আবার চাঁপাই বলে পরিচিত। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায়

"বহিছে কালিন্দী গঙ্গা, প্রবল তরঙ্গভঙ্গা।
বহিপুর রাখে রাজবাটি।
ধর্মজয় বলি ডাকে, রম্যপুর যাস্যে থাকে,
কাম্যদহে বলে জল বাটী।।
ব্রহ্মদহ রাখি দূরে, ঝুমঝুমি ঝারিকেশ্বরে,
বেযে পাইল চাঁপায়ের ঘাট।

নারদ কপিল তবে, কতকাল ছিল জপে
মহামুনি দুর্বাসার পাট"।।

চাঁপাই বলতে এখানে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাই পণ্ডিতের আশ্রমের কথা বলা যেতে পারে। গৌড়বঙ্গের যত ধর্মঠাকুর আছে, যাত্রাসিদ্ধি রায়ের সম্মান সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। অব্রাহ্মণ চণ্ডালদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে পূজ্য। এই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত বংশ ডোমপণ্ডিতরা আজও নিজেদেরকে রামাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া গৌরব করে থাকেন। তাঁদের মাধ্যমেই রামাই পণ্ডিতের পূর্ব-পরিচয়, যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতি বা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ পাওয়া গেছে। ধর্মঠাকুরের ভক্তদের কাছে চাঁপাই চাঁপাতলার ঘাট বলে পরিচিত। সুতরাং এই চাঁপাই বা চাঁপাতলার ঘাট যে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি পয়ার-ত্রিপদীতে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মঠাকুর বিষয়ক যে সকল রচনা আলোচিত হয়েছে তা হল, সৃষ্টিপত্তন, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপূজাবিধান। ধর্মপুরাণের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি হল হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি, যমপুরাণ, মার্কণ্ডপুরাণ, শিবপুরাণ ও অজপুরাণ। সর্বত্রই ভণিতা রামাই পণ্ডিতের। ধর্মপূজাবিধানের এক বিরাট অংশ রঘুনন্দনের সৃষ্টি বলে দাবি করা হয়েছে। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়* অবশ্য সৃষ্টি পত্তন অংশকেই শূন্যপুরাণ বলে দাবি করছেন। তিনি মূলত পুরোনো বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন।

শূন্যপুরাণের মূল পুথি উদ্ধার করা যেমন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তেমনই বর্তমান সম্পাদকের পক্ষে দেখার সুযোগ ঘটেনি*। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক শূন্যপুরাণের প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে ড: শহীদউল্লাহ ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু অবশ্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত তিনটি পুথির সাহায্যে শূন্যপুরাণ সম্পাদনা করেন এবং পরিশিষ্টে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' সংযোজন করেছেন। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে উদ্যোগী যে নগেন্দ্রনাথ বসুর শূন্যপুরাণের পাঠ যথার্থ নয়। তিনি বরং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি সুকুমার সেনও নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত শূন্যপুরাণকে খুব একটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না। আসলে নগেন্দ্রনাথ বসু বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের ওপর বেশি নির্ভর করে শূন্যপুরাণের সম্পাদনা করার অনেক ভ্রান্তি সহজেই চোখে পড়ে। এছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল সংক্রান্ত আলোচনা পাঠকসমাজকে নতুন চিন্তাভাবনার সুযোগ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে বিনয়চন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধ* আলোচনার দাবি রাখে, অর্থাৎ তাঁর সময়কাল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বোঝা সম্ভবপর।

নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের নামের অন্তরালে একাধিক কবির রচনা লুকিয়ে আছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শূন্যপুরাণে তিনটি স্তর এবং পাঁচজন কবির হস্তাবলেপ খুঁজে পেয়েছেন*। ডা: শহীদউল্লাহর মতে শূন্যপুরাণ আদিম আকারে রামাই রচিত দ্বিতীয় স্তরে নাথ ও ইসলামী প্রভাব

এবং তৃতীয় স্তরে কিছু অর্বাচীন রচনা ও সংস্কৃত শ্লোক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।[৭] সুকুমার সেন ছাড়াও আশুতোষ ভট্টাচার্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসবিদরা রামাই পণ্ডিতের রচনায় একাধিক লোকের হস্তক্ষেপ দাবি করেন[৮]। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় এরকম দু-একটি প্রমাণ হাজির করেছেন[৯]।

রচনাশৈলী বা কাব্যদেহ নির্মাণেও ভাষাভঙ্গীর বিচারেও শূন্যপুরাণে একাধিক রচয়িতা ও ভিন্নকালের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'অথ বারমাসি' অংশ প্রাচীন রচনা, 'সৃষ্টিপত্তন'-ও প্রাচীন। কিন্তু 'অথ বেড়া মনুই' অংশ কোনক্রমেই বারমাসি বা সৃষ্টিপত্তনের মত প্রাচীন হতে পারে না। রচনাগুলিতে ব্যবহৃত মিল, শব্দ, উপমাদি থেকে এরূপ ধারণাই জন্মে। যদিও নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামাই পণ্ডিতকে গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সমসাময়িক বলে দাবি করেছেন কিন্তু ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় শূন্যপুরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে রামাই পণ্ডিতকে দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক বলছেন। এমনকী ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের দিক-নির্ণয়ের ওপরও সন্দেহ পোষণ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে শূন্যপুরাণের সম্ভাব্য রচনাকাল বলে মনে করেন।[১০] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শূন্যপুরাণের তিনটি স্তর কল্পনা করে তাদের রচনাকাল যথাক্রমে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ, পঞ্চদশ-ষোড়শ, ও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেছেন[১১]। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শূন্যপুরাণটির রচনা আরম্ভ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এতে সংযোজন ঘটেছে। এর প্রাচীনতম অংশ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এবং নবীনতম অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। সুকুমার সেন অবশ্য শূন্যপুরাণের ভাষা-বিচারে এর প্রাচীনতা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত টেনেছেন, তার অধিক নয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর আলোচনায় রচনাকাল বা লিপিকালের সন্ধান পাওয়া যায় না[১২]। আবার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাপ্ত পুথি থেকে অর্জুন কর্মকার নামে এক লিপিকারের কথা জানা যায়।

শূন্যপুরাণে 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' কালিমা জালাল নামে ধর্মপূজাবিধানের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত পুথির ভিত্তিতে এই অংশ রামাই বিরচিত বলে ভণিতায় চিহ্নিত হয়েছে। শূন্যপুরাণে প্রাপ্ত চরণ থেকে শূন্যপুরাণ ও ধর্মঠাকুরের যোগের কথা উপলব্ধি করা যায়। এই অংশ সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছেন সেই সময় যবনরূপী ধর্ম আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুকুমার সেন এক্ষেত্রে মতামত দিতে গিয়ে বলছেন ফিরোজ শাহ তুঘলক তার রাজত্বের শেষদিকে যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' তারই স্মৃতিবহ[১৩] (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড)। পাল বংশের আমল থেকে বাংলার বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছিল। সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রসার ও প্রচার চলেছিল এবং বৌদ্ধ নিপীড়নের পটভূমি 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন "ধর্ম নিরঞ্জনের উপাসনায় ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ ও কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল...ধর্ম নিরঞ্জনের সঙ্গে ইসলামী একেশ্বরবাদের তত্ত্বগত সাদৃশ্যের জন্য মুসলমান সমাজ ও ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল"[১৪] অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাব যেমন ধর্মঠাকুরে পড়েছে, মুসলমান সমাজও তেমনি ধর্মকে স্বীকার করতেন।

জহর সরকার তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায়[১৫] রামাই পণ্ডিত, শূন্যপুরাণ ও ধর্মঠাকুর বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার উন্মোচন করেছেন। জহর সরকারের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা দেশি, বিদেশি ঐতিহাসিকদের কাছে নিঃসন্দেহে এক তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা। তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যায়ক্রমে আলোচিত হবে। বেশ কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদের ধর্মমঙ্গল, ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো। তাঁদের আলোচনা শূন্যপুরাণের মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এক কথায় বলা যেতে পারে জহর সরকারের সাম্প্রতিক গবেষণা শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিত ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে এমন বেশ কয়েকটি নূতন প্রশ্নের অবতারণা করেছে, যা আধুনিককালের অন্য কোনো আলোচনায় দেখা যায় না।

শূন্যপুরাণের মূল বিষয়বস্তু মুহম্মদ শহীদউল্লাহ্ তাঁর ভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন। বৌদ্ধদের ওপর আক্রমণের চিত্র স্পষ্টতই ধরা পড়ে। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলেমিশে যাওয়ায় এবং তাদের প্রভাব উভয় সম্প্রদায়ের আচার-আচরণে থেকে যাওয়ায় বেশ কিছু বেদাতি ফকির বা ন্যাড়া ফকিরদের উদ্ভব হয়েছিল। এমনকি নাথপন্থীদের ওপরও প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এই প্রভাবের কিছুটা ইঙ্গিত যেমন কল্যাণী মল্লিকের আলোচনায়[১৬] দেখা যায় তেমনই ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়[১৭]এ তার আভাস মেলে। কিন্তু নাথতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মপূজার সেরকম কোনো সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মপূজার প্রধান কেন্দ্র হল হুগলির অন্তর্গত জাজপুর যার কথা রামাই পণ্ডিত তার আলোচনায় করেছেন। রামাই পণ্ডিতকে অনুসরণ করে শহীদউল্লাহ্ বলছেন এমনকি পুথিগুলিও পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া গিয়েছিল।

ধর্মপূজায় মুসলমানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুহম্মদ শহীদউল্লাহ্ "শ্রীনিরঞ্জনের রাম্মা"-র প্রসঙ্গ এনেছেন। "মুসলমানের খোদা ও ধর্ম, মুহম্মদ ও ব্রহ্মা, পেগাম্বর (পয়গম্বর) ও বিষ্ণু, আদম ও শিব, চণ্ডিকা, নূর বিবি (পাতিমাহ্) ও পদ্মাবতী, গাজী ও গনেশ...এক করা হইয়াছে।" শূন্যপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে লক্ষ্য করা যায়। নাথধর্মে যে সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাও অনেকাংশে শূন্যপুরাণের সঙ্গে মেলে।[১৮] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল সমাপ্ত করেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ দত্তের মতে এর রচনাকাল ১৫৬৭ বা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ। আবার বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৫৮৭ থেকে ১৭৪৮[১]খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও সময় এটি সমাপ্ত হয়েছিল। শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সৃষ্টিতত্ত্ব তুলনা করলে এ বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে অনেক পৌরাণিক ও দার্শনিক ব্যাপারে ধর্মসম্প্রদায়ের কথা মূল সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। চার্লস ইলিয়ট শূন্যপুরাণের ধর্ম বা নিরঞ্জনের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন "The Dharma or Niranjana of the Sunnya Purana seems to be equivalent to Adibuddha"[১৯] এই সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও তিব্বতে প্রসারিত হয়েছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের কথা প্রচার করেন এবং এটিকে 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি' নামে অভিহিত করেন। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসু এর নামকরণ করেন আসামপুরাণ, যদিও তা

শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত।[১০] তিনি লেখক হিসেবে যে কয়েকটি নাম উচ্চারণ করছেন তা হল শ্রীযুত আমাই, রামাই পণ্ডিত, পণ্ডিত রামাই, পণ্ডিত রাম, শ্রীরাম পণ্ডিত, দ্বিজরামাঞ্চি? তিনি যে ধর্মপূজার প্রবর্তক তাও তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তবে নগেন্দ্রনাথ বসু বলছেন রামাই চতুর্থ। সত্য যুগে সেতাই, ত্রেতা যুগে নীলাই, দ্বাপরে কংসাই এবং কলিযুগে রামাই। শূন্যপুরাণের তৃতীয় স্তর খুব সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত। শূন্যপুরাণে কিন্তু অনেক বিষয়ে পৃথক বিবরণ আছে। এমনকি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় রামাই পণ্ডিতকে এই ধর্মের 'প্রথম ও প্রধান পুরোহিত' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি আরও বলছেন ময়ূরভট্ট সর্বপ্রথম ধর্মমঙ্গলের গান রচনা করেন। একাধিক পুথির ওপর ভিত্তি করে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মতামত ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি নগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে একমত যে শূন্যপুরাণে বিবিধ কালের রচনা স্থান পেয়েছে। রামাই পণ্ডিতের জীবনীর সঙ্গে ধর্মপূজার পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন ও রামাই পণ্ডিতকে দশম শতাব্দীর লোক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান।

শূন্য-পুরাণ বাংলা ভাষার একখানি আদিগ্রন্থ। তাঁর সময়কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এ বক্তব্য মেনে নেওয়া হয় যে একাদশ শতাব্দীর গৌড়রাজ ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য মেনে নিলে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে 'বোধহয় বাঙ্গালা ভাষায় এত পুরোনো পুস্তক আর পাওয়া যায় নাই'। শূন্য-পুরাণ পুথি অবস্থায় দু-খণ্ডে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। শূন্য-পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনই এর ভাষা কোন্ অঞ্চলের সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে বলে এটা যে রামাই পণ্ডিতের লেখা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে নগেন্দ্রনাথ বসু বলছেন "শূন্য-পুরাণের পুঁথিখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে।...স্থানে স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দাঁড়াইয়াছে যে কোনখানি আদর্শ ও কোন্খানি নকল তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব"। যেহেতু সব কয়েকটি কবিতার শেষে রামাই পণ্ডিতের নাম আছে সেকারণে রামাই পণ্ডিতকে শূন্য-পুরাণের রচয়িতা বলে দাবি করা যেতে পারে।

শূন্য-পুরাণের ছন্দ ও শব্দের বানান, যেমন, হিসটি, ভূমিসৃটি, বম্মা, বিস্রাম, ত্রিপণী, একক্ষর, মিত্তিকা, পচ্চিম ইত্যাদি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এটি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের লেখা। সাধারণত নিম্নবর্ণের গায়কেরা ধর্মের গান গেয়ে থাকেন। এমনকি এ কথাও বলা হয়ে থাকে 'এক সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, রামাই পণ্ডিতের এই গ্রন্থখানি যখন ধর্মপণ্ডিতগণের নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়তো কেহ সাহসী হন নাই। কিন্তু এখন নানা স্থানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে'। নগেন্দ্রনাথ বসু রামাই পণ্ডিতকে ন'শত বছরের পুরোনো লেখক বলে দাবি করেন। আরও বলছেন যে শূন্যপুরাণ একখানি গ্রন্থ নয়, অন্তত দুখানি পুথির সংগ্রহ। শূন্যপুরাণে পাওয়া যায় 'সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিতের শ্বেতবর্ণ ঘোড়া, শ্বেতবর্ণ জোড়া, শ্বেতবর্ণ পাদুকা' তিনি 'ধর্ম্মমণ্ডপের পশ্চিমদ্বারের পূজক' ছিলেন, 'ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিতের নীলবর্ণ ঘোড়া, নীলবর্ণ জোড়া এবং নীলবর্ণ পাদুকা' ছিল। তিনি 'ধর্মমণ্ডপের দক্ষিণ দ্বারের পূজক' ছিলেন। অন্যদিকে 'দ্বাপরযুগে কংসাই পণ্ডিতের কাংসবর্ণ ঘোড়া, কাংসবর্ণ জোড়া এবং

কাংসবর্ণ পাদুকা' ছিল। তিনি 'ধর্মমণ্ডপের পূর্বদ্বারের পূজক' ছিলেন। কলিযুগে 'রামাই পণ্ডিতের তাম্রবর্ণ ঘোড়া, তাম্রবর্ণ জোড়া এবং তাম্রবর্ণ পাদুকা ছিল।' গোঁসাই পণ্ডিত কিন্তু কোনোভাবেই রামাই পণ্ডিত ছিলেন না। এমনও হতে পারে এই দুই পণ্ডিত একত্রে মিলে মিশে ধর্মপূজাপদ্ধতি প্রকাশ করেছিলেন। শূন্যপুরাণে যেমন রাঢ়ের দ্বারকেশ্বর অঞ্চলের ভাষা শব্দের সঙ্গে শূন্যপুরাণের শব্দের মিল আছে সে কারণে একথা মনে করতে দ্বিধা নেই যে ওই অঞ্চলেই রামাই পণ্ডিতের আশ্রয় ছিল। রাঢ়ের ভাষার সঙ্গে শূন্যপুরাণের ভাষার বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর। শূন্যপুরাণের কোন কোন শব্দের স্বরের বিপর্যয় দেখা যায়। আবার শূন্যপুরাণের শব্দের সঙ্গে ময়নামতীর গানের কোথাও কোথাও মিল রয়েছে। এমনকি গানের ক্ষেত্রেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার শিবের গাজন ও ধর্মঠাকুরের গাজনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

শূন্যপুরাণ একাধিক সময়ে লেখার ফলে বিভিন্ন স্থানের লোকের ভাষা মিশে গেছে। শূন্যপুরাণের প্রায় সর্বত্র কর্মকারকে 'ক', অধিকরণে 'এ', সম্বন্ধে 'র', এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় 'ব' আছে। শূন্যপুরাণ 'সঙ্গীত গ্রন্থ' না 'ধর্মপূজার গ্রন্থ' এ নিয়ে যে বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল সে বিষয়ে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এটিকে ধর্মপূজার গ্রন্থ বলতে চেয়েছেন। এমনকি সারদাচরণ মিত্র রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু শূন্যপুরাণে রাঢ়ে প্রচলিত ধর্মপূজার প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাকৃত বাংলার নিদর্শন আছে। যে কারণে শূন্যপুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে শূন্যপুরাণের মহত্ত্ব চোখে পড়ে। শূন্যপুরাণকে একটি নাম চিহ্নিত করা যায় না, কারণ, তা অনেক পুথির সংগ্রহ। সে কারণে কোনো একটি নির্দিষ্ট নামকরণ সার্থক হবে না। রামাই পণ্ডিত ধর্মের গাজন প্রবর্তন করে 'গাজনে পণ্ডিত রাম' হয়েছিলেন।

ধর্মপূজা হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সমান মাত্রায় প্রচলিত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে কারণে বলছেন ধর্মপূজা হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সমানগতিতে প্রবাহমান ছিল। তাঁর আলোচনা থেকে জানা যায় 'The form Dharma in its Sastric technical meaning may rightly be stated to convey the sense of righteousness, duty or sacred law and it has been observed that righteousness is an aspect of civilization"[২১]। সমাজের নীচুতলার মানুষজনের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল। তাদের আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চিন্তাভাবনায় বৌদ্ধধর্মের ভাবনা-চিন্তার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এই বিতর্ককে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[২২]। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল কথাই হল যে বৌদ্ধধর্ম বাঙালির জনমানসে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে পরবর্তীকালে একাধিক প্রশ্ন ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু[২৩], অম্বিকাচরণ গুপ্ত[২৪], দীনেশচন্দ্র সেন[২৫], ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়[২৬], সুকুমার সেন[২৭], সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়[২৮], ও শশীভূষণ দাশগুপ্তের[২৯] আলোচনা উল্লেখ করার মতো। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে একবাক্যে সুর মিলিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে অল্প-বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। জহর সরকার যে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাইছেন যে ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে কোনো সাংস্কৃতায়নের বৃত্ত তৈরি হয়েছিল কিনা[৩০]? জহর সরকার অবশ্য শ্রীনিবাসের যুক্তি খাড়া করতে চাইছেন তা কতটা বাস্তবসম্মত তাও ভেবে দেখা

সরকার[৩১]। জহর সরকার অবশ্য শ্রীনিবাসের বক্তব্যকে খণ্ডন করে নিজেই স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাজের কুর্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫২ সালে শ্রীনিবাসের লেখা পড়লে তা মনে করা স্বাভাবিক। হিতেশরঞ্জন সান্যাল অবশ্য রাঢ় বাংলার ওপর একাধিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা সম্পর্কে তিনি খুব একটা বেশি আলোচনা করেন নি[৩২]। জহর সরকার তাঁর সিদ্ধান্তে অটুট যে সমাজের অন্ত্যজ সম্প্রদায় যারা ধর্ম্মপূজার প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন তাঁরা মূলতঃ রাঢ়কেন্দ্রিক[৩৩]।

তথ্যসূত্র :

১. *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ১৩০৪, পৃ. ৬২
২. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* (২য় সংস্করণ) কলকাতা, পৃ. ৫৬
৩. *ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে. এল. এম, কলকাতা,* ১৯৭৭, পৃ. ২
৪. যদিও পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত আকারে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু একাধিকবার চেষ্টা করেও পড়ার সুযোগ ঘটেনি।
৫. 'Ramai Pandit', *Calcutta Review*, August, 1924, pp. 353-361.
৬. *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* ১৩০৪, পৃ. ৬০-৬৮
৭. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৮. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড
৯. ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৯-১০
১০. *Origin and Development of Bengali Literature,* Vol. I, p. 132.
১১. *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* ১৩০৪, পৃ. ৬০-৬৮
১২. শূন্যপুরাণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩
১৩. সুকুমার *সেন, ঐ,*
১৪. S. B. Dasgupta, Obscure Religious Cults, p. 86
১৫. Jawar Sircar, *The Construction of the Hindu Identity in Medieval Western Bengal? The Role of Popular Cults,* Occassional Paper, Institute of Development Studies, Kolkata, July, 2005.
১৬. কল্যাণী মল্লিক, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী,* কলকাতা,
১৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*
১৮. *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ৩১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা
১৯. Hinduism and Buddhism, Vol. II, p. 32 fn.
২০. নগেন্দ্রনাথ বসু, 'শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* খণ্ড ১৬, সংখ্যা ৪, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ; এছাড়া তাঁরই অন্য এক গ্রন্থ দেখা উচিত *বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস,* দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ২০০২
২১. Haraprasad Chatterjee Sastri, *Studies in Dharmasastra, Dharmanibandha and Raghunandan's Dayatattna' Our Heritage,* XXXV, Part I, Jan-June, Vol.II, pp. 1-16.

২২. Harapraad Sastri, 'Discovery of the Remnamts of Buddhism in Bengali' *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, Kolkata, December, 1894; See also Shastri, 'Buddhism in Bengal since the Mughal Conquest' *J.A.S.B*, Vol. LXIV, Pt I, No. I, Kolkata, 1895; Shastri, 'Cri-Dharma-Mangala; A Distant Echo of Lalit-Vistara' *JASB*, kolkata, Vol LXIV, Pt I, No 1, 1895; Shastri, 'Discovery of Living Buddhism in Bengal', *JASB*, kolkata, Vol. LXIV, Pt I, No. 2

২৩. 'শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* ১৬ খণ্ড, অংশ ৪, ১৩১৬

২৪. 'সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* খণ্ড ১০, অংশ ১, ১৩০৪

২৫. দীনেশচন্দ্র সেন 'ধর্মমঙ্গল' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* খণ্ড ১৩, অংশ ১, ১৩১৩

২৬. 'ধর্মপূজা বিধি', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* খণ্ড ২১, অংশ ৩, ১৩২১

২৭. 'Is the Cult of Dharma a Living Relic of Buddhism in Bengal' D. R. Bhandarkar ed. *B.C. Law Volume*, Vol. I, Kolkata, 1945.

২৮. 'Buddhist Survivals in Bengal' in D. R. Bhandarkar, *Op cit*

২৯. *Obscure Religious Cults*, Kolkata, Reprint, 1976.

৩০. Sircar, *Op.cit p. 4.*

৩১. M. N. Srinivas, *The Cohesive Role of Sanskritization and other Essays*, New Delhi, OUP, 1989.

৩২. চিত্তরঞ্জন সান্যাল 'রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা', অনুষ্টুপ, ১৩৯৬

৩৩. Sircar, *Op.cit* p. 12-13

"উনিশ শতকের নগর কলকাতার 'সঙ্' : নিম্নবর্গের চোখে 'বাবু' বৃত্তান্ত"

গার্গী সরকার

ভারতবর্ষ কিংবা বাংলাদেশ বারেবারেই আক্রান্ত হয়েছে বিদেশী শক্তির দ্বারা। শক-হুন-পাঠান-মোগল বাংলার শস্য-সম্পদের টানে ভীড় জমিয়েছে, লুঠ করেছে। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই বিদেশী শক্তিগুলির কেউই, বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, তার অর্থনীতিকে টলাতে পারেনি এতটুকু। বাংলাদেশের গ্রাম তার ফসল-কুটির শিল্প-জমিদারি-ব্রাহ্মণত্ব-প্রজাপালন-উৎসব-চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিল। গল্পটা পাল্টে গেল যখন বাণিজ্যতরী বেয়ে এল ইংরেজ কোম্পানি; আর তারপর বাণিজ্যের অধিকার পরিণতি পেল প্রায় দীর্ঘ দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকারে। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্রিটেনের ধনিক বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে। ফলে গ্রামবাংলার অর্থনীতি বা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্য নির্ভর ধনিক পুঁজির সংঘাত অনিবার্য ছিল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে দেশীয় জমিদাররা ক্ষমতাচ্যুত হলেন। পুরনো অভিজাতদের হাত থেকে সরে গিয়ে মালিকানা গেল কোম্পানির অনুগৃহীত নতুন ভাগ্যবানদের হাতে। যাদের ঠিকানা—কলকাতা। বস্তুত অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই গ্রাম সমাজ ভাঙছিল আর নবনির্মীয়মান কলকাতা হয়ে উঠছে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী। ফলে কলকাতায় তখন হাজার মানুষের আনাগোনা। বিচিত্র তাদের শ্রেণিবিন্যাস। একদিকে আছে ইংরেজ দ্বারা পুষ্ট, ইংরেজ তোষণকারী ব্ল্যাক জমিদার, দালাল, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান—ইতিহাস যাদের নাম দিয়েছে—'বাবু'। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, উপার্জন থেকে উপার্জনহীনতা, বিলাস থেকে ব্যভিচারের স্রোতে এদের ভেসে যাওয়া। এর ঠিক বিপরীতেই থাকল কলকাতার নিম্নবর্গীয় বহুবৃত্তিজীবী সমাজ—কারিগর, জেলে, ময়রা, ধোপা, মালি, দর্জি, পণ্যদ্রব্যবিক্রেতা, কুলি, মজুর, চাকর, বেয়ারা, পাল্কিবাহক, মেথর, ভিস্তি। গ্রাম থেকে কলকাতার মাটিতে পা রাখা এই বিপুল কর্মময় জীবনের বাসিন্দারা পরম বিস্ময়ে লক্ষ করেছিল সমাজের উপর তলার জীবনযাত্রাকে। আর সেই 'দেখা'-কেই তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মোড়কে প্রকাশ করার জন্য নিম্নবর্গের বেছে নেওয়া সংরূপের মধ্যে অন্যতম হল উনিশ শতকের কলকাতার সঙ্।

যে কোনো সাহিত্যই সমাজলগ্ন। আর লোকসাহিত্যে তো সৃষ্টিকর্তাই থাকে গৌণ। সংহত গোষ্ঠীর স্বর ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবে ভাষা পায় ছড়া-গান-কথা-ধাঁধা-প্রবাদে। তাই এখন আমাদের বিবেচ্য হল উনিশ শতকের কলকাতার বহুবৃত্তিজীবী নিম্নবর্গ সমাজ কীভাবে সঙ্-এর বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তাদের বিপরীত শ্রেণিচরিত্রের 'বাবু'দের বিশ্লেষণ করেছিল তার স্বরূপ উন্মোচন করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে নিতে হয় সঙ্ সম্পর্কে সাধারণ তথ্যটি—

> "নাটকীয় ভাব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সার্বজনীন মাধ্যম হল সঙ্। পরে এই রীতি যাবতীয় নাটকলার অঙ্গীভূত হয়। সকল সভ্যতার আদিপর্বগুলিতে সঙের

> প্রচলনের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। অঙ্গভঙ্গি, পদক্ষেপ ও মুখভঙ্গির দ্বারা ভাব, কার্য এবং পারিপার্শ্বিকতা বর্ণনা সঙের অন্যতম উদ্দেশ্য।...'"[১]

তাহলে সঙ্-ও এক অর্থে 'মিমিক্রি'। কলকাতা তথা বাংলাদেশের সমাজের নানা খণ্ড চিত্রই বিচিত্র সাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে, গানের কথায় অতিরেক বা ঈষৎ অশ্লীলতার ভিয়েন চড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি সহযোগে পরিবেশন করা হত।

হুতোম বর্ণনা দিয়েছেন কলকাতার চড়ক পার্বণ আর বারইয়ারি পূজার। বারইয়ারিতে পূজা পদ্ধতি গৌণ। উৎসবটাই আসল। আর উৎসব মানে—যাত্রা, পাঁচালি, হাফ-আখড়াই, বাইনাচ, খ্যামটা, কবির লড়াই, কেত্তন আর সঙ্-ই হল মুখ্য। কারা এই উৎসবে সামিল হন? 'বাবু'-রা। তাই হুতোমের মনে হয় চড়ক দেখতে বেরনো সাজগোজ করা 'বাবু'-রাই যেন আস্ত একটা সঙ্—

> "ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও স্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সং-এর মতো পালকী গাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেচেন,—ছোট লোক বড় মানুষ হঠাৎ বাবুই অধিক।"[২]

বস্তুত হুতোম যে 'বাবু'দের সঙ্ সদৃশ মনে করেন সেই 'সঙ্'-এর সাজেও যেমন চরিত্র হয়ে এসেছে 'বাবু'-রা, ঠিক তেমনি সঙ্-এর গানেও বিষয় হয়েছে 'বাবু'দের বিচিত্র স্বভাব। তাই বারইয়ারিতলায় যখন সঙ্ গড়া শেষ হয়ে যায় তখন দর্শন দেখেন—

> "কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান,
> হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহরের মুৎসুদ্দি
> বাবুদের মত পোসাক পরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।"[৩]

আর আমাদের মনে হয় নিম্নবর্গের বিনোদনের দৃষ্টিতে কী অনায়াস দক্ষতায় উঠে এসেছে উনিশ শতকের নগর কলকাতার ইতিহাস যেখানে রাজা ইংরেজ আর তার চারপাশে অধীনস্থ বশংবদর দল—জাম্বুবান, হনুমানের মতো মুৎসুদ্দিবাবুরা। এর ঠিক পাশেই আছে 'বাবু' সঙের খুব সোজাসাপ্টা ছবি। যা উনিশ শতকের 'বাবু'-র 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন', 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' কিংবা 'ক্ষুদ্র নবাব' স্বভাবকে বেআব্রু করে দেয় এভাবেই—

> "বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর বাড়ী শোন আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই অথচ দেশের রিফরমেসনের জন্য রাত্তিরে ঘুম হয়না।"[৪]

দেখতে 'রাজরাজড়ার পৌত্তুর' অথচ খোঁজ নিলে জানা যাবে 'হিদে জোলার নাতি'-এ হেন মেকি 'বাবু'-তে ছেয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের নগর কলকাতার সমাজ। আর লোকসাহিত্য যেহেতু সবসময়ই সমাজের দর্পণ এবং প্রতিবাদে বাঙ্ময় তাই বাংলাদেশের সঙ্ ও তার গানে এবং সাজে তুলে এনেছে অন্তঃসারশূন্য, অনুকরণপ্রিয় ও ব্যভিচারী 'বাবু'-দের। উদাহরণ সহযোগে সে ব্যাখ্যাতেই যাব এবার আমরা।

মুখ্যত চিত্তবিনোদনের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল সঙ্। কিন্তু শুধু সেই গণ্ডীতেই আবদ্ধ না থেকে সমাজ সত্যের প্রতিফলক হয়ে উঠল সঙ্। তাই নিম্নবর্গের এই বিনোদন চর্চাকে মান্যতা দিয়ে উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনে 'বাবু'-র বাড়ীর উঠোনে সঙের আসর বসলেও সঙের সৃষ্টিকর্তারা কিন্তু তাদের শ্রেণিচরিত্রকে ভুলে যায়নি। সে কারণেই বাংলা ছড়ায় যেমন বলা হল—

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কতো মজা
আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানি"*

ঠিক তেমনি সঙের দল গান বাঁধল—

"হলো ঘোর কলি কারে কি বল বলি।
সমাজ দিয়ে ছারে-খারে, সাহেব সাজে বাঙ্গালী।।
পমেটম সব দেয় চুলে।
তেলমাখা সব গেছে ভুলে।।
উচিত কথা সব বলতে গেলে,
বাবু গো, দিবেন আমায় গালাগালি।
সমাজ দিয়ে ছারে-খারে, সাহেব সাজে বাঙ্গালী।।"*

এ ছড়ার সূচনায় যে 'ঘোর কলি'-র কথা বলা হল, উনিশ শতকের 'বাবু' সংস্কৃতির চিত্র অনুসন্ধানে তার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। বস্তুত উনিশ শতকের লেখকরা সে যুগের যা কিছু অধঃপতন, কদাচার ও সংস্কারহীনতার আর্কেটাইপ হিসেবে দেখেছিল পুরাণ বর্ণিত 'কলিযুগ'-কে যেখানে সামাজিক ভারসাম্য হয় লঙ্ঘিত। তাই 'সাহেব সাজে বাঙ্গালী'। একটু আগেই আমরা দেখেছি ছড়া যেমন 'বাবু'দের অনুকরণপ্রিয়তার সমালোচনা করেছিল তেমনি সঙের গান-ও সমাজ উচ্ছন্নে যাবার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করল বাঙালি বাবুর নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-আচরণ বিসর্জন দিয়ে সাহেবিয়ানার নির্লজ্জ অনুসরণকে। আসলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শাসকের রক্তচক্ষু, অধিকারবোধ ও প্রভুত্বকামিতার দ্বারা গ্রস্ত হতে হতে শাসিতের নিজস্ব 'আইডেন্টিটি' হারিয়ে যেতে থাকে। যে শাসক শ্রেণি শাসিতের অস্তিত্বের মধ্যে সর্বদা ক্রিয়া করে, তার প্রতি অন্ধ অনুগত্য থেকেই জন্ম নেয় প্রভু সাজবার আকাঙ্ক্ষা। আবার—

"ব্রাহ্মণত্ব চুলোয় যাক, নাই বজ চিহ্ন অঙ্গে।
ফিরিঙ্গি সেজে দাঁড়িয়ে আছেন কে দেখেছে রঙ্গে।।

ছিলেন প্রপিতাম অগ্নিহোত্র,
বাপ পোড়ালেন যজ্ঞসূত্র,
ইনি এখন গোত্রহারা হা-ঘরে।
(ইনি) বাংলা বসন, বাংলা অশন,
বাংলা আসন, বাংলা ভাষণ, সব ভাসালো সাগরে।।"

বাবু খাতা খুলে চাঁদা তুলে, নিয়ে টাকার রাশ।
গিয়েছিলেন বিলেত বাসে শিখতে জমি চাষ।।

....

মাথার উপর ধুচনি চাপা, গায়ে Monkey Coat।
চুরুট চেপে ধরে আছে দুটি ভস্মমাখা ঠোঁট।।
গলায় দড়ি জোটে নাই তাই নেকটাই আছে এঁটে।
পেটটি ভরান 'পেলিটিতে' পাতের প্রসাদ চেটে।।

....

ভট্টাচার্যের বংশধর Mr Vat।
বিলিতী বামনী কি ছেলে বিওবেন ভাবছি আমি that।"[৮]

—দীর্ঘ এই গানটি উদ্ধৃত করা হল সমাজ পরিবর্তনের দলিল হিসেবে। আলোচ্য গানের ক্ষেত্রে আছে উনিশ শতকের শেষার্ধের বিলাত ফেরত ইংরেজি শিক্ষিত এক 'বাবু', যার প্রপিতামহ ব্রাহ্মণত্বের ধ্বজাধারী ছিলেন। পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পৈতে ত্যাগ করলেন। আর সঙের গানের নায়ক নতুন 'Nation'-এর নয়া 'Fashion'-এ মেতে সমস্ত আচারবিচার বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠেছেন এক শিকড়হীন নব্য যুবক যিনি সমস্ত রকমভাবেই বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। বস্তুত সঙের ছড়া বা গান এভাবেই অল্পকথায় বর্ণনা করেছে সেদিনের সমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কীভাবে 'ধাপে ধাপে ভিন্ন ভঙ্গী' আরম্ভ করার মধ্য দিয়ে 'ব্রাহ্মণ বংশে টেঁশ ফিরিঙ্গী' জন্মাচ্ছিল।

ইংরেজি জানা 'বাবু'দের প্রতি সঙের ছড়াকার বা গায়কেরা বিমুখ হয়েই ছিল। উনিশ শতকের বিজ্ঞান শিক্ষিত 'বাবু'দের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনেছে সঙের দল। মুর্গি মাটন খেতে আপত্তি নেই অথচ হিন্দুয়ানিকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও না করতে পারা 'বাবু'দের কথা ধরা আছে সঙের ছড়ায়—

"কিন্তু ঠাকুরতলায় টুপি খোলেন,
হাই তুলতে হরি বলেন,
হুলিড়ে করেন হিঁদুর পুজোপর্বে।।"[৯]

আবার যেহেতু উনিশ শতকের শেষ দিকের এই 'বাবু'রা উচ্চশিক্ষিত বা তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক তাই অতিরিক্ত বিজ্ঞান প্রেমে দশ অবতারকে ভাবে 'Evolution', চণ্ডীপাঠ 'Elocution', টিকি আর কিছুই নয় 'Magnetic Electric Conductor'। একইরকম অতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মন্মথবাবুর এল.এ পাশ পুত্র হেমেন বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব আয়োজন করেন। সেখানে পার্বতীর মুখ ভুটিয়া ছাঁচে গড়া, লক্ষীর জায়গায় কাবুলিওয়ালার স্থান, সরস্বতী বেহু বাজিয়ে অপেরার গান শোনান, কার্তিক 'Evening Coat' পরে ঠোঁটে সিগারেট এঁটে ঘুরে বেরান। এককথায় এ যেন উনিশ শতকের নগর কলকাতার পৌরাণিক ছবির সঙ্করে সংস্করণ, যেখানে—

"দম দিয়ে গ্রামোফোন যন্ত্রে,
বিলাতী আমদানি মন্ত্রে,

নব্যভাবে সভ্যতন্ত্রে,
বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পূজা মার।"[৯]

ছড়াটি অনেকাংশে অতিকথন দোষে দুষ্ট হলেও মনে রাখতে হয়, উনিশ শতকের শেষ ভাগের নগর কলকাতার শিক্ষিত 'বাবু'দের হুজুগসর্বস্বতা ও ইংরেজি ভাষা এবং সভ্যতার প্রতি অন্ধ আকর্ষণকে সেই 'বাবু'-দের কাছেই আয়না হিসেবে তুলে ধরবার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল এই অতিরিক্ততার।

এবার একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। আগেই বলা হয়েছে, উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক নগর কলকাতার 'বাবু' বৃত্তান্তকে কখনোই একটা ফ্রেমে বাঁধা যাবেনা। নানা সময়ে, তাদের নানা চারিত্রিক রকমফের। কলকাতার প্রথম দিকের অর্থাৎ 'আদি বাবু'-দের পরবর্তী প্রজন্ম 'নববাবু'দের নিয়েও রচিত হয়েছে সঙের ছড়া বা গান। সেখানে 'বারোয়ারি' উৎসব উপলক্ষে তাদের বাঁধন ছাড়া বিলাসের ছবি ফুটে ওঠে—

"হদ্দ সব মদ্দ বটে, বেহদ্দ কীর্তি উড়িয়েছে।
দেখে, লম্ফ-ঝম্প, বহ্বারম্ভ, কেউ কাঁপছে, কেউ হ'সতেছে।
এদের দাপটে চৌচাপটে গাঁথান তোল্‌পাড় হতেছে।
....
বারোয়ারি মানেই মজা, হায়। কেবল আমোদ গড়ায় তার্ তলায়
ও তাই যন্ত্রী রস্ত্রী পেন্ত্রীস্ তরফায়, খেমটা নাচিয়েছে।
তেমি যাত্রা কবি, নক্সা ছবি, আজগুবি আচ্ছা দেখিয়েছে।
বিদ্‌ঘুটে সোরত্ রটিয়ে, বিদ্‌ঘুটে ছক্কট ঘটিয়েছে।"[১০]

বাবুদের জীবনে বিলাস সত্য কিন্তু চিরসত্য নয়। তাই একদিন তাদের এসে দাঁড়াতেই হয় মাটির কাছাকাছি। বস্তুত উনিশ শতকের নক্সা বা প্রহসনগুলো যেমন সামাজিক শিক্ষাদানের কারণেই 'বাবু'দের জীবনের করুণ পরিণতি বর্ণনা করেছিল তেমনি সমাজ শোধরানোর তাগিদেই সঙের গানে উঠে এল 'বাবু'-দের বিলাসময় জীবনের অনিবার্য দুঃখময় পরিণতির কথা—

"কাপ্তেনগিরি কি ঝকমারি।
কেঁদে কেনে শেষে চোখে পড়ে বারি।
পরিবারের অলঙ্কার, সেও হল ছারখার,
পয়সা বিনে এ সংসার শূন্য হেরি।
যত সব ইয়ার ছিল, এখন সব ছেড়ে গেল,
....
প্রেম কি পরিপাটী, বোতল বোতল উড়ল খাঁটি
ভিটে মাটি হল চাটি আহা মরি।
সব হল খোলা মালা, দিলুম আমি কান মোলা,
যেন করে নাকো কোনও শালা কাপ্তেনগিরি"[১১]

কিম্বা,

"সুখে দুঃখে কাটালেম দিন
দীনের দীনবন্ধু,
মানভঞ্জন করেছি আমি,
দেখুন ভাই বন্ধু।
বনেদী ঘরের ছেলে আমি
পড়েছি বিষম ফেরে,
জ্বালিয়ে মারলে আমায় মশাই
গয়না গয়না করে।
ঘর ছেড়েছি, সব ছেড়েছি
শুধু প্রেমের দায়,
টাকা দিয়েছি, মন দিয়েছি
ওর দুটি পায়।
তার বদলে মিলছে আমার
শুধু লাথি ঝাঁটা,
এখন আমি বুঝতে পেলাম
আমি রাম পাঁঠা।।"[১৮]

কখনো বারাঙ্গনা বিলাস, কখনো ইয়ার দোস্তি, আবার, কখনো বা বারোয়ারি উৎসবের দিনে অপরিমিত উল্লাস—এই সবকিছুই 'বাবু'দের জীবনের বিষবৃক্ষের উৎস। সমাজের অন্তর্গত সত্যিকে প্রকাশ করা এবং সামাজিক কু-প্রবৃত্তি ও হীন আচার থেকে নগর কলকাতাকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল সঙের সৃষ্টিকর্তারা, সেকথাও বলা আছে সঙের গানে। বস্তুত শ্লীলতা-অশ্লীলতা, সাহিত্যিক গুণসম্পন্নতা কতটা আছে বা নেই গূঢ় বিচারের বাইরে গিয়ে শুধু অকপটে সমাজছবি জানবার জন্যই সঙের ছড়া বা গানের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো অভিযোগেই সঙের সামাজিক শিক্ষাদানের প্রয়াসকে ছোটো করা যায় না। ইংরেজের ধামাধরা যে অনুকরণসর্বস্ব সমাজ কলকাতায় গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিল সঙ। আর তাই উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে এসে কাসুন্দিয়ার সঙের গান থেকেই বুঝে নেওয়া যেতে পারে উনিশ শতকের নিরিখে ও কলকাতার সামাজিক ইতিহাস ও 'বাবু'দের চরিত্র বিশ্লেষণে সঙের তাৎপর্য—

"মোদের এ সঙ নয় শুধু কালি মেখে সঙ সাজা,
নয়কো শুধু হাল্‌কা হাসি নয়কো শুধু মজা।
সংসারেতে সাজার ওপর সাজেন যিনি যে যা,
তারি ছবি দেখাই সবে সহজ ভাষায় সোজা।
সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি আদি,
বলতে গিয়ে কারো প্রাণে ব্যথা দি যদি।
ক্ষমা করবেন সবার কাছে এই মোদের মিনতি,
সত্যের ভাষণ, সত্যের গানই মোদের সঙ এর রীতি।"[১৯]

কলকাতার যে যে অঞ্চলের সঙ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল কাঁসারিপাড়ার সঙ, আহিরীটোলার সঙ, জেলেপাড়ার সঙ, কাসুন্দিয়ার সঙ। নাম শুনলেই বোঝা যায় যে কলকাতার বৃত্তিজীবী নিম্নবর্গের বাসভূমি থেকেই উঠে এসেছিল উনিশ শতকের এই 'popular culture'টি। কলকাতার 'অন্য সংস্কৃতি' বললে বুঝে নিতে হয় উনিশ শতকের নাগরিক লোক-সংস্কৃতিকে। শহরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার গতি-প্রকৃতি, বৈষম্য, ঘটনা পরম্পরা, চারিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই সংস্কৃতি। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> "...অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক সংস্কৃতির স্রষ্টা ও সমঝদার দুই-ই শহরের খেটে খাওয়া বাসিন্দারা, বা এমন সব শিল্পী যাঁরা এই বাসিন্দাদের দৈনিক সমস্যা ও ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন বা গান গেয়েছেন।"[১৪]

যেহেতু সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণি থেকেই উঠে এল সঙের গান, তাই সেখানে ধরা পড়ল বিত্তবান সমাজের 'সঙ' সেজে থাকা। তাই প্রতিবাদে মুখর হল এক শ্রেণি সঙের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অশ্লীলতার। ভণ্ড তপস্বী, রাজকর্মচারী কিম্বা বাঙালি 'বাবু' সকলেই সঙের বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ হয়। তাই আশঙ্কিত হন তারা। বন্ধ করে দিতে চান নিম্নবর্গের বিনোদন। সমাজশোধনের একচেটিয়া অধিকার যেন তাদেরই। তাই ১৮৭৩-র ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে ব্রাহ্ম সমাজের কেশব সেন, খ্রিস্টান যাজক কালীচরণ ব্যানার্জী, শোভাবাজারের কালীকৃষ্ণদেবের উদ্যোগে 'Society for Suppression of Public Obscenity' প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখান থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সঙের মিছিল বন্ধ করার। কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আবার ইতিহাসের কৌতুক এমনি যে একদিন কৃষ্ণদাস পাল সঙের মিছিল বন্ধের বিরোধিতা করে সঙের ছড়াকারদের কাছে বাহবা কুড়োন কিন্তু তিনিই আবার নিন্দিত হলেন সঙের গানে তার ইংরেজি খানা খাওয়ার আধিক্যের কারণে—

> "হরে মুরারে মধুকৈটভারে, হরি ভজে কি হবে—চপ
> কাটলেট, কোপ্তা খাও বাবা গবগব। খাও বাবা
> গবাগব হরি ভজে কি হবে।"[১৫]

বস্তুত, এভাবেই উনিশ শতকের নাগরিক লোকসংস্কৃতির উপাদান 'সঙ' সমাজের উপরতলার মানুষদের সমস্ত ভণ্ডামি, ব্যভিচারিতাকে নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিল বলেই আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে।

সঙ বিষয়ে অমৃতলাল বসুর মত ছিল—

> "ছোট, মন্দ, অশ্লীল প্রভৃতি বলিয়া আমরা আমাদের কত জিনিসই না হারাইয়াছি ও হারাইতে বসিয়াছি। ছোটকে বড়, মন্দকে ভাল, অশ্লীলকে শ্লীল করিয়া লইতে আমরা চেষ্টা করি, তা হইলে আমাদের অনেক জিনিস নিজস্ব থাকিয়া যায় এবং জগতের দৃষ্টিতে এত ক্ষুদ্র এত হেয় হই না।"[১৬]

কিন্তু আধুনিক পাঠক বা ঔপনিবেশিক দৃষ্টির বাইরে দাঁড়ানো পাঠক হিসেবে আমাদের বলবার কথাটা একটু ভিন্ন। আমরা সঙের গানকে কোনভাবেই অশ্লীলতা থেকে শ্লীলতায় উত্তরণের

দিকে নিয়ে যেতে চাইনা সঙের গানের নিজস্ব স্বভাবধর্মকে অক্ষুন্ন রেখেই তার ভিতর থেকে সামাজিক ও সাহিত্যিক রস খুঁজে নিতে চাই।'এমনকী ১৮৭২ সালের ১৫ এপ্রিল 'The Hindoo Patriot' পত্রিকায় কাঁসারীপাড়ার সঙ প্রসঙ্গে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেখানেও কোনোরকম অশ্লীলতার অভিযোগ আমল পায়নি—

> "...Everybody enjoys the fun and pleasure which cost the spectators nothing, and we are glad that while the barbarities of the churruck have been Supressed, this innocent popular amusement survives....there was considerable humour, very broad humour too, but nothing obscene. A most phantastic collection of comicalities was exhibited....an oilman making oil, a fisherman dallying with his sweet-heart, a fast but ruined Babu with a group of flatterers—these were some of the representations, all singing appropriate and humours songs."[১১]

সঙের গানে 'হিউমার'-এর অন্যতম উৎস 'বাবু'-দের জীবনযাত্রা। আর আমরা এতক্ষণ ধরে বুঝে নিতে চাইছিলাম উনিশ শতকের নগর কলকাতার 'বাবু'-দের সঙের ছড়া বা গান কীভাবে এঁকেছিল আর কেনই বা 'বেদে-বেদেনী', 'বরযাত্রী', 'জুয়াচোর'-এর পাশে জায়গা করে নিল 'ধনবান বাবু'-র সঙ। নগর কলকাতার লোকসংস্কৃতির উপাদান সঙ, নিম্নবর্গের বিনোদনযাপনের অন্যতম অঙ্গ সঙের সাজে 'বাবু'-দের অন্তর্ভুক্তির সামাজিক তাগিদ ও তাৎপর্যটিকে বিশ্লেষণ করাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র :

১. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ১।
২. অরুণ নাগ (সম্পাদিত), সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্শা, কলকাতা, আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ৫৪।
৩. একই, পৃ. ৬৯।
৪. একই, পৃ. ৭০।
৫. পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৫৪।
৬. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ১৮৩-১৮৪।
৭. একই, পৃ. ১৯৮-১৯৯।
৮. একই, পৃ. ২৬৫।
৯. একই, পৃ. ২৭০।
১০. 'বারোয়ারি', বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

১১. 'কাপ্তেনবাবুর গান', বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ১৮৩।
১২. 'রামপাঁঠা', বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ৩৫১।
১৩. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ৬৮-৬৯।
১৪. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতায় অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯, পৃ. ৫৬।
১৫. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা', মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, পৃ.৩৭।
১৬. জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস 'অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সঙ', কলিকাতা, মাসিক বসুমতী, ১৩৩৬, পৃ. ৩০।
১৭. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে', কলকাতা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ২৩-২৪।

অপরিচিতের কলমে পরিচিত কথা : পুরবালা রায়, সরোজবাসিনী গুপ্ত ও সরোজকুমারী দেবী

দীপেন দাস

॥ ক ॥

ছোটোগল্প সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পাঠক মনে অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি করে চলেছে। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সম্যক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ শতকে বাংলা ছোটোগল্প তার ধারাবাহিক প্রবণতাকে ছাপিয়ে গেছে। প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যন্ত্রণা ও টানাপোড়েনে মানবমন ও মনস্তত্ত্বের দোলাচলতার এই চিত্রও উঠে এসেছে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ছোটোগল্পকারকে কেন্দ্র করে। বাস্তবের মাটি ছেড়ে পরাহত, রণক্লান্ত সৈনিকের অবসন্নতা, অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাকাতর সেই ছবি ছোটোগল্পকেও দিয়েছে পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গরূপ। বিশেষত ব্রিটিশ শাসক শক্তির শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদর্শনে ও দুঃশাসনিক দোলাচলতার মানুষের যন্ত্রণা-হতাশা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা ছোটোগল্প পাঠে আমাদের মন তেমনই ইতিহাসের বিস্মৃত গন্ধ নিতে উৎসুক হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র অতীত নয় এরই সঙ্গে সমকালের সমাজ ভাবনাও বাংলা ছোটোগল্পে স্থান করে নিয়েছে।

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে এমনই কিছু লেখিকা আমাদেরকে গল্প শুনিয়েছেন, যাঁদের কথা তুলনামূলকভাবে পাঠক সমাজে তেমন বেশি পরিচিত নয় (পুরবালা রায়, সরোজবাসিনী গুপ্ত, সরোজকুমারী দেবী)। অথচ তাঁরা অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম সমাজ সমস্যার কথা প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন। হারানো ছড়ানো সেই বিস্মৃত কাহিনিই তাঁদের গল্পে হীরকদ্যুতির উজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছে। বিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের সমাজ ও অন্ধকারময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের খণ্ড চিত্রকেই তাঁদের গল্পে দেখি। আসলে ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা নিষেধের কাছে মুসলিম সমাজ-জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়েছিল। সুতরাং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহেই তাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বাস্তবিক উক্ত আলোচ্য গল্পকাররা এই দিকগুলিই প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে আলোকপাত করেছেন।

এই ক্ষেত্রে একসূত্রে তিনটি গল্পের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যই হল গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণধর্মী মতামতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা। প্রথম গল্প 'জমির মালিক' দ্বিতীয় গল্প 'প্রতীক্ষা' আর তৃতীয় গল্প সরোজকুমারী দেবীর 'দেওয়ানার কবর'। গল্প-গুলিতে সামাজিক আচার, প্রথা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কারের রূপ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের-সম্পর্কের সূত্রপাত দেখা গেছে। তবে মুসলমান সমাজের শিক্ষা, নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিবাদের ভাষা বা উনিশ শতকের পরবর্তী সামাজিক অবস্থানকেও সূচিত করেছে। গল্পগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে ভিন্ন সম্প্রদায় ও সমসম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের প্রবৃত্তি জাত সম্পর্ক-দ্বন্দ্ব, বিবর্তনশীল মনন, প্রণয়-অভীপ্সা, উপেক্ষা-প্রতীক্ষা।

।। খ ।।

মহেশ্বর গ্রামের ক্ষুদ্র দীনদরিদ্র ভিক্ষু এমাম মণ্ডল ও তার স্ত্রী জেলেখাকে নিয়ে 'জমির মালিক' গল্পটি রচিত। গল্পের মূল সমস্যা এমামের অর্থনৈতিক বিপর্যয়তা, জমিদারের শোষণ এবং এমামের আত্মহত্যার ঘটনা। তুলনামূলকভাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পেও হিন্দু জমিদারের শোষণ ও মুসলমান প্রজাকে এমনই ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে দেখেছি। এক্ষেত্রে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই-এ বেঁচে থাকার রসদ খুঁজেছে এমাম। সামান্য কিছু খেজুর গাছের রস থেকে গুড় তৈরি করে দু-পয়সা রোজগারের আশায় বুক বেঁধেছে। কিন্তু জমিদার তার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ্যে খাজনা স্বরূপ গুড় নিয়ে চলে গেলে এমাম দু-চোখে অন্ধকার দেখে। অর্থের অভাবে স্ত্রীর চিকিৎসা সে করাতে পারেনি। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায় এমাম নিজেকেই দায়ী করেছে এবং নিজে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

'প্রতীক্ষা' গল্পে ফুলজান এবং রহিমকে নিয়ে গল্পকার বিচ্ছেদের বেদনাবহ স্মৃতি চিত্রিত করেছেন। পিতা-মাতার একমাত্র আদরের কন্যা ফুলজান আর যশোরের বৃদ্ধ মায়ের একমাত্র সম্বল রহিমকে নিয়েই গল্পটি রচিত হয়েছে। কর্মসূত্রে রহিম পাটের নৌকোয় কাজ নিয়ে দূর দেশে চলে আসে। কলেরায় আক্রান্ত হলে, তার সঙ্গীরা অসুস্থ অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। তখন ফুলজানের পিতা-মাতার শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করে এবং সেই পরিবারেই থেকে যায়। এখানেই মহাজনের আড়তে সে দশটাকার মাইনেতে চাকরি নেয়। কিন্তু উপবাসী মায়ের কথা ভেবে রহিম ফিরে যেতে চাইলেও ফুলজানের পিতামাতার কাছে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের কথার খেলাপ করতে পারেনি। ফুলজানের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে সে সম্মত হয়েছে এবং দীর্ঘ চার বছর সেই পরিবারেই থেকে গেছে। তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মায়ের স্মৃতি বেদনা ক্রমশই তাকে ভারাক্রান্ত করেছে। অবশেষে ফারখৎ পত্রে সই করে ফুলজানকে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুদূর যশোরেই চলে গেছে। সেই থেকে প্রতি বছর রহিমের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান ফুলজান।

'দেওয়ানার কবর' গল্পে সরোজকুমারী দেবী মুসলমান যুবকের হিন্দু বিবাহিতা নারীর প্রতি ভালোবাসার কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। মুসলমান যুবক আমির, যে প্রকৃতির বুকে উদ্দাম চঞ্চলতাকে নিয়ে আপন মনে গান গেয়ে ফিরেছে। প্রয়াগের অলিতে গলিতে মন ভোলানো সেই সুরের সঙ্গে সকলেই পরিচিত ছিল। ধনী লতিফ খাঁর ছেলে আমির হিন্দু কন্যা ললিতার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তবে সামাজিক সংস্কারের কাছে পরাহত হয়ে আমির দূর থেকে হৃদয়ের প্রতিমাকে একটিবার দেখেই রূপ তৃষ্ণার মধ্যে দিয়ে আপন হৃদয়কে শান্ত করেছে। ললিতা শ্বশুর গৃহে চলে যাওয়ার পর আমির আর তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু তাকে একটি বার দেখার জন্য অপেক্ষা করেছে, হৃদয়ের আরাধ্য প্রতিমাকে দেখার আকুলতায় শেষে প্রাণ ত্যাগ করলে সেই গাছের তলাতেই তার সমাধি দেওয়া হয়। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার বন্ধু জামির নিয়মিত ফুল ও আলো ছড়িয়ে দেয়—এভাবেই প্রয়াগের গল্প কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে।

।। গ ।।

'জমির মালিক' ও 'প্রতীক্ষা' দুটি গল্পেই উল্লিখিত হয়েছে মুসলিম সমাজের নর-নারীর হৃদয় বৃত্তির দ্বন্দ্ব জটিল সংকটময় রূপ। 'জমির মালিক' গল্পে স্বপ্ন-ব্যর্থতা এবং জমিদারের অত্যাচারের ফলস্বরূপ একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে ছোট্ট গল্পটিতে স্বল্প সময়ে দু-দুটি মৃত্যু ঘটনা আমাদেরকে হতবাক করেছে। জমির মালিক গল্পের এমামের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা-আত্মযন্ত্রণায় অনুশোচনা এবং আত্মহনন, সর্বোপরি বাসভূমি থেকে উৎখাত সর্বহারা দুর্বল এক চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু 'প্রতীক্ষা' গল্পে রহিম তার বৃদ্ধ মাকে দেখতে গেছে দীর্ঘসময়ের পর। ফুলজানকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, আবার ফুলজানও দীর্ঘ সময় রহিমের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করেছে। তাই দুই চরিত্রই আত্মমনের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু সবশেষে ফুলজানের প্রতিশ্রুতিলব্ধ অপেক্ষাই গল্পটিকে চিরন্তন কালের হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। চরিত্রগুলির আত্মিক বেদনা, মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব জটিলতায় গল্প দুটি আমাদেরকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নারী পুরুষের হৃদয় বিদারক বিচ্ছেদের কাহিনি শেষপর্যন্ত গল্পের ক্লাইমেক্সকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অন্যভাবে 'জমির মালিক' গল্পটির সঙ্গে 'দেওয়ানার কবর' গল্পটির বিচার-বিশ্লেষণেও একটি ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং তা চরিত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে। দুটি গল্পেই প্রেমের প্রবাহমানতা দেখা গেছে। তবে এমাম মন্ডল ও জেলেখার প্রেম একই সমাজের, অর্থনৈতিক বিপর্যয়তাই এখানে চরিত্রগুলিকে স্থায়িত্ব এনে দেয়নি। কিন্তু 'দেওয়ানার কবর' গল্পে মুসলমান যুবকের হিন্দু বিবাহিতা কন্যার প্রতি প্রেম-ধর্মগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম মিলন ঐক্যে সমাজই হয়েছে প্রধান অন্তরায়। অর্থনৈতিক সংকট এখানে নেই বললেই চলে।

আবার 'প্রতীক্ষা' ও 'দেওয়ানার কবর' গল্প দুটির ভাবঐক্য লক্ষিত হয়েছে। মুসলমান যুবকের অপেক্ষা করতে করতে প্রাণত্যাগ, আর ফুলজানের (প্রতীক্ষা) দীর্ঘ ষোল বছর ধরে পথের দিকে চেয়ে থাকা এ যেন চিরকালীন বিরহের একসূত্রের দ্যোতনা বয়ে আনে। গল্প দুটি একে অপরকে পরিপূরক যেন একই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ। নামান্তর থাকলেও বিষয় ভাবনায় তাই চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। একরৈখিক এই দুটি গল্পে রহিম, ফুলজান, আমির এবং ললিতা (অংশ বিশেষ) চরিত্রগুলি কম বেশি কিছু না কিছু চাওয়া-পাওয়ার আশায় উন্মুখ হয়েছিল।

তাই তিনটি গল্প মিলে যেন একটি সম্পূর্ণ গল্প বলয়ের সৃষ্টি করেছে। তিনটি গল্পের কাহিনি, চরিত্র সমাবেশে লেখিকারা দেখিয়েছে মানব মনের আন্তরিক চাওয়া-পাওয়া ও দ্বান্দ্বিকতার ছবি। এই ছবিই হয়েছে যুগের কথা। মুসলিম সমাজের কথা, নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে সংগ্রামী মানুষের কথা, আশা হতের কথা-ছবি যা মানবতাকেই চিহ্নিত করেছে।

।। ঘ ।।

মুসলিম সমাজ ও চরিত্রের বিস্তৃত পরিচয়ে তিনটি গল্পেই তৎসমসাময়িক যুগ-পরিস্থিতি, ধর্মীয় সংস্কার, প্রথা-বিশ্বাসের খণ্ড খণ্ড কথা আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে লক্ষ করা গেছে—

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল এবং কৃষক কীভাবে শ্রমিকে, ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে, জমির অধিকার থেকে চ্যুত হয়েছে—তারই কাহিনি। বিশেষত ব্রিটিশদের অত্যাধিক পরিমাণে রাজস্ব

আদায় এবং বাণিজ্যিক আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি যোগ্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে কৃষককে আগ্রহী করা। তবে ব্রিটিশ মনোভাবের ফলস্বরূপ বাংলার জমিদারদের খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। স্বভাবতই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী না হয়ে সামন্ততান্ত্রিক ও সুদখোর মহাজনি ব্যবসায়ে আস্থা দেখিয়েছে।

খ. মুসলিম সমাজের আর্থিক দৈন্যতার দিক। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দৈন্যতা এবং কৃষক-শ্রমিক তথা গ্রামীণ সর্বহারার সংখ্যাটা বেড়ে যেতে থাকে।

গ. রক্ষণশীল ও ধর্মীয় বিধি-বিধান।

জমির মালিক গল্পে ভিক্ষু এমাম মন্ডল সে কিন্তু জমির অধিকারী হয়নি। জমিদারই জমির মালিক থেকেছে এবং খাজনার বিনিময়ে এমামকে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। অবশ্য বাংলার বুকে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব, প্রজার কাছ থেকে ইচ্ছামত খাজনা আদায় করা এবং তাদের উপর বলপূর্বক অত্যাচার একটা সময়কাল পর্যন্ত চলেছিল। জমির প্রকৃত মালিকরা তাই অর্থনৈতিক-বিপর্যয়তার সামাল দিতে জমিদারের দ্বারস্থ হয়েছে। ১৭৯৩ থেকে ১৮৮৫ সময় পর্বে যদিও প্রজাস্বত্ব আইনের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল ঘটেছিল। কিন্তু দরিদ্র কৃষক প্রজার অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। এমাম মন্ডল সেও বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল, আর্থিক দুর্বলতা তথা একাকিত্বের যন্ত্রণায়।

'প্রতীক্ষা' গল্পেই আবার সামাজিক সমস্যার রূপ চিত্রিত হয়েছে। নির্জন পল্লী বাংলার গরিব নিরীহ চাষাভূষা মানুষজনই এই গল্পে এসেছে। পল্লীগ্রামের একটা চিত্র সচরাচর আমরা দেখতে পাই, গ্রাম্য মানুষকে ঠকিয়ে আর পাঁচজনের অর্থউপার্জন, বিপরীতে একটি পরিবারের ভূমিহীন, বৃত্তিহীন, অবস্থায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা দ্বন্দ্ব-কলহ, ভ্রান্তি-মোহ, জটিলতার ফলে দেখা গেল সামাজিক অবনতি। গল্পকাররা গল্প লিখতে গিয়ে দুঃখ দরিদ্রতা পূর্ণ মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতার দিকগুলি এভাবেই তাঁদের গল্পে নিয়ে এসেছেন। আবার ধর্মকে কেন্দ্র করে সামাজিক শ্রেণী বিভাজন, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনা প্রবাহের কথাও বলেছেন। তবে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা উনিশ শতক থেকে প্রবল হয়েছিল। এই কারণে মুসলমান যুবকের হিন্দু নারীর প্রতি প্রণয় প্রীতির মাধ্যমে লেখকরা চেষ্টা চালিয়েছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে। 'ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা', এই মন্ত্রেই বিশ্বাসী হয়েছিলেন কর্তব্যপরায়ণ লেখকেরা। কারণ তাঁরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ছোটোগল্প লিখেছেন। তাই তাঁদের রচনায় এমন এক আর্থসামাজিক হিন্দু-মুসলিম পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে থেকে সমাজে নৈতিক শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজের অগ্রণী হোতা ছিলেন মহী লেখিকা। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটাতে চেয়ে গল্পকাররা গল্প রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে মোহম্মদ আর্জুমন্দ আলী-ই সর্বপ্রথম 'প্রেমদর্পন' (১৮৯৯) উপন্যাসটি লিখে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি আনতে চেয়েছিলেন। তিনি মুসলমান যুবকের সঙ্গে হিন্দু নারীর প্রেম ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই দিকটি আলোকপাত করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সমস্যা আজও তেমন ভাবেই রয়ে গেছে।

|| ৩ ||

ছোটোগল্পের চরিত্ররা স্বল্প পরিসরেই জীবন্ত হয়েছে। লেখিকারা দেখিয়েছেন নারীমন-মনস্তত্ত্বের আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। নারীদের জীবনাচারকে অন্তঃপুরের মধ্যে থেকে নিয়ে এসেছেন বাস্তবের মাটিতে। তারা স্নেহ প্রেম, মায়া-মমতার অপরূপ বন্ধনে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তুলল। জীবনের পথে ভাঙা, বাকা চোরা অন্ধকারময় পথকে তারা দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এমনই কিছু নারী চরিত্র গল্পগুলিতে এসেছে—জেলেখা (জমির মালিক), ফুলজান (প্রতীক্ষা), ললিতা (দেওয়ানার কবর)। জেলেখা মহেশ্বর গ্রামে ভিক্ষু এমামের একমাত্র সহযোগী ও সহমর্মী। অর্থকষ্ট থাকলেও সর্বদাই এমামের পাশে থেকেছে। বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী নারীরূপে সংসারের অভাব অনটনের মধ্যে এমামকে রক্ষা করেছে।

'প্রতীক্ষা' গল্পে ফুলজান বুক বেঁধেছে প্রতিশ্রুতির কাছে। তার মনে সন্দেহ নেই, আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর বিশ্বাস। নিষ্ঠাবান মুসলমান যেমন দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন তেমনি বিশ্বাস ফুলজানের। জীবনে রহিমের (স্বামীর) পছন্দকেই ফুলজান শ্রদ্ধা করেছে। লেখাপড়া শিখেছে এবং অভিজ্ঞতার দুর্বিবহ জীবনকে ছেড়ে কর্মব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেছে। একারণেই রহিমের যন্ত্রণায় সেও কান্না করেছে। এক সময় রহিম তার মাকে দেখতে যেতে চাইলে ফুলজানই বলেছে—

> *"অত অস্থির হয়োনা, আমার কথা শোন ফারখৎ পত্রে সই করে দিয়ে তুমি চলে যাও।"* (পৃ. ১৬৭)

এমন সাহস-ভরসা যুগিয়েছে ফুলজান। মাতৃহারা ফুলজান জানে 'মায়ের চেয়ে দুনিয়ায় কেউ বড় নয়।' তাই রহিমকে যেতে দিয়েছে। তবে রহিমের প্রতি তার ভালবাসা এতটুকুও কমে যায়নি। তাদের একে অপরের প্রতি আত্মিক চাওয়া ও বিশ্বাস থেকেই জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ককে প্রতিকায়িত করেছে। শুধু এখানেই নয় ফুলজান পিতার বিরুদ্ধে, সামাজিক প্রথা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। রহিমের চলে যাওয়ার কথা উঠতেই ফুলজানের পিতা তালাকের কথা বললে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। পিতাকে ভয় দেখিয়েছে নিজে 'জলে ডুবে' মরবে বলে। তবে রহিমের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকাটা ফুলজানের কাছে দুর্বহ হয়েছে। নিজেকে এক সময় মনে করেছে—

> *"দুনিয়ায় সে আজ বড় একা, তার যেন সকল কর্তব্য শেষ হয়েছে। এখন কোন মতে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা।"* (পৃ. ১৬৮)

একদিকে কর্তব্য কর্ম অপরদিকে প্রিয়জনকে দূরে পাঠিয়ে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, আশায় আশ্বাসে প্রতীক্ষা করে গেছে। নানান কাজে সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রেখে স্বাধ্বী ফুলজান চেষ্টা করে গেছে দুঃখ যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে।

'দেওয়ানার কবর' গল্পটির নারী চরিত্র তুলনামূলকভাবে হিন্দু পরিবারের। কিন্তু উল্লিখিত দুটি গল্পের নারী চরিত্রের মর্মের কথায় গল্প কাহিনি একই সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। শেঠজীর মেয়ে ললিতা পাগল আমিরের গান শুনলেও এক সময় দোতলার জানালার ধারে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেছিল। আমিরের দৃষ্টির সামনে থেকে চলে গেলেও গানের অমোঘ আকর্ষণে সে আবার নিজে থেকেই দাঁড়িয়েছে। অপরিচিতের কাছে লজ্জা কুণ্ঠা সবই উবে গেছে। পাগলের গানে

সে খুঁজে পেয়েছে যন্ত্রণাকাতর হৃদয় বিদারক সুর। ললিতা তাই দ্বিরাগমনের দিনে একটিবার চোখের দেখার জন্য অধীর আগ্রহে শূন্যময় গাছতলার দিকে চেয়ে থেকেছে। বিদায় ক্ষণে তার চোখের কোণে জল জমেছে। লেখিকা এভাবেই নারী মনের অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাবটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু সচেতন ভাবেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথাটি বর্ণনা করেছেন।

শুধুমাত্র নারী চরিত্রগুলিই নয় পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল হয়েছে—এমাম মন্ডল, রহিম এবং আমির। এমাম সামান্য ভিক্ষু। কষ্টের জীবনে একমাত্র ভরসা জেলেখা। গ্রামের লোকেরা পরিহাস করে বলে—'এমামটা লক্ষ্মী ছাড়া, চালে খড় নেই, পেটে ভাত নেই আছে কেবল এক সুন্দরী স্ত্রী।' দুঃখযন্ত্রণাকে তাই কোনকালেই পাত্তা দেয়নি। জেলেখার অসুস্থতায় সে বিচলিত হয়েছে। উপার্জনের জন্য চিন্তিত সকালবেলাতেই উপার্জনের নেশায় ছুটেছে। ভেবেছে গুড় বিক্রির টাকাতে সমস্যা মিটবে। কিন্তু জমিদারের আগমনে ও গুড় চাওয়াতে তার সব আশাতেই জল ঢেলে দিয়েছে। নির্বাক, আনুগত্যে ও কৃতজ্ঞতাবোধে এমাম জমিদারের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছে দুটি টাকার জন্য। প্রতিদানে শুনেছে উপদেশ। জেলেখার মৃতদেহ দেখে এমাম নির্ভীক চিত্তেই জমিদারের কাছে টাকা চাইতে গেছে। পার্থিব সুখ ছেড়ে দারিদ্রতার চরমতম অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। দরিদ্রতার জীবন যাদের চোখে উপহাসের ও হাসি-তামাশার বিষয় হয়েছে সেই জমিদার কন্যার বিবাহের বেশে এমাম আবিষ্কার করেছে জেলেখাকে। দেখতে পেয়েছে জেলেখার অস্থি-মজ্জা-রক্ত ক্লান্তিকেই। শুভ্রতা বা আড়ম্বরতার মধ্যেও পেয়েছে নিজের অস্থিরতা ও দরিদ্রতাকে। আপন হৃদয়ের সম্পদকে হারিয়ে এমাম তাই আত্মহননের পথকেই শ্রেয় বলে মনে করেছে

'প্রতীক্ষা' গল্পের রহিম চরিত্রটিও বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। তবে চরিত্রটি দুইভাবে অস্থির হয়েছে—

ক. "ফুলজান আমি বড় দুর্ভাগা, তাই তোমার মতো স্ত্রী পেয়েও একদিনের জন্য সুখী হতে পারলাম না। তোমাকেও কেবল দুঃখই দিলেম।"

খ. "মা হয়তো না খেতে পেয়ে মরেছে, এমন বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল।"

দুই পারের স্মৃতি যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে রহিম। দার্শনিক উপলব্ধি তথা মানবিকতার দিক থেকেও চরিত্রটি একইভাবে উজ্জ্বল হয়েছে।

'দেওয়ানার কবর' গল্পে আমির যমুনার তীরে মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছে। কুঠিয়াল মাধো প্রসাদের মেয়েকে দেখে আমিরের ঘোর পরিবর্তন দেখা গেছে। মনের মানুষের জন্য, হৃদয়ের আকুলতা নিয়ে আমির শুধু চেয়েছে একটিবার তাকে দেখতে। আমিরের এই চাওয়াই তাকে নতুনভাবে চিনিয়েছে—

> *"ওগো আমার এইটুকুই ভালো। তোমাকে আমি প্রাণ ভরে দেখতে পেয়েছি, তুমি আমার দুঃখে কাতর হয়েছ, এই-ই আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর কিছু চাইনা, আমি এমনি দূর থেকে তোমায় পূজা করব, তুমি এ দীনের পূজা এইভাবেই গ্রহণ কোরো..."* (পৃ. ৪৭)

।। চ ।।

ট্রাজিক পরিণতির দিক থেকেও ত্রয়ী গল্পই মৃত্যু-বিচ্ছেদ এবং প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার বেদনায় চিরকালের গল্প হয়ে উঠেছে। তবে জমির মালিক গল্পে জেলেখা ও এমামের মৃত্যু আমাদেরকে বিচলিত করেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ও অনুভবের কথায় যন্ত্রণাটা আরও চাগিয়ে দিয়েছে মনকে—

> *"কি এত অনন্ত স্মৃতি দীপ্তিতে, সে ক্ষুদ্র দাওয়ার উপরে এমামের প্রেম-তৃষ্ণ জীবানুকূল বিব বিশীর্ণ দেহখানি মৃত্যু সমুদ্রে ভাসমান হইল; আখি তারা দুটি চিরদিনের মত বুজিয়া গেল।"* (পৃ. ১৪৮)

এমামের হতাশ জীবনের কথা বলতে গিয়ে স্বপ্নভূমি, খেজুর গাছ যেন প্রতীকী ব্যঞ্জনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনের সম্পদ তথা প্রকৃতির নির্যাস দুই-ই ফুরিয়ে এলে মৃত্যুই হয়েছে একমাত্র উপায় স্বরূপ।

দ্বিতীয় গল্পটিতেও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ও আত্মবিবেকী মানবিক গুণ প্রকাশিত। প্রতীক্ষায় যারা দীর্ঘ সময় রত থেকেছে তাদেরও পরীক্ষা, এক্ষেত্রে রহিম-ফুলজানের আত্মিক টানাপোড়েনের চিত্রই হয়েছে সফল। রহিমের জন্য একই ভাবে যোল বছর প্রতীক্ষা তথা দুর্বিবহ যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন। ফুলজানের ট্রাজিক বেদনাকেই প্রকাশ করেছে। এমনই দুটি দৃষ্টান্ত—

ক. "আল্লার হুকুমে তোমার আমার যে সম্বন্ধ তুচ্ছ তালাক নামার সাধ্য কি সে সম্বন্ধ মুছে ফেলে। এ বন্ধন জন্মান্তরের কার সাধ্য ছিঁড়ে ফেলবে?" (পৃ. ১৬৭)

খ. "মরণ ভিন্ন আর কেউ আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আল্লা জানে, এখানে আমার প্রাণ ফেলে রেখে গেলাম। ফুলজান, তোমায় একবার না দেখে বেহেস্তে যেয়েও আমার সুখ হবে না।" (পৃ. ১৬৮)

ট্রাজিক পরিণতির চূড়ান্ততম যন্ত্রণাকাতরতার ছবি উঠে এসেছে 'দেওয়ানার কবর' গল্পেও। বৈষ্ণবীয় প্রেমরসের ধারাপাতে হৃদয়ের নিকশিত প্রেম রজকিনী রামির মতোই চন্দ্রালোকিত থেকেছে। একটিবার মাত্র হৃদয়ের আরাধ্য দেবীকে দেখার জন্য সমস্ত দিন উন্মুখ হয়ে থাকা-অপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দেবী প্রতিমাকে না দেখতে পাওয়া, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় গান গাওয়া, গাছ তলাতেই প্রাণ দেওয়া এই যন্ত্রণা কাতরতাই পাঠক মনকে সিক্ত করেছে।

> *"কোথায়? আমার জীবনের আরাধনার ধন। আজ তুমি কোথায়? আজ দুদিন তোমার দেখা না পেয়ে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। আমি ত কিছুই চাই না, কেবল দিনান্তে দূর থেকে তোমায় দেখেই আমি পরম আনন্দে ছিলাম, আমায় সেটুকু থেকেও বঞ্চিত করলে?"* (পৃ. ৪৮)

মানবিক প্রেমের প্রকাশে গল্প তিনটি তাই জীবনের চেনাপথের সবশেষে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। গ্রাম্য সহজ সরল মানুষগুলি অভাবের তাড়নায় সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎই অপরিচিত হয়ে গেছে। প্রতিহত করতে চেয়েছে সামাজিক বাধাবিপত্তি, দুঃখযন্ত্রণাকে। এমনই স্মৃতি নিয়ে

গল্পকাররা কলম ধরেছেন। গল্পের ভাবসত্যতা ও আঙ্গিকগত কুশলতায় পাঠক মনকে আপ্লুত করেছেন। আবার অন্যভাবে দেখলেও মানবিকতাকে জয়ী করতে পেরেছে মানব বন্ধনে। দুঃখদারিদ্রতাকে নিয়ে জীবনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন, সামাজিক বাধা-বিঘ্নকে পাশে রেখেও বেঁচে থাকার লড়াই করে গেছে কিন্তু না পাওয়ার যন্ত্রণা ও অতৃপ্তিতেই আশাহত হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে তাই গল্পগুলির ট্র্যাজিক আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে।

মুসলিম সমাজ-জীবনের এমন রূপ চিত্রণ আমাদের কাছে পরিচিত নয়। লেখিকারা তাঁদের গতানুগতিক পথরেখা থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে যেভাবে মুসলিম সমাজের রূপচিত্রণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। সামাজিক বাধাবিঘ্ন ও প্রথাবিশ্বাসের এই অপরিচিত কথাই আমাদেরকে মুসলিম সমাজ দর্শনে সহায়তা করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্-মুহূর্ত থেকে আজও এই সভ্যতার বুকে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা তেমন ভাবেই রয়ে গেছে। সেই সমস্যা ও সমাজ বাস্তবতার চিত্রণ তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা নতুন করে বুঝে নিতে পারি এই সকল গল্পের মাধ্যমে। তাই অপরিচিত লেখিকাদের কলমে এই কথাগুলো মুসলিম সমাজের পরিচয় প্রদানে শেকড়ের সন্ধান দিয়েছে—এভাবেই গল্পগুলি সময়ের বিচারে গুরুত্ব করে নিয়েছে পাঠক মনে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. শৈলেন চক্রবর্তী, প্রবাসীর গল্প সম্ভার, প্রথম প্রকাশ পত্রভারতী, ২০০০।
২. শ্যামলী গুপ্ত সম্পাদিত, শতগল্প শত লেখিকা (১ম খণ্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৬।
৩. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০১২।

বঙ্গভাষায় রাহুল-জীবন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বাংলাভাষায় রাহুল সাংকৃত্যায়নের দুটি জীবনকথার সন্ধান আমরা পাচ্ছি। তার একটি সম্প্রতি প্রকাশিত, অন্যটি কিছু আগের। প্রথমটি লিখেছেন রাহুল-জায়া কমলা সাংকৃত্যায়ন আর দ্বিতীয়টি আশিস্ গঙ্গোপাধ্যায়। উভয় বইয়ের প্রকাশ রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশত-বার্ষিকীতে। তবে রাহুল-জায়ার বইটি নেপালি ভাষায়। বাংলায় বইটি ভাষান্তরিত হয়েছে। কলেবরের দিক থেকে উভয় বই-ই কৃশ।

বস্তুত রাহুল-চর্চায় আমরা অনেক পিছিয়ে। রাহুল-চর্চায় আমরা পিছিয়েই থাকব। রাহুল চর্চাকে, রাহুলের গ্রহণ-বর্জনকে সামনে আনতে হলে আমাদেরকে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ইউরোপীয় 'মডেল' থেকে সরে আসতে হয়। তৈরি করে নিতে হয় এক দেশজ 'মডেল'। যেখান থেকে রাহুলচর্চার পাঠ ও অনুশীলন শুরু হতে পারে।

আসলে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে ভারতে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার যে সূচনা স্বভাবতই তা ছিল চিন্তা-চর্চার এক ব্রিটিশ মডেল। যা আদতে শাসকের তৈরি। যা আদতে শাসকের চোখে শাসিতকে দেখা। শাসনের প্রয়োজনে শাসিতের সংস্কৃতির বিশ্লেষণ-সংরক্ষণ। এই ধারার শুরু যদি হয় উইলিয়াম জোন্স-এ, তবে তা প্রসারিত ডেভিডের অলডাইন ও হাইনৎসে মোডে অব্দি। এই ধারাই আরও বেশি জোরদার হয় ১৮০০ সালে তৈরি শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবর্গের হাতে। এই ধারাতেই ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখা হয়, লেখা হয় ফরাসি-ওড়িয়া-বাংলা অভিধান, শব্দকোষ আসে, অনুবাদ হয় হিন্দুশাস্ত্র তথা গীতার, অনুবাদ হয় সংস্কৃত সাহিত্যের। ইতিহাস-পুরাতত্ত্বেও ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ বা আলেকজাণ্ডার কানিংহামেও এই ব্যবস্থার নড়চড় হয় না। এই ব্যবস্থা চলতে থাকে কেমব্রিজ স্কুল অব হিস্টরিয়গ্রাফি পর্যন্ত।

এই অবস্থান থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূল্যায়ন হয় না। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের প্রতিষ্ঠান তাঁকে স্বীকৃতি দেয় না। তাঁকে সম্মানিত করে শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানায় রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর মাতৃভাষা হিন্দিতে তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনী রচিত হয় না। হিন্দিতে তাঁকে নিয়ে লেখা হয় না কোনো পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা। অথচ হিন্দি ভাষায় তাঁর রচনার সিংহভাগ।

তাঁকে নিয়ে ইতস্তত আলোচনা হয় বাংলাভাষায়। আমরা স্মরণ করতে পারি ডালার্ক পত্রিকার 'রাহুল সাংকৃত্যায়ন সংখ্যা' বা শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মনস্বী রচনার কথা। তবে এই ঘটনা গত শতকের ৮ থেকে ৯ দশকের। বাংলায় তাঁর রচনা অনূদিত হতে থাকে, প্রকাশিত হতে থাকে প্রায় একই সময়ে। ১৯৮১ থেকে ছেপে বেরোতে থাকে তাঁর 'ভোলগা সে গঙ্গা' সহ বিবিধ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। হিসেব করলে দেখা যাবে এইসব প্রয়াসের সূচনা তাঁর জন্মশতবর্ষের কাছাকাছি সময়ে। তার আগে অব্দি এক অদ্ভুত নীরবতা।

অন্যপক্ষে তাঁর বৌদ্ধশাস্ত্রের বই প্রকাশ করে মহাবোধি সোসাইটি আর ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী। যার ভেতর দিয়ে তাঁর বৌদ্ধভিক্ষু পরিচয়ই বড়ো হয়ে ওঠে। রাহুলও তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম কেদারনাথ পাণ্ডের বদলে ভিক্ষু-নাম 'রাহুল সাংকৃত্যায়ন' হিসেবেই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান।

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে রাহুলের কৃতিকে ঘিরে নিরুচ্চার হওয়ার আরও এক কারণ ছিল। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে স্বীকার করেনি। হিন্দুরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশ অবতাররূপের একজন হিসেবে ভাবতে চেয়েছিল। যার চূড়ান্ত প্রসারণ রাঢ়বঙ্গের দশাবতার পায় চিত্রকলায়। এই অবস্থান থেকেই ১৮৯৬ নাগাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন এক প্রবন্ধে 'ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ' বলে ঘোষণা করেন তখন তিনি সমালোচিত হন। বলা হয়, জেলে-মালোর ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ হবে পারে না। আসলে বিষ্ণুর অবতার রূপের আসনে বসিয়ে হিন্দুরা বুদ্ধকে উচ্চকোটির হিন্দু দেবতা হিসেবে দেখতে চাইছিলেন, স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে নয়। এই একই কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন ১৮৯৭-৯৮ নাগাদ নেপাল থেকে বৌদ্ধ গানের পুঁথি নকল করে আনেন তখন তার ভেতর খালি 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ চর্যাপদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সরোজবজ্রের ও কাহ্নপাদের দোহা কোষ অনালোচিতই রয়ে যায়।

এই পটভূমিতে বাংলায় এই দুই জীবনকথা বিশেষ গুরুত্ব পায়। জীবনী রচনার উদ্যোগ বুঝিয়ে দেয় তাঁকে নিয়ে চিন্তা বুদ্ধিমানসে জোর পাচ্ছে। রাহুলের সৃষ্টিসম্ভার বিপুল। যাকে হয়তো ১২টা ভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাগগুলো হতে পারে ১. দর্শন ২. ধর্মশাস্ত্র ৩. ভ্রমণকথা ৪. রাজনীতি ৫. ভাষাশিক্ষা ৬. সাহিত্য ৭. নাটক ৮. জীবনী সাহিত্য ৯. সমাজতত্ত্ব ১০. ইতিহাস ১১. পুরাতত্ত্ব ১২. আত্মচরিত। উভয় বইতে এই ভাগগুলো দুই বিন্যাসে এসেছে। আশিস্ গঙ্গোপাধ্যায়ের বইতে যা ৮টি পরিচ্ছেদে আর কমলা সাংকৃত্যায়নের বইতে যা ১৮ পর্বে। আশিস্ গঙ্গোপাধ্যায়ের বইতে পরিচ্ছেদ সাজানো হয়েছে বিষয়গতভাবে আর শ্রীমতী সাংকৃত্যায়নে এই বিভাজন পড়েছে ভাবগত দিকে।

আশিস্ গঙ্গোপাধ্যায়ের বইয়ে তথ্যসূত্র রাহুল সুহৃদ প্রভাকর মাচওয়ের রচনা, রাহুল পত্নী শ্রীমতী কমলা সাংকৃত্যায়ন ও পুত্র কেতা সাংকৃত্যায়নের আলাপচারিতা, হীনযানী বিশ্রুত বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের জীবনী ও রাহুল গ্রন্থরাজি। বইটিতে বিশ্লেষণের বদলে বিবরণে জোর পড়েছে। পরিচ্ছেদগুলোর নাম হয়েছে ব্যক্তিজীবন, দার্শনিক রাহুল, সাহিত্যিক রাহুল, পরিব্রাজক রাহুল, রাহুলের ধর্ম, জীবনের বিশেষ ঘটনাবলি, সম্মানসূচক উপাধি ও সৃষ্টি পরিচয়। সৃষ্টি পরিচয়ে হিন্দি, ভোজপুরি, তিব্বতি ও সংস্কৃত রচনার ভাষাওয়াড়ি তালিকা আছে।

এক তর্কের সুযোগ আছে এই বইতে। তর্কটি রাহুলের ইংরেজি ভাষাচর্চা নিয়ে। আমরা জানি রাহুলের কোনো ইংরেজি রচনা নেই। এই প্রসঙ্গে এই বইতে ধর্মাধার মহাস্থবির বলেছেন, রাহুল ইংরেজিকে বিদেশি ভাষা বলে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এইকথা সত্য বলে মনে হয় না। কারণ যিনি ভাষাকে ঘৃণা করবেন তিনি সেই ভাষা শিখতে যাবেন কেন, সেই ভাষায় লেখা রচনা পড়বেন কেন। রাহুল কৈশোরে বারাণসীর দয়ানন্দ স্কুলে অন্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি শিখেছেন, দর্শন নিয়ে লিখতে গিয়ে ইউরোপীয় দর্শন সম্ভবত তিনি ইংরেজিতে পড়েছেন আর

তাঁর সাম্যবাদে দীক্ষা যে বই দিয়ে শুরু ট্রটস্কির সেই 'বলশেভিকস অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রেভলিউশন' তো আদ্যন্ত ইংরেজিতেই লেখা। পাশে এই কথাও মনে হয় রাহুলের ইউরোপ পরিক্রমায় কি ইংরেজি ভাষাই সহায় ছিল না? এইসব দেখে মনে হয় তাঁর মতো ধীমান সমাজ চিন্তক কেবল একটি ভাষাকে কী কারণে ঘৃণা করবেন। আবার বিদেশি ভাষাকে ঘৃণা করার কথা বললে তিব্বতিও কি বিদেশি ভাষা নয়।

শ্রীমতী কমলা সাংকৃত্যায়নের বইতে পর্বগুলি হল জীবনকথা, ভবঘুরে বৃত্তি, আর্য সমাজের দিকে, অন্তিম জীবন, ব্যক্তিত্ব, মার্কসবাদে আস্থা, মানুষ রাহুলজি, পুঁজিবাদী শোষক সমাজের বিরোধী, দার্শনিক ভাবনা, পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্ব, যাযাবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জ্ঞানের অদ্বিতীয় সংগ্রহালয়, প্রারম্ভিক শিক্ষন প্রক্রিয়া, রাজনীতি ও রাহুলজি, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব, ভাষা দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যে জাতিবাদ। এই বইতে রাহুলের তাত্ত্বিক ভাষার রচনা, রাহুল নিয়ে ইংরেজি সংগ্রহ ও বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই বইয়ের 'মানুষ রাহুলজি' ও 'অজাতশত্রু ব্যক্তিত্ব' পর্ব থেকে মানুষ রাহুলকে আবছা হলেও ধরা যায়। আর 'আর্য সমাজের দিকে' পর্ব থেকে পাওয়া যায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তনের নানা কথা। কিন্তু যা উভয় বইতেই প্রায় অনুপস্থিত তা হল 'পরসা মঠ' পর্ব, বৈষ্ণব রাহুলের পর্ব। অথচ এই পর্ব বিস্তারিত হলে ভারতব্যাপী 'বৈষ্ণব ধর্মের রূপ-এর আভাস পাওয়া যেত। অবাক করে আর একটি বিষয় তা হল, রাহুল 'বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে আলাদা কিছু লেখেননি। এমন এক বিদ্রোহী ধর্ম তাঁর চোখের আড়াল হল কীভাবে? এই জীবনকথাটি যেমন আন্তরিক তেমন এক দ্বিধাও থাকে। দ্বিধার কারণ বইটি রাহুলের নিকটজনের রচনা। ফলে অজান্তেই সেখানে এক আবেগ কাজ করবে।

ভারতে দর্শনচর্চায় ন্যায় ও বেদান্ত দর্শনের চর্চা যত বেশি হয়েছে ঠিক ততটাই কম হয়েছে অন্য বিবিধ দর্শনের চর্চা। সমাজ-সংস্কৃতিগত কারণে এমন ঘটনাই স্বাভাবিক। আর দর্শন চর্চায় ভারতবাসীর দৈন্যের কথা বহু বছর আগেই খেদের সঙ্গে বলেছিলেন দর্শনের কৃতী অধ্যাপক শ্রী রাসবিহারী দাস। এই প্রেক্ষিতে মাধবাচার্যের 'সর্ব-দর্শন সংগ্রহে'র পরই স্থান পায় রাহুলের 'দর্শন দিগদর্শন' বইটি। এমনই উল্লেখের দাবিদার মহাদেশীয় ইতিহাস চর্চায় রাহুলের 'মধ্য এশিয়া কা ইতিহাস'। রাহুলের কাজের এমনই অজস্র স্বাক্ষর রয়েছে ভাষাতত্ত্বে-পুরাতত্ত্বে-ধর্মশাস্ত্রে।

এহেন এক ব্যক্তিত্বের অনুধ্যান মনে হয় এই দুই জীবনকথা দিয়ে বাংলায় শুরু হতে পারে। এই দুই বই, প্রভাকর মাচওয়ে-ধর্মাধার মহাস্থবির-আনন্দ কৌশল্যায়ন-কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ও রাহুলের পুত্রকন্যার আলাপচারিতা আর সঙ্গে পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ইনস্টিটিউট, লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়, রাহুলের চিঠিপত্র-ডায়েরি মিলে রাহুলের এক প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হোক, উঠে আসুক নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবন ও কৃতি। সেখানেই সার্থক হবে এই দুই জীবনকথার প্রকাশনা।

জীবনকথার বই :

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন।। আশিস্ গঙ্গোপাধ্যায়। ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী
মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব।। ড. কমলা সাংকৃত্যায়ন।। অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায়।। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

ননী ভৌমিকের গল্পের জগৎ : শহর ও গ্রামের মেয়েরা

ধনঞ্জয় ঘোষাল

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ধানকানা' গল্পসংগ্রহের 'একতলা' গল্পের মিনতিকে দিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। 'খুকুর মা মিনতি। বছর ছাব্বিশ বয়স। রোগা চেহারা। ছোটো কপালের একপাশ দিয়ে খানিকটা চুল উঠে গেছে ছেলে হওয়ার পর। ঠোঁট দুটো চাপা।'

কলকাতায় ভাড়াটের সংখ্যা বেড়ে গেছে। একতলা, দোতলা আর তিনতলায় ভাগাভাগি করে নিয়েছে এক একটি পরিবার এক একখানি ঘর। তেতলা বাড়ির নিচের তলায় অন্ধকারে শোনা যায় অনেকক্ষণ ধরে একটা এরোপ্লেন ওড়ার ফাটা ভাঙা শব্দ।

'বারান্দার কোণের দিকে অস্থায়ী রান্নাঘর। তোলা উনুনটা ধরে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে রান্নার সরঞ্জাম এক এক করে নিয়ে আসে মিনতি। নিয়ে এসে একটু দাঁড়ায় ক্লান্তভাবে। তখন ওর দিকে তাকিয়ে মনে হবে ও একটু কুঁজোই হয়তো, একটু লম্বা।'

মিনতির অনেক কাজ। জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুতে হবে রেশনের চালগুলো। ধুয়ে ধুয়ে কাঁকর বেছে ফেলতে হবে।

তেতলার আইবুড়ো মেয়ে রমা কলতলার একটু দূরে দাঁড়িয়ে অকারণে গায়ে ময়লা শাড়ির আঁচল জড়ায়। কখন কলটা দখল করে নিয়ে স্নান শুরু করতে হয় বুঝতে পারে না। যুদ্ধের আগে কলেজ ছেড়েছিল। আশা ছিল বিয়ে হয়ে যাবে। এখন আশা আছে যুদ্ধের শেষে জিনিসপত্তর সস্তা হলে বিয়ে হয়ে যাবে।

ওপরের বিধবা কাকিমা হেঁট হয়ে কাপড় কাচতে কাচতে শুধোয়—কালকে সুধীর আর সুধীরের দাদা ঝগড়া করেছিল নাকি?

মিনতিদের পাশের ঘরে থাকে সুধীররা। সুধীর কলেজে পড়ে। তার দাদা চাকরি করে। বউদির অসুখ। সুধীর প্রায়ই কলেজে যায় না। কলেজে না গিয়ে বউদির সেবা করে। স্টোভ জ্বালিয়ে পথ্য তৈরি করে, পাখার বাতাস দেয়, নিজেরা হোটেল থেকে খেয়ে আসে। কালকে রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি ওদের ঘর থেকে চাপা কথাবার্তা শোনা গিয়েছিল।

ভাতের মাড় গালতে গালতে সুমিকে ধমক দিয়ে পাঠাল মিনতি—ওর শার্টটা এখনও সেলাই করে দিলি না?

মিনতির বোন সুমি, বছর তেরো বয়স। ঢেঙা ঢেঙা গঠন। শাড়ির চেয়ে ফ্রক সস্তা, তাই ফ্রক পরেই চলেছে এখনও বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না ওর ফ্রক পরা শরীরের দিকে। কেমন অসহ্য লাগে।

"বাবাঃ আপনাদের বিছানা কী ময়লা!"

সুমির গলা শোনা যাচ্ছে। নিয়ে জুটেছে পাশের ঘরে। শার্টটা হাতে করেই আছে। সেলাই করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওই অবস্থায়ই যতদূর সম্ভব আড্ডা মারবে, মাতব্বরি করবে।

সুধীরের গলাটা কীরকম রূঢ় মনে হল মিনতির কানে।

"পরিষ্কার? পরিষ্কার রাখতে গেলে কত খরচ হয় এর পেছনে? একটা চাদর কত কায়দা করে চালাতে হয়। থাবড়া মারব কিন্তু সুমি বেশি পাকামি করলে।"

স্বামীকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে কিছুক্ষণ থামত মিনতি। কলতলায় দুজন পুরুষ চান করছে। দোতলার বিধবা কাকিমা পাশে বসে হেঁট হয়ে বাসন মাজছে।

মিনতি সুমিকে বলল সুধীরের বিছানার চাদর তুলে আনতে। সে কেচে দেবে। সুমির ট্যারা বাঁকা বিচ্ছিরি সেলাই করা শার্ট পরে মিনতির স্বামী অফিস গেল। মিনতির কথা থেকে জানা গেল তার স্বামীর দাড়ি কামানো হয়নি।

ননী ভৌমিক কমিটেড লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকের ছবি পাই 'একতলা' গল্পে। কলকাতার গলির মধ্যে তিনতলা পুরোনো বাড়ির ভাড়াটেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও মানবিক সম্পর্কের দিকগুলি নিপুণ চিত্রীর মতো তুলে ধরেছেন লেখক। মিনতি এই গল্পের প্রধান নারী চরিত্র। সুধীরের দাদার চাকরি চলে যায়। তাদের দেশে চলে যেতে হবে। সুধীরের বউদি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে শুয়ে থাকে। দেশে গেলে সে মরে যাবে—ফাঁকা বোকা চোখে সে বলে। সুধীদের ঘর থেকে নিজের ঘরে এসে শক্ত হয়ে বসে থাকে মিনতি। কিকে ভাবে খুকুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। খোকাকে তুলে অন্যমনস্কের মতো আদর করে। বুকে চেপে ধরে, অথচ ওর বুকে দুধ নেই। খুকুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বিলাতি দুধের টিকিটের কথা জানা গেল। একটা কালো আর বিচ্ছিরি ছেলেকে খুকু দেখেছিল লাইনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে। মিনতি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল ডাক্তার বলেছে মিনতির ম্যাল নিউট্রেশন। খুকুর কাছে জানা গেল ইস্কুলে কাশতে কাশতে সুমির রক্ত বেরিয়েছিল। খুকু লাইনে দাঁড়িয়ে দুধ আনতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মিনতির স্বামী উত্তর দেয়নি। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিনা পয়সার দুধের আবার ভদ্র অভদ্র? স্বামীকে বলেছে একটা টিকিট করিয়ে দিতে। ওই বাড়ির আরও অনেক বউ-এর অস্পষ্ট ছবি আছে গল্পে মিনতির ছবি স্পষ্ট।

১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আগন্তুক' গল্প সংকলনের 'অহল্যা' গল্পের গৃহবধূর চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ঘটনাকাল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট। গল্পের নায়ক কথক ১৪ আগস্ট রাত্রির বর্ণনা দিয়েছেন—"মাসের পর মাস আতঙ্কিত দাঙ্গাবিভক্ত কলকাতাকে যারা দেখেছে তারা বুঝবে সেই রাতের মদিরা। রাত্রে, সজ্জিত হয়ে উঠেছে ১৪ই আগস্ট রাত্রের শহর। গলির ভেতরে ভেতরে জেগে উঠেছে অসংখ্য তোরণ, সবুজাভ নরম গ্যাসের আলো পড়েছে তোরণে গাঁথা দেবদারুর পাতার সারিতে, তিনরঙা কাগজের অস্পষ্ট সজ্জায়।"

রেডিও-র খবরের জন্য সকলের মধ্যে উন্মাদনা। রাত বারোটায় আনুষ্ঠানিক সমারোহ শুরু হবে দিল্লিতে। গল্পকথক এক পরিচিত গলির মধ্য দিয়ে হাঁটছিলেন। 'অমিদি'—বলে ডাকলেন একটি বাড়ির জানালায় একজনকে দেখে। অমিদি দরজা খুলে দিয়ে ডাকলেন 'আয় ভেতরে আয়'। অমিদির শ্বশুর, স্বামী সবাই ঘুমাচ্ছেন। সারা কলকাতা সেই রাত্রে রাস্তায় নেমে এলেও ওই বাড়ির লোকেদের যেন কিছু এসে যায় না।

অভাব অনটনের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসার অমিদিদের। অমিদি নিরাসক্তভাবে বললেন—'তুই বুঝি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিস আজ?'

জোর করে একটা উৎসাহের আমেজ আনার চেষ্টা করে গল্পের নায়ক-কথক (তপু) বললেন—'আজকে স্বাধীনতা পাচ্ছি আমরা।'

হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্লান্ত মনে হল তাঁর নিজেকে। "অদ্ভুত স্থির ঠান্ডা মনে হল এই বাড়ির চুনখসা দেয়াল আর অন্ধকার। ক্লান্ত অসুস্থ অন্যমনস্ক অমিদিকে কি বলবার আছে? কলকাতা উৎসবে কি এসে যায় এখানে? কি এসে যায় নয়াদিল্লির ঘোষণায়।"

তিনি কষ্ট পেলেন অমিদিকে এই মূর্তিতে দেখে, এমনি নিরুত্তাপ উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তায়। 'অমিদি মরে গেছেন—পাথরের প্রতিমার মতো হিম হয়ে আছে অমিদির ব্যক্তিত্বের সমস্ত উষ্ণতা'।

এরপর ফ্ল্যাশব্যাকে চৌদ্দ-পনেরো বছর আগেকার কথা আছে যেখানে অমিদির ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

এক মফস্‌সল শহরের বাসিন্দা গল্পের কথক ও অমিদি। সন্তোষদা আখড়ায় ব্যায়াম শেখাতেন। সন্তোষদার চিঠির আদানপ্রদানের সূত্রে অমিদির সঙ্গে আলাপ গল্পের কথকের। সন্তোষদা স্বদেশী করতেন। রিভলবার কাগজপত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন অমিদি। সন্তোষদার জেল হয়। অমিদির বাবার সরকারি চাকরি চলে যায়। পরের বছর অমিদির বিয়ে হয়ে যায়। অমিদির স্বামীর স্টিল-ট্রাঙ্কের দোকানের চাকরি। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মাস-মাইনে। শ্বশুরের ফাইফরমাশ খাটতে হয় অমিদিকে, গালমন্দও খেতে হয়। স্বামীর হাতে মাঝে মাঝে মারও খেতে হয়।

অমিদির প্রশ্ন ছিল—'আমাদের আর কোন আশা নেই নারে তপু?'

নায়কের অনুভূতি—"অসহ্য কষ্ট হয়েছিল। তবু অমিদির আর্তনাদে এইটুকু বুঝেছিলাম, অমিদি বেঁচে আছেন এখনও।"

তিনি ভেবেছেন "সন্তোষদা'রা জেলে। তাঁরা জানেন, তাঁরা লড়াই করেছেন। শত্রু তাঁদের সামনে। অমিদির মতো মেয়েরাও তো একই সংগ্রামের একই উত্তেজনায় অংশ নিয়েছিলেন। শুধু তাঁদের মামলায় ট্রাইবুনাল নয়, জেল-পুলিশ নয়—রায় দিয়েছে অভিশপ্ত বাঙালি সমাজের দারিদ্র্য।"

ননী ভৌমিকের গল্পের জগতে সলিমের মা উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র। 'আগন্তুক' গল্প সংকলনের অন্তর্গত 'ইজ্জত' গল্পের নায়িকা। সে গাঁয়ের মেয়ে। আহিনুদ্দিন প্রধানের বেটা মইনুদ্দিন প্রধানের বউ। খানদানি বংশের বউ সে। অন্দরের কর্ত্রী মইনের মা নতুন বউকে উপদেশ দিয়েছিল, "গরিব হয়েছি, কিন্তু এ ঘরের ইমান বড়ো কড়া বৌ। অচেনা পরপুরুষের দিকে চেওনা। ঘরের বাইরে পা বাড়িও না। জিগ্যেস করে কাজ করবে।" তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। সলিমের মা হয়েছে।

জোতদার করম আলি তাদের সমস্ত জমি গ্রাস করেছে। তারা গরিব হয়ে যাওয়ায় সলিমের মা মাঠে কাজ করতে নামার প্রস্তাব দিয়েছিল। মইনুদ্দিন ক্ষিপ্ত হয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাকে মেরেছিল। প্রধানদের ঘরের বউ পা বাড়াবে ঘেরাটোপ আব্রুর বাইরে—তা হতে পারে না।

তারা ভাগচাষিতে পরিণত হয়েছিল। করম আলির খামারে মঈনুদ্দিন কাজ করত। করম আলি কর্জা বন্ধ করে দিল। বর্ষাকালটা কাঁঠাল খেয়ে চলল। বর্ষার পর সব গয়না পেটের জন্য চলে গেল। বর্ষার পর মড়ক লেগেছিল। দুদিনের জ্বরে তাদের বাচ্চা সলিম মরে গেল। প্রধানের বাড়ি বউ হওয়ার দরুণ কাঁদতে গিয়েও মঈনুদ্দিনের ধমক খেতে হয়েছিল।

একদিন আধিয়াররা পণ করল এবার জোতদারের খোলানে ধান উঠবে না। ধান উঠবে কৃষকদের নিজের খোলানে। সেইখানে ন্যায্য বিচার হবে ভাগের।

করম আলি লাঠিয়াল এনেছিল। সলিমের মা ঘরে থাকতে পারেনি। ধানকাটা মানুষগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোন সময় যেন আপন মনে চলতে শুরু করে দিয়েছিল এই হতভাগিনি কৃষাণী মা। সিপাহি চৌকিদার দফাদাররা বন্দুক-লাঠি নিয়ে ধান কেড়ে নিতে এসেছিল। আশ্চর্য উন্মাদ একটা মুহূর্ত। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা যার বারণ, সেই সলিমের মা একদঙ্গল পুরুষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বেশরম, বেআব্রু হয়ে। আধিয়াররা সারা মাঠ থেকে লাঠি হাতে ছুটে এসেছিল। সলিমের মা বিধ্বস্ত ও রক্তাক্ত হয়েছিল। কিন্তু জোতদার ধান নিয়ে যেতে পারেনি। সেদিন মঈনুদ্দিন তাকে মারেনি। এতদিন পরে সলিমের শোকে তার মা কাঁদতে পেরেছিল।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পূর্বক্ষণ গল্পসংকলনের অন্তর্গত 'গান্ধারী' গল্পের মা-মণি এক বিচিত্র নারীচরিত্র।

গল্পের নায়ক মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির বাড়ি মফস্‌সল জেলার এক শহরে। যখনই শহরে আসা হত তখন মা-মণিকে দেখতে এসে গল্প-গুজব করা হত। ছেলেবেলা থেকেই মা-মণিকে দেখছেন। ইংরেজির মাস্টারমশাই প্রমথবাবুর স্ত্রী। তিনিই স্বামীর ছাত্রদের বলেছিলেন তাঁকে মা-মণি বলে ডাকতে। প্রমথবাবুর ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় ছিলেন মা-মণি। মা-মণি কবিতা আবৃত্তি করতেন—গুণগুণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। তাঁদের অভাব-অনটন ছিল। আর মা-মণির ছেলেপিলে হয়েছিল একপাল। তাঁর বড়োছেলে শ্যামল যখন জোয়ান তখনও মা-মণির সন্তান হয়ে চলেছে। ডাক্তারির ছাত্র (বীরু) গল্প-কথকের ঘৃণা হয়েছিল প্রমথবাবুর উপর। মা-মণি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। একটি মৃত সন্তান (মা-মণির) প্রসবের পর প্রমথবাবুকে তিনি বলেছিলেন—'আরো ছেলে চাই আপনার? আশ্চর্য!' প্রমথবাবু বলেছিলেন—'একটাকেও মানুষ করে যেতে পারব না। কিন্তু...ও যে মানে না। ও তবু চায়।...আমি কি কব যদি...'

মা-মণির ছেলে চাওয়ার কারণ জানা গেল তাঁরই কথায়—

'আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে। সব কটাকে কি ভালোই না বাসি বীরু। সব কটাকে। যেটা মরে গেলো সেটাকে দেখিনি, তবু সেটাকে ভালোবাসি কেমন। বড় ছোট ছোটটা সবাইকে। তবু কি মনে হয় জানিস, যেন ভারি সুন্দর একটা ছেলে হবে আমার। ছেলে হোক মেয়ে হোক, এমন সুন্দর একটা কিছু হবে। যা আর কারো মতো নয়। তা কেন হয় না বীরু, বার বার এত যন্ত্রণা সইলাম, তবু সব কটাই কেমন একই রকম মামুলী হয়ে যাচ্ছে।"

আদিম নারীর প্রবৃত্তির দিকটা উঠে এসেছে 'গান্ধারী' গল্পে। যে গল্পকারের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতির শিল্পরূপ

মূর্ত হয়ে উঠেছে তিনিও আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে গল্প লিখতে পারেন ও তা শিল্পসার্থক হতে পারে—তার চেয়ে আশ্চর্য আর কিছু নাই। লেখকের সংহতিবোধের প্রশংসা করতে হয় এইজন্য যে ভাষা ব্যবহারের একটু এদিকওদিক হলে গল্প হয়ে উঠত চটুল। কিন্তু তা হয়নি। আশ্চর্য গম্ভীর সিরিয়াস হয়ে উঠেছে লেখকের শিল্পরীতির কল্যাণে।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'চৈত্রদিন' গল্প-সংকলনের অন্তর্গত 'পাওয়া না পাওয়া' গল্পে এক কমিউনিস্টের মায়ের কথা আছে। কমিউনিস্ট ছেলেটি মরণাপন্ন। হাসপাতালের বিনা পয়সার রোগ-শয্যায় শুয়ে আছে ক'দিন ধরে। চিরন্তন মায়ের ছবি এঁকেছেন লেখক—

"আর সবাই চলে যাবার পরেও বসে থাকে শুধু একজন, ওর মা। হাসপাতালের দারোয়ানটার হাতে সাক্ষাৎ-সমাপ্তির নির্বিকার ঘন্টাটা বেজে যায় যন্ত্রের মতো।...

তখনো বসে থাকে বুড়িটা—ওর মা। বসে বসে চেয়ে থাকে ওর শুকিয়ে আসা কাটাকাটা জীবন-খুইয়ে-কসা গতানুগতিক মুখখানার দিকে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ওর প্রায় স্তব্ধ চাদরে ঢাকা দেহটার ওপর, লাল চোখে কাঁপতে কাঁপতে কি যেন খোঁজে ওর মুখের মধ্যে, কি যেন দেখতে চায়, কি শুনতে চায়।"

মাকে খবর দিতে চায়নি ছেলেটি। মা খবর পেয়ে এসেছে। ছেলেটি চোখ বুজে থেকেও কেঁপে ওঠে ভেতরে ভেতরে। চোখ বুজে থেকেও ও জানে তার বুড়ী মার লাল চোখে একটা স্নেহার্ত অসহ্য প্রশ্ন কাঁপছে—'কী হল? শেষ পর্যন্ত কী পেলি তুই।'

শেষ মুহূর্তটুকুতে এই অসহ্য পীড়াদায়ক প্রশ্নটাকে শুনতে হবে—তা ছেলেটি চায়নি।

মাকে সে বলত সে 'অন্য কিছু' করতে চায়। পোস্টার দেওয়া আর কাগজ বিক্রি করার মতো তার কাজে মার অবিশ্বাসী চোখদুটো হতাশের মতো তাকিয়ে থাকত—'কী হল এতে, কী হবে?'

ছেলে মধ্যে হাসত—'হবে, হবে নিশ্চয়। সবুর করো...'

দশ বারো বছর আগে যা বলত—পরেও একই কথা বলে এসেছে। এখন সে মরছে। বুড়ি সবুর করতে পারলেও নিজে আর সবুর করতে পারেনি।

তার মৃত্যুর আগেও মা ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করেছিল—'কী হল। কী পেলি তুই শেষ পর্যন্ত।'

সে ধীরে ধীরে প্রথম—এই প্রথম পরিপূর্ণ জবাব দিল ঐ প্রশ্নটার—'আমি যে কমিউনিস্ট মা।'

কলোনির উদ্বাস্তু মা, আন্দোলনে আত্মলীলা সাঁওতাল বউ, নজরবন্দি স্বদেশীর আত্মহননকারী প্রেমিকা—অজস্র বৈচিত্র্যমণ্ডিত নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। তাঁর গল্পের জগৎ থেকে কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া হল মাত্র।

দ্বিভাষিক কবি রবীন্দ্রনাথ

(গীতাঞ্জলি পর্ব—১৯১২-১৯১৩)

রামদুলাল বসু

[এক]

দুটি ভাষায় সমান্তরালভাবে সাহিত্য রচনার ঘটনা বিশ্বে বিরল। সেই বিরল ঘটনাটি ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্ত থাকলেও তা নিতান্ত সংখ্যালঘু। আবার মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা না করেও অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনার উদাহরণ ও সাফল্য দুর্লভ নয়। তেমনি এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়, যাঁরা অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনার পত্তন করে তাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে ফিরে এসেছেন মাতৃভাষায়। এই আলোচনার ধারায় আমরা তিন শ্রেণীর লেখক পাই। (১) দুটি ভাষায় সমান্তরালভাবে সাহিত্য রচনা। (২) মাতৃভাষা ত্যাগ করে ভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা। (৩) অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনার সূচনা করেও মাতৃভাষায় ফিরে আসা।

প্রথম শ্রেণীতে পড়েন রবীন্দ্রনাথ এবং সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিভাবিক (Bilingual) রচনাকার হিসাবে তাঁর স্থান প্রথম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন এমন দৃষ্টান্ত কম। আমাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হয় উনিশ শতকে। ইংরেজি জনপ্রিয়তা পাবার সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের মধ্যেও একটা দ্বিধা দেখা দেয় সাহিত্যের ভাষা গ্রহণের ব্যাপারে। ইংরেজি না মাতৃভাষা। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একসময় মাতৃভাষাকে ইংরেজি প্রায় আবৃত করে দেয়। সংস্কৃত ঘেঁষা মাতৃভাষা যেমন এব শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তেমনি ইংরেজি অনেকের কাছে মাতৃভাষাকল্প হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে ইংরেজিটা ছিল সম্ভ্রমের ভাষা, যার সূচনা ডিরোজিও করে যান। এই ধারায় আসেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। যদিও মাতৃভাষাকে তিনি ত্যাগ করেননি। দ্বিভাবিক লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে যাঁকে প্রথম লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদ প্রায় তিনশোটি গান বাংলায় লিখেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিতদের একশ্রেণীর কাছে বাংলা সাহিত্য রচনা ছিল অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের বিষয়। ১৭৬০ (ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল) থেকে ১৮০০ পর্যন্ত সময় ছিল বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যাকাল। এই সময়ের মধ্যে অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার ধাপগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। কাশীপ্রসাদের ইংরেজি কবিতা অধ্যাপক ডি এল রিচার্ডসনের প্রশংসা পেয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাশীপ্রসাদই বাংলা ও ইংরেজি দুটি ধারার পত্তন করে গেছেন।

এ দেশে ইংরেজি কবিতা রচনার সূচনা করেন ডিরোজিও। ডক্টর জন গ্রান্ট ডিরোজিওকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ তাঁর কবিতা প্রকাশ করে। ডিরোজিও অবশ্য ইংরেজভাষী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ভাগলপুরের ডিরোজিও কলকাতার হিন্দু কলেজে

শিক্ষকতার নিযুক্তি পান। বলা বাহুল্য যে ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকৃত না হলে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন না ঘটলে ইংরেজি সাহিত্য রচনার ধারাটি আমাদের দেশে গড়ে উঠত না। ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে INDO ANGLIAN কবিতার সূচনা, যার পশ্চাতে ছিল ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার প্রতি আকর্ষণ এবং ইউরোপীয় মানবতাবাদ। দ্বিতীয় ধারায় আছেন তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রমুখেরা। এঁদের রচনায় ভারতীয় বিষয়ই মুখ্যত স্থান পেয়েছে। হরচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, নবকৃষ্ণ ঘোষ (রামশর্মা), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ইংরেজি কবিতায় ভারতেরই আধিপত্য। তরু দত্ত বাংলা ভালো জানতেন না। অন্যদিকে ছিলেন স্বল্পজীবী। পিতার আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা তাঁকে ইংরেজি কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু ও শ্রীঅরবিন্দের ধারায় পরবর্তীকালে ভারতীয় কবিদের অনেকেই এসেছেন, যাঁরা ইংরেজিতে কবিতা রচনা করেছেন। এঁরা হলেন এন বি পাই, কে ডি শেঠনা, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রাথমিক কালে অনেকেই শুরু করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্য দিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছেন মাতৃভাষায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (LYRICS OF IND)। মাদ্রাজে থাকার সময় মধুসূদন 'রিজিয়া' নামে একটি নাটক লেখেন ইংরেজিতে। সেটা মুদ্রিত হয়নি। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ইংরেজি কবিতা রচনায় স্বচ্ছন্দ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ছোটো বড়ো অনেক ইংরেজি কবিতা লেখেন। বায়রনের মতো কবি হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। ১৮৪৮-৪৯ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত MADRAS CIRCULATOR পত্রিকায় তিনি ছদ্মনামে A VISION OF THE PAST—CAPTIVE LADIE কাব্য লেখেন, পৃথ্বিরাজ-সংযুক্তার কাহিনি নিয়ে। ১৮৪৯ সালে কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে কবিতা লিখলেও মধুসূদনের কাব্যের বিষয় ছিল ভারতীয় ইতিহাসের কাহিনি। নাটক 'রিজিয়া'ও তার ব্যতিক্রম নয়। বঙ্কিমও শুরু করেছিলেন ইংরেজি উপন্যাস রচনা দিয়ে। মধুসূদন উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গ কাব্যলক্ষ্মীর আশ্রয়ই হবে তাঁর অভিপ্রেত। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনাই হবে তাঁর 'Great Object'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'RAJMOHAN'S WIFE', ১৮৬৪ সালে 'INDIAN FIELD' নামে একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনি আধুনিক বাঙালির পারিবারিক জীবন। গ্রন্থাকারে বইটি প্রকাশিত হয়নি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা করলেও মূলত বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। কেউই ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় সমান্তরালভাবে সাহিত্যসৃষ্টি করেননি। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। GITANJALI (1912) প্রকাশের কাল থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে তাঁর ১৮টি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি মূলত দু'ধরনের। (১) কবিতার অনুবাদ। (২) প্রবন্ধ ও আলোচনা গ্রন্থ। শেষোক্ত শ্রেণীটি মৌলিক রচনা। এছাড়া অসংখ্য ভূমিকা ও প্রাককথনজাতীয় ইংরেজি রচনা। এছাড়া আছে বক্তৃতা ও অভিভাষণ। এর অনেক অংশ আজও সাময়িকপত্রের পাতায় রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অন্তত দশখানি ইংরেজি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

[দুই]

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্য রচনায় প্রবেশের আগে তাঁর ইংরেজি রচনাবলীর একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত রচনাবলীর ক্রমানুযায়ী তালিকা নিম্নরূপ।

1912—Gitanjali. 1913—The Gardener, Sadhana, The Crecent Moon, Chitra; 1914—One hundred Poems Of Kabir; 1916 : Fruit Gathering, Stray Birds; 1917 : Sacrifice and Other Plays, Personality, Nationalism; 1918 : Lover's Gift and Crossing, 1921 : The Fugitive; 1922 : Creative Unity; 1925 : Red Oleanders; 1928 : Fire Files, Letters to a Friend; 1929 : Thoughts from Tagore; 1931: The Child, The Religion of Man.

উপরোক্ত গ্রন্থাবলি ছাড়াও ভারত থেকে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। যথা FUGITIVE (1919), THE PARROT'S TRAINING (1918), TALKS IN CHINA (1925)। এছাড়া বহু সংখ্যক রচনা ও প্রবন্ধের অনুবাদ, যেগুলি জন-অনুরোধে লিখিত হয়েছিল। তবে তাঁর এসব রচনাবলির অধিকাংশই ছিল পরিকল্পনাহীন। ব্যতিক্রম 'STRAY BIRDS' এবং 'FIREFLIES'। 'GITANJALI'র ভাবক্রম রক্ষিত হয়নি। কেন-না কাব্যটিতে যে অন্য দশটি কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলির ভাবক্রম ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সেই বিচারে 'THE CRESENT MOON' এর কবিতাগুলিতে বিষয় ভাবের ঐক্য অনেক বেশি। তার কারণ ৪০টি কবিতার মধ্যে ৩৫টি কবিতাই 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'THE GARDENER' এর প্রকৃতি মিশ্রভাবাশ্রিত। ৮৫টি কবিতার মধ্যে সর্বাধিক কবিতা (২৬) নেওয়া হয়েছে 'ক্ষণিকা' (১৯০০) থেকে। 'কল্পনা' ও 'সোনার তরী' থেকে যথাক্রমে ১৩ ও ৮টি কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। বাকিগুলি এসেছে 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)-৩, মায়ারখেলা (১৮৮৮)-৩, মানসী (১৮৯০)-৩, চিত্রা (১৮৯৬)-৬, চৈতালি (১৮৯৬)-৭, খেয়া (১৯০৬)-৪, প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)-১, গীতাঞ্জলি (১৯১০)-১, রাজা (১৯১০)-১, উৎসর্গ (১৯১৪)-৬, অন্যান্য-৩। THE GARDENER পরিকল্পিত হয়েছিল GITANJALI'র বিপরীত ধারায়। অর্থাৎ কাব্যটি তিনি রহস্যভাবমুক্তরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে বিষয়গত ভাবসাম্য থাকলেও GARDENER-এ তার অভাব স্পষ্ট। অন্যদিকে বিষয়গত বৈপরীত্য সৃষ্টি করে তিনি GARDENER কে একটা স্বতন্ত্র চেহারা দিতে চেয়েছেন। মূলত ১৮৮৬ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত রচিত কয়েকটি কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা সংকলিত করেন। GARDENER-এর অনুবাদও স্বচ্ছন্দ নয়। কোথাও মূল কবিতার সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা ভাবান্তর। রবীন্দ্রনাথের এই অভ্যাসটিকে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'Dangerous Habit'। তিনি তাঁর অনেক অনবদ্য কবিতার খণ্ডিত রূপ দিয়ে এক অবিশ্বাস্য অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন। (The English Writings of Rabindranath Tagore, Sahitya Academi, Vol. 1. P. 24)। ধর্মীয় কাব্য GITANJALI-র সঙ্গে GARDENER এর বৈপরীত্য সৃষ্টি করে তিনি তাঁর কবিধর্মের যে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, GARDENER সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ইংরেজি কাব্য FRUIT GATHERING (1916)-এ কবিতার সংখ্যা ৮৬টি। এটিও মিশ্র প্রকৃতির সংকলন। অর্থাৎ তাঁর ১৬টি গ্রন্থ থেকে ও অন্য ২টি কবিতা নেওয়া হয়েছে (অজ্ঞাত সূত্র থেকে গৃহীত)। এগুলি হোল 'বলাকা' (১৯১৬) থেকে ১৫টি, 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) থেকে ১৭টি, 'গীতালি' (১৯১৪) থেকে ১৪টি, 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) থেকে ১টি, 'চিত্রা' (১৮৯৬) থেকে ১টি, 'কাহিনী' (১৯০০) থেকে ২টি, 'কল্পনা' (১৯০০) থেকে ১টি, 'কথা' (১৯০০) থেকে ৮টি, 'নৈবেদ্য' (১৯০১) থেকে ৩টি, 'স্মরণ' (১৯০৩) থেকে ৪টি, 'খেয়া' (১৯০৬) থেকে ৫টি, 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) থেকে ১টি, 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) থেকে ১টি, 'রাজা' (১৯১০) থেকে ১টি, 'উৎসর্গ' (১৯১৪) থেকে ১৪টি, বিবিধ থেকে ৪টি নিয়ে FRUIT GATHERING এর কাব্যাধার। এ কাব্যটিরও ভারসাম্য রক্ষা পায়নি। 'বলাকা'র তত্ত্বমূলক কবিতার গভীর ও গম্ভীর কবিতাগুলির পাশে গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যের কবিতাগুলি বা অন্যান্য গৃহীত কবিতাগুলি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। 'কাহিনী'র কবিতাগুলিকে কৃষ্ণ কৃপালিনী বলেছেন ক্ষুদ্র মহাভারত জাতীয় যা ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এই কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলির ক্রমও ব্যতিক্রমী। এ কারণে এটিকে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'একটি নিরানন্দ বিশৃঙ্খল সংকলন' (ডঃ শিশিরকুমার দাশ)। LOVERS GIFT, CROSSING (1918), THE FUGITIVE (1921), STRAY BIRDS (1916) এবং FIRE FLIES কাব্যগুলি তাদের গঠন সাদৃশ্যের জন্য অনেকখানি সংহত সৃষ্টি। উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থগুলি ও কবির নানা কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কাব্য সংকলন। সেই অর্থে কবির কাব্য প্রতিভার বৈচিত্র্যজ্ঞাপক।

ভারতের বাইরে রবীন্দ্রকাব্য পরিচিতির একমাত্র উপাদান রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি অনুবাদ। ভারতেও নানা ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্ররচনার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই ইংরেজি রচনা থেকে অনূদিত, বাংলা থেকে নয়। ইংরেজি রচনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক পরিচিতির যে অন্যতম কারণ সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রসাহিত্য বেঁচে থাকারও অন্যতম কারণ তাঁর স্বকৃত ইংরেজি রচনা। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতিরও প্রধান কারণ তাঁর ইংরেজি রচনা। তাঁর বহু ইংরেজি গ্রন্থের সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয়। ডঃ শিশিরকুমার দাশের মতে পরবর্তী শতকে রবীন্দ্রনাথ যদি বিস্মৃত না হন তো, সেটা সম্ভব হবে কেবলমাত্র তাঁর ইংরেজি রচনাবলির জন্য। (ঐ)

[তিন]

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতার সংকলন গ্রন্থগুলি নানা নামে চিহ্নিত হলেও আসলে সেগুলি তাঁর কবিপ্রতিভার অবিমিশ্র সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের বাংলা কাব্যাবলীর নির্বাচিত কবিতা নিয়ে এক একটি সংকলন গড়ে উঠেছে। এগুলিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুটি বা তিনটি কবিতা নিয়ে একটি কবিতা রূপ পেয়েছে। আবার বাংলা কাব্যগ্রন্থ বহির্ভূত এমন অনেক কবিতা যুক্ত হয়েছে, যেগুলি তাঁর মৌলিক ইংরেজি রচনা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অনেক ইংরেজি কবিতাও সরাসরি তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া একই বাংলা কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন কবিতাও তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের তালিকা এইরকম—
১৯১২—GITANJALI, ১৯১৩—THE GARDENER, THE CRESENT MOON, ১৯১৪—ONE HUNDRED POEMS OF KABIR, ১৯১৬—FRUIT GATHERING, STRAY BIRDS, ১৯১৮—LOVERS GIFT AND CROSSING, ১৯২১—THE FUGITIVE, ১৯২৮—FIRE FLIES, ১৯৩১—THE CHILD, ১৯৩৬—COLLECTED POEMS AND PLAYS, ১৯৪২—POEMS, এছাড়া আরও কিছু রচনা পাওয়া যায়।

GITANJALI যে ইউরোপে (এবং আমেরিকায়) তাঁর সাড়া জাগানো কাব্য একথা বলা বাহুল্য। নোবেল পুরস্কার তাঁর বিশ্বপরিচিতির ও কবিখ্যাতির ব্যাপ্তি এনেছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে গীতাঞ্জলি অনুবাদ শুরু করেছিলেন শিলাইদহে অবকাশ যাপনকালে, নিতান্তই আলস্যের দায় মোচনের জন্য। বাংলা গীতাঞ্জলির প্রকাশ কাল ১৯১০ (৩১শে শ্রাবণ, ১৩১৭/ইংরাজি ১৬ আগষ্ট ১৯১০)। ইংল্যাণ্ড যাওয়া শারীরিক কারণে স্থগিত হওয়ার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ২২ মার্চ, ১৯১০ শিলাইদহ যান। ৬ চৈত্র ১৩১৮-র সকালে কলকাতা থেকে জাহাজে (City Of Paris) ইংল্যাণ্ড যাওয়ার দিন নির্দিষ্ট থাকলেও তিনি যেতে না পারার জন্য মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির এক নতুন পথ আবিষ্কারের আনন্দে তিনি মনোবেদনা মুক্ত হতে পেরেছিলেন। শিলাইদহে অবস্থানকালে গীতিমাল্য'র গানগুলি রচনার সময়ে সমান্তরাল ধারায় তাঁর গান ও কবিতার অনুবাদ শুরু করলেন। যে পাণ্ডুলিপিতে এগুলি ছিল সেটি পরবর্তীকালে তিনি উপহার দিয়েছিলেন বন্ধু রোটেনস্টাইনকে। পাণ্ডুলিপি এখনও সংরক্ষিত আছে হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হটন গ্রন্থাগারে। সেই পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত ১৪টি কবিতা (গান)-র মধ্যে ৩টি গীতাঞ্জলির ও বাকি ১১টি অপ্রকাশিত গীতিমাল্য থেকে নেওয়া। রোটেনস্টাইন পাণ্ডুলিপিটি চিহ্নিত করেছিলেন একটি বাক্যে—"Original manuscript of Gitanjali which the Poet brought me from India on his initial visit to us at Oak Hill Park."

'Gitanjali'র সূত্রপাত ১৯১০-এ কবির শিলাইদহে অবস্থানকালে। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি তাঁর মতো করে জানিয়েছেন—'শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম।...হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠতে চায়—অথচ কোমর বেঁধে লেখার মত বল আমার ছিল না। সেইজন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম....আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল সেটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল'—(চিঠিপত্র-৫)।

এভাবেই শুরু হোল 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদের কাজটি একটা অনাবশ্যক কাজ বলে মনে করেছিলেন। এই সূচনা থেকে পরিণতি—পথে যাত্রার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল রবীন্দ্র প্রতিভার এক নতুন অধ্যায়। 'Gitanjali'র বিশ্বস্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধিত করল ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ রচনায়। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের জন্য যে কবিতাটি তিনি প্রথম বেছে নেন, সেটি ছিল একটি সদ্যরচিত কবিতা, 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।' (Gitanjali-88, গীতিমাল্য-৮)। শিলাইদহের তালিকায় এই দুটি কবিতাই পাওয়া যায়। পরবর্তী

অনুবাদ 'আমার তুমি অশেষ করেছ' শান্তিনিকেতনে কৃত (৭ই বৈশাখ ১৩১৯) (Gitanjali-1./গীতিমাল্য-২৩), 'হার মানা হার পরাব তোমার গলে' (Gitanjali-98/গীতিমাল্য-২৪) গানটির অনুবাদটিও একই তারিখের। এই পর্বে মোট ৮৬টি গানের অনুবাদ পাওয়া যায়, যেগুলি 'Gitanjali'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'GITANJALI'র পদসজ্জা কালানুক্রমিক কিম্বা ভাবানুপাতিক নয়। যে সব কাব্য থেকে পদগুলি সংগৃহীত হয়েছে, সেইসব পদও GITANJALIতে ক্রমিক অনুসৃত নয়। যার ফলে 'GITANJALI'র ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। স্বকৃত অনুবাদের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি স্বয়ং প্রশ্নটি তুলেছিলেন টি এস এলিয়টের কাছে। এলিয়ট তাঁকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন যে, 'যদি কেউ বলে, এ লেখাকে আরও improve করতে পারে সে সাহিত্যের কিছুই জানে না।' (রবিজীবনী/ষষ্ঠ/পৃ. ৩১৫)। এলিয়ট রবীন্দ্রনাথকে সংশয়মুক্ত করতে চাইলেও রবীন্দ্রনাথের সংশয় থেকেই গিয়েছিল। GITANJALI যে বাংলা গীতাঞ্জলির পূর্বাপর অনুবাদ নয় সেটা নতুন কথা নয়। বাংলা গীতাঞ্জলিতে আছে ১৫৭টি পদ। GITANJALIতে ১০০। এই বর্জন ও সংযোজনের বিষয়টি এরকম : 'GITANJALI'র ১০০টি গানের মোট ৫৭টি গান বাংলা গীতাঞ্জলি থেকে নেওয়া হয়েছে। বাকি ৫০টি গান রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছেন তাঁর অন্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে। গীতিমাল্য ও নৈবেদ্য—১৬টি করে, খেয়া—১১টি, শিশু—৩টি, কল্পনা, স্মরণ, চৈতালি থেকে—১টি করে, এবং অচলায়তন নাটক থেকে ১টি গান। বাংলা গীতাঞ্জলির ১০৪টি বর্জিত গানের পরিবর্তে ৫০টি নতুন গান ইংরেজি GITANJALIতে সংযোজিত হয়েছে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি নতুন পরিকল্পনায় ও পদসজ্জায় প্রকাশিত হয়েছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে এলিয়টের ভূমিকা সহ (১লা নভেম্বর ১৯১২)। বাংলা গীতাঞ্জলির প্রথম পদ 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার—' ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে বর্জিত এবং শেষ গান 'দিবস যদি সাঙ্গ হল—' (১৫৭) স্থানচ্যুত হয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে স্থান পেয়েছে ২৪ সংখ্যক পদ রূপে।' GITANJALI'র প্রথম গান 'আমারে তুমি অশেষ করেছ—' (thou hast made me endless such is thy pleasure) বাংলা গীতাঞ্জলিতে নেই এবং শেষ গান 'In one salutation to the my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet' (একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে/সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে'), বাংলা গীতাঞ্জলির ১৪৮ সংখ্যক গান। এ থেকে বোঝা যায় যে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' গীতাঞ্জলির একটি নতুন সংস্করণ।

ইংল্যাণ্ডের হ্যামস্টেড-এ অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা (গান) লেখেন এবং সে দুটির অনুবাদও করেন। কবিতা দুটি হল, 'তব রবি কর আসে কর বাড়াইয়া' (গীতিমাল্য-২৯) , এবং 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি' (গীতিমাল্য-৩০)। রোটেনস্টাইন GITANJALI-র পাণ্ডুলিপি টাইপ করে পাঠিয়েছিলেন ইংলণ্ডের তৎকালীন তিন শীর্ষ কাব্যবোদ্ধার কাছে—এঁরা হলেন কবি ডবলিউ বি ইয়েটস্, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এ সি ব্রাডলে এবং একেশ্বরবাদী স্টপফোর্ড অগষ্টাস ব্রুক। রোটেনস্টাইনের বাড়িতে সান্ধ্যভোজে (২৭ জুন, ১৯১২) ইয়েটস্ খুব সুন্দর সুর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি তর্জমা পড়েছিলেন এবং প্রশংসাও করেছিলেন। ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ 'edit করে একটা 'introduction' সহ মুদ্রণের পক্ষে মত প্রকাশ

করেছিলেন। স্টপফোর্ড ব্রুক এবং ব্রাডলির প্রতিক্রিয়া ছিল আবেগপূর্ণ। ব্রাডলির মতে, তাঁর মনে হয়েছে শেষ পর্যন্ত তাঁরা আবার এক মহান কবিকে পেলেন। আর স্টপফোর্ড ব্রুকের অভিমত—"I have read them with more than admiration with great gratitude for their spiritual help—and for the love and beauty which they deepen far more than I can tell, I wish I was worthy of them." এন্ড্রুজের একটি প্রবন্ধ (An Evening with Rabindranath/The Modern Review/Aug 1912) থেকে জানা যায় যে, ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি আকর্ষণী শক্তির কথা বলেছেন। আরও বলেছেন, 'besides a feeling of natural beauty which linked it with the Poets of the revolution Period of English Literature, with Keats and Shelly and Wordsworth. At the same it was singularly and wholly original.' ইয়েটস রোটেনস্টাইনের বাড়িতে আর একটি আসরে (৭ জুলাই ১৯১২) রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতা গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে পড়েন (read with wonderful effects)। কবিতা তিনটি হোল—১. I was not aware of the moment when I first crossed the thresold of this life ('জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে' (নৈবেদ্য-৮৯)। ২. In the deep shadows of the rainy july ('আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে'—গীতাঞ্জলি-১৮)। ৩. On the slope of the desolate river among tall grasses I asked her ('কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে'—(খেয়া)। অনাবশ্যক এই তিনটি কবিতাই GITANJALI'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (৯৫, ২২ এবং ৬৪)। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতা যে বিদগ্ধ ইংরেজ মহলে সাড়া জাগিয়েছিল সে বিষয়ে তথ্যের অভাব নেই। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের উল্লেখ করি। The Statesman এর প্রাক্তন সম্পাদক S. K. Ratcliffe প্রশ্ন করেছিলেন কেন তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ৫০তম বছর অতিক্রম করলেন ইংরেজি পাঠক সমাজে প্রবেশ করার কোনো চেষ্টা না করে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, বাংলা কবিতার ভাব ইংরেজি কবিতার তুলনায় এতটাই দূরবর্তী যে, তার অনুবাদ সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এতই দুর্বল যে, তিনি সে বিষয়ে নিজে কোনো উদ্যোগ নিতে পারেননি। (An Indian who conquered Europe/The Daily News, 7 Aug 1926)।

১৫ জুলাই, ১৯১২য় কেমব্রিজ থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে ফিরে আসেন, GITANJALI'র রচনা পর্ব তখনও চলছিল। ওই দিনই (১৫ জুলাই) তিনি তিনটি মৃত্যু বিষয়ক কবিতা অনুবাদ করেন। রোটেনস্টাইনের মাতৃবিয়োগের খবর পেয়ে প্রথমটি তিনি পাঠিয়ে দেন। সেটি 'স্মরণ' (মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু সংক্রান্ত) এর পঞ্চম সংখ্যক কবিতা (আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই...)র অনুবাদ—"In desperate hope I go and search her in all corners of my room." বাকি দুটি কবিতা "পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত আমার ঘরের দ্বারে" (নৈবেদ্য-১৮) "Death Thy servant, is at my door. He has crossed the unknown sea brought Thy call to my home", "একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ" (দুর্লভ জন্ম/চৈতালি)—"I know that the day will come when my sight of the earth shall be lost", GITANJALI-তে গান তিনটি যথাক্রমে ৮৭, ৮৬ ও ৯২ সংখ্যকরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রোটেনস্টাইন আয়োজিত সব অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ থাকতেন

মধ্যমণি। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে সভাস্থল গম্ভীর রূপ পেত। ইয়েটস্ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সুরেলা কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ কৃত তাঁর ইংরেজি কবিতা পাঠ করতেন। শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতেন। রবীন্দ্রনাথ অন্তত মনে মনে আশ্বস্ত হতেন তাঁর অনুবাদ কর্মের সাফল্য সম্পর্কে। বলা বাহুল্য GITANJALI-র কবিতা বা গানগুলি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন গদ্যে। GITANJALI-র স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনা, বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে প্রকাশেরও দাবিদার হয়ে ওঠে। পরের বছরেই (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথের দু'খানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশিত হয়। এবং বাংলার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইংরেজি কাব্য রচনার (এবং গদ্য) ধারা এভাবে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাবলি তাঁর বিশ্বপরিচিতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি রচনার কাজটি সম্পন্ন করেন। রোটেনস্টাইনের হাতে প্রকাশের জন্য GITANJALI তুলে দেবার ২০ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ১৮টি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

GITANJALI-র কিছু সংস্কার সাধন করা যায় কিনা সে সম্পর্কে ইয়েটস্-এর অভিমত জানতে চেয়ে রোটেনস্টাইন তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। মনে হয়, কেমব্রিজ থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস্-এর এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল এবং পাঠসংস্কারের কাজটি ৪/৫ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল। INDIA SOCIETY থেকে GITANJALI প্রকাশের সিদ্ধান্ত হবার পর রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন সাপেক্ষে ইয়েটস্ GITANJALI-র পাণ্ডুলিপি সংস্কারে হাত দেন। GITANJALI ইয়েটস কর্তৃক পুনর্লিখিত হয়েছিল এরকম একটা খবর রটনার পর রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে রোটেনস্টাইনকে লেখেন, "more over, I was with him (Yeats) during the revision...though you have the first draft of my translations with you unfortunately I have allowed the revised typed pages to get lost in which Yeats penciled his corrections"। হার্ভার্ডে হটন লাইব্রেরিতে GITANJALI-র যে ১২টা কবিতা (গান) রক্ষিত আছে সেগুলি ইয়েটস কর্তৃক পেন্সিল দ্বারা সংশোধিত। সেখানে দুটি কবিতার সামান্য সংশোধনের সুপারিশ পাওয়া যায়। সে দুটি কবিতা GITANJALI-র ৮৭ ও ৮৮ সংখ্যক। প্রথমটিতে (৮৭) তিনটি ও দ্বিতীয়টিতে (৮৮) চারটি সংশোধনের সুপারিশ পেন্সিলে করা হয়েছে। যার মধ্যে মুদ্রিত পাঠে প্রথমটিতে একটি ও দ্বিতীয়টিতে চারটি গৃহীত হতে দেখা যায়। আরও দু একটি ছোটোখাটো সংশোধন মূল পুথির তুলনায় দেখা গেলেও সেগুলি উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। Emest Ryms-এর (Everymans' Literary Series-এর সম্পাদক) বক্তব্যে বিষয়টি সমর্থিত হতে দেখা যায়—It may be as well as to say, then, that the small manuscript book in which the author made there new English versions when he was on his way here in 1912, is still in the possession of Mr. will Rothenstein and any one who takes the trouble to compare the pocket book with the printed text will find that the variation are of the slightest (Emest Ryms; Rabindranath Tagore; A Biographical study 1915) (দ্র. রবিজীবনী/ষষ্ঠ/পৃ. ৩২৩)।

১৯১৩ সালের মার্চ-এ ম্যাকমিলান GITANJALI-র পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করে। ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণের সঙ্গে ম্যাকমিলান সংস্করণের কিছু অমিল লক্ষ্য করা যায়। সেটা এইরকম—

কবিতার নাম	ইণ্ডিয়া সোসাইটি	ম্যাকমিলান
৩০	My Lord	My lord
৫১	Someone has said	Some one has said

(Some one has said, "Vain is thy cry! Greet him with empty hands, lead him into thy rooms all bare। প্রথম সংস্করণে ছিল Someone, পরবর্তী সং-এ Some one).।

৫২	Shy and Soft demeanour	Coyness and Sweetness of demeanour (Last Paragraph)

(...and weeping in corners, no more Coyness and sweetness of demeanour.)

৮৭	My Lord	My lord

সি এফ এন্ড্রুজ এই পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করলে ইয়েটস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি বিশেষভাবে ৫২-সংখ্যক কবিতাটির পরিবর্তন সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের GITANJALI-র মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা গেছে, অনুচ্ছেদ গঠনে ও বিন্যাস কলায়। এই পরিবর্তনের কোনো কারণ জানা যায় না।

কবি এজরা পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে শিকাগো থেকে প্রকাশিত POETRY পত্রিকায় TAGORE'S POEM নামে GITANJALI-র ৬টি কবিতা পাঠান এবং সেগুলি প্রকাশিত হয় ১৯১২-র ডিসেম্বরে। এজরা পাউণ্ড GITANJALI-র কবিতাগুলিকে দেখেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে GITANJALI-র কবিতাগুলি ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সংযোজন। 'FORTNIGHTLY REVIEW (MARCH 1913) পত্রিকায় এজরা পাউণ্ডের 'RABINDRANATH TAGORE' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বক্তব্য পাওয়া যায়।

GITANJALI ইয়েটসকে অভিভূত করেছিল। এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি অনুবাদপাঠের জন্য। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে যে প্রশ্ন উঠুক না কেন, GITANJALI যে ইংরেজি জানা সমাজে অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছিল সেকথা ঐতিহাসিক সত্য। মূল কবিতাগুলি সহজ, সরল গঠন সংহতিতে নির্ভার এবং ছন্দমাধুর্যে স্বতঃস্ফূর্ত। প্রতিটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের নিপুণ শিল্পসৃষ্টির স্বাক্ষর। গদ্যে অনূদিত GITANJALIও মূল রচনার অনেকখানি মূল্যমানারূপ। সম্ভবত ভাবানুষঙ্গে অকৃত্রিম বলেই GITANJALI ইয়েটস ও এজরা পাউণ্ডের প্রশংসাধন্য হতে পেরেছিল এবং সেই হেতু এক দশক ধরে ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয়তার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। GITANJALI-র অনুবাদ সম্পর্কে একজন বিদগ্ধ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করি—"The translations are more or less faithful to the Bengali original; the deviations, which are not many, that one might point out are not only legitimate but satisfying too. Once

and only once, did Tagore succeed in translating his own poems" (Sisir Kumar Das Enghish Writings of Rabindranath Tagore/Vol-1, P-602)। GITANJALI'র ভূমিকায় ইয়েটস এর প্রশস্তির ভাষা ছিল উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যপূর্ণ। "Rabindranath Tagore, like Chaucer's fore runners, writes music for his words and one understands at every moment that he is so abundant, so spontaneous, so daring in his passion. ...These verses will not lie in little printed books upon ladies' tables who turn the pages with indolent hands—or be carried about by the students at the University to be laid aside when the work of life begins, but as the generations pass travellers will hum them on the highway and men rowing upon rivers." ইয়েটস GITANJALIকে দেখেছেন আত্মদর্শনের মুকুর রূপে—"একটি সমগ্র জনগোষ্ঠী, একটি সমগ্র সভ্যতা যা আমাদের কাছে অপরিমেয় বিস্ময়ের বিষয়, কবি কল্পনায় তা-ই গৃহীত হয়েছে, তথাপি আমরা এর বিস্ময়-মুগ্ধতায় আন্দোলিত হই না, কারণ তা আমাদের আত্মদর্শনের মুখোমুখি করে দেয়, মনে হয় যেন আমরা রসেটির 'WILLOW WOOD' এর মধ্যে পদচারণা করে চলেছি অথবা সম্ভবত প্রথম সাহিত্যে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর যেন শুনলাম স্বপ্নের মধ্যে। "ইয়েটস-এর গভীরতম উপলব্ধি এই যে GITANJALI বিশ্বসাহিত্যে নববার্তা এনেছে।

ইয়েটস-এর কাছে GITANJALI, 'words full of Courtesy' এই প্রসঙ্গে একাধিক পদও তিনি উল্লেখ করেছেন। দুটি উদ্ধৃতি হল—

১। I have got my leave Bid me farewell, my brothers, I bow to you all and take my departure. Here I give back the keys of my door, and I give up all my claim to my house. I only ask for last kind words from you. We were neighbours for long but I received more than I could give. Now the day has dawned and the lamp that lit my dark corner is out. A Summons has come and I am ready for my journey (93). গানটি বাংলা গীতাঞ্জলিতে নেই। 'গীতিমাল্য'র ২৬ সংখ্যক এই কবিতাটি (গান) তিনি GITANJALI-র অন্তর্ভুক্ত করেন। কবিতাটি উদ্ধৃত করছি এইজন্যে যে মূলের সঙ্গে অনুবাদের ভাষা ও ভাবগত মিল অনুধাবন করা সম্ভব হবে। 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,/সবারে আমি প্রণাম করে যাই।/ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি/রাখিনা আর ঘরের দাবি,/সবার আজি প্রসাদবাণী চাই।/অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী,/দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।/প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি/নিবিয়া গেল কোণের বাতি,/পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই,/সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'

দ্বিতীয় উদাহরণ :—

"...They build their houses with sand and they play with eampty shells. With withered they weave their boats and smilingly float them on the vast deep; children have their play on the sea shore of worlds. They know not how to swim, they know not how to cast nets. Pearl fishers dive for pearls, merchants sail in their ships, while children gather pebbles and scatter them again. They seek not for hidden treasures they know not how to cast nets." (আংশিক উদ্ধৃতি) (৬০)

"বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,/ঝিনুক নিয়ে খেলা।/বিপুল নীল সলিল'-পরি/ভাসায় তারা খেলার তরী/আপন হাতে হেলায় গাড়ি/পাতায় গাঁথা ভেলা।/জগৎ-পারাবারের তীরে/ ছেলেরা করে খেলা।/জানে না তারা সাঁতার দেওয়া জানে না জাল ফেলা।/ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,/ বণিক ধায় তরণী বেয়ে,/ ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে/সাজায় বসি ঢেলা/রতন ধন খোঁজে না তারা/জানে না জাল ফেলা।" (শিশু/ভূমিকা)।

GITANJALI-র অনুবাদ বিষয়ানুযায়ী হয়েও ভাবোদ্দীপক। বিষয়ের সঙ্গে ভাবের সংযোগে পদ্যানুবাদও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলির স্পর্শকাতরতা সম্ভবত ইয়েটস ও এজরা পাউণ্ড কর্তৃক বন্দিত হবার কারণ। রবীন্দ্র অনূদিত কাব্যগুলির মধ্যে বলা হয় GITANJALI-ই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদ শিল্পকর্ম। উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে GITANJALI-র একটা গভীর যোগসূত্র দেখা যায়। তাছাড়া মধ্যযুগের ভক্তি-কবিতা, সুফি মতবাদ, বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের প্রভাব GITANJALI-র কাব্যভাষায় আছে। GITANJALI তাই কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের বার্তাবহ না হয়ে এক ধর্মনিরপেক্ষ মিলনসঙ্গীতরূপে জীবনবন্দনার সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। মূল বাংলা থেকে অনূদিত GITANJALIর কবিতাগুলিতে কাব্যসৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়েছে। এই অনুবাদ বিষয় ও ভাবের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে পদগুলিকে মূলের মত আস্বাদনীয় করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে একটি অতি পরিচিত গানের উল্লেখ করছি।

বাংলায় মূলপদ :—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,/আঁধার করে আসে-/আমায় কেন বসিয়ে রাখ/একা দ্বারের পাশে।/কাজের দিনে নানান কাজে/থাকি নানা লোকের মাঝে,/আজ আমি যে বসে আছি/ তোমারি আশ্বাসে/আমায় কেন বসিয়ে রাখ/একা দ্বারের পাশে।/তুমি যদি না দেখা দাও/কর আমায় হেলা,/ কেমন করে কাটে আমার/এমন বাদল বেলা।/দূরের পানে মেলে আঁখি/ কেবল আমি চেয়ে থাকি;/পরান আমার কেঁদে বেড়ায়/দুরন্ত বাতাসে/...(১৬)

অনুবাদ :—

> Clouds heaps upon clouds and it darkens. Oh, love, why does thou let me wait outside at the door all alone?
> In the busy moments of the noontide work I am with the cloud, but on this dark lonely day it is only for thee that I hope
> If thou showest me not thy face leavest me wholly aside, I know not how I am to pass these long rainy hours.
> I keep gazing on the far away gloom of the sky, and my heart wonders wailing with the restless wind. (18)

এই স্বচ্ছন্দ গদ্য অনুবাদ মূলের সঙ্গে এতই সঙ্গতিপূর্ণ যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিষয় ও ভাবের অভিব্যক্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই পদ। বাংলা গীতাঞ্জলিতে একটা ভাবের ঐক্য ছিল কিন্তু ইংরেজি GITANJALIতে ভাবের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে ৫০টি নতুন পদ তিনি অন্য যে দশটি কাব্যগ্রন্থ থেকে (একটি নাটক থেকে) সংকলন করেছিলেন, সেগুলিতে ভাবের পারম্পর্য রক্ষা সম্ভব ছিল না। "The arrangement of the

Poems in Gitanjali is neither in chronological order of their publication nor according to any sequence in the growth of mood or idea. They are contained independent lyrics. Though they have a slender thematic connection"—(The English Writings of Tagore, vol-1, Notes to section 1, p-601).

'GARDENER' এর উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ 'GITANJALI'কে বলেছেন 'RELIGIOUS POEMS'। GITANJALI-তে 'খেয়া' কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ ১১টি কবিতা নির্বাচন করেছেন। খেয়া কাব্যটি মূলত ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আধারিত। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে, সম্পর্কটি পারস্পরিক। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অর্থহীন। অনেকটা সীমা-অসীমের তত্ত্বের মতো। 'অসীম যে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ/সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।' মূলত, ভক্ত-ভগবানের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মতত্ত্ব গড়ে উঠেছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে খেয়া কাব্যে। মিস্টিক জাতীয় কবিতার অনুবাদ আয়াসসাধ্য। ভাব ও ভাবনার সহযোগে গড়ে ওঠা তত্ত্ব অনেকক্ষেত্রেই অস্পষ্ট রয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে কবি যখন কলম ধরেন অনুবাদ রচনায়, তখন তা অনেকখানি মূলানুগ হয়ে উঠতে পারে। GITANJALI-তে অন্তর্ভুক্ত এরকম দুটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে কবি আত্মমগ্নতার মধ্যে পেয়েছেন ঈশ্বরের সঙ্গ, বিস্মৃত হয়েছেন তাঁর ইহকালিক চেতনা।

(১) "সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম/মিলিয়ে এল প্রাণে।/ভুলে গেলেম কিসের তরে/বাহির হলেম পথের পরে,/ঢেলে দিলেম চেতনা মোর/ছায়ার গন্ধে গানে-/ধীরে ঘুমিয়ে পলেম অবশ দেহে/কখন কে তা জানে।/শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হতে/ফুটল যখন আঁখি,/চেয়ে দেখি কখন এসে/দাঁড়িয়ে আছ শিয়র-দেশে/তোমার হাসি দিয়ে আমার/অচৈতন্য ঢাকি.../ওগো ভেবেছিলেম আছে আমার/কত না পথ বাকি।" (নিরুদ্যম)

অনুবাদ :—The repose of the sun-embroidered green gloom slowly spread over my heart, I forgot for what I had travelled, and I surrendered my mind without struggle to the maze of Shadows and songs. At last when I woke from my slumber and opened my eyes, I saw thee standing by me, flooding my sleep with your smile. How I had feared that the path was long and wearisome, and the struggle to reach thee was hard. (48)

এই অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ, সাবলীল ও মূলানুগ। ভাষা মূল ভাব পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টিকারী নয়।

(২) "দেখি সহসা রথ থেমে গেল/আমার কাছে এসে,/আমার মুখ পানে চেয়ে/নামলে তুমি হেসে।/দেখে মুখের প্রসন্নতা/জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা/হেনকালে কিসের লাগি/তুমি অকস্মাৎ/আমায় কিছু দাও গো বলে/বাড়িয়ে দিলে হাত।/...যবে পাত্রখানি ঘরে এনে/উজাড় করি এ কী।/ভিক্ষা মাঝে একটি ছোটো/সোনার কণা দেখি।/দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে/স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে/তখন কাঁদি চোখের জলে/দুটি নয়ন ভরে.../তোমায় কেন দিইনি আমার/সকল শূন্য করে।" (কৃপণ)।

অনুবাদ—The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me and Thou comest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last, Then of a sudden you didst hold out Thy right hand and say, "What hast thou to give to me?...But how great my surprise when at day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had had the heart to give Thee my all." 'কৃপণ' কবিতায় ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কের দূরত্ব অবলুপ্ত হয়েছে, দেওয়া নেওয়ার সহজ প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর সামান্য কিছু চেয়েছিলেন ভক্তের কাছে, প্রতিদানে ভিক্ষাপাত্রে ভক্ত ভিখারি পেলেন 'স্বর্ণকণা'। বিস্মিত ভক্তের চরম আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে—কেন তিনি তাঁকে সর্বসমর্পণ করলেন না। অনুবাদ যে এখানে সংযত সংহত এবং মূল ভাবানুগ, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাব্যব্যঞ্জনা ও গদ্যানুবাদে তা অব্যক্ত থাকেনি। সমালোচকের মন্তব্যটি তাই যথাযথ —"Once and only once, did Tagore succeed in translating his own poems" (S K Das)

'The Gardener' এর অনুবাদ সম্পর্কে যে 'abridged' ও 'paraphrased' এর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'GITANJALI' তার ব্যতিক্রম হলেও বিষয়-বিন্যাসে কোথাও বা তা নতুন চেহারা পেয়েছে। মূলের চেয়ে অনুবাদ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। মূল..."সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি/তারায় তারায় খচিত/স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি/বর্ণে বর্ণে রচিত/খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে/বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে/গোরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে/যেন গা অস্ত আকাশে/জীবন-শেষের শেষ জাগরণ সম/ঝলসিছে মহা বেদনা/সুন্দর বটে অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত,/খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত।" (গীতিমাল্য—৩০)। অনুবাদ—"Beautiful is Thy wristlet, decked with stars and cunningly wrought in myriad-coloured jewels, But more beautiful to me Thy sword with its curve of lightning like the outspread wings of the divine bird of Vishnu, prefectly poised in the angry red light of the sunset.

It quivers like the one last response of life in ecstacy of pain at the final stroke of death, it shines like the pure flame of being burning up earthly sense with one fierce flash.

Beautiful is Thy wristlet, decked with starry gems, but Thy sword O lord of thunder is wrought with uttermost beauty, terrible to behold or to think of. (53).

অনুবাদ কখনও কখনও প্রচলিত ধারায় গড়ে না উঠে অনুবাদকের ইচ্ছানুযায়ী বিষয়ের ভাবান্তর ঘটে। তখন মূল ভাব গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের মধ্য দিয়ে একটা ভিন্ন চেহারা পায়, যেটা হুবহু মেলে না। একটা স্বতন্ত্র নতুন চেহারায় নির্মিত রচনাটি পাঠকের আকর্ষণ বাড়ায়। এই রচনা-কর্ম কখনও কখনও মূল বক্তব্যকে অতিক্রম করে পাঠকের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। GITANJALI-র উদ্ধৃত কবিতাটি সেই পরিচয় দেয়, রবীন্দ্রনাথ GITANJALI রচনায় যে বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ গীতাঞ্জলির গদ্যরচনা ও

কাব্যের মতো ভাবাবেদনাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পশ্চাতে এই সাফল্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। GITANJALI একটি পুনর্নির্মিত কাব্যগ্রন্থ-রূপে তাই অভিনবত্বের দাবি রাখে।

[চার]

ধর্মীয় রহস্যবাদ পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ 'The Gardener' কাব্যে সংগৃহীত কবিতাগুলিতে জগৎ, জীবন ও প্রেম সম্পর্কিত কিছু কবিতা সংকলিত করেন। কিন্তু এর অনুবাদ আশানুরূপ হয়নি। মূল কবিতাগুলির ঐশ্বর্যময়তার বদলে গতানুগতিক ধারায় গড়ে ওঠা অনূদিত কবিতাগুলির অধিকাংশই নীরস এবং কাব্যব্যঞ্জনাহীন। তিনি জানিয়েছেন অনুবাদগুলি সবসময় মূলানুগ হয়নি বরং কোনো ক্ষেত্রে মূল কবিতার সংক্ষিপ্তকরণ এবং মূল অর্থকে কখনও কখনও ভিন্ন শব্দে প্রকাশের চেষ্টা ঘটেছে। 'GARDENER' এর মধ্য দিয়ে কবি যে তাঁর স্বতন্ত্র ভাবমূর্তিটি গড়তে চেয়েছিলেন তা সর্বাংশে সার্থকতা পায়নি। গ্রন্থটি প্রকাশের পর পাঠকসমাজেও অস্বস্তির লক্ষণ দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ সেটাও লক্ষ্য করেছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন, 'I find that the Gardener is not having very warm reception from your critics."

যে উদ্দেশ্য নিয়ে GITANJALI'র বিপরীত মেরুতে GARDENER'কে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তার মূলে ছিল কবিপ্রতিভার একটা সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা। ভারতীয় রহস্যবাদের প্রতি পাশ্চাত্য পাঠকদের আকর্ষণ GITANJALI'র পাঠকদের সমাদরের প্রধান কারণ। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল GITANJALI'তে তার প্রতিভার যে খণ্ড প্রকাশ ঘটেছে, তা তাঁর কাব্যপ্রতিভার প্রতি সুবিচারের কারণ হতে পারে না। "GARDENER" পরিকল্পিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়জ্ঞাপক কাব্যরূপে। "যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মরমী কবিরূপে জেনে GITANJALI'র প্রেম-কবিতার মধ্যে কবির লৌকিক রূপের নিরলংকার প্রকাশ উপাদেয় বলে মনে করেননি।" (প্রশান্ত পাল : রবিজীবনী/ষষ্ঠ/পৃ. ৮৩৬)। একথা মোটামুটি পাশ্চাত্যের GITANJALI'র এক শ্রেণীর সমঝদারের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, সেখানে 'GARDENER' এর অবস্থান বিবেচিত হতে পারে ভিন্ন ধারায়। সেখানে 'Love and Life' এর কাব্যরূপই হবে বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ 'GARDENER' রচনা করে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, এই উভয় কাব্যযোগেই তাঁর কবিপ্রতিভার পূর্ণতা।

The Gardener রবীন্দ্রনাথ ডবলিউ বি ইয়েটস্‌কে উৎসর্গ করেন। GITANJANI রচনা পূর্বের প্রায় ত্রিশ বছরের রচনাবলির নির্বাচিত ৮৫টি কবিতার সংকলন। 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্য থেকে সর্বাধিক কবিতা (২৬) গৃহীত হয়েছে। 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলিতে যে স্বতঃস্ফূর্ততা, যে কলানৈপুণ্য ও যে অর্থপূর্ণ কৌতুকহাস্যের স্নিগ্ধ দীপ্তি কাব্যকে মণ্ডিত করেছে, তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার আদি বৈশিষ্ট্যটি মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ সরল সত্যরূপ চপল লঘুগতিসম্পন্ন ছন্দে ব্যক্ত কোনো কাব্যে দেখা যায়নি। এর সঙ্গে পূর্ববর্তী রচনাবলি কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), মায়ার খেলা (১৮৮০), নির্বাচিত কাব্য ও নাটকের কবিতা ও গানের বিষয়ভাবনা ও কলাকৃতির মিল নেই,

যার ফলে Gardener ভাবগত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পারেনি, বরং পরিকল্পনাহীন কয়েকটি কবিতা ও গানের বিশৃঙ্খল পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন সংকলনের রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের ক্ষেত্রে এই সংকলনে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন সেটাই এজন্য দায়ী বলে মনে করা যায়। নিষ্ফল কামনা' (মানসী) সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকৃত প্রথম অনুবাদ কবিতা।

Lovers Gift (১৯১৮) কাব্যের ২৫ সংখ্যক কবিতারূপে কবিতাটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাওয়া যায়। এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে Poems এর তিন সংখ্যক কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা খণ্ড ও অখণ্ডরূপে অনূদিত হয়ে একাধিক ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। আবার একাধিক কবিতার মিশ্রণে ইংরেজিতে একটি কবিতায় পরিণত করা হয়েছে।

The Gardener এর কবিতাগুলির উৎস এইরকম : চিত্রা/৬, কণিকা/২৬, সোনার তরী/৮ (অক্ষমা, দরিদ্রা ও আত্মসমর্পণ তিনটি কবিতা নিয়ে একটি পদক্রম ৭৩), খেয়া/৪, উৎসর্গ/৬, কল্পনা/১৩, গীতবিতান (প্রেম)/৩, কড়ি ও কোমল/৪, মায়ার খেলা (নাটক)/৩, মানসী/৩, প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)/১, চৈতালী/৬, রাজা (নাটক)/১, গীতাঞ্জলি/১।

মূল গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৬।৮৫টি কবিতার সংকলন। তালিকা থেকে দেখা যায়, ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল' থেকে এই নির্বাচন শুরু। তবে নির্বাচনের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার ছাপ আছে। পদসজ্জা পরিকল্পনাহীন। তথাপি GITANJALI'র বিপরীতে কাব্যটির অবস্থানক্ষেত্রটি নজরকাড়া। 'Irish Citizen' পত্রিকাটির মন্তব্য, কাব্যটি 'ইংরেজি সাহিত্যের শীর্ষধাপের থেকে বেশি দূরে নয়।' এজরা পাউণ্ড সমসাময়িক অভিমতে রবীন্দ্রনাথ একজন 'ধর্মধ্বজী নীতিবিদ' উক্তিটির বিরোধিতা করেছিলেন এবং যে সিনক্লেয়ার একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, 'আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রেমের কবিতারূপে গ্রন্থটি অনবদ্য।' (দ্র. English Writings of Rabindranath Tagore—Vol-1, (Notes) P-603.)

GITANJALIর মতো Gardener-এর কবিতাগুলি সংখ্যাবাচক। নাম নেই। The Gardener প্রেসে যাবার পর প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। ইয়েটস-এর গড়িমসি তাঁকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করে তুলেছিল। মনে হয় ইয়েটস রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিতার প্রতি ক্রমে ক্রমে মুগ্ধতামুক্ত হয়ে চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেটা অনুমান করে ইয়েটস-এর প্রতি নির্ভরতা মুক্ত হতে চাইছিলেন। তাঁর কাছে বিকল্প ছিলেন স্টার্জ মুর। কিন্তু এ ব্যাপারে দুজনেই কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। মুর জানতেন, যে ইয়েটস অত্যন্ত দুর্মুখ। স্টার্জ মুরের সংশোধন ইয়েটস সবটাই মেনে নিয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে, ইয়েটস জানতেন না, মুর ওই কাজটা করেছেন। Gardener এর আখ্যাপত্র এইরকম :

THE GARDENER/BY/RABINDRANATH TAGORE/TRANSLATED BY THE AUTHOR FROM/THE ORIGINAL BENGALI/MACMILAN AND CO. LIMITED/ST. MARTIN'S, LONDON/1913.

উৎসর্গপত্রে (W.B. YEATS) লেখেন

PREFACE

Most of the lyrics of love and life, the translations of which from Bengali are published in the book, were written much earlier than the series of religious

poems contained in the book named GITANJALI. The translations are not always literal—the originals being sometimes abridged and sometimes paraphrased.

RABINDRANATH TAGORE

এই উক্তি থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। (১) GATINJALI অপেক্ষা ভিন্ন জাতের কাব্য GARDENER (২) অনুবাদের ধরন বৈশিষ্ট্য।

THE GARDENER-এর অনুবাদ যে সব ক্ষেত্রে মূলানুগ ও সুখপাঠ্য হয়নি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। আবার ব্যতিক্রমও ঘটেছে, যেখানে একই ভাবের একাধিক কবিতাকে একত্রিত করে একটিতে পরিণত করা হয়েছে।

'সোনার তরী'র 'অক্ষমা', 'দরিদ্রা', 'আত্মসমর্পণ' কবিতা তিনটি চৌদ্দ চরণের সনেট জাতীয় কবিতা। বিষয়-'সর্বসহা মৃন্ময়ী জননীর উদ্দেশ্যে কবির মনোভাব জ্ঞাপন। তিনটি কবিতাই নির্দিষ্ট আয়তনে গঠিত হওয়ায় প্রতিটির ভাববস্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ। তথাপি তিনটিকে একসূত্রে গ্রথিত করলে মূলভাব বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং ভাবের ধারাবাহিকতায় একটা অখণ্ড রূপ পেতে পারে। GITANJALI-র অন্তর্গত ৭৩ সংখ্যক কবিতাটি উপরোক্ত তিনটি কবিতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদে গঠিত একটি কবিতা। 'অক্ষমা'র প্রথম চারটি চরণ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত। ("যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথানকার/দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।/জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখ ভার/বহু ভাগ্যবলে তাই করিয়াছি স্থির।") তবে মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদের চেষ্টা আছে। কবিতাটির পরবর্তী অংশ এইরকম : 'অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে,/হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।/সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,/পারিস নে কতবার—'কই অন্ন কই'/কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ।/জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ—/যা কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,/সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,/সব আশা মিটাইতে পারিস না হায়—/তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক।/।

অনুবাদ—

Infinite wealth is not yours, my Patient and dusky mother dustl/you toil to fill the mouths of your children, but food is scarce./The gift of gladness that you have for us is never perfect./The toys that you make for your children are fragile./you can not satisfy all your hungry hopes, but should I desert you for that?

এখানে দেখা যাচ্ছে নবম চরণটি অনূদিত হয়নি। সে কারণে কবিতাটির ভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে হয় না। বরং কোনো একটি চরণ শব্দবাহুল্যমুক্ত হয়ে আরও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। "পারিসনে কতবার 'কই অন্ন কই'—but food is scarce,।"

'দরিদ্রা' ও 'আত্মসমর্পণ' কবিতা দুটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাওয়া যায়। যেহেতু তিনটি কবিতাই মৃন্ময়ী জননীকে উদ্দেশ্য করে লেখা, সেজন্য তিনটিকে একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে ভাবপরম্পরায় বিঘ্ন ঘটেনি। যদিও বাংলা কবিতাত্রয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতার নিরিখে রসাস্বাদনে পূর্ণতার অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, যখনই তিনি কোনো রচনা পরিমার্জনে (এক্ষেত্রে ভাবান্তরণে)

হ্যত দেন, সেটি নতুন চেহারা পায়। তিনটি কবিতা নিয়ে একটি কবিতা গড়ে উঠেছে, সেখানে একটি নতুন কবিতা এসেছে তার স্বরূপে। এটা সৃষ্টির অভিনবত্বের উদাহরণ বলা চলে। 'GARDENER' এর কবিতাগুলি 'literal' নয় এবং যে 'sometimes abridged and sometimes paraphrased.' সেকথা আগেই তিনি কবুল করেছেন সম্ভবত এই জন্য যে, তাঁর এই অনুবাদের ধারাটি যাতে নবসৃষ্টির রূপ পায়। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় এবং থাকতেই পারে। কারণ কবিতাগুলি বাংলা কবিতার অনুবাদ।

'GARDENER' এর প্রথম কবিতা একটি কাব্যনাট্য—'আবেদন' (চিত্রা)। মূল ভাবটি অক্ষুণ্ণ রেখে রচনাটির সংক্ষিপ্তকরণ ঘটেছে। এর ফলে রচনাটি আরও নাট্যগুণসমৃদ্ধ হয়ে সংহত রূপ পেয়েছে। যাঁরা বাংলা রচনার সঙ্গে ইংরেজির তুলনা করবেন তাঁদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কেননা, এই অনুবাদ abridged। রচনায় নাট্যগুণ বৃদ্ধি পেলেও কাব্যসৌন্দর্যের হানি ঘটেছে। ভৃত্যের আবেদন ও রাণীর প্রার্থনাপূরণের মধ্যে উভয়ের দীর্ঘ কথোপকথনে যে কাব্য সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে, ইংরেজি অনুবাদে তার বিনিময়ে বিষয়টি এক টুকরো স্বয়ংসম্পূর্ণ নাট্যসংলাপে পরিণত হয়েছে। কাব্যসংলাপের দৈর্ঘ্য নাট্যোপযোগী নয়, কিন্তু ইংরেজি অনুবাদ অংশটিতে কাব্য থাকেনি। যদিও কাব্যরূপেই তার গ্রন্থন। উদাহরণ—

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর।/লব সব কাজে।/যুদ্ধ অস্ত্র ধনুঃশর/ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ/রাখিনু চরণে তব-যত উচ্চ কাজ/সব ফিরে লও দেবী।/তব দূত করি/মোরে আর পাঠায়ো না,/তব স্বর্ণতরী/দেশ দেশান্তরে লয়ে।/জয়ধ্বজা তব দিগদিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব দিগ্বিজয়ে পাঠায়ো না মোরে.../...অয়ি একাকিনী,/আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

Servent : I will give up my other work,

I throw my swords and lances down in the dust, Do not send me to distant courts; do not bid me undertake new conquests. But make me the gardener of your flower garden.

'আবেদন' কবিতায় ভৃত্যের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ যে সুদীর্ঘ আকুতিতে কাব্যরস অভিব্যক্ত হয়েছে, অনুবাদ অংশে তা সংহত হয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় নাট্যসংলাপে সীমাবদ্ধ থেকেছে। কাব্য এখানে নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। 'আবেদন' কবিতায় কোনো কোনো চরণ বিশিষ্ট বাগ্‌ধারারূপে অনেকের মুখে শোনা যায় যা অনুবাদে ভাবান্তরিত হয়েছে। কাব্যসংহতি নাটকের উপযোগী হয়ে উঠেছে। আরও উদাহরণ—

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়/শত শত/আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্য পথে কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে/...সে বন বীথিকা/রাখিব নবীন করি। পুষ্পাক্ষরে লিখা/তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়/বিকশি উঠিবে তব পরশ তৃষায়/পুলকিত তৃণ পুঞ্জতলে/.../ কুমুদ সরসীকূলে/বসিবে যখন সন্তর্পণ তরুমূলে/...পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে কেশবাসে/কৌতুহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন/...নিদ্রাহীন আঁখি মেলি...সে প্রদীপখানি/আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধ তৈল আনি।...পাদপীঠখানি/নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে/প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুম চন্দনে/ কল্পনার লেখা/.../।

Servent : The service of your idle days.

I will keep fresh the grassy path where you walk in the morning, where your feet will be greeted with praise at every step by the flowers eager for death.

I will swing you in a swing among the branches of the Saptaparna, where the early evening moon will struggle to kiss your skirt through the leaves.

I will replenish with scented oil the lamp that burns by your beside, and decorate your foot stool with sandal and saffron paste in wondrous designs,

এখানে প্রথম চরণটি অলঙ্কারবর্জিত একটি স্পষ্ট ও বাস্তবোচিত নাট্যসংলাপ। 'আবেদন' এর এই সংলাপটি একটি বাগ্‌ধারার মতো। 'আবেদন'এ ভৃত্যের দীর্ঘ সংলাপ কাব্যের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হলেও নাটকের পক্ষে অনুপযোগী। 'GARDENER' এর প্রথম কবিতা (1) কাব্য সংলাপে রচিত একটি ক্ষুদ্রকায় নাটক। 'আবেদন' এর অনুবাদ রূপে একে গ্রহণ করা চলে না। এটি 'আবেদন' অবলম্বনে একটি নতুন সৃষ্টি। 'আবেদন' 'abridged' ঠিকই কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়।

'GARDENER' এর আর একটি কবিতায় আলোকপাত করে এই কাব্য সম্পর্কে উপসংহার টানব। সেটি 'GARDENER' এর সর্বশেষ (85) কবিতা,...রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত জনপ্রিয় কবিতা–১৪০০ সাল (চিত্রা)। এখানে কবিতাটির (১৪০০ সাল) মূল ভাব অবলম্বন করে একটি নতুন কবিতা গদ্যে রচিত হয়েছে। 'abridged' হয়েও কতখানি 'abridged' সে সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। তবে বলা যায় 'transcreation'.

প্রথম স্তবক : আজি হতে শতবর্ষ পরে/কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে—/আজি হতে শতবর্ষ পরে।/আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের/লেশমাত্র ভাগ—/আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,/আজিকার কোনো রক্তরাগ/অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে/তোমাদের করে/আজি হতে শতবর্ষ পরে।

অনুবাদ : WHO ARE YOU, reader reading my poems an hundred years hence? I can not send you one single flower from this wealth of spring, one single streak of gold from yonder clouds.

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় স্তবকটিও উল্লেখ করতে হয়।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণদ্বার/বসি বাতায়নে/সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি/ ভেবে দেখো মনে—/তোমাদের শতবর্ষ আগে।/সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,/কবি এক জাগে—/কতকথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়/কত অনুরাগে/একদিন শতবর্ষ আগে।

Open your doors and look abroad

From your blossoming garden gather fragrant memories of the vanished flowers of an hundred years before.

তৃতীয় স্তবকের দশটি পংক্তির অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত।

In the joy of your heart may you feel the living joy that sang one spring morning, sending its glad voice across one hundred years.

১৪০০ সাল কবিতাটি 'GARDENER'এ শুধু নতুন চেহারা পায়নি, বক্তব্যের স্পষ্টতায় বাহুল্যমুক্ত ভাষা ব্যবহারে একটি নতুন কবিতায় পরিণত হয়েছে। Translation রূপ পেয়েছে Transcreationএ। অথচ '১৪০০ সালে'র বক্তব্য ছিল আরও গভীর ও নিখিলের মর্মবিজড়িত

এক মরমী অভিব্যক্তি। যে কথা বলেছেন রবীন্দ্র-গবেষক উইলিয়ম রাদিচে—"1400 Sal is about Tagore's core identity as a poet, which for him is also the Centre of the Universe. The Poem's Central Phase is Nikhiler marma, 'the heart of the universe', a place where both Tagore and his fellow poet can find common ground." (Tagore before and after 1912)/The Statesman A tribute/9.5.2012) তাঁর মতে, ১৯১২-র পরবর্তী একজন কবিকে একই স্থান পেতে হলে তাঁকে বাংলার পাখি, ভ্রমর এবং সুগন্ধি পুষ্পের অতিরিক্ত জাগতিক বিষয়ের কথাও বলতে হবে যেগুলি সেইকালে রবীন্দ্রনাথের মন অধিকার করেছিল,...ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, সামাজিক উন্নতি, বিশ্বশান্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ধর্ম সবকিছুই। নূতন কবি বলতে রাদিচে সেই কবির কথা বলেছেন যিনি গান লিখবেন রবীন্দ্র-সুর-ভাবনায়। তিনি ভিনদেশিয় ভিন্নভাষী হতে পারেন। একশো বছর পরের কবি, রাদিচের (RADICE) মতো একজন রবীন্দ্র অনুবাদকও হতে পারেন। ১৯১২-র পরে যদি তিনি এই কবিতা লিখতেন তা আরও জটিল ভারাক্রান্ত হত এবং কখনই ১৮৯৬এ রচনার মতো একটা বসন্তের আনন্দগীতির রূপ পেত না। তথাপি জাগতিক সমস্যা জটিল জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তিত হলেও এবং ১৮৯৬এ অভিব্যক্ত এই কবিতার প্রকৃতির অপরিবর্তিত রূপটি রয়ে যাবে 'বসন্তের আনন্দ অভিবাদন' ফুরিয়ে যাবে না। (ওই/p-10-11)।

রাদিচে ১৪০০ সাল কবিতাটিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং বিচার করেছেন তার তাৎপর্য ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। রাদিচে ১৪০০ সাল কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "But 1400 Sal is about Tagore's Core identity as a poet which for him is also the centre of the universe." (p-10)

রাদিচের কথা মতো ১৪০০ সাল কবিতাটিকে যদি রবীন্দ্রনাথের 'প্রায় মূল পরিচয়বাহী' কবিতারূপে গণ্য করতে হয়, তাহলে অবশ্যই বলা যায় যে, অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির সুবিচার করেননি। কবিতাটির সারাংশ অনূদিত হলেও বাদ পড়ে গেছে কবিতাটির কেন্দ্রীয় বিষয় 'the heart of the universe', যেখানে রাদিচের মতে কবি এবং আগামীর কবি মিলতে পারেন একটি মৌলিক ক্ষেত্রে। তবে প্রকৃতির প্রসঙ্গটি সর্বকালীন তাৎপর্য প্রকাশ করে— 'বসন্তের আনন্দ অভিবাদন' অপরিবর্তিত ও অমলিন রয়ে যাবে।

'GARDENER' যে সমাদৃত হয়নি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। 'Gitanjali'র 'religious Poems'ই যে রবীন্দ্র কবিমানসের একমাত্র পরিচয় নয়, তাঁর কাব্যে যে একটা সমগ্রতার পরিচয় আছে তা পাঠকমনকে নাড়া দিতে পারেনি। সেই অর্থে তাঁর বাংলা কাব্যগুলিতে ভাব-বৈচিত্র্যের যে ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় তার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিমানসের একটা উত্তরণের ধারাও দুর্লক্ষ্য নয়। সেখানেই তাঁর কাব্যের সিদ্ধি। 'GARDENER' এর অর্থ উদ্যানরক্ষক অর্থাৎ মালি। যিনি বর্ণগন্ধময় বিচিত্র পুষ্পবনের রক্ষক। সেই সমগ্রতা নিয়েই পুষ্পবনের গরিমা। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের নামকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যটিকে ব্যক্তিত করলেও, বহুভাবের মিশ্রণে 'GARDENER' এর মিশ্র ভাবসৌরভ এই সংকলন গ্রন্থটিকে বিচিত্রগামী করে তুললেও ভাবের ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি।

[পাঁচ]

The Crescent Moon-এ বিচিত্র গন্ধ ও বর্ণশোভিত পুষ্প-সমারোহ নেই। মোট চল্লিশটি কবিতার সংকলন, যার মধ্যে পঁয়ত্রিশটি কবিতা 'শিশু' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। তিনটি কবিতা নেওয়া হয়েছে 'Gitanjali' থেকে (60, 61, 62)। কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) সোনার তরী (১৮৯৪), ক্ষণিকা (১৯০০) এবং গীতিমাল্য (১৯১৪) গ্রন্থের ৫টি কবিতা বাকি ৫টির উৎস। যেগুলির মধ্যে উপরোক্ত তিনটি কবিতা 'Gitanjali'র অন্তর্ভুক্ত। The crescent Moon-এর কবিতাগুলি সংখ্যাসূচক নয়, নামবাচক। গ্রন্থটির প্রকাশক Macmillan, London। প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯১৩। স্টার্জ মুরকে কাব্যটি উৎসর্গীকৃত। আটটি রঙিন চিত্র শোভিত। এগুলির শিল্পীরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসু। 'Gitanjali'র অন্তর্ভুক্ত তিনটি কবিতার মধ্যে 60 ও 61 সংখ্যক কবিতা দুটি (তিনটিই শিশু কাব্যের অন্তর্গত) অবিকল গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ 62 সংখ্যক কবিতাটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। The crescent Moon-এ কবিতাটির নাম When and Why।

GITANJALI	CRESCENT MOON
1. When I bring to you Coloured toys	1. When I bring you Coloured toys
2. I surely understand what the pleasure is that Streams from the sky	2. I surely understand what pleasure that streams from the sky
3. and what delight that is which the summer breeze brings	3. and what delight the summer breeze brings

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের তিনভাগে রচিত 'মঙ্গলগীত' The crescent Moon-এ দুটি কবিতায় (38, 39) বিন্যস্ত হয়েছে। 38-সংখ্যক কবিতাটি My Songsএ 'মঙ্গলগীত'এর তৃতীয় ভাগের খণ্ডাংশ এবং 39-সংখ্যক কবিতা 'The Child Angel' গঠিত হয়েছে 'মঙ্গলগীত'এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের অংশ বিশেষের ভাববস্তু অবলম্বনে। উদ্দিষ্ট শিশুটি হলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। কবিতাটি তাঁরই উদ্দেশ্যে রচিত। 'Gitanjali' ও 'The crescent Moon'এ কবিতাটি দুটি সংখ্যা ও নামে পুনর্গঠিত। অন্যর্থে নতুন কবিতা। বাংলা 'মঙ্গলগীত'-এর ভাবসাদৃশ্যে গঠিত নতুন দুটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতাগুলিকে অনুবাদ নিরপেক্ষরূপে বিচার করাই সঙ্গত। পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্যগ্রন্থগুলি সেভাবেই সমালোচিত হয়েছে। তবুও বাঙালি পাঠকের কাছে কিছুটা প্রশ্ন থেকে যায়। আর সেই কারণেই বাংলা কবিতাগুলির পাতা ওলটাতে হয়, ইংরেজির সঙ্গে তার রূপ ও ভাবগত মিল ও অমিল নির্ণয়ের কৌতূহলে।

এই প্রসঙ্গে 'শিশু' কাব্যটি রচনার পটভূমির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। কেন না, The crescent Moon-এর ৩৫টি কবিতা 'শিশু' কাব্যের অন্তর্গত। কাব্যটির মূল ভাবের সঙ্গে তাই কবিতাগুলির সম্পর্ক অনস্বীকার্য। স্ত্রীর মৃত্যুর পর (২৯ নভেম্বর, ১৯০২)

অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে কবি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রেণুকাকে নিয়ে তিনি হাওয়া বদলের জন্য আলমোড়ায় যান। সঙ্গে আরও দুই সন্তান। সেখানে থাকাকালে 'শিশু'র কবিতাগুলি লিখতে শুরু করেন। তিন মাস তিনি আলমোড়ায় ছিলেন। ২৯ আগস্ট ১৯০৩ তিনি কলকাতায় পৌঁছোন। রেণুকার মৃত্যু হয় (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩)। মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি যে 'শিশু'কাব্যের 'সঞ্চারী ভাব'-একটি পত্রে কবি সেকথা লিখেছেন—'শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মা'র সঙ্গ পেয়েছিলেন।' (৩১ শ্রাবণ, ১৩১০)। 'শিশু'কাব্যের শেষ কবিতা 'জগৎ পারাবারের তীরে' কাব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়েছে—"এই কাগজটায় যে নামহীন কবিতাটা লিখে দিলেম সেইটেই বোধ হয় শিশু খণ্ডের সূচনারূপে ব্যবহৃত হতে পারে" (রবিজীবনী-৫/পৃ.১৪৫)। 'শিশু'র কবিতাগুলি তারিখবিহীন। কবিতাগুলি মূলত শিশুদের আনন্দদানের জন্য রচিত। মাতৃহারা সন্তানদের এক সান্ত্বনার নামান্তর। নিজেও হয়তো তাঁর শোক গোপন করার চেষ্টা করেছেন, এগুলি রচনার মধ্য দিয়ে।

The crescent Moon-এর প্রথম কবিতা 'HOME' সোনার তরী'র 'শৈশবসন্ধ্যা'র কাব্যরূপ। কবিতাটিতে সন্ধ্যার পটভূমিতে অদৃশ্য এক 'বালক পথিকের' গ্রাম্যপথে চলার কালে 'সপ্তম সুরে' 'তীব্র উচ্চতান' এ গানের উল্লেখ প্রসঙ্গে কবির বাল্যসন্ধ্যাস্মৃতি যাপিত হয়েছে। কবিতাটিতে বালক আছে, বাল্যস্মৃতি আছে কিন্তু বালক বা শিশুর জন্য এটি রচিত নয়। 'শিশু'র অন্যান্য কবিতার মতো নীতিবাচকও নয়। কবিতাটি ভিন্ন আঙ্গিকে পয়ারে লেখা একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক স্মৃতি উদ্দীপক রচনা। স্বাভাবিকভাবেই শিশুর অন্যান্য কবিতার তুলনায় ব্যতিক্রমী। সেই অর্থে বেসুরো।

শৈশবসন্ধ্যা'র বক্তব্য বিষয় THE HOME এ খণ্ডিত। THE HOME-এ 'শৈশবসন্ধ্যা'র প্রথম অংশের অনেকখানি বক্তব্য সমান্তরাল ধারায় এলেও দ্বিতীয় অংশ একান্তই সংক্ষিপ্ত ভাব-সংস্করণ। 'শৈশবসন্ধ্যা'র দ্বিতীয় অংশের মধ্যভাগ থেকে THE HOME-এর পুনর্যাত্রা।

'শৈশবসন্ধ্যা'—দাঁড়ায়ে হেথায়/নির্জন মাঠের মাঝে নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যায়,/শুনিয়া কাহার গান পড়ি গেলা মনে—/কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,/কাংস্যঘণ্টা মুখরিত মন্দিরের ধারে,/কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে/গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,/নবীন হৃদয়-ভরা নব নব সুখ,/কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,/কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,/অনন্ত বিশ্বাস/দাঁড়াইয়া অন্ধকারে/দেখিনু নক্ষত্রলোকে, অসীম সংসারে/রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,/সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।'

THE HOME এর প্রাসঙ্গিক অংশ :—

I stopped for a moment in my lonely way under the starlight, and saw spread before me the darkened earth surrounding with her arms countless homes furnished with cradles and beds, mothers' hearts and evening lamps, and young lives glad with a gladness that knows nothing of its value for the world.

'শৈশবসন্ধ্যা' ও 'THE HOME' কবিতা হিসাবে দুটি স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। HOME-এ রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ বর্ণনা থেকে সরে এসে ভাবার্থ অবলম্বনে একটি নতুন কবিতা গঠন করেছেন।

তাই শৈশবসন্ধ্যা'র আলোকে 'THE HOME' বিচার্য হতে পারে না। HOMEকে ঠিক Transcreationও বলা যায় না, বরং বলা যায় Transmulation (রূপান্তরকরণ)। রবীন্দ্রনাথের কবি স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-রচনা সংশোধন কিংবা রূপান্তরকরণকালে ভিন্নরূপে এবং ভাবে পরিগ্রহণ। THE HOME 'শৈশবসন্ধ্যা'র তুলনায় অনেক সংহত ও বক্তব্যের ভাবপ্রবাহে তীক্ষ্ণমুখ ও ব্যঞ্জনাধর্মী। GITANJALIতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনায় যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন, সেই ধারায় এগুলি রচনায় পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্রমপ্রসারণ লক্ষ করা যায়। তথাপি মূল অনুবাদের তুলনায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের ইংরেজি কবিতাগুলির স্বাতন্ত্র্য ও সৃষ্টিকর্মকে বিচারের আওতায় আনা সঙ্গত। সেই বিচারে THE HOME কবিতাটি THE CRESCENT MOON এর মূল ভাববাহী না হলেও, কবিতা হিসাবে সুখপাঠ্য। শব্দ নির্বাচনে এবং ভাবপ্রবাহ রক্ষায় কবির সাফল্য প্রশ্নাতীত। সংযম, সংহতি ও পরিমিতিবোধে কবিতাটি নিঃসন্দেহে পরিণত কবি-মানসের সাক্ষ্য দেয়।

THE CRESCENT MOON-এ 'শিশু'র অন্তর্ভুক্ত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। কবিতাটি THE HERO ('শিশু'র বীরপুরুষ)। 'THE HERO' এই কাব্যে স্বরূপে অবস্থিত। কিছু কিছু চরণ অনুবাদে বর্জিত মূল ভাব এবং গঠনে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ও দ্রুততা বাংলা কবিতাটির (বীরপুরুষ) মতো উপভোগ্য। কবিতাটি শিশুকে নিয়ে শিশুদের জন্য রচিত হলেও বড়োদের কাছেও এর আবেদন পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা কবিতা থেকে কিঞ্চিৎ উদাহরণ : মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে/মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।/তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে/দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,/আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার' পরে/টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।/রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে/রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে। সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,/এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে।/ কোনোখানে জনমানব নাই,/তুমি যেন আপনমনে তাই/ভয় পেয়েছ : ভাবছ, 'এলেম কোথা।'/আমি বলছি, ভয় কোরো না মাগো,/ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।' (বীরপুরুষ)

MOTHER let us imagine We are travelling, and passing through a strange and dangerous country.
You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse.
It is evening and the Sun goes down. The waste of Joradighi lies wan and grey before us. The land is desolate and barren.
You are frightened and thinking—'I know not where We have come to.'
I say to you, 'mother do not afraid.'

বীরপুরুষের সূচনায় কবিতাটিতে সম্বোধিত হয়েছেন পাঠক। কিন্তু HERO-তে মা। কবিতাটি জুড়ে আছে পুত্র ও মাতার অজানা যাত্রাপথের এক কাল্পনিক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা। মায়ের কাছে শিশু সর্বদাই তার উপযুক্ততা প্রমাণ করে মায়ের আস্থাধন্য হতে চায়। শৈশবে রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বল্পবিদ্যা সম্বল করে মায়ের সমীহ আদায় করতে চেয়েছেন। মাকে তাক লাগিয়ে দিতেন তাঁর জ্ঞানের পরিধি জাহির করে। (ছেলেবেলা/বিশ্বভারতী ১৯৭৫/পৃ.৮৬)। শিশুমনের কাল্পনিক জগতের একটি চমকপ্রদ প্রতিফলন ঘটেছে 'বীরপুরুষ' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ

'বীরপুরুষ' নামটির অবিকল ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদরূপে একে পরিচিত করতে চেয়েছেন। 'বীরপুরুষ' কিঞ্চিৎ গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে 'THE HERO'য় রূপান্তরিত হয়েছে। যে মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে 'শিশু' কাব্যটি রচিত হয়েছিল তার মূলে ছিল তাঁর মাতৃহারা সন্তানদের শোকমুক্ত করে চিত্তবিনোদনের চেষ্টা এবং সম্ভবত আত্মসান্ত্বনা লাভ। 'বীরপুরুষ' রচনার উৎসে যে কারণই থাকুক না কেন, কবিতাটি যে অসাধারণ জনপ্রিয় তা বলা বাহুল্য। THE HERO-ও 'বীরপুরুষ' এর ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ একটি কাব্যিক অভিব্যক্তি। অনূদিত কবিতাটি 'বীরপুরুষ'-এর মতো বর্ণনা ও সংলাপের মিশ্রণে গঠিত একটি মূলানুগ সৃষ্টি।

The fight becomes so fearful, mother that it would give you a cold
shudder could you see you it from your palanquin.
Many of them fly, and a great number are cut to pieces.
I know you are thinking sitting all by yourself, that your boy must
be dead by this time.
But I come to you all stained with blood, and say, mother, the
fight is over now.
You come out and kiss me, pressing me to your heart, and
you say to yourself,
'I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort me.'

(কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,/শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।/কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,/কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।/এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে/ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।/আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে/বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে',/তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে/চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে—/বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল।/কী দুর্দশাই হত তা না হলে।')

'শিশু'র একটি জনপ্রিয় কবিতাকে কবি সামান্য অঙ্গচ্ছেদ করেও ইংরেজি গদ্যে পুনর্নির্মাণে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যে কারণে THE HERO কবিতাটি THE CRESCENT MOON-এর একটি উল্লেখযোগ্য ও কাব্যের মূল ভাববাহী কবিতারূপে চিহ্নিত হবার মতো। গদ্যে কাব্যভাবপ্রকাশের সীমাবদ্ধতার কথা অজানা নয়। তাই কোনো কবির হাতে যখন তাঁর রচনা ভাষান্তরিত হয়, তখন কবির দায়িত্ব অবশ্যই নিজের উপর এসে পড়ে। GITANJALI-র ভাষা ও গঠন পরিকল্পনা ইংরেজ কবি-সমালোচকদের সমাদর পেয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর ভাষার যে প্রশংসা ইয়েটস উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথকে সংকোচমুক্ত করে ইংরেজি রচনার ধারাটিকে অব্যাহত রাখার শক্তি জুগিয়েছিল। তাই CRESCENT MOON এর ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে মন্তব্যে শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, বোধগম্যতার ক্ষেত্রে এর কাব্যিক চমৎকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকায় রসগ্রহণে বাধা ঘটে না।

কাব্যের মূলভাব প্রসঙ্গে আর একটি ব্যতিক্রমী কবিতা উল্লেখ করি। এটি CRESCENT MOON কাব্যের শেষ কবিতা—THE LAST BARGAIN। গীতিমাল্যের অন্তর্গত (৩১) এই কবিতাটির রচনাকাল ২৪ পৌষ, ১৯২৩। কবিতাটির মূলভাব গীতাঞ্জলির মূলভাবাশ্রিত। যে কারণে এই কাব্যের মূলভাবের বিপ্রতীপে এর অবস্থান। তবে কবিতাটির শেষ স্তবকে আছে

বালুতটে ক্রীড়ারত এক শিশু, যার কাছে কবি বিনামূল্যে আত্মসমর্পণ করে মুক্তির আনন্দে ভারমুক্ত হয়েছেন। কবিতাটি 'Sometimes abridged sometimes paraphrased' পদ্ধতিতে অনূদিত হলেও গীতিমাল্যের (৩১) 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?'র স্বচ্ছন্দ অনুবাদটা পাঁচটি স্তবকে বাংলা কবিতাটি লেখা।

প্রথম স্তবক :

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?/পশরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে-দিনে।/এমনি করে হায়, আমার/দিন যে চলে যায়,/মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।/কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।"

"COME AND HIRE ME" 'I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road.

এখানে অনুবাদ সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু মূল বক্তব্য বর্জিত নয়। আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা কবিতাটির মূল ভাব। যা গীতাঞ্জলির মূল ভাবের অনুগত। কবিতাটিতে রাজা স্বর্ণপাত্র হাতে বৃদ্ধ, সুন্দরী হাস্যময়ী নারী, একে একে কবিকে কিনে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সকলেই কবি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। অথচ কবি পথে পথে ঘুরেছেন আত্ম-বিক্রয়ের আবেদন জানিয়ে—"COME AND HIRE ME", "শেষে তিনি পৌঁছেছেন এক বালকের কাছে—

> The Sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly,
> A child sat playing with shells.
> He raised his head and seemed to know me, and said,
> 'I hire you with nothing.'
> From then ceforward that bargain struck in child's play made me a freeman.

("সাগরতীরে রোদ পড়েছে ঢেউ দিয়েছে জলে,/ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে। যেন আমার চিনে বললে/"অমনি নেব কিনে"/বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেইদিনে।/খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় কিনে।"—গীতিমাল্য ৩১)।

এখানে কবিতাটি শেষ হয়েছে গীতিমাল্যের অবিকল ভাষা অনুসরণে। প্রথম স্তবক অনেকটা বাস্তবধর্মী হলেও, বাহুল্যবর্জিত বর্ণনার পটভূমি রচনায় যে ধারাটি গড়ে দিয়েছে, তার উপর দিয়ে কবিতাটির চারটি স্তবক অর্থবহ ভাবপ্রবাহে চমকপ্রদ পরিণতি পেয়েছে। THE BARGAIN শিশুকে নিয়ে শিশুর জন্য রচিত কবিতা নয়, যদিও শিশুকে এখানে সিদ্ধিদাতারূপে কল্পনা করে কবি আত্মচরিতার্থতা পেতে চেয়েছেন। মানবজীবনে মুক্তিদাতারূপে শিশুর ভূমিকা এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। বল নয়, বিত্ত নয়, সুন্দরী নারীর হাস্যমুখও নয়, নিষ্কলঙ্ক শিশুহৃদয়ই পারে মানুষকে বিনামূল্যে কিনে নিতে।

THE CRESCENT MOON-এ কবির কোনো মৌলিক ইংরেজি কবিতা না থাকলেও অনূদিত কবিতাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ভাবব্যঞ্জনায় স্বমহিমরূপ পেয়েছে। কোথাও বা পুনর্গঠনে নতুন অবয়ব পেয়েছে। ভাষা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আগেই জানিয়েছি, একথা মনে রেখে যে, কবিতাগুলির একটি নিরপেক্ষ কাব্যরূপ আছে। তাই কাব্যিক বিচারের যথার্থতা নির্ভর

করে কবিতার নিজস্ব রূপায়ণের বৈশিষ্ট্যের উপর। ইংরেজি এই কবিতাগুলির দাবি আছে অনুবাদনিরপেক্ষ বিচারের মানদণ্ডের নিরিখে। ভাষা ও শৈলী ও ভাবাভিব্যক্তির উপকরণসমূহের ব্যবহারের বিষয়গুলি গদ্যকবিতা বিচারের প্রসঙ্গে সমানভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু কবিতাগুলির ঘোষিত ইংরেজি অনুবাদরূপে এগুলির পরিচিতি, সেজন্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের মান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এবং সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশও থাকতে পারে। কিন্তু 'এহো বাহ্য' THE CRESCENT MOON-এর সমালোচনা বিদেশের অনেক পত্রিকায় পাওয়া যায়। দি টাইমস্ লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট-এ (১৪/৫/১৯১৪) সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কবিতাগুলি 'more childish than childlike.' THE HERO CRESCENT MOON কে সমালোচক টেগোরের একটি প্রতিনিধিমূলক রচনারূপে গণ্য করেছেন। THE GLOBE-এ (২৭ নভেম্বর ১৯১৩) গ্রন্থটি বর্ণিত হয়েছে, 'a vision of childhood which is only parallel in our literature by the work of Willium Blake,' কাব্যটিকে যদি vision of childhood বলে গণ্য করা যায় তো শিশুকে কেন্দ্র করে কবিমনের প্রতিক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা যায় না। গ্রন্থটি সমসাময়িক অনেক পাশ্চাত্য কবিকে স্পর্শ করেছিল। বিশ শতকের মধ্যভাগে চীনার কয়েকজন কবির মনে 'THE CRESCENT MOON' গভীর ছাপ ফেলেছিল। (দ্র. THE ENGLISH WRITINGS OF TAGORE-VOL-1. P. 604-605) আরবি কবি বোস্তানী (Wedih El Boustany) রবীন্দ্রনাথের Gitanjali ও Crescent Moon আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি উল্লেখ করছি—"Gitanjali is the greatest Boon, 'The Gardener is my name and in my heart is 'Crescent Moon'...(র.জী/৭/২৩)

GITANJALI-র বিপ্রতীপে বইটির অবস্থান হলেও THE GARDENER-এর তুলনায় THE CRESCENT MOON কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে।

গ্রন্থঋণ :

আকর গ্রন্থ : The English Writings of Rabindranath Tagore Vol I, Sahitya Academy, Ed Sisir Kumar Das

সহায়ক গ্রন্থ :

রবীন্দ্রজীবনী (১ম ও ২য় খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবিজীবনী (ষষ্ঠ খণ্ড) : প্রশান্ত কুমার পাল

পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র চিন্তাচর্চা : ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্র রচনাবলি (১ম ও ২য় খণ্ড) পঃবঃ সরকার প্রকাশিত জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ

গীতাঞ্জলি (১৩১৭/১৯১০)

Gitanjali 1912 (India Society London)

Gitanjali 1913 (Macmilan & Co. Ltd. London)

The golden Treasury of Indo-Anglican Poetry) ed. Binayak Krishna Gokak (Sahitya Academy)

Tagore before and after 1912 (The Statesman : A Tribute 9 5.2012) : William Rachide

রবিচ্ছায়ায় জাভার পথে

সুগতা সেন

বহু পরিকল্পনার পর অবশেষে ২০১২ সালে নভেম্বর এর গোড়ায় আমি ও আমার স্বামী দমদম বিমানবন্দরে প্লেনে চড়ে বসলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল ইন্দোনেশিয়ার জাভা। থাই এয়ার ওয়েজের উড়ান ব্যাঙ্কক হয়ে জাকার্তায় পৌঁছে দিল আমাদের। সেখান থেকে প্লেন বদল করে আমরা সোজা গেলাম যোগ্যকর্তা।

সাধারণত জাভা দ্বীপপুঞ্জে পর্যটকদের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয় 'বালিদ্বীপ'—সমুদ্রতীরের বিখ্যাত Tourist spot। কিন্তু আমাদের যাত্রার মূল লক্ষ্য ছিল বরোবুদুর। তাই আমরা প্রথমেই যোগ্যকর্তা গেলাম। সেখান থেকে গাড়িতে যেতে হ'বে বরোবুদুর। বালি যাব বরোবুদুরের পরে।

আমাদের বরোবুদুর তথা জাভাযাত্রার সংকল্পের পিছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ রবীন্দ্রনাথের 'জাভাযাত্রীর পত্র' পাঠের ফলে এই দ্বীপময় ভারত সম্পর্কে কৌতূহলের উদ্রেক। দ্বিতীয় ও মূল কারণটি আরও ব্যক্তিগত; তাই একটু বিশদ করে বলি—

ছোটবেলায় স্কুলপাঠ্য বইয়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার প্রসঙ্গে কম্বোজের আঙ্কোরভাট, আঙ্কোরথোম এবং জাভার বরোবুদুর মন্দিরের কথা পড়েছিলাম। তখন থেকেই এই দেশগুলি ও মন্দিরগুলি দেখার একটা স্বপ্ন ছিল। বিশেষ করে আঙ্কোরভাট (কম্বোডিয় ভাষায় 'ভাট' বা Wat মানে মন্দির) দেখার ইচ্ছা প্রবল ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কম্বোজ বা কম্বোডিয়া বাইরের লোকের অগম্য ছিল দীর্ঘকাল। মন্দিরগুলিও অনাদরে, অবহেলায় উপরন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইদানীংকালে রাজনৈতিক সুস্থিতির সঙ্গে 'ইউনেস্কো' মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন শুরু করায়, পর্যটকেরা সেখানে আবার যেতে শুরু করেছে। বহুদিনের সাধ মেটাতে তাই আমরাও কম্বোডিয়া গেছিলাম ২০১১ সালে।

বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির—'আঙ্কোরভাট'—'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'। সুবিশাল ও সুউচ্চ পাঁচটি মন্দির—মাঝের প্রধান মন্দিরটি বিষ্ণুর—সেগুলিকে ঘিরে তিন সারি অলিন্দ—তার চারদিকে বিরাট চত্বর জুড়ে বিস্তৃত বাগান, অসংখ্য আকাশচুম্বী 'আদিম মহাদ্রুম'—এরও বাইরে সবকিছুকে ঘিরে চওড়া নদীর মত পরিখা। সমস্তটা মিলে 'আঙ্কোরভাট' এক সুবিস্তীর্ণ এলাকা। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব ভাস্কর্য, অপ্সরামূর্তি। অলিন্দের দেওয়ালে রামায়ণ, মহাভারত ও সমুদ্রমন্থনের নিখুঁত ও অসাধারণ সূক্ষ্ম খোদাইকর্ম। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে কম্বোজরাজ দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ নির্মিত এই হিন্দু মন্দির ইতিহাসের এক অতন্দ্র প্রহরী যেন; প্রাচীন হিন্দু ভারতের গৌরব ঘোষণা করে চলেছে নিরন্তর। মুগ্ধ বিস্ময় ও সম্ভ্রমবোধে চিত্ত আপনি বিনত হয় এর সামনে।

আঙ্কোরভাট দেখা ইস্তক মনে এই ইচ্ছা প্রবল হল—বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির দেখেছি, এবার বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দিরটি দেখতে হবে। বরোবুদুর যেতে হবে। সেই ইচ্ছাপূরণ করাই ছিল আমাদের জাভা যাত্রার প্রধান কারণ।

যোগ্যকর্তায় ছিলাম দেড়দিন। যোগ্যকর্তার আদি নাম ছিল অযোধ্যা। শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডেরও আদি রাজধানীর নাম ছিল 'আয়ুথিয়া' অর্থাৎ (অযোধ্যা)। দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি এসে এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে কেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথ জাভাযাত্রীর পত্রে বিশদাকারে লিখেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যের নামে নিজেদের রাজধানীর নামকরণ তার অন্যতম পরিচয়। যাই হোক, অযোধ্যা নামটি লোকমুখে হয়ে গেল 'যোগ্যা' এবং বহু সংস্কৃত শব্দের মতো স্থানীয় উচ্চারণে এখন তা হয়ে গেছে 'জোগ্‌জা'।

উচ্চারণ পরিবর্তনের আরও নমুনা দিই। ইন্দোনেশিয় ভাষাকে এরা বলে 'বাহাসা' (Bahasa)—এটি সংস্কৃত 'ভাষা' শব্দেরই বিবর্তিত রূপ। নিজেদের উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরেজি শব্দের বানানও এরা বদলে দিয়েছে—Taxi-র মাথায় লেখা 'Taksi', টেলিফোন বুথের উপর লেখা—'Telepon'। তাদের টাকার নাম 'রুপিয়া'।

এদের খাদ্য ভাতপ্রধান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমস্ত খাবারের সঙ্গেই এরা ভাত খায়। এমনকি ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গারের সঙ্গেও পাতার মোড়কে জমাট-বাঁধা ভাত কামড়ে কামড়ে খায়। এদের রান্না কিছুটা চীনা রান্নার মতো, কিন্তু শুকনো শুকনো। ভাতের সঙ্গে এরা ডাল বা ঝোল জাতীয় কিছু খান না। শুকনো ভাত ও ভাজা মাংসের সঙ্গে আমরা তরকারি ও ঝোল জাতীয় কিছু চাওয়াতে ওরা কাঁচা স্যালাড ও তরল স্যুপ এনে দিয়েছিল।

আজকের ইন্দোনেশিয়ায় ৯০ শতাংশ অধিবাসী ধর্মে মুসলমান। কিন্তু দেখলাম এদের ধর্মসহিষ্ণুতা ও উদারতা অপরিসীম। একই পরিবারে বাবা-ছেলে, ভাই-ভাই, কিংবা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারে অনায়াসে। পারিবারিক চর্চায় হিন্দুর পুজো, মুসলমানের নমাজ, বৌদ্ধের ধ্যান অথবা খ্রিস্টানের প্রার্থনায় কোনো বিরোধ নেই। বিয়ের পাত্রপাত্রী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে আপোসে ঠিক করে নেয়, বিবাহকালীন অনুষ্ঠান হলে ব্যয়লাঘব যে যার ধর্মমতে ফিরে যেতে পারে।

এরা মুসলমান কিন্তু এদের অভিবাদন 'আদাব' হয়, ভারতীয় 'নমস্কার'। দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান, কিন্তু এদের অন্যতম জাতীয় ছুটি (National holiday) বৈশাখী পূর্ণিমা,—বুদ্ধদেবের জন্মদিন। মুসলমান হলেও এদের নাম আবশ্যিকভাবে আরবি/ফারসি নাম নয়। অনায়াসে সংস্কৃত শব্দে নামকরণ হয়। আমাদের গাড়ির মুসলমান চালকের নাম ছিল অনন্তবিজয়। যার রোমান ক্যাথলিক ভাইয়ের স্ত্রী বৌদ্ধ। এদের কোনো বংশগত পদবি নেই। বাবার নামই ছেলের পদবি, আমাদের দক্ষিণ ভারতীয় প্রথার মতো।

মনে হয়, বর্তমানে ইসলামের আধিপত্য বেশি হলেও, প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এবং রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি এদের অন্তঃকরণকে এমনভাবে অধিকার করেছিল, যে ভিতরে ভিতরে তা প্রবাহিত হয়েই চলেছে। জীবনযাপনে, আহারে-বিহারে তাই সব ধর্মেরই একটা আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে যেমন কোনো আবশ্যিকতা নেই, মাংসভোজন, মদপান প্রভৃতির উপরেও কোনো নিষেধের বেড়া নেই। এই উদার ধর্মনিরপেক্ষতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে আমরা গর্ব

করি, কিন্তু সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতা দেখলাম ইন্দোনেশিয়ায়। একসময় ভারতের ধর্মের বাণী এ দেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজ এদের ধর্মসহিষ্ণুতার বাণী কি ভারতকে অনুপ্রাণিত করতে পারে না?

যোগ্যকর্তার রাস্তায় অন্যান্য যানবাহনের সঙ্গে সাইকেল-রিকশার চলন প্রচুর। কিন্তু এখানকার রিকশায় আরোহীর আসন সামনে, চালকের সাইকেল পিছনে, কিছুটা আমাদের সাইকেল-ঠ্যালাগাড়ির মত। যানবহুল রাস্তায় এরকম রিকশায় সওয়ারি হতে একটু আতঙ্ক হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় যদিও গণতান্ত্রিক সরকার এখন, তবুও ওখানকার প্রধান ব্যক্তি সুলতান; ইংল্যান্ডের রাণীর মতন। যোগ্যকর্তায় সুলতানের প্রাসাদ দেখলাম। নির্মাণে ইসলামি স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু অলংকরণ ও বৌদ্ধ প্যাগোডার গঠনের মিশেল ঘটেছে। ইসলামি স্থাপত্যে ফুল-লতা-পাতার নকশা থাকে, প্রাণীর নকশা থাকে না। সাপ ও ড্রাগনের মিশ্রিত রূপের ভাস্কর্য দেখলাম। সবুজ, মেরুন ও সোনালি রং-এ প্রাসাদটি বর্ণাঢ্য।

প্রাসাদে প্রবেশমাত্র যন্ত্র ও কন্ঠের সম্মিলিত সংগীত শুনতে পেলাম। দেখি মার্বেল পাথরে তৈরি একটি বড়ো চত্বর, কারুকাজ করা কাঠের থামের উপরে কাঠের চালু ছাদ—সেখানে অনেক যাত্রী বসে বিবিধ রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। জলতরঙ্গের মতো কিছু বাজনা ও ধাতু নির্মিত নানারকমের তালবাদ্য। কোনো যন্ত্রই হাত দিয়ে বাজাচ্ছে না—ছোটো কাঠের লাঠি, বা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাজাচ্ছে। বড় কাঁসর ঘন্টার (gong) মতো বাজনাও আছে। কিন্তু কোনো তারযন্ত্র, বা বাঁশি ও সানাইএর মতো ফুঁ দিয়ে বাজানো যন্ত্র দেখলাম না। এই অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনজন মহিলাও গান গাইছিলেন। মনে হল কন্ঠসংগীত যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত করছে, যন্ত্রসংগীতই প্রধান। ভাষা সুর ছন্দ সবই অচেনা। কিন্তু জমজমাট এই অর্কেস্ট্রা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় একেই 'গামেলান সংগীত' বলেছেন। বাজনা থেমে গেলে বাদক-গায়কেরা উঠে গেলেন, যন্ত্রগুলি সেখানেই রাখা থাকল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্যটকরা ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট শ্রোতাও দেখলাম না। মনে হল, এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান নয়। সুলতান-প্রাসাদে হয়তো দিনের মধ্যে একাধিকবার এরকম গামেলান সংগীত হয়। হয়তো 'বন্দির বন্দনাগান'। যোগ্যকর্তা থেকে বরোবুদুর যাবার পথে পূর্ব পরিকল্পনা মতো থামলাম প্রম্বাননের মন্দির দেখতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতো, মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গভর্নমেন্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলছেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প করে এগোচ্ছে।" ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ দেখার ৮৫ বছর পরে প্রম্বানন মন্দির পুনর্গঠনের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। স্বাধীন ইন্দোনেশিয় সরকার ইউনেস্কোকে দায়িত্ব দেওয়ায় মন্দিরগুলি তার সাবেক মূর্তিতে ফিরে এসেছে। কেবল মন্দিরের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজ কিছু এখনও বাকি।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সঞ্জয় নামক হিন্দু ব্যক্তি 'ওপাক' ও 'প্রোগো' নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ভূমিতে তৎকালীন যবদ্বীপে 'মাতারাম' নামক বৃহৎ রাজ্য গড়ে তোলেন। পরে তিনি বৌদ্ধ রাজা শৈলেন্দ্র কর্তৃক সপরিবারে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেও শতাব্দীকাল পরে সঞ্জয়ের উত্তরপুরুষ রাকাই পাকিস্তান (নামের পরিবর্তন লক্ষণীয়) শৈলেন্দ্র পরিবারে বিবাহ সূত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে

প্রাচীন হিন্দু গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ও বহু হিন্দু মন্দির তৈরি করেন। প্রম্বানন মন্দিররাজি সেগুলির অন্যতম। কিন্তু আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতকের শেষার্ধে মন্দিরগুলি গঠিত হবার একশো বছরের মধ্যেই মাতারাম রাজত্ব পূর্ব জাভায় স্থানান্তরিত হবার ফলে মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হয়। তদুপরি ষোড়শ শতকের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে অবহেলিত মন্দিরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়।

সেই ভগ্নদশা থেকে আবার তাদের সাবেকি চেহারায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। একটি প্রকাণ্ড চত্বরের উপরে কালো পাথরে তৈরি পাঁচটি মন্দির। মাঝখানের মূল মন্দিরটি শিবের। তার দুপাশে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির। শিব মন্দিরের ঠিক সামনে নন্দীর মন্দির। সেখানে বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও ব্রহ্মার বাহন হংসের মূর্তিও আছে—অর্থাৎ পিছনে মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দুর্গার মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ। তবুও সাবধানতার কারণে আমাদের মাথায় হেলমেট পরে শিব মন্দিরে ঢুকতে হল।

মন্দিরের চারপাশে বিশাল বাগান, জলাশয়। মন্দির প্রাঙ্গণ তথা সমস্ত এলাকাটি অতি পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। প্রম্বাননের মন্দিরের গঠন, তার বিন্যাস আঙ্কোরভাটের কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও আঙ্কোরভাট আরও অনেক প্রকাণ্ড ও প্রায় তিনশো বছর পরে তৈরি।

মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে পৌরাণিক দেবদেবী ও রামায়ণ কাহিনি খোদিত। পূর্বেই বলেছি এই দ্বীপময় ভারতে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি মানুষের জীবন ও মননের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। রাম বিষ্ণুর অবতার বলে রামায়ণ কথা এখানে বিশেষ জনপ্রিয়। যদিও বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনি, চরিত্র এখানে অনেক বদলে গেছে, রামায়ণের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ একথাও তারা ভুলে গেছে। কিন্তু রামায়ণ এদের ভারতবর্ষ জীবনের সঙ্গে একীভূত। আজকের ইসলামি প্রাধান্যের সময়েও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

প্রম্বানন্দ মন্দিরের পিছনে খোলা আকাশের নীচে যুক্তমঞ্চে এখনও রামায়ণ কাহিনি নৃত্যান্বিত হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমনটি দেখেছিলেন। নাচের মঞ্চটি দেখলাম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সময়াভাবে নাচ দেখা হল না।

প্রম্বানন মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে মন্দিরের ছবি আঁকা একটি পরিষ্কার চাদর (সারং) আমাদের কোমরে জড়িয়ে নিতে হল। এসব মন্দিরে এখন আর পুজো হয় না। তবু বাওলি প্রথায় বিদেশি পোষাক পরিহিত মানুষকে সারং না জড়িয়ে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো মন্দিরে এ জাতীয় প্রথা দেখেছি—সেকথা মনে পড়ল।

মন্দির কমপ্লেক্সের বাহির পথে সারংটি খুলে নেয় ওরা। সেই বাহির পথে স্থানীয় হস্তশিল্পের বিপুল পসরা সাজিয়ে দোকানিরা বসে। ইন্দোনেশিয়ার হস্তশিল্প—বাতিক, কাঠ ও পাথরের কাজ সুবিখ্যাত—এখানে তার বিভিন্ন ও বিচিত্র নমুনা দেখলাম।

এবার যথার্থই বরোবুদুর অভিমুখে আমাদের যাত্রা শুরু। মেরাপি পর্বত ও মেনর্ক পার্বত্য অঞ্চলের মাঝখানে মধ্যজাভায় একটি ছোটো গ্রাম বরোবুদুর। সেখানে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় ও নিবেদনে এই প্রকাণ্ড আশ্চর্য মন্দির নির্মিত হয়েছে। কাছ থেকে মেরাপি আগ্নেয়গিরি দেখবার আশায় আমরা পাহাড়ি চড়াই ভেঙে অনেকদূর উঠেছিলাম। কিন্তু মেরাপির চূড়া মেঘে ঢাকা তাই দেখা যাবে না শুনে ভগ্নোৎসাহ হয়ে নেমে এলাম। সোজা পৌঁছলাম বরোবুদুর।

বরোবুদুরে আমরা যেখানে ছিলাম তার নাম 'মনোহরা'—Monohara Center of Borobudur Study। এ ঠিক হোটেল নয়, একটা ছোটোখাটো রিসর্ট। প্রধানত বরোবুদুর মন্দির সম্পর্কে গবেষণার কারণে তৈরি। মনোহরা সত্যিই মনোহরা। তার পরিবেশ, বাগান, ঘরগুলির অবস্থান গৃহসজ্জা, ভোজনালয়, কর্মচারীদের ব্যবহার সবই যত মনোরম ততই আন্তরিক।

মনোহরার বাগানের বেড়ার ঠিক বাইরেই বরোবুদুর মন্দিরের এলাকা শুরু হয়েছে। আমরা যখন সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পড়ন্ত আলোয় সামনে বিশাল মন্দির দেখে দেহে মনে যে রোমাঞ্চ লাগল ভাষায় তা বোঝানো যায় না। 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ, আসিতে তোমার দ্বারে'। তখনই আর কাছে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রহরীর সতর্ক নিষেধে ফিরে আসতে হল।

পরদিন অন্ধকার থাকতে উঠে রওনা হলাম বরোবুদুরের চূড়া থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। মনোহরার রিসেপশনে সূর্যোদয়-দর্শনার্থী সকলকে একটি করে টর্চ আর কোমরে বরোবুদুরের ছবি আঁকা সারং জড়িয়ে দিল। রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে, অন্ধকার রাস্তা ভিজে। গাইড আশ্বাস দিল যে বৃষ্টি হয়ে গেছে বলেই নিশ্চিত সূর্যোদয় দেখা যাবে। আগের দুটো দিন মেঘলা আকাশে সূর্যোদয় দেখা যায়নি। আশা-আশঙ্কায় দুরুদুরু বক্ষে মন্দিরের সামনে পৌঁছোলাম।

দেখলাম মন্দিরের কোনো তোরণ দ্বার নেই। রাস্তা যেখানে শেষ, সেখানেই সিঁড়ির শুরু। ২০/২৫ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একটা প্রকাণ্ড খোলা চত্বরে পৌঁছুলাম। সেই চত্বর পার হয়ে এবার আসল মন্দিরের সিঁড়ি শুরু হল। সে সিঁড়ি খাড়া উঠে গেছে মন্দিরের মাথা পর্যন্ত। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম নয়টি তলা; মনে ভয় পাছে আমরা চূড়ায় পৌঁছোবার আগেই সূর্যদেব উঠে পড়েন। প্রাচীন মন্দির—সিঁড়ির ধাপগুলি খুব উঁচু উঁচু ও অসমান, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় ছিল না।

চূড়ায় গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, পুবের আকাশ তখন রঙিন হয়ে আসছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের গায়ে তখন অরুণ আলোর স্বর্ণরেণুর ছোঁয়া লাগছে। মন্দিরের স্তূপগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সূর্যদেব দেখা দিলেন। বৃষ্টিধোয়া পার্বত্য প্রকৃতির পটে বরোবুদুর মন্দির আমাদের মুগ্ধ বিহ্বল চোখে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। মনে হল অনেক ভাগ্য করে এমন দেখা দেখতে পেলাম।

হঠাৎ লক্ষ করি ওই পুবদিকেই মেরাপি আগ্নেয়গিরি—আগের দিন যার দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়েছিলাম। ভূগোল বইতে চিরকাল আগ্নেয়গিরির ছবিই দেখে এসেছি—নিজের চোখে কখনও দেখিনি। পাহাড়ের চূড়াটি কে যেন এক কামড়ে খাবলে খেয়েছে। ২০১০ সালে মেরাপির তিনদিনব্যাপী ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণনাশ হয়েছিল। উৎক্ষিপ্ত পাথরে বরোবুদুরের কাছের একটি নদী সম্পূর্ণ বুজে গেছে, নদীর উপরের ব্রিজ তো ভেঙেইছে। এখন আবার মাটি খুঁড়ে পাথর সরিয়ে নদীর ধারাকে পুনঃপ্রবাহিতকরার চেষ্টা চলছে। সাময়িক সেতুর উপর দিয়ে আমরা সে নদী পারও হয়েছি। মেরাপি থেকে ২৮ কি:মি: দূরে অবস্থিত বরোবুদুর মন্দির ১" ইঞ্চি পুরু ছাইএ চাপা পড়েছিল। মন্দিরের উপর থেকে মেরাপির ক্রেটারের মাথায় এখনও ধোঁয়া দেখা যায়।

সূর্যোদয় দেখার তাড়নায় একটানা সোপান বেয়ে মন্দিরের চূড়ায় উঠে গিয়েছিলাম। দুপাশে তাকিয়ে দেখার অবকাশ ছিল না, অন্ধকারও ছিল। এবার দিনের আলোয় মন্দিরটিকে ভালো করে দেখলাম। চূড়ায় বারবার প্রদক্ষিণ সেরে, ধীরে ধীরে এক একটি-তলা নামতে শুরু করলাম।

পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দির বরোবুদুর আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতকে নির্মিত। কে বা কারা, কেন এবং কখন এ মন্দির নির্মাণ করেন তার কোনো সঠিক তথ্য এখনও জানা যায়নি। এত বড়ো Sipgle Construction মন্দির পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। মন্দিরের গঠন এবং স্থাপত্যও অনন্য সাধারণ। মসজিদ, গির্জা যাই হোক না কেন আসলে একটি সুবৃহৎ গৃহ। যাতে প্রবেশের একটি দরজা থাকে। সেই দ্বারপথেই মূল উপাসনাস্থলে পৌঁছোতে হয়। দেবালয়কে ঘিরে যদি প্রাচীর বা প্রাকার থাকে, তাহলে প্রবেশের জন্য তোরণ থাকে। এই দেবগৃহে উপাসনা স্থলের উপরে যে ছাদ তারই উপরে থাকে মন্দিরের চূড়া। বিশেষ বিশেষ ধর্মের দেবালয়ের বিশিষ্ট চূড়ার গঠন দূর থেকেই চিনিয়ে দেয়—হিন্দুমন্দির না বৌদ্ধমন্দির, না গির্জা, না মসজিদ।

বরোবুদুরর মন্দির এই প্রচলিত মন্দির গঠনশিল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ মন্দিরের কোনো তোরণ নেই, কোনো দুয়ার নেই কারণ এর কোনো ঘর নেই, কোনো অভ্যন্তর নেই। অভ্যন্তরে কোনো উপাসনাস্থল নেই। পাথরের উপরে পাথর গেঁথে স্তরে স্তরে মন্দিরটি গড়া হয়েছে, যেন একটি ছোটো পর্বত। মন্দিরের বহির্গাত্রে প্রতিটি স্তর একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মূল মন্দিরের দেওয়াল ও প্রাচীরের মাঝখানের প্রশস্ত অলিন্দ দিয়ে পুরো মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করা যায়। একটি স্তর থেকে উপরবর্তী স্তরে যেতে সিঁড়ি বাইতে হবে। মন্দিরের গায়ে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিকেই সোপান আছে। এইভাবে ধাপে ধাপে উঠে যায় নয়টি তলা। প্রথম পাঁচটি স্তর চতুষ্কোণ; নীচের থেকে উপরে পরিসর ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই স্তরগুলিতে প্রাচীর আছে। তার উপরের তিনটি স্তর গোলাকৃতি; সেগুলিও ক্রমশঃ ছোট হয়েছে এসেছে। এই গোলাকার স্তরগুলিতে' কোনো পাঁচিল নেই; অসাবধানে পতন অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম পাঁচটি চতুষ্কোণ স্তরে, প্রাচীরের ভিতর দিকের দেওয়ালে ও মূল মন্দিরের গায়ে, উপরে নীচে দুই সারিতে বুদ্ধের জীবনকাহিনি, জাতকের কাহিনি, বোধিসত্ত্বের কাহিনি, রাজা সুধন্যের কাহিনি নিপুণ শিল্পকৌশলে খোদিত। ধারাবাহিক এই কাহিনিগুলি খোদাই করবার সময় শিল্পী কি নিখুঁত ও বিশদভাবে রূপায়ণ করেছেন দেখলে অবাক হতে হয়। নারীদের বস্ত্র, অলংকার, কেশবিন্যাস, দাঁড়াবার ভঙ্গি—সন্ন্যাসীদের জটা, কমণ্ডলু—প্রত্যেকটি পৃথক ও বিশিষ্ট। গাছপালা, ফুলফল বিভিন্ন প্রাণী—সবই অসাধারণ ডিটেলে খোদিত। আর গৌতম বুদ্ধের রূপায়ণের তো কোনো তুলনাই হয় না। এই বুদ্ধ কথাগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে প্রতিটি স্তরে সিঁড়ির বাঁদিক থেকে শুরু করে (clockwise) চারবার মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হবে। এইভাবে কুড়িবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে তবে গোলাকৃতি স্তরে পৌঁছোনো। মন্দিরের বাইরে নীচ থেকে কিন্তু এই খোদাইকর্ম প্রায় দেখা যায় না।

মন্দিরের মূল ভিত্তিগাত্রেও দেওয়াল-খোদাই চিত্র ছিল তবে সে ছবি মানব সংসারের ছবি। পরে কেউ কখনও সেই ভিত্তির উপরে পাথর চাপিয়ে ভিত-অংশটিকে অনেক প্রশস্ত করেছে। মনে হয় অত প্রকাণ্ড মন্দিরকে ধরে রাখার জন্য ভিত্তিটিকে অধিকতর শক্তিশালী করবার প্রয়োজন

হয়েছিল। এখন দেখলে মনে হয় বেশ দুতলা সমান উঁচু একটি পাথরের বিশাল চত্বরের উপরে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। মূল ভিত্তিচিত্রের নমুনা দেখাবার জন্য একটি ছোটো অংশের পাথর সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বাকি অংশকে অক্ষতই রেখেছে।

গোলাকার স্তরগুলিতে কোনো প্রাচীর নেই, তাই খোদাইকর্ম নেই। কেবল সমানুপাতে ঘন্টা আকৃতির জাফরি কাটা স্তূপ সাজানো আছে। প্রথম গোল স্তরে ৩৬টি, দ্বিতীয় স্তরে ২৪টি, তৃতীয় স্তরে ১২টি স্তূপ। এই মোট ৭২টি স্তূপের ভিতরে একটি করে বুদ্ধমূর্তি আছে। দেখলাম কেবল দুটি স্তূপের উপরের অংশটি খোলা—ইচ্ছায় না অনিচ্ছায় জানিনা। সেগুলি থেকে আবক্ষ বুদ্ধমূর্তি মাথা তুলে আছে। অন্য স্তূপগুলির গায়ের জাফরিতে চোখ লাগিয়ে অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্তি দেখতে হয়।

এই তিনটি স্তরের উপরের সর্বোচ্চ স্তরে একটিমাত্র প্রকাণ্ড স্তূপ। সেটি solid, ভিতরে কোনো মূর্তি নেই। এটিকেই মন্দিরের চূড়া মনে হয়। দূর থেকে দেখলে মন্দিরের গায়ে জানালার মতো যে খোপগুলি দেখা যায়, সেগুলি আসলে মন্দিরের গায়ে কাটা ছোটো ছোটো গুহা—যার প্রত্যেকটিতে একটি করে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। আবার, গুহা ছাড়া খোলা আকাশের নীচে প্রাচীরগুলিতে বুদ্ধমূর্তি বসানো। এরকম ৪৩২টি বুদ্ধমূর্তি আছে সারা মন্দিরের বিভিন্ন স্তরের গায়ে। আর স্তূপগুলির ভিতরে আছে আরও ৭২টি।

আর আছে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত ৩২টি সিংহমূর্তি, যারা মন্দিরের দ্বারপাল, মন্দিরকে রক্ষা করে। বস্তুত বরোবুদুর মন্দিরের বিশেষ গঠনটি এমন যে আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে ঘন অরণ্যের মাঝখানে বিকশিত একটি পদ্মফুল। বৌদ্ধধর্মে পদ্মফুলের বিশেষ তাৎপর্য আছে—পদ্ম শান্তির প্রতীক। বুদ্ধের আসন তাই পদ্মাসন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অতি পবিত্র তীর্থ এই মন্দিরকে সেজন্যই হয়তো পদ্মফুলের আকার দিতে চেয়েছিলেন সঠিক শিল্পীরা। মন্দিরের পাথরের রং হলদেটে গোলাপি বলে সূর্যের প্রথম আলোয় গোলাপি পদ্ম মনে হয়।

মন্দিরের গঠন যেমন অদ্ভুতপূর্ব, এখানে সাধনার ও উপাসনার আইডিয়াটিও তেমনি অনন্যসাধারণ। বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে পূজার্চনা বা ধ্যান কিছুই নয়। বুদ্ধের বিভিন্ন জন্ম ও বোধিসত্ত্বের কাহিনি দেখতে দেখতে মন্দির প্রদক্ষিণ করার দ্বারাই বুদ্ধের ক্ষমা ও করুণা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী সাধকচিত্তে সঞ্চারিত হবে—এটিই অভিপ্রেত। এই শিক্ষামূলক প্রদক্ষিণই বৌদ্ধের ধ্যান ও সাধনা। কুড়িবার প্রদক্ষিণান্তে সাধকচিত্ত যখন বুদ্ধের আদর্শে সংসারের দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করতে প্রস্তুত, তখনই শেষ তিনস্তরে পৌঁছোবার অধিকার জন্মায়। গোলাকৃতি স্তরগুলিতে শুরুতে সোপানের উপরে তোরণের আকারে মহাকালের মুখ খোদাই করা আছে—যিনি অতীতের সব বাধাবিপত্তি গ্রাস করে সাধককে শান্তির পথে যাত্রার সাহায্য করেন। প্রথম দুটি গোল স্তরের স্তূপের গায়ে বরফি আকারের জাফরি কাটা, তৃতীয় স্তরের স্তূপে চৌকো জাফরি। বরফি আকার শান্তির পথের প্রতীক, আর চৌকো আকৃতি চূড়ান্ত শান্তির প্রতীক। অর্থাৎ এখানে মাটির পৃথিবী ও সংসারের বন্ধন থেকে উন্মার্গগামী হয়ে সাধক বুদ্ধের অনুসরণে পরিপূর্ণ শান্তিলাভ করতে সক্ষম হলেন। সর্বোচ্চ স্তূপটি শূন্য। বোধহয় বৌদ্ধধর্মের শূন্যতা ও নির্বাণের প্রতীক রূপে কল্পিত।

এ মন্দির-দর্শন, মন্দির-আরোহণই তীর্থযাত্রা—Pilgrimage। সমগ্র মন্দিরের আকৃতি ও গঠনের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের মূল অভিপ্রায় ও আভ্যন্তরীণ বাণী নিহিত আছে। সমগ্র মন্দিরটিই যেন—

"উঠেছে অম্বর পানে
কহিছে গম্ভীর গানে
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

বরোবুদুরের মন্দির রবীন্দ্রনাথের চোখে ভালো লাগেনি। লিখেছেন—"থাকে থাকে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয় পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে।" ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর কারো হাত নেই। সচরাচর মন্দিরের গঠন ও সমানুপাতে অভ্যস্ত তাঁর চোখে এই মন্দিরের আকৃতির ভিন্নতা পীড়াদায়ক হয়েছিল। তবে আমার মনে হয় এ অপছন্দের গভীরতর কারণ অন্যত্র নিহিত। হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো এই মন্দির প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের অবহেলায় ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন গিয়েছিলেন তখন ওলন্দাজ সরকার সংস্কারের কাজ সবে শুরু করেছে। আরও ৮৫ বছর পরে, ইউনেস্কো দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও মন্দির এখনও পুরোপুরি পুনর্গঠিত ও সংস্কৃত হয়নি। কবি দু'একটি তলা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারেননি, সর্বোপরি যে চূড়া হয় একটি স্তূপ সেও তিনি স্বচক্ষে দেখেননি—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরোবুদুরে দাঁড়ানো কবির আলোকচিত্রটি মন্দিরের প্রথম স্তরে দাঁড়িয়ে তোলা।) বস্তুত সমস্ত মন্দিরটি ঘুরে দেখতে না পারলে, উপরের স্তরে না পৌঁছোতে পারলে মন্দিরের বিশেষত্বটি ঠিক বোঝা সম্ভব নয়। অংশত দেখার ফলেই বোধহয় কবির ভালো লাগেনি।

বরোবুদুর মন্দিরের গঠন কবিকে প্রসন্ন করতে পারেনি; কিন্তু এ মন্দিরের পাষাণতটে ভক্তির নিবেদনের যে বাণী নিহিত আছে তা যে কবিচিত্তকে কতখানি আন্দোলিত করেছিল তার প্রমাণ 'বরোবুদুর' কবিতা।—

"সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়তে পারে সে ভাষার লিপির লিখন,...
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতির দেশে
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা
নেমেছে বিস্মৃতি কুহেলিকা।

...চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে
হৃদয় নীরস অহংকারে।
তাই আসিয়াছে দিন
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

তাজমহলকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কালের কপোলতলে একবিন্দু নয়নের জল'; প্রেমিক সম্রাটের বিরহবার্তাবাহী নব মেঘদূত'। বরোবুদুর মন্দিরও তেমনি ধরণীতল থেকে পরিপূর্ণ প্রশান্তির পথে যাত্রা; অমৃতময়ের প্রতি উদ্গীত ত্রিশরণ মন্ত্র।

বরোবুদুরের কাছেই আরও দুটি মন্দির দেখেছি 'পাওয়ান' ও 'মেন্‌ডুট'। পার্বত্য অঞ্চলে রচিত বরোবুদুরের দুপাশ দিয়ে দুটি নদী গেছে—'এলো' আর 'প্রোগো'। প্রাচীনকালে যখন নদীর উপর কোনো সাঁকো ছিল না, তখন পুণ্যার্থীরা পাহাড় পার হয়ে হেঁটে এল নদী পার হয়ে আগে মেনডুটের মন্দিরে—বুদ্ধের আরাধনা করতে। ফের আর একটি পাহাড় টপকে প্রোগো নদী পার হয়ে পাওয়ানে বিশ্রাম নিয়ে তবে বরোবুদুরের দিকে রওনা হতেন। পাওয়ানের বহির্গাত্রেও বুদ্ধের বিভিন্ন পূর্বজন্মের ও অবতার জন্মের কাহিনি খোদিত। শুধু মানব-অবতারই নয়, খরগোস, কচ্ছপ, আটপেয়ে হরিণ, কোকিল, কোয়েল, আগুন প্রভৃতি বিভিন্ন পশুপাখি ও বস্তুকে বুদ্ধের বাণী ও আদর্শের প্রতীক বা প্রতিনিধি রূপে দেখানো হয়েছে। পাওয়ানের মন্দির গৃহে কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। ক্ষুদ্রাকৃতি পক্ষান্তরে মেনডুটের বহির্গাত্রের খোদাই শিল্প কালের প্রলেপে নিশ্চিহ্ন। দুটি একটি খাঁজে কিছু অবশিষ্ট নিদর্শনমাত্র আছে। মন্দিরের চূড়াটিও ভেঙে গেছে। কিন্তু ভিতরে তিনটি বিরাট ও অক্ষত বুদ্ধমূর্তি আছে, নিয়মিত অর্চনা হয়।

এই তিনটি মূর্তি—একটি সামনাসামনি ও অন্য দুটি দুপাশে, পাশ ফিরিয়ে বসানো। তিনটি মূর্তির বেদীতে পা-ঝুলিয়ে বসা বুদ্ধমূর্তি। আমি দেশে ও বিদেশে পদ্মাসনে বসা ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, চলমান বুদ্ধমূর্তি, প্রলম্বিত শায়িত বুদ্ধমূর্তি বহু দেখেছি। কিন্তু মূর্তিগুলির side face দেখা যায়। মাঝের মূর্তিটি অপূর্ব সুন্দর।

পাওয়ান ও মেন্‌ডুট—দুটি মন্দিরেরই ছোটো আকৃতি ও গঠন চিরাচরিত। মেন্‌ডুট রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল—"ছোটো মন্দির। গড়নটি বেশ লাগল। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন মূর্তি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির এই মূর্তি তৈরি করে তুলেছিল। সে কত কোলাহল, কত আয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মানুষের প্রাণ।...তৈরি করে তুলবার জন্যে যে প্রবল শ্রদ্ধা

সেটা তখনকার সমস্তকাল জুড়ে সত্য ছিল।...তারপরে সেদিনের ভাষার উপর ভাবের উপর ধুলো চাপা পড়ল।...মানুষের এই কীর্তি আপন প্রকাশের জন্যে মানুষের যে দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হল সে লুপ্ত হয়ে গেছে।"

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বরোবুদুর সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য। মেন্‌ডুটে তো নিয়মিত পুজো হয়, নিয়মিত ভক্তকণ্ঠে মন্ত্র-উচ্চারিত হয়। কিন্তু বরোবুদুরে আর পুজো হয় না। বৈশাখী পূর্ণিমায় কোনো ভিক্ষু হয়তো ব্যক্তিগত পূজা নিবেদন করেন। কিন্তু সম্বৎসরে এই ৫০৪টি বুদ্ধমূর্তি অনারাধিতই থেকে যায়। প্রাচীনকালের মানুষের ভক্তির ও প্রাণের যে আবেগ এই মন্দিরের পাষাণ প্রস্তরে গাঁথা আছে তারই জীবন্ত সাক্ষী এ মন্দির এখন National Manument। সারা বিশ্বের পর্যটকরা এখানে তাঁদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা মেটাতে আসেন। কিন্তু ভক্তি নম্র চিত্ত পুণ্যার্থী সাধক আর এখানে তীর্থযাত্রায় আসেন না।

আমাদের বরোবুদুরের পালা শেষ হল। মন্দির দেখবার পরিতৃপ্তিও ছেড়ে চলে যাবার বেদনা বুকে নিয়ে যোগ্যায় ফিরে এলাম। এবার যাব বালিদ্বীপ।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, কলকাতায় ফিরে কাগজে খবর দেখলাম ১৫০তম রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বরোবুদুর মন্দির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মনে খুবই আক্ষেপ হল যে আর ক'দিন আগে এটা ঘটলে আমরা দেখে আসতে পারতাম। ঠিক কোন্‌খানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি বসানো হল সে কৌতূহলও মনে রয়ে গেল।

যোগ্যকর্তা থেকে ডেনপাসার (বালি) বিমানবন্দরে পৌঁছোতে উড়ান নিল দেড়ঘণ্টা। আমাদের প্লেন মেরাপির একদম উপর দিয়ে উড়ে গেল। জানালা দিয়ে ক্রেটারের ভিতরটাও দেখতে পেলাম। ভারী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বালির কুটা অঞ্চলে সমুদ্রতীরে আমাদের হোটেলে যখন পৌঁছোলাম, তখন দুপুরবেলা। প্রখর মধ্যাহ্নরৌদ্রে লবণাম্বুরাশি বিধৌত বালুকাবেলা ঝক্‌মক্‌ করছে।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় ৯০ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান; কিন্তু বালিতে এখনও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য। এখানকার হিন্দুরাও অত্যন্ত ধর্মসহিষ্ণু। জাভাদ্বীপে তথা সমগ্র পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, যাকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৃহত্তর ভারত বা দ্বীপময় ভারত বলে আখ্যাত করেছেন, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছিল বাণিজ্যের পথ ধরে। আর্যদের আগমনের আগে যখন ভারতবর্ষে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধারা নিজ বিশিষ্ট রূপ লাভ করেনি, সেই অনার্য ভারতের সঙ্গেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলগুলির বাণিজ্যিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল। সামুদ্রিক পথে বাণিজ্যের সূত্রেই দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির প্রবেশ। সে জন্যই বোধহয় বরোবুদুর মন্দিরগাত্রে একাধিক বাণিজ্যতরীর চিত্র খোদিত আছে।

বস্তুত আর্যদের আগমনের ফলে ভারতে আর্য-অনার্য সম্মিলনে যে নবধর্ম ও সংস্কৃতি সৃষ্ট হল, তা বন্যার জলের মতো ভারতের সীমা ছাপিয়ে দ্বীপময় ভারত ও মধ্য-এশিয়ার নানা দেশকে প্লাবিত করল। মনে রাখা প্রয়োজন যে এসব দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করে, স্থানীয় লোকেদের বধ করে, অত্যাচার উৎপীড়নের দ্বারা ভারতবর্ষ নিজের ধর্ম-সংস্কৃতিকে এদের উপরে চাপিয়ে দেয়নি। বাণিজ্যসূত্রে এসে কেউ কেউ হয়তো স্থানীয় রাজবংশে বিবাহ করে রাজকীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন

করেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা স্থানীয় ও অভারতীয়ই থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের 'ভারতীয়' করে তোলার কোনো চেষ্টা ভারতীয়রা করেননি। অর্থাৎ বণিকের মানদণ্ডকে রজনী-প্রভাতে রাজদণ্ড করে তোলার কোনো ইচ্ছাই ভারতবর্ষের ছিল না। সুনীতিকুমার লিখছেন—"ভারতের দিগ্‌বিজয় ঘটিয়াছিল সত্য এবং ধর্মের সাহায্যে, অস্ত্রের সাহায্যে নহে। রাজর্ষি অশোকের আকাঙ্ক্ষিত ধর্মবিজয়ের আদর্শকেই ভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানেই ভারতের অবিনশ্বর গৌরব। কাষায়-চীবর পরিধান করিয়া বিনয়াবনত ভিক্ষু ও কটিবস্ত্রমাত্র পরিহিত হইয়া ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো...এই সকল দেশে ভারতের প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া...একটি সত্যকার বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।"

এ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়; প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, মনের সঙ্গে মনের সহজ আদান-প্রদান—'তোমার তালে আমার নাচে মিলন রিনিঝিনি'। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় রূপকল্পে এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ চিত্রিত।—

"মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাটপরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী।...
কহিনু আমি...পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।"

বালিতে হিন্দুধর্মের এই মিশ্রিত রূপ বিশেষভাবে লক্ষ করা গেল। হিন্দুধর্মের শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সব দেবতারাই আছেন, কিন্তু ভিন্ন রূপে, ভিন্ন আকারে। তাদের পুজোও হয় ভিন্ন রীতিতে। 'তির্ত আম্‌পুল' নামক ইন্দ্রের মন্দিরে গেলাম আমরা; এখানে রবীন্দ্রনাথও গিয়েছিলেন।

ভারতে কখনও ইন্দ্রের মন্দির দেখিনি। ইন্দ্র এদের জলের দেবতা (পক্ষান্তরে বৃষ্টির দেবতা), হাতে বজ্র। এই মন্দিরে প্রবেশ করলাম বালিনি কাপড়ের সারং জড়িয়ে। মন্দিরে প্রবেশের খুব কারুকার্য করা তোরণ আছে। কিন্তু ভিতরে আমাদের মতো একটি দেবগৃহ নেই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ছোটো মন্দির বা চৈত্যে, কিংবা থামে ধরা ছাদের নীচে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি। মূল ইন্দ্রের মূর্তিটি দেখলেই বোঝা যায় সেটি সুপ্রাচীন। সেটি একেবারেই খোলা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। তার সামনে সাদা বালিনি পোষাক, সাদা পাগড়ি পরিহিত পুরোহিত মাটিতে বসে পুজো শুরু করলেন। ফুল, ধূপ, ঘন্টার ব্যবহারে পুজো। প্রদীপ বা আরতি দেখলাম না। ছোটো ছোটো টুকরিতে ফুলপাতা দিয়ে মূর্তির সামনে সাজানো; খাদ্যদ্রব্যের নৈবেদ্য দেখিনি। পুরোহিত যে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, তার ভাষা সংস্কৃত বলে মনে হল না। সংস্কৃত হলেও স্থানীয় উচ্চারণে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পাশেই একটি উষ্ণ প্রস্রবণ; তার জল এদের কাছে খুব পবিত্র।

রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় এই মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতি বর্ণনা করেছেন। "হিন্দুভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কীরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্রভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গিটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের।...মনে হয় এক সময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, তার দেবদেবী রীতিনীতি উৎসব অনুষ্ঠান পুরাণ স্মৃতি সমস্তই ছিল। তারপরে ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে, হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ...ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল একথা সে ভুলল, কিন্তু, সমুদ্রপারের আত্মীয়-বাড়িতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ পড়ে আছে বলে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারল না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হতে পায়নি বলে কালের হাতে সেই সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষয়ে, কিছু ভেঙেচুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হয়ে।"

হৃতগৌরব ভারতের প্রতিনিধি হয়ে রবীন্দ্রনাথ জাভায় এসে, এখানে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির এই অভিজ্ঞান ও অনুসরণ দেখেই 'বাণী' (পরে যা সাগরিকা' নামে পরিচিত) কবিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে লিখলেন—

"আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি—
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।...
নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।...
শুনিনু কান পেতে—
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা পৌঁছে পড়েছি সেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি যুগল করি পাণি।"

গৌরবময় ভারত, মহাযোগী শিব ও বুদ্ধ-দর্শিত মোহমোচন বাণী পৌঁছে দিয়েছিল সমুদ্রপারের অন্যান্য দেশগুলিতে। তারা মনে-প্রাণে সেই ধর্মবাণী, পুরাণকথা গ্রহণ করেছিল। আজ হয়তো মূল উৎসের কথা তারা ভুলেও গেছে, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম নতুন ভাবে, নতুনরূপে সেখানে অনুসৃত ও চর্চিত হয়ে চলেছে। একেই সুনীতিকুমার সংজ্ঞায়িত করেছেন 'হিন্দুধর্মের বলিদ্বীপীয় বিকাশ' বলে।

বালিতে যেদিকেই গেছি, শহরের বাইরে বা ভিতরে, বড়ো রাস্তার (Highway) দুধারের জনপদগুলিতে—সর্বত্র মন্দিরের ছড়াছড়ি। মন্দিরের স্থাপত্য ও বর্ণ ভারতীয় মন্দির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মন্দির ও মূর্তির গঠনে জাভানী শিল্পের সঙ্গে চীনা ও জাপানী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মিশ্রণ ঘটেছে। ছাই রং ও টেরাকোটা রং-এর মিশ্রিত বর্ণ মন্দিরগাত্রে। লক্ষ করলাম মন্দিরে মূল

মূর্তির সামনে উপচার সাজানো থাকলেও, আসল পুজো হয় বাইরে কোনো বড়ো গাছের নীচে বা আলাদা বেদীতে বসানো ছোট মূর্তির সামনে। যাতে পথচলতি মানুষও পুজো দিয়ে যেতে পারে। সেই বেদী সাজাবার একটি প্রধান উপকরণ খোলা বর্মীছাতা। অনেকগুলি খোলা ছাতা বেদীটিকে বর্ণাঢ্য করে রাখে। আর দেখলাম ছোটো-বড়ো সব দেবীমূর্তিকেই এক টুকরো কাপড় পরানো।

ভারতীয় ধর্মের মতো, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিও এখানে বদলে গেছে। এমনকি এই মহাকাব্য দুটির চরিত্র, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, চরিত্রগুলির নাম সবই এখন ইন্দোনেশীয় বা বলিদ্বীপীয়। ইংরেজি ভাষার প্রচলন এদেশে খুব কম হয়তো কোনদিন ইংরেজ উপনিবেশ হয়নি বলে। সেটা পর্যটককদের পক্ষে একটা বড়ো সমস্যা। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে সংস্কৃত ভাষা এসেছিল ধর্ম-সংস্কৃতি, রামায়ণ-মহাভারতের হাত-ধরে, তার পরিচয় সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন রাজা আমাদের ভাষা বোঝেন না, কিন্তু কেমন গড়গড় করে কত সংস্কৃত ছন্দের নাম, সমুদ্র, পাহাড়ের কত সংস্কৃত প্রতিশব্দ, ভারতবর্ষের কত পাহাড় নদীর নাম বলে গেলেন। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে হয়তো এদের স্পষ্ট কোনো ধারণাও নেই, কিন্তু হাজার বছর আগে সে দেশের বাণী ও সুর যে এদের মনে গেঁথেছিল, তার রেশ এখনও কাটেনি। রাজবাড়িকে এরা বলে 'পুরী'। গায়ত্রী মন্ত্র না জানলেও শব্দটা জানে। নামকরণে এরা কীরকম সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে, রবীন্দ্রনাথ তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন; আমরাও তার নমুনা দেখলাম।

বালিনি পোষাকও বিশেষ ধরনের। পুরুষরা নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি, তার উপরে শার্ট বা জামা পরে। মাথায় এক টুকরো কাপড় বিশেষ কায়দায় বাঁধে উষ্ণীষের মতো। মেয়েদের পোষাক সারং কিছুটা শ্যামদেশীয়, কিছুটা আমাদের মণিপুরী 'ফানেক' এর মতো। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বাঁ কানের উপরে প্রধানত কাঠচাঁপা ফুল গুঁজে রাখে। কাঠচাঁপা এখানকার জাতীয় ফুল। হোটেলের বাগানে পাথরের মূর্তির কানেও পাথরের কাঠচাঁপা ফুল গোঁজা দেখলাম।

বালির মানুষ সুন্দরের সাধক, শিল্পীর জাত। এদের ঘরে মন্দিরে, বেশভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে সর্বত্র সমস্ত জাতটার শিল্পরচনার স্বাভাবিক উদ্যম ধরা পড়ে। ফুল ও মালার ব্যবহার এই শিল্পবোধের পরিচায়ক। এরা হাত জোড় করে নমস্কার করে, ফুলের মালা দিয়ে বরণ বা অভ্যর্থনা করে। হোটেলে 'চেক ইন' করা মাত্র আমাদের দুজনের গলায় কাঠচাঁপার মালা পরিয়ে এক গ্লাস করে স্থানীয় ফলের রস খেতে দিল। ফলের রস খাইয়ে আপ্যায়ন জোগজায় কম্বোজে দেখেছি; কিন্তু গলায় মালা কেউ পরায়নি।

ধরণী এখানে চিরযৌবনা, অকৃপণা, 'মাটির উপরে অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ। জাভা গরম দেশ। এখানকার ফল ফুল অনেকগুলিই আমাদের দেশের মতো। অন্ন এখানকার প্রধান খাদ্য। জলসেচ ও চাষবাসের রীতিপদ্ধতি খুব উৎকৃষ্ট। সমভূমি ছাড়াও পাহাড়ের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত থাকে থাকে ধানের খেত। পার্বত্য অঞ্চলে ধানের চারার নীচে জল ধরে রাখার অভিনব কৌশল—যাকে ওরা 'Rice Tarrace' বলে। চলার পথের দুধারে সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, নারকেল আমজাম কাঁঠাল সপেটা, আতা গাছের ঘন জঙ্গল। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো সুদৃশ্য গ্রাম। গ্রামের বাড়িগুলিতে টালির বা

খড়ের ঢালু ছাদ; ছাদের চারটি কোণা থেকে প্যাগোডার মতো একটি করে ঘন্টা বা ঝালর ঝুলছে। ছাদের মাঝখানে ডিজাইন করা একটি ছোট্ট চূড়া। ভারী সুন্দর। প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক মন্দির—ছাই ও গেরুয়া রঙে বিশিষ্ট বালিনি স্থাপত্যের ঐতিহ্যবাহী। এছাড়াও দেখেছি প্রতিটি জনপদেই অন্তত একটি চারপাশ-খোলা ছাদ ঢাকা চত্বর। থামগুলিতে সুন্দর কারুকার্য ছাদটি প্যাগোডার মতো। মনে হয় এগুলি বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি। গাছে-পালায়, পাহাড়ে-ঝর্নায়, মন্দিরে মূর্তিতে কুটীরে ধানখেতে নাচে গানে সাজসজ্জায় এই ছোটো দ্বীপটি যেন একটি জীবন্ত ছবি।

এদের হস্তশিল্পও অতি চমৎকার এবং সেই শিল্পকাজ সর্বত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়ানো। কাপড়ের উপর গরম মোমের তুলি বুলিয়ে আঁকা বাটিকশিল্প জাভার নিজস্ব আর্ট। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জাভাযাত্রার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। তিনি জাভা থেকে ফিরে শান্তিনিকেতন কলাভবনে এই 'বর্তিকশিল্প' শেখানোর প্রচলন করেন। বালিতে তাঁতের কারখানায় এক বিশেষ ধরণের রঙিন কাপড় বোনা হয়, যার নকশা অনেকটা আমাদের কটকি কাপড়ের মতো। 'তির্ত আমপুল'এ এই কাপড়েরই সারং আমাদের পরিয়েছিল। সোনা ও রূপোর দোকানের গয়না বিশেষত রূপোর জালিকাজের তৈরি জাহাজ, রথ, পশুপাখি (যা হুবহু উড়িষ্যার 'ফিলিগ্রি' কাজের মতো) দেখে ধন্দ লাগছিল ভারতেরই কোনো দোকানে এলাম কি না।

অপূর্ব সুন্দর ও সূক্ষ্ম এদের কাঠের কাজ। সেগুন মেহগনি, আবলুস কাঠ ছাড়াও বালির নিজস্ব কিছু কাঠ দেখলাম। দুরকম জবা কাঠ (Hibiscus) দেখলাম—একটি লালচে রং এর, অন্যটি সাদা ও কালোয় দুরঙা। আর একরকম কাঠ আছে—Crocodile wood—কুমিরের চামড়ার মত বাইরেটা কালো ও উঁচুউঁচু খড়খড়ে; ভিতরটা কুমিরের পেটের মতো সাদা। এসব বিভিন্ন কাঠ দিয়ে কী সুন্দর সব মূর্তি তৈরি করেছে। আসবাবপত্রেও সূক্ষ্ম নকশার কাজ।

ধাতু, কাঠ, সুতো, পাথর—সব উপাদানেই এদের হস্তশিল্পের উৎকর্ষ দেখে মনে প্রশ্ন জাগছিল যে ধর্ম-সংস্কৃতির পাশে পাশে ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রভাবও কী এই দেশে বিস্তৃত হয়েছিল? না কি এগুলি যবদ্বীপের একান্ত নিজস্ব?

জাভা আগ্নেয়গিরির দেশ। 'কিন্তামণি' বলে একটি জায়গায় জোড়া আগ্নেয়গিরি দেখলাম খুব কাছ থেকে। এই আগ্নেয়গিরিগুলি কিন্তু সবই জীবন্ত। শুনলাম পর্যটকের দল খুব ভোরে পাহাড়-চড়াই শুরু করে, ক্রেটারের মুখে পৌঁছে, ক্রেটারের তাপে ডিমসেদ্ধ করে প্রাতরাশ করে। আমাদের অবশ্য সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য হয়নি।

বালিতে একটা নাচের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। সেটি মূলত নৃত্যাভিনয়। শুভ ও অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্বের একটি কাহিনি নৃত্যাভিনীত হল, মঞ্চের তিনদিকে গোল করে গ্যালারির মতো দর্শকের আসন। স্টেজের একপাশে বাজনা ও বাজনদারের দল বসেছে, তাদের বাজনা অনেকটা গামেলান সংগীতের মতো। শুধু নতুন বাজনা দেখলাম, আমাদের মতো একটি ঢোল বা মাদল—যা বাদক হাত দিয়ে বাজাচ্ছে। শুরুতেই দুটি মেয়ে নাচল; তাদের তনুদেহে আঁটোসাঁটো পোষাক, মাথায় ফুলের মুকুট। স্নিগ্ধ দোলায়িত ভঙ্গিতে তাদের নাচ নয়ন ভুলানো। নাচটি হল

বাদ্যসংগীতের সঙ্গে কোনো কণ্ঠসংগীত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এদের কণ্ঠসংগীতের অভাব। এরা...যে বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল।" এদের ঢাকঢোল জাতীয় যন্ত্র বা ধাতুযন্ত্রে টানা সুর বাজানো সম্ভব নয়, দরকারও নেই। কেন-না টানা সুর দরকার গলার গানের জন্য, কিন্তু এদের দরকার নাচের তাল, কারণ "এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মিড় দেওয়া।...এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান।" নাচকে রবীন্দ্রনাথ 'দেহভঙ্গির সংগীত' বলেছিলেন, এদেশে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

শুরুর ভূমিকা-নৃত্যটির পরে আরম্ভ হল আসল নৃত্যাভিনয়। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে গীতাভিনয় আছে যাকে অপেরা বলি; আর এদের অভিনয় সবটাই নাচ-এ। কবি লিখেছিলেন—'এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালবাসার প্রকাশে, এমনকি ভাঁড়ামিতে, সমস্তই নাচ।' সেকথা যে কত সত্যি নিজের চোখে তা দেখলাম। নাটকের চরিত্ররা অনেকেই মুখোশ পড়েছিল, কেউ কেউ নানারকম জীবজন্তুর পোষাকে সেজেছিল। নারী ও বালকবেশীরা জাভানী নাচের পোষাক পরেছিল। পুরুষদের পোষাক দেখলাম খুবই অভিনব ও জবরজঙ। সকৌতুকে লক্ষ করলাম দুজন পুরুষ নিম্নাঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা-পরিকল্পিত জাতীয় পোষাক' এর মতো কাপড় পরেছে—"অর্থাৎ পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিয়াছে।" (জীবনস্মৃতি) এই নৃত্যাভিনয়ে বাদ্যসংগীতের সঙ্গত ছাড়া বালিনি ভাষায় কিছু সংলাপ ছিল, যা আমাদের দুর্বোধ্য। একটা যেমন-তেমন ইংরেজি অনুবাদ থেকে বুঝলাম কাহিনি তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব হলেও, পাত্রপাত্রীদের নাম কুন্তী, সহদেব, শিব, কালিকা প্রভৃতি।

বিশ শতকের গোড়ায় আমাদের দেশে নাচ হয়ে গিয়েছিল বাইজিদের একচেটিয়া এবং নিম্নমানের বিনোদন হিসাবে সমাজের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয়। ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা ও নৃত্যচর্চার কথা ছিল কল্পনার বাইরে। অথচ সেইসময়েই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে নৃত্য একটি শিল্পকলা যা সংগীতের মতোই হৃদয়ভাব ও আবেগপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। তাই সেযুগের তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকগোষ্ঠীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি নৃত্যশিক্ষার প্রচলন করেন।

জাভায় এসে কবি যখন দেখলেন "এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা", তখন আরও দৃঢ়ভাবে অনুভব করলেন "মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে-স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলেছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি...সেটা যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ।" অর্থাৎ সুরশিল্প ও নৃত্যশিল্প দুয়েরই জন্ম মনের আবেগে। বাঙালি যেমন যখনই আবেগ-মথিত হয়েছে তখনই তার কণ্ঠে গান জেগেছে, জাভায় তেমনই "প্রাণ যখনই কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে।"

জাভায় নাচের এই মর্যাদা দেখে, নিজের দেশের নৃত্য-বিরূপতা যেন কবিকে আরও ব্যথিত করে তোলে।—"ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন।

তিনি এদের যে বর দিয়েছিলেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি। আর আমাদের জন্যে কী কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল।"

তা ভারতীয়দের জন্য যা-ই থাক, রবীন্দ্রচিত্ত যে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে বিশেষভাবে আন্দোলিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষাদান ছাড়াও, আশ্রমের প্রতিটি উৎসবে, তাঁর গীতিনাট্য-ঋতুনাট্যগুলিতে একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল নাচ। এবার শান্তিনিকেতনে ফিরে নৃত্যপরা জাভার স্মৃতি, জাভার নৃত্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতার আবেশে রবীন্দ্রনাথ পঁচাত্তর বছর বয়সে রচনা করলেন নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'; এবং তারই পরে পরে আরও দুটি নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা'।

এই নৃত্যনাট্যগুলির কোনো পূর্বসূরি ছিল না, কোনো উত্তরসূরি আজও নেই। নাচকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই জানতেন স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের এক অনিবার্য উপায় হিসাবে; এবার জাভার নৃত্যময় জাতীয় চরিত্রের অনুপ্রাণ নয়, নাচকেই অভিনয়ের মূল বাহন করে এই রূপনাট্যগুলি তাঁর লেখনীমুখে উৎসারিত হল। তবে জাভার মতো এগুলি বাণীবিহীন সুরের সঙ্গে নাচ নয়। এই তিনটি খাঁটি নৃত্যনাট্যে সংগীতগুলি সংলাপ আর অভিনয় নৃত্যে।

বলতে দ্বিধা নেই, রবীন্দ্রনাথ জাভায় না গেলে হয়তো বাঙালি ও বাংলাসাহিত্যে এই অমূল্য রচনাগুলি থেকে বঞ্চিতই থেকে যেত। একসময় জাভা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। এখন জাভা-সংস্কৃতির কাছে বাংলা সংস্কৃতির অপরিশোধ্য ঋণ রইল এই রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলি।

আমাদের জাভাদর্শন পালা সাঙ্গ হল। অল্প ক'দিনেই এই দেশটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। বহুদিন-প্রবাসী আত্মীয় যেমন অচেনা হয়ে গিয়েও চেনা, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সমুদ্রপারের এই ভিনদেশটিও যেন তেমনই।—'মন যে বলে চিনি চিনি, কে ওরে কয় বিদেশিনি'। আরও ভালো করে, আরও বেশি করে দেখবার অপূর্ণ ইচ্ছা মনে নিয়ে দেশের দিকে মুখ ফেরালাম। থাই এয়ারওয়েজের বিমান আমাদের নিয়ে দেশের পথে রওনা হল। আকাশ থেকে সুন্দরী বালিকে বিদায় জানালাম আমরা। বললাম,—

"আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো
নূতন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।"

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ

(১৯২৫—১৯৩০)

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

প্রবীর বসু

১৯২৫ সাল আসতে না আসতেই কংগ্রেসের নরম দলের লোকেরা এই দাবি করতে আরম্ভ করে দেয় যে ১৯১৯ সালে নির্মিত ভারত সরকার আইনটি বদলে দেওয়া হোক এবং ভারতকে আগের তুলনায় বেশি অধিকার দেওয়া হোক। ওঁদের এই দাবিকে নাকচ করে ভারতের তৎকালীন সচিব লর্ড বার্কেনহেড হাউস অব লর্ডসে জুলাই ১৯২৫ সালে তাঁর দেয় ভাষণটিতে ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনটির ভূমিকার সেই সব শব্দগুলির ওপর জোর দেন যেখানে বলা হয়েছিল যে ভারত কয়েকটি সাংবিধানিক সোপান পেরিয়ে আসার পর স্বরাজ পাবে এবং শুধু মাত্র ব্রিটিশ সাংসদরাই এর নির্ধারণ করতে পারবে যে এই দিকে কবে এবং কিভাবে যাওয়া যাবে। সেখানে বার্কেনহেড এই কথাও বললেন যে,—

'আমরা অস্থির চিত্ত এবং অসহিষ্ণু লোকেদের ফন্দিবাজি থেকে নিজেদের উচ্চ কর্তব্যের পথ ছাড়ব না। গতিবৃদ্ধির দ্বার ধমকের দ্বারা খোলা যাবে না। হিংসাত্মক হামলার দ্বারা সেটা আরও কম খুলবে।'

ব্রিটিশ নেতৃত্বের এই বক্তব্যগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা যে কোনও রকমে ভারতকে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়ে রাখবে। ব্রিটিশ শাসন থাকতে ভারতের কখনও স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটবে না। ইতিমধ্যে দেখা গেল ব্রিটিশ শাসকেরা ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী গড়ে ওঠা বিধানসভাগুলির জারি করা মন্তব্য ও রায়গুলিকেও সম্মান করে না। ব্রিটিশ রাজস্ব পুঁজির স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সব কিছুকে নাকচ করে। ভারত সরকার তার মর্জিমাফিক নিয়মকানুন তৈরি করতে থাকে, অন্যদিকে ভারত ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল রাজা-রাজড়াদের নানানভাবে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও চালিয়ে যায়।

'চেম্বার অফ প্রিংসেজ'-এর অনুরোধে ১৯২২ সালে বিধানসভায় বিদ্রোহ করানোর প্রচেষ্টা থেকে দিশি রাজা-মহারাজাদের রক্ষা কবচের জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই বিলটিতে এমন ব্যবস্থা ছিল যে যারা ভারতে দিশি রাজা-রাজড়াদের অবস্থার বিষয়ে অসন্তোষ জাহির করবেন কিংবা সেখানকার প্রশাসনের আলোচনা করবেন, তাঁদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে। বলাবাহুল্য বিধানসভায় এই প্রতিক্রিয়াশীল বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবুও কিন্তু ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনটির অন্তর্গত প্রাপ্ত অসাধারণ ক্ষমতার সাহায্য নিয়ে ভাইসরয় তাকে আইনের স্বরূপ প্রদান করে দেন। ১৯২৩ সালে নুনের ওপর কর বসানোর ব্যাপারেও তাই হয়। ১৯২৩-২৪ সালের বাজেটটি যখন বিধানসভায় প্রস্তুত করা হয় তখন বহুমতের দ্বারা নুনের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাবটি বাতিল করা হয়। কিন্তু

নিজের অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা ভাইসরয় নুনের ওপর করটি বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করে দেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিধানপরিষদগুলির (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) প্রতিও সেখানকার গভর্নরেরা একই পথ বেছে নেন। এইভাবে সাধারণ মানুষের ওপর দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতীয় বিধানসভা এবং বাংলার বিধানপরিষদের রায়কে উপেক্ষার দ্বারা ব্রিটিশ শাসকেরা বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে দমন করার জন্য অসাধারণ পদক্ষেপ করে। ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার পর বাংলায় গরম আন্দোলনের জোর দেখা যায়। আসলে বাংলার কিছু মানুষ গান্ধি ও কংগ্রেসের তৎকালীন নীতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। তাঁদের মনে হয়েছিল কংগ্রেস ও গান্ধির নীতির দ্বারা স্বরাজ প্রাপ্তির উদ্দেশে ব্রিটিশ শাসককে বাধ্য করা যাবে না। ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর ভাইসরয় লর্ড রীডিং একটি নির্দেশ জারি করেন। সেই নির্দেশে বাংলার সমস্ত আধিকারিদের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে সাধারণ আইনি কাজকর্ম না করেও তাঁরা যে কোনও দেশভক্তকে দণ্ডিত করতে পারেন। এই নির্দেশের দ্বারাই বাংলার রাষ্ট্রবাদী বিপ্লবীরাই শুধু নয়, সুভাষচন্দ্র বোস এর মতন কংগ্রেসের নেতাকেও গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় এবং তিনি বার্মার মান্দালয়ের জেলে বন্দি থাকেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে যখন এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল তখন সেই সময়ে ব্রিটেনে ম্যাকডোনাল্ড-এর নেতৃত্বে লেবার পার্টির প্রথম সরকার তৈরি হয়। এই সরকার গঠন হওয়ায় ভারতবাসিদের মনে খুশির জোয়ার জেগে উঠেছিল। তারা আশা করেছিল যে এই সরকার ভারতবাসীদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করবে কিন্তু দেখা গেল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেছিল, গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের এই সরকার তার বদল ঘটাতে প্রস্তুত নয়।

উক্ত নির্দেশের মেয়াদ ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন প্রায় একই রকম আর একটি আইন তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাই এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবিত বিল বাংলার বিধানপরিষদে প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের কাছে বিলটি পরাজিত হয়। সেখানে বিলটির পক্ষে ভোট পড়েছিল ৪১ এবং বিপক্ষে ৭২ এই সব দেখে বিধানপরিষদের মতকে নাকচ করে ভাইসরয় একটি নতুন ফরমান জারি করেন।

নিজেদের অভিজ্ঞতায় ভারতবাসীরা দেখে নিয়েছিলেন যে ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনটি তাঁদের বাস্তবে কোনও অধিকার প্রদান করে না। এছাড়া ব্রিটিশ শাসকেরা নিজেদেরই তৈরি করা বিধানপরিষদগুলির মতকেও সম্মান জানায় না। সমস্ত ক্ষমতা ভাইসরয় ও গভর্নরদের হাতেই থাকে। ভারতকে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করার কোনও অধিকার দেয় না। এইসব অভিজ্ঞতাগুলির পরিণতি হল এই যে কংগ্রেসের বড়-বড় নরমপন্থী (মডারেট) নেতাদের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁরাও এই আইনের পরিবর্তনের দাবি তুলতে লাগলেন। এর ফলে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় পুলিশি উৎপীড়ন ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে বিদেশে যাওয়ার পথে যাত্রী হিসাবে জাহাজে ছিলেন। বিভিন্ন চিঠি-পত্রের মারফত রবীন্দ্রনাথ দেশের কিছু কিছু খবর পাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে তাঁর ডায়ারি লেখার

অভ্যাস ছিল। ১৯২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি 'ক্রাকোভিয়া' নামক জাহাজটি তাঁকে নিয়ে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছোয়। ৯ ফেব্রুয়ারি লোহিত সাগর দিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি তাঁর ডায়ারির পাতায় ভারত সম্পর্কিত রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করেন। ভারতে বিশেষ করে বাংলায় এই পর্বে যে পুলিশি উৎপীড়ন ও অত্যাচার দেখা গিয়েছিল কবি তারই কারণ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন,—

...'ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে।...এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ ধনী বাংলাদেশের রক্ত নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মহামারী মরকে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশকে বুকের উপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে...কেননা, ওই ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায়নি, তার মোটা মুনাফার ওপারে বাংলাদেশ আড়ালে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখ-দুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, একথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দারোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনাফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যাণ্ড অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দারোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; সিমপ্যাথি অ্যাণ্ড রেস্‌পেক্ট হচ্ছে ধর্মতন্ত্র—মানুষের রীতি।'

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে তাঁর ডায়ারির পাতায় সে কথাগুলি নির্দ্বিধায় লিখতে পেরেছিলেন; ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে সেটা অনেকেই উপলব্ধি করলেও তার প্রকাশ তেমনভাবে ঘটেনি। বিশেষ করে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতাদের সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে। তাঁরা আইনি লড়াইয়ের পথে যাচ্ছিলেন; সেই পথটাও ভুল ছিল না কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সঠিকভাবে চিনতে তাঁদের ভুল হয়েছিল। কারণ দরকার পড়লে সব-আইনকানুনকে তাকে তুলে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। এমন ঘটনা বারেবারে ঘটছিল। অথচ কংগ্রেস এবং স্বয়ং গান্ধিজিরও বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসক দ্বারা নির্মিত আইনের আওতার মধ্যে থেকেই সেই আইনের বিরোধিতা করা যায়। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথেরও কিছুটা এমনই বিশ্বাস ছিল। শিক্ষিত-সুসভ্য ইংরাজ জাতির প্রতি কবির আস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসক ইংরাজ ও ব্রিটেনে বসবাসকারি ইংরাজ জনজাতির মধ্যে পার্থক্য কবি ভালরকম উপলব্ধি করেন। নিজের লেখায় এঁদের 'ছোট ইংরাজ' ও 'বড় ইংরাজ' বলে অবহিত করেছেন। এইভাবে শাসক ইংরেজের প্রতি ক্রমশ মোহভঙ্গ হতে থাকে। 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার না করলেও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটি কবির বুঝে উঠতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কারণ তাঁর ডায়ারির একই পাতার পরবর্তী অংশে কবি লিখছেন,—

...'যে-দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্সই মানুষের সকল চেষ্টার চূড়া দখল করে বসেছে।... সর্বভুক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসের আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।'...

এটা ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথ কোনও রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি এবং সেই কবি-হৃদয় থেকেই মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, সমবেদনা, দরদ ও সহমর্মিতার উদ্রেক হয়। এই বোধ থেকেই তিনি বিশ্বে ও নিজ দেশে ব্যাপ্ত সমগ্র ঘটনাবলির আগ্রহ অনুসন্ধানে ব্রতী হন এবং সেখানেই না থেমে তিনি নিজের সাধ্যমত প্রতিবাদও করেন। দেশে না থাকলেও ১৯২৫ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি, সে কথাগুলি তিনি লিখলেন এবং যেভাবে বিশ্লেষণ করলেন; তা বাস্তবধর্মিতায় সাধারণ মানুষের আঁতের কথা। এইরকম সৎ-সাহস এবং বিশ্লেষণধর্মীতা সেকালে কংগ্রেসের বড়ো-বড়ো নেতাদের বক্তৃতার মধ্যে দেখা যায়নি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের কিছু অংশের কাছে বিশেষ করে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বা আস্থাভাজন হতে পারেননি। কবিও কংগ্রেসের সব মতামত ও কর্মপদ্ধতি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেননি। তবুও কবির কাছে কংগ্রেসের প্রতি জরুরি কিছু প্রত্যাশা ছিল কারণ পরাধীন দেশে কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছিল। যখনই কংগ্রেস সেই প্রত্যাশার কাছাকাছি পৌঁছোনোর চেষ্টা করত, কবিও তখন খোলা মনে সব আপত্তি ও মতান্তর ঝেড়ে ফেলে কংগ্রেস সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু এমন অবস্থা খুব বেশি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বাণীকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণ রাজনৈতিক নেতারা রাষ্ট্রীয়তা ও রাষ্ট্রবাদের নিরিখে কবিকে বোঝার চেষ্টা করতেন। কবির আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শকে তাঁরা অসময়োচিত বলে মনে করতেন। অথচ এই আন্তর্জাতিক ভাবনায় কবি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে মগ্ন। শুধু সেটা তাত্ত্বিক চিন্তাধারার স্তরেই ছিল না, কবি তাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার প্রমাণ পরাধীন ভারতে শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যতিক্রমী পথে ও পদ্ধতিতে বিশ্বভারতীর মতন উদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম।

তবুও কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে কবির মনের দূরত্ব ছিল অনতিক্রমণীয়। কবি সেটা জানতেন এবং জানতেন বলেই কবির মনে একটা ক্ষোভ বা অভিমান ছিল। এসব সত্ত্বেও কংগ্রেস তার সংগঠনে কবির খ্যাতিকে নানান পর্যায়ে নানান ভাবে ব্যবহার করেছিল। কবি তাতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু কবির মনের বেদনার তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি। কবির এই বেদনার বহিঃপ্রকাশ তাঁর দেশবাসীর কাছে তেমনভাবে ঘটেনি কারণ কবি ধরেই নিয়েছিলেন যে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর মতামত দেশবাসীর কাছে স্বীকার্য হবে না। অতঃপর সেই বেদনারই প্রকাশ ঘটল ১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রমাঁ রলাঁকে লেখা তাঁর চিঠিতে। কবি চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—

...'আমি ভগ্ন ও নিঃশেষ হয়ে ফিরেছি। আমি ফিরেছি সেই দেশে যে-দেশ মেতে আছে অনেক কিছু নিয়ে, যে-দেশের অন্তত আমার সম্পর্কে বা আমার আদর্শ সম্পর্কে ভাবার স্বাধীনতা নেই।

আমি অনুভব করি এখানে, অন্তত এই মুহূর্তে, আমি প্রয়োজনীয় নই। আমার ভয় হয়, আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শকে অসময়োচিত বলে অধিকন্তু, এক কাব্যিক বিলাস—যাতে গা ঢেলে দেবার ঝুঁকি আমাদের যুগ নিতে পারে না ব'লে, আমার দেশের লোক না ভাবতে শুরু করে।

কিন্তু আমি একই সময়ে অনুভব করি যে, আমার জন্যে এক দেশ আছে, আমার জন্যে এক বন্ধু আছেন, আর আছেন আমার আদর্শের জন্যে আমার সহযোগীরা, আছেন সহায়করা। তাঁদের সবাইকে আমি আবিষ্কার করি আপনার মাধ্যমে, আপনার গভীর বন্ধুত্বের মাধ্যমে একজনের মধ্যে। এই আবিষ্কার আমাকে শক্তি দেয়, বিশ্বাস এনে দেয়। এবং আমার জীবনের সন্ধ্যার এই ভাঁটার মুহূর্তে এনে দেয় সর্বশেষ আনন্দ।'

কবির উক্ত চিঠিতে আক্ষেপ ধ্বনিত হলেও তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। ওই বিশ্বাসটুকু সম্বল করে কবি তাঁর জীবন, সমাজ ও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ইতিবাচক পদক্ষেপ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক কিছু ঘটনা মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার প্রসঙ্গে প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে।

রাষ্ট্রীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের আর এক রূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে দেখা দেয়। ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত, এই ছয় বছরে বড়ো-বড়ো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। যার নিয়ন্ত্রণ গান্ধিজি বা কংগ্রেসের হাতের বাইরে ছিল। আসলে সারা দেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনগুলি যখন প্রভাবশালী অবস্থান নিচ্ছিল ব্রিটিশ শাসকেরা তখনই হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে তুলে দুটি জাতিকে পরস্পর লড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারের সামনে তাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যায়। তবে ১৯২২ পরবর্তী সময়ে যেই গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস গণআন্দোলন বন্ধ করে দেয়, তখনই তারা কলুষিত কাজগুলি করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ায় বিপ্লবী শক্তিগুলির ভেতরে যে হতাশা অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, সাম্রাজ্যবাদীরা চাতুর্যের সঙ্গে নিজেদের দালালদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার দিকে তারই গতিমুখ বদলে দেয়। আমরা এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছিলেন,—

'এটা হতে পারে যে এক মহৎ আন্দোলনকে এইভাবে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় দেশে দুঃখজনক ঘটনাগুলি ঘটে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে এখানে-ওখানে কখনও-কখনও ব্যর্থ হিংসার দিকে প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু এই অবদমিত হিংসার জন্য বহির্গমনের কোনও পথের প্রয়োজন ছিল, এবং আগামী বছরগুলিতে এটাই খুব সম্ভব সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বৃদ্ধি করে।'...

তবে এখানে নেহরুর মন্তব্য মেনে নিলে একথা বলতে হয় যে বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যবহৃত হিংসাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎস। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচিত হলে দেখা যাবে যে যেখানে যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থাকুক না কেন; সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান ছিল না। তবে সাম্প্রদায়িকতার একটা উৎস কোথাও ছিল নিশ্চয়ই। বাইরের কোনও শক্তির প্ররোচনায় যদি দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের অন্তরে আমরা কোনও কারণে এই বীজ নিহিত ছিল যা উপযুক্ত পরিবেশে বৃক্ষের রূপ ধারণ করে ডালপালা মেলে

ধরেছে। এই বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতামত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরে আসব। আপাতত এটাই মনে হতে পারে যে নেহরুর মতন কংগ্রেস নেতৃত্ব সমস্যাটিকে তখন উপরিস্তর থেকে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল ভিন্ন।

যাহোক ১৯২৩ সালে অমৃতসর, মুলতান, মেরঠ, মোরাদাবাদ, রায়বেরেলী, সহারনপুরের মতন শহরগুলিতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। ১৯২৪ সালে দিল্লি, কোহাট, গুলবার্গ, জব্বলপুর, নাগপুর, লাহোর, লখনউ ও এলাহাবাদে দাঙ্গা হয়। ১৯২৫ সালে দিল্লী, কলকাতা, এলাহাবাদ ও লাহোরে ব্যাপক দাঙ্গা হয়। ব্রিটিশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী এপ্রিল১৯২৬ থেকে মার্চ ১৯২৭ পর্যন্ত ভারতে ৪০টি বড় রকম দাঙ্গা হয়েছিল যাতে ১৯৭ জন নিহত এবং ১৫৯৮ জন আহত হয়। এর মধ্যে কলকাতার দাঙ্গা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল যাতে ৪৪ জন নিহত এবং ৫৮৪ জন আহত হয়। পরিমিত ও সংখ্যার দিক থেকে এত দাঙ্গা দেশের ইতিহাসে কখনও হয়নি।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে যখন রাষ্ট্রীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার সারা দেশে উঠে আসছিল, ঠিক সেই সময়েই কিছু ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনও চালিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে একটি ছিল 'তবলীগ' অর্থাৎ অমুসলমানদের মুসলমানে পরিবর্তিত করার আন্দোলন এবং অন্যদিকে দ্বিতীয়টি হল আর্যসমাজের 'শুদ্ধি' আন্দোলন অর্থাৎ আগে যেসব হিন্দু মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের 'শুদ্ধ' করে পুনরায় হিন্দু করার আন্দোলন। ব্রিটিশ শাসকেরা দুটি আন্দোলনকেই জেনেশুনে প্রশ্রয় দিতে থাকে এবং ধর্ম পরিবর্তনের খবর ছেপে মিডিয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাব উসকে দিতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জোয়ার বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি, কিন্তু আন্দোলন যেই স্তিমিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে বিভেদকামী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়।

১৯২৫ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই আবহে মুসলিম লিগ-এর মোকাবিলায় হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা'র জন্ম হয়। ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠক একথা শুনে খুব আশ্চর্য হবেন যে হিন্দুদের এই সাম্প্রদায়িক গরম দলের রাষ্ট্রবাদী নেতা হিসাবে দেখা গিয়েছিল অতীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাঁর নাম বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের নামের সঙ্গে নেওয়া হত। সেই পর্বকে বাল, পাল, লালের সময় বলা হত। এই লালা লাজপত রায়ই ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা এবং অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। আসলে ধর্ম-প্রাণ বিষয়গুলিতে রাষ্ট্রবাদীদের সঙ্কীর্ণতার এটাই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভা ক্রমশ মুসলমান ও হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার নামে পরস্পর দোষারোপে পরিস্থিতিকে জটিল ও বিষাক্ত করে তোলে। মুসলিম লিগ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে হিন্দুদের চিহ্নিত করত এবং হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় শত্রু মুসলমানদের বলত। আর এই দুটি দলই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিজের বন্ধু মনে করত।

মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশন ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অধিবেশনের সময়টি তারা বেছে নিয়েছিল যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ডাকা হয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের সমান্তরাল সংগঠনটিকে মুসলিম জনমানসে প্রভাবশালী

করে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্থান হিসাবে কলকাতাকে নির্বাচন করার পেছনে সম্ভবত মুসলিম জনবহুল রাজনৈতিক সচেতন শহরে বিভেদের বীজ বপন করা। এর আগে যেহেতু এই শহরেও কয়েকটি ছোটো-বড়ো দাঙ্গা সংগঠিত হয়ে যায় তাই তারা এই জমিকে দাঙ্গার পক্ষে আরও উর্বর করে তুলতে উঠে পড়ে লেগে যায়। পরবর্তীকালে দেখা যাবে এই শহরে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কীভাবে দাঙ্গার নরমেধ যজ্ঞের বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার এই অধিবেশনে মুসলিম লিগের সভাপতি আব্দুর্রহিম ঘোষণা করেন যে ভারতে হিন্দুদের আক্রামক নীতির জন্যই মুসলমানদের জন্য মুসলিম লিগের প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে মুসলমানদের হিন্দুদের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে কখনও যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের নির্বাচন ক্ষেত্র আলাদা হওয়া উচিত। ব্রিটিশ শাসকদের প্রশংসা করে ওই মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাটি সেদিন বলেছিলেন যে ভারতের উন্নয়নের জন্য ব্রিটেনের সাহায্য একান্তই দরকার।

অন্যদিকে হিন্দু মহাসভারও এই ব্যাপারে একই সুর ছিল। ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে তাদেরও অধিবেশন কলকাতায় হয়। আসলে হিন্দু মহাসভার দেখাদেখি মুসলিম লিগ তাদের অধিবেশন কলকাতায় করে। হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তাদের উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছিল যে তারা হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করতে চায়, যাদের জোর করে মুসলমান করা হয়েছে তাদের পুনরায় হিন্দু করা, হিন্দুদের ধার্মিক উৎসবগুলি পালন করা ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে আপাতত কারুর কোনও আপত্তি না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য অধিবেশনে যে প্রস্তাবগুলি পাস করা হয়; তার রিপোর্ট পেয়ে মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ব্যাপারটি শুধু এইখানেই থেমে থাকেনি। হিন্দু মহাসভার আর এক নেতা লালা হরদয়াল লাহোরের একটি পত্রিকা 'প্রতাপ'-এ জঙ্গি হিন্দু ধর্মের যে কাজকর্মের বিবরণ দেন, সেখানে লেখা হয়েছিল,—

'আমি ঘোষণা করছি যে ভারতে ও পাঞ্জাবে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ চারটি স্তম্ভের ওপর টিকে আছে,—

(১) হিন্দু সমাজ (২) হিন্দুদের সর্বোচ্চতা (৩) মুসলমানদের হিন্দু তৈরি করা (৪) আফগানিস্তান ও সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসা এবং সেখানকার লোকেদের হিন্দু তৈরি করা। যতক্ষণ ও যতদিন পর্যন্ত হিন্দু রাষ্ট্র এই চারটি কাজকে করে উঠতে না পারছে; ততক্ষণ ও ততদিন পর্যন্ত আমাদের ছেলে-মেয়ে ও নাতি-পুতিদের সুরক্ষার ওপর বিপদ ঘনিয়ে থাকবে এবং হিন্দু জাতির শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।'

মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার নেতাদের এইরকম বক্তব্যে ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তার অনুমান খুব সহজেই করে নেওয়া যায়। এই সব নেতারা নিজেদের বিবৃতির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে দুর্বল করে তুলছিলেন যার সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল এবং একই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার শত্রু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করছিলেন।

দেশের এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব চুপ করে বসে থাকেনি। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধি। তাঁর চেষ্টায় আন্তরিকতার

কোনও অভাব ছিল না। রাষ্ট্রবাদী ভাবনার হিন্দু-মুসলিম অন্যান্য নেতারাও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে অনেক শুভবোধ সম্পন্ন সাধারণ মানুষও নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে এবং কোথাও-কোথাও প্রাণ বিসর্জন দিয়েও দাঙ্গায় মানুষের সুরক্ষা প্রদান করছিলেন ও দেশের ঐক্য বজায় রাখার উৎকৃষ্ট মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন। এঁরা বেশিরভাগই রাজনীতির লোক ছিলেন না।

গান্ধিজি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে দিল্লিতে ২১ দিনের উপবাস রাখেন। তিনি নিজেকেই এই বিভেদকামী উন্মাদনা ও হত্যা প্রবৃত্তির জন্য দায়ী এবং অভিযুক্ত করেন। গান্ধিজি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে উপবাসের মাধ্যমে 'নিজের পাপ'-এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন। এইভাবে চিত্তের বিশুদ্ধতাসাধন ও স্বেচ্ছায় গৃহীত শাস্তির দ্বারা মানুষের মনের ভাবাবেগকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন তিনি। এর সুদূরপ্রসারী লাভ না হলেও তাৎক্ষণিক লাভ একটা হল। দূরগামী ফলাফল পেতে হলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের কারণ ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গান্ধিজি সেদিকে গেলেন না। অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় একটা চটজলদি সমাধানের পথ নিজের মতন করে বেছে নিলেন। এরই ফলস্বরূপ দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষায় একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত তৈরি করা হয় যার সদস্যরা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি, হাকিম আজমল খাঁ, লালা লাজপত রায়, কে এক নারীম্যান, ডাঃ এ কে দত্ত ও সুন্দর সিংহ। গান্ধিজি ছিলেন এই পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সংযোজক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই আগুন অন্তত কিছু সময়ের জন্য নিভে আসে যখন দেশে বিপ্লবী শক্তিগুলি এগিয়ে এসে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে মোকাবিলায় নেমে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেক আগে থেকেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে নিজ মত ব্যক্ত করে আসছিলেন। তাঁর মত ছিল কংগ্রেস বা গান্ধিজির থেকে ভিন্ন।

১৯২৩ সালের ১৯ আগস্ট 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুর কাছে দেওয়া কবির সাক্ষাৎকারে কবির মনোভাব কিছুটা বোঝা যায়। সাক্ষাৎকার মূলক বক্তব্যটি ৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবির বক্তব্য,—

...'আজ দেশের সর্বত্রই সব চেয়ে প্রবলভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যা। তাঁর মনে হয় যে আজো পর্যন্ত নেতারা কার্যোপযোগী কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প কেবল বিলাস-স্বপ্নই থেকে যাবে। কারু কারু মনে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এমন একটা অস্পষ্টভাব রয়েছে, যাতে করে তাঁরা বলতে পারেন যে, বিদেশি প্রভুত্ব লোপ পেলেই মিলন সম্ভবপর হবে। কবির তেমন বিশ্বাস নেই। তিনি বললেন ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংঘবদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক মুসলমান কেন ধর্ম সম্পর্কীয় আভিজাত্য গর্বিত শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্বল।'...

কবি বললেন যে মোপলা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এত দুর্বল, এমনই অসহায় ভাবে মুসলমানের দয়ার উপর সে বেঁচে আছে।

'আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে মালাবারে ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার দরুনই তা আর সম্ভবপর হবে না।'...

আমরা পূর্বে দেখেছি যে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধিজির আবেদনে সমস্ত হিন্দুদের সমর্থন চাওয়া হয়েছিল। এর পেছনে তখন যুক্তি ছিল যে ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। হিন্দুরা সমর্থন জানালেও সেই ঐক্য ধোপে টেকেনি। উল্টে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে দেখা করতে আসার সুযোগে এক গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমান আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করে হত্যা করে। শ্রদ্ধানন্দ তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এর ঠিক একদিন আগে তিনি কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে বার্তা পাঠিয়েছিলেন,—

'ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর নির্ভর করে।'

কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে শ্রদ্ধানন্দ সম্বন্ধে শোকপ্রস্তাব গান্ধিজি করেছিলেন এবং এর সমর্থন মুহম্মদ আলী করেন।

গান্ধিজি যতই উপবাস রাখুন এবং নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করুন না কেন দাঙ্গায় হত্যার এই ঘটনাক্রম চলতেই থাকে। তবে উক্ত দৃষ্টান্তে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে হিন্দু মুসলিম; সকলেই ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ঘোর অন্ধকারময় মার-কাটারি পরিবেশেও কিছু শুভবোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন বলেই সাম্প্রদায়িকতাজনিত দাঙ্গাকে তখনকার মতন রোধ করা গিয়েছিল।

১৯২৩ সালের ১৯ অগাষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনা এই বিষয়ে উজাড় করে দিয়েছিলেন একটি সাক্ষাৎকারে,—

'এ সমস্যার সমাধান হবে না।...অমিলের প্রধান একটা কারণ পরম্পরা বর্তমান। বাইরের প্রলেপে কিছুই হবে না আর এতদিন পর্যন্ত কেবল আমরা তাই-ই করে আসছি। এই সমস্যা মানব মনকে এমন করেই গুলিয়ে দেয় যে, সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, হাত পা ছেড়ে দেবার ভাবই প্রবল হয়ে ওঠে।'

কবি তারপর হয়তো কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছিলেন,—

'আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তা হলেই সম্ভব নয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে ওঠে।'

কবি জানতেন বাস্তবে সেটা কখনওই সম্ভব নয়। তাই তিনি মোক্ষম কথাটি কিছুক্ষণ পরে বললেন,—

'একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোনো ভাবে যা যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।

ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু'সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা এক সঙ্গে কাজ করিতে পারি। হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনীতিক অনুষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলি ক্রমশ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে যা আর কোন মতে সম্ভবপর হবে না।

পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে এইভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।'

পল্লী-সংগঠন গড়ে তোলা এবং পল্লী সংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলে এসেছেন কিন্তু তখনকার কংগ্রেসী নেতারা কবির এই বক্তব্যকে কোনও গুরুত্ব দেননি। তাঁদের মনে হয়েছিল যে এই কাজ সময়োচিত নয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর নিজেদের দেশের সরকার হলে এই সব কাজ আপনা-আপনি হবে। তাঁরা ইংরেজ তাড়ানোকেই প্রাথমিকতা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজের মাধ্যমে যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে—একথা সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-চেতনায় এসেছিল।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় পল্লীসমাজ কি করে গড়া যেতে পারে, এবং সেইভাবে হিন্দু-মুসলমানের বাস্তবিক ঐক্য কি করে সম্ভব; সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ১৯২৩ সালে ২২ সেপ্টেম্বর কবি তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন,—

...'এ দেশটা বাস্তবিক হিন্দু-মুসলান, কারুর নয়। কারণ হিন্দু বা মুসলমান কেউ আমরা এদেশের জন্য বিশেষ কিছু করিনি। শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সবারই প্রেরণা আসে বিদেশীর কাছ থেকে। তারাই ব্যবসা করে, আমরা ঘাড় পেতে মেনে নিই। তাঁরা রাস্তাঘাট করে দেয়, আমরা চলি। তারা স্কুল করে দেয়, আমরা পড়ি; তাদের ম্যালেরিয়া তাড়ানোর প্রতীক্ষায় আমরা বসে থাকি। তারা যদি ভাল পানীয় জল সরবরাহ করে, আমরা পান করে বাঁচি, যদি না করে আমরা লাখে লাখে মরি।...

দেশাত্মবোধ কিসে জাগে? দেশ একটা abstract কিছু নয়। দেশের শত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর মমতা থেকেই দেশাত্মবোধ জাগে।...দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পল্লী-গঠনে মন দিতে হবে। যখন পল্লীতে-পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় এক বা দুই ততোধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে,—তখনই জানবে সত্যিকারের দেশাত্মবোধের সূচনা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষা করবার জন্য তখন হিন্দু-মুসলমান আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়বে।... মুসলমানের বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে এবং সে ডাকাত যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে কি সে মুসলমান ডাকাতের বিরুদ্ধে হাত তোলে না বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না? সেই রকম হিন্দু-মুসলমানের গড়া প্রতিষ্ঠান যদি আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণকারী যদি মুসলমানও হয় তাহলে তা রক্ষা করবার জন্য মুসলমান স্বধর্মাবলম্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ হবে না।...সারা ভারতের পল্লীতে-পল্লীতে যখন এই রকম প্রতিষ্ঠান সব গড়ে উঠবে তখন দেখবে সত্যিকার দেশাত্মবোধ জেগেছে।'...

উক্ত সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু মহাসভার সংগঠন ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। কবি সেখানে খোলাখুলি মন্তব্য করেন। কিন্তু কবি তখনও অনুমান করতে পারেননি যে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করার নামে এই সংগঠনটি কীভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠবে। আসলে লালা লাজপত রায় ও মদন মোহন মালভিয়ার মতন কংগ্রেসের নেতারা এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় সংগঠনটি কবির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। কারণ এই দুই নেতার ওপর কবির ভরসা ছিল। তাই কবি সেদিন নিঃসংশয়ে বলেছিলেন,—

...'হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সংঘবদ্ধ হতেই হবে।'

কবিকে প্রশ্ন করা হয়েছি যে হিন্দুদের এই সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসলমানরা সন্দেহের চোখে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না?

এই প্রশ্নের জবাবে কবি বলেছিলেন

...'সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনো করচে—আমরা তো কখনো বাধা দিতে দাঁড়ায়নি। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সংঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?

কিন্তু কবির মনে সংশয় ছিল। কবি জানতেন যে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হওয়ায় সবচেয়ে বড় বাধা হল তারা নিজেরাই। তিনি বলেছিলেন,—

...'হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদনীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।'

১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুর কাছে সাক্ষাৎকারে যা আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল কবি কিন্তু হিন্দু মহাসভার কিছু আলোচনাও করেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন,—

'হিন্দু-মহাসভা যদি হিন্দু-সমাজের কীটস্বরূপ, দৈহিক ও নৈতিক অস্পৃশ্যতা দূর করতে পারতেন তা হলে, মুসলমানরা চলে গেলেও কাজের মতো এক কাজ হত। কিন্তু ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এই যে হিন্দু-মহাসভা তার কিছু করতে পারলেন না। হিন্দু যেখানেই ছিল সেখানেই থাকলো এক পদও অগ্রসর হল না অথচ মুসলমানদের চটিয়ে দেওয়া হল। এখন যেখানে এক কুস্তির আখড়া হবে—মুসলমান অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলবে, ঐ দেখ হিন্দুরা আমাদের মারবার জন্য গায় জোর করছে।

হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করতে হলে তাদের মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করে গায়ে জোর করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঘরে গলদ দূর করতে পারলে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা (ফিজিক্যাল ও মরাল) দোষ আছে তা নিরাকরণ করতে পারলে হিন্দু সংঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা করলে কিছু হবে না, মুসলমান হিন্দুদের দেখা গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করতে পারে। এ রকম চেষ্টা ও বিপরীত চেষ্টা কেবল পাপের পথে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল হবে কি? শারীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জন করা দরকার সে ত চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দেশ করে তাই উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টাই হচ্ছে গোড়ার কথা।'

কবির উক্ত বয়ানে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে হিন্দু মহাসভার সংগঠনিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির যে ধারণা ছিল তা এখন কবির কাছে অসার বলেই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং তার সমাধান কবির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তাই তিনি

সাক্ষাৎকারের ওপরেই নির্ভর করে উঠতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে সাক্ষাৎকারে কথার হিসাব ঠিক লেখা হয়েছে, কিন্তু গঠনটা বদলে গিয়েছে। সেই কারণে কবি একটি প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করে বলেছেন এবং বেছে নিয়েছেন কলকাতার এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চকে যেখানে বহু মানুষের সামনে সেটি পাঠ করা যাবে। সেই সমাগমে কংগ্রেসের নাম করা নেতাদের মধ্যে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। সেদিন কবি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন,—

...'ভেদবুদ্ধিই অশান্তির কারণ, মিলনের অন্তরায়। যেখানে ভেদ সেখানেই আপদ, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ থাকে না, সেইখানেই স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়। ভেদ দূর করিয়া মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধকে সার্থক করিয়া তুলিয়া স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা—ইহাই ইতিহাসের ইঙ্গিত।... ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে কেবল মীহা সারাইবার চেষ্টা করিলেই হইবে না। বাড়ির আশে পাশের পঙ্কিল ডোবা বুজাইতে হইবে। আমরা ডোবা বুজাইব না, অথচ ম্যালেরিয়া দূর করিব, এ যেমন অসঙ্গত চেষ্টা, তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনের চারদিকের বিধিনিষেধের অষ্টবন্ধন ঠিক থাকিবে, অথচ আমরা স্বাধীন হইব—এ প্রত্যাশাও বাতুলতা। আমাদের সমাজের সর্ব অঙ্গে বোধশক্তি নাই। সমাজের কুপ্রথা আমরা মানিয়া চলি। সামাজিক ভেদবুদ্ধির ফলে আমাদের সমস্ত প্রকার দুর্দশা।...হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অতি কঠিন। বাহিরের দিক হইতে কোন কৃত্রিম পায়ে মিলন হইবে না। উভয় জাতি নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উভয়েই নিত্যসত্য ও বাহ্য আচারের খিচুড়ী পাকাইয়াছেন।...

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষের প্রতি বিরক্তির সুযোগে মিলনের চেষ্টা বিফল হইবে।... খেলাফতের ঠেকো দিয়া সন্ধির ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর হয় নাই। এ বিরোধ কেবল তৃতীয়পক্ষের চেষ্টায় ঘটে না, নিজেদের ত্রুটির চেষ্টার ফলেই ঘটে। কংগ্রেসী স্পর্শদোষ দূর করিবার চেষ্টা—ইহা বাহ্য।...

কংগ্রেসের মঞ্চ ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলা দ্বারা পলিটিক্যাল অধিকার লাভ করা যাইবে না।'

৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে কবির ভাষণে যে কথাটি পরিলক্ষিত হল সেটি এই যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি দেশের সামাজিক সমস্যা এবং তার সমাধানও সামাজিকভাবেই করতে হবে; রাজনৈতিক ভাবে নয়। এই সমস্যার সমাধান কল্পে কংগ্রেস বিশেষ করে গান্ধিজির নীতির সঙ্গে কবি একমত হতে পারেননি। তবুও তিনি চেয়েছিলেন যে দেশের নেতারা তাদের সবখানি মন দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করুক।

কিন্তু রাজনীতির গতিপথ নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক লাভের পদাঙ্কের অনুসরণ করে। এখানেই কবির পথ ভিন্ন। তিনি কোনও মতেই মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারেন না। সেই কারণেই তিনি বারংবার দেশের একমাত্র বৃহত্তর শক্তি কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার যে অনেক প্রত্যাশা কংগ্রেস থেকে। কিন্তু গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের কয়েকটি সংস্কারমূলক নীতি রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা গান্ধিজির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গান্ধিজি প্রবর্তিত নীতিগুলি মেনে নিয়ে অভ্যাসে রপ্ত হয়ে বাস্তবায়িত করছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯২৪ সালে মার্চ মাসে বিদেশ থেকে শান্তিনিকেতন এলেন তখন তিনি দেখলেন যে তাঁর আদর্শবাদ সেখানে অনেকটাই পেছনে চলে গেছে। শান্তিনিকেতনে ঘরে-ঘরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে প্রায় ৯০ খানা চরখা ও তক্‌লি চলছে। বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকেই চরখা কাটতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এ যেন রবীন্দ্র পরিসরে গান্ধিজির জয়-যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ এসে সব কিছু দেখলেন এবং শুনলেন কিন্তু নিজে কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। সেখানে চরখা কাটা সুতায় তৈরি একটি উত্তরীয় কবিকে উপহার দেওয়া হয়। কবি নীরবে সেটি গ্রহণ করেন। কারুর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কবির অভিপ্রায় ছিল না। চরখায় সুতা কেটে যে স্বরাজপ্রাপ্তি ঘটবে কিংবা দেশ স্বাধীন হবে, এমন তত্ত্বে কবি বিশ্বাসী ছিলেন না। তখন থেকেই কবি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য মতামত খোলাখুলি ভাবে সর্বসাধারণকে জানাবেন।

যাইহোক, শান্তিনিকেতনের ঘটনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই গান্ধিজি খুশি হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের ৭ মে গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জন্মোৎসবের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন,—

...'Suneeti Devi tells me she is going to Bolpur to take part in the celebration of your 64th birthday, may I add my wish and prayer to the many that will be sent up tomorrow for your health and long life?

গান্ধিজি ১৯২৫ সালের মে মাসে তাঁর চরখা ও খাদি বস্ত্রের প্রচারে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেই ভ্রমণ করছিলেন। গান্ধিজির আশঙ্কা ছিল বাংলায় এই ব্যাপারে বিরোধিতা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মনস্থিতি তিনি জানতেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যদি তিনি চরখা তকলি ও খাদির সমর্থনে মতামত আদায় করতে পারেন তাহলে গোটা বাংলায় তাঁর নীতি ও আদর্শের জয়জয়কার হবে এবং রাজনীতি সচেতন বাংলায় এটা তাঁর সবচেয়ে বড় পাওনা। তাই আরও একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিজেব মতের সমর্থনে আনবার ইচ্ছা নিয়ে তিনি নিজেই শান্তিনিকেতনে আসার অভিপ্রায় জানিয়ে খবর পাঠান। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে গান্ধিজির সঙ্গে সামনাসামনি কথাবার্তায় এই বিষয়ে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেবে তবুও তিনি সৌজন্যবশত গান্ধিজিকে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখেন।

১৯২৫ সালের ২৯ মে গান্ধিজি বোলপুর স্টেশনে রাত্রে এসে পৌছোলে রবীন্দ্রনাথের তরফে অ্যান্ড্রুজ ও অন্যান্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা সহ মোটর গাড়িতে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। গান্ধিজির সঙ্গে এসেছিলেন সস্ত্রীক সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহাদেব দেশাই, প্যারেলাল প্রভৃতিরা। গান্ধিজি শান্তিনিকেতনে এসে পৌছোলে তাঁকে একটি ফুল দিয়ে সাজানো ঘরে বসানো হয়। গান্ধিজি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁকে এমন একটি বিবাহ সংক্রান্ত নববধূর ঘরে কেন নিয়ে আসা হল? কবি হেসে উঠে বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতন আমাদের হৃদয়ের সদা তরুণী রানী, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

গান্ধিজির প্রতি কবির এই অভ্যর্থনার উল্লেখ এখানে করা হ'ল এই কথা বুঝাতে যে পরস্পরের মধ্যে যতই মতান্তর থাকুক না কেন মনান্তরের কোনও জায়গা ছিল না; উল্টে এঁরা দুজনেই পরস্পরের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯২৫ সালের ৩০ মে সকালে সর্বপ্রথম গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথের 'বড়োদাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধিজির মতাদর্শের দিক থেকে বিশেষ করে চরখা ও খাদি বস্ত্র পরিধানের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সাক্ষাৎকারে গান্ধিজি ও 'বড়োদাদা' খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। যদিও গান্ধিজির ব্যবহারে সৌজন্যতার কোনও অভাব ছিল না তবুও একথা মনে হতেই পারে তিনি যেন আটঘাট বেঁধে কবিকে তাঁর পরিবারে কোনঠাসা করে নিজের মতাদর্শের অনুকূলে মত আদায় করে নিতে এসেছিলেন। কবি সেই সময়ে তাঁর অসুস্থতা থেকে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ১৯২৫ সালের ২ জুন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে,—

...'কবি একটি বড় চেয়ারে শুইয়া শুইয়া মহাত্মার সঙ্গে কথা বলেন। উভয়ের মধ্যে প্রায় ৩ ঘন্টাকাল আলাপ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে যাইবার পূর্বে বাহিরে দণ্ডায়মান বিরাট জনতাকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী বলেন, যে তিনি নির্জনে একটু কথাবার্তা বলিতে চান কেহ যেন কোনপ্রকার গোলমাল না করেন। তিনি মাত্র শ্রীযুক্ত এন্ডরুজকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলেন। তাঁহারা এবং আশ্রমের দুই একজন লোক ছাড়া এই কথাবার্তার সময়ে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না।'

ব্যাপারটি এতটাই নির্জনতায় হয় যে গান্ধিজির ঘনিষ্ঠ মহাদেব দেশাই শান্তিনিকেতনে সঙ্গে গেলেও সাক্ষাৎকারের সময়ে তাঁকেও সেখানে থাকতে দেওয়া হয়নি। অ্যান্ড্রুজও পরবর্তী সময়ে এই প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন। তাই এই আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি।

তবে গান্ধিজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বেশ কিছু অমিল ছিল যা পরবর্তী সময়ে আরও প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধার কোনও অভাব ছিল না। এই অমিলগুলির মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তির উদ্দেশে চরখা ও খাদির ব্যবহার ছিল অন্যতম যা তখন গান্ধিজির দ্বারা প্রবর্তিত কংগ্রেসের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নীতি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। দেশে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে চরখা ও খাদির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনও আসক্তি ছিল না। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে সেদিন দুজনের নিভৃত আলোচনায় সহমতে পৌঁছোনো যায়নি। কিন্তু গান্ধিজি আশা ছাড়েননি। পরের দিন অর্থাৎ ৩১ মে গান্ধিজি ভোরে শান্তিনিকেতনের পাশেই অবস্থিত সুরুল গ্রামের কৃষিবিভাগ শ্রীনিকেতন দেখতে যান। সেখানে দ্রষ্টব্যের মধ্যে অনেক কিছুই তাঁর ভালো লাগে। এই ভালোলাগা বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সেখানকার গোপালন ব্যবস্থা। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল,—

...ঐ স্থানে গোপালনের যে ব্যবস্থা আছে তাহা দেখিয়া মহাত্মা খুব সন্তোষ লাভ করেন। মহাত্মা কর্মীদের সঙ্গে এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেন।'...

আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই দাঙ্গা বিধ্বস্ত সময়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশে হিন্দুত্বের প্রতি মোহ দেখা গিয়েছিল। গান্ধিজির নিজের আশ্রমেও গোপালনের ব্যবস্থা ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানেও গোপালনের ব্যবস্থা দেখে তিনি মনে মনে হয়তো আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে অন্তত একটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কবির মিল আছে।

সুরুল গ্রাম থেকে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন। এই দিনও তিন ঘন্টার মতন দুজনের আলোচনা হয়। আনন্দবাজারে প্রকাশিত

বিবরণ থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয়বার দুজনের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় এবং পরে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে আমেরিকা থেকে আগত কলকাতার মেথডিস্ট চার্চের বিশপ ফ্রেডরিখ বন ফিসার এর লেখা থেকে। কারণ তিনি সস্ত্রীক ৩১ মে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমতী ওয়েলথি, এইচ, ফিসার তাঁর স্মৃতি ধর্মী লেখা 'A week end with Tagore and Gandhi' তে সেই সময়কার রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজির মধ্যে মতপার্থক্য বিষয়ে লিখেছেন। আলোচনার সময়ে গান্ধিজি হরিজনদের সিঁদুরমাখানো প্রস্তরপূজার সমর্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন,—

...'That painted piece of stone is the only tangible symbol of God our half-starved brother has ever bad. How can we deny him the only link between himself and God?

এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় অথচ সাহসিক মন্তব্য ছিল,—

'No...if the idol and idolatory, if beads and painted stones are not needed by us in this room, not righteous for us, then they are not righteous for any of our people, however lowly. I'd like to sweep up every idol of every kind, brass, wood, stone and Alabaster, from every city and village—every temple and Mohulla, and make one great heap from the whole country, and sweep them into the sea and so clanse our stables!'

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজির কথোপকথনে রাজনীতি ও ধর্ম-বিশ্বাস প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় দুজনের অবস্থান ছিল একেবারে বিপরীতে। এখানে উক্ত বিবৃতি থেকে একটি ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায় যে গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস কোন পথে চলবে এবং সেখানে ধর্ম ও রাজনীতির কী সম্পর্ক থাকবে কিংবা আদৌ থাকবে কিনা? যদি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মও গাঁটছড়া বাঁধে তাহলে সেই ধর্ম বাস্তবিক, ব্যবহারিক ও যুক্তি সম্মত হবে কিনা? এবং একই সঙ্গে এই ধর্মবোধে জারিত কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব কতটা থাকবে? এছাড়া ধর্মের দ্বারা উন্মেষিত, বিশেষ করে প্রাচীন হিন্দুধর্মের ব্যবস্থা অনুযায়ী জাতপাতের প্রভাব এই আন্দোলনে জায়গা করে নেবে কিনা? কারণ এই ভাবনাগুলি রাজনীতিতে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস ও আস্থার বহিঃপ্রকাশের ওপর নির্ভর করে। গান্ধিজির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তিনি বর্ণাশ্রম ও বিভিন্ন বর্ণের কর্মবিভাগ সমর্থন করেন; অন্তত যা তাঁর রচনাবলিতে লেখা আছে। (ক্রমশঃ)

অথচ সেখানে

রমা চট্টোপাধ্যায়

মোমের আলোয় মিছিলের মুখ নত
দৃঢ় হাতে ধরা মৌন শপথ বাতি
অথচ সেখানে ছিল তারা জ্বলা রাতি
আশ্বাস ভরা ভালবাসা অবিরত।

কখন কুটিল কৃষ্ণ ধূমের শিখা
দ্রুত খুলে ধরে মৃত্যুর পরোয়ানা
তখনো স্বপ্ন জানায় ঘর ঠিকানা
জানা নেই শুধু পরাবে শেষের টিকা।

অন্ধকারে আকাশ নীরব স্তব্ধ
লজ্জায় মুখ লুকোয় সাহসী চেতনা
থেমে যায় দূরে প্রভাতী আলোর বেদনা
দুঃস্বপ্নেরা ডানা মেলে করে শব্দ।

উত্তাপ দাও

দীপঙ্কর পাল

শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড অনিবার ডাকছে।
পতঙ্গেরই মতো যেন তার
লেলিহান স্পর্শকাতরতা,
মৃত্যুন্মুখী।
আমাকেও সে সঙ্গী করতে চায়।
আমাকে বাঁচতে দাও।
শুষ্ক, শীতল, জীর্ণ এ কলেবর
প্রাণের উষ্ণ স্পর্শে আকুল
প্রজ্জ্বলিত হ'তে।

ওই শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড অবিরাম ডাকছে—
আমাকে চায় সে।
তুমি এ জীর্ণ, শীতল মাংসপিণ্ডটাকে দু'হাতে
আবদ্ধ করো, আগলে রেখে প্রাণিত করো;
আরও উত্তাপ দাও।

বসবাস

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

দু'জনের মাঝে দৃষ্টিভেদ্য কাচ
দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল হয়ে আছে
চলাকেরা অঙ্গমুদ্রা স্পষ্ট দেখা যায়
দু'পারেই কথা চলে যার যার
অন্যজন কিছুই শোনে না;
পাঁচীললগ্ন যত চলাকেরা—
ভরভরন্তি থিতুও সংসার।

এ এক অদ্ভুত থাকা—
থাকা বা না-থাকার তবে ভেদাভেদ কী।
এ প্রশ্ন বুজকুড়ি কাটে
কী এক দ্বিধায় তা দু'ঠোঁটে ভাঙি-না;
বাতাসে হলুদ রঙ—
ঝিম সন্ধে নামবে এখুনি
কী হবে নতুন করে ক্ষত করে দাগে নখ রেখে।

এটাই জীবন
দুঃখ ছেনে যে আনন্দ সর্বাঙ্গে রেখেছি
মেখে মেখে।

নদী

লিলি হালদার

সৃষ্টির নির্মেঘে বৃষ্টি।
মন্ত্রের মতো শব্দ পতন।
জলের উপর জল-স্ফুলিঙ্গ
মৃদু কম্পন...

বাহারি ডানায় মাছের পাখি
রঙিন ঠোঁটে বৃষ্টি চাটে—

রক্তমুখী সন্ধ্যা
  কৃজন বিকেল
শব্দ কবিতা হয়ে...
  প্রবল স্রোতে তীর ভাঙে।

গ্রহণ

বিক্রম ত্রিবেদী

ভুল হয়ে যায় জ্যোৎস্নার
যেন জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নার ভয়
আকাশ পেতেছে আলো
আলো আছে আলোর ধর্নায়
কে ডাকলো মুখের গলির পাশ দিয়ে
যে ডাকলো নিজের মুখোশ দেখিয়ে
বয়ে গেলো
ঝরে গেলো
পৃথিবীর নাব্য বরাভয়...

তোমার আমার মতো নয়
তোমাদের আমাদের দুরকম অন্ধকার আছে
বাকি সব উদাহরণ
দু-তীরের আঁচল দিয়ে ঢাকা...
জ্যোৎস্নারা ভয় পায়
চাঁদ নিজে গ্রহণ লাগায়।

কবিতার শিল্প

মনোজ দে নিয়োগী

এখনও খোলা নৌকাখানায় বসেনি মাঝি
এখনও শীর্ণনদীতে আসেনি ভরা কোটাল
এখন উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন এল
প্রতিশ্রুতি কে দেবে আজ ভবিষ্যতের?

উত্তরণের আধুনিকতা না উত্তর আধুনিক
ক্যামেরাম্যান তৈরি আছে নেই পরিচালক
চিত্রনাট্যের আঘ্রাণ নেবে গ্রহীতা নেই
কাঁচাফিল্মের রোল জমে থাকে পাহাড় সমান।

তবু তুমি আমি বসেছি যখন সৃষ্টি হবে
সৃষ্টি হবে বুকের মাঝে কষ্ট হবে
রসকষ সব নিংড়ে নিয়েও থাকবে কিছু
মিটবে কি তাতে আগামীকালের সব
প্রয়োজন?

নিথর

দিব্যেন্দু ঘোষাল

ঐ গোঙানিটা যেন প্রায়...দূর
কোনও দূর থেকে ভেসে আসছে
...মাঝে একাধিক অন্তরায়
নির্ঘাত...তবু সে গোঙানির
তেজ এমন, যে মেঝে কেটে
আছড়ে পড়ছে পাবলিক এরিনায়
...ছাড়ো, ছাড়ো আমায়...
নিঃশ্বাস...নিঃশ্বাস...
ভুল ভাবছি না তো? নাকি ভাবাটাই

ভুল? পরম তৃপ্তিটা কেটে
যাচ্ছে আমার যেন...
'গত' হয়ে যাওয়া ঐ গোঙানির
রেশ—
পাহাড়প্রমাণ গ্যালিভার
যেন...তাকে কি আর
আটকাতে পারে লিলিপুটের
দল!
কালো জড় কাপড়েও যেন
রক্তের দাগ উজ্জ্বল...

পাত্রী

টোকন মান্না

খুব চেনাপথ। আঁকাবাঁকা পথ। জলকাদা মৃত্তিকা পায়ে পায়ে
গাছে গাছে বয়স্ক পাখি বসে আছে। বটপাতায় শুয়োপোকা
থেকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। সামনে পুকুর
ছোটোছোটো ঘর। এইখানে রাজকুমারী আছে
পাত্রী এল মাথা নত করে। হাতে পান। পানের ভেতর আমি

পাড়ালোক দেখছে আমাকে। আমার মধ্যে শহরে গন্ধ
গন্ধ হচ্ছে কালো সু, টাই এবং চশমাতে। চশমার ভিতরে
জবুথবু ঘৃণান্ধকার মেঘ। এবার ফিরতে হবে। সেই ইটপাথরের গুহায়
তুমি ক্ষমা করো। হয়তো শুনেছে পাত্রী। তুলসীতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকল
অনেকক্ষণ। আমি ফিরে যাচ্ছি; নীলকাচে তখন তার চোখ খুশি
হয়তো আর ফিরে আসবে না গ্রাম্যঘরে। পুকুর থেকে উঠে যাচ্ছে ব্যাঙ
চট করে গাড়ি দাঁড়াল। পিছনে পাত্রী হাতে প্রণামী পত্রপাতা

ঘর

মানসকুমার চিনি

নিভৃতে রেখেছি ফুলের স্তবক
কেউ খুঁজে নেবে দহনের পলাশ
বুকে তার ছায়ামাখা দিন
রাতের খেলায় যে নীরবতা আছে
অশ্রু ভেবে অগ্নিস্তূপে ভাসিয়ে দিয়ো না—

আজ এই বাড়ির কোনো আত্মীয় নেই
সারাঘর বালুরাশি, জল নেই, তবু
অদৃশ্য ছায়ায় অন্য এক ঘর গড়ে ওঠে।

তন্দ্রা

সুশোভন রায়চৌধুরী

চোখের পাতায় তীব্র বিবাদ
ঝলসে ওঠে রাতের ঘুম
ঘুঙুর পরা অন্ধকারের
বিবোদ্গারে—পশুর লোমে।

চাণক্যপ্রেম জীবিত যখন
মানুষের খালি অট্টহাসি
চোখের কোণের জমাট রক্ত
বানভাসি আজ
রক্তস্রোতে ভাসতে এল
কোন উদাসী?

তন্দ্রা এল চোখের কোণে
আগলে রাখে নয়নমণি
লুণ্ঠিত হয় তন্দ্রা তখন
নশ্বর থাবার নেই যে গ্লানি।

এবং যদি

উৰ্বসী ভট্টাচার্য

হতাশ দুপুর
মোম নেভানোর পালা,
বাইরে প্রেমিক,
দরজা জুড়ে তালা।

পড়শি বাড়ি
পরপুরুষে মন,
দরজা ধরে উপেক্ষারা,
এই তো কিছুক্ষণ।

শেষ কালিতে
টিফিন ঘন্টা
প্রিয় বন্ধু আড়ি,
ফেরার পথেই
ভীষণ তাড়া।
অপেক্ষাতে বাড়ি।

একটা সিঁড়ি
দুটো সিঁড়ি
তিনটে সিঁড়ি, পার
রাস্তা খোঁজে
রাস্তারা সব
রাস্তা পালাবার।

ঘরের কথা

অসীম ত্রিবেদী

নাম?

দিগন্ত রায়।

বাবার নাম?

শ্রী পথিক রায়।

মা'র পরিচয়টা দাও।

মায়ের নাম পল্লবী। অবশ্য মা তো পল্লবী রায়ই লেখে।

অবশ্য...লেখে...একথার মানে?

অ্যাকচুয়ালি আমার মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

ওফ্ হো! এই সময়ের মায়েরা সব না...

না, লেখক মশাই, আমার মা ঠিক এই সময়ের মা নয়, বেশ খানিকটা আগের সময়ের মা।

তোমাদের আগের সময় মানে তো আমাদের সময়। না বাপু, আমাদের কালের মায়েরা এমন দুমদাম ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেত না। বরং ঘরগুলোকে গড়ে তুলত।

আপনি ভুল বুঝছেন। আমার মায়ের কালের আগের মায়েরা, মানে আমার ঠাম্মা-টাম্মারা যে ঘর গড়েছিল সেটা আমাদের মায়েদের পায়ের শেকল হয়ে গেসলো। আমার মা সেই শেকলটা ভেঙে বেরিয়ে যায়।

তোমাকেও ফেলে রেখে? তোমাকেও শেকল মনে হয়েছিল তোমার মায়ের?

পুরোটা নাই, শেকলের একটা গিঁট তো বটি। দা উইকেস্ট্ পয়েন্ট্ অফ্ দা চেইন্।

সফ্টেস্টও বলতে পারো। সবচেয়ে নরম, নম্র অঞ্চল হল সন্তান-স্নেহ সব মায়েদের কাছে।

কেন শুধু মায়েদের? বাবাদেরও নয় কেন?

বাবাদেরও তাই-ই, তবে মায়েদের মতো অতটা নয়।

কেন?

মায়েরা মেয়ে মানুষতো, পেটে ধরে, শরীর দেয়, দুধ-রক্ত দেয়—মানে, একটু বেশি বেশি শারীরিক আর কি। আর সন্তান হল ওই শরীরের সম্পূর্ণ কথামালা।

আ, কী বললেন লেখক মশাই। শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম।

দ্যাখো, তোমার-আমার মা তো মেয়েমানুষ বাপু। শরীরটাই সম্পদ, আবার শরীরটাই ফাঁদ—ওক। এতগুলো সেন্সপয়েন্ট্, ভাবা যায়? মেয়েদের তালুর তাপ নিয়েছ? তোমার-আমার থেকে অন্তত দু' ডিগ্রী বেশি। তা এই সম্পদের শ্রেষ্ঠ রত্নটি হল সন্তান।

আমার মা সেই অমূল্য রত্ন নিয়ে দখলদারিতো করেইনি, বরং বাবাকে হয়তো বলেছিল, এই শেষ রত্নটুকুও রেখে গেলাম। পিছু ডেকো না শ্রীযুক্ত পথিক। তখন হয়তো বাবা হতভম্বের

মতো জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাচ্ছ তুমি পন্নবী?, কেন, মায়ের উত্তর, মানুষের মিছিলে। যে মিছিলে যেতে তোমার এত আপত্তি পথিক, সেই মিছিলই আজ থেকে আমার ঠিকানা।

সত্যিসত্যিই এরকম কিছু হয়েছিল নাকি তোমার বাবাতে-মাতে?

ঠিক এইরকম নয়, প্রায় এইরকমই।

তুমি কি করে জানলে?

কেন। বাবা আমাকে বলেছে বড় হবার পর।

কবে ঘটেছিল ব্যাপারটা?

উনিশশো বিরাশি।

সে কি। সে তো আমাদের প্রতিষ্ঠার কাল। ওইকালের মায়েরা তো ঠিক এতটা একগুঁয়েমি করে—

মিছিলে যেতে চায়নি বলছেন? অযান্ত্রিক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কি ভুবনসোম নিয়ে মনকষাকষি, তর্কাতর্কি করেনি। খালি শাড়ি পড়েছে পরিপাটি? কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী বেড়াতে চেয়েছে? পর চর্চা বুঝতে চেয়েছে?

অ্যাট্ লিস্ট্ ঘরটা ভাঙতে চায়নি।

ঘরটা নরক মনে হলেও?

ইয়েস। নরকটাকে স্বর্গ তৈরি করার দায় নিতে হয়। ইয়েস।

আমরা রেগে গেলে আপ্তবাক্য আর ইংরিজি বলি না? আপনি জোরের সঙ্গে 'ইয়েস্' বলছেন, হাঃহাঃ, আমার বাবাও বলে।

চোপ। শাট আপ।

আবারও ইংরিজি।

নাহ। নাহে ছোকরা, তুমি আমাকে হাসিয়েই দিলে। তোমাকে নিয়ে চলতে দেখছি, তোমার ওপর রাগ করা যায় না। তুমি ঠিকই বলেছ, শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে অথচ আমরা এখনও রেগে গেলে ইংরিজিই বলি। যাইহোক, শোনো যুবক বন্ধু, তোমাকে আমার একটু একটু ভাল লেগে যাচ্ছে।

সহানুভূতি এসে যাচ্ছে না তো?

কেন? সহানুভূতি কেন?

না, ওই মানে, মা চলে গেছে, একা বাবার কাছে মানুষ—এমন ছেলেকে সব্বাই কেমন সহানুভূতি দেখায়।

আমার আসলে অপার কৌতূহল যে, তোমার মা নাইনটিন্ এইট্টি টুতে তোমাকে, তোমার বাবাকে ছেড়ে কেন চলে গেল।

ওই যে বললাম, মা মিছিলে যেতে চাইল।

তাতে পথিক—পথিক আপত্তি করল?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

আমিতো সেইটাই বাবাকে পরে জিগ্যেস করেছিলাম।

পরে বলতে?

বড় হয়ে, এই ধরুন, যখন আমার বয়েস উনিশ-টুনিশ।

ধুস্। আঠারো-উনিশে কেউ বড় হয় নাকি? ওটাতো তাত্ত্বিকদের হিসেব। কবি সুকান্ত'র আবেগ। কিংবা ধরো, নির্বাচন কমিশনের বড় হবার বয়েসের সীমা। আঠারো-উনিশতো একটা বিতিকিচ্ছিরি বয়েস—শরীরটা বড় হয়, মনটা নাবালক থাকে। আঠারো-উনিশ নাগাড়ে ভুল করার বয়েস। ভারি মিষ্টি বয়েস।

কী বলছেনটা কি? মশাই, কানাডার রিকি গ্যালান্টের নাম তো শুনেছেন, নাকি? তো, গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে এগারো বছর বয়েসেই ছেলেটা বুড়ো হয়ে যায়। মানে, এগারো বছর বয়েসের মধ্যেই জীবনের সব কটা পর্ব পেরিয়ে অকালবার্ধক্যে পৌঁছে যায়, মারাও যায়। এখানে তো তাত্ত্বিক, নির্বাচন কমিশন, আপনি, আপনারা সকলেই ফেল্ মেরে গেছেন, তাহলে?

দিগন্ত, রিকি গ্যালান্টের ব্যাপারটাতো একটা অসুখ।

কেন হয় এমন অসুখ? কেন হয়? এই যে, এই যে আমাদের সোনা—

সোনা কে?

স্বর্ণাক্ষর। স্বর্ণাক্ষর সরকার। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে থাকে। তো স্বর্ণাক্ষর শরীরে, মনে, দুটোতেই প্রতিবন্ধী। এখন প্রায় কুড়ি-একুশ বছর বয়েস, তো-তো করে কথা বলে, তাই-তাই-তাই হাততালি দেয়, চান্স পেলেই জিগ্যেস করে আমাকে—দিদন্ত মানে তি দিদন্ত? ওর মনের বয়েস পাঁচ কি ছয়, এটাও তো একটা অসুখ নাকি?

হ্যাঁ, অসুখই তো।

কিন্তু, কেন হয় এমন অসুখ?

দ্যাখো দিগন্ত, রিকি গ্যালান্টের হল হরমোনাল্ ডিস্অর্ডার, তোমার স্বর্ণাক্ষরের ক্ষেত্রে হয়তো রোগটা জিনেটিক ডিসঅর্ডার কিংবা জাস্ট্ একটা অ্যাকসিডেন্ট।

তার মানে, কোথাও তো নিশ্চয়ই অর্ডারের অভাব আছে। এ ধরনের ডিসঅর্ডার কেন পৃথিবীতে?

বাহ্। বিশৃঙ্খলা কেন, বেশ ভাবার মতো সওয়াল।

আমার বাবা অন্য একটা সোজাসাপটা ভারতীয় কথা বলেছিল।

কীরকম কথা?

মানে, ওই সোনা যখন ওর মায়ের পেটে ছিল তখন ওর মাতাল বাবা নাকি রাত্তিরে মাঝেমধ্যেই ওর মাকে বেধড়ক মারত। মানে ওই, পেটে ফেটে লাথি-কাথি—

সে কি!

হ্যাঁ। বাবাতো বলে, আপনাদের সময়ের ওইসব উন্মত্ত মত্ততার ফসলই হল স্বর্ণাক্ষর।

তার মানে, অসুখের দায়, বিশৃঙ্খলার দায় আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। বেশ পাকা ছেলেতো।

বয়েসতো কম হল না।

কত আর হবে তোমার?

ছাব্বিশ।

ঠিকই ধরেছি। আসলে পঁচিশ-ছাব্বিশেই প্রশ্নগুলো বেশ পোক্ত হতে শুরু করে। অ্যাকচুয়ালি, উত্তরগুলো এই প্রথম তৈরি হতে থাকে।

আমার কিন্তু উত্তর খুঁজে পাওয়াটা সহজ করে দিয়েছে তোমার বাবা, আর মা-ও।

মা-ও? মা-তো বললে বাড়িতে থাকে না।

হ্যাঁ, মামাবাড়িতে তো থাকে। আমি যাই। একটা স্কুলে তো পড়ায় আমার মা এখনও। আমি যাই। মাও আমার স্কুলে আসত, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে আসত। এখনও আসে। ন্যাশনাল্ লাইব্রেরি কিংবা রবীন্দ্রসদন। কিংবা ফোনা-ফোনি করে আমরা মা-বেটা বিকেলের নদীর কাছে দেখা করি।

বাহ্। রোমাঞ্চকর ব্যাপার কিন্তু। মা আর ছেলে ফোনে টাইম ঠিক করে নদীর কিনারে দেখা করছে। দারুণ।

আপনিতো তখন দেখলাম মেয়েদের ব্যাপারটা খুব বোঝেন। বললেন মেয়েদের শরীরের নম্রতম অঞ্চল হল সন্তান স্নেহ। তা, আপনি ছেলে সন্তানদের বোঝেন না?

কেন বুঝব না? আমিও তো ছেলে রে বাপু।

কী বোঝেন?

ছেলেরা যেহেতু সেক্সুয়ালি মেয়েদের কাছে খুব সহজে হেরো হয়ে যায়, তাই ছেলেদের মন আর সেন্সরিং সিস্টেম্টা খুবই সক্রিয়। খালি একটা জায়গায় ছেলেদের কোনও সেনসর লাগে না সেটা হল, মা।

তাহলে, মাকে ভালোবাসা, কিংবা মায়ের ভালোবাসা পাওয়াটা হল ছেলে সন্তানের মনের উগ্রতম অঞ্চল, বলুন।

নিশ্চয়ই।

এইটা আমার বাবা খুব বোঝে জানেন। আমার বাবা-মা'র মধ্যে কোন সেপারেশান্, ডিভোর্স, কোন আইন-আদালতের দরকার হয়নি। মা চলে গেছে, আর ফেরেনি। বাবা আনতে গেছিল, তা-ও আসেনি। আসলে একই অপরাধ বাবাকে বারবার করতে দেয়নি।

'মানে?

মানে, মা যদি সুড়সুড় করে ফিরেও আসত, তাহলেও কি এমন কোন গ্যারান্টি থাকত যে, বাবা একই দুর্ব্যবহার আবার, বারবার করবে না?

কি দুর্ব্যবহার?

আসলে সেইসময় মা'র মিছিলে যাওয়াটা পছন্দই করেনি আমার অধ্যাপক গবেষক বাবা। তারওপর বাবার চিরকালের গবেষণার বিষয় হল সোস্যাল সায়েন্স—সমাজে মেয়েদের স্থান, উন্নয়নে মেয়েদের তাৎপর্য ইত্যাদি ইত্যাদি। তো, সেই বাবা, আপত্তি করতেই মা ফুঁসে ওঠে। একটু আধটু বাবার গবেষণাকে ঠেস মেরে দু'চারটে চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও শুনিয়ে দেয়। ব্যস, বাবার মটকা গরম। কানপাটায় এক থাপ্পড়।

সে কি।

হ্যাঁ, তাহলে আর বলছি কি?

এসব তুমি জানলে কোত্থেকে?

কেন। বড় হবার পর বাবা-ই সমস্ত বলেছে, বলেছে, মেল্ স্যাভিনিজমের জন্যেই তোর মা ইনসাল্টেড্ হয়ে ঘর ছেড়েছে। বাবা আরও বলেছে, আমাকে না জানিয়ে তোর মা একটা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর তাতেই আমার পুরো নখ-দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল। তোর মা ফিরে না এসে ভালোই করেছে, আমাকে দ্বিতীয় কি তৃতীয় থাপ্পড়টা আর মারতে দেয়নি। আমাকেও নিজের কাছে বারবার লজ্জা পাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রে। আয়নায় নিজের কি যে প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম দিগন্ত—ওফ। ভাবা যায় না।

তোমার মা জানে, তোমার বাবা যে তোমাকে সব বলেছে, জানে?

হ্যাঁ, আমিই বলেছি।

মা বলেনি কোনো কথা? কোনোদিন?

না। এইটা খুব মজার, এই যে দুজনের দু'রকম ব্যাপার—মানে, বাবা নিজের সমস্ত অপরাধ করছে, আর অন্যদিকে মা বাবার অপরাধের কোনো আলোচনাই করছে না—এই দুটো ব্যাপারই আমার ছেলে হিসেবে গর্বের বস্তু।

তবু মা-বাবা দুজনে মিলতে পারছে না?

মেলাবই, আমি মেলাবই।

কি করে?

সুযোগ আর সময়ের অপেক্ষায় আছি।

সময়ের অপেক্ষায় থেকো না, সুযোগটাই বরং তৈরি করে নাও। সময় তোমার সাথ দেবে।

তবে যে সবাই বলে সময়ে সবই হয়? আপনি বলেন না?

হাঃ সময়। স্টিফেন হকিংয়ের সময়? কিংবা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সময়? আমি কালান্তক কাল। ইহারা কালের ক্রীড়নক মাত্র। স্পেসের কি হবে দিগন্ত, স্পেস? এই দেশের এই স্পেসে হাজার হাজার বছর ধরে দাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে, সময় পেরেছে তাকে একটুও বদলাতে?

তাহলে...কাল...?

কাল কেবল কালেরই কালান্তক। কাল মানুষ, পৃথিবী—প্রাণের অন্ত ঘটাতে অক্ষম। প্রাণ অমর।

কিন্তু এই অমরতা যেদিন ব্ল্যাক হোলে নিক্ষিপ্ত হবে, সেদিন?

সেদিন কালেরও অন্ত হবে। কেননা, মানুষ ছাড়া, প্রাণ ছাড়া কাল অর্থহীন, শূন্য।

তার মানে আইনস্টাইন যে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, আমি না থাকলেও পিথাগোরাসের থিওরেম্ সত্য, তা অর্থহীন?

আলবাত। আর সেইজন্যেই তো আমাদের কবি আইনস্টাইনকে বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের সত্যের অমরতা বিষয়ে আমি আপনার মতো অতটা ধার্মিক নই। আমি না থাকলে সত্য অর্থহীন। আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে...আমি চোখ মেললে তবে আকাশে আলো ফুটে ওঠে, নয়তো নয়।

অথচ মানুষ, দেখুন মানুষের মরণশীল। ম্যান্ ইজ্ মর্টাল্ হাঃ—হাঃ হাঃ, বাবা মজা করে বলে, মানুষ মাতাল।

মাতালই তো। ঠিক বলে তোমার বাবা। তাল হল পিথাগোরাসের থিওরেম, নিউটনের ল'। মাতাল এসে ওই তালটাকে আবিষ্কার করে, ওটাকে সত্য বলে প্রমাণ করে, তবেই ওটা সত্য হয়। এই মাতালটা না থাকলে সমস্ত তাল সত্যহীন, সৌন্দর্যহীন আর অর্থহীন।

এবং বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি—

বাহ্। তোমাকে আমার ভালো লাগছে, তোমার ভাবনাচিন্তা বেশ ভালো লাগছে দিগন্ত।

কেন?

তোমাকে তোমার বাবা-মা যে দিশা দিতে চেয়েছে, তুমি সেইটা ঠিক ঠিক খুঁজে পেতে পারছ।

কেন পারব না? বুদ্ধিমানের কাছে ইশারাই কাফি। কিন্তু, আমি আমার বাবাকে নয়, মাকে এখনো এই দিশাটা দিতে পারিনি যে, আমাদের মানে, আমাদের জেনারেশনের জন্যে ঘর, ঘর, ঘর খুব জরুরী। আমার অনেক বন্ধুবান্ধবেরই আজ কোথাও কোন ঘর নেই জানেন।

কিরকম?

আসলে মায়েতে মা নেই, বাবাতে বাবা নেই। প্রেম করার কথা ছেলের, তো তার বাবা-ই প্রেম করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না; কিংবা প্রেমে পড়ার কথা মেয়ের, মা করে যাচ্ছে চুটিয়ে প্রেম। বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়ের জায়গাটা কেড়ে নিতে চাইছে যেন জিম্, হেলথ্ ক্লাব বিউটি পার্লারের দৌলতে। ওদিকে আমার বন্ধুবান্ধবরা হোমটাস্ক আর পরীক্ষার কল্যাণে, প্রাইভেট ফার্মের বারো-চোদ্দো ঘন্টার চাকরির কল্যাণে কুঁজো, বুড়ো, বুড়ি হয়ে যাচ্ছে—অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে জানেন। ঘর কোথায়? মা-বাবা কই? সময় কোথায় হারাচ্ছে? বলুন, একটা বাবা, একটা মা আর খানিক সময় ছাড়া ঘর হয়?

কোনদিন হয় না। কোনখানে হয় না। অন্তত একটা মা ছাড়াতো হয়ই না। এক কাজ করো।

কি?

আজ থেকে বিশ-বাইশ বছর আগে তোমার মা তোমার বাবাকে একদম ঠিক ঠিক চ্যালেঞ্জ করেছিল; আর আজ তোমারও উচিত হবে মাকে চ্যালেঞ্জ করা।

চ্যালেঞ্জ মানে?

বাইরে, কি মামার বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দাও। বলো জোরের সঙ্গে যে, তোমার ঘর চাই ঘর। বলো, মা। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কের ওপর নিয়মিত বম্বার্ডমেন্ট্ হচ্ছে, এখন একখানা ঘর চাই তোমার, মাথার ওপর ছাদ চাই তোমার। বলো ঘরের কথা।

আচ্ছা, আপনি রবীন্দ্রবিরোধী নন তো?

কেন?

না, রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারবার বাইরে বেরোনোর টান।

ঠিক কোথা থেকে?

কেন। ঘর থেকে।

কখন? না, একটা পরাধীন দেশে। আর এখন? এখন তো ঘরই নেই। সবটাই বাইরের হয়ে গেছে, বাজারের হয়ে গেছে। বাজারে যা হবার তাই হচ্ছে। ঘর চাও, ঘর।

বাহ! ভাল শ্লোগান দিলেন তো! ঘর চাই, ঘর।

ইয়েস। তোমার মায়ের কাল বা রবিঠাকুরের কাল তো নেই, এখন ফিরে দাও সে গৃহ-র যুগ। চাপা জোরের সঙ্গে মা'র কাছে ঘর চাও। তোমার মা তো, নিশ্চয়ই বুঝবে।

অদ্ভুত তো!

কি?

আপনি এমন সমস্ত কথা এতক্ষণ বললেন, যেন আপনি একখানা এক্সরে মেশিন, যাতে আমার সমস্ত ভেতরটা ধরা পড়ে।

একথা কেন হঠাৎ?

আপনি যা যা পরামর্শ দিলেন, আমিতো ঠিক সেই লাইনেই ভাবছি। কি করে জানলেন আমার ভাবনার কথা?

আরে বাপু দিগন্ত, গ্রেট মেন্, থিংক্ অ্যালাইক্। তুমি এখন বলো দিকি, এই স্টেশনে, এখন এই শেষ বিকেলে কি করছ? মানে, কার অপেক্ষায়? মায়ের?

নানা, সোনা—স্বর্ণাক্ষরের কথা বললাম না তখন, তো সেই স্বর্ণাক্ষর ওর মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি গেছে। আজ দশদিন পরে ফিরবে। সোনাকে রিসিভ্ করে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। ...নেন, সোনা না থাকলে না আমাদের বাপ-বেটার সংসারটা একেবারে অন্ধ হয়ে যায়।

কেন?

আমাদের তো বাপ-বেটা আর কাজের মাসির উলঢুল সংসার। এখন আমিও বড় হয়ে গেছি। ফলে বড়দের সংসার। সেখানে রোজ তিনবেলা সোনা—একুশ বছরের শিশু সোনা এসে এমন অক্সিজেন দিয়ে যায় না! আপনাকে কি বলব। এত শুদ্ধ একটা মানুষ। এত পবিত্র আমাদের সোনা, ও হল সত্যিসত্যিই স্বর্ণাক্ষর।

ভালোবাসো ছেলেটাকে, না করুণা করো?

ওকে না ভালোবেসে কোন উপায় নেই। হাঃ হাঃ, আমার বাবাকে অব্দি এমন ধমক দেয় না, গার্জেন একেবারে।

কি বলে?

বলে, দিদন্ত মানে দানে না—পতা বাবা একতা।

ও আসলে দিগন্ত পেতে চায়।

কিন্তু পাবে না। এটা আপনাদের কালের ফসল, বুঝেছেন লেখক মশাই? তবে আমি আপনাদের গোটা কালটাকেই উল্টে দেব।

কি করছ তুমি দিগন্ত মানে, কি পড়ছ?

এখন প্রফেসরের আন্ডারে ডক্টরাল্ রিসার্চ করছি।

বিষয়?

পুতুল নাচের ইতিকথা। মাল্লাহত মানিক ব...্যোপাধ্যায়।

বাহ্। আর কি করো?

কি আর। বাবাকে চা করে দি', বাবার জুতো পালিশ করি, মোজা-গেঞ্জি কেচে দি'। সোনার গান শুনি।

কি গান গায় সোনা?

একটাই গানের একটাই লাইন গায়—পাদ্‌লা হাবা বাদলদিনে পাদল আমাল্ মন নেতে ওথে...গাইতে গাইতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। যেন শিশুটার ভেতরকার একুশ বছরের যৌবনটা ওর ভেতরে কোথাও কেঁদে ওঠে, নেচে ওঠে না...আরে। শুনছেন। আপনি আমাকে ছেড়ে; জংশন স্টেশনটা ফেলে রেখে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন কেন, ও লেখক মশাই?

একি। আমার সামনের পৃথিবীটা আদিগন্ত সাদা হয়ে গেল যে। সাদা, খুব সাদা, দুধসাদা, কাগজের পৃষ্ঠার পৃথিবীতে আমি যেন দাঁড়িয়ে। খালি দাঁড়িয়েই আছি। তাহলে আমার পেছনের ওইগুলো সব কি? কাগজের পাতার ওপর ওই যে রাশি রাশি সরণি, গলি, ঘুঁজি, প্যারাগ্রাফের পাড়া, শহর, জংশন স্টেশন—এই এত কিছু পেরিয়ে পেরিয়ে আমি কি আসছি তবে?

বড্ড একা লাগছে, শুনছেন, আমার ভয় করছে।

একি। ঘচাং করে বাক্যটা কেটে দিল। ভাগ্যিস দু'পা লাফিয়ে পিছিয়ে এলাম। শুনুন না, আমার সত্যিই ভয়—

আবার ঘচাং করে বাক্যটা কাটা হল, আবারও পেছনে লাফিয়ে নিজেকে বাঁচালাম।

শুনুন। আমাকে ভয় দেখাবেন না।

বাহ্, সাদা পাতায় এইতো পাঁচ কদম এগোলাম। শুনুন, মেলাবই, আমি মেলাবই।

আরে না। তিন-পা এগোলাম ফের।

আমার ঘর চাই ঘর।

চার কদম পথ পেলাম। আমি মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি...পাঁচ কদম এগোচ্ছি...স্বর্ণাক্ষরের জন্যে অপেক্ষা করছি...চার কদম পথ আবার...

রবিবাবুর বন্ধু

বাণীব্রত চক্রবর্তী

"তুমি ওঁর 'লাইট অফ লন্ডন' পড়েছ!" প্রশ্ন করে রবিবাবু একদৃষ্টে তাপসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে ওই ভদ্রমহিলার লেখা একটা বই পড়েছে। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

রবিবাবু বোধহয় খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যত হচ্ছিলেন। তাপস তাঁকে নিরস্ত করে বলল, "আবছা আবছা মনে পড়ছে। গ্রিনরুম না ডার্করুম ওই ধরনের কোনও নাম।" রবিবাবু বললেন, "ডার্করুম।" তাপস মাথা ঝাঁকায়, "হ্যাঁ।" রবিবাবু বললেন, "আমার আশি। তোমার বড়জোর পঞ্চাশ একান্ন। এর মধ্যে ভুলে যাচ্ছ!" তাপস গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের লাইব্রেরিয়ান। পঁচিশ বছর ধরে কত বই ঘাঁটছে। পড়ছেও। এত মনে থাকে নাকি। ইদানীং ডিটেকটিভ বই পড়ার নেশা হয়েছে।

রবিবাবু এখন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে চোখ বন্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মল্লিক। বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। তাপস সিটি কলেজে পড়েছে। স্কুল ছিল মেট্রোপলিটন। স্কুলে পড়ার সময় রবিবাবুর কাছে প্রাইভেটে ইংরেজি পড়ত। সেই সুবাদে মাস্টারমশাই।

গণেশ চা নিয়ে এল। রবিবাবু চোখ খুললেন, "সিগারেট দাও।" তাপস চেয়ার ছেড়ে উঠে ওঁর কাছে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে প্যাকেট ও দেশলাই ইজি চেয়ারের পাশে উঁচু টুলটায় রাখল। রবিবাবুর মুখে সিগারেট। হাত বাড়িয়ে ওই টুল থেকে চায়ের কাপ তুলে নিচ্ছেন। তাপস স্মোক করে না। এখানে এলে স্যারের জন্য সিগারেট নিয়ে আসে। সিগারেট নামিয়ে উনি চায়ে চুমুক দিলেন।

তাপস চেয়ারে এসে বসেছে। সেন্টার টেবিলে তার চায়ের কাপ। কাপ হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিল। এখন কাপ নামিয়ে সিগারেটে টান দিয়ে রবিবাবু বললেন, "উনি আমাদের দিদির বন্ধু ছিলেন। আমারই বয়সি। দিদি আর আমি যমজ। উনি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন।" অ্যাশট্রে বাঁ পাশে। ছাই ঝেড়ে আবার চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। বয়সোচিত কম্পনে হাতের সঙ্গে চায়ের কাপও কাঁপে। তবে চুমুক দিয়ে যথাস্থানে কাপটি রাখেন। তাপস উদ্গত জিজ্ঞাসা চেপে রাখতে পারে না, "মানে আপনাদের গড়পাড়ের বাড়িতে?" উনি মাথা নাড়েন, "হ্যাঁ। তা হঠাৎ শুনি কি একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে লন্ডনে চলে গেছেন। বছর পাঁচেক বাদে লন্ডনের মার্কার অ্যান্ড মার্কার বুক কোম্পানি থেকে ওঁর 'লাইট অফ লন্ডন' বেরল। বইটা নিয়ে দ্য স্টেটস্‌ম্যান রীতিমতো একটা আর্টিকেল লিখে ফেলল। তখন কি জানি নেমেসিস ছদ্মনামের আড়ালে দিদির সেই বান্ধবী!"

চায়ে চুমুক দিয়ে তাপস জিজ্ঞেস করল, "ওঁর আসল নামটা কী!" রবিবাবু বললেন, "সেটা তোমায় খুঁজে বার করতে হবে। একটু আগে তো বললে উনি নাকি বরানগরে থাকেন। তাঁর নামটা শোনোনি!"

তাপস বলল, "না স্যার। শুনিনি। রমেন সাহাকে মনে আছে। আমরা একসঙ্গে আপনার কাছে প্রাইভেট পড়তাম। আপনি তখন কোন্নগরের স্কুলে পড়াতেন।"

রবিবাবুর সিগারেট-চা শেষ। কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "রমেন। পি কে দে সরকারের গ্রামারের আদ্দেকটা যে ছেলেটা মুখস্থ করে রেখেছিল। সেই রমেন।" তাপস বলল, "হ্যাঁ। রমেনই বলল বরানগরে তার কারখানার পাশের গলিতে এক বৃদ্ধা থাকেন। উনি নাকি বহুদিন বিলেতে ছিলেন। একসময় ইংরেজিতে নভেল লিখতেন।"

রবিবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "পি কে দে সরকার মুখস্থ করে কারখানা। নিজের।" তাপস বলল, "নিজের।" রবিবাবু রমেনের ধারণাকে খণ্ডন করতে চাইলেন, "মোটেই বহুকাল বিলেতে ছিলেন না। বিলেতে থাকতে থাকতে ওই দু'টো ফিকশন লেখেন।" আবার সিগারেট ধরালেন।

তাপস জিজ্ঞেস করল, "উনি বাংলায় কিছু লেখেননি।" রবিবাবু বললেন, "জানি না।" তাপসের চা খাওয়া শেষ। এবার উঠবে। তাকে উসখুস করতে দেখে বললেন, "ছটফট করছ কেন। বোসো। কথা বলার কেউ নেই। তুমি এলে ভালো লাগে। গণেশ মিষ্টি আনতে গেছে। আর এক দফা চা খাওয়া হবে।"

তারও শেষ বয়স কি এইরকম হবে। মা যতদিন ছিলেন বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন। এখন তাড়া দেওয়ার কেউ নেই। বয়স গড়িয়ে গড়িয়ে বাহান্ন।

রবিবাবু যেন স্মৃতির ভেতর সাঁতার কাটছেন। তাপসকে শোনাচ্ছেন, "সুন্দরী ছিলেন। গলার স্বর ভারী মিষ্টি। ক্লাসে ফার্স্ট হতেন। এক অদ্ভুত সারল্য ছিল।" থামলেন। তাপসের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "তুমি আবার অন্য কিছু ভেবে বোসো না। সমবয়সি হলেও দিদির বন্ধু। দিদি তো আমারও বন্ধু ছিলেন। যমজ ভাইবোনের মধ্যে মনের মিল একটু বেশিই থাকে।"

রবিবাবু কিন্তু কিছুতেই ভদ্রমহিলার নামটা বলছেন না। ওঁর মুখ ফসকেও বেরোবে না। তাপস জানে। তাকে বসে থাকতে হবে। গণেশ মিষ্টি আনবে। চা করবে। আর রবিবাবু ধীরে ধীরে বিলেত ফেরত মহিলাটির কথা বলে যাবেন। অনর্গল।

॥ দুই ॥

ওই ভদ্রমহিলার ব্যাপারে তাপসকে উৎসাহিত করেছেন স্বয়ং রবিবাবু। ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে তাপসের মন ইদানীং অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে। অল্পেই ইন্ধন জোগাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ মল্লিক। তাপসের মাস্টারমশাই। রবিবাবু। তাপস যেন সত্যান্বেষণের দায়টা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।

দিন পনেরো আগে এইরকম এক রবিবারের বিকেলে পদ্মপুকুরের সি আই টি বিল্ডিংয়ে রবিবাবুর ফ্ল্যাটে এসেছিল। রবিবাবুদের গড়পাড়ের পৈতৃক বাড়ি কবে বিক্রি হয়ে গেছে। এখন ওখানে ফ্ল্যাট বাড়ি। স্যারের পারিবারিক কথা সে বিশেষ কিছুই জানে না। কীভাবে ক্রিস্টোফার রোডে সি আই টি বিল্ডিংয়ে চলে এলেন তাও তাপস জানে না। বছর দশেক আগে কলিগ সনাতন একদিন বলল, "আপনি কি রবীন্দ্রনাথ মল্লিকের ছাত্র ছিলেন।" তাপস বলল, "কোন রবীন্দ্রনাথ মল্লিক।" সনাতন বলল, "বঙ্গবাসীতে ওঁর কাছে পড়েছি। উনি একসময় কোন্নগরের স্কুলে পড়াতেন।" তাপস বলল, "হ্যাঁ। এবার মনে পড়ছে। গড়পাড়ে থাকেন তো।" সনাতন বলল, "না। না। থাকেন সি আই টি বিল্ডিংয়ে। ক্রিস্টোফার রোডে। পদ্মপুকুরের কাছে। ফোন নাম্বার দিচ্ছি। আপনার কথা খুব বলছিলেন।"

সেই থেকে রবিবাবুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ। দিন পনেরো আগে কথায় কথায় রবিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "নেমেসিসের কোনও লেখা পড়েছ?" নামটা খুব চেনা চেনা লাগছিল। তাপস বলেছিল, "মনে হচ্ছে পড়েছি। ইংরেজি নভেল তো।" রবিবাবু বললেন, "হ্যাঁ। বিলেতে বসে লিখেছেন। বিলেতে বই ছাপা হয়েছে। অথচ লেখিকা খাঁটি বাঙালি। এই কলকাতার মেয়ে।" তাপস অবাক, "তাই নাকি!" উনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ। যতদূর মনে হয় এখনও বেঁচে আছেন। হয়তো কলকাতাতেই আছেন। পারবে তাঁকে খুঁজে বার করতে।" তাপস জিজ্ঞেস করল, "চিনতেন নাকি তাঁকে।" রবিবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, "এই প্রসঙ্গ আজ থাক। অন্য একদিন হবে।"

তারপর আজ এল। মিষ্টি খেতে হল। রবিবাবুর খাওয়া বারণ। তবু একটা খেলেন। অথচ তাপসেরই মিষ্টি আনার কথা। পুজোর পরে এল। স্যারের মিষ্টি খাওয়া বারণ বলেই তো আনেনি। সিগারেট এনেছে। বয়স আশি। স্মোকিং করা ঠিক নয়। ছেলেমানুষের মতো তাপসের কাছে একটা স্থায়ী আবদার করেই রেখেছেন, "যখন আসবে আমার জন্যে সিগারেট আনবে।"

দ্বিতীয় দফার চায়ে চুমুক দিয়ে রবিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ডার্করুমের স্টোরিটা মনে আছে?" তাপস অকূলে পড়ে যায়। সেই কবে মান্ধাতার আমলে পড়েছিল। ততক্ষণে রবিবাবু আপন মনে বলতে শুরু করে দিয়েছেন। তাপসকেই শোনাচ্ছেন, "একদিন আমাকে পাকড়াও করে সিমলেতে ভূপেন দত্তের কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাপারে তখন তেমন মোহ ছিল না। অনেক করে স্বামী বিবেকানন্দের কনট্রিবিউশন রিঅ্যালাইজ করতে পেরেছি। বরং ভূপেন দত্ত, এম এন রায় আমাকে বেশি টানত। ভূপেন দত্তের Dialecting of Land Economics of India পড়ে আমরা অভিভূত। সম্ভবত সেটা উনিশশো পঞ্চান্ন। ভূপেনবাবুর বয়স তখন পঁচাত্তর।" তাপস বলল, "তারপর।" রবিবাবু বললেন, "তারপর আবার কী। ভূপেনবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা হল। ভূপেন দত্ত সম্পর্কে কিছু জানো কী।" তাপস মাথা নাড়ে, "বিশেষ কিছু জানি না।" রবিবাবু বললেন, "এত বড় মাপের মানুষ। তার স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই। জানা উচিত ছিল।" তাপস চুপ করে থাকে। সেটাই বিধেয়। তবে স্যারের দিদির বান্ধবীর কথা জানতে গেলে ভূপেন দত্তকে কেন জানতে হবে বুঝতে পারে না। ততক্ষণে রবিবাবু কথা শুরু করেছেন। মাস্টারমশাই ছাত্রকে বলছেন, "বিপ্লবীদের 'সাপ্তাহিক যুগান্তরে'র সম্পাদক হন। তার আগে অরবিন্দ, নিবেদিতার সাহচর্যে আসেন। ১৯৩৯ সালে ভারতের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ভূপেনবাবু যুক্ত হন। এক সময় তিনি সোভিয়েত নেতা লেনিনের কাছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণা পত্র দেন। অদ্ভুত জীবন তাঁর। এসব তো জানতে হবে। ওঁর Dialectics of Hindu Ritualism বইটিও অপূর্ব। দিদির বান্ধবীর লেখায় ভূপেন দত্তের চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে।"

তাপস বলল, "এবার ডার্করুম নভেলটা আবছা আবছা ভাবে মনে পড়ছে। ভদ্রমহিলা মানে লেখিকা কমিউনিজমে আস্থা রাখতেন। নিত্যগোপাল, গোলাম মহম্মদ এই দু'টো ক্যারেক্টার ছিল। এছাড়া ভায়োলেট বলে এক বিদেশিনি। কি স্যার, ঠিক বলিনি!"

রবিবাবুর এলিয়ে পড়া ভাবটা কেটেছে। চেয়ার থেকে উঠে খাটের ওপর বসেছেন। তাঁর নিষ্প্রভ চোখে আলো, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। তবে তুমি লাইট অফ লন্ডন বইটা কোথাও পাও কিনা দেখো।" তাপস বলল, "আপনার কাছে নেই।" জোরে মাথা নাড়লেন, "না। না। আমার কাছে নেই।" তাপসের মনে হল ওঁর কাছে আছে। বইটা হাতছাড়া করতে চাইছেন না। বললেন, "তুমি লাইব্রেরিয়ান। খোঁজ করো। পেয়ে যাবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিশ্চয়ই আছে।" তাপস মাথা নাড়ল, "তা ঠিক। আচ্ছা উনি তো কমিউনিস্ট। এইরকম একটা ছদ্মনাম নিলেন কেন? আসলে ভাগ্যকে ব্যঙ্গ করার জন্যই মনে হয়।" রবিবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

।। তিন ।।

সি আই টি বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে তাপস এক বিশেষ ধরনের উত্তেজনা বোধ করে। গোয়েন্দাদের মতো ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বার করতেই হবে। রমেন নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে। রমেন থাকে কাছেই। ক্রিক রো। চারদিকে প্রগাঢ় সন্ধে। মোবাইল বার করে রমেনকে ফোন করল। রমেন বলল, "চলে আয়। অনেকদিন জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হয়নি।"

আড্ডা শুরু হল ছেলেবেলার গল্প দিয়ে। তাপস কিন্তু এখুনি রবিবাবুর কথা রমেনকে বলবে না। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে তোর কারখানার পাশের গলিতে সেই ভদ্রমহিলার কাছে আমাকে একদিন নিয়ে যেতে পারবি।" রমেন বলল, "কোন ভদ্রমহিলা বলতো।" তাপস বলল, "সেই ভদ্রমহিলা যিনি অনেকদিন বিলেতে ছিলেন। একসময় ইংরেজিতে নভেল লিখতেন।" রমেন বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। তিনি তোর চেনা।" তাপস বলল, "না। না। ওঁর বই পড়েছি। একটু আলাপ করতে চাই।" রমেন বলল, "তাহলে তোকে উইক ডে দেখে আসতে হবে। আমার অফিসে শ্যামল বলে একটা ছেলে আছে। বেশ চটপটে। ও তোকে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু রবিবাবু ছাড়া তোর কি সুবিধে হবে। রবিবার আবার কারখানা বন্ধ।" তাপস বলল, "তাতে কোনও অসুবিধে নেই। হাফডে নিয়ে নেব।" রমেন বলল, "বেশ। তবে কাল আয়। কখন আসবি।" তাপস বলল, "চৌরঙ্গি থেকে বরানগর। বিকেল পাঁচটা হবে।" কাল সোমবার।

রমেনের কারখানায় টিনের কৌটো তৈরি হয়। তাপস এখানে এই প্রথম এল। রমেন খুব সমাদর করে তার অফিস ঘরে নিয়ে গেল। একটু পরে চা আর কাটলেট এল। তাপস বলল, "এসব কেন?" রমেন বলল, "অফিস থেকে আসছিস। তাই।" খেতে খেতে তাপস ঠিক করে নিল রমেনকে নিয়েই ভদ্রমহিলার কাছে যাবে। দু'জনেই তো রবিবাবুর ছাত্র। ভদ্রমহিলা ওদের পরিচয় পেলে খুশি হবেন। তাহলে তো রমেনকে গোড়া থেকে সব ব্যাপারটা বলতে হয়। বলল। রমেন রাজি হয়ে গেল।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। গলিতে আলো কম। সঙ্গে শ্যামল এসেছে। সে বাড়িটা চেনে। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে শ্যামল চলে গেল। দোতলা বাড়ি। সদর দরজা বন্ধ। বাড়িতে কেউ নেই নাকি। কলিংবেলের ব্যবস্থা নেই। ওরা কড়া নাড়বে কিনা ভাবছিল। বাড়ির গায়ে একটা

পান সিগারেটের দোকান। ওদের দেখে দোকানদার বলল, "কড়া নাড়ুন।" তাপস কড়া নাড়ল। কোনও সাড়া শব্দ নেই।

রমেন বলল, "সব জানলাগুলোও তো বন্ধ। নিশ্চয়ই বাড়িতে কেউ নেই।" তাপস বলল, "তাহলে বাড়ির সদর দরজায় তালা দেওয়া থাকত।" দোকানদার বলল, "বাড়িতে লোক আছে। আর একবার কড়া নাড়ুন।" এবার রমেন কড়া নাড়ল। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। গায়ের ছিটের জামা। দরজা খুলে লোকটা বলল, "কাকে চাই?" নেমেসিসের আসল নাম তো ওরা জানে না। এদিকে রবিবাবু মুখ ফসকে একবারও ভদ্রমহিলার নাম বলেননি। তাপস বলল, "বড়দির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" লোকটা বলল, "বড়দি বাড়িতে নেই।" ওদের সামনে আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তাপস এবার দোকানদারের দিকে তাকাল। দোকানদার বলল, "আপনারা মেমদিদিমার খোঁজে এসেছেন।" তাপস বলল, "মেম দিদিমা মানে? উনি তো বাঙালি।" দোকানদার দাঁত বার করে হাসে, "দেখতে যে মেমের মতো। শুনেছি বিলেতেও ছিলেন। উনি তো অসুস্থ। মেডিকেলে গিয়ে খোঁজ করুন।"

হাঁটতে হাঁটতে কারখানায় ফিরে যেতে যেতে রমেন বলল, "তোর ছুটিটা নষ্ট হল।" তাপস বলল, "নষ্ট তো হয়নি। বাড়িটা তো চিনে নিলাম।" রমেন বলল, "ইনিই কি স্যারের সেই বন্ধু। মানে স্যারের দিদির বন্ধু।" তাপস কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "মনে তো হয়। মেডিকেলে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। ভাবছি কাল যাব।" রমেন বলল, "আবার হাফ ডে।" তাপস অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "দেখি।"

কারখানায় ফিরে এসে আবার ওরা অফিস ঘরে বসল। রমেন শ্যামলকে ডেকে বলল, "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। ওই বাড়িতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে মেডিকেলে আছেন। কোন ওয়ার্ড কত নম্বর বেড এই খবরটা চাই।" শ্যামল বলল, "ঠিক আছে জোগাড় করে দেব। কবে চাই বলুন।" রমেন তাপসকে দেখিয়ে বলল, "ইনি ঘন্টাখানেক আছেন। তার মধ্যে পারবে কি?" শ্যামল বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে আপনি একবার জাফরুলকে বলে দিন।" এখানকার ইনচার্জ জাফরুল। শ্যামল তাকে সঙ্গে নিয়ে এল। রমেন বলল, "শ্যামলকে কিছুক্ষণের জন্য একটা কাজে বাইরে পাঠাচ্ছি। ওই সময়টুকু ম্যানেজ করে নিয়ো।"

।। চার ।।

শ্যামল ফিরল মিনিট কুড়ি পরে। বলল, "আপনাদের আর মেডিকেলে যেতে হবে না।" তাপসের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। ভদ্রমহিলা মারা গেলেন নাকি। সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর মুখটা মনে পড়ল। স্যার অপেক্ষা করছেন। তাপসকে দায়িত্ব দিয়েছেন নেমেসিসকে খুঁজে বার করতে হবে। তাপস ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কেন?" "উনি তো সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।" তাপসের বুক থেকে পাষাণ ভার নামল। বলল, "সুস্থ মানুষকে নিয়ে ফিরলে অ্যাম্বুলেন্স বোধহয় সাইরেন বাজায় না।"

পরের দিন তাপস অফিস গেল না। বিকেলে বরানগরে যাবে। রমেনের ইচ্ছে ছিল তাপসের সঙ্গে যাওয়ার। কিন্তু আজ সকালে ব্যাবসা সংক্রান্ত কাজে দুর্গাপুর চলে যাচ্ছে। ফিরবে কাল। তাপস আর দেরি করতে চাইছে না। রমেন বলেছে, "ফিরে এসে সব শুনব। একদিন আমাকে রবিবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাবি। তাঁর কাছে গিয়ে স্বীকার করব পি কে দে সরকারের গ্রামারের সিকি ভাগও মনে নেই।"

সকাল দশটা নাগাদ রবিবাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হল। গণেশ অবাক হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন রবিবাবু, "তুমি!" আজ কিসের ছুটি!" ঘরে ঢুকেই চোখে পড়েছে স্যারের খাটের ওপর পড়ে আছে লাইট অফ লন্ডন বইটা। উনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজটা দিয়ে বইটা ঢেকে ফেললেন।

চেয়ারে বসে তাপস বলল, "ছুটি নিলাম। আপনার জন্যে এক প্যাকেট দামি সিগারেট এনেছি।" সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই নিয়ে রবিবাবু বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো!" এখুনি গণেশ চা নিয়ে আসবে। তাপস বলল, "স্যার, এখনও আপনি ডিটেকটিভ বই পড়েন!" রবিবাবু নতুন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "না। না। ওইসব ছেলেমানুষি নেশা আর নেই।" গণেশ চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে তাপস বলল, "বছর খানেক হল খুব ডিকেটটিভ বই পড়ছি।" রবিবাবু বললেন, "এটা ঠিক করছ না। কত ভালো ভালো বই আছে সেগুলো পড়ো।" তাপস বলল, "ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমার এক বন্ধু আছে। হিরন্ময়। ও নিশ্চয়ই লাইট অফ লন্ডন জোগাড় করতে পারবে।" তাপস লক্ষ করল স্যার একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যাচ্ছেন। নিজের ওপর রাগ হল। বলল, "স্যার, নেমেসিসকে খুঁজে পেয়েছি।"

রবিবাবু চমকে উঠলেন। চোখে ফুটে উঠল আলো, "সত্যিই তাঁকে খুঁজে পেয়েছ। কোথায় পেলে তাঁকে। ওই বরানগরে।" তাপস একবার ভাবল গতকালের কথাটা বলবে। কিন্তু বলল না। বলল অন্য কথা, "জানেন স্যার, ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে মনের ভেতরটা অনুসন্ধিৎসু হয়ে থাকে। তাই তো পারলাম স্যার ওঁকে খুঁজে বার করতে।"

রবিবাবু বললেন, "তোমাকে উনি কী বললেন?" তাপস বলল, "ওঁর বাড়িটা খুঁজে পেয়েছি। এখনও ওঁকে দেখিনি কিংবা ওঁর আসল নামটাও জানতে পারিনি।" রবিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে ছাত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ভুল করেও ভদ্রমহিলার আসল নামটা বললেন না।

চা শেষ করে তাপস উঠল। রবিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কবে ওঁর কাছে যাবে। ছুটি যখন নিয়েছ মনে হচ্ছে আজই যাবে।" রবিবাবু আবার প্রণাম নেন না। আর তাপসও সহজে মাথা হেঁটে করতে শেখেনি। তাপস বলল, "সেরকমই তো ইচ্ছে।"

সন্ধেবেলায় সেই বাড়িটার সামনে এসে দেখল সদর দরজা খোলা। রকের ওপর সেই লোকটা বসে আছে। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। গায়ে ছিটের জামা। গলিটা আবছা অন্ধকার। বাড়ি থেকে একটা দাড়িওয়ালা ছেলে বেরিয়ে তাপসকে দেখে থমকে দাঁড়াল, "আপনি?" তাপস ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল। বছর তিরিশ বয়স। মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ছেলেটা বলল, "আমার নাম বীতশোক। আর্ট কলেজে পড়তাম। আপনি কি দিদিমার সঙ্গে দেখা

করতে এসেছেন?" তাপস বলল, "দিদিমা?" বীতশোক বলল, "আমার মায়ের মাসি নিয়তি দেবী। উনি অবশ্য বিয়েটিয়ে করেননি। এটা আমাদের বাড়ি। উনি এখানেই থাকেন।" তাপস বলল, "নিয়তি দেবী। এই জন্যেই ছদ্মনাম নেমেসিস।" বীতশোক অবাক, "সব জানেন দেখছি। কই, আপনাকে তো কোনওদিন দিদিমার কাছে আসতে দেখিনি।" তাপস বলল, "ওঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে পাঠালেন।" বীতশোক বলল, "ম্যালেরিয়া হয়েছিল। কাল হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন। খুব দুর্বল।" তাপস বলল, "বেশিকথা বলব না। ওঁকে একবার দেখব আর আমার মাস্টার মশাইয়ের কথাটা ওঁকে বলব।" বীতশোক একটু অবাক হল, "আপনার মাস্টার মশাই!" তাপস মুচকি হাসল, "উনি ওঁর পরিচিত।" বীতশোক বলল, 'আসুন।" উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি। তাপস বীতশোকের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

চুরিদারি

বিপ্লব চক্রবর্তী

যেখানেই হোক না কেন নামতে হবেই, চলার ধর্মটাই থামার শর্তে শুরু হয়। একটু পেঁচিয়ে ভাবলে খাল বিল পুকুর থেকে ওই অতবড় আকাশটা জল নিচ্ছে। যেমন নিচ্ছে আবার বৃষ্টি হয়ে নাবিয়ে নিচ্ছে। নাবার সময়টা ঋতুচক্র মানতে হবে। অর্থাৎ সঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে নামতে হবে। ব্যতিক্রম হলেই অঘটন। আমরা সার্কাসের দলে লোহার খাঁচাতে সেঁটে বাঘের খেলা দেখাই। হঁম হঁম হালুম হালুম ডাক ছাড়ি। হিংস্র গর্জন করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি লোহার খাঁচাটাকে ভালোবেসে। একটু অন্যরকম ভালোবাসার টানে কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম,—দই-এর বাজার যাব। কোন্ বাস ধরব বলুন না?

ভদ্রলোক হাততুলে বললেন,—ওই দেখুন মাধবপুর যাবার বাস ছাড়ছে। ওই বাসই দই-এর বাজারে যাবে।

যাওয়ার চলনটা আমার একইরকম হয়ে রইল। ভাবা মানেই মনস্থির করে বেড়িয়ে পড়া। সুচিত্রা আমাকে বলেছিল দেখা হলে সবাই বলে যাব। আসতে কেউই যায় না।

সুচিত্রার অভিমান ভরা কথাটা আমাকে ভাবিয়ে ছিল। নদে জেলায় সুচিত্রার গানের শ্রোতা অনেক। মহানন্দির বাউল ফকির সম্মেলনে বড় বড় বাউল ফকির গায়করা গেরুয়া গুধড়ি চড়িয়ে গুপীযন্ত্র খমক একতারা নিয়ে প্রস্তুত গান গাইতে। বড়োদের ভিড় এড়িয়ে কিছুটা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সুচিত্রা দাসি। কৃষ্ণকায় শীর্ণকায়া। সস্তাদামের সিন্থেটিক শাড়ি পড়েছে। সম্মেলনে এসেছে গান শুনতে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। লোকমুখে শুনেছিলাম সুচিত্রা নতুন গোঁসাই নিয়েছেন। কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। গান পাগলদের অনুরোধে উদ্যোক্তারা বাধ্য হল ঘোষণা করতে; সুচিত্রা দাসি এই মঞ্চে গাইবেন। আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন।

এইসব ডামাডোলের মধ্যে সুচিত্রা আমাকে ইশারা করে কাছে ডাকল। ভালো লাগল। সুচিত্রা আমাকে মনে রেখেছে। কাছে গেলাম। কৃষ্ণকায় সাবলীল স্বচ্ছতোয়া ধারায় ওর মুখমণ্ডল স্ফীত হয়ে উঠল। সামনে যেতেই জিজ্ঞেস করল—

—এখনও চিনতে পারেননি?

ওর কথায় লজ্জা পেলাম, অনেকদিন থেকেই আমি সুচিত্রাকে খুঁজছিলাম। কতজনকে যে জিজ্ঞেস করেছি। এক একজন এক এক রকম বলেছে। সুচিত্রাকে সামনে পেয়ে অবচেতনে সেই কথাগুলোই ভাবছিলাম। ফলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম।

বললাম,—ভগবান সামনে এসে দাঁড়ালে যতটা আনন্দিত হতাম। তার চাইতেও হাজারগুন আনন্দিত হয়েছি তোমাকে সামনে দেখে। এতটাই আনন্দিত যে ভাবা হারিয়ে যাচ্ছে।

সুচিত্রা চিরপরিচিত হাসিটা দিয়ে বলল,—মনে রং ধরাতে পেরেছি বলেন।

হেসে বললাম,—বাকি হয়েই ছিল, বৈশাখের রোদ মেরে রংটা একেবারে পাকা করে দিয়েছ।

সুচিত্রা আমার কথার খেই ধরে বলল,—সুচিত্রা দাস জাদু জানে তাহলে।

আমি সুচিত্রার কথাটাকে হৃদয়ের সঙ্গে ছুঁইয়ে নিয়ে বললাম,—কথার হেঁয়ালিতে তোমার সঙ্গে পারব না। এর আগে তোমার সঙ্গে আড্ডা মেরে অনেক কথা লিখে রেখেছিলাম। তোমার মতো আমার সেই খাতাটাও হারিয়ে ফেলেছি। কাজের কথাটা হোল, তোমার বলা কিছু কথা আমি মগজে ধরে রেখেছি। ওটা আমার কাছে সারাজীবন থাকবে কিন্তু গভীর গভীরতম সুচিত্রাকে আমি খাতার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছি। আর একটা সুযোগ দিতে হবে আড্ডা দেবার।

সুচিত্রা আমার হাতদুটো মুঠোর মধ্যে চেপে নিয়ে বলল,—একদিন আড্ডা মেরেছি তাতেই মগজে ধরে রেখেছেন। সাংঘাতিক মানুষতো আপনি। কি জানতে চান বলুন? অপ্রস্তুত হয়েও সামলে নিয়ে বললাম,—আগে গান শুনি। গানের সুর আর কথায় সেই সুচিত্রাকে খুঁজে পেলে মনের মানুষের টানে ঠিক তোমার কাছে পৌঁছে যাব। এমন গুন করেছ তুমি তিন বছর ধরে খুঁজছি।

সুচিত্রা দুষ্টুমি করে বলল,—আপনি খুঁজছেন না আপনার মন খুঁজছে। আমি বললাম,—দুজনই। এক পাড়াতেই তো দুজন থাকি।

মনে মনে মনোহর গোঁসাইকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলি থেকে কাটোয়ার অজয় আর গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত কানু ছাড়া অন্য কোনো গীত হয় না। এই অঞ্চলটা অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এখানেই মিলেমিশে থাকে বাউল ফকির বৈষ্ণবরা। তিনজন তিনমতের হলেও তিনমতের মিলের দিকটাও অনেকটা। মনোহর গোঁসাই সেটাই বলেছিলেন দোলকুঞ্জের আশ্রমে বসে। কৃষ্ণনগর থেকে কিছুটা পশ্চিমে হেঁটে গেলে মনোহর গোঁসাই-এর আশ্রম। হাবগেরস্থ মানুষ। ভাগবত পাঠ, কথকথা, কয়েকজন মন্ত্রশিষ্য, এই নিয়েই গোঁসাই-এর রাজ্যপাট। সুচিত্রাকে খুঁজতে খুঁজতে মনোহর গোঁসাইকে খুঁজে পেয়েছিলাম চলার পথে। সুচিত্রা আমাকে আসতে বলেছিল। কোনো ঠিকানা দেয়নি। বলা ভালো কোথাও যেতে হলে যে ঠিকানা দরকার সেটাও আমার মাথায় আসেনি। কৃষ্ণনগর যাবার পথে মনোহর গোঁসাই-এর সাক্ষাৎ পেতেই জানতে পারলাম সুচিত্রা দাসি মনোহর গোঁসাই-এর সঙ্গ করছে কথকতা শেখার জন্য। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বৈষ্ণব বাউল ফকিরি চর্চা কোনো কোনো জায়গায় একইরকম মনে হয় কেন বলুন তো?

মনোহর গোঁসাই প্রশ্ন শুনে হেসে বলেছিল,—গুরুকৃপা না হলে এসব গুহ্যকথার উত্তর দেওয়া যায় না। আমি প্রথম জীবনে বাউল চর্চা করেছি। ফকিরের সঙ্গও করেছি। পারানিতে এসে ভেক ধরে বৈষ্ণব হয়েছি। যেটুকু বুঝেছি সেটুকুই বলছি।

আমি কৌতূহল নিয়ে বললুম বলুন

মনোহর গোঁসাই ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে বললেন,—বাউল সাধনায় খানিকটা বাহ্য খানিকটা গোপন। ফকিরদেরও তাই, খানিকটা জাহির খানিকটা বাতুন। বৈষ্ণবদের পুরোটাই বাহ্য। রসগ্রহণ রাধাশক্তির জাগরণ। এই রাধা শক্তি হল সৃষ্টির কারণ। যেখানে সৃষ্টির

সম্ভাবনা সেখানেই বিনাশ। এই জন্যই শান্তিপুরের বেশ্যাদের হাতজোড় করে বাসে বসে নমস্কার করেছিলাম। রাধাশক্তির বিস্তার কার মধ্যে কীভাবে স্বয়ং মহাপ্রভুই জানেন। আমি ভক্ত মানুষ।

সাধনতত্ত্বের যে পথেই যাই না কেন ঘুরে ফিরে এক জায়গায় এসে যতি চিহ্ন দিতেই হবে। মনোহর গোঁসাই-এর সঙ্গে যতি চিহ্ন পড়েছিল বাসের মধ্যে।

সিটটা গোঁসাই-এর পাশেই ছিল। রানাঘাট ছাড়িয়ে শান্তিপুরে বাসটা ঢুকতেই বাবাজি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

কোথায় নামবেন?

বললাম—কৃষ্ণনগর?

তারপর বললেন—ওখানেই থাকেন বুঝি।

—না না। আসলে কৃষ্ণনগরটা আমার ভালো লাগে। কলকাতা থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসা যায়।

গোঁসাই একেবারে নাছোড়বান্দা, সব কিছু নিখুঁত ভাবে জানাতে হবে। আমার গুরুত্বহীন কথোপকথনে নিজেকে এতটুকু না শুধরে জিজ্ঞেস করলেন,

—প্রায়ই আসেন বুঝি কৃষ্ণনগরে

মাথা নাড়লাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন,—

এখানে এলে হোটেলে থাকেন?

এবার ডান কাঁধটা বেঁকিয়ে আমার পাশের সিটে বসা গোঁসাইকে একবার ভালো করে দেখে নিলাম। সাদা ধুতি, হাতকাটা ফতুয়া গলায় তুলসী আর কম দামি স্ফটিকের মালায় মধ্যযাম্ রসকলিটা হেমন্তের প্রাক দুপুরের জানলায় ছিটকে আসা সূর্যের আলোর চক্চক্ করছে। কাঁধের উত্তরীয় দিয়ে মাথাটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে। পেছনে শিখা আছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। গোঁসাইকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—

—গৌড়ীয় বৈষ্ণব না নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের আপনি? গোঁসাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন বুঝতে পারলাম না। মিষ্টি হাসিতে গোঁসাই-এর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন এক অমোঘ সান্ধ্যভাষা,

—এ পথে চলন আছে বুঝি আপনার?

এতক্ষণ মন বাঁধার কোনো জায়গা পাচ্ছিলাম না। গোঁসাই-এর কথায় কীভাবে যেন অবচেতনে খোরাক পেয়ে গেলাম। প্রশ্নের উত্তরটাও বেশ ঘুরিয়ে দিলাম,—চলনের মালিক তো আমি নই গোঁসাই। একমাত্র মালিকই জানে কোথায় চলেছি। হৃদবৃন্দাবনের পথে তার পদরজধুলি খুঁজে চলেছি। স্পর্শ পাবার জন্য। ঘাটে অঘাটে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। কোনো পথই আমার কাছে পরিষ্কার নয়, কী উত্তর দিই বলুনতো বাবাজি। গোঁসাই-এর নির্মল হাসিটা উধাও হয়ে গেল। সপ্রতিভ মুখটার মধ্যে অদৃশ্য কেউ কালি লেপে দিল নাকি বুঝতে পারলাম না। খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এক হিসাবে ভালোই মনে হল। কথা মানেই তো লগা বাড়িয়ে মগডালের শেষ আমটা পাড়ার কসরত। কীভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে লাভলোকসানের জৌলুস

ছড়াচ্ছি তার তত্ত্বতালাশ। কে কে আছে? কী করা হয়। ব্যাবসা না চাকরি। তার চেয়ে চুপ করে থাকা ঢের ভালো। আমি গোঁসাইকে একবার আড়চোখে দেখলাম। গোঁসাই আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জানালার বাইরের দিকে চেয়ে আছে। স্থির নিশ্চিত হলাম গোঁসাই তাঁর ভাবের জগতের সঙ্গে আমাকে সম্পৃক্ত করতে চাইছেন না। আমাকে ভিন্নপথের পথিক করে দিল।

বাসটি শান্তিপুরের থানার মোড় শ্যামচাঁদের মন্দির ডানদিকে ফেলে চওড়া রাস্তায় উঠল। কিছুটা এগোতেই পতিতাপল্লী। চায়ের দোকান খাবারের দোকান রাস্তায় দেহপসারীনিরা বসে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। বড়রিপুর শক্তিশালী রিপুটি যার কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই চোখদুটো ঠেলে জানালার বাইরে নিয়ে গেল। গোঁসাই-এর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। গোঁসাইও দেখছিলেন মৃদুমন্দ হাসছিলেন। দুজনের হাসির সঙ্গে দুজনের চোখ ধরা পড়ে গেল। কথা নেই কোনো। লক্ষ করলাম বাসটা মহল্লা ছাড়তেই গোঁসাই দুই হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেন যা অস্পষ্ট। মনে মনে ভেবেছিলেন দর্শনেন্দ্রিয় যেটুকু নরক দর্শন করলেন তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। না...কি অন্য কিছু। যাই ভাবি না কেন মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। গোঁসাইকে ছাড়া যাবে না। আমার বিক্ষিপ্ত মনের সাথি করার জন্য যেচে কথা পাড়লাম।

অন্যরকম কিছু জানার ইচ্ছা প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন কি? কথাটা শুনে পূর্বের মধুময় হাসিটা মুখে ফুটে উঠল।

বললেন—চুরিদারি করা মানুষ আপনারা। অনেকগুলো থাক্। কোন থাকে কী প্রশ্ন লুকিয়ে রেখেছেন। তবে গুরুর কৃপা হলে চেষ্টা করতে পারি।

অনুমতি পেতেই জিজ্ঞেস করলাম,—বৃন্দাবনে কি বেশ্যাবৃত্তি ছিল?

গোঁসাই প্রশ্নটা শুনতে যেটুকু সময় নিলেন তারপর পুরো বাসটা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলেন। অন্যান্য যাত্রিরা চকিত হাসির শব্দে আমাদের দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন। লক্ষ করলাম গোঁসাই-এর সাথে একটা ছোটোখাটো বাহিনিও আছে। গোঁসাই হাসি থামিয়ে বললেন,— আমার এ প্রশ্নের উত্তর জানা নাই; এটা পুঁথিপড়া পণ্ডিতদের বিষয়, আমি ভক্ত মানুষ!

আমি এবার কিছুটা সাহস পেয়ে বললাম,—তাহলে কিছুক্ষণ আগে হাত জোড় করে নমস্কার করলে কেন? আপনার নমস্কারটা কী নরকের প্রতি না ফেরার আর্জি নাকি অন্যরকম কিছু? আর একটা কথা, আপনার চুরিদারি কথাটার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদি খোলসা করে বুঝিয়ে বলেন। গোঁসাই এবার অন্তর্মুখীন হয়ে পড়লেন। বোধের বিষয়ে নিক্তি মেপে কথা বলেন এরা। মনে মনে ভাবছি জ্বালাতন না করাই ভালো। বিরক্ত হয়ে যাবেন। একটু পরেই গোঁসাই আমার ডানহাতটা তাঁর দুই হাতের মধ্যে নিলেন।

বললেন,—দোকানদারি, ব্যাবসাদারি, কবিদারি, চৌকিদারির মত চুরিদারিও একটা পেশা, যেমন ধরুন যাদের কথা আমি বললাম ওদের দেখে আপনি সহজেই বুঝে যাবেন এদের জীবিকা। আমার সাজপোশাক পারিবদ দেখে আপনি সহজেই বুঝে গেছেন আমি ধর্মজীবী। কিন্তু আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না আপনি কী। আসলে আপনি সব দোকান থেকেই দুই এক হাতা করে জানা কিনছেন। তারপর রঙ না মেখে সঙের কথা কিনতে চাইছেন। আপনার

প্রশ্ন আপনার হেঁয়ালির একটাই উত্তর চুরিদারি। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কেন নমস্কার করলাম? তা জানতে হলে আমার আশ্রমে আসতে হবে। পাশের ঝোলা থেকে একটা ছাপানো কার্ড হাতে ধরিয়ে দিলেন। বাসটা পালপাড়া স্টপেজে এসে থামল। গোঁসাই একজনের উদ্দেশ্যে বললেন,—বিনোদ সমস্ত ব্যাগগুলো দেখে নামিও। দুজন মা গোঁসাই, বিনোদ এবং গোঁসাই সহ ছোটো একটা মোটদজল বাসের পেট উগরে নেমে গেল।

কার্ডে মনোহর গোঁসাই-এর ঠিকানা দেখে সেদিনই আশ্রমে গিয়ে উঠেছিলাম। সুচিত্রা দাসীর ঠিকানা যদি পাই। গিয়ে আমার দুটো লাভ হয়েছিল। প্রথম লাভ মনোহর গোঁসাই-এর বৈষ্ণবভাবের সান্নিধ্য, আতিথেয়তা এবং আশ্রমে একটি রাত্রি যাপনের সৌভাগ্য। দ্বিতীয় লাভ সুচিত্রার সঠিক ঠিকানা। মনোহর গোঁসাই আমার উদ্দেশ্য শুনে পরদিনই আমাকে দুপুরের আগেই খাইয়ে দাইয়ে ছাড়লেন।

মনোহর গোঁসাই-এর ঠিকানা মতোই দই-এর বাজারে বাস থেকে নামলাম। সরু পিচরাস্তা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে একটা জনবহুল বাজারে নামিয়ে দিল। এই বাজারে কামারশালা থেকে ওষধের দোকান সবই আছে। সিগারেট কিনে ধরিয়ে দোকানদারকে সুচিত্রার নাম বলতেই বলল— সুচিত্রাদি গান গায়, রবিবারের কাগজে বড়ো ছবি বেরিয়েছে। এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। কিছুটা গেলে রাস্তাটা বাঁয়ে মোড় নেবে। একটা বড়ো তেঁতুলগাছ তার নিচের টালির ছাউনিটাই সুচিত্রা দাসীর।

হেমন্তের পড়ন্ত রোদেও ঘর্মাক্ত আমি। একটা চুম্বকীয় টানে ঝামাইটের খাবলানো গ্রামীন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি।

অনেকটা এসে দেখা মিলল একজন মানুষের। সাইকেলের ভেতর একটা ধানের বস্তা সেঁটে হেঁটে হেঁটে বাজারের দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম।

—সুচিত্রা দাসীর বাড়ি যাব কদ্দুর।

সাইকেল থামিয়ে একবার সামনে একবার পিছনে তাকিয়ে লোকটি বললেন,—

ওকে তো ঘরে দেখলুম না—বোধহয় ভাইয়ের বাড়ি গেছে—দরজা টানা, এগিয়ে যান বাঁ হাতে নাবাল জমিতে তেঁতুলগাছ, ওরই নিচে ঘর।

কথামত ঘরের সামনে এলাম। এ পোড়ো দেশে একেও ঘর বলে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। ছাউনিটা টালির হলেও দরমার বেড়ার মধ্যে অসংখ্য তালি। তার মধ্যে টাকমাথার ঝুলপির মতো একচিলতে বারান্দা বের করা। বারান্দায় বাঁশের চাওড়ি দিয়ে একটা গেট। গেটের চাওড়ি আর বারান্দার বাঁশের খুঁটির সঙ্গে একটা সস্তা দরের চেন দিয়ে টিপতালা আটকানো। সুচিত্রার ঘরগেরস্থি ওই টিপতালার মধ্যে জিম্মা রাখা। লক্ষ করলাম ওই অদ্ভুত ঘরটার মেঝে গোবর দিয়ে পরিপাটি করে নিকোনো। আশেপাশে কাউকে পেলাম না সুচিত্রার খোঁজ জানার। নাবাল জমিটা থেকে রাস্তার উপর হেঁটে এলাম। একটা দোকান সামনের বাড়িটার সঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে দোকানে গিয়ে সুচিত্রার অবস্থান জানার চেষ্টা করতেই মাঝবয়েসি দোকানদার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—

কোত্থেকে আইসছেন? উত্তর দিলাম। দোকানদার সংক্ষিপ্ত উত্তরে খুশি নন।

পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন,—সুচিত্রাকে কদ্দিন চেনেন?

এ ধরণের প্রশ্নে একধরণের খোঁচা থাকে। যে খোঁচায় উত্তরদাতাকে কিছুটা বিব্রত করা হয়। একটা অনাবশ্যক কৌতূহল। সঙ্গে কিছুটা রসালো গালগল্পের আমিষগন্ধ খোঁজার চেষ্টা। বুঝেই প্রশ্ন করলাম—

আপনাদের গ্রামের মেয়েটির সম্বন্ধে আপনারা কতটুকু জানেন? গত রবিবারের কাগজে দেখেছেন? গায়িকা হিসাবে ওর ছবি ছেপেছে। আমার কথাশুনে দোকানমালিক কিছুসময় চুপ করে থেকে বললেন।—

ও আপনি সাংবাদিক। বসেন ওই টুলের পরে। দুপুরে খাওয়ার পরে সুচিত্রা ভাইয়ের বাড়িতে যায়। সেখেন থেকে বিকেলে আসে। অতক্ষণ বসবেন না এগোয়ে দেখবেন—

কথার ভাঁজে সরাসরি চলে যাবার আর্জি বলি আর হুকুম বলি দুটোই আছে। অগত্যা নির্দিষ্ট দিকে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুটা যেতেই সুচিত্রাকে দেখতে পেলাম হেঁটে আসছে। মুখোমুখি হতেই বলল,—

আপনি এসেছেন, আমারে যেয়ে বলল কে একজন এসেছে তোমার কাছে। আমি তো ভাবতেই পারছি না। কাছাকাছি এসে পুরোনো দুষ্টুমি দিয়ে বলল,—

আপনি এলেন না আপনার মন এল।

বললাম,—দুজন একমত না হলে কী আসা যায়।

একটা ছোটো পয়সার পার্স থেকে চাবি বের করে তালা খুলতে খুলতে সুচিত্রা গাইছে—রতির ঘরে বসল কালা/রতি যেন না যায় সারা/দোহাই কালা দোহাই কালা।

বাঁশের চাঙাড়ির গেট সরিয়ে বারান্দা। বারান্দাটা তেঁতুলগাছের গোড়ার থেকে এল এর মতো চৌকো ত্রিভুজ। পূর্ব দিকে কয়েকটি দেবদেবীর ছবি। অন্যদিকে কাঠের একটা জলচৌকি। তার উপর একটা হারমোনিয়াম একটা খোল জুরিকত্তাল রাখা আছে। বোঝা যাচ্ছে গানবাজনার আসর বসে। দুই বারান্দার আবডালে মূল ঘরটি সত্তাদরের টিন কাঠের বাটাম দিয়ে আটকে নিয়ে দরজা। শিকলতোলা। ওই ঘরটি সুচিত্রা খুলল না। বারান্দায় পাটের দড়ি দিয়ে ছিকে বাঁধা। ছিকের মধ্যে সামান্যকিছু রান্নার বাসনকোসন। তুলনায় বেশি শক্ত কোরপ্রাই পাটের দড়ি দিয়ে দ্বিতীয় আর একটি ছিকে। সেখানে রাতে শোয়ার বিছানাপত্র বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সুচিত্রার সংসারটা হল গিয়ে খুব উঁচু থেকে দেখলে পাখির বাসা। ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমান আছে। সেখানে অভাবটা দাঁত বার করে হাসছে। অবচেতনে একটা কৌতূহল দানা বাঁধল। সবটাই তো বারান্দা তাহলে ঘরের ভেতরে কী? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই কৌতূহলটা মিটে ছিল। সুচিত্রার ওই একমাত্র ঘরটা দখল নিয়েছিল তিনটে ছাগল। সুচিত্রার পুষ্যি ওরা।

সুচিত্রা মাদুরটা বিছিয়ে বলল,—বসো দেখি গোঁসাই, আমি চা বানাচ্ছি। সন্ধ্যার আগে কেউ গাই দোয়াবে না, রং চা-ই খেতে হবে। আমি মৃদু হেসে বললাম—সবেই যখন রং ধরিয়ে দিয়েছ চা-টাই বা বাদ রাখবে কেন? মাদুরে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

পাখির বাসায় ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আমারও ঠাঁই হয়ে গেল। বুঝতে চেষ্টা করেও বুঝলাম না কোন অনন্তমোহ নিয়ে সুচিত্রার দিনযাপন চলে। সদানন্দময়ী চিদানন্দ ফল্গুতে, সম্পৃক্ত

সুচিত্রার জীবনবোধ চেষ্টা করেও ধরতে পারব না। ভিন্ন জগৎ, ভিন্ন ভাষা, তার চেয়েও ভিন্ন দৈনন্দিন লাভলোকসানের হিসাব। হ্যারিকেনের আলোয় সুচিত্রা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরলেন। গান শুনতে শুনতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি। ভাবছি পরিপাটি হয়ে সুচিত্রা দাসী এতদিনে খাঁটি পথে দাঁড়িয়েছে।

আমি বাউল দেখে দেখে অভ্যস্ত। বেশিরভাগ সাজা বাউলরা মনে করে বিবাহবিহীন একত্র থাকা সন্তানহীন যুগল যাপন, অনুমান নির্ভর বর্তমান নিয়েই এদের চলতে হয়। এরই অন্যপিঠে সুচিত্রা দাসীর সংসার। লক্ষ করলাম সুচিত্রার সামাজিক সম্মান আছে। আর্থিক স্বাধীনতা না থাকায় রোজকার অন্ন নেই। শুধুমাত্র বাউল মাথুর দেহতত্ত্ব পদাবলী গান দিয়ে সুচিত্রা বেঁচে আছে। অতিথি সেবায় ত্রুটি নেই। সন্ধ্যার মধ্যে জোগাড় করে ফেলল দেশি মুরগির ডিম, পরিমাপ মতো আলু, মুগের ডাল, খেতের বেগুন। এক একজন এসে পাখির বাসায় অতিথির জন্য প্রণামী রেখে যাচ্ছেন। শহরের কাছে চষাজমি খাবলানো রাস্তা হলেও সেই অর্থে গ্রাম নয়। সম্পন্ন কায়স্থ আর হিন্দু কাউরা সম্প্রদায়ের বাস। কয়েক ঘর মাঝি সম্প্রদায়ের মানুষ থাকলেও সকলেই কৃষিমজুর। কাউরা হিন্দুরা জাত বৈষ্ণবে নাম লিখিয়েছে। প্রায় সকলের গলায় কণ্ঠি। সেই তারাই পাখির বাসায় প্রণামী রেখে গেলেন। সুচিত্রার হাত দিয়ে অতিথি সেবন করাতে ব্যস্ত।

—আছে যার মনের মানুষ আপন মনে/সে কি আর জপে মালা/নির্জনে যে বসে বসে দেখছে খেলা.../ওরে লালন ভেড়োর লোক দেখানো/মুখে হরি হরি বলা। লালনের গান থামলে জিজ্ঞেস করলাম—

চাষির ঘরের মেয়ে গান বাজনায় বেশ তো চলছিল তো বাউল হতে গেছিলে কেন? সুচিত্রা আমার কথায় শুধু বলল,—কপাল।

কিছুক্ষণ নীরব। হ্যারিকেনের শিখার একটি দিক কাত হয়ে গেছে। অন্যদিকের শিখাটা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আমার আর সুচিত্রার মুখটা কালোতে ঢেকে দিল।

সুচিত্রা নীরবতা ভেঙে বলল,—জানোতো সাতবছর বয়স থেকে গান গাইছি। কৃষ্ণযাত্রায় পালা গাইতাম। নিমাই সন্ন্যাসে নিমাই। নিমাই ঘরছাড়ার সময় গান ধরতাম,—"তবে যাই/যাই তোমাকে ছাড়িয়া/এ জনমের মত/দেশ ছাড়িব বেশ ছাড়িব/তোমাকে ছাড়ালাম তাই/"—জানো এই গান শুনে আসরের শ্রোতারা কেঁদে ফেলত। একদিনের কথা, বদ্যিবাজারে নিমাই সন্ন্যাস পালা গেয়ে নেমে সাজপোশাক খুলছি। সুবল বাউল আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল,—আমার আশ্রমে একদিন আস। সুবলের কথার মধ্যে কেমন জাদু ছিল।...লক্ষ করলাম সুচিত্রা তার অতীতটাকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে চাইছে। কোনো সংকোচ নেই জড়তা নেই পাপবোধ নেই বলছে—গেলাম ওর আশ্রমে। আমার তখন চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স। সুবল বাউল তখন পাঁচছেলেমেয়ের বাবা। সুবল আমারে ঘরের ভিতর নিয়ে বসাল। গুরুদেবের ছবির পা থেকে তুলসী পাতা তুলে নিয়ে বলল, এটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেল। কথামতো তুলসীপাতাটা খেতেই সুবল আমার মুখটাকে দুই হাতের বাঁধনে বেঁধে ঠোঁট কামড়ে চুমোতে চুমোতে ভরিয়ে দিল। আমার তখন সোমত্ত বয়েস। আশে পাশে কেউ ছিল না। সুবল আমার

সারা শরীরটাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলল। সম্ভোগ করল না। আমার যৌবন লুঠ করল না যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও। অনেকক্ষণ পর সুবল আমাকে বলল,—আমার কেপী হবি। তাহলে সব ছেড়েছুড়ে চলে আয়। সেদিন বাড়ি চলে এসেছিলাম। সুবলের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ তারপর থেকে আমি অনুভব করতে শুরু করি। শরীরি চাহিদা। একদিন সুবলের কেপী হবার জন্য সব ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। সুবল ছিল ভেক বাউল। ভালো পদাবলীও গাইত। গানের আর শরীরের টানে সুবল বাউলের সাথে ঘর বাঁধলাম।

জিজ্ঞেস করলাম,—তখন সুবলের বয়স কত?

কত আর হবে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। কয়েকদিন পরই আমার ভুল ভাঙল। কীসের ভুল?

সুবল গানে গলায় যতটা জোরালো শরীরি ব্যাপারে ততটাই কমজোরি। মাঝনদীতে আমার ঢেউ বাড়লে সুবল খোলের মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ত। তবে একটা কথা জানো গোঁসাই সুবল খুব ভালো আদর করতে জানত। প্রথম দিনই ওর আদর খেয়ে আমি পুরুষ চিনতে ভুল করেছিলাম। আজও সেই পুরুষ চিনতে পারিনি।

সুবলকে প্রথমেই ছেড়ে দিলে না কেন?

সুচিত্রা মৃদু হাসি দিয়ে মাথাটা নিচু করল। ভূমির দিকে চোখ রেখে বলল,—

গোঁসাই সুবলের কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সুবল আদর করতে করতে বলত,—নারী হচ্ছে রসের নাগরি। তাকে সেজদা দিতে হয়। সুবলই শিখিয়েছে বাউল ফকির বৈষ্ণব তিনজনকেই নারীর কাছে সেজদা দিতে হয়। সেজদা দেবার সময় পায়ের নখ্‌ থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলতে পারত সুবল।

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম,—শেষমেশতো সুবল কে তুমি ছেড়ে দিলে।

সুবলকে আমি মন থেকে ছাড়তে চাইনি। সুবলের কাছে থাকলে আমার আর কিছু পাবার ছিল না। ও সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আসলে সুবল ছিল রসের কারিগর। মনের কারবারি। বলতে বলতে সুচিত্রা কোনো এক সুদুর অতীতে চলে গেল। সুবল বাউলের থেকে ও চলে গেল ফকিরের সঙ্গে। সুচিত্রা একমাত্র মেয়ে যে বাউল ফকির বৈষ্ণব তিনজনের সঙ্গেই দেহতত্ত্বের সঙ্গিনী হয়েছে। দেহতত্ত্বে পুরুষ নারীর শরীরি আবেদনে স্খলনহীন সঙ্গম সম্ভব কিনা সুচিত্রা সারাজীবন দিয়ে সেই শক্তির অন্বেষণ করে কাটিয়েছে। বিভিন্ন সাধু সঙ্গে সুচিত্রা দমের কাজ শিখেছে। নিজের জীবনে বারবার সেটা প্রয়োগ করেছে। কী পেল সেটাই জানার ইচ্ছে। সব বলবে বলে আমাকে আসতে বলেছিল।

সুচিত্রা আমাকে জিজ্ঞেস করল,—জামাল ফকিরের গান শুনেছ?

আমি স্মৃতি থেকে চারটে লাইন বললাম—

আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার ভিতরে/তিন গম্বুজ তিনটি সিঁড়ি ভিতরে তার খোদার ঘড়ি/রেখেছে নয় দরজা হয়জনা মৌলবী কিরে—/এতো ফকিরি দেহতত্ত্বের কথা। জামাল ফকিরের ইহবাদী দেহকেন্দ্রিক সাধনার গান শোনো—নাভীর মধ্যে মক্কা শরীফ/কইয়াছে ঠিকানা/নাভীর উপর বয়তুল মকাদ্দাম/কলিজাতে খানা/দেহের ভিতর রাখিয়াছে/সোনার

মদিনা/। বুঝলে গোঁসাই একমাত্র হৃদয় সংযোগে বোঝা যাবে সাঁইয়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত হয়ে আছে খোদা। যেমন দুধের মধ্যে ননি, ননির মধ্যে ঘৃত। এটাই সুফিবাদ।

সুচিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। এটুকু বুঝতে পারছি ও এখানে বসে থাকলেও কোনো এক নিরুদ্দেশে ওর বোধকে নিয়ে গেছে। আমি ছাপোষা মানুষ, এই উচ্চভাবের কথা বোঝার ভান করছি মাত্র। আমার মন শরীর কোনটাই সেভাবে তৈরি করিনি। শুচিস্নিগ্ধ সুচিত্রা দাসী সাধকের অন্বেষণ করতে করতে নিজেই সাধিকা হবার পথ খুঁজে পেয়েছেন কী। এসব প্রশ্ন মনের আনাচেকানাচে উঁকি মারছে। কীভাবে বলব সেটাই ভাবছি।

সুচিত্রা বলছে—জামাল ফকির আমার গান শুনেছিল। জিয়াগঞ্জের যুগলতলায় বহরমপুর যাবার জন্য বাস ধরব বলে দাঁড়িয়েছিলাম। জামাল ফকিরও দাঁড়িয়ে ছিল বাসের জন্য। কথায় কথায় ফকির সাহেব আমাকে বলেছিল—এ বড় বিচিত্র জগৎ—আশ্চর্য বিশ্বাসের জগৎ। জলের সুঁচ আর পবনের সুতো দিয়ে এই মানব দেহ গড়া।—

আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি এঁদের কথার আড়ালে যে কথাটা লুকিয়ে থাকে সেটা কোনো ধর্ম নয়। একটা যৌনতা সর্বস্ব যৌগিক জীবনের রসায়ন। সুচিত্রার মতো মেয়েরা গানের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও আর্থ সামাজিক কারণে ওই রসায়নের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অবাক হচ্ছি এই ভেবে সুচিত্রা দাসী ওই রসায়নের পাক থেকেই নির্লিপ্ত বোধের কোনো ঠিকানা পেয়ে গেছে। সুচিত্রা কথা থামিয়ে গান ধরল,—'জিন্দা দেহে মরার বসন/খিরকা-তাজ আর ডোর কোপিনী/জিন্দা মরার পোশাক পরা/আপন সুরাত আপনি সারা।/—'এই চিত্রিত সন্ধ্যায় সুচিত্রার সান্নিধ্যে আমি অনেক অমৃত সংগ্রহ করলাম। বিনিময়ে সুচিত্রাকে আমার কিছুই দেবার নেই। আমার চুরিদারি করার জুগুপ্সা জানতে চাইল—

—বলোতো সুচিত্রা অত বড়ো মাপের একজন গবেষক মাস্টারমশাই তোমার বশ হয়ে গেল কীভাবে? তোমার সাধনপথ ছেড়ে তার জন্য জীবনপাত করলে কেন? আমার প্রশ্ন শুনে সুচিত্রা হেসে দিল। হাসির সঙ্গে চোখের দুষ্টুমিটা মিলে গেল। আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে বলল,—যা আছে ভান্ডে, তাই পাবে দেহভান্ডে। সব খেলাটাই দেহকে ঘিরে। দেহতত্ত্ব যত সাধন করবে দেহগত মন তত ধরা দেবে। মাস্টারমশাই আমার থেকে বৈষ্ণব মতে বাউল মতে ফকিরি মতে দেহমিলনের সমস্ত ফিকিরগুলো জেনেছে। আমি জীবন দিয়ে যা সংগ্রহ করেছি মাস্টারমশাইকে সব উগরে দিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুচিত্রা। আমি সোৎসাহে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সুচিত্রা বলল,—

—ওই একটা মানুষ আমার জীবনের সাঁই; যাকে শরীর মন সব অক্লেশে দিয়ে দেওয়া যায়।—

আমার মধ্যবিত্ত রুচিবোধ মুখফোসকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—

—তোমার বয়স মাস্টারমশাইয়ের বয়সের ব্যাপক ফারাক। শরীরি কলায় তোমার সঙ্গে পেরে ওঠারতো কথা নয়। কিছুটা অবাস্তব নয় কী?

সুচিত্রা আমার কথাটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—

—মাস্টারমশাই সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা বলতে পারব না। দীর্ঘ বছর ধরে বাউল বৈষ্ণব ফকিরি দেহচর্চাকে জেনেছে; তিনি নিরঞ্জন সাঁই তার শক্তির অভাব নেই। অনেক ফকির বাউল বৈষ্ণবের চাইতেই মাস্টারমশাই-এর দমের কাজ অনেক বেশি। দমের কাজে আমি তাকে দিনের পর দিন সঙ্গ দিয়েছি। তাইতে না সে এত মোটা বই লিখেছে। জানো মাস্টারমশাই কী লিখেছে আমার পড়তে খুব ইচ্ছে। আমাকে পড়ে পড়ে শোনাবে? আমি তো পড়তে পারি না।

আমি সুচিত্রার আন্তরিক আবেদনে রাজি হয়ে যেয়েও বললাম।—পড়লেও তুমি বুঝবে না সুচিত্রা, সেখানে তোমার কোনো কথা নেই। তোমাকে দিয়ে সংগ্রহ করা তথ্যে তোমার কোনো স্বীকৃতি নেই। এর নাম গবেষণা। সুচিত্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,—

—দেহমিলনের গুহ্যকথাগুলো মাস্টারমশাই বইয়ে লিখেছে। সেগুলো তুমি পড়েছ? আমার নাম নেই সেখানে?

সুচিত্রার এত কৌতূহলের উত্তর আমার কাছে নেই। সময়ের একজন উঁচু মাপের দেহসাধিকাকে মাস্টারমশাই খুঁজে না পেলে কীভাবে আমরা জানতে পারতাম এই তত্ত্বের গভীরতা বাস্তবতা। সুচিত্রাকে আমার বোধ দিয়ে সে কথা কী করে বোঝাব। সুচিত্রা আবেগে উৎসাহে তার ঝাঁপি উজাড় করে বলল,—

আমি যত বাউল ফকির বৈষ্ণবের দেহসাধিকা হয়েছি কেউই পিতৃবস্তু ধরে রাখতে পারেনি। সবারই স্খলন হয়। একমাত্র মাস্টারমশাই চেষ্টা করলে পারতেন। ওনার সেই ক্ষমতা ছিল। আমি অবাক বিস্ময়ে সুচিত্রার কথা গিলে যাচ্ছি।

মাস্টারমশাইয়ের কথামতো নদে বীরভূম মুর্শিদাবাদের অনেক সাধক বাউল, ফকিরের সঙ্গে দেহসাধনার সঙ্গী হয়েছি। স্খলন হয় না একটাও পাইনি। সবকটার পাঁচটা দশটা করে বাচ্চাকাচ্চা। সাধকস্তর থেকে পতন হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে মন আর শরীরটা আমার তৈরি হয়ে গেছে গোঁসাই। এখন মনোহর গোঁসাইয়ের কাছে আমি রাধাভাবের সঙ্গী হয়েছি। জানি না এ পথের শেষ কোথায়? সুচিত্রা নীরব হয়ে ধ্যানমগ্নার মতো অনেকক্ষণ বসে রইল।

গল্প করতে করতে কখন গভীর রাত হয়েছে লক্ষ করিনি। রাতের তৃতীয় প্রহরে পাখির ডাক শুনতেই সুচিত্রা বলল,—এবার শুয়ে পড়ো গোঁসাই, অনেক রাত হয়েছে। ভোরবেলা উঠতে হবে। বারান্দার একপাশে মাদুরের উপর একটা কাঁথা পেতে দিল। ছিকার তাক থেকে একটা চিমটানো বালিশ দিয়ে বলল,

—নাও শুয়ে পড়ো।

বারান্দার অন্যপাশে সুচিত্রা আর একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। বাতিটা নিভিয়ে দিল।

একজন দর্শনপ্রার্থী

মারিয়ো ভার্গাস সোসা

অনু : কামারুজ্জামান

[জন্ম পেরুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরেকুইপা-তে। ছোটোবেলা কেটেছে বলিভিয়ার কোচাবাম্বা আর পেরুর উত্তরের শহর পিউরা-তে। তার মা তাকে মিথ্যাই বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে তাঁর বাবা মৃত; কারণ, তাদের দুঃখজনক বিচ্ছেদ। সত্যটি হঠাৎ প্রকাশ পেল যেদিন তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর দাদু আর দিদিমার কাছ থেকে নিয়ে লিমাতে চলে গেলেন। এই সত্য উদ্ঘাটনে মারিয়ো ভার্গাস ইয়োসার জীবনে বিশাল পরিবর্তন এল। এক দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থা থেকে বাবার শত্রুতামূলক আচরণের পরিবেশে গিয়ে পড়লেন। জীবনে প্রথমবার তিনি হিংসা, অন্যায়-অবিচার আর ভীতির মুখোমুখি হলেন।

শৈশবের এসময় তিনি ভিক্টর হুগো আর দ্যুমার রচনার মধ্যে ডুবে ছিলেন। ১৯৪৮ সালে পেরুতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। পরবর্তী আট বছর তাঁকে ঘরে-বাইরে একনায়কতন্ত্রের দুঃসহ অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হল। তারই ফলস্বরূপ তাঁর সাহিত্যকর্মের সূচনা হল 'The Time of the Hero' (১৯৬৩) উপন্যাস রচনার মধ্যদিয়ে। এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা এসেছিল তাঁর বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী মিলিটারি একাডেমিতে যাওয়া এবং তাঁর থেকে এগারো বছরের বড় তাঁর মাসিমার বোনকে বিবাহ করার মধ্য থেকে। দুটিরই তিনি বিরোধী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতাও তাঁর দুটি উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর জীবনের অপর এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল আমাজনের জঙ্গলে অভিযান। এথেকেও তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন Green House নামে।

লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে জড়িত হয়ে এক সময়ে ইয়োসা সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীতে বিপ্লবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কাস্ত্রোর সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ। ১৯৮৭তে পেরুর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটিকে সরকারের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টা বলে তিনি মনে করেন। ১৯৯০ তে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয়। এসময়ের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয় তাঁর 'A Fish in the water', উপন্যাসে।

ক্ষমতার কাঠামোর চিত্রায়ণ, ব্যক্তিগত প্রতিবাদ এবং পরাজয়ের যে চিত্ররূপ তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত, তারজন্য ইয়োসা ২০১০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।]

পান্থশালার সামনেটা অবরোধ করে আছে বালির পাহাড়, কিন্তু ওই পর্যন্তই, সেখানেই তার শেষ; যে-ফোকরটা দরজা হিসাবে উপযোগ হয় সেখান থেকে, কিংবা নলখাগড়ার ঝোপ থেকে দৃশ্যপটটা ছড়িয়ে আছে একটা সাদা অসাড় পৃষ্ঠভূমিতে, তারপর গিয়ে মিশে গিয়েছে সার্বত্রিক আকাশে। পান্থশালার পিছনে, জমিটা খুব রুক্ষশুষ্ক বন্ধুর। এক মাইলেরও কম দূরত্বে তকতকে ঘনসংবদ্ধ টিলার সমাবেশ, পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তীটা উচ্চতায় দীর্ঘতর, তাদের চূড়া সূঁচের মতো বা কুড়ুলের শক্তিতে মেঘ ভেদ করে কোথায় গিয়ে পৌচেছে। বামপার্শ্বে বালির সীমানা বরাবর কাঠের সঙ্কীর্ণ প্যাঁচানো পথ, সেই পথ পান্থশালা ছাড়িয়ে বরাবর বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, শেষে দু'টো টিলার মাঝে অদৃশ্য হ'য়ে পড়েছে : বনভূমির নীচে ছোটো ছোটো গাছের ঝোপ, বন্য গাছপালা এবং একটা শুকনো বিস্তৃত তৃণভূমি, তার মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে আছে সবকিছু—বন্ধুর ভূখণ্ড, সাপ, ছোটো ছোটো বাদাভূমি। কাঠল অরণ্যই শুধু একমাত্র বনভূমির নিদর্শন, তার একটা পূর্বাভাস : একটা গিরিখাতের প্রান্তে গিয়ে তা শেষ হয়েছে, একটা বিরাট

টিলার পাদদেশে, তা ছাড়িয়েই আসল বনভূমির শুরু। এবং দোনা মার্সেদিতাস সেটা জানেন: বহুকাল আগে একদা ওই মহিলা পর্বতের শীর্ষে আরোহন করেছিলেন এবং বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টি দিয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জকে তিনি তাঁর পায়ের তলায় ভেসে বেড়াতে লক্ষ্য করেছিলেন, কোনো ছেদ ছাড়াই সবুজাভ বিস্তৃতি সর্বত্র।

দু'টো বস্তার উপর শুয়ে এখন দোনা মার্সেদিতাস ঝিমোচ্ছেন। একটু দূরে, ছাগলটা বালিতে নাক ঘষতে ঘষতে তেঁড়েটের মতো এক টুকরো কাঠ চিবিয়ে চলেছে। হঠাৎই ছাগলটা কানে খোঁচা খেয়ে সিঁটিয়ে পড়ে। মহিলা তাঁর চোখ আধাআধি খোলেন।

"কী ব্যাপার, কুয়েরা?"

জন্তুটা দড়ি দিয়ে খোঁটাতে বাঁধা। সে দড়িটা সজোরে টান মারে। কষ্টেসৃষ্টে মহিলা উঠে দাঁড়ান। পঞ্চাশ গজের মতো দূরে লোকটাকে দিগন্তের পশ্চাৎপটে স্পষ্ট ছায়াচিত্রের মত দ্যাখা যায়। তাকে ছাড়িয়ে তার ছায়া বালিতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। একটা হাত দিয়ে মহিলা তাঁর কপালটা আড়াল করেন, চকিত দৃষ্টিতে চতুর্দিক চেয়ে দ্যাখেন, নিথর নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে। লোকটা খুব কাছেই; দীর্ঘকায় ঝিরঝিরে চেহারা, বেশ গাঢ় রঙ, কোঁকড়ানো মাথার চুল এবং অবজ্ঞায় ভরা চোখ দু'টো। তার ফ্যানেলের প্যান্টের বাইরে ঝাপসা জামাটা বাতাসে উড়ছে। প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। তার পা দু'টো দেখতে ঠিক কালো খোঁটার মতন।

"শুভ অপরাহ্ণ, দোনা মার্সেদিতাস।" সুরেলা তার কণ্ঠস্বর এবং শ্লেষাত্মক। মহিলা বিবর্ণ হ'য়ে ওঠেন।

"আমাকে চিনতে পারেন, ঠিক কি না? ঠিক আছে ভালোই, তাতে আপনার আর কী। যদি একটু কৃপা করেন, আমি একটু কিছু খেতে চাই। এবং পান করতে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

"এখানে বিয়ার আছে, ভিতরে গেলে ফল পাওয়া যাবে।"

"ধন্যবাদ, সেনোরা মার্সেদিতাস। আপনার বড় দয়া। সবসময়ের মতোই। আসুন না, আপনিও যোগ দিন না আমার সঙ্গে।"

"কিসের জন্য?" মহিলা সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে তাকান। তিনি বেশ মোটাসোটা, বয়সও হয়েছে বেশ। কিন্তু দেহের ত্বক এখনও মসৃণ। পায়ে কিছু নাই। "তুমি তো দেখছি জায়গাটা আগে থাকতেই জানো।"

"ওহ! হ্যাঁ", লোকটা হার্দিকতার সঙ্গে বলল। "আমাকে একা খেতে ভালো লাগে না। বড় কষ্ট পাই।"

এক মুহূর্তের জন্য মহিলা গড়িমসি করেন। তারপর পান্থশালার দিকে ফিরে যান, বালির উপর পা টেনে-টেনে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে একবোতল বিয়ার খোলেন।

"ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সেনোরা মার্সেদিতাস। কিন্তু আমার পছন্দ দুধ। আপনি তো বোতলটা খুলেই ফেলেছেন, কেন আপনিই খান না।"

"না, আমি খাই না, ইচ্ছা করে না।"

"আরে আসুন, সেনোরা মার্সেদিতাস, অমন করে না—আমার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান করুন।"

"না, না—আমি চাই না।"

লোকটার মুখটা কালো হ'য়ে ওঠে। "আপনি কি কালা? আমি বলছি আপনি বোতলটা শেষ করুন। শুভারম্ভ!"

মহিলা দুই হাত দিয়ে বোতলটা তোলেন, ধীরে ধীরে সামান্য চুমুকে পান করতে থাকেন। ময়লা আঁচড়কাটা কাউন্টারের উপর একবোতল দুধ চকচক করছে। লোকটা তার হাতের ঝাপড় দিয়ে বোতলকে ঘিরে উড়তে থাকা মাছির ঝাঁক উড়িয়ে তাড়ায়, বোতলটাকে তোলে এবং একটানা এক দীর্ঘ চুমুকে বোতলটা নিঃশেষ করে। দুধের সরের মুখচ্ছদে তার ঠোঁট দু'টো ঢাকা পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই লোকটা জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে চেটে সাফ করে নেয়।

"আহা!" জিভ দিয়ে চাটতে চাটতেই সে বলে। "দুধটা সত্যিই দারুণ, সেনোরা মার্সেদিতাস। ছাগলের দুধ, তাই না? আমার দারুণ লেগেছে। আপনি কি এরই মধ্যে বোতলটা শেষ করে ফেলেছেন? কেন, আর একটা খুললে হয় না?"

মহিলা আপত্তি না করে তাই করেন। লোকটা দু'টো কলা আর একটা কমলালেবু খায়।

"বলি শুনুন, সেনোরা মার্সেদিতাস, এত তাড়াহুড়া করবেন না। বিয়ারটা আপনার গলা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আপনার পোশাক ভিজে যাবে। এইভাবে জিনিস নষ্ট করবেন না। আর একটা বোতল খুলুন। নিউমার উদ্দেশ্যে পান করুন। শুভারম্ভ!"

লোকটা "শুভারম্ভ!" বলেই চলতে থাকে যতক্ষণ না কাউন্টারের উপর চারটে খালি বোতল জমে ওঠে। মহিলার চোখ দু'টো তখন স্থির-নিষ্প্রভ। তিনি ঢেঁকুর তুলতে থাকেন, থু থু করে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন, একবস্তা ফলের উপর উঠে গিয়ে বসেন।

"হা ঈশ্বর!" লোকটা বলে। "বেড়ে মহিলা বটেন আপনি। বেশ বুঝছি আপনি রোজ মদত খেয়ে আয়েস করেন, সেনোরা মার্সেদিতাস। ক্ষমা করবেন আমাকে এমন কথা বলার জন্য।"

"একজন বেয়ারা বুড়িকে এমন করার জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে। দেখে নিও তুমি, জ্যামাইকান, তুমি দেখে নিও।" তাঁর জিহ্বাটা ভারী হয়ে উঠেছে।

"তাই না কি?" লোকটা বলল, বিরক্ত হ'য়ে। "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, নিউমা কখন আসছে?"

"নিউমা?"

"সত্যিই আপনি যেন কী, সেনোরা মার্সেদিতাস, আপনি যেন কিছু বুঝতে চান না। কখন সে আসছে?"

"তুমি একটা বেজন্মা কালা আদমি, জ্যামাইকান। নিউমা তোমাকে খুন করবে।"

"ওইভাবে কথা বলবেন না, সেনোরা মার্সেদিতাস।" হাই তুলে সে বলে। "ঠিক আছে। আমার মনে হয় আমাদের হাতে এখনও কিছু সময় আছে। সেই রাত্রি পর্যন্ত। একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়, আপনি ঠিক আছেন তো?"

সে উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। সোজা সে ছাগলটার কাছে যায়। সন্দেহের দৃষ্টিতে জন্তুটা তার দিকে চেয়ে থাকে। সে তাকে খোঁটা থেকে খুলে দেয়। সে পান্থশালায় ফিরে আসে। দড়িটাকে জাহাজের চালক পাখার মতো ঘোরায় এবং শিস দিতে শুরু করে। মহিলা তখন চলে গিয়েছেন। তার অভিব্যক্তির অলস কামুক প্রশান্তি সঙ্গে-সঙ্গেই কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে।

গজগজ করতে করতে সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারপর অরণ্যের দিকে মুখ ফেরায়, পিছু-পিছু চলতে থাকে ছাগলটা। জন্তুটা গাছের পিছনে মহিলাকে দেখতে পায়, তাঁর পা চাটতে শুরু করে। ছাগলটার দিকে তাঁকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখে অ্যামাইকান হাসে। মহিলার দিকে সহজ অভিব্যক্তিতে তাকায় এবং দোনা মার্সেদিতাস তার দিকেই এগিয়ে আসেন।

"আপনি সত্যিই একটা সৃষ্টিছাড়া মহিলা, হ্যাঁ, সত্যিই। আপনার যত হতচ্ছাড়া ধারণা।"

সে তাঁর হাত ও পা দু'টো বাঁধে। তারপর তাঁকে সহজেই তুলে নিয়ে গিয়ে কাউন্টারের উপর নিয়ে গিয়ে বসায়। দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে শয়তানি দৃষ্টিতে তাকায়, এবং হঠাৎই তাঁর চওড়া গোড়ালির ভাঁজে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। মহিলা হেসে ককিয়ে ওঠেন; তাঁর মুখে বেপরোয়া আভাস। কাউন্টারটা খুবই সংকীর্ণ। নড়েচড়ে উঠে দোনা মার্সেদিতাস প্রান্তের দিকে ঘেঁষে আসেন।

"হ্যাঁ, সত্যিই বলছি, আপনি কী সৃষ্টিছাড়া মহিলা।" সে পুনরাবৃত্তি করে। "আপনি মূর্ছা যাওয়ার ভান করছেন, আসলে আপনি এক চোখ দিয়ে আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছেন। আপনার সত্যিই কিছু হওয়ার নয়, সেনোরা মার্সেদিতাস।"

গোঁত্তা মেরে ছাগলটা ঘরে ঢোকে, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলার দিকে চেয়ে থাকে।

ঘোড়ার চিঁহি-ই-ই চিঁহি হ্রেষাধ্বনিতে শেষ বেলার পড়ন্ত বিকেল কালা-কালা হ'য়ে যায়: ক্রমশ আঁধার জমে ওঠে। সেনোরা মার্সেদিতাস তাঁর মাথা তোলেন, হ্রেষাধ্বনি শুনতে থাকেন, তাঁর চোখ হাট করে খোলা।

"ওই তো তারা," অ্যামাইকানটা বলে। সে লাফিয়ে ওঠে। ঘোড়াগুলো চিঁহি-ই-ই করতে শুরু করে এবং মাটিতে খুর ঠুকতে থাকে। পান্থশালার দরজা থেকে লোকটা ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে :

"আপনি কি পাগল হ'য়ে গিয়েছেন, লেফটেন্যান্ট? পাগল হয়ে গিয়েছেন, না?"

টিলার পাথুরে বাঁক থেকে লেফটেন্যান্ট আবির্ভূত হন : বেঁটেখাটো চেহারা, বেশ মোটাসোটা গড়ন; পায়ে ঘোড়ায় চড়ার জুতো, মুখ ঘামে প্যাচপ্যাচ করছে। সতর্ক চোখে তিনি চারদিকে তাকান।

"আপনি কি পাগল না কি?" অ্যামাইকান পুনরাবৃত্তি করে। "কী ব্যাপার আপনার?"

"গলা চড়িয়ে কথা বোলো না বলছি, কালা আদমি। তুমি এখনও মুক্ত হওনি", লেফটেন্যান্ট বলেন। "আমরা এমনিই এখানে এসে পৌঁছেছি। কি চলছে সব?"

"আপনি কী বলতে চান, কী হয়েছে? আপনার লোকজনকে বলুন যেন ঘোড়াগুলো নিয়ে ভেগে পড়ে। আপনি কি জানেন না আপনাকে কী করতে হবে?"

লেফটেন্যান্ট রেগে লাল হ'য়ে ওঠেন।

"মনে রেখো তুমি এখনও মুক্ত নও, কালা আদমি", সে বলল। "একটু সমীহ করে কথা বলো।"

"ঘোড়াগুলো আড়ালে রাখুন। চাইলে ওদের জিভ টেনে কেটে ফেলুন তাহলে আর ওদের চিঁহি শোনা যাবে না। অপেক্ষা করে থাকুন। আমি আপনাকে সঙ্কেত দেব।" অ্যামাইকান তার

মুখটাকে কুঞ্চনমুক্ত করে এবং তার মুখ থেকে যে-হাসি প্রসারিত হয়, তা চরম ঔদ্ধত্যের। "আপনি কি বুঝতে পারছেন না এখন আপনাকেই আমার হুকুম তামিল করে চলতে হবে?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য লেফটেন্যান্ট দ্বিধাবিহ্বল হয়ে পড়েন।

"ঈশ্বর যেন করেন সে যেন না আসে", তিনি বললেন। মাথা ঘুরিয়ে তিনি ফরমান জারি করলেন : "সার্জেন্ট লিতুমা, ঘোড়াগুলো আড়ালে সরিয়ে নিয়ে যাও।"

"তাই করছি, লেফটেন্যান্ট," টিলার পিছন থেকে একজন বলে। মাটিতে খুরের শব্দ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে।

"এটাই ভালো", জ্যামাইকান বলে। "আপনাকেই হুকুম তামিল করতে হবে। খুব ভালো কথা। বাহবা, কম্যান্ডার! শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ক্যাপ্টেন। এই জায়গা থেকে একদম নড়বেন না। আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।"

লেফটেন্যানটি তাকে ঘুঁষি দেখান এবং টিলার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে যান। জ্যামাইকা পান্থশালায় এসে প্রবেশ করে। মহিলার চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলতে থাকে।

"ভণ্ড প্রতারক", বিড়বিড় করে তিনি বলেন। "তুমি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছ। মরণ হয় না তোমার!"

"কী আচরণ, ওহ! ভগবান! কী বদ আচরণ আপনার, সেনোরা মার্সেদিতাস। আমি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি। আমি একাই এসেছি। লেফটেন্যান্টের সঙ্গে এখানেই আমার দেখা। এটা আপনার স্পষ্ট বোঝা উচিত।"

"নিউমা আসছে না", মহিলা বলেন। "পুলিশ আবার তোমাকে জেলে চালান করে দেবে। এরপর যখন তুমি বেরিয়ে আসবে, নিউমা তোমাকে নৃশংসের মতো হত্যা করবে।"

"আপনার দেখছি বড় কড়া ধাত, সেনোরা মার্সেদিতাস, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। কী আশঙ্কাই না আপনি করছেন আমার জন্য।"

"জোচ্চর-প্রতারক," মহিলা পুনরাবৃত্তি করেন। কোনক্রমে তিনি উঠে বসেছেন এবং আড়ষ্ট হয়ে আছেন। "তুমি কি ভাবো নিউমা একটা নির্বোধ?"

"নির্বোধ? মোটেই তা নয়। সে একটা ধূর্ত শেয়াল। কিন্তু আশা ছাড়বেন না, সেনোরা মার্সেদিতাস। আমি নিশ্চিত যে সে আসবে।"

"সে আসবে না। সে তোমার মতো নয়—তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। পুলিশ যে এখানে এসেছে, তারা তাকে হুঁশিয়ার করে দেবে।"

"তাই আপনি ভাবছেন? আমি সেই রকম কিছু মনে করি না। তারা সময় পাবে না। পুলিশ অন্য রাস্তা ধরে এসেছে, পাহাড়ের পিছনের দিক দিয়ে। আমি একাই শুধু বালি পার হয়ে এসেছি। সব শহরেই আমি জিগ্যেস করেছি, 'সেনোরা মার্সেদিতাস কি এখনও চটিতে আছেন? তারা আমাকে বাইতে আসতে দিয়েছে, আমি ওঁর গলা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলব।' অন্তত বিশজন লোক নিউমাকে বলতে ছুটেছে। এখনও কি ভাবেন যে সে আসবে না? হায়! ঈশ্বর! এ কী মুখোশ আপনি পরেছেন, সেনোরা মার্সেদিতাস!"

"যদি নিউমার কিছু ঘটে," তো-তো করে রুক্ষ গলায় বলে ওঠেন, "তোমাকে সারাজীবন ধরে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি, জ্যামাইকান।"

সে ঘাড় ঝাঁকায়। একটা সিগারেট ধরায় এবং শিস দিতে শুরু করে। তারপর সে কাউন্টারের দিকে পা বাড়ায়, তেলের ল্যাম্পটা তুলে নেয় এবং সেটা জ্বালায়। সেটাকে দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখে।

"অন্ধকার হয়ে আসছে," সে বলে। "এখানে আসুন, সেনোরা মার্সেদিতাস। আমি চাই নিউমা আপনাকে দুয়ারে বসে থাকতে দেখুক, আপনি যেন তার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। ওহ্। এটাই ঠিক আছে। আপনি নড়তে চড়তে পারবেন না। ক্ষমা করবেন, আমার বড় ভুলোমন।"

সে নিচে ঝুঁকে তাঁকে তার বাহুতে তুলে নেয়। চটির বালিতে সে তাঁকে নামায়। লম্ফ থেকে আলো ছুটে এসে তাঁর মুখের উপর গিয়ে পড়ে। এবং তাঁর মুখের ত্বক আরও কমনীয় হয়ে ওঠে। তাঁকে অনেক কম বয়সী বলে মনে হয়।

"এ কী সব করে চলেছ তুমি, এ কী সব চালাকি তোমার জ্যামাইকান?" এখন দোনা মার্সেদিতাসের গলায় স্বর বড়ই ক্ষীণ বড়ই নিস্তেজ।

"কেন?" জ্যামাইকানটা জিজ্ঞাসা করে। "আপনি তো আর জেলে যাননি, তাই নয় কি, সেনোরা মার্সেদিতাস? দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়, কিচ্ছুটি করার থাকে না। আমি আপনাকে সত্যি করে বলছি, আপনিও বিরক্ত হ'য়ে পড়তেন। এবং পেটে খুব খিদে জ্বলে উঠত। শুনুন, তবে, আমি একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আপনার মুখকে খোলা ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন না। যখন নিউমা আসবে চিৎকার শুরু করতে পারবেন না। শুধু আপনি একটা মাছি গিললেও গিলে পারেন।"

সে হাসে। ঘরটার চারদিকে চোখ ঘোরায়। এবং একটা কম্বল খুঁজে পায়। সেটা দিয়ে সে দোনা মার্সেদিতাসের মুখটার আধাআধি পট্টি বাঁধে। আহ্লাদিত, সে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ধরে যাচাই করে।

"বলছি, শুনুন, এই অবস্থায় আপনাকে দেখে ভারী মজা লাগছে আমার, সেনোরা মার্সেদিতাস। আমি বলতে পারছি না আপনাকে ঠিক কেমন লাগছে।"

চটির পিছনের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে, জ্যামাইকান সাপের মতো গড়িয়ে উপরে উঠতে থাকে; রবারের মতো স্থিতিস্থাপক এবং পুরো নিঃশব্দে। সে ঝুঁকেই থাকে, কাউন্টারের উপরে তার হাত দু'টো। তার দু'গজ সামনে, আলোর বৃত্তে মহিলা নিথর হ'য়ে আছেন, তাঁর মুখটা সামনের দিকে ঠেস দেওয়া যেন তিনি বাতাস শুঁকছেন : তিনিও সেটা শুনেছেন। খুব ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট শব্দ, বাঁ দিক থেকে ভেসে আসছে, ঝিঁঝির গুঞ্জনকে কাটিয়েও সেই শব্দের রেশ বেশ স্পষ্ট। আবার শব্দটা উজিয়ে আসে, বেশীক্ষণ ধরে : অরণ্যে গাছের শাখা-প্রশাখা চড়্‌পট শব্দে ভেঙে পড়ে। কিছু একটা যেন চটির দিকে এগিয়ে আসছে। "সে একা নয়," ফিসফিস করে জ্যামাইকান বলে ওঠে। "তারা বেশ কয়েকজনই।" সে তার জেব্বার মধ্যে হাত ঢোকায়,

বাঁশিটা বের করে তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে নেয়। সে অপেক্ষা করতে থাকে, নিশ্চল হয়ে। মহিলা বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং জ্যামাইকান দাঁত কবে শাপশাপান্ত করতে চলে। সে লক্ষ্য করে তাঁর ছটফটানি এবং ডাইনে বাঁয়ে তাঁর মাথার ঝাঁকুনি, তাঁর হাঁ-পুঁটলিটা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। হট্টগোল থেমে গিয়েছে : সে কি বালিয়ারিতে এসে গিয়েছে, তাতে তার পদশব্দ নিঃশব্দ হ'য়ে পড়েছে? মহিলা তাঁর মুখটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নেন, চোখ দু'টো দলা পাকানো ইগুয়ানার মতো, অক্ষিকোটোর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। "ও তাদেরকে দেখতে পেয়েছে," জ্যামাইকান বিড়বিড় করে বলে। জিভের ডগায় সে বাঁশিটাকে রাখে : একটা ধাতব তীক্ষ্ণতা। দোনা মার্সেদিতাস তাঁর মাথাটা মোচড় দিয়ে ওঠেন, যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকেন। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে ওঠে। জ্যামাইকান পা মুড়ে নিচু হ'য়ে গুটিসুটি মেরে বসে ওঁৎ পেতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়, সে লক্ষ্য করে একটা ছায়া মহিলার উপর নেমে আসছে এবং একটা নাঙ্গা বাহু মুখপুঁটলির দিকে বাড়িয়ে আসছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘুঁষি চালায়, নবাগতের উপর লাফিয়ে পড়ে। বাঁশির শব্দে রাত্রি আগুনের মত লকলকিয়ে গুঞ্জিয়ে ওঠে এবং হারিয়ে যায় এলোপাতাড়ি গালমন্দের বিস্ফোরণের মধ্যে, পিছনে ধাওয়া করে আসে ক্ষিপ্র পদক্ষেপ। দু'জন মানুষ মহিলার উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লেফটেন্যান্ট খুব সচকিত : জ্যামাইকা যখন উঠে দাঁড়ায়, তার একটা হাত নিউমার চুল পাকড়ে ধরা, তার অন্য হাতে একটা রিভলবার সে তার রগে ঠেকিয়ে ধরে আছে। রাইফেল হাতে চারজন রক্ষী তাদেরকে ঘিরে ধরে।

"দৌড়াও", জ্যামাইকান চেঁচিয়ে রক্ষীদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে। "অন্যরা বনে লুকিয়ে আছে। ঝটপট। তারা চলে যাচ্ছে। ঝটপট।"

"চুপ করে থাকো।" চেঁচিয়ে লেফটেন্যান্ট বলেন। নিউমার উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, সে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে রিভলবারটা খোঁজার চেষ্টা করছে। তাকে শান্ত বলেই বোধ হয়, দু'পাশে তার হাত দু'টো ঝুলে আছে।

"সার্জেন্ট লিতুমা, ওকে বেঁধে ফ্যালো।"

লিতুমা তার রাইফেলটা মাটির উপর রাখে। সে তার কোমরে বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলতে থাকে। প্রথমে সে নিউমার পা দু'টো বাঁধে, তারপর হাতকড়া লাগায়। ছাগলটা উঠে এসেছে, নিউমার পাগুলো শুঁকছে, শেষে তাদের চাটতে শুরু করে, ধীরে-ধীরে।

"ঘোড়াগুলো, সার্জেন্ট লিতুমা।"

লেফটেন্যান্ট তাঁর রিভলবারটা চামড়ার খাপে গুঁজে রাখেন। এবং মহিলার উপর গিয়ে ঝুঁকে পড়েন, মুখপুঁটলিটা ও দড়িদড়া খুলে নেন। দোনা মার্সেদিতাস উঠে দাঁড়ান এবং ছাগলটাকে এক লাথি মেরে রাস্তা থেকে সোজা ভাগিয়ে দিয়ে নিউমার কাছে যান। কিছু না বলে তিনি তার কপালে হাত বোলান।

"ওরা তোমার কী করেছে?" নিউমা জিজ্ঞাসা করে।

"তেমন কিছু না," মহিলা জবাবে বলেন। "সিগারেট চায়?"

"লেফটেন্যান্ট," জিদ করে বলে ওঠে। "আপনার কি মনে হয় না যে অন্যরা বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, এইমাত্র কয়েক গজ দূরে? তাদের কথাবার্তা কি আপনি শুনতে পাননি? সংখ্যায়

অন্তত তারা তিন-চারজন তো হবেই। কেনই বা আপনি অপেক্ষা করে আছেন? কেন আদেশ দিচ্ছেন না তাদের খুঁজে বের করতে।"

"চুপ করো, কানা আদমি," লেফটেন্যান্ট বলেন, তার দিকে না তাকিয়েই। মহিলা যে-সিগারেটটা নিউমার মুখে গুঁজে দিয়েছেন, একটা দেশলাই জ্বালিয়ে তাতে তিনি আগুন ধরিয়ে দেন। দীর্ঘ টানে নিউমা ধোঁয়া নিয়ে চলে; দু'পাটি দাঁতের মাঝে সিগারেট, তার নাক দিয়ে ঘন-ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। "আমি এই লোকটাকে খুঁজতে এসেছিলাম, আর কাউকে নয়।"

"ঠিক আছে," জ্যামাইকান বলে ওঠে। "কী করতে হবে তা না বুঝলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি। আমি আমার কাজ করেছি। আমি এখন মুক্ত।"

"হ্যাঁ," লেফটেন্যান্ট বলেন। "তুমি এখন মুক্ত।"

"ঘোড়াগুলো, লেফটেন্যান্ট," লিতুমা বলে। পাঁচটা পশুর সে লাগাম ধরে আছে।

"ওকে তোমার ঘোড়ায় চাপিয়ে নাও, লিতুমা," লেফটেন্যান্ট বলেন। "ও তোমার সঙ্গেই যাবে।"

সার্জেন্ট ও অন্য একজন রক্ষী নিউমাকে ধরে এবং তারপর তার পায়ের বাঁধন খুলে ঘোড়ার উপর নিয়ে গিয়ে বসায়। লিতুমা তার পিছনে চড়ে বসে। লেফটেন্যান্ট ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর নিজেরটার বল্গা ধরেন।

"শুনুন, লেফটেন্যান্ট বলেন, তাঁর একটা পা রেকাবে। "তুমি?"

"হ্যাঁ, আমিই," জ্যামাইকান বলে ওঠে। "আর কে?"

"তুমি তো মুক্ত," লেফটেন্যান্ট বলেন। "তোমাকে আমাদের সঙ্গে আর আসতে হবে না। যেখানে খুশি তুমি চলে যাও।"

তাদের ঘোড়াগুলো থেকে লিতুমা আর অন্যসব রক্ষীরা হেসে ওঠে।

"এ' কী ধরনের রগড়?" জ্যামাইকান জিজ্ঞাসা করে। তার গলা কেঁপে ওঠে। "আপনারা আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যেতে পারেন না, শুনছেন কি, লেফটেন্যান্ট? আপনারা বনের হট্টগোল শুনতে পাচ্ছেন। আমি যথেষ্ট ভালো আচরণ করেছি। আমার যা করার করেছি। আপনারা আমার সঙ্গে এমন বদ আচরণ করতে পারেন না।"

লেফটেন্যান্ট রেকাব থেকে একটা পা ওঠান এবং কষে এক লাথি ছোঁড়েন জ্যামাইকানের দিকে, সজোরে।

"আমাদেরকে মাঝেমধ্যেই জোর কদমে ছুটতে হবে," লেফটেন্যান্ট বলেন। "মনে হচ্ছে খুব বৃষ্টি হবে, তাই নয় কি সার্জেন্ট লিতুমা?"

"না, আমার তো মনে হয় না। দেখছেন না আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার।"

"আপনারা আমাকে ছেড়ে যেতে পারেন না।" গলা ফাটিয়ে জ্যামাইকান জোর গলাবাজি শুরু করে।

সেনোরা মার্সেদিতাস উচ্চকিত কণ্ঠে হাসতে শুরু করেন। পেটে খিল ধরে যায়, তিনি পেটটা চেপে ধরেন।

"চলো যাওয়া যাক," লেফটেন্যান্ট বলেন।

"লেফটেন্যান্ট। লেফটেন্যান্ট।" জ্যামাইকান চিৎকার করে ওঠে। "পায়ে পড়ছি, দয়া করুন, লেফটেন্যান্ট, দয়া করুন।"

ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলো পা বাড়ায়। তাজ্জব হতবিহ্বল, জ্যামাইকান তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার বিকৃত মোচড়ানো মুখে ল্যাম্পের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে, জ্বলজ্বল করে। সেনোরা মার্সেদিতাস বজ্রগম্ভীর স্বরে হাসছেন, হেসেই চলেছেন। হঠাৎ তিনি শান্ত সমাহিত হয়ে পড়েন। হাত দু'টো পেয়ালার মতো গোল করে মুখ ঢাকেন।

"নিউমা।" তিনি চিৎকার করে ডেকে ওঠেন।" প্রতি রোববারে আমি তোমার জন্য ফল নিয়ে আসব।"

তারপর আবার তিনি হাসতে শুরু করেন। যত জোরে পারেন, তত জোরে। অরণ্যের মধ্যে থেকে গাছের ডালপালা ভেঙে খসে পড়ার শব্দ ওঠে, সেই শব্দে শুকনো ঝরা পাতাগুলো আরও খসখসিয়ে উঠতে থাকে।

ইতিহাস-বিষয়ক ধারণাগুলি ভীষণ গোলমেলে

গৌতম নিয়োগী

বাঙালির ইতিহাস-বিমুখতা এবং ইতিহাস-চেতনার অভাব বহুকালের। আবার একথাও ঠিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন বলেছিলেন 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। বিগত চার দশকের অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি এই চেতনায় অভাব এখনও সম্পূর্ণ দূর হয়নি; বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দুঃখের সঙ্গে জানতে পেরেছি তাঁদের তৃতীয় প্রজন্ম ডায়রি চিঠিপত্র বা দরকারি কাগজপত্র রক্ষা করার চেষ্টা করেননি। ইতিহাসচর্চা অবশ্য বিগত একশো, বিশেষত বিগত পঞ্চাশ বছরে বহুধাব্যাপ্ত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষে, বাঙালির 'ইতিহাস নাই' বলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আর্তি অনেকের মনে পড়বে। শুধু বাঙালি কেন, ভারতীয়দের ইতিহাস-চেতনারই প্রাচীন যুগে যথেষ্ট অভাব। কলহনের *রাজতরঙ্গিণী* একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ। রাজচরিত বা প্রশস্তি ধরছি না। একথাও অনেকাংশে সত্যি মধ্যযুগে ইতিহাসবোধ বা 'তাওয়ারিখ' (*তারিখ*) বিষয়ে ধারণা এসেছিলো ফারসি-আরবি ঘরানা থেকে। আমরা পেলাম জিয়াউদ্দিন বারাণী বা আবুল ফজলের মতো ইতিহাস লেখককে। আধুনিক যুগে ভারতবিদ্যা, প্রাচ্যবিদ্যা, পুরাবৃত্ত সবই সূত্রপাত ইয়োরোপীয়দের হাতে।

সাহেবী ইতিহাসচর্চা অবশ্যই নিরপেক্ষ ছিলো না; সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদদের উদ্দেশ্যমূলক কর্ম বোঝা কঠিন না। এদের অনেকেই এসেছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারের কাজ নিয়ে। তবু তাদের ভূমিকা স্মরণীয়। এশিয়াটিক সোসাইটির কাজকর্ম, *বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা* সহ নানা সূত্রাবলী প্রকাশ আর্কিও-লজিকাল সারভে প্রতিষ্ঠা এসব ভোলা উচিত নয়। আর সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চার নানাবিধ ত্রুটির জন্য, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ তা-ও অবশ্য ত্রুটিমুক্ত মতো ছিল। এর মধ্যে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্রের দুঃখ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর সাধারণ বইকে 'সুবর্ণের সৃষ্টি'র সঙ্গে তুলনা এবং ইতিহাস রচনায় আহ্বান বোঝা সহজ।

কিন্তু মুশকিল হলো, আবেগ দিয়ে ইতিহাস রচনা করা যায় না। ইতিহাস রচনায় প্রণালী জানা প্রয়োজন, নানাবিধ উপাদান-উপকরণ-উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন; সর্ববিধ পক্ষপাত বর্জন প্রয়োজন। বাঙালি আবার স্বভাবগতভাবে আবেগপ্রবণ, তারা গালগপ্পো ভালোবাসে, রোম্যান্টিক কল্পনায় তাদের প্রশ্রয়। ফলে ইতিহাসের নামে যা রচিত হতে লাগলো, তার একাংশ ইতিহাসপদবাচ্য, বাকি অধিকাংশই জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, অতিকথন বা মিথ্। সবাই তো আর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নন।

একালের কথা উহ্য রাখছি কারণ এখন ইতিহাসচর্চার জগতে নানা ঘরানা। শুধু তাই না, ইতিহাসের সংজ্ঞাই আমূল বদলে গেছে। আধুনিক যুগে তার অনেক প্রসার হয়েছে। কিন্তু বিংশ

শতাব্দীর গোড়া থেকেই ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক, তথ্যভিত্তিক অর্থাৎ পাথুরে প্রমাণ সহ ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। ইতিহাসের দর্শনে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়ে ভারতে। ইতিহাস বলতে মূলত 'রাজকাহিনী' বা রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝানো হলেও ক্রমে অন্যদিকে দৃষ্টি পড়তে থাকে। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী কে? এই নামে কোনও ইতিহাস লেখকের কথা জানি না। তার *বঙ্গীয় সমাজ* শীর্ষান্বিত বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৯৯ কিংবা ১৯০০ (১৩০৬ বঙ্গাব্দে)। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে লেখকের নামের পাশে বি এল ডিগ্রি দেখে অনুমান করি তিনি পেশায় উকিল। সে তো অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মশাই-ও আইনজীবী। কিন্তু সে যুগেই অক্ষয়কুমারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই সতীশ রায়চৌধুরীর কতো তফাৎ। *বঙ্গীয় সমাজ* বইটি প্রকাশের এক গালভরা উদ্দেশ্য ছিলো। তা হলো 'অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' রচনা। সেই উদ্দেশ্যে লেখক ডাহা ফেল। এহেন গ্রন্থ অত্যন্ত যত্ন নিয়ে (বর্তমান সংস্করণের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই অতি উত্তম), প্রভূত খরচা-পাতি করে পুনর্মুদ্রণ ক'রে প্রকাশক কেন নিজেদের 'গৌরবান্বিত' (ব্যাককভার বা পৃষ্ঠ প্রচ্ছদ ভাষ্য) বোধ করলেন, তা বোঝা দায়।

লেখক বা প্রকাশক কারও প্রতি আমাদের ব্যক্তিগতভাবে অসূয়া নেই। থাকার কথাও নয়। বরং লেখক যে ব্যাপারে সমৃদ্ধ ও কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন, তা যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। আর প্রকাশকের সদিচ্ছা এবং ব্যয়-বিনিয়োগের জন্য আমাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমরা নিরুপায়, শুধু অ্যাকাডেমিক স্বার্থেই এ সমালোচনা, তা রূঢ় মনে হলে কিছু করার নেই। ইতিহাসের নামে মিথ, জনশ্রুতি, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, কিংবদন্তী, ধাপ্পা, বুজরুকিতে সে সময় প্রাবল্য ছিলো। আজ একবিংশ শতাব্দীর পাঠক সে-সব পাঠ করতে যাবেন কেন?

সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত *বঙ্গীয় সমাজ* গ্রন্থের তিনটি খণ্ড। যাদের শিরোনাম যথাক্রমে 'বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণ', 'বঙ্গজ কায়স্থের যশোহের সমাজ' এবং 'টাকীর মুন্সী বংশ'। এর মধ্যে প্রথম খণ্ডে যোলোটি, দ্বিতীয় খণ্ডে কুড়িটি এবং তৃতীয় খণ্ডে সতেরোটি অধ্যায়। এই তিন খণ্ডের আগে 'অবতরণিকা [কায়স্থের বর্ণ, সামাজিক মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা নির্ণয়]' এবং 'হিন্দুসমাজ [বৌদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত]' নামে দুটি অংশ যুক্ত করেছেন। ব্যস্। আশ্চর্য। এই কি বাঙালি সমাজ? প্রশ্নটি হয়তো প্রকাশকের মনেও এসেছিলো। তাই 'প্রকাশকের কথা' লিখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন : "বঙ্গীয় সমাজ বললে যে বৃহৎ প্রেক্ষাপট ভেসে ওঠে, এই গ্রন্থে তা অনুপস্থিত।...চন্দ্রদ্বীপে বাকলা সমাজ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পিতৃব্য বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহের সমাজ এবং টাকীর মুন্সীবংশের কথা এই গ্রন্থের মূল অবলম্বন।" ঠিক কথা, তবে এই গ্রন্থ 'নির্মোহ দৃষ্টিকোণ' থেকে আলোচিত আদৌ নয়; 'ইতিহাসের এই ধারা অভিনব' তো নয়ই বরং ভ্রান্ত এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধর্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চায় সম্পূর্ণ অচল।

ইতিহাস-মনস্ক যে-কোনও সাধারণ বাঙালি পাঠক-পাঠিকার প্রশ্ন করার অধিকার আছে 'বঙ্গীয় সমাজ' মানে কি শুধুই হিন্দুসমাজ? অখণ্ড বঙ্গের বিপুল সংখ্যক বাঙালি মুসলমান কি সমাজের বাইরে? চট্টগ্রামের বহু বাঙালি ধর্মে বৌদ্ধ, তারা কি সমাজের অন্তর্গত নয়? বাঙালি খ্রিষ্টানেরা? আবার, এ প্রশ্নও পাঠকবর্গ করতে পারেন শুধু হিন্দুসমাজই যদি ধরি, তাহলেও

কি ব্রাহ্মণ-কায়স্থই সব? বিপুল সংখ্যক মানুষ, যাঁরাই গরিষ্ঠ অথচ শ্রমজীবী শূদ্র বলে যাদের দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তারা বঙ্গীয়-সমাজ বহির্ভূত? আসলে 'বঙ্গীয় সমাজ' নামকরণটি সার্থক এবং যুক্তিযুক্ত নয়। ইতিহাসের এমন সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অধুনা অপাংক্তেয়।

আসলে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীদের মতন মানুষদের ইতিহাস-চেতনা এবং ইতিহাসবোধেই গণ্ডগোল। এই ধরনের লেখার পালের গোদা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮), যিনি পণ্ডিত মানুষ, বাংলায় বিশ্বকোষ বহু খণ্ডের রচনার জন্য স্মরণীয় কিন্তু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-এর খণ্ডগুলি অধুনা কেউ ছুঁয়েও দেখে না। আধুনিক পণ্ডিত ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যখন বাংলার নয় 'বাঙালীর ইতিহাস' লিখলেন, তখন এই প্রকৃত ইতিহাসকে স্বাগত জানিয়ে ইতিহাসচার্য যদুনাথ সরকার বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছিলেন :

> এই গ্রন্থ বাঙালীর লোক-ইতিহাস; ইহাতে বাঙালীর জনসাধারণের, বাঙালী জাতির সমগ্র জীবন-ধারার যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য আদ্যন্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং, বলা যাইতে পারে, এই ঐতিহাসিক কাজটির 'নায়ক' রাজবংশ নহে, ধনী সমাজ নহে, পণ্ডিতবর্গ নহে, জাতীয় চিন্তায় শিক্ষিত নেতাদের সমাজ নহে—যাহাদের বলা হয় জনসাধারণ, যাঁহারা উচ্চবর্ণ সমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে, যাহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাহারাই এই ইতিকথার 'নায়ক'—যদিও নীহাররঞ্জন প্রথমোক্ত শ্রেণী ও লোকেদেরও ভুলেন নাই, তাহাদের ইতিহাসও বাদ দেন নাই।

বলাবাহুল্য, নীহাররঞ্জন রায়ের সার্থকতা সমাজ-ইতিহাসের সঠিক সংজ্ঞা বুঝতে পারার জন্য, সেজন্য আচার্য যদুনাথ গ্রন্থটিকে 'অমূল্য গ্রন্থ' বলেছিলেন। যদিও সেই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক নতুন উপাদান পাওয়া গেছে, নতুন গ্রন্থ বেরিয়েছে। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো লেখকের ব্যর্থতা 'বঙ্গীয় সমাজ' কাকে বলে তা বুঝতে না পারার জন্য।

লেখকের 'ভূমিকা'র প্রথম লাইন থেকেই আধুনিক ইতিহাসবেত্তারা হোঁচট খাবেন। লেখকের মন্তব্য :

> প্রায় নয় শত বর্ষ অতীত হইল, মহারাজ আদিশূর বৌদ্ধবিপ্লবান্তে বহুদিনের ব্রাহ্মণ্যহীন বঙ্গদেশে, বঙ্গভূমে, বিক্রমপুর নগরে, হিন্দু রাষ্ট্র সংস্থাপন সহকারে হিন্দুভাবে বঙ্গীয় সমাজ সংগঠন করিয়াছিলেন।

ন'শো বছর আগে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দী। তখন 'হিন্দুভাবে বঙ্গীয় সমাজ' সংগঠিত হলো। তাহলে তার আগে বাঙালি সমাজ ছিলো না? তাহলে গৌড় অধিপতি শশাঙ্ক হাওয়ায় ভেসে ছিলেন? বৌদ্ধ বিপ্লব অন্তে মানে কি? লেখক যদি পাল যুগ বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন সেকালে কি বাঙালি সমাজ ছিলো না? শেষ এবং সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন 'মহারাজ আদিশূর' বলে আদৌ কি কেউ ছিলেন? এই শেষ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ইতিহাসপ্রবর রমেশচন্দ্র মজুমদার হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নীহাররঞ্জন রায় থেকে দীনেশচন্দ্র সরকার, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাক্ষ্য নিন যাঁরা প্রাচীন যুগ বিশেষজ্ঞ, ইতিবাচক উত্তর পাবেন না।

আদিশূরের ঢপকীর্তন আমরা দুশো বছর ধরে শুনছি। এই তথাকথিত আদিশূরের কোনও মুদ্রা পাওয়া গেছে? না। আদিশূরের কোনও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। না। তার কোনও তাম্রশাসন পাওয়া গেছে? না। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, নেই। সমসাময়িক সাহিত্যে আছে কি? না, তা-ও নেই। পাল রাজা রামপালকে নিয়ে যেমন লিখেছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী (*রামচরিত*) বা বল্লালসেন নিজে যেমন লিখেছিলেন (*দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর*)। তাহলে আদিশূর এলেন কোথেকে? তিনি ছিলেন লোকশ্রুতি আর কিংবদন্তীতে। আর তার ভিত্তি অর্বাচীন কুলজী সাহিত্য। কুলজী গুলি যে নানা প্রকার গালগল্পে ভরা। বিচিত্র সব অসংগতি সেখানে আছে। ইতিহাসের বিচারে কোনও কুলজী গ্রন্থেরই রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের আগে নয়। কুলজী গ্রন্থ যে উপাদান হিসেবে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, রমাপ্রসাদ চন্দ থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত অনেকেই যুক্তিতথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে-সব পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আচার্য যদুনাথ তো 'অমুক জাতির ইতিহাস' শ্রেণীর বইগুলিকে 'গুলিখুরী মত ও প্রবাদে অন্ধ বিশ্বাস' পর্যন্ত বলেছেন। আমি শুধু ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধার করছি :

> ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের অনেক পণ্ডিত এইসব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কুলজী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং এখনও অনেক কৌলীন্যমর্যাদাগর্বিত ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থ বংশ এইসব কুলজী সাক্ষ্যের উপরই নিজেদের বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

এক একটি নিদর্শন সতীশচন্দ্র রায়ের *বঙ্গীয় সমাজ*। কুলজী গ্রন্থগুলিতে শুধু আদিশূর নয়, তার পৌত্র ক্ষিতিশূর এবং তস্যপুত্র ধরাশূরের উল্লেখ আছে। এদের নামও কিন্তু ইতিহাসে অজ্ঞাত। আদিশূরকে নিয়ে লেখক প্রথম খণ্ডের অধ্যায় প্রথম ব্যয় করেছেন। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন যে মহারাজ আদিশূর

> বিক্রমপুর সমাজ নামক এক হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্বারা দেশের নিষ্ঠাবান বা সদাচার, ক্রিয়াশীলতা বা সৎপ্রকৃতির বশে কার্য্য করা, চরিত্রবল এবং বংশবিশুদ্ধি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখানেও এটি আপ্তবাক্য, লেখকের বক্তব্যের কোনও প্রমাণ ইতিহাসে নেই। আবার একটি মন্তব্য :

> তাঁহারই পুত্রোষ্টি যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ ওই দেশে আগমন করেন, তাহাদেরই সন্তানগণ তদবধি বঙ্গীয় সমাজ পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

আবার সেই লোকশ্রুতি ও কিংবদন্তীর ফাটা রেকর্ড। ইতিহাসে এর কোনও প্রমাণ আদৌ নেই। আর পরিচালনা উত্তরকালে দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কেমন করেছিলেন তার নিদর্শন বাঙালি হিন্দু সমাজে স্মৃতির দাপট, ব্রাহ্মণদের কায়েমী স্বার্থ আর সতীদাহ-বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ-গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি সামাজিক কুৎসিৎ, ভয়াবহ এবং অমানবিক রীতিনীতি।

সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী আরও একটি মন্তব্য করেছেন যা ইতিহাসের দিক থেকে গোলমেলের সেটি আগে শুনে নেওয়া যাক :

> মহারাজ আদিশূর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গদেশের বা পঞ্চগৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার শতবর্ষ পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজাধিরাজ বল্লাল সেন পিতৃগণের প্রিয় রাজধানী বিক্রমপুর নগরে, বঙ্গের জাতীয় সামাজিক অধিবেশনে সহকারে, এইদেশে কৌলীন্যপ্রথা স্থাপন করেন।

প্রথমত, আদিশূরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রপৌত্র বল্লাল সেন ওই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? ইতিহাসে যতদূর জানা যায়, বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন, তার পিতা হেমন্ত সেন, তার পিতা সামন্ত সেন। দ্বিতীয়ত, সেন বংশীয়রা বাঙালিই নন। তারা এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে। আর তারা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ নন, ক্ষত্রিয়। উনিশ শতকে কোনও লেখক সেনরাজাদের বৈদ্য দাবি করে উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। বল্লাল সেনের রাজত্বকাল দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে নয়, আনুমনিক ১১৫৮-১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' এর প্রথম খণ্ডে 'দ্য ক্রনোলজি অফ দ্য সেন কিংস্' দ্রষ্টব্য)। চতুর্থত, বিক্রমপুর রাজধানী হয় লক্ষ্মণ সেনের সময়, যখন তিনি রাজধানী নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে যান। শেষ কথা, কৌলীন্যপ্রথাও যে বল্লাল সেন চালু করেছিলেন, তারও কোনও সমসাময়িক প্রমাণ নেই।

বস্তুতপক্ষে পাল-সেন যুগ অনেক সময় সাধারণভাবে একত্রে উচ্চরিত হয় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক কিন্তু একটি তথ্য উল্লেখ্য : পালরাজগণ ছিলেন বাঙালি। সেন রাজারা আদতে অ-বাঙালি। আশ্চর্যের ব্যাপার লেখক যে সাম্প্রদায়িক ভাষ্যে বিশ্বাসী তাতে বাঙালি সমাজ শুরু হচ্ছে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। আরে বাবা, তার আগে খ্রিষ্টপূর্বের কথা ছেড়েই দিলাম, প্রথম থেকে দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালি সমাজের অবস্থা কেমন, তা পাঠকরা জানতে চাইবেন না? শশাঙ্কের আমল বাদ? নানাক্ষেত্রে উৎকর্ষে উজ্জীবিত পাল যুগবাদ? ঠিকই যে প্রাচীন যুগে অর্থাৎ কোনও বাংলাদেশ ছিলো না, নানা এলাকায় নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিলো কিন্তু বাঙালি তো সর্বত্র। রাষ্ট্রবিন্যাসে মাঝে মাঝেই সামন্ততান্ত্রিক কিন্তু তারই মধ্যে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি গোপালদেব কর্তৃক পাল শাসনের সূত্রপাত। দ্বাদশ শতকের তৃতীয় দশকে গোবিন্দপাল পর্যন্ত এই বংশ ঠিক থাকলেও একাদশ শতক থেকেই অবক্ষয়ের সূচনা। নানা বহিরাগত আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এর কারণ; রামপালের সাময়িক ক্ষমতা বাদ দিলে আবার রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশা; পরস্পর ঈর্ষাপরায়ণ ও বিবদমান সামন্ততন্ত্র। পালরাজত্বের একেবারে শেষ দিকে দুর্বলতার সুযোগে সামন্তশ্রেণী ক্ষমতাবান হয়—এদের মধ্যে শূর, বর্মন, সেন বংশ—যারা কেউই আদতে বাঙালি নন। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে যে শূর বংশ ছিলো, তাতেও আদিশূর নাম পাওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত কর্ণাটক আগত সেন বংশই ক্ষমতাবান হত। রাষ্ট্রবিন্যাস বাদ দিয়ে যদি সমাজের দিকে তাকাই, তাহলেও দেখি পালযুগে যেখানে সমন্বয় ও সমীকরণ, সেন যুগে যেখানে বিভেদ ও বৈষম্যের রমরমা।

ফলে সমাজ দুর্বল তো হবেই। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় তাই তুর্কি আক্রমণের সময় লক্ষ্মণ সেনের না পালিয়ে উপায় কি। সতীশচন্দ্র 'যবন বিপ্লব' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, তা নিন্দনীয়।

জাতিভেদ দীর্ণ সমাজের ইতিহাস লেখক বর্ণনা করেছেন প্রথম খণ্ডে। বিশেষত বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নিয়ে যতখানি উচ্ছ্বাস, স্বাভাবিকভাবেই তিনি, সদগোপ, কৈবর্ত্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, উগ্র ক্ষত্রিয়, স্বর্ণকার, কর্মকার, প্রভৃতিদের সম্পর্কে তা নেই। সতীশচন্দ্রের কাছে তা প্রত্যাশিত। বাঙালি সমাজ নিয়ে বই লিখব অথচ সেই সমাজকে যিনি সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা দিলেন—যিনি মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা না করা অমার্জনীয়। সুলতানি, মোগল এবং ইংরেজ যুগ সম্পর্কেও তাই ইতিহাসবোধ নিতান্ত সীমিত।

তবে কি *বঙ্গীয় সমাজ* একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। না, তা নয়। 'বঙ্গজ কায়স্থের যশোহর সমাজ' বিষয়ে তিনি প্রভূত তথ্য উদ্ধার করেছেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে তিনি নিরপেক্ষ। বেশ কিছু বংশের ইতিহাস তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। বিশেষত টাকীর মুন্সী (রায়চৌধুরী) সম্পর্কে তিনি খুবই সমৃদ্ধ। রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কালীনাথ মুন্সী (রায়চৌধুরী) সম্পর্কে তথ্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। রায়চৌধুরী পরিবারের একশাখা কোলকাতার উত্তর শহরতলী বরানগরে থাকতেন। যেমন মুর্শিদাবাদের কান্দির সিংহ পরিবার থাকতেন পাইকপাড়ায়। আঠারো-উনিশ শতকের বহু তথ্য লেখক সন্নিবিষ্ট করেছেন। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ভাষাও বঙ্কিমী রীতির সাধুভাষা হলেও সহজ ও সাবলীল।

বঙ্গীয় সমাজ/সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত/প্রথম প্রকাশ ১৩০৬ সাল/নূতন সং ২০১২/সোপান/ ৩০০ টাকা।

এক জাতীয় বিপ্লবীর আত্মত্যাগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস

গৌতম নিয়োগী

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় বিপ্লবী সমাজের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা ইতিহাসে যতখানি স্থান পাওয়া উচিত ছিলো, তা তাঁরা পাননি। এজন্য আমাদের মতন পেশাদার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইতিহাসচর্চাবিদগণ তাঁদের দায় এড়াতে পারেন না। তবে একেবারে কাজ হয়নি, তা-ও না। বহু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। আনন্দের কথা সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় একথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই শেষপর্যন্ত ভারতে যে সাফল্য লাভ করলো, ব্রিটিশ সরকার যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবাসীকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হলো, তার এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত আছে। এবং এই সাফল্য লাভ একক দল বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কৃতিত্বে আসেনি। স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পর এ-কথা মান্যতা পেয়েছে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বস্তুত, বহু ধারা এবং উপধারা ছিলো আর সব ধারার মিলিত অবদানে, বহু মানুষের কান্না-ঘাম-রক্তের বিনিময়ে, অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা।

শুধু কি ঐতিহাসিকদের ঔদাসীন্য? স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকার ও দল, এবং পরান্নভোজী একশ্রেণির লেখক ও সংবাদমাধ্যম এমনভাবে ঢক্কানিনাদে প্রচার করেছেন যে সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে যে অহিংসা-অসহযোগ-আইন অমান্যের পথেই দেশে স্বাধীনতা এসেছে। গান্ধি-প্রদর্শিত পন্থা, জাতীয় কংগ্রেস বা নেহরু পরিবারের গরিমা বিন্দুমাত্র খাটো না করেও বলা দরকার এরাই পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সবচেয়ে পরে। কংগ্রেসের ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রথম চেয়েছিলেন যাঁরা তারা জাতীয় বিপ্লবী এবং তাদের লক্ষ্য ছিলো সমস্ত বৈপ্লবিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। এই পথ ঠিক না ভুল, তাদের প্রকৃত অবদান কতখানি তা নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনা হতে পারে কিন্তু ইতিহাস থেকে তাদের মুছে ফেলার চেষ্টা অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ এই বিপ্লবীরাই আত্মত্যাগ করেছিলো সবচেয়ে বেশি। ফাঁসির মঞ্চে আন্দামানে নির্বাসনে তারাই জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। তাঁদের দুর্জয় সংকল্প, নিখাদ দেশপ্রেম, অটুট নিষ্ঠা এবং প্রত্যয়ী কর্মে কোনও খাদ ছিলো না। বিপ্লব পন্থার নিজে শরিক না হয়ে বিপ্লবী আন্তরিকতাকে তাই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই তবু কেন নানা যুগে বিপ্লবীদের চিন্তা থেকে কংগ্রেস পিছিয়ে ছিলেন বলে মন্তব্য করেছি তার অন্তত দুটি উদাহরণ দেওয়া দরকার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই, ১৯০৬-১৯০৯ পর্বে বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ যখন 'absolute autonomy free from foreign control' এর উচ্চারণ করেন। তখন নরমপন্থী কংগ্রেস। গোখেল-রানাডে-সুরেন্দ্রনাথের দল মনে করত, 'কেবলমাত্র পাগলা-পারদের মানুষরাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা

চিন্তা করতে পারেন'। আবার পরবর্তী যুগে দেখুন, ১৯২১-এ বিদেশ থেকে ভারতে ফিরে এলেন বিপ্লবী হসরৎ মোহানি এবং পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে যখন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনতে চাইলেন, তখন তাকে নেতৃবৃন্দ পাত্তাই দিলেন না। এমনকি, ১৯২৮-এ মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যখন এই কোলকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হলো, তখন গান্ধি সমেত নেতৃবৃন্দ 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' চাইছেন। ইতিহাস বলে, পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব নিতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো; যখন ইরাবতী নদীর তীরে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস যেমন কম লেখা হয়েছে, তেমনি বিপ্লবীদের সঠিক তথ্য নির্ভর জীবনীও কম। এই প্রেক্ষিতে নির্মলকুমার নাগের দীনেশ জীবনীটি পাঠ করে খুব খুশি হলাম। অসম্ভব ভালো কাজ। তাঁকে অজস্র অভিনন্দন। সাতাশ বছরে যে প্রাণ অকালে চলে গিয়েছিলো, তাকে তিনি বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অমোঘ বাক্য—'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'—মনে পড়বে। তাই বর্তমান প্রজন্ম তাঁর কথা মনে রাখেনি, এমনকি তাঁর জন্ম-শতবর্ষেও তেমন আলোচনা হয়নি। কিছু মানুষ আবার বিপ্লবী দীনেশ বলতে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' ভাবেন বটে কিন্তু সেই দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-১৯৩১) ভিন্ন ব্যক্তি। যদিও উভয় দীনেশের মূল লক্ষ্য অভিন্ন। দীনেশ গুপ্ত ঢাকা জেলার সন্তান। যেমন ছিলেন ঢাকার অপর দুই সুসন্তান বিপ্লবী বিনয় বসু (১৯০৮-১৯৩০) এবং বাদল গুপ্ত (১৯১২-১৯৩০)। আর সমালোচ্য বইটি 'বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র মজুমদার' উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট অঞ্চলের মানুষ।

ওই বসিরহাট শহরেই দীনেশ মজুমদারের স্মৃতিরক্ষা কমিটি হয়েছিলো, জন্মশতবর্ষে (২০০৭) কিছু অনুষ্ঠান হয়েছিলো, কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়া, কোলকাতায় বিবাদী বাগের এক কোণায় শহিদ দীনেশ মজুমদার এবং তাঁর সঙ্গী শহিদ অনুজা সেন-এর (ইনি খুলনা জেলার লোক) আত্মত্যাগের স্মরণে একটি ফলক বসানো আছে। যেমন ফলক আছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে (বিধান সরণি) যে বাড়িতে দীনেশরা ধরা পড়েছিলেন যে বাড়ির সামনেও। এমনকি, নিউ আলিপুরে একটি রাস্তাও তাঁর নামাঙ্কিত। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। স্থায়ী কাজ, ইতিহাসের কাজ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর কাজ বাকি ছিলো। তা এত দিনে পূর্ণ করলেন নির্মলকুমার নাগ। এ-বিষয়ে তাঁর যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। এর আগে শহিদ প্রফুল্ল চাকী সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ আমি সংগ্রহ ক'রে পড়েছি এবং এখনও পড়া না হলেও জেনেছি তিনি অগ্নিযুগ সম্বন্ধেও একটি বই লিখেছেন। বর্তমান বইটি অতি সুদৃশ্যভাবে মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সোপান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

নির্মলকুমার নাগ লিখেছেন :

> বলে থাকি, প্রত্যেক প্রজন্মে নতুন করে ইতিহাস লেখা হয়। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান প্রজন্ম বেছে নেয় সবচেয়ে উপযোগী মত ও পথ, ভবিষ্যতে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এই আশায়। বিপ্লবের আঙিনায় দীনেশ শুধুমাত্র এক ব্যক্তি হিসেবে আসেননি, এসেছিলেন এ-যুগের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে। এ যুগের

> তপস্যা-সাধনা ছিল মানুষকে সর্বপ্রকারে মুক্ত করা। এই মুক্ত মানুষের বিশ্বে থাকবে না কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের শোষণ-পীড়ন-দমন, থাকবে না অসাম্য, অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য। সমাজের সার্বিক কল্যাণই সেখানে একান্ত কাম্য।

কথাটি সত্যি। কিন্তু একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রথমত, বিপ্লবী দু'ধরনের। প্রথম দল জাতীয় বিপ্লবী (National Revolutionaries), যাঁরা জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পরাধীনতা থেকে মুক্তি। দ্বিতীয় দল হলো সাম্যবাদী বিপ্লবী (Socialist Revolutionaries), শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে অবশ্য জাতীয় বিপ্লবীদের একটি অংশ রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এবং মার্ক্সবাদী সাহিত্য পাঠ ক'রে এবং ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতালাভ এবং সমাজ বদলের স্বপ্ন দুইই দেখতেন।

দীনেশ মজুমদার ছিলেন যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। যুগান্তর কি কোনও স্বতন্ত্র দল? তাহলে তার প্রতিষ্ঠা কখন? ডা: যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৭১) লিখেছেন, "ইতিহাসের গতিতে ১৯১৫ সালের পর এই নাম এসে যায়।" কিন্তু মতান্তরে যুগান্তর গোষ্ঠীর আদি বিপ্লবীদের মতে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের পর বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত বিপ্লবীবৃন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাসভবনে এক গোপন সভায় মিলিত হন এবং সেই সভায় তারা 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিপ্লবতত্ত্ব ও আদর্শকে সমর্থন করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের বাণীবাহী এই পত্রিকা গোষ্ঠীর পশ্চাতে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করলেন। পত্রিকা সম্পাদকের কোনও নাম থাকত না। পরিচালনা ছিল এক গোষ্ঠীর হাতে, যে গোষ্ঠীতে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। ব্রিটিশ সরকার এই গোষ্ঠীকে নাম দেন 'যুগান্তর দল'। বস্তুত তারা স্বতন্ত্র দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তারা ছিলো 'অনুশীলন সমিতি' (প্রতিষ্ঠা ১৯০২)-এর মধ্যে এক গোষ্ঠী।

দীনেশচন্দ্র মজুমদার চব্বিশ পরগনার বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করেন আমরা সবাই জানি, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। তাও জানি, কিন্তু জন্ম তারিখ অজানা। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বা কমলা দাশগুপ্তের লেখায় পাইনি। সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধানেও নেই। নির্মলকুমার নাগের কাছে আশা করেছিলাম কিন্তু বাবা-মায়ের নাম, বংশ-তালিকা দিলেও জন্মতারিখ জানাতে পারেননি। তবে এই বাহ্য। দীনেশের কর্মকৃতি তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

কলেজে পড়ার সময়ই দীনেশ যুগান্তর গোষ্ঠীতে যোগ দেন। দলের নির্দেশে তিনি বগুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিপ্লবী সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। তিনি পরিচিত হন কোলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে (দলে ছিলেন অতুল সেন, অনুজা সেন এবং শৈলেন নিয়োগী) ১৯৩০-এর ২৫শে আগস্ট। উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু ১৯৩২ খ্রি. মেদিনীপুর জেল থেকে তিনি দুঃসাহসিকভাবে পালাতে সমর্থ হন ফেব্রুয়ারি মাসে তবে পালাতে গিয়ে পায়ে সাংঘাতিক আঘাত পান। এরপর তার সংগ্রামী দুঃসহ জীবন। কখনও কোলকাতা, কখনও বর্ধমানের রানিগঞ্জ,

শেষ পর্যন্ত ফরাসি-শাসিত চন্দননগর, শেষে আবার কোলকাতা। আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়ানো। জেল পালানোর সময় থেকে পা প্রায় ভাঙা, খাওয়া দাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। ফলে টিবি রোগে আক্রান্ত হওয়া। এসময়ের মধ্যেই দীনেশ সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন কয়েকবার। কোলকাতার *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকায় ভারত-বিদ্বেষী সম্পাদক ওয়াটসন-কে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় (আক্রমণ হয়েছিল দু'বার, ১৯৩২ ৩০ আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে কিন্তু ওয়াটসন প্রাণে বেঁচে যান) এবং চন্দনগরের পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুঁই নিহত হওয়ার ঘটনায় (মার্চ, ১৯৩০)। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ এর ২২ মে উত্তর কলকাতার চিত্রা সিনেমা হলের (এখন যার নাম মিত্রা) কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের যে বাড়িতে এক ফ্ল্যাটে নারায়ণদাস ব্যানার্জীর কাছে দীনেশ থাকতেন অন্য দুই ফেরারী নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর সঙ্গে সেই চারতলার বাড়ি রাতে বা ভোর তিনটের সময় পুলিশ ঘিরে ফেলে। শুরু হয় অসম লড়াই; শেষ বুলেট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে বিপ্লবীরা আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। বিচারে নারায়ণদাস ব্যানার্জী খালাস পান; নলিনীমোহন দাস এবং জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং দীনেশের মৃত্যুদণ্ড। তাকে রাখা হয়েছিলো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ খ্রি. ৯ জুন ফাঁসি হয় দীনেশ মজুমদারের। এই হলো সংক্ষিপ্ত জীবন।

এই জীবনই বিস্তারিত ক'রে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন সহজ ও সাবলীল ভাষায়। পাঁচটি অধ্যায়ে তিনি বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলি যথাক্রমে 'ভূমিকা', 'টেগার্ট হত্যা-প্রয়াস পর্ব', 'মেদিনীপুর জেল থেকে মেদিনীপুর পর্ব', 'শেষ সংগ্রাম' এবং 'দীনেশ ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিপ্লবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী'। এর মধ্যে ভূমিকা পর্বটি আর একটু বড়ো আকারে লিখলে পাঠক-পাঠিকাদের বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমি এবং প্রাক্-দীনেশ মজুমদারের পর্ব বুঝতে সুবিধে হত। তবে দীনেশ মজুদার বিষয়ে তিনি গবেষণায় ফাঁক রাখেননি। ডা: যতীন্দ্রনাথ ঘোষালই বাঘাযতীনের এক যোগ্য উত্তরাধিকারী এবং তিনিই যে দীনেশ মজুমদার তথা বসিরহাটে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই তথ্য সঠিক। শেষ কয়টি অধ্যায় সুলিখিত এবং প্রামাণিক তথ্যাশ্রয়ী। দীনেশ মজুমদার সম্পর্কে আমি প্রথম জানি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কমলা দাশগুপ্তের *রক্তের অক্ষরে* বইটি পাঠ করে। তারপর শুনি কমলাদির (চ্যাটার্জী/মুখার্জী) মুখে; পড়ি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনী দাস, কালীচরণ ঘোষ প্রমুখের বই। কিন্তু সানন্দে স্বীকার করি, এত বিস্তারিত জানতাম না। সেজন্য কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট অনেকে ভাবেন ইংরেজ, লেখক সঠিকভাবেই জানিয়েছেন তিনি আদতে আইরিশ। আইরিশ বলতেই ইংল্যাণ্ড-বিরোধী মনে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু আজীবন ইংল্যাণ্ডের তথা ব্রিটেনের পদসেবা করা কিছু মানুষ ছিলো। বাংলার বিপ্লবীদের বিষ নজরে একদা যেমন ছিলেন বিচারপতি ডগলাস কিংসফোর্ড, তেমনি পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, দুজনকেই বিপ্লবীরা একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেও হত্যা করতে পারেননি। আর একটি ব্যাপার নির্মলকুমার নাগকে সকৃতজ্ঞচিত্তে সাধুবাদ জানাই, তা হলো ফাঁসির আগে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে লেখা তিনটি চিঠি প্রকাশ করার জন্য। আমরা এতদিন বিনয়-বাদল-দীনেশ এর অন্যতম দীনেশ

কিছু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

প্রসূন মাঝি

রবীন্দ্র পূজা নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি—এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় সমালোচ্য বইটি হাতে নিয়ে। আবার হাতে চাঁদ পেয়েছি—অতিশয়োক্তি করেও একথা কোনো বই সম্পর্কে বলা যায় না। পঞ্চানন মালাকারের 'নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি হাতে পেয়ে এমনই এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে পাঠকের অনুভবের জগতে। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছবি, ছোটোদের জন্য ছড়া। আত্মজীবনী, লোকসংস্কৃতি, ধর্মচেতনা, হাস্যকৌতুক হেঁয়ালি নাটক, সাম্যবাদী চেতনা, গদ্যকাব্য, উপন্যাস এবং নির্দিষ্ট দুটি নাটকের আলোচনা এবং রবীন্দ্র চিত্রকলা অর্থাৎ রবীন্দ্রসৃষ্টির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন লেখক।

'ছড়ার ছবি' অধ্যায়ে লেখক মন্তব্য করেছেন—"রবীন্দ্রনাথের রচনারগুণে তুচ্ছ বিষয় কেমন আকর্ষণীয় হয় তা 'ছড়ার ছবি' পড়লেই বোঝা যায়। শিশুদের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এমন একখানি মনকাড়া গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলেই আমরা তাঁর মনের জগতের এক অনাবিষ্কৃত কুঠুরির সন্ধান পেয়ে যাই।" যথার্থই বলেছেন লেখক। সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির জগতে শিশুদের নিয়ে ভাবনা অনেক সময় ফিকে হয়ে যায়। কিন্তু কবিগুরুর চেতনার জগতে শিশুরা অন্যতম গুরুত্ব পেয়েছে। এই দিকটি লেখক সুন্দরভাবে পর্যালোচনা করেছেন।

ছোটোদের কবি রবীন্দ্রনাথ অংশে লেখক বলছেন—"ছোটদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যাও কম নয়।" 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', কাব্যগ্রন্থে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে তা সবই ছোটোদের কথা ভেবে রচিত। পৃথিবীতে শিশুর মন যেমন নানান প্রশ্ন নিয়ে অবাক দৃষ্টি মেলে, তেমনি করে চেনা কী বড়োদের পক্ষে সম্ভব। কবিতাংশের যে অংশগুলি উদাহরণ হিসেবে লেখক ব্যবহার করেছেন তা যথাযথ। যেমন—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

'কবির ব্যতিক্রমী আত্মজীবনী : আত্মপরিচয়' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন লেখক। 'বেঙ্গলী পত্রিকা'-র সহকারী সম্পাদক পদ্মিনী মোহন নিয়োগীকে লিখেছিলেন, "আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবন-চরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য নহে।" লেখক সঠিক ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী হলেও তা মানুষ রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ কী করে সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মদর্শন করেছেন সেকথাই এই গ্রন্থের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে আত্মজীবনীটিকে ব্যতিক্রমী বলা যথাযথ মূল্যায়ন।

'লোকসংস্কৃতির আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ের সূচনাতেই লেখক মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যভাবনাকে কতভাবে উস্‌কে দিয়েছেন, তা ভাবলে অবাক হতে

হয়।' সত্যিই এব্যাপারে বড় বিস্ময় জাগে। লোকসাহিত্য, ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলি ছড়া, গ্রাম্যসাহিত্য ইত্যাদি গ্রন্থগুলির কথা আলোচনায় এনেছেন। তবে এপ্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ এলে আলোচনাটি আরও সুন্দর হত। কারণ রবীন্দ্রস্নেহধন্য বলেন্দ্র সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং লোকসাহিত্যের প্রভাব সর্বজনবিদিত।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা প্রবন্ধটিতে লেখকের রবীন্দ্রচর্চার গভীরতা ধরা পড়েছে শেষ অনুচ্ছেদে। সমস্ত প্রবন্ধ জুড়ে আলোচনার যে রসবিস্তার তিনি ঘটিয়েছেন তার সার যেন তুলে দিলেন শেষ অনুচ্ছেদটিতে। যেখানে তিনি বলেছেন—"...তিনি মানুষের মানবিক প্রেমের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। মানুষকে প্রেমের সম্পর্কে বুকে টেনে নিয়ে সব বাধা-ব্যবধান মুছে ফেলে দিতে পারলেই মানুষ তার নিজের ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারবে।

'রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালি নাট্য' প্রবন্ধটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি অংশ। তবে 'সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তিনি কলম ধরেননি।' মন্তব্যের সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, কবিগুরু কিন্তু 'মহাকাব্য' লেখেননি। তবে হেঁয়ালি নাট্য সম্পর্কিত লেখকের মূল্যায়ন সঠিক। মানুষের কর্মময় জীবনে আমোদপ্রমোদের প্রয়োজন আছে। মানুষকে কাজ করতে গেলে অবসর বিনোদনের পথ হিসাবে কৌতুকনাট্যের অবতারণার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ, —এই মন্তব্য সকল মানুষেরই মনের কথা।

সাম্যবাদী চেতনা, গদ্যকাব্য লিপিকা, বিসর্জন নাটকের উৎস, সাংকেতিক নাটক রাজা সম্পর্কিত আলোচনা যথাযথ। এবং বিষয়গুলি বহু আলোচিত। তবে আলোচিত বিষয়কে নিয়ে আলোচনার সময় সে নিজস্বতা ও মৌলিক চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর লেখক রেখেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। 'চোখের বালি' উপন্যাসের মনস্তত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধটি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

তেরোটি অধ্যায় জুড়ে লেখক পঞ্চানন মালাকার যে বিষয়বৈচিত্র্য বজায় রেখেছেন, তা অন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায় "সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'" অধ্যায়টিতে। এই অধ্যায়টি সংযুক্ত না হলে গ্রন্থটি অপূর্ণ থেকে যেত। লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে ডুব দিয়ে রত্ন সদৃশ মূল্যবান কিছু দিক পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। তবে প্রকাশক আর একটু যত্নবান হলে গ্রন্থটি অন্যমাত্রা পেত। মনে রাখতে হবে গ্রন্থ নির্মাণও কিন্তু একটি শিল্প। সেখানে ফাঁক থেকে গেলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়। তবুও রবীন্দ্রচর্চার জগতে গ্রন্থটি নবতম সংযোজন এবং সংগ্রহে রাখার মতো একটি গ্রন্থ।

নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ/পঞ্চানন মালাকার/অনিমা প্রকাশনী/১৫০ টাকা।

লেখকের সৎ অঙ্গীকারের মহত্তম ফসল

স্বস্তি মণ্ডল

অমর মিত্র আজকের সময়ের একজন খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। ছোটোগল্প, উপন্যাস দুই শাখাতেই তাঁর ব্যতিক্রমী সাফল্য নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ১৯৭৪ থেকে আজ ২০১৪র শেষেও তাঁর গল্প উপন্যাসে তিনি সন্ধানী দৃষ্টি ও সংবেদনশীল মন নিয়ে খুঁজে চলেছেন কত কাল ধরে যেসব মানুষ অপরিসীম জীবনেচ্ছা নিয়ে অরণ্য, পাহাড়, নদী-কন্দর, সাগর সংলগ্ন মোহানায় জাগা একটুকরো চরের বুকে একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়, দুমুঠো সম্মানের ভাত আর বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে গড়া ঘরগেরস্থালির স্বপ্ন দেখে চলে। এককথায় মানুষের মতো বাঁচতে চাইছে। নিজেদের অস্তিত্বকে ডালপালা মেলে আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিতে এবং মাটির গভীরে প্রোথিত তার শিকড়কে ছুঁতে চাইছে। এইসব মানুষের ঘরবসতের স্বপ্ন-সংগ্রাম এবং বারবার আধিপত্যকামী একশ্রেণীর দখলদারির চতুর কৌশলের কাছে প্রকৃতিনির্ভর মানুষগুলির পরাভব নিয়ে তিনি অসংখ্য ছোটোগল্প, উপন্যাস লিখে চলেছেন।

চাকরির সূত্রে কলকাতা থেকে দূরে বেশ অনেক বছর পশ্চিমবঙ্গের নানাজায়গা, কখনও কংসাবতী, কখনও সুবর্ণরেখা, ডুলুং, হলদি নদীঘেরা জনজীবন, মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গা, থেকে শুরু করে দিঘা, সুন্দরবন, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কত গ্রাম কত মৌজায় ঘুরে বহুবিচিত্র ধরনের মানুষের দেখা পেয়েছেন এখান থেকেই তিনি পেয়ে যান কী নিয়ে লিখবেন, কাদের কথা লিখবেন। তাঁর লেখায় প্রান্তিক মানুষের দুঃখকঠিন বাস্তব, সামান্য ইচ্ছাপূরণের ব্যর্থতার সকরুণ বাস্তব। তবে সেই বাস্তবের সঙ্গে মিশে থাকে লোককথা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি। এসব আশ্রয় করেই দেশজভঙ্গিতে জীবনের গভীর যন্ত্রণা-বেদনা, সাফল্য-অসাফল্য, সফেন জীবনের শ্রম-ঘাম-রক্ত, মানব-মানবীর নিবিড় গভীর সম্পর্কের টানাপোড়েন অনায়াসে বলে যান। তৈরি হয় এক জাদুবাস্তব। লেখক যে জানেন 'গল্পটি আছে চেতনার অন্তঃস্থলে'। অমর মিত্রের নিজের উপন্যাস ভাবনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়—

> 'উপন্যাস রচনা যেন নিজের জীবনকে একটু একটু করে রচনা। হ্যাঁ, নিজেরই জীবন, নিজের কল্পনা, বিভ্রম। জীবনের আলোছায়া। এই আশ্চর্য জীবনে কতরকমের বিপন্নতা, তা থেকে মুক্ত হতে কতরকম প্রয়াস কত প্রতিদ্বন্দ্বী কতবার কত আক্রমণ প্রতিহত করা, কত ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানো কতরকম ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই তো এসে যেতে পারে উপন্যাসে। উপন্যাস রচনা যেন আমার এই পৃথিবী বাসের দিনপঞ্জি রচনা, অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখে যাওয়া, তা সে উপন্যাস আত্মজৈবনিক হোক বা না হোক।'

আসলে অভিজ্ঞতা অনুভূতি আর চেতনা থেকেই তিনি পৌঁছে যান প্রান্তিক মানবমানবীর সুখদুঃখ অসহায়তার মাঝে আঁকড়ে থাকা একমাত্র অবলম্বন সুতীব্র জীবনবাসনা ও অস্তিত্বরক্ষার জন্য যে লোকবিশ্বাসকে তারা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে।

লেখকের 'ধনপতির চর' উপন্যাস পাঠের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অনেকটা এইরকম। তিনদিকে নদী ঘেরা ধনপতির চর যেন একটা কাছিমের পিঠ। মূলভূখণ্ড থেকে দূরে জেগে ওঠা এই আশ্চর্য ভূখণ্ডে মাত্র ছটা মাস একদল নারীপুরুষ অস্থায়ী ঘর-বসত করতে আসে। কাছিমের পিঠের মতো চরটার পলি পড়ে ভূমি জেগে ওঠে একটু একটু করে আবার ছমাস পরে চরটা জলের তলায় চলে যায়। চরভূমি আসলে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে তিনদিক ঘেরা সমুদ্র প্রায় নদীর গর্ভে—চরে আসা মানুষেরা বলে ধনপতির সর্দার বলে—কূর্মাবতার বা কাছিমসর্দার চলে যাচ্ছে হার্মাদের দেশ পিসবোঁয়ার দিকে। বুড়ো ধনপতি সর্দার সকলকে বোঝায়

> 'এই ছমাসের পৃথিবী, ধনপতির দ্বীপ চিরকাল থাকবে না, থাকতেই পারে না। তার মরণের পরই হয়তো ঘুম ভাঙবে কূর্ম অবতারের। তার মাসের হার্মাদিবানে সে নড়ে উঠবে, এগোতে থাকবে। নারিকেল, সুপারি, আম আর গৌয়া গর্জন গাব হেঁতাল বানগাছের বনাঞ্চল নিয়ে জলে জলে ভেসে যাবে। এইটিই সত্য, চিরদিন থাকবে না ধনপতির চর।'

উপন্যাসের সূচনায় ধনপতি সর্দারের মুখে মুখে বলা বৃত্তান্ত যার অনেকটাই তার কল্পনা বলে মনে হবে শিক্ষিত আধুনিক মানুষের কাছে। অবিশ্বাসী ব্যাপারী দশরথ সিং বা তার সহায়কারী মালাকার, কনস্টেবল মণ্ডল মিশ্রের কাছে চর ও চরের নারীকে কেন্দ্র করে দখলের নানা কৌশল দেখতে দেখতে শিক্ষিত সহানুভূতিশীল বি.ডি.ও. অনিকেত সেন ভাবেন

> 'এমন তো হতে পারে, হতেই পারে। ধনপতি যে বৃত্তান্ত রচনা করেছিল তা সত্য হয়ে যেতে পারে। যে পুলিশবাহিনী চরের দখল নিতে চলেছে আজ, তারা হয়তো খুঁজে পাবে না ধনপতির চর। চর নিয়ে চলে গেছে চরবাসীরা। যেদিকে তাকাও, শুধু জল আর জল। তাই হোক। তাই হোক।...অনিকেত সেন কল্পনা করে বঙ্গোপসাগরের মোহানায় শুধু পাং আর পানি। তার ভিতরে দিশেহারা হয়ে ব্যাপারী আর পরমেন খুঁজছে কোথায় গেল সেই চর। তাহলে এতদিন কি কোনো চরই ছিল না সেখানে। সবটাই শোনা কথা অলীক?

উপন্যাসটির কাহিনিতে নানা স্তর। এক স্তরে আছে চরের আদিকথা—মুখে মুখে চলে আসা চরের আদি কাহিনি—কূর্মঅবতারের প্রতীক কাছিমসর্দারকে কেন্দ্র করে মৌখিক প্রচলিত কাহিনিটি গড়ে উঠেছে। আলো আঁধারি এক আদিম পৃথিবীর সঙ্গে বহুকাল ধরে জড়িয়ে থাকা মানুষের নিবিড় সম্পর্ক যেন একইভাবে বহতাসময়ের মাঝখানে স্থির অবিকৃত চিরপুরাতন এবং সনাতনও বটে। সেখানে চর এক আশ্চর্য চরিত্র, যার গভীর আকর্ষণে যুগযুগ ধরে একদল মানুষ ছমাসের জন্য একইভাবে আসছে। সমুদ্র তাদের জীবিকার টানে একইভাবে টেনে আনছে। তারা মাছমারা মানুষ, আশ্বিনে দুর্গাপ্রতিমা জলে যাবার পরই বাতাসে টান ধরতে না ধরতেই ঘোড়াদলের জেলেরা নিজেদের ঘরবাড়ি (ডাঙার জীবন) ছেড়ে স্ত্রী সংসার ফেলে চলে আসে ধনপতির চরে। সমুদ্রের টানে তারা আসে। সমুদ্রে তার মাছ ধরে, চরে মাছ শুকায়, অস্থায়ী ঘর বাঁধে। তাদের ঘরসংসার সামলাতে, দেহ সুখ-রমণে-রঙ্গে-রসে ভরিয়ে দিতে চরে এসে ওঠে। যমুনা, সাবিত্রী, বাতাসী নামের কত রমণী। এরাই চরে আসা জেলেদের এবং বর্তমান

ধনপতির অস্থায়ী ঘরণীরূপে তারা ছমাস সংসার স্বামীসুখের স্বপ্নে-মিলনে ভরে ওঠে। নারীরা নতুন করে জীবন পায়, গৃহস্থালির স্বাদে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় আর ভরপেট খাবার পায়। কূর্মঅবতারের প্রতীক কাছিম সর্দারের পূজা করে। কার্তিক পূর্ণিমার রাতে চরের গাবগাছের তলায় কাদামাটির কাছিম মূর্তি তৈরি করে মেয়েরা পূজা করে। তাদের আশা

> 'এমন একদিন আসবে, এসে শুনবে ধনপতি সর্দার শোনাচ্ছে এক আশ্চর্য কথা, কাছিমসর্দার আর নড়বে না, ধনপতির চর পিঠে নিয়ে চিরকালের মতো ঘুমিয়েছে বুড়ো কাছিম, ঘুম ভাঙবে লক্ষ বছর পরে।'

কার্তিক পূর্ণিমার পুজোর মূলমন্ত্র, মূল আয়োজন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে '...কাছিম বাবা তুমি ঘুমাও।' 'জেলেনিরা বিনবিন করে, হে কাছিম বাবা তুমি সাগরতলে থাকো, হে কাছিম সর্দার তুমি জগৎ ধরে রাখো, শুনো পুরাকালের কথা শুনো।' ঢাক ঢোল, কাঁসর ঘন্টা শাঁখ নিষিদ্ধ এ পুজোয়। কারণ এ পুজো নৈঃশব্দ্যের পুজো। কাছিম সর্দারকে ঘুম পাড়ানোর পুজো। কাছিম সর্দার যতদিন ঘুমাবেন ততদিনই এই অস্থায়ী ঘরবসতে জেলেনিরা সংসার সুখ, পেট ভরে খাবার, নিশ্চিন্ত রমণসুখ পাবে—অর্থাৎ বাঁচবার একটা পথ খুঁজে পাবে। তাই তাদের প্রার্থনা 'চন্দর সুয্যি যতদিন/ধনার চর ততদিন।' চরবাসিনীদের কাছে কাছিম সর্দার যিনি কূর্মঅবতারের প্রতীক, যিনি চরটি তার পিঠে ধরে রেখেছেন তিনি ধনপতি আবার দ্বীপের মালিক যে বয়োবৃদ্ধ গাঁওবুড়ো চরের বুকে লাল প্লাস্টিক চেয়ারে বসে থাকে তার নামও ধনপতি। মধ্যবয়সী যমুনা, ষোল সতেরো বছরের কুন্তি সহ যুবতী জেলেনিরা এবং বাতাসি কূর্মদেবতার পাঁচালি গাইতে থাকে—

> কাত্তিক পুন্নিমে তিথি চাঁদেরও আলো
> দেখি নাও ধনপতি কারে লাগে ভালো।
> ধনপতি একজন জলেতে ঘুমায়
> ধনপতি আরজন গাছেতে ভাসায়।
> ধনপতি সবজন, জাগে নিশিদিন।...

এভাবেই মেয়েদের কাছে কাছিম সর্দারের কথার সঙ্গে সঙ্গে চরমালিক সব ধনপতিও পূজিত হয়। বাতাসি সগৌরবে বলে—

> 'আমরা কাছিমচন্দারের কথা কহিনা শুধু। আমরা সব ধনপতির কথা কহি। এবার চুপ করে থাকি, কাছিম বুড়ো ঘুমাক, তিনি ঘুমালে আমরা বাঁচি।'

হ্যাঁ চর থাকলে মেয়েরা বাঁচবে। তাদের স্বপ্নের চরে তারা ঘর সংসার করে বাঁচবে। নারীজীবনের পূর্ণতার স্বাদ পেতে তাদের আসা। তাই তারা বর্তমানকালের মানুষ হয়েও চরে এসে আদি সনাতনী পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে এক মায়াময় জীবনের বৃত্ত রচনা করে। তারা বিশ্বাস করে আদিম পৃথিবীর সমান বয়সী এক গাঁও বুড়োর কথা। বৃদ্ধ ধনপতি তাদের শোনায়

> 'মা কমলার সোনার কলসের ভিতর থেকে আশমান, সাগরে গাং পানির সঙ্গে একদিন বেরিয়ে এসেছিল ধনপতির চর। ধনপতি সর্দারের কাছ থেকে এই চর আশমান গাং পানি গ্রহণ করে তার সগুন্দী বিবি ধনেশ্বরী...'

আমাদের বৃদ্ধ ধনপতির নারী হয়েই চরে এসেছিল যমুনা, যমুনার পরে বাতাসী, এখন কুন্তি। বৃদ্ধ ধনপতি তাকেই চরের অধিশ্বরী করে তার ওপর চরের ভালোমন্দের দায়িত্ব ভার দিয়েছে। আর ধনপতি কুন্তিকে শোনায় অতীত জীবনের কথা। তাতে মিশে যায় কত অলৌকিক কাহিনি; কোনোটা বিশ্বাস হয়, কোনোটা বিশ্বাস হয় না। তবু কুন্তিও মনে করে ধনপতি হার্মাদ পেদরুর বংশধর। তাদের দেশ ছিল সাগর পারে লিসবোঁয়ায়। শোনায় আন্নাবিবির কথা। কমলেকামিনী কমলার কথা, মাতা মেরীর প্রচলিত মৌখিক কাহিনী শুনতে শুনতে সপ্তদশী কুন্তিও বৃদ্ধ ধনপতির মতো চরের অধিশ্বরী হয়ে চেয়ারে বসে গাবতলায় কার্তিক মাসে কাছিমকল্পনা করে আর বলে—

> 'জেলেনিরা এখানে বারোমাস থাকবো। জেলেনিরা কেউ ভেসে বেড়ানো শ্যাওলা হবেনি। গাবতলায় এসো মেয়েমানুষ সবাই। এডা মা কমলার চর। মা কমলা দিল মোর ধনপতি পেদরুকে। আমি পেদরুর বিবি। মোরও সেই লিসবোঁয়া ঘর। হবে হবে, ধনপতি পেদরু বাঁচাবে—শুধু তারে ডাকো। মা কমলারে ডাকো। মা মেরিরে ডাকো।'

বৃদ্ধ ধনপতি একদিন যেমন করে শোনাত চর কাহিনি 'বৃত্তান্ত' এখন কুন্তি চরের অধিশ্বরী বৃত্তান্ত শোনায় 'লিসবোঁয়ায় গরমেন ছিল বলে চর নিয়ে ইদিকে এলাম, ইদিকে গরমেন আছে, আর একদিকে যায়।' কুন্তির বিশ্বাস 'বড় গরমেন' অর্থাৎ উদার হৃদয় বিডিও সাহেব কুন্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাকে। ধনেশ্বরী কুন্তি সেই বিশ্বাসে ভর করেই চরের মেয়েদের আশ্বস্ত করে বিডিও সাহেব তার কথা রাখবেন। তারা চরে বারোমাস বসতির অধিকার পাবে সন্তান পাবে—নারীর অধিকারের স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্ন দেখায় ধনেশ্বরী কুন্তি। কুন্তি এমন এক লিসবোঁয়া কল্পনা করে যেখানে আর আগের মতো মেয়েমানুষ পুরুষমানুষের দাসী নয়; বরং উলটোটাই হবে ধনেশ্বরী কুন্তির কালে তাদের লিসবোঁয়ায় পুরুষেরা মেয়েদের দাস হবে। কিন্তু 'গরমেনে'র প্রতিনিধি মালাকার, মঙ্গল মিদ্দের মতো কনস্টেবল তাদের জানায় চর খালি করে দিতে হবে, চরের অধিকার নেবে 'গরমেন'। 'এই গাং এই চর সব গরমেন্টের।' দশরথ ব্যাপারী আর পুলিশের লোক আগেই এসেছে চরে। চরে আসা মেয়েরা আধা বছরের জন্য ঘরকন্না, স্বামীসংসার সাজিয়ে সুখের স্বর্গ রচনা করতে চাইলেও ব্যাপারীর শ্যেন দৃষ্টি পড়ে ভরাযৌবন বাতাসী প্রমুখ চরের নারীর ওপর, সে চায় পুলিশকে হাত করে মদ টাকা ঘুষ দিয়ে মেয়ে পাচারের রমরমা ব্যাকসা চালাতে। তাই তার আনাগোনা। আগেরবার টাকা ঘুষ দিয়েও বাতাসীকে না পেয়ে এবার দশরথ ব্যাপারী হয়ে উঠেছে মরিয়া। হয়তো কৌশলে সরকারের কানে সেই তুলে দিয়েছে ওর কুড়ি চলছে বেশ্যাবৃত্তি ও নারী পাচার চক্রের কারবার। স্বভাবতই প্রশাসন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে। আর সেই সুযোগেই পুঁজিবাদী ব্যাপারী বনসৃজন, পরিবেশ রক্ষার দাবি নিয়ে সরকারের সহায়তায় দ্বীপে তাদের অধিকার কায়েম করতে চায়। চরের অধিকার চলে যাবে মা কমলা, পেদরু, ধনপতি, ধনেশ্বরী কুন্তির হাত থেকে। উচ্ছেদের আয়োজনে নেমে পড়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাও তার অধীন গরমেন্টের প্রতিনিধি কনস্টেবল, পুলিশ, মালাকার, গোমস্তা, আমিন, এমনকি ভালো মানুষ 'ভগমান' তুল্য বিডিও সাহেবও। চরের মেয়েরা কাছিম

সর্দারকে জাগাতে চাইলেও, বুড়ো ধনপতির 'জোস' ফেরাতে চাইলেও, সপ্তদশী ধনেশ্বরী কুন্তি আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারে না চরকে রক্ষা করতে। 'গরমেন যদি নেবে বলে নেবে গরমেন।' কুন্তিরা ভাবে 'যদি জাগে ধনপতি, চর নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। চর নিয়ে পালানো ছাড়া চর বাঁচানোর কোনো উপায় জানা নেই চরের রমণীদের'।

লোকবৃত্তান্ত আর বর্তমান কঠিন নিষ্ঠুর দখলির বাস্তবকে একসূত্রে গাঁথেন অমর মিত্র। এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা। উপন্যাসের শেষ অংশ পড়তে পড়তে, বিশেষত গ্রিন উড কোম্পানির আড়ালে পুঁজিবাদী ঝানু ব্যাপারী দশরথ সিং এর ক্ষমতার প্রশস্ত হাতের সঙ্গে সরকারের নিঃশর্ত সমঝোতা ও সেই সূত্রে প্রশাসনের তরফ থেকে সহায়তার প্রসঙ্গগুলি মনে করিয়ে দেয় ২০০৬ ২০০৭ এর পশ্চিমবঙ্গের অস্থির পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রান্তিক নরনারী, বিশেষত নারী সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, সমষ্টির প্রতিবাদের প্রসঙ্গ।

প্রামাণ্য ইতিহাস নয়, মান্যতা পেয়েছে লোককথা, কিংবদন্তি পুরুষানুক্রমিক ধারায় বহতা স্মৃতির পুরাণ উত্তর আধুনিক বাংলা উপন্যাসে দেরাজ গঠনরীতির পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। সেই ধারায় এর অনবদ্য সংযোজন অমরের 'ধনপতির চর' উপন্যাসটি। 'ইউরো' বা পশ্চিমী নভেল' রচনার আদল সরিয়ে রেখে তিনি কিংবদন্তি, লোককথা, ছড়া, গান প্রভৃতির বুনটে এবং মিথিক্যাল জাদুবাস্তবতার মধ্যেই অকৃত্রিম জীবনবেলা, সুস্থ সম্পূর্ণ জীবনাকাঙ্ক্ষার যথার্থ মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই মিথ যারা রচনা করে তারা সাধারণ মানুষ মানুষী। জনজীবনের যুগযুগ ধরে চলে আসা, পরম্পরায় বুনে চলা কথা এবং স্মৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলার 'বৃত্তান্ত' কথনের মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলি কালের সীমায় থেকে সনাতন আদি পৃথিবীর সন্তান-সন্ততি হয়ে উঠেছে। নামে তারা বাতাসী, যমুনা, কুন্তী ধনপতি হলেও আসলে সময় কালের বহমানতায় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। কূর্ম অবতারের প্রচলিত মিথকে অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক পুনর্নির্মাণ করেছেন কত ছড়া, কিংবদন্তিতে ঘেরা চরকেন্দ্রিক মৎস্যজীবী নারীপুরুষের জীবনভাষ্য। তিনশো তিরাশি পাতার দীর্ঘ উপন্যাসে কত আখ্যান কত তার শাখা-প্রশাখা। কিন্তু লেখনশৈলীর স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও বাধা পায়নি। বিস্তারধর্মী বড়ো মাপের ক্যানভাসে আকাশ জল-চর ও চরের মানুষের জীবনের নানা তরঙ্গ যেন প্রকৃতির মতোই স্বাভাবিক এবং প্রসারিত—

> 'তার (চরের) মাতার আকাশে তারা ফুটিছে কত। হেমন্তের শীত একটু একটু করে ঘন হচ্ছে। অন্ধকারে বসে ধনপতি সর্দার মা কমলা আর হার্মাদ পেদরু কাহিনি শোনাচ্ছে জেলে জেলেনিদের। মা কমলার সোনার কলসির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল গাং আশমান চর নিয়ে হার্মাদ পেদরু। লিসবোঁয়া থেকে এল সাধু পেদরু সেই কাহিনী শুনতে শুনতেই চরের মানুষ মৎস্যজীবীরা বারবার আসে, সেই মৎস্যজীবীদের চর থেকে উচ্ছেদ করলে সে কাহিনী মুছে যাবে। 'ধুয়ে যাবে নোনা জলের প্লাবনে, সোনার কলসি ভেসে যাবে অকূল দরিয়ায়।' বিডিও অনিকেত সেন সে কাহিনী লিখুন আর নাই লিখুন, বাস্তবের নদী, জল, নদীজীবী মাছমারাদের দেখতে দেখতে লেখক অমরের সেই ১৯৭৪-এই মনে হয়েছিল 'আমার মতো

> করে এই পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছে কে? আমি বরং লিখেই যাই। আমি বরং আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাটুকু ব্যবহার করে চাষীবাসী বিপন্ন মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি।'

'ধনপতির চর' লেখকের এই সৎ অঙ্গীকারের মহত্তম ফসল। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর পাঠকেরা পেয়ে যাবেন ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ড ও বিচিত্র মানুষের ভেতর আরও অসংখ্য ভারতবর্ষ ওই চরের মতোই স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে জেগে ওঠে কত শত, প্রান্তিক, শ্রমজীবী মানুষকে আশ্রয় দেয়, আহারের ব্যবস্থা করে, সুখ স্বপ্ন দেখায় আর তারপরই চরের দখলের নানা কৌশলের কাছে লোকায়ত চর ও চরের মানুষেরা ধ্বংস হয়। সোনার কলস ভেসে যায় তাদের নিয়ে অকূল দরিয়ায়।

ধনপতির চর : অমর মিত্র। দেজ পাবলিশিং ২০০৭। ২৫০ টাকা।

কবিতা কখনও কখনও শব্দের কৌশল

পঞ্চানন মালাকর

কবিতা যখন বোধের গোড়ায় নাড়া দিয়ে জীবনের গভীর-গোপন অনুভবকে জাগিয়ে তোলে, তখনই আমরা বুঝতে পারি শব্দ-গন্ধ-ছন্দ একত্রিত হয়ে ছড়িয়ে যায় চেতনার জগতে। কবি শব্দশিল্পের ইমারত তৈরি করতে যে কঠিন সাধনা করেন তাকে বুঝতে গেলে সংবেদনশীল হওয়া আবশ্যক। কবিতা পড়তে পড়তে আমরা আপন মনের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারি। আর তখনই বুঝতে পারি সকলের জন্যে কবিতা নয়, কারও কারও অস্তিত্বের সন্ধানেই কবিতা তার নিজস্বতা খুঁজে পায়।

কবিতা শব্দশিল্প। শব্দের কারিকুরি দিয়ে কবি আমাদের বিমুগ্ধ করে জীবনের কথা বলেন। সেখানে তুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গে ধরা দেয় সমকালীন জীবনবোধ। এখানে নবীন-প্রবীণ পাঁচজন কবি তাঁদের আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। সবার জীবন দেখার চোখ সমান না হলেও তাঁরা যে আপন অনুভূতির মধ্যে সন্ধান করেছেন জীবনের মর্মকথা-তা বুঝতে গেলে কবিতার পাঠে আত্মমগ্ন না হলে চলে না।

কবিতাচর্চার অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে যখন একজন কবি কবিতার মধ্যে বেঁচে থাকতে চান তখন তাঁর অধ্যাবসায়ের নিমগ্নতা আমাদের মুগ্ধ করে। কবি গণেশ বসুর 'বর্ণময় পৃথিবী' আমাদের সত্যিই এক বর্ণময় পৃথিবীর কাছে নিয়ে যায়। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে দেখেছেন, তাকেই ছেনেছুঁয়ে যে পংক্তি কাব্য উপহার দিয়েছেন—তা আমাদের মুগ্ধ করে, আবিষ্ট করে। তিনি কবিতার অবয়ব গঠনে প্রতি মুহূর্তে নতুন এক আস্বাদনে ভাসিয়ে দিয়েছেন কবি পাঠকের অন্তরকে। ৮৩টি কবিতার সংকলনে বিচিত্র এক মায়াজাল বুনেছেন। তার মধ্যে ধরা পড়েছে চেনা জগৎ। আবার কখনও কখনও প্রসঙ্গ ও প্রকরণে তিনি প্রকৃত সত্যের সন্ধান করে ফিরেছেন। ছন্দ অথবা গদ্যে তিনি যে সাবলীল তা তাঁর কবিতা পংক্তি উচ্চারণ করলেই বোঝা যায়। 'পারিবারিক ফোটোগ্রাফ' কবিতায় কবির নস্টালজিয়া আমাদের মনকে স্পর্শ করে : 'শিশুর আদল এক মাঝে মাঝে কুয়াশা সরায়/শিশুর আদল এক ঘাই মারে সরপুঁটি মাছের মতোই/শিশুর আদল এক পাকা গাব সোনার বলের মতো পুকুরের জলে।/

আঙ্গিকগত দিক থেকেও কবি কীভাবে কাব্যশৈলী তৈরি করেছেন তাও আমরা বুঝতে পারি। একদিকে সমান্তরালতায় কবি সিদ্ধহস্ত; অন্যদিকে উপমা-সৃষ্টিতেও নতুনত্বে আমাদের বিমুগ্ধ করেন সন্দেহ নেই।

কবি যে সমাজ-সচেতন তার প্রমাণ পেয়ে যাই আমরা, যখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠেন : 'সিলিংয়ের থেকে খসা চাঙড়ের দাগ আজো মাথার উপরে বিছানায়।/গেল বছরের ঝড় মনে আছে, চুঁয়ে চুঁয়ে বৃষ্টিও সেদিন।/এবড়ো-খেবড়ো গোলাকার, গাঢ়তম অন্ধকার জেগে, গুহার আদল।" (আমার শরীরে হাঁটে তোমার শরীর)। এভাবেই কবির সামাজিক বোধ আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয়। যেমন—'আমি, বাসু গণেশন, কয়েক টুকরো রেশমি কাবাব। থাকি শহরের সীমা ঘেঁষে তেতলা/বাড়িতে, পেনশনের ঘ্রাণ ওড়ে, ডি-এর গাজর। পড়শিরা

ডিনারে যায়, স্বচ্ছের প্লাবন,/জেলিফিস, নৃত্যের তালে তালে মোম গলে পড়ে, অথবা তুষার। (সারাটা জীবন ধরে চেখে যাই, যাবো)। জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি তির্যক কৌতুকের ভাষ্যে যে প্রতীকী চিত্র তুলে ধরেছেন তা তাঁর কাব্য-কৃতিরই পরিচায়ক।

কবি কখনও কখনও যে রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন তার নিদর্শনও দু-একটি পংক্তিতে ধরা পড়েছে। যেমন—'এখনও আমার হাতে তোমার রোদ্দুর লেগে আছে/এখনও আমার ঠোঁটে তোমার ফাগুন গান গায়/এখনও আমার চোখে তোমার আকাশ ছায়া মেলে/অবিকল সেই চিহ্ন।/(দাঁড়াও)।

এমনই অনেক কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভব মুগ্ধতা বাড়িয়ে তোলে। সহজেই অনুমিত হয় কবি পোড়-খাওয়া মানুষ। জীবনকে দেখেছেন; আপন অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন সেখানে। তার থেকেই জন্ম নিয়েছে এক-একটি অনবদ্য কাব্যপংক্তি। আটপৌরে জীবন শুধু নয়, কবির ভাবনায় উঠে এসেছে বিশ্বমানবিকতাবোধ ও রাজনৈতিক জীবনবোধ। তাই কবিতায় প্রসঙ্গ হয়ে এসেছে কার্ল মার্কসের কথা, স্তালিনের কথা, চে-গুয়েভারার কথা। 'ফ্রিডম অব দি প্রেস' অথবা 'কবি ফ্যাসিবাদী হলে' কবির গোত্র চিনিয়ে দেয়। তিনি কত সহজেই বলতে পারেন : 'কবি ফ্যাসিবাদী হলে ইতিহাস গোপনে কাঁদেই'।

কবি যে সংস্কৃতি-মনস্ক, নিজের ঐতিহ্যকে মনে মনে শ্রদ্ধাই করেন। আর সেজন্যেই তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে ধরা দেয় অগ্রজ ও সমসাময়িক কবিদের কথা। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা তরুণ সান্যালের মতো কবির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে কাব্যিক ভাবনায়। এ ছাড়াও উঠে এসেছে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ কবি Charles Bukowaski, সুইডিশ কবি Gunner Ekelof এর প্রসঙ্গ। এভাবেই কবি তাঁর ঐতিহ্যানুগত্য প্রকাশ করেছেন।

সামগ্রিকভাবে কবি গণেশ বসুর 'কর্দময় পৃথিবী' সত্যিই কাব্যশৈলীতে কর্দময় হয়ে উঠেছে। তিনি কবিতার গঠন নিয়ে ভাঙচুর করেছেন অবলীলায়। কখনও নির্ভেজাল গদ্যে, কোথাও ছন্দের বিচিত্র ফর্মে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়। কবির জীবন ছোঁয়া অভিজ্ঞতায় কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী; এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

'কর্দময় পৃথিবী'-র প্রচ্ছদ এবং প্রকাশনার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করতেই হয়। কাব্য-গ্রন্থটির শেষে কিছু টীকা, স্বীকৃতি ও মন্তব্য কবিতাগুলিকে বুঝতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

ছাপ্পান্নটি কবিতা নিয়ে কবি জয়ন্তী রায়ের 'কিছু প্রশ্ন কিছু ইতিহাস' কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ফুটে উঠেছে পরিচিত জীবনযাত্রার ছবি। কবি কবিতায় হয়ে উঠেছেন সহজ সরল ভাষ্যকার। তিনি সোজা কথা সোজা ভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতা কখনওই বিষয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। বিষয় নির্বাচনে তিনি জীবনমুখী হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁর কবিতা, 'হরিধ্বনি', 'পাগল', 'বিষাদ বিন্দুগুলি', 'ঝাপসা আয়না', 'টুকরো টুকরো হৃদয়', 'বৃষ্টির দিনলিপি', 'আগুনের ভাষা', 'আলেয়া', 'ভাঙা টুকরোগুলো', 'স্রোতে শুধু পলিমাটি জমে', 'অন্ধকার রাতের গান', 'রোদবৃষ্টির খেলা' শিরোনামে পাঠকের মনের অনেক কাছাকাছি এসে আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। কবি জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ে উচ্চারণ করেন : 'বুকের জল ডিমের কুসুমের মতো/ যে হলুদ দিনগুলোকে তুমি/উজ্জ্বল করে তুলেছিলে,/কিছু অসাধু মানুষ/তাকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে./(হরিধ্বনি)। সাংসারিক জীবনযাপনের মধ্যে কবি

তাঁর নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছেন। তাই দৈনন্দিন জীবনচিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যপংক্তিতে : 'মূর্খ দ্বিধা আর ভুলগুলোকে বেছে বেছে/একটি তাম্রপাত্রে রাখো,/তারপর চাল থেকে যে ভাবে/কাঁকর বাছা হয়/সেভাবে খুঁটে খুঁটে তুলে/বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও,/তোমার সীমানার মধ্যে সে যেন/আর ফিরে না আসতে পারে—'/(মূর্খ ভুল)।

কবি সারল্যে সাংসারিক কথা যেমন বলেছেন, তেমনি কখনও কখনও ছন্দ নিয়ে খেলা করেছেন। মিলটা সেখানে বড়ো নয়—ছন্দের চালে কবির স্মৃতিচারণ গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়ে যায় : 'এসব ফেলে কোথায় গেছ চলে/এমন ঘন মেঘ ভাসানো বেলায়,/সবই ছিল আলতো ছুঁয়ে থাকা,/তাই কি এমন ভীষণ ছেলেখেলা?/(ভীষণ ছেলেখেলা)।

কবি জীবনের ভাঙাগড়াকে কবিতায় ধরতে চেয়েছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় বিপদ-বেদনা কখনও কখনও কাব্যপংক্তিস্থ করে তুলেছে বেদনা-ভারাক্রান্ত। তবুও তিনি যে আশাহত নন তা আমরা বুঝতে পারি। তাই তিনি বলতে পারেন : 'মন খারাপের কুয়াশাকে/বাইরে রেখে/সামনে টাঙিয়ে রাখবো/আলোর অমলতাস।/(অমলতাস)।

কবি জয়ন্তী রায়ের কাব্য-চেতনার মধ্যে এক নিগূঢ় প্রাতিস্বিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার ভাষা তেমন জটিল হয়নি কোথাও, তবে গ্রন্থের প্রকাশনার কাজে আরও একটু মনোযোগ দিলে ভালো হত। প্রুফ দেখায় আরও নিষ্ঠার প্রয়োজন কাব্য-পংক্তির নির্ভুল প্রকাশে। কারণ কবিতা শব্দশিল্প, শব্দ-প্রয়োগে একটু নজর দেবার দরকার ছিল। প্রকাশনায় গ্রন্থটি মোটামুটি ভালোই হয়েছে। প্রচ্ছদ, মুদ্রণ বেশ ভালোই।

সুনন্দ অধিকারীর 'হৃদয় প্রথম ছাড়পত্র পায় যেখানে' কাব্যটি হাতে নিয়ে মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ১৬/১ ডাবল ক্রাউনে ছাপা গ্রন্থটি বেশ দৃষ্টিনন্দন। ছোটো-বড়ো চুয়ান্নটি কবিতায় কবি জীবনের মধ্যেই কবিতার সন্ধান করে ফিরেছেন। তাঁর কবিতার বিষয় নির্বাচনেও সামাজিক অবক্ষয় থেকে আরম্ভ করে ছোটো ছোটো রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন কবি। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি সমাজ ও সময় সচেতন মানুষ। কয়ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা সোজাভাবে বক্তব্য রাখার জন্যে সাহসী বলতেই পারি। আর কাব্যপংক্তি সৃষ্টিতে তিনি যে কতটা অকপট তাও বোঝা যায় : 'কিন্তু তুমি যখন তোমার সহকর্মীকে এড়িয়ে/ছুতো বানিয়ে ঢুকে যাও বসের চেম্বারে।/কিম্বা পথে-ঘাটে সামান্য নেতা গোছের/কাউকে দেখলেই, গদগদ হয়ে পড় কথা বলতে।/অথবা বাড়িতে অতিথি এলে/নিজের বউকেই ঠেলে পাঠিয়ে দাও সর্বাগ্র...'/(অরাজনৈতিক)।

কবি স্পষ্ট কথা বলেন : পরিচিত বিষয় তাঁর কবিতার শিরোনাম হয়ে ওঠে। যেমন—বন্যা, স্মৃতি, চানঘর, আত্মহত্যা, জাদুঘর, জীবন, নকশা, পালঙ্ক, রথ, সম্পর্ক, চিত্র প্রদর্শনী থেকে ফিরে, সুনন্দ আর নেই। এমনই সব কবিতার মধ্যে কবি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাঁর চেনা জগতের মধ্যেই কবিতার অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, জীবনে যেমন কবিতা আছে, তেমনি জীবনোত্তর জগতেও কবিতা রয়ে গেছে। আর সেই কবিতার মধ্যেই তিনি মানবিকতার অবসান না দেখে দুঃখ পান। তাই তিনি বলে ওঠেন : 'কে বলল পুরুষ? নারীই বা কী?/'বলাৎকার' শব্দটাই সেদিন থাকবে না/যদি জন্ম পোশাকে/ফিরে যেতে পারে মানুষ।/(ছুরি ধরবে যে...)।

তুচ্ছ বিষয়কে কীভাবে কবিতার বিষয় করতে হয় তা ভালোই জানেন সুনন্দ। কখনও কখনও তাঁর তির্যক বাক্যবন্ধে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন : "ওবামা, তুমিই তো নোবেল পেয়েছ শান্তির/শান্তি মানে তো রক্তপাতহীন/মিলনের গায়ে হলুদ পৃথিবী,/যেখানে প্রযোজ্য শুধু প্রজাপতিলিপি।'/(খ্রিস্টিয়)।

কবিতার ভাষায় কবি যে সাহসিকতার পরিচয় অনেক কবিতার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। জীবনকে কবিতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বলেই কবি এপিটাফ লিখে বলতে পেরেছেন : 'সুনন্দ আর নেই/স্যালুট না চুম্বন/জীবনকে কী দিয়ে যাই?/(সুনন্দ আর নেই)।

কবি বেশি কথা বলেন না, মিতভাষণে তিনি জীবনটা ছুঁতে চেয়েছেন : এদিক থেকে তাঁর কাব্য পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। প্রকাশনার পরিপাটিতে কাব্যটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি করতে পারে।

তরুণ কবি পার্থ শর্মার 'ঘুমঋতু ও অন্যান্য' একগুচ্ছ কবিতার সংকলন। আলাদা আলাদা করে কবিতার নামকরণ করেননি তিনি। ১ থেকে ৪৬ নং ক্রমিক সংখ্যায় কবিতাগুলিকে সাজিয়েছেন। এইসব কবিতার মধ্যে কবির জীবনযন্ত্রণার কথা স্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির নিষ্ঠাকে কবি কবিতার মধ্যে গভীর অনুভবে ধরতে চেয়েছেন। তাই তো বলতে পেরেছেন: "পৃথিবী তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে/আকাশ তাকিয়ে আছে মাটির দিকে/মাটি তাকিয়ে আছে গাছের পাতার দিকে/আর পাতারা ক্রমাগত চোখ বুজে, ধ্যান করছে নৈঃশব্দের। (১৭)

কবির মধ্যে সময়ের অস্থিরতা এসে জমা হয়। দিনের পরিচিত মুহূর্তগুলি তাঁর সামনে এসে বিভ্রমে ফেটে পড়ে। তার ভেতর থেকে কবি এমন এক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যাকে চেনা বলে মনে হলেও ঠিক চেনা যায় না। আর সে কারণেই রোমান্টিক কবিমনও অস্থির এক জীবনবোধের কাছে পৌঁছে যায় অবলীলায়। তাই বলেন : "লাইনের দীর্ঘদেহ থেকে খণ্ড খণ্ড পাথর/ছিটকে এসে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করে। কাঁচা রক্তের উপর/ভীষণ ভালোবাসা দুপায়ের মাঝামাঝি হাঁ হয়ে আছে। (২৯)।

কবি পার্থ গদ্যে কথা বলেন। গদ্যছন্দে বলার জন্যেই তাঁর বক্তব্য পাঠকের মনে ধাক্কা দিয়ে যায়। তিনি পরিচিত সমাজ, মানুষ আর প্রকৃতির সঙ্গেই কথা বলে। যদিও গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর এক অগ্রজ কবি তাঁকে নির্জনতম কবি বলেছেন। যদিও সব কবিই আত্ম-বিস্তর নির্জনতাকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চান। পার্থ কিন্তু সমসাময়িক জীবনচর্চার কথা ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর কবিতায় উঠে আসে : শেষ ট্রেন চলে গেলে কামরায় আলোচনা চলে/জিনিসের দাম, রাজনীতি আর রাতারাতি বড়োলোক/'তবু প্রেম ছিল' শেষ রাতে—পরদিন ভোরবেলা হলে/(৪৬)·

কখনও কখনও পার্থর কথায় অসঙ্গতি এসে জমা হয়, এর কারণ হয়তো বর্তমান জটিল জীবনভাবনার প্রতিফলন। তিনি কাটা কাটা বাক্যে যে বলিষ্ঠ বক্তব্যে সোচ্চার হয়ে ওঠেন—তাতে তাঁর নিজস্বতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা আশা করতে পারি, কবির মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

প্রকাশনার প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতেই হয় মুদ্রণ কাজে যত্ন আছে যথেষ্ট তবুও কবিতাগ্রন্থের প্রুফ দেখায় আরও একটু যত্ন নিলে ভালো হতো।

কবি তন্ময় বীরের 'আলো কথা' একটি ক্ষুদ্র কাব্যনাটিকা। কবি প্রস্তাবনায় জানিয়ে দিয়েছেন এর কাব্য কাহিনিটি কিছুটা ইতিহাসের পটভূমিকায় এক অপ্রাকৃত পরিবেশে রচিত। এই কাব্য-

নাটকের মুখ্য চরিত্র নুরজাহান। নুরজাহান-কথার অর্থ জগতের আলো। সেজন্যই কাব্যনাটকের নাম 'আলোকথা'। নুরজাহানকে জাহাঙ্গির বিবাহ করেছিলেন যুদ্ধ জয় করে। সেই যুদ্ধে নুরজাহান অর্থাৎ মেহের উন্নিসার স্বামীর মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গিরের বেগম হয়ে তিনি দিল্লির বাদশাহের বেগম হন। তাঁরই জীবনের এক অপ্রকাশিত অনুভূতির কথাই এই কাব্যনাটকের মূল বক্তব্য। নুরজাহান এবং শের খাঁর অশরীরি আত্মার সঙ্গে নুরজাহানের সংলাপে এক দুঃখী নারীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। যমুনার তীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নুরজাহানের মনে জাহাঙ্গিরের ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে : সেই ভালোবাসা।।.../এ-কি বাগিচার গোলাব/ইচ্ছে হলে তুলে এনে দেবো?/(পৃ. ১৮)।

নুরজাহানের স্মৃতিতে তাঁর স্বামীদের অশরীরি আবির্ভাব তাঁকে বিব্রত করে। তাই তিনি প্রশ্ন তোলেন। শের খাঁ তার উত্তরে বলেন : 'জীবনের স্মৃতির উঠোন জোড়া/মৃতদের সাম্রাজ্যপাট,/আর কোথা যাবো?/উৎখনন ছাড়া ইতিহাস মূক.../(পৃ. ২৯)।

শেষ জীবনে জাহাঙ্গিরের পুত্র খুরমের দয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যে যে গ্লানি—তা নুরজাহানকে কুরে কুরে খায়। যন্ত্রণা, অপারগতা, শূন্যতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাঁকে জীবনের প্রকৃত সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশেষ নারী থেকে তিনি সাধারণ হয়ে নিজের মধ্যে যে আলো দেখতে পেয়েছেন তার প্রকাশে কাব্যটি হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট : 'তোমার আদরের মেহের,/কারোর-বা নুর; আরও শত/মানবীর সারিতে দাঁড়িয়ে/ঐশ্বর্যের বলয় হতে বহুদূরে/অপেক্ষায় থাক যুগ যুগ/তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন, সংজ্ঞাহীন/প্রশ্নপত্র হাতে—/আর কোন্ পরিচয়/আলো/জ্বলে দেখি ভবিষ্যপ্রদীপে/(পৃ. ৩১)

'আলোকথা' কাব্যনাটক এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাব নিয়ে পাঠকের কাছে আদৃত হবে সন্দেহ নেই। এক নারী হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এর প্রতিটি পংক্তির মধ্যে। এ বিষয়ে কবি অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে একটা কথা বলতেই হয়, তা হলো যেহেতু ইতিহাসের চরিত্রকে এনেছেন কবি; তখন সব চরিত্রকে ইতিহাসের মর্যাদা দিলে ভালো হত। নুরজাহানের প্রাক্তন স্বামীর নাম 'শের খাঁ' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'শের আফগান'। 'মেহেরউন্নিসার পূর্বের স্বামীর প্রকৃত নাম আলি কুলি বেগ। সে কথা উল্লেখ করেও কবি তাঁকে শের আফগান না করে শের খাঁ কেন করলেন এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। ঐতিহাসিক কাহিনির মর্যাদা এক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হয়।

ছোটো কাব্যনাটিকাটির প্রকাশনার কাজ, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ প্রশংসার যোগ্য। তবে মুদ্রণ ত্রুটিও রয়ে গেছে দু-একটি। সামগ্রিকভাবে কাব্যনাটকটি ভালো লাগল।

১. বর্ণময় পৃথিবী : গণেশ বসু/মনন প্রকাশনী ২০১৩/১৫০ টাকা।
২. কিছু প্রশ্ন কিছু ইতিহাস : জয়ন্তী রায়/পত্রলেখা/২০১৩/৭০ টাকা।
৩. হৃদয় প্রথম ছাড়পত্র পায় যেখানে : সুনন্দ অধিকারী/একুশ শতক/২০১৩/৮০ টাকা।
৪. ঘুমকাতু ও অন্যান্য : পার্থ শর্মা/রূপসী বাংলা/২০১৩/৬০ টাকা।
৫. আলোকথা : তন্ময় বীর/নক্ষম/২০১৩/৩৫ টাকা।

গল্পের চেয়ে বেশি কিছু

রামদুলাল বসু

সময়কে পটভূমিতে রেখে গল্প লেখার ব্যাপারটি দুরূহ হলেও একটা প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু সময়ের যাত্রার ধ্বনিকে প্রতিবিম্বিত করে তোলা সহজ নয়। বাংলা উপন্যাস কিন্তু এই ধারায় সফল শিল্পকৃতি। শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এর সাফল্য প্রশ্নাতীত। এইসব রচনায় সময়ের অভিপ্রায় ও বার্তা যখন ব্যক্ত হয় তখন তার স্বরূপটি পরিপূর্ণতা পায়। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছোটোগল্প রচনার পরিকল্পনা সচরাচর চোখে পড়ে না। এই গল্প সংগ্রহটি সেই অর্থে একটি ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা নন্দ চৌধুরি একজন প্রবীণ লেখক। বহুকাল ধরে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করে আসছেন। মূলত ছোটোগল্পকার। তাঁর এই গল্প সংকলন মনে হয় যেন 'গল্প' গ্রন্থে ১৯৬২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক উত্থান পতনের পটভূমিতে বাস্তবজীবনের অন্বয়ে গল্পগুলি রচিত হওয়ায় এগুলির গল্পের আঙ্গিকে গল্প বলে মনে হলেও নিছক গল্প নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। রাজনৈতিক জীবনের অভিঘাতে পরিবর্তমান জীবনের সামাজিক উত্তরণের কাহিনি। সময়ের স্রোতে চলমান মানবজীবনের ধাপগুলি সময়ের অদৃশ্যশক্তিতে কিভাবে ধাপ পরিবর্তন করে করে অবিশ্বাসী কিংবা অনভিপ্রেতরূপ পায় তাই অন্বেষণ গল্পগুলিতে আছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ বছরের (১৯৬২–২০১২) কর্মকাণ্ড কীভাবে বাঙালির জীবনযাত্রার ধারা তথা মানসিক জীবনে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে বদলে দিয়ে চলেছে তার একটা কালানুক্রমিক চিত্র গল্পের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করার চেষ্টা আছে। গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ঐক্যগ্রন্থিহীন হয়েও কালের বিধাতা যেন এগুলির সংযোজক। তাই এই প্রচেষ্টা অভাবিতপূর্ব। এ সংকলনে মোট একুশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রবল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বামফ্রন্টের সুদীর্ঘকালের শাসন এবং অবসানের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রসারিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে জনজীবন ও জনমানসকে প্রভাবিত ও আন্দোলিত করে সামাজিক জীবনের পথ নির্দেশের ভূমিকা নিয়েছিল, সেই অন্বেষণের ফলশ্রুতি গল্পের উপজীব্য। এ কারণে কোনো কোনো রচনা গল্পের আঙ্গিকে ঘটনার বর্ণনা হয়ে উঠেছে। তবে এটাই এই গল্পপাঠের সিদ্ধান্ত নয়। কেননা অধিকাংশ গল্পই শিল্পাঙ্গিকে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রাজনীতির সর্বগ্রাসী বিস্তারের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক। 'জটিল অঙ্ক' থেকে শুরু, শেষ 'ঘটনা সামান্য'। 'জটিল অঙ্ক' বিগত শতকের ষাটের দশকের সূচনা পর্বের পটভূমিতে লেখা। প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক সব্যসাচী একটি বিপ্লবী সংগঠনের নেতা। একদল সুবিধাভোগী মানুষ কীভাবে প্রশাসনের সহায়তায় কোটি কোটি মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নেয় সেটাই তিনি বুঝিয়ে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। চাকরি খুইয়ে স্ত্রী ও সংসার ত্যাগ করে এখন পথকেই আশ্রয় করেছেন। একসময়ে ভাড়াটে কিছু গুণ্ডার হাতে ইনি পড়েন। তারপরেই অঙ্কের শুরু। এরপর মাস্টারমশায় তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে তাকে ধরিয়ে দিয়ে যে টাকা তারা পাবে তাতে তাদের দারিদ্র্য ঘুচবে না।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মগোপনকারী একটি বিপ্লবী সংগঠনের জনজাগরণের প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্বের চিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে। যদিও সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের রূপরেখা গল্পে নেই। এক বিপ্লবী শিক্ষকের সামাজিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা ভাঙার উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের গল্প। নকশাল আন্দোলনের পূর্বাভাস যেন গল্পে আভাসিত হয়েছে। রচনাকাল ১৯৬২। সংসার ও রাজনৈতিক দায়িত্বের দ্বন্দ্বে এক আত্মত্যাগী যুবকের অকালমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে 'অনুভার কথা' পরিকল্পিত। নিতান্তই গরিব ঘরের মেধাবী সন্তান সুবিমল স্কুল ফাইনাল পাশ করেই দুর্গাপুরের একটা কারখানায় চাকরি পায় কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অটোমেশন এর বিপক্ষে আন্দোলন জড়িয়ে পড়ে। তার বিধবা মা আশঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে ছেলের কিছু হলে সংসার ভাসবে। সংসার বলতে তিনজন,—সুবিমল, তার মা এবং বোন অনুভা। পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থায় তখন এক ক্রান্তিকাল,—কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের সংঘাত। সুবিমল ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে বাম রাজনীতির সঙ্গে। বিগত শতকের ষাট সালের মধ্যভাগ থেকে সত্তরের শেষভাগ পর্যন্ত সময়ের বিস্তারে এক অস্থির রাজনৈতিক জীবনের সংঘাতময় চিত্র গল্পের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত। দাদার বন্ধু অমলের সঙ্গে অনুভার প্রেম ও বিবাহও সমান্তরালভাবে গল্পে বর্ণিত। বিয়ের পর অনুভা জেনেছিল তার দাদার মৃত্যুর কথা। তারপর অমলেরও অন্তর্ধান। গল্পে রাজনীতির সমান্তরালে এসেছে প্রেম, যা রাজনীতির দাপটে পরাভূত হয়েছে। রাজপাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবস্থানটি নির্দেশিত হয়েছে। গল্পটি বিন্যাসের গুণে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দাবি করে।

একটি বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে (অনুলিখিত) 'বৃত্ত' ভাবার্থে পুনর্নির্মাণমূলক। কারখানার সর্বগ্রাসী চেহারা কীভাবে দাম্পত্য সম্পর্ককে আঘাত করে মানবিক দাবিকে অস্বীকার করতে চায় সেই বিষয়টি গল্পের বক্তব্য। গল্পের সময় বিশ শতকের সত্তরের দশকের প্রান্তভাগ। বামফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার পটভূমি। চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্টের শাসনে শাসকশক্তির আনুকূল্যে সমাজে যে পেশিশক্তির জন্ম নেয়, তার অবিনাশী চেহারা পরিবর্তিত শাসকদলে সংক্রামিত হয়ে কীভাবে সামাজিক জীবনকে একটা স্বাভাবিক চেহারা দেয় তার চিত্র সর্বশেষ গল্প 'ঘটনা সামান্য' এ বর্ণিত হয়েছে। অধিকার বিরোধী হয়ে এ কালের অদৃশ্য বিধানে পশুশক্তির সংহারক রূপও অধিকারসম্মত হয়ে ওঠে। রাজনীতির প্রশ্রয়ে মানবনীতি হরণের একটি 'সামান্য' ঘটনা অসামান্য তীব্রতায় অন্তরকে বিদ্ধ করে। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিকৃতি কীভাবে অবক্ষয়ের ধাপ রচনা করে মূল্যবোধহীন এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলে, তার ধারাবাহিক রূপ পরিস্ফুটনের চেষ্টা আছে। উত্তরণের ইঙ্গিত নেই, তবে গল্পগুলি ভাবনার জগৎকে আন্দোলিত করে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা (নন্দর গল্প : যৌবন পর্বের বৃত্তান্ত) এই সংকলনের গল্পগুলির অভিমুখ ও লেখকের জীবন দর্শনের মূল সূত্রটি ধরিয়ে দেয়। বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় নন্দ চৌধুরির এই সৃষ্টিসম্ভার নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি করে।

মনে হয় যেন গল্প/নন্দ চৌধুরি/গ্রামীণ লেখক সমবায় সমিতি লিঃ /বাঁকুড়া/১৩০ টাকা

দুটি গল্পের বই

সমরেশ রায়

দেবাশীস লাহার 'দ্রৌপদী ও অন্যান্য গল্প' সংকলনে সতেরোটি গল্প আছে। গল্পগুলোর বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও গল্প বলার ধরনে বৈচিত্র্য নেই। সব গল্প কি একরকম করে বলা যায়? ভাষায়, বাক্যগঠনে শব্দবন্ধে উপমায় সামান্য ইতরবিশেষ ঘটাতে পারলে, মনে হয় গল্পগুলো আরও সুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারত। অথচ দেবাশিস আমাদের চেনাজানা পরিবেশ থেকে গল্প তুলে এনেছেন। 'বহুমাত্রিক'-এর পনশা তো আমাদের খুব চেনা। দেবাশিস কিন্তু কোনো কিছু বানিয়ে তোলেন নি। কিন্তু পনশার বেঁচে থাকার, 'অন্যভাবে সক্ষম' পনশার লড়াই, যে লড়াই তাকে একা লড়তে হয়েছে, কেন শেষ হবে আত্মহত্যায়? এতে তো এক বিকলাঙ্গের বেঁচে থাকাটাই মিথ্যে হয়ে যায়।

দেবাশিস সতেরোটি গল্পের মধ্যে সাতটি গল্পের সমাধান করেছেন মৃত্যুতে। মৃত্যুগন্ধবহ আরও তিনচারটি গল্প আছে। অথচ টিকটিকি, প্রজাপতি, সিসিফাসের মতো গল্পের সব বাধা, অঘটন, ব্যক্তি জীবনের সর্বনাশ কাটিয়ে জীবনে ফেরার কথা বলা হয়েছে। যদিও সিসিফাস-এর বউ-পালান, মেয়ের ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরও, শংকরের, রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত শিশুকে কোলে তুলে নেওয়ার মধ্যে নাটকীয়তা হয়তো আছে, কিন্তু গল্পের সত্যের সঙ্গে মেলে না। গল্পের সত্য, নির্মানের স্থাপত্যের অন্তর্গত না হলে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। দেবাশিস কিন্তু অসম্ভব সাহস দেখিয়েছেন 'দ্রৌপদী' গল্পে। কুৎসিতদর্শনা, মিনিজলহস্তী কৃষ্ণা, যে আজীবন অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, অভিশাপ ছাড়া আর কিছু পায়নি, জন্মদাতা পিতা যাকে মরতে বলে, তাকে পাঁচজন মিলে এক বৃষ্টির সন্ধ্যায় ধর্ষণ করে। চায়ের দোকানে এরা বসে থাকে। টিউশনিতে যাতায়াতের সময় কৃষ্ণা প্রতিদিনই এদের দেখে। পাঁচজনের মধ্যে একজন, যার কুচকুচে কালো বাইসেপ কৃষ্ণাকে কামাতুরা করে তুলেছে কতদিন। সেই ধর্ষণে কৃষ্ণা যেন মেয়ে হওয়ার স্বীকৃতি পেয়ে যায়।" ওর সমুদ্র জুড়ে পাঁচজন নাবিক পাল তুলে দিয়েছিল কালরাতে।...পাঁচজন আদিম কৃষকের কাছে কৃষ্ণা তার চির-অবাঞ্ছিত ভূখণ্ড তুলে দিয়ে কর্ষণের ঘ্রাণ নিতে চেয়েছিল কাল।...এই পৃথিবীর সমস্ত পুরুষই তো বহুকাল আগে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই কুচকুচে কালো সেই প্রার্থিত পুরুষকে ধারণ করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বাকি চারজনের অনভিপ্রেত প্রবেশকে অনেকটা সহনীয় করে তুলেছিল।...সেই কৃষ্ণকায় পুরুষ তার বুকে মুখ রেখেছিল, সত্যি হয়েছিল সেই নৈশ নির্মাণ। চরম আশ্লেষে কৃষ্ণাও জড়িয়ে ধরেছিল তাকে।...অহল্যার মতো প্রস্তরীভূত শরীর মুহূর্তেই প্রাণান্বিত হয়ে তখন সবুজে সবুজ। না, ধর্ষণ নয়। সে এক অন্য অবগাহন।

এই অবধি তো খুব সাহস দেখিয়েছেন দেবাশিস। তার ধর্ষণ নিয়ে বৌদির রাজনীতিও ঠিক আছে। পাঁচজন ধর্ষকের চারজনকে থানায় সনাক্ত করলেও, ক্লাবের বেঞ্চে বসে থাকা যাকে দেখে সে নিত্য কামাতুরা হত, যার ধর্ষণে ... সুখে অবগাহন, তাকে সনাক্ত করেনি।

তাকে কেউ ধর্ষণ করেনি, তাকে ধর্ষণ করেছে প্রতিদিন তার আত্মীয়-স্বজন, লিখে রেখে সে মরতে যায়, রেল লাইনে দাঁড়িয়ে সে তার কামনার পুরুষের নাম 'আবিষ্কার' করল,—অর্জুন, সে দ্রৌপদী হয়ে ট্রেনের হেডলাইট লক্ষ্য করে ছুটে যায়। এখানেই কেমন গোলমাল লাগে। বানিয়ে তোলা মনে হয়। যেন এইজন্যই এত কথা। যেন এইটুকু বলার জন্য পাঁচজন যুবক তাকে ধর্ষণ করে। পাঁচজনই কেন? পঞ্চপাণ্ডবের কথা মনে করাতে? এই কৃষ্ণকায় যুবক তৃতীয় বা মধ্যম যুবক কেন? অর্জুন তৃতীয় পাণ্ডব-তাই? গল্পের শেষটুকু গল্পের অন্তর্গত থাকল না।

সতেরোটি গল্পের চারটি গল্প বিনুর—কিশোর ও যুবক বিনুর। পাগল মা আর উদাসীন বাবার সাহচর্যে বড় হওয়া বিনুর গল্প। শেষ গল্পে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গাড়ি করে উত্তরবঙ্গের এক জেলা শহরে রওনা হয়েও মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে আসে। গাড়ির পেছনের সিটে তার মৃতদেহ আবিষ্কার হয়। কিন্তু মরে যাওয়ার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারি না। গল্পের ন্যায় আর জীবনে ন্যায় কিন্তু সবসময় এক থাকে না। গল্পকারের এমন মনে হতেও পারে মৃত্যুতেই সব সমস্যার সমাধান। তা হলেও, গল্পের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তোলার, গল্পের ন্যায়ের অন্তর্গত করার দায়-ও কিন্তু তাঁরই।

দেবাশিস শব্দবন্ধ, উপমা ব্যবহারে তাঁর পছন্দের মধ্যে থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। ভাষা নিয়েও খুব একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে যাননি। গল্পগুলো একসঙ্গে পড়ে এক ঘেয়ে লাগতে-ও পারে কারও। আবার এমনও হতে পারে তাঁর গল্প তিনি এভাবেই বলতে চান। কয়েকটি শব্দের প্রতি তাঁর দুর্বলতা আছে,—যেমন 'অনাস্বাদিতপূর্ব'। কখনও কোনো পাঠকের মনে হতে পারে, শব্দটির ব্যবহারে আর একটু সতর্ক হলে ভালো হত।

গৌতম রায়-এর "১১ ইডিয়ট ও সেই মেয়েটির গল্প"—সংকলনে বারোটি গল্প আছে। প্রাক্‌কথনে আবুল বাশার মশায় বলেছেন 'গৌতম' খাসা গল্প লেখেন।' সংকলনটিকে হাসির গল্পের তকমা দেওয়াটা আমার ভালো লাগেনি। গৌতম হাসির গল্প লেখেননি। তাঁর গল্প বলার ধরণে একটা আপাত সরলতা আছে, মজা করার ভঙ্গি আছে। আমাদের মুখের লবজ্‌কে গল্পের ভাষায় এনে ফেলায় গল্পগুলো পড়তে পড়তে মজাও পাওয়া যায়, কিন্তু নিছক হাসির গল্প মনে হয় না কখনও। গৌতমকে তো গল্প বানাতে হয়নি। রুটিরুজির জন্য তাঁর সাংবাদিক পেশাই নিত্যদিন গল্প জুগিয়েছে। সাংবাদিকের চোখে যা দেখেছেন সদরে-অন্দরে, কখন যে গল্প হয়ে গেছে। তখন তো আর না-লিখে উপায় থাকে না। গৌতমের-ও ছিল না। যে কথা সাংবাদিক গৌতম বলতে পারেন না নানা কারণে, নানা দায়বদ্ধতায়, সেই সত্য তিনি বলছেন গল্পে। কখনোই সাংবাদিকতা গল্পে ছায়াপাত করেনি।

গোটা দুয়েক রাজনীতির গন্ধওলা গল্পে (পার্টি ভোলা, ডাকাতের সফর সঙ্গী) গৌতম তাঁর নিজের তৈরি করা মজার, হালকা রসিকতার চলনে, আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার গল্প বানিয়েছেন। ক্ষমতা একটু একটু করে আমাদের বোধ ও মেধাকে কব্জা করে ফেলে। মূল্যবোধ বদলে যায়। শাসকদলের ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি হয়। আর সেই ডামাডোলে সবচেয়ে আগে ছেঁটে ফেলা হয় আদর্শবান, দলের প্রতি অনুগত, আন্দোলনের—মানুষের আন্দোলনের—মাটিগন্ধমাখা মানুষজনকে। আমাদের চোখের সামনেই এসব ঘটে। আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। গৌতম আমাদের

'অভ্যস্ত হয়ে' যাওয়ার অভ্যেসকে মজা করার ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করেন। দেখার চোখ বদলে দেওয়া যে, ব্যবহার, ক্ষমতাকে ব্যবহারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, গৌতম আমাদের মনে করিয়ে দেন।

গল্প বলিয়ে গৌতম পাঠককে মনযোগী রাখতে পারেন অনায়াসে। তাঁর গল্প বলার কোনো কিছু বানিয়ে তোলা নেই। তাই কোনোরকম দ্বিধা নেই। গল্প নিজের গতিতেই এগিয়ে যায়, পাঠককে তার সঙ্গে তাল রাখতে দৌড়তে হয় কখনও। 'ফিরতি মেট্রো বা অপরেশন মতির মালা গল্পে গৌতম একরকম টেনশন তৈরি করেন, সেই টেনশনই আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয় 'সাইবার বোধ' গল্পে মেয়ের আত্মহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর শোধ' গল্পে। দিবাকরের মেয়ে শ্বশুরের বিকৃত কামনায় আত্মহত্যা করে। দিবাকর বুড়ো বয়সে কমপিউটার শিখে তার বন্ধু এবং বেয়াই-এর সঙ্গে কচি মেয়ে হয়ে চ্যাট করতে করতে তার সব গোপন জেনে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। গৌতম গল্পে টেনশন বুনেছেন ভালো।

গৌতমের গল্প পড়ে ভালো লাগে। গল্পের নিরাভরণতাই গৌতমের বড় শক্তি। তার সঙ্গে কথা বলার ধরনে লেখা আমাদের পিছুতে দেয় না। গৌতমের গল্প পড়ে ভালো লাগে। পাঠককে ভালো লাগানো কিন্তু খুব সহজ কাজ না।

১. *গৌতমী ও অন্যান্য গল্প* : দেবাশিস লাহা। উর্বী প্রকাশন। ১৫০ টাকা।

২. *১১ ইডিয়ট ও সেই মেয়েটির গল্প* : গৌতম রায়। একুশ শতক। ১৫০ টাকা।

সহিষ্ণুতার দ্বন্দ্বসমাস

অনির্বাণ বসু

অতিক্রান্ত শতাব্দীর উপান্তে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহল, নির্মাল্য আচার্য বিহীন কালয়ে যখন নিজেদের লাগসই করে নেওয়ার আয়োজনে রত—মনখারাপের সেই ঋতুতে, অশোক মিত্র, বন্ধুবর নির্মাল্য আচার্য-র প্রয়াণলেখ লিখতে বসে যে-লেখাটি মন্ত্রো করেছিলেন, তার কিছু অংশ ছিল এমন :

> —যাঁরা এলেবেলে স্বভাবের, উচ্ছৃঙ্খলতা যাদের তথাখ্যাত দ্বিতীয় প্রকৃতি, তাঁরাও নির্মাল্য আচার্যের অনুশাসনের প্রকোপে ক্রমশ উপলব্ধি করেছেন পরিশোধন-পরিমার্জন বাদ দিয়ে সৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকচন দুরাশা, নিখাদ স্বভাবকবিকেও কর্মী হতে হয়, এখানে-ওখানে তাঁকেও সংস্কৃতির পরীক্ষায় বসতে হয়, যদি নিজেকে শাসন করতে না শেখেন, তিনিও তাহলে সভাকক্ষ থেকে একদা নির্বাসিত হবেন।

আর এখানেই দেখা দেয় সমস্যা : যে-কোনও লেখাই, তা এমন-কি নিছক প্রেমপত্র হলেও, সে-ও তো লেখকের সন্তানবৎ। সন্তান সর্বাঙ্গসুন্দর না হলে কি তার ঠাঁই অতএব আস্তাকুঁড় ? তেমনটা হলে তো কানা-ছেলের-নাম-পদ্মলোচন মার্কা প্রবাদই তৈরি হত না। বস্তুত মহতী স্রষ্টা ব্যতীত, আর-পাঁচজনের ক্ষেত্রে, ঠিক-ঠিক সম্ভব হয়ে ওঠে না এই 'পরিশোধন-পরিমার্জন' প্রক্রিয়া।

উৎপলেন্দু মণ্ডল-এর *মাটির বাঁশি*, নন্দ চৌধুরী-র *অপেক্ষায় আছি*—গল্প-সংকলন দুটি, উল্লিখিত পর্যায়ক্রমে পড়তে গিয়ে, প্রথম আভাসেই, হাহাকার উঠে আসে নির্মাল্য আচার্য-বিহীনতা-জনিত কারণে। দশচক্রে ভগবানের স্রেফ ভূত বনে-যাওয়ার এই সময়-মুদ্রায়, অবশ্য তিনি থাকলেই-বা কী এমন ফারাক হত। আধুনিকতার হর্ম্যকক্ষে, মুড়ি-মিছরি, সবই তো সেঁধিয়ে যাচ্ছে অকাতরে। বর্তমানে মানুষের 'বাজে-খরচের সময়' কমে গেছে। আগ্রহ-ভরে বই-পড়াও ক্রমেই অপ্রতুল। ফলত উৎকর্ষতার প্রশ্নে সামান্য গড়বড় করেছেন তো মরেছেন : কীটদষ্ট এ-কাননে, বইপোকায় যত-না কাটবে, পোকায় কাটবে বেশি। উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হতে গেলে পরিশ্রমের প্রয়োজন; যে-পরিশ্রম যুগপৎ মেধা আর মননের। ব্যক্তিকথনকে কালির দোয়াতে সাঁতার দেওয়ালেই হয় না; প্রতিযোগিতার আসরে নামলে তাকেও শিখতে হয়, জানতে হয় সন্তরণের রকমফের। এটা ঠিক, উৎপলেন্দুবাবু-র গল্পগুলিতে মাটির একটা পরিচিত সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু মৃৎ-প্রতিমার শরীর থেকে এ-জাতীয় গন্ধই শুধু নির্গত হলে, ভক্তি/ভালোবাসার খামতি দেখা দেবে না-কি? সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রসাদগুণ, বা মানুষের আটপৌরে অন্তরজগতের তলা পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়—*মাটির বাঁশি*-র গল্পগুলির মধ্যে তাই একমাত্র সরেধন-নীলমণি প্রসাদগুণ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু মহৎ সৃষ্টিতে শুধু সেটি থাকলেই চলবে না। বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের রচনা প্রসাদগুণে ভরপুর, অথচ একমাত্র অবলম্বন নয়। আবার লেখকের প্রতিটি গল্পেই এই বৈশিষ্ট্যটি উপস্থিত, তেমনটাও নয় এমন-কি। "মিশ্র প্রতিক্রিয়া"-র মতো গল্প তো এক্ষেত্রে মূর্তিমান ব্যতিক্রম। সেখানে দলীয় রাজনীতির

কোন্দল আছে, নদীর পার ভাঙার কথা আছে; কিন্তু অষ্টপ্রহরের আটকাহন কোথাও নেই। বহুচর্চিত আঞ্চলিক রাজনীতি গল্পে এসেছে এমনভাবে, যা আমাদের পূর্ব-পরিচিত।

সুন্দরবনের ভূমিপুত্র গল্পকার উৎপলেন্দু মণ্ডল। হয়তো-বা সেই শিকড়ের টানেই একটি গল্পের নাম : "জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ"। অন্য গল্পগুলির মতো এখানেও এসেছে নদীর ভাঙন; আর এসেছে বাঘশিকার-হরিণশিকারের বেআইনি কার্যকলাপের কথা। বইটি যেহেতু ছোটোগল্পের, সেখানে এই গল্পটিই সেরা। এখানে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নের অবতারণা না-করলেই নয় : পঞ্চাশোর্ধ্ব পৃষ্ঠার একটি কাহিনি কি ছোটোগল্প হতে পারে? একদা রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" নিয়ে এই বিতর্কের শুরু হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে "নষ্টনীড়" ছোটোগল্পই : সেখানে ঘটনার ঘনঘটা কাহিনির একমুখীনতাকে অতিক্রম করে না। অন্যদিকে, এই বইয়ের নাম-গল্পটি কোনওভাবেই একমুখি নয়—কাহিনির পাশাপাশি উপকাহিনিও প্রচ্ছন্ন আছে, এমন-কি। সে-বাঁশির সুরে ঘর ছাড়লে তাই চোরাবালিতে ডুবতে হয়। কাহিনি বিশ্লেষণে শুধু নাড়া দিয়ে যায় উৎখাত-উন্নয়ন-প্রত্যাখ্যান। যদিও বাঘারু-র সঙ্গে-পরিচিত-পাঠক তাতে অবগাহন করতে পারেন না। আরও একটি খটকা লাগে গল্পটিকে নিয়ে : গল্পটির মাঝে আকস্মিক একটি (উপ) শিরোনাম : 'মিথোজীবি'। অথচ মূল গল্পটির সঙ্গে এর কোনওই মিল চোখে পড়বে না। এমন-কি, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হলেও না। বোঝা যায়, এটি সম্পূর্ণ পৃথক আর-একটি কাহিনি, তা সূচিপত্রে বতই সে গরহাজির থাকুক-না-কেন।

বইটির কষ্টসহিষ্ণু পাঠের অভিজ্ঞতার থেকে মুক্ত হতে-না-হতেই, যদি পাঠক, আপনি, হাতে তুলে নেন নন্দ চৌধুরী-র *অপেক্ষায় আছি*, তাহলে আবারও পার-হয়ে-আসা অভিজ্ঞতার অসহ্য অনুকৃতি। বইটির শেষের মলাটে লেখকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

> নন্দ চৌধুরী অবিরত প্রচারের আলোয় মুখ দেখানো অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত বিখ্যাত লোক নন ...একসময় যুক্ত ছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যচর্চায় ...রাঢ় অঞ্চলের অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সার্থক উত্তরসূরীর অন্যতম প্রতিভূরই নাম নন্দ চৌধুরী।

বইটির পিঠ-প্রচ্ছদে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনাত্মক জ্ঞাপন যে বাচনিক আকর্ষণে খুঁজে বেড়ায় ক্রেতা-সাধারণকে, সে তো প্রতিষ্ঠিত সত্য : *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র বুকম্যান সংস্করণের প্রকাশকের ধাপ্পাবাজির প্রতিবাদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে পর্যন্ত, বাধ্যত "আত্মসমালোচনা" লিখতে হয়েছিল। আলোচ্য বইটির ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তাই। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে একদা যুক্ত ছিলেন লেখক। বাম, না দক্ষিণ—পথ যাই হোক-না-কেন, মোদ্দা বিষয়টি হল, লেখক একটা সময় সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। সে-কারণেই কি-না, কে জানে, তাঁর রাজনীতি-কেন্দ্রিক লেখাগুলির অধিকাংশই উচ্চকিত চিৎকারে হয়ে পড়েছে অভ্রংলিহ প্রোপাগান্ডা। কোথাও-কোথাও এমন-কি, পায়ের জোরে জিতিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বিশেষ শ্রেণিকে; স্বভাবতই ছন্দ হারায় কাহিনিসূত্র।

বইটির প্রারম্ভেই আবদুস সামাদ "পরিচারকা" অংশে লেখকের বৈশিষ্ট্য এবং সংকলিত গল্পগুলির প্রতি একটি সাধারণ ধারণা দিয়েছেন, এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :

ছোটোগল্পের সনেটধর্মী ঘনবুনোট এবং তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতময়তা প্রতিটি গল্পেই ফুটেছে।...প্রতিমা নির্মাণের শেষতম পর্যায়ে যেমন চক্ষুদানের পালা, তেমনি গল্পের সর্বশেষ বাক্যে লেখক মৃন্ময় প্রতিমাকে চিন্ময় করে তুলেছেন। এক চামচ চিনির গল্প (চিনি) শেষ হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তথা চিরায়ত মূল্যবোধের শর্করায়। 'বিষধর' গল্পে সাপের চিহ্ন নেই। রয়েছে কিছু মানুষের হিংসা-বিদ্বেষের বিষোদ্ঘাটন।...নারীদেহলোভী কেষ্টপদর জীবনে হঠাৎ একদিন ষষ্ঠ ঋতু [বসন্ত গল্পের নামও তাই] বসন্ত এনে দেয় তরুণী এক নার্স। কিন্তু এইসব চকিত সংঘটন ও উদ্ঘাটনের জন্য গল্পের শেষ বাক্যটি পর্যন্ত যেতে হবে। শেষ পাতাতেই তো মিষ্টান্ন।

মিষ্টান্নের পরেও থেকে যায় কিছু, যা হজমের কাজ করে। তার অনুপস্থিতি মুহূর্তে বদহজমকে আহ্বান জানাতে পারে। অবশ্য তা কিন্তু ধারে/ভারে কখনওই বোদলেয়ারের বদহজমের ওগড়ানি নয়। শ্রীচৌধুরীর অধিকাংশ লেখাই শেষপর্যন্ত তাই যথার্থ শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রীচৌধুরীর অন্যতম দু'টি ভালো গল্প : "বিকাশের তে-রাত্তির" আর "দিল হুম হুম করে"। এখানে মনোগহনে ডুব দিয়েছেন লেখক। এবং লেখা হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে গল্প দু'টি। যদিও রতন ভট্টাচার্য-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প "কৃষ্ণকীর্তন"-পড়া পাঠককে তা নতুন কোনও সুহানা সফরে নিয়ে যেতে পারে না; আর এখানেই "গট আপ স্টোরি" গল্পটি, পুরাণের নবনির্মাণে, এ-বইয়ের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রতিবেশ এক শ্বাসরোধী তাসের দেশ, সর্বক্ষণ ফরমান নিয়ম-মেনে-চলার। আমাদের আলাপ স্তব্ধ, কথা বন্ধ, কথকতা সৃষ্টির পথ সংশয়দীর্ণ : এহেন সিদ্ধান্তেই কি এসে পৌঁছেছি আমরা? না। আমাদের সেই রৌরবে প্রবেশের পথ; রোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন সমীরণ দাস। চব্বিশটি গল্পের পসরা সাজিয়ে :-*দুই চার গল্প*। আজকের এই কনজিউমারিজমের অভিশপ্ত প্রহরে, অলকানন্দা-জলছাপে, আর্চিস গ্যালারির বিগবাজারে; হৃদয় এবং রবিবাসরীয় আড্ডা—সবই যখন ভেসে চলেছে বানভাসির অশ্লীল বিভঙ্গে—লাইফবোট হয়ে উঠতে চায় এ-বইয়ের অনেক গল্পই। অন্তত হওয়ার আস্পর্ধাটুকু দেখায়। ইদানীং অধিকাংশ সাহিত্যিক মাত্রেই যখন বাজারের চাহিদা মেনে স্টোরি-টেলার হয়ে হাজির হচ্ছেন সম্পাদকের বৈঠকে, ঘাটের দোড়গোড়ায় পৌঁছে যাওয়া (বইটির প্রকাশসাল হিসেবে) সমীরণবাবু; স্রোতের বিপরীতে থাকাটাই তার মন-পসন্দ। তিনি যথার্থই একজন স্টোরি-রাইটার। সস্তা জনপ্রিয়তার হিড়িক উঠবে না হয়তো-বা গল্পগুলিকে ঘিরে; আহা-উহু-বালাই ষাট গোছের কোনও সংবাদপত্রের বেস্টসেলার তালিকায় নাম উঠবে না হয়তো কখনওই—কেন-না, মন-জোগানোর-দায় যারই থাকুক-না-কেন, *দুই চার গল্প*-এর অন্তত নেই। নেই বলেই দুপুরে ভরপেট খেয়ে ঘুম-আসার-সাবস্টিটিউট হতে পারবে না এ-বই, আপনার সবটুকু মনোযোগ দাবি করবে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য-র পাঠক-মাত্রেরই সমীরণবাবু-র গল্প ভালো লাগতে বাধ্য। তাঁর বহু গল্প পূর্বসূরি লোকনাথ-এর *বাবুঘাটের কুমারী মাছ-থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায়-ভোর-যত ঘার তত অরণ্য*-র কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের প্রাত্যহিক চালচলন যে আদতে রাষ্ট্রনির্দিষ্ট গানপয়েন্টে, আমরা প্রত্যেকেই যে আস্ত একটা জেলখানায় বন্দি—"আত্মহত্যার পরিবর্তে" সেই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গল্পই বলে চলে। "হাঁটা" গল্পটি লেখকের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। গল্পটির

শেষটির সঙ্গে কোথাও একটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের "বিজনের রক্তমাংস"-এর সমাপ্তির আপাতসাদৃশ্য চোখে পড়ে :

ক) অনিমেষ চমকে উঠল। চোয়াল শক্ত করল। ওর জন্যই তো এত ভোগান্তি। বলতে ইচ্ছে করল, চলে যেতে বল ভদ্রলোককে। দেখা করব না, ব্যস্ত আছি। কিন্তু বলতে পারল না। চোরা স্রোতের মতো কী যেন প্রচণ্ডভাবে টানছে ওকে। বলল, একটু বসতে বল, আমি ভাবছি। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পিছনে হাঁটতে লাগল।

খ) আগে থেকে এনগেজমেন্ট করে পরদিন বিকেলে বিজন একজন স্পেশালিস্টের কাছে গেল। স্পেশালিস্ট প্রথমে প্রায় আধঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করে, তারপর সাঁড়াশির মত স্টেথিশকোপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন যে, বিজনের অতি গুরুতর অসুখ হয়েছে। এর কোনো ওষুধ নেই, এর কোনো চিকিৎসা হয় না; কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে এর ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে, এইজন্যে, যতদিন সম্ভব বেশি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, তিনি এখুনি বিজনের চিকিৎসা শুরু করবেন।

বিজনের ততদিন বেঁচে থাকা দরকার।

অস্তিত্বের সংকট তাঁর গল্পের প্রধান ভরকেন্দ্র। "শরীর বিষয়ক একটি বিজ্ঞাপন", "সর্প সহবাসে", "যুদ্ধে হারে না যে বিড়াল", "সমুদ্র মন্থন ও বিষপানের গল্প"—প্রায় সবক'টি গল্পে ধ্রুবপদের মতো ফিরে-ফিরে আসে অস্তি আর নাস্তির নিয়ত দ্বান্দ্বিক প্রবাহ। সমীরণবাবু-র গল্প আমাদের আসলে তুলে দেয় সেই সিঁড়িতে, যা ঘুরে-ঘুরে উপরে ওঠে। এবং ভেঙে যায় অতঃপর।

বই তিনটির প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, ফটোগ্রাফ যদি মলাট হয়ে যায় কোনও সৃজনশীল সাহিত্যের, তাহলে তার যত্ন সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে। বরং অ্যাবসার্ড আর্টে, শুধুমাত্র শরীরী অবয়বের বিন্যাসে ভালো লাগে *দুই চার গল্প*-র প্রচ্ছদ।

"কবিতার কথা"-র প্রথম বাক্যেই জীবনানন্দ যে-আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন, সামান্য রদবদল করে, এই মুহূর্তে সেই কথাটাই বলার প্রয়োজন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে : সকলেই যেমন কবি নয়, তেমনই সকলেই লেখক নন, এমন কি পাঠকও নন। গন্তব্য যার যাই হোক-না-কেন, তার জন্য একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে হয় প্রত্যেককে। নিরন্তর সেই চর্চারই আজ বড়ো বেশি প্রয়োজন।

উৎপলেন্দু মণ্ডল, *মাটির বাঁশি*, কলকাতা : বইওয়ালা, ২০১৪, ৮০ টাকা।
নন্দ চৌধুরী, *অশেষের আছি*, বর্ধমান : বোধন প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৭, ৮০ টাকা।
সমীরণ দাস, *দুই চার গল্প*, কলকাতা : পাণ্ডুলিপি, আগস্ট ২০১২, ৩০০ টাকা।

এক আধারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিন্ন দুই সুর

অদ্বৈত সিন্নাহীনবীশ

সমান ও সমান্তরাল দুভাগে ভাগ করা শিল্প চেতনায় সৃষ্ট দুটি উপন্যাস ও একটি ছোটোগল্পের বই। স্রষ্টা অনিতা চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস দুটি একটি বইয়ের দু'মলাট বন্দী যেন একই ফ্ল্যাটবাড়ির দু'টি কক্ষ। আলাদা। কিন্তু এ ফ্ল্যাটের টুংটাং কিংবা উল্লাস-বিলাপের স্বর-শব্দ ও ফ্ল্যাটে গিয়েও কিছু আবহ রচনা করে। উপন্যাস দুটির একটি চোখে মানসে চলচ্চিত্র অন্যটি 'দোতারা' গোটা বইটির ডাকনাম 'দোতারা'। একটি গহন অথচ উজ্জ্বল মফস্‌সলি পল্লীগ্রাম ভিত্তিক, একটা শিশু বললেই চলে, দেখতে কুচ্ছিত নয়, অনাদর বা উদাসীন উপেক্ষায় লীন,—অযত্নের স্নেহে লালিত পালিত এক কন্যা 'বুলি'-র চোখের সংবেদনশীল ক্যামেরায় ধরাপড়া আঞ্চলিক সংস্কার, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নানান কিসিমের চরিত্র এবং উচ্চ ধনীপরিবারের চলনবলন মেজাজ অহমিকা, সম্পর্কের জোড় এবং পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে শোকাবহ অঘটন ঘটানো ও বিবদ ছায়ায় স্তব্ধ করে দেওয়া পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ধর্মী চলচ্চিত্র; আর দক্ষ হাতে, শিশু মনস্তত্ত্ব মাথায় রেখে, সেই প্রায় শিশু কন্যাকেই প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপনের উপকথা এবং অন্যটি সম্পূর্ণ মেট্রোপলিটান সর্বাধুনিকতায় গঠিত অন্তর্মানস দ্বন্দ্বে দীর্ণ সম্পর্ক সচেতন সুশিক্ষিত রুচিস্মতী রমণীর ফ্রয়েড-ইয়ুং-আদির অবচেতনের দার্শনিক মানসিকতায় বিধ্বস্ত প্রাণের বার্নাড শ-র নায়িকার মতো নৈঃশব্দিক জিজ্ঞাসা, যদি পাঁচ জনকেই ভালোবাসা, কেন সে ভালোবাসায় দেহ নিমজ্জনে মানা? এবং সে জিজ্ঞাসার উত্তর আবিষ্কার করেই নায়িকা প্রধান উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র 'সুমনা'-র সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ আইনানুগভাবে পাওয়া পুরুষ অন্য জীবন-সতেজ পুরুষে অথচ ঘর না ভেঙে, পারিবারিক সম্পর্ককে অটুট রাখার জোরালো ভূমি প্রস্তুত করার বলিষ্ঠ সাহসিকতা ও সক্রিয়তা উপস্থিত করে, যা স্থবির চেতনাকে ঘা দিয়ে সমাগত ও অনাগত সময় সচেতনা ধরানোর নিগূঢ় বাস্তবের কথাশরীর।

বুলি-সুমনার এই দুই ধারাই প্রতিফলিত অনিতার ছোটগল্পের বই 'যুগান্তিকা ও অন্যান্য'। এ বই-য়ে আছে উনিশটি ছোটোগল্প। এই উনিশটি গল্পের বেশির ভাগ গল্পেরই পটভূমি মফস্‌সলি গ্রাম তথা এক বিশেষ অঞ্চল। গ্রন্থনামে 'যুগান্তিকা' এই নাম গল্পটির উল্লেখ থাকাতে পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে লেখিকা একটা ইঙ্গিত রাখতে চেয়েছেন এই দিকে, যে, যদিও তাঁর সৃতিকক্ষে বুলি-চেতনাই প্রাধান্য পায়, তিনি 'সুমনা' চেতনাকে সজ্ঞানেই স্বীকৃতি দেন, সময়ের পরিবর্তনকে অস্বীকার করার মতো মূর্খামি তাঁর নেই। তাঁর গল্পের নারী প্রতিবন্ধক সমাজ সংস্কারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে বলতে পারে, 'আমি সিঙ্গিল মাদার হব মম্। আর তো ছ মাস, কলেজ ক্যাম্পাসি শুরু হলে কিছু নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। রুজুর সন্তান, সে বোবা কালা যাই হোক না কেন। আর কাজরি? ও থাকবে ওর সন্তানের কাছেই'। আদিবাসী তরুণী যার "পুরুষ্ট বুক, ঢলঢলে মুখ"-দেখে কালো গায়ের রং তুচ্ছ করে সম্ভোগ ক'রে গর্ভে বীজ বুনেছে যে রুজু, সেই প্রেমিক রুজুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে

ইঞ্চি আধুনিক মানবী কাজরির গর্ভে বেড়ে ওঠা খজুর সন্তানকে অ্যাডাপ্ট করে সিঙ্গল মাদার হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার সংকল্প ঘোষণার মধ্যে 'দোতারা' উপন্যাসের সুমনা-চেতনারই দ্যোতনা অনুভব করা যায়।

যে প্রকৃত কথাশিল্পী, তার কলমে মুখের কথা আর্টিস্টের কেবল চোখ বা রাজনীতিওয়ালার কেবল গলার কুশলী জোর কিংবা গায়কের কেবল কানই যদি থাকে, তাকে শিল্পী বলা যায় না। শিল্পীকে হতে হয় আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সচেতন। তাকে হতে হয় সুন্দর বীভৎস, অসঙ্গতিতে ভরা ক্রিয়াকাণ্ড কি সুখ আনন্দ বেদনাদায়ক যেকোনো ঘটনায় স্পর্শকাতর ও জাগ্রত মনের অধিকারী। জীবন প্রবাহের যেকোনো ঘটনায় তার চেতনা সাড়া দেয় এবং মানুষ সম্পর্কে যার থাকে সনিষ্ঠ আগ্রহ, তাকেই বলা চলে যথার্থ শিল্পী। তার প্রত্যক্ষ ও অধীত অভিজ্ঞতাই শিল্প শরীরে সঞ্চার করে মানবিক আবেদন। অনিতার উপন্যাস ও ছোটোগল্পে সেই শিল্পচেতনা দুর্লক্ষ্য নয়। একটা অভিজ্ঞ মরমী মন নিয়ে তার সাধারণ-অসাধারণ নানা শ্রেণীর, নানা বর্গের ধনী নির্ধন, নিরক্ষর অত্যুচ্চ শিক্ষিত মানুষ-পাঠের সঙ্গে আছে গ্রাম পরিবেশ ও নাগরিক-পরিবেশ পাঠের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নিসর্গের প্রতি তার কবিসুলভ আগ্রহ কী গল্প আর কী উপন্যাসের আলম্বন বিভাব গুলোকে যেমন যথার্থ উদ্দীপিত করে তেমনি ঘটনাগুলোরও উপযুক্ত আবহ রচনা করে।

চোখের মানসে চলচ্চিত্রের বুলির আয়নায় মুখের মেলা। এ আয়না বুঝিবা লেখিকা নিজেই। একটা অঞ্চলের সার্বিক চিত্র-চরিত্র আচার আচরণ ক্রিয়াকর্ম, এমন কি ভাষাও যেভাবে তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে—যেভাবে নানা কিসিমের মানুষ নিজ নিজ আচরণিক ও বাচিক ভঙ্গি নিয়ে উপন্যাসে ধরা দিয়েছে, তা দেখে লেখাটিকে যেমন বলা যায় আঞ্চলিক, তেমনি বলা যায় আত্মজৈবনিক উপন্যাস—বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জাত। লেখার শৈলীও চলচ্চৈত্রিক কুশলীর আদলে। 'ক্যামেরা', এ বইয়ের প্রথম প্রকাশ কালে ভূমিকা লেখক বীরেন্দ্র নিয়োগীর কথায়, 'কখনো প্যান করে, জুম করে। কখনো ক্লোজ শট কখনো বা লঙ শট এবং হঠাৎই ফ্রিজ। অসংখ্য ফ্ল্যাসব্যাকে অন্বিত হয়ে যায় অতীত আর বর্তমান।" প্রকৃতি ও মানুষ শিশুপ্রায় বুলির হৃদয়ের ক্যানভাসে একাকার। বুলির সাথী ফুলির মৃত্যু এবং বিয়ের রাতের পরের সকালে অতীন দা ও রাতের দিকে বুলির দিদি টুনুর ট্র্যাজিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা শোকের চেয়েও ভারী শুকনো অন্ধকারে বিরাজী পিসির একচিমটে আদর তাকে যেন পৌঁছে দেয় সব শূন্য শূন্য নয় ব্যথাময় বোধে।

'দোতারা' উপন্যাসেও শিল্প কৌশল একই। ব্যারিস্টার জ্ঞানপ্রকাশ মুখার্জির বউ, তরুণী সোলনের মা, কুন্তলের প্রাক্তন প্রেমিকা ও নিশীথের কাছে মনের সঙ্গে দেহ বিলিয়ে দেওয়া উচ্চ শিক্ষিতা কল্পনা প্রবণ ও নিসর্গের প্রশান্ত সৌন্দর্যপিয়াসী সুমনার অন্তর্লোক বিশ্লেষণ করে এক জট জটিল নানা মাত্রিক প্রেমকাহিনি উপস্থিত করেছেন এ উপন্যাসে অনিতা চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকটি প্রধান পুরুষ-চরিত্রই প্রেম ভালোবাসার কাঙাল এবং আইনকে মান্যতা দিয়ে প্রেমের স্বর্গ পরকীয়া শরীর সম্পর্ক স্থাপন করা। ব্যতিক্রম মি. মুখার্জি ও দু'একটা পার্শ্বচরিত্র, যেমন সুমনার জামাইবাবু ও নিশীথের ছোটোভাই দীপক। মোট কথা এ বইতে মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত

সমাজের কিশোর, কিশোরীর উৎপন্ন প্রেম স্বকীয়া-পরকীয়া প্রেম চেতনার নানা আকর্ষণ বিকর্ষণের গুটি তৈরি ও রেশম খোলার জটিল চিত্র, অ্যাফ্লুয়েন্ট জীবনযাপনের চলচ্চিত্রের সঙ্গে নাগরিক নিসর্গ ও স্মৃতিধৃত গ্রাম প্রকৃতি ও ভ্রমণে সংস্পর্শে আসা নিসর্গরূপের প্রত্যক্ষতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এবং সবটাই সুমনার নানা কৌণিক হীরক খণ্ডের মতো মনের মধ্যস্থতায়। সুমনার যাপিত যৌবনের সুখ-দুঃখ বিবাদ আনন্দের মধ্যে দিয়ে নাগরিক বিত্তভোগী সমাজটা যেমন দ্যোতিত, তেমনি নারীর স্বাধীনতা স্পৃহা ও সীমাটা কতদূর ও কেমন ও জিজ্ঞাসাটাও জাগিয়ে মোটামুটি একটা উত্তর তল্লাসেরও প্রয়াস চালিয়েছেন অনিতা, দেখিয়েছেন সব থেকেও কী যেন নেই সভ্যতাদর্পী সমাজের নারীর। সুমনা নিশীথকে বলেছে, "আমি বড় ক্লান্ত নিশীথ, আমার সব আছে অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, সন্তান। কিন্তু তা আমার কি? ভালোভাবে বাঁচতে গেলে এর সব কিছুই প্রয়োজন, এর বাইরে কি কিছুই চাওয়ার নেই?" এমন প্রশ্ন মনে জাগাতেই কি ডি. এইচ. লরেন্স-এর লেডি চ্যাটার্লি তার বনপ্রহরী মেলর্সএ নিজের সম্মান সর্বস্ব ও শরীর নিয়ে ঝাঁপ দেয়নি? সুমনাও নিশীথে ঝাঁপিয়েছে, কিন্তু পেয়েছে কি তৃষ্ণার শান্তি? সুমনার আন্তর বিবৃতি, "মা, মাতৃত্বের একটা অহংকার আছে। মা হলেই গাছ, পাখি, পশু, মানুষ সুন্দর হয়—পরিপূর্ণ হয়। মাতৃত্বের সফলতা সুন্দর সন্তানে। সন্তান সুন্দর কি করে? গাছ, পাখি, পশু তাদের কোন চাহিদা নেই, চিন্তা নেই। কিন্তু মানুষ? তার চাহিদার পারদ আরো, আরো, আরো —ধরতে পারেনা। ফলে যা পেলাম তাতে নয়। যা পেলাম না, পাব না, পেতে পারি না তার জন্য নিজে ছুটে সন্তানকেও ছুটিয়ে নিয়ে ফেরা"। লেখিকার যোজনা, 'মনটা বিষণ্ণতায় ভরে যায়' সুমনার তবু দুটি নারী-পুরুষ হয়েছে বন্ধনবিহীন স্বতন্ত্র থেকেও নতুন জীবনের জন্যে উন্মুখ।

এই দুখণ্ড স্বতন্ত্র মানসিকতারই সৃষ্টি অনিতার ছোটোগল্পের সংকলন 'যুগান্তিকা ও অন্যান্য'। সূচনাংশেই এ বই সম্পর্কে কিছু বলা গেছে। জাতে ও ধাতে সব গল্পই আলাদা আলাদা স্বাদের। গল্পগুলোতে আছে আঞ্চলিকতার স্বাদ। প্রতিটি গল্পে বহু চরিত্র এবং বিশেষ মুহূর্তে চকিতে উঁকি দেওয়া কলমের এক একটি ইঙ্গিতবহ আঁচড়ে আঁকা। প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত। গল্পে সহসা দেখা দিয়ে মুহূর্তে উবে যাওয়া চরিত্রটির ওইটুকু উপস্থিতি না থাকলে নিশ্চিত অভাব থেকে যেত। অতি মুন্সিয়ানায় বিচিত্রিত চরিত্রগুলো একটা অঞ্চলের সত্য নির্ভর আলেখ্য। গ্রাম্য আচার-আচরণ, গোঁ গোয়ার্তুমি, ক্ষুদ্র স্বার্থ, শয়তানি, দারিদ্র্য, বিত্তবানের মর্জি ও মহানুভবতা সংকীর্ণতা, হীনতা, অসাম্প্রদায়িকতা, ভণ্ডামি, পড়শীপানাভাব যেমন আছে অনিতার গল্পে, তেমনি আছে রঙ্গরস, লোকসংস্কৃতিভুক্ত নানা অনুষ্ঠান যাত্রা পালাদির পরিচয়, এবং সবটাই লেখিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উৎপন্ন। নন্দরানী, ষষ্ঠী ঠাকরুণের সংসার ও ছাগল, অষ্টকথা, চনার বাবা ইত্যাদি গল্পে লেখিকার উইট হিউমার স্যাটায়ার সৃষ্টি ক্ষমতা বিস্ময়কর। যেখানে অসংগতি—সে কী আঙ্গিক বা বাচিক—ঘটনায় কি মানসিকতায়, বাহ্যিক আচরণে কি চিন্তাচেতনায়, সেখানেই তির্যকতা—শ্লেষ। হাস্যরস লেপ্টে আছে অনিতার প্রায় সব গল্পেই। আবার যেখানে সিরিয়াস হবার দরকার, সেখানে ভাষা ও উপস্থাপনায় ভঙ্গিও হয়েছে যথাযথ। যেমন 'নস্টালজিয়া', 'যুগান্তিকা', 'বসন্ত এসেছিল'। সময়ের চাপে প্রতিষ্ঠিত জীবনের ছাঁচ

এক অন্তদর্পণের আখ্যান

বিশ্বজীবন মজুমদার

ছোটনাগপুর মালভূমি ঝাড়খণ্ডের এক সুরম্য অঞ্চল। মূলত উপজাতিদের আদি বাসস্থান। তারপর এল বিহারের হিন্দি বলয়ের মানুষ। অন্যদিকে গড়ে উঠল বাঙালি বসতি। এই অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গে তারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। হয়ে উঠল তাদেরও স্বভূমি। কিন্তু শতাব্দী অতিক্রান্ত হতেই তাদের বিশ্বাসে ভাঙন ধরতে শুরু হল। হিন্দি জনগোষ্ঠী প্রবল হয়ে উঠল। অর্থে এবং সামর্থে। আদিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের সমঝোতা শুরু হল। তৈরি হল ঝাড়খণ্ড রাজ্য। বাঙালিরা তার স্বক্ষেত্র হারাতে শুরু করল। এই মনোরম রাজ্যটি বাঙালির পক্ষে আর নিরাপদ রইল না। এমন একটি পরিসরকে স্মরণে রেখে রচিত হয়েছে ‘শেষ বেলা’ উপন্যাসটি। লেখক চিন্ময় গুহঠাকুরতা। কবি হিসেবে তিনি সুপরিচিত। এবার ঔপন্যাসিক রূপে তিনি বাঙালির জটিল জীবন সম্বন্ধে সাহসের সঙ্গে উন্মোচিত করেছেন।

এই উপন্যাসে সমাজ, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, হিংস্রতা, প্রেম, সবই স্থান পেয়েছে, কিন্তু কোনো বিষয় অন্য বিষয়কে অতিক্রম করে উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি। লেখক উপন্যাস পঠনে পাঠকের আগ্রহকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন।

উপন্যাসটির কাহিনি বিস্তারে আছে শেষ বেলায় দুই প্রবীণ বাঙালি পুরুষ; ভবতোষ এবং অখিলেশ বাল্যবন্ধু এই দুজন ষাট অতিক্রম করে অবসর নিয়েছেন। তাদের চেতনায় বারগণ্ডার অতীত আজও উজ্জ্বল। কিন্তু নিষ্প্রভ হয়ে আসছে বর্তমান। আতঙ্ক সৃষ্টি করছে ভবিষ্যতের ভাবনা।

ভবতোষের একমাত্র ছেলে নীলাঞ্জন দুর্ঘটনায় ডানপায়ের গোড়ালি এবং পাতা হারিয়ে অনেকটাই প্রতিবন্ধী। একদা দুরন্ত ছেলে এখন শান্ত নীরব। ভবতোষ তাকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েও পারেননি। ছেলে টুকটাক ইলেকট্রিকের কাজ করে। গ্র্যাজুয়েট হয়েও প্রতিবন্ধী কোটায় চাকরি পায়নি। তবু ভবতোষ বারগণ্ডা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা ভাবতে পারেন না। শৈশব থেকে এ শহর তার জীবনের শেকড়।

বন্ধু অখিলেশ নিত্যসঙ্গী হয়েও বারগণ্ডার বন্ধন ছেড়ে চলে যেতে দ্বিধা করেন না। সাংসারিক প্রয়োজনে এখানকার বাস উঠিয়ে তিনি পাটনা চলে যান। সেখানে ছোটো ছেলে হিমাদ্রির চাকরির সম্ভাবনা তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। পাটনায় বড়ো ছেলে চাকরি করে। ছোটো মেয়ে লিপিও কলেজে পড়বার সুযোগ পাবে। দুই বন্ধু ঘর ও বাইরের টানাপোড়েনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এককথায় ভবতোষ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সকালবেলা চাদর জড়িয়ে ভ্রমণে বেরোন। সামনে দুর্গাপুজো। বারগণ্ডার আকাশে বাতাসে তার আভাস খুঁজে পান তিনি। এককথায় এই বর্ধিষ্ণু বসতিটিতে ভ্রমণ পিপাসু বাঙালিদের ভিড় জমত। এখন আর তাদের দেখা যায় না। শুরু হয়েছে উলটো স্রোত। শুরু হয়েছে এখান থেকে চলে যাওয়ার পালা। আর এই পালা-বদলের রূপটিকে লেখক তার মরমী চেতনায় তুলে ধরেছেন।

পথে শিক্ষক পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা। তিনি চলেছেন লাখনবাবুর বাড়িতে ছেলে পড়াতে। আশি বছর আগে প্রফেসার কমল সরকারের জমকালো বাড়ি আজ লাখনবাবু কিনে নিয়েছেন। সেটিও ভগ্নপ্রায় পুরোনো অভ্রের খনিও আজ আর নেই। লাখনবাবু কংগ্রেসের ডাকসাইটে নেতা, মারকুটে এবং অনেক টাকার মালিক। এমারেল্ড হাউসের ফুলের বাগান এখন গরু মোষের বিচরণ ক্ষেত্র।

সুদীর্ঘ কালের দুটি দুর্গাপুজো একটিতে ঠেকেছে। উদ্যোগী যুবক শ্যামলের প্রচেষ্টায় সেটি টিকে আছে। তার সঙ্গে আছে জনাকয় বাঙালি যুবক যুবতী। কিন্তু শ্যামল এখন গুরুতর অসুস্থ। গাছগাছালির ঘ্রাণ নিতে নিতে এইসব কথা ভাবছিলেন ভবতোষ।

মহুয়া ফুলের গন্ধে একসময় তার মন হারিয়ে যায় স্কুলের স্মৃতিতে। হাদি আর মতিলালের বন্ধুত্ব। ওরা দুজন পাঁচ মাইল দূর থেকে সাইকেল চালিয়ে আসত। তিন বন্ধু মিলে হাদির পয়সায় ইসমাইলের দোকানে চপ আর ডিমের ডেভিল খেত। স্কুল পালিয়ে দুপুরের শোতে হিন্দি সিনেমা দেখত। একদিন হাদি আর মতিলাল বারমাসিয়ার খারাপ পাড়ায় তাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে বাইরে দাঁড়িয়ে একা সিগারেট খাচ্ছিল। শহরের সেরা ক্রিকেটার, প্রণবেশ চট্টরাজ ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন সকলের কিংদা। কিংদা তাকে সেই অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। ওঁর সামনের ভঙ্গিটি অন্যরকম। মৃদু তিরস্কার করে সাইকেলে চলে গেলেন। এতদিন পরেও সেদিনের লজ্জা ও অপমান ভবতোষ ভুলতে পারেননি। ধীরে ধীরে হাদি ও মতিলালের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কমে গেল। তবু তাদের সঙ্গে মহুয়া খাবার গন্ধ যেন পথের সঙ্গে মিশে থাকে।

উশ্রী নদীর ওপারের একটা ছোটো পাথুরে টিলা। নদীখাতে জলহীন বালিয়াড়ি। ভবতোষ বন্ধুদের সঙ্গে চলে যেতেন ওই টিলাতে। কখনও চড়ুইভাতি করতে, কখনও বা বনফুলের খোঁজে।

একবার খেলাচ্ছলে হাদি একটা পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল। তার ধাক্কায় একজন অচেনা মানুষের মাথা ফেটে গিয়েছিল।

সেসব কত কালের কথা। ক্ষীণ ধারা উশ্রী নদী কতবার বর্ষায় খরস্রোতা হয়ে কত গ্রাম ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ বারবার আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিয়ে গেছে। কত চেনা মানুষ হারিয়ে গেছে। কত নতুন মানুষ বসতি করেছে।

সাত সকালে স্মৃতিচারণা করতে করতে একটা শূন্যতা বোধ ভবতোষকে পীড়িত করে। একটা ঘোরের মধ্যে চলছিলেন তিনি। ছুটন্ত দুটি টাঙ্গা রাস্তা জুড়ে ছুটে আসছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন। শহরটায় যেন বেপরোয়া হয়ে ছুটছে সবাই।

ভবতোষ চাদরটা ভাঁজ করে কাঁধের উপর রাখলেন, শরতের মিঠে রোদ ভালো লাগছে। শিউলি তৈরি করে দেয়। হঠাৎ একটা ডাক শুনে তাঁর আবেশ ভেঙে গেল। চব্বিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক মন্টু তাঁকে ডাকছে। সবার প্রিয় এই যুবকটি গ্রাজুয়েট হয়েও চাকরি পায়নি। শেষ পর্যন্ত ছোটো একটি স্টেশনারি দোকান খুলেছে সে। স্মৃতি থেকে তিনি বাস্তবে নেমে এলেন।

নিউ বারগণ্ডার দিকে এখন অনেক নতুন মুখ। একটা অচেনা শক্তি লুটপাট করে রাজ্য চালাচ্ছে। চলছে ধর্মান্ধতা, জাতপাতের দোহাই, ভাবার দ্বন্দ্ব। লাখনবাবুর মতো লোকদের

পোয়াবারো। বাঙালিদের পুরোনো বাড়িগুলি দখল হয়ে যাচ্ছে। ছেলেপুলেরা বাইরে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। বুড়োবুড়িরা পড়ে থাকছে পুরোনো বাড়িতে। সকাল থেকে নানা ভাবনার জের মিটিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ভবতোষ। স্ত্রী সুরমার কাছে চা চাইলেন।

উপন্যাসের শুরু ভবতোষকে নিয়ে। উপন্যাসের অন্তিমেও ভবতোষ। মাঝখানে নানাজনের খণ্ড খণ্ড ঘটনার টুকরো। এই টুকরোগুলি নিয়েই উপন্যাসের মালা গাঁথা হয়েছে।

কালের অভিঘাতে বারগণ্ডায় আজ একটি মাত্র দুর্গাপুজো। বাহান্ন বছর ধরে বাঙালির আনন্দ উৎসবের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে অবশিষ্ট যুবক যুবতীরা। লাখনবাবু তাঁর ক্ষমতা আর অর্থ নিয়ে এই দুর্গোৎসবের কাণ্ডারি হবার লোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাপূরণ হয়নি।

আরেক দিকে ঝাড়খণ্ড গঠনের দামামা বেজে উঠেছে। উন্মেখিত হয়েছে গোপাল মাহাতো, শিবু সোরেনের মতো রাজনৈতিক চরিত্রের। রাজনৈতিক উন্মাদনার মধ্যে বাঙালি তার অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভাবছেন। ঝাড়খণ্ডে হিন্দির প্রাধান্য যথাযথ রইল, আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির দরজা খুলে গেল। শুধু বাঙালির সবরকম বিকাশের দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকল।

এবার ঔপন্যাসিকের কথা বলা যাক। ছোটনাগপুর বাঙালি জীবনের যে অবক্ষয়িত রূপ তিনি তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে হয়তো নিহিত আছে ষাট সত্তর বছর আগে বাংলা বিভাজনের গভীর বেদনা। জাতির একটি বড় সমষ্টির নীড় যদি ভেঙে যায়, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর তার আঘাত পড়ে সবচেয়ে বেশি। অবশ্য পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালির সংকট তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতায়। ছোটনাগপুরে বাঙালির সংকট এসেছে রাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্নতার মধ্যেই। এর আর্থসামাজিক রূপটি আরও জটিল।

আমরা আবার উপন্যাসের মূল কাহিনিতে ফিরে আসছি।

অখিলেশের সপরিবারে পাটনা চলে যাবার সিদ্ধান্তে ভবতোষ দুঃখ পেলেও তাকে বাধা দেননি। কঠোর বাস্তবতাকে অস্বীকার করায় কোনো শক্তি তিনি খুঁজে পাননি। বন্ধুর মহাপ্রস্থান যাত্রাকে গভীর বেদনার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, বন্ধুপত্নী সুনয়নীর হাতে তৈরি চা খাবার মরমী মুহূর্তকে তিনি আর কোনোদিন ফিরে পাবেন না। অখিলেশের এই সিদ্ধান্তে হিমাদ্রি ও দীপা, মন্টু আর লিপির হৃদয়ের দরজা খুলে গিয়েছিল, শুরু হয়েছিল তার আবেগময় মুহূর্ত। লেখক তার সূচনায় ছবি এঁকেছেন। কিন্তু প্রেমের পরিণতির কোনো অবকাশ রচনা করলেন না। নীলাঞ্জনের জীবনেও প্রেম এসেছিল, কিন্তু বাস্তবের রূঢ়তায় তা হারিয়ে গেল। ভবতোষের স্ত্রী সুরমা চরিত্রকে লেখক নেপথ্যে রেখে দিয়েছেন।

উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র অতসী। নিতাই সরকারের সাঁইত্রিশ বছরের মেয়েটির স্বামীর সংসারে স্থান হয়নি। বাবা মরে যাবার পর বনবিতান বাড়িটিতে সে একাই থাকে। বাড়িতে সে গানের স্কুল খুলেছে। গানের সূত্রেই ধনী ব্যবসায়ী অভিরামের সঙ্গে তার পরিচয়। জীবনের শূন্যতা একদিন দুজনকে কাছে টেনে নিয়ে এল। পাপপুণ্যের বোধ তাদের হারিয়ে গিয়েছিল। অতসী সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ল, কিন্তু মাতৃত্বের কোনো অনুভব তৈরি হল না। বিষয়টি সকলের আড়ালে রাখার জন্য অভিরামের ইচ্ছাকেই সে মেনে নিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল সন্তান প্রসবের পর কোথাও শিশুটিকে দান করে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি। উষ্ট্রীর বালিয়াড়িতে

শিশুটিকে পুঁতে ফেলে হত্যা করা হয়েছিল। অসহায়তা এবং নিষ্ঠুরতার এমন ভয়াবহ চিত্রটি মনুষ্যত্ববোধের অবক্ষয়তা দেখাতেই সম্ভবত লেখক তুলে ধরেছেন। রাত্রির অন্ধকারে আকস্মিক ভাবেই এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটির সাক্ষী হয়ে রইলেন ভবতোষ আর মন্টু। অতসীর আদিবাসী ভৃত্য শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘাতকের আঘাতে সে তা পারেনি। মন্টু তাকে উদ্ধার করেছে। শিশুটি হিংস্র শেয়ালের ভক্ষ্য হয়েছে। হত্যাকারী দুজনও অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এরপর অতসী বারগণ্ডা ছেড়ে চলে যায়। লাখনবাবুর ভাগনে প্রমোটার রামপ্রসাদ বনবিতান কিনে নেয়।

এই অমানবিক দৃশ্যটি দেখার পর ভবতোষের শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ে, সুরমাকেও তিনি এই ঘটনার কথা জানাননি। এককভাবে বহন করেছেন এই দুঃসহ অভিজ্ঞতার বেদনাকে।

চৈত্রের পশ্চিমা বাতাসে নির্জন উশ্রীর ধারে চেয়ে বসে থাকেন ভবতোষ। কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল ছড়িয়ে আছে চারদিকে। শেষ বসন্তের রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিকে। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে অতীতের সব স্মৃতি ভেসে যায়। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের আলোকবিন্দু দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন ভবতোষ। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

'শেষ বেলা' আসলে বেলা শেষের গান মানুষ জীবন গড়ে তোলে। একদিন তা ভেঙেও যায়। হৃদয় দিয়ে এই ভাঙনের সুন্দর অনুভব করতে করতেই কি চলে গেলেন ভবতোষ?

উপন্যাসটি শুধু সুখপাঠ্য নয়, চলমান জীবনের অন্তরালে পাঠকের অনুভবনে তা নাড়া দিয়ে যায়।

শেষ বেলা : চিন্ময় গুহঠাকুরতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৫০ টাকা

তিন লেখকের তিন সমালোচিত গ্রন্থ

মৌসুমী বোস ব্যানার্জী

'Book review' অর্থাৎ গ্রন্থ সমালোচনা করা কাজটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার থেকেও বড় কথা, লেখক তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার স্থান থেকে গ্রন্থটি রচনা করেন। তাই তাঁর মানসিকতাকে বুঝে নেওয়াটা আমাদের অত্যন্ত জরুরি। সমালোচনা মানেই যে লেখককে চক্রব্যূহে আবদ্ধ করে তাঁকে চতুষ্পার্শ্ব থেকে নানাভাবে কুকথার আক্রমণ করা তা কিন্তু মোটেই নয়। সামান্য ভুল-ত্রুটি তো সকলের ক্ষেত্রেই হয়, আর তাকেই মধুর বাক্য দ্বারা তুলে ধরে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই সমালোচনার মূল লক্ষ্য। ভালোমন্দ সবটাই সমালোচনায় স্থান পায়। ভালোমন্দ দোষ-ত্রুটি সবই তুলে ধরে সমালোচনা করার চেষ্টা করেছি, কোনোভাবে লেখক বা লেখিকাকে আঘাত করে নয়।

কাজল মিত্র-র 'সেই রাত সেই সকাল' এই গ্রন্থটি মোট ২০টি গল্পের সংকলন নিয়ে প্রকাশিত। গল্পগুলিতে যেমন আবেগ রয়েছে তেমনি রয়েছে বাস্তবতা। বইটির প্রচ্ছদ অত্যন্ত নিম্নমানের। আরেকটু যত্ন সহকারে নির্বাচন করলে ভালো হত, গ্রন্থটিতে কোন মূল্য নির্ধারিত করা নেই। আর, প্রস্তাবনা অংশটি একটু অন্যভাবে লিখলে পাঠক বেশি আকর্ষণ বোধ করত বলে আমার মনে হয়েছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠার কাগজের মান অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের। 'সর্পমুখী' গানটি সাপুড়েদের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন খুকু চরিত্রের মধ্যে, কিন্তু অন্যান্য চরিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি সর্পবেষ্টিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বিধবা চরিত্র নিয়ে তিনি বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। 'সিঁড়ি' গল্পটিতে যেমন বাস্তবতা ফুটে উঠেছে তেমনি রাজনীতিও তার স্থান করে নিয়েছে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবেশ মানুষকে কতটা অসহায় করে তোলে তারই চিত্র পাই 'সৌহার্দ্য' গল্পটিতে। মৃত্যু তাঁর গল্পে একটি আসন জুড়ে রয়েছে। 'সেই রাত সেই সকাল' গল্পটিতে পুরুলিয়া জেলার কথা আছে। সেই সূত্রেই আমার মনে হয় পুরুলিয়া জেলার উপভাষায় ব্যবহার থাকলে চরিত্র, ঘটনা আরও পরিস্ফুট হত। 'বেলোয়ারির' গল্পটির মধ্য দিয়ে দোলনচাঁপা শিক্ষা দিয়ে গেল সকলকে। সে প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে ভালবাসার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও সে মি. গাঙ্গুলিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ সম্বলটুকু যখন সে পেল না তখন কারও কাছে মাথা নত না করে নিজের জীবন দিয়ে সকলকে শিক্ষা দিয়ে যায়। ধর্ম কথার অর্থ ধারণ করা। তাই বিভাস ও নাসিম—উভয়েই ভিন্ন জাতের হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম তাদের মাঝে প্রাচীর তুলতে পারেনি। ধর্ম যে কোন মানুষের বিচারকর্তা হতে পারে না তার 'ক্যানভাস' পরিস্ফুট। 'মানুষ-রতন' গল্পটিতে প্যাট ও রবার্টের বোঝাতে বৈষ্ণব পদাবলির অতিরিক্ত লেখিকার নিজস্বতাকে ছাপিয়ে গেছে। 'পাখি-পাহাড়', 'তামাশা' গল্প দুটি অসাধারণ। টিতে ঢাকিওয়ালাদের জীবন ফুটে উঠেছে, পাশাপাশি মাতৃমনের আশঙ্কাও স্থান

লেখিকার সমস্ত গল্পই আদিবাসী-উপজাতিদের নিয়ে। এই সকল গল্পগুলির মধ্যে দু-একটি যদি শহরে বিষয়ভিত্তিক গল্প থাকত তবে পাঠক ভিন্ন স্বাদ গ্রহণে তৃপ্ত হত। 'মাটি' গল্পটিতেও আমরা মাটির মাতৃত্বের পরিচয় পাই। 'দ্বন্দ্ব' গল্পটি আপামর বাঙালি ঘরের শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। 'ফিরে দেখা' গল্পটিতে কুন্তার ফিরে পাওয়া দিন, জীবনের কথা প্রকাশিত। গল্পগুলি আপাত সাধারণ বিষয় নিয়েই রচিত। গল্পগুলিতে বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, কিছু কিছু বাক্য গঠনেও ত্রুটি রয়েছে। সেগুলি হল—২৩ নং (নির্ভুল), ২৪ নং ('পাথরের' পরিবর্তে 'পাথরে' হবে), ২৫ নং (করচিল), ২৬ নং (লাটি), ৪০ নং (শুঁচপুঁতির), ৪৫ নং (গুড়্যাবুড়ি), ৪৬ নং (গেয়ে), ৫৩ নং (অলো), ৫৫ নং (মউমাঝির), ৫৭ নং (অমার), ৬২ নং (ঘটানার), ৬৭ নং (আলোচলায়), ৯৯ নং (ডানারে), ১১৯ নং (কেমাত্র), ১২৫ নং (বুকিং), ১৪২ নং (নীটবালা), ১৪৪ নং (আয়ে, আমার), ১৪৭ নং (সাথি), ১৫০ (মিনি), ১৫১ নং (চুলবে), ১৬৭ নং (মেড়) পৃষ্ঠাগুলিতে বানান ভুল। প্রকাশনার দ্রুততায় বানানগুলি লেখিকার নজর এড়িয়ে গেছে। বানানগুলি হবে—নির্ভুল, করছিল, লাঠি, কাচপুঁতির, গুড়্যাবুড়ি, গেছে, আলো, মউমাছির, আমার, ঘটনার, আলোচনায়, ডানার, কেবলমাত্র, বুকিং, নীপবালা, আয়, আবার, সাথি, বিনি, তুলবে, মেড—ইত্যাদি। শেষে বলা যেতে পারে, লেখিকার আরও একটু যত্ন সহকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করা উচিত ছিল। পরবর্তী গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে আশা করব এধরনের ত্রুটি থেকে তিনি গ্রন্থটিকে মুক্তি দেবেন।

কুলবুলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের প্রচ্ছদটি সুন্দর। গ্রন্থমূল্য ৮০ টাকা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ২০১১। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন দিদা শ্রীমতী নেলী বিশ্বাসকে, গ্রন্থের বিষয়টি ভালো, তবে খুব সাদামাটা। একরৈখিক কাহিনি। কাহিনিতে কোনো জটিলতা নেই। হেমেন্দ্র ও লাবণ্যপ্রভার জীবনকাহিনি উঠে এসেছে গ্রন্থটিতে। তবে বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষণীয়। ১৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে 'গদার মা' কিন্তু ২০ নং পৃষ্ঠায় পাই 'গজার মা'। ২৩ নং পৃষ্ঠায় 'পারব না কিনা জানি না' বাক্যগঠনে ভুল রয়েছে। অতিরিক্ত 'না' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থটিতে একটি স্থানে বলা হয়েছে হেমেন্দ্র-প্রভাবতীর কন্যা শুভা। কিন্তু ৩৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে হেমেন্দ্র লাবণ্যপ্রভার সন্তান শুভা। ৪২, ৪৪, ৯০, ৯৩ পৃষ্ঠায় একই ভুল বানানের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ৪৪ নং পৃষ্ঠায় 'আকুল' বানানটি ভুল।

গ্রাম্য সমাজ বিভিন্ন কুসংস্কারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকে। তাকেই তুলে দেখিয়েছেন লেখিকা বটপাতায় একশো আটবার দুর্গানাম লেখার মধ্য দিয়ে বৃষ্টিকে আহ্বান জানানোর দ্বারা। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ৪১ নং পৃষ্ঠায় 'সন্দেহাকুল' বানানটি ভুল। ৪২ নং পৃষ্ঠায় 'ভূবন' বানান ভুল। ৪৩ নং পৃষ্ঠায় 'দূর্গা' বানান ভুল। ৪৬ নং পৃষ্ঠায় 'উন্নতির স্বপ্নে বিভোর হতে ভালোবাসে সুধীর সরকার' বাক্যটিতে দুবার 'স্বপ্নে বিভোর' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হওয়ায় বাক্য গঠনে ত্রুটি লক্ষণীয়। ৫২ নং পৃষ্ঠায় 'গ্রামের ফেরে' ভুল। হবে 'গ্রামে ফেরে'। শুভার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির সাথে বাস্তবের মিল আছে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর হেমেন্দ্র সপরিবারে পলাশিপাড়ায় স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলে আসে। ৬২ নং পৃষ্ঠায় 'দেশ' এর পরিবর্তে 'বেশ' হবে। লাবণ্যপ্রভার দিদি

কিভাবে হেমেন্দ্র ও লাবণ্যপ্রভার সম্পর্ক তৈরি হল তার কথা রয়েছে। প্রবাসী পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ৭৯ পৃষ্ঠায় 'লাবণ্যলেখা নামটির পরিবর্তন করা হয় লাবণ্যলেখা। গ্রন্থটিতে অসংখ্য কুসংস্কারের কথা রয়েছে। লেখিকার জন্ম পলাশিপাড়ায়। তাই তাঁর গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ৯৫ নং পৃষ্ঠাতেও বানান ভুল। লাবণ্যলেখা নিজের শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য সে তার দিদির ঘর ভেঙেছে, নলিনী প্রমাণ করেছে নারী সর্বংসহা। সে তার শক্তি দিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করে আজ পরীক্ষায় বসে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় পথ তৈরির নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি আপাত সুন্দর উপন্যাস।

আব্দুস শুকুর খান-এর 'ভালোবাসায় ঘরবাড়ি' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ যথেষ্ট সুন্দর ও উন্নতমানের। গ্রন্থমূল্য ১২০ টাকা নির্ধারিত। প্রথম প্রকাশ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২, ফাল্গুন ১৪১৮। ভাষা দিবসের দিন বইটি প্রকাশিত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শচীন দাশ ও আফসার আমেদকে। গ্রন্থটিতে আমরা দেখি সালমা ও দানেশের সুখী পরিবারের চিত্র। কিন্তু অপরিচিত শিশুটিকে ঘিরে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে যে চিড় ধরে তাকে আরও পরিপক্কতা দান করে সালমার বাল্যবন্ধু খাইরতন নোশা। সালমা ও দানেশের ভালোবাসার ঘর ভেঙে গেল। শেষাবধি দানেশ ফিরে এলেও সালমা দানেশের জীবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সন্তানের অভাব তাদের বিচ্ছেদ ঘটালেও সেই সন্তান জন্ম নেয় ঠিকই কিন্তু সালমার আর আগের জীবনে ফিরে আসা হল না। উপন্যাসটি অসাধারণ বিষয় নিয়ে গঠিত। উপন্যাসের প্লটটি বেশ ভালো। তবে উপন্যাসে বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষণীয়। ১১ নং পৃষ্ঠায় 'যায়ে' বানানটি ভুল, এর পরিবর্তে হবে 'হয়ে'। ১২ নং পৃষ্ঠায় 'সে এক মুহূর্তে বাঁচবে না' বাক্যটি ভুল। ১৫ নং (দীন-দুনিয়া), ২৩ নং (আবিষ্কার), ২৭ নং (হা-পোয়া), ৩০ নং (পূণ্যভূমি), ৩১ নং (ছোটখাটো), ৩২ নং (কুলকাতা), ৩৭ নং (আকজ্ঞোর), ৩৮ নং (মাথা নিচু), ৩৯ নং (শাশত), ৪০-৬৪ নং (আকাঙ্খার), ৫৩ নং (হা-হুতাস), ৫৪ নং (সেখান বসে), ৬৪ নং (সামগ্র অধিকার), ৬৮ নং (অসম্ভভ), ৭০ নং (চেঁচামেছি), ৭৫ নং (বিদুৎ, শিটে, কিং কর্তব্যবিমুঢ়), ৭৮ নং (জমিরের পরিবর্তে লেখা জামির, একবেরেই), ৯৫ নং (খামাখা), ৯৮ নং (বিধুমুখী), ১০১ নং (সংসাসের), ১০৩ নং (হঠাং), ১০৪ নং (বারন, প্রাবল), ১০৫ নং (জনই), ১০৭ নং রেখে রেখেছে), ১০৮ নং (পুন্য), ১১২ নং খুন, বাঁজালো, ১১৫ নং আমায় ১২১ নং নেকে শিক্ষক জড়ো...), ১২১ নং (সম্মান), ১২৬ নং (স্বস্তির), ১৩০ নং (জামাইয়ের), ১ নং (পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার অসঙ্গতিপূর্ণ, অর্ধচ্ছেদের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়), ১৪০ নং (পাড়া া—একই শব্দের দুবার ব্যবহার অসঙ্গতিপূর্ণ), ১৪১ নং (পূর্ণ), ১৪৩ নং (জমপুরি), ৩ নং (মুর্তি), ১৫৫ নং (মেয়ে ও ছিল শব্দ দুটির মাঝে ব্যবধান বাঞ্ছনীয়), ১৫৮ নং ('মান, মান, তা না হলে তোকেও...'—সম্বোধনে আপনি ও তুই মিলে মিশে গেছে), ১৫৯ নং মলার), ১৬২ নং (মহিয়ষীর), ১৬৩ নং (শামিল), ১৬৪ নং (বহিস্কৃত), ১৬৮ নং (দুচোখে ধিয়ে), ১৭০ নং (ব্যাথা), ১৭১ নং (ইসারা) পৃষ্ঠায় বানান ভুল। একটি উপন্যাসে এত অজস্র বানান ভুল পাঠককে রসতৃপ্তি থেকে বিচ্যুত করে। বানানগুলি হবে—মুহূর্ত, দীন, আবিষ্কার, হা-পোষা, পুণ্য, খাটো, কলুষতা, আকাঙ্ক্ষার, নিচু, শাশ্বত, হুতাশ, সেখানে, সমগ্র, অসম্ভব,

চেঁচামেচি, বিদ্যুৎ, সিটে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, একেবারেই, খামোখা, বিধুমুখী, সংসারের, হঠাৎ, বারণ, প্লাবন, জন্যই, রেখেছে, পুণ্য, ক্ষুণ্ণ, বাঁধানো, আশয়, অনেক, সম্মান, স্বস্তি, জামাইয়ের, পূর্ণ, যমপুরী, মূর্তি, সালমার, মহিয়সী, সামিল, বহিষ্কৃত, দুচোখ, ব্যথা, ঈশারা, লেখকের প্রকাশনার তাড়াহুড়োতে এত বানান ভুল রয়েছে গ্রন্থটিতে। একটি গ্রন্থের বিষয় যত ভালোই হোক না কেন অজস্র বানান ভুল গ্রন্থটির মান কমিয়ে দেয়। আর একজন উচ্চমানের লেখকের থেকে এরূপ আশা করা যায় না। লেখক যদি বানানের দিকে, বাক্য গঠনের দিকে আরেকটু মনোযোগী হতেন তবে হয়তো গ্রন্থটি আরও উচ্চমানের হত। আশা করব পরবর্তী গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে তিনি যত্নবান হবেন।

পরিশেষে, এইটুকু বলতে পারি, তিনটি গ্রন্থই অসম্ভব ভালো। কিন্তু সামান্য দোষ ত্রুটির জন্য গ্রন্থমান কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরবর্তীকালে লেখক-লেখিকারা তাঁদের রচনার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ও মনোযোগী হবেন এরূপ আশা রাখি।

সেই রাত সেই সকাল : কাজল মিত্র। প্রকাশক—সমীরকুমার মিত্র

জলকথা : বুলবুলি বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১

ভালোবাসার ঘরবাড়ি : আবদুস শুকুর খান। পত্রলেখা। ২০১২

বইপত্র : অল্পকথায়

অনিল ঘোষ

□ রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা : নীরেন্দু হাজরা। সৃজন প্রকাশনী। ১৪২১। ১০০ টাকা।

কবি নীরেন্দু হাজরার বর্তমান প্রবন্ধ গ্রন্থে মূলত আলোচিত হয়েছে বাংলা কাব্য ও কবি নিয়ে। কবি তো শুধু কবিতার স্রষ্টা নন, একই সঙ্গে তিনি পাঠক, সমালোচকও। বর্তমান গ্রন্থে কবির গদ্যে সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অন্তর বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যচর্চার যে ধারা, প্রধানত বামমার্গীয় কবিদের কাব্যবীক্ষা নিয়ে আলোচনা খুবই জরুরি ছিল। বিষয়গুলি নতুন না হলেও আলোচনার ধারা, বিশ্লেষণ নতুনত্বের দাবি রাখে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুকান্ত, সুভাষ, সমর সেন, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল প্রমুখ কবিবৃন্দের কাব্যদর্শন, বীক্ষার আলোচনা করেছেন খুবই প্রাঞ্জল ভাষায়।

□ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। প্যাপিরাস। ২০০৬। ১০০ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার মধ্যযুগের কাব্যধারা, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীর যোগ খুব নিগূঢ়। এ তো জানা কথাই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বৈষ্ণব কাব্য সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী তো বিদ্যাপতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মতো রোমান্টিক কবিকে মধ্যযুগের রোমান্সধর্মী কাব্যধারা প্রভাবিত করবে—এ তো জানা কথা। বর্তমান সংকলনে চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব পদসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মুসলমান কবি সম্প্রদায় ও লোকসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যোগ সংযোগ ও প্রভাবের নিপুণ আলোচনা গ্রথিত আছে।

□ প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব বসু : সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। ২০১০। ১০০ টাকা

বাংলা সাহিত্য ভুবনে বুদ্ধদেব বসু সর্বার্থেই বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ-শিশু কিশোর সাহিত্য—সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগেই তাঁর অনায়াস বিচরণ বাংলা সাহিত্য ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। কাব্যশরীরে যেমন নতুন ভাষা দিয়েছেন, তেমনই কঠিন কঠোর নীরস প্রবন্ধ-গদ্যেও এনেছেন সরসতার জোয়ার। এই বুদ্ধদেবকে কোনও একটি সংকলনে আবদ্ধ করার প্রয়াস বেশ দুরূহ কাজ। সেই কাজটিই করেছেন লেখক। বর্তমান গ্রন্থে বুদ্ধদেব রচিত দুটি বিখ্যাত আত্মজীবনী ('আমার ছেলেবেলা' ও 'আমার যৌবন') নিয়ে আলোচনা আছে, শিশু সাহিত্য ভাবনায় বুদ্ধদেব, প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব, আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে বুদ্ধদেবকৃত রচনার বিশ্লেষণ বেশ যত্ন সহকারে গ্রথিত আছে। বুদ্ধদেব বিষয়ে এই গ্রন্থ খুবই প্রাসঙ্গিক একটি কাজ।

□ রবীন্দ্রনাথ বিকল্প থিয়েটারের সন্ধানে : মলয় রক্ষিত। পরম্পরা। ২০১১। ১৭৫ টাকা

রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু বাংলা থিয়েটার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাটকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতটুকু—সে বিষয়ে আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ

নিজেই একটি ধারা তৈরি করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ধারাই একটি বিকল্প থিয়েটার হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। তরুণ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র থিয়েটারের এই বিকল্প রূপটি সন্ধান করেছেন আয়াসসাধ্য গবেষণায়। রবীন্দ্র নাট্যভাবনা থেকে রঙ্গমঞ্চে গণনাট্য ধারায় রবীন্দ্র নাটকের রূপ স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এমনকী প্রশ্নও তুলেছেন 'রবীন্দ্র নাটক কি যাত্রার সমীপবর্তী'? শম্ভু মিত্র-র প্রযোজনায় রবীন্দ্র নাটক এবং কুমার রায়-এর রবীন্দ্র নাট্যচর্চা দিয়ে বইটি শেষ করেছেন। মাঝখানে আছে রবীন্দ্র থিয়েটারের ভিন্ন মাত্রার ভিন্নকৌণিক সন্ধান ও বিশ্লেষণ। লেখকের ভাষা সাবলীল, ভঙ্গি সহজ। ফলে দুরূহ বিষয়ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

□ **কালের লেখন : ভবানী সরকার। কারুকল্পনা। ২০১৩। ৬০ টাকা**

কালের লেখন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের বই। প্রথমেই বলা ভালো প্রবন্ধের ধরাবাঁধা ছকমেলানো পথে চলতে চাননি লেখক। লেখনীর সরসতা, বিষয়ের গভীরতা কোনও প্রবন্ধকেই গুরুগম্ভীর হতে দেয়নি, বরং নিবিষ্ট পাঠকের মতো রবীন্দ্র-গল্পে নারীর বেঁচে থাকা, জেগে ওঠার কথা বলেন। তেমনই গোকুল নাগ-এর বিস্মৃত উপন্যাস 'পথিক' নিয়ে আলোচনা করেন। সতীনাথ ভাদুড়ির 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর 'খোয়াবনামা' নিয়ে আলোচনা এবং সর্বোপরি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গল্পবিশ্ব নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ আমাদের আকর্ষিত করে। লেখকের বৈচিত্র্যময় বিষয় ভাবনায় বইটি যে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে—এ কথা বলতেই হয়।

□ **ও সুহৃদ অন্ধকার : ঋত্বিক ঠাকুর। সোনার তরী প্রকাশনী। ২০১৩। ১০০ টাকা**

দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখছেন ঋত্বিক ঠাকুর। কাব্যভাষায় তাঁর নিজস্ব ঢং ও কথনভঙ্গি আয়ত্তে আছে। 'ও সুহৃদ অন্ধকার' তাঁর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এখানে তাঁর কবিতার বয়নে আছে সুললিত শব্দ ঝংকার। রোমান্সের আবেশে বুঁদ হয়েও কখনও কখনও ছিঁড়ে ফেলেন ছন্দ তন্তুজাল। পৌঁছে যান মাটি কাটা মানুষের হৃদয়ে, নিরলস ঘাম রক্ত জমাট পরিশ্রমের শরীরে। নতুন কাব্যভাষায় বলতে পারেন—'দেখতে দেখতে বৃষ্টি এল।/ফোঁটায় ফোঁটায় উপচে উঠছে মায়ের দুখের রূপকথা।/ভিজছি। ভিজতে ভিজতে ফিরে আসছে আঁতুড় চৈতন্য।/গলে যাচ্ছে রক্ত মাংস পাথরের ভিটে মাটি।/চাল ডাল নুন। কেরোসিন মাসকাবারের ফর্দ। ধর্মসাক্ষী সোহাগ/বালিশ ভিজছি।'

□ **বাসা ও বদল : অভন্ম চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা লেটারপ্রেস। ২০১৪। ৬০ টাকা**

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। আদ্যোপান্ত একটি গাল্পিক নামকরণকে কবিতার ভাষা দিয়ে আবৃত করা রীতিমতো দুরূহ কাজ। আর এই কাজটাই তিনি অনায়াস স্বচ্ছন্দে করতে পেরেছেন। কবির শব্দপ্রয়োগ, ভাবনার দ্যুতি, ব্যঞ্জনাবদ্ধ চিত্রকল্প যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। চমকিত করে মন-মনন-বোধ। তিনি যখন লেখেন—'সবুজ মাছির চুলে শোলার মুকুট।' কিংবা 'শোলার মাছির চোখে সন্তানের মুখ।' তখন কাব্য-হৃদয়ের গহন প্রদেশ থেকে উঠে আসে একটাই শব্দ কেয়াবাত। উপমার ক্ষেত্রেও তিনি এনেছেন ছবি ও সংগীতের অনুষঙ্গ—'যেরকম মিনিয়েচার

জুড়ে বসে থাকে রাগ ও রাগিণী,/যেরকম পাতকুয়োর গভীরে গোঙিয়ে ওঠে অন্ধকার'। নতুন এই কাব্যভাষায় কবিকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। তবে বেশ কিছু ভুল বানান চোখে পীড়া দেয়।

□ মানুষের সঙ্গ ছাড়িনি : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। জননী প্রকাশনী। ২০১৪। ৮০ টাকা

দীর্ঘদিন ধরে কবিতাচর্চা করে আসা কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় জীবনকে হাড়ভাঙা শ্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন, কিন্তু কাব্যচর্চায় সেই কাঠিন্য রাখেননি। বরং জীবনের ওঠানামা টানাপোড়েনের কাব্যভাষায় লাগিয়েছেন কোমল ধৈবতের তান। কবি যেন নীলকণ্ঠ। তিনি নিজে বিষ ধারণ করেছেন, কিন্তু বিষাক্ত করেননি কবিতার দেহ মনকে। বর্তমান সংকলনে জীবনের বহু দিকগুলি তিনি নিজে যেমন দেখেছেন, তেমন সরল ভঙ্গিতে শুনিয়েছেন তার কথা। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন—'তবু গান তো থামে না—/কবি, গান দাও গান, গরল দিও না—/মানুষ বড় দুঃখে আছে...'।

□ কবিতা পাঠক : শুভেন্দু বারিক। কবিপত্র। ২০১৪। ৬০ টাকা

শুভেন্দু বারিক পরিণত বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। বর্তমান সংকলনটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। জীবনের পথ পরিক্রমায় যা কিছু দৃশ্যমান, যার মধ্যে কবি-হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটেছে তাই রূপ পেয়েছে কাব্য শরীরে। তাঁর দেখার জগৎ শুধু দৃশ্যমান নয়, বোধের মননেরও। তিনি চলতে চলতে দেখতে পান 'বর্ণভেদ জাতিভেদ ধর্মভেদ মানুষেরই গড়া—/মানুষের অবয়বে দেখি ছায়ার সঞ্চার, অথচ/মানবিকতার অবয়ব থাকে বোধের গভীরে।' তাঁর উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। তিনি গভীর প্রত্যয়ে বলতে পারেন—'আর দেরি কেন। সব দায় অক্লেশে/ঝেড়ে ফেলে দাঁড়াও দরজা হাট করে।'

□ কঙ্গো থেকে বলা : সন্তোষকুমার ব্রহ্ম। পাললিক। ২০১২। ১০০ টাকা

কালো আফ্রিকা আজও বিস্ময়ের মহাদেশ হয়ে আছে। কঙ্গো সেই মহাদেশেরই একটি অংশ। অনেক কথা-কাহিনি-কিংবদন্তির জনক এই দেশটিতে আছে দীর্ঘ শোষণ আর বঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস। সেই দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ এবং সেই কবি সম্পর্কে পরিচিতি দিয়েছেন সংকলক। সঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা এক পরম প্রাপ্তি। সেইসঙ্গে কিছু চিত্র এখানে সংযোজিত হয়েছে, যেখানে কঙ্গোর লোকচিত্রকলা থেকে আধুনিক শিল্পিতার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

□ প্রেম পদাবলী : আবদুল শুকুর খান। পত্রলেখা। ২০১১। ৫০ টাকা

কবিতার হাত পায়ের চলাচল বহুমুখী। সে চলা নিরন্তর যেন এক প্রবাহ। তবু এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, পৃথিবী যতই জীর্ণ শীর্ণ জরায় পুরনো হোক, বা চকচকে এলিডি ল্যাম্পে আধুনিক হয়ে উঠুক, প্রেম আজও আজও অমলিন, আজও নতুন। সকল চলাচলের সাথী প্রেম। কবিতার সেই উষাকাল থেকে এই এক উপকরণ সমানভাবে জাগরূক, আজও তার গতি অব্যাহত। বর্তমান সংকলনেও কবিতার সেই চিরন্তন রূপটি আলোকিত হয়ে আছে। তিনি এই সময়ে বসে অনায়াসে বলতে পারেন—'তুমি এলে/গাছে গাছে ফুল ফোটে; দুধ আসে ধানে/জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসে পৃথিবী, তুমি এলে/ঋতুমতী হয় নারী, গর্ভে গর্ভে আসে ভ্রূণ'।

□ **সময়ের ঘড়িচিহ্ন ভেঙে : আবদুস গফুর খান। সূচিপত্র। ২০১২। ৫০ টাকা**

সময়ের কথালাপ পরতে পরতে জড়িয়ে আছে সংকলনের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, শব্দ অক্ষরের মায়াজালে। সময় চলে যায় সব বাধা এড়িয়ে, সব বন্ধুরতা মাড়িয়ে। আলোর উৎসে পৌঁছতে অন্ধকার ভেঙে ভেঙে শব্দের লাবণ্য ধরতে চেয়েছেন কবি। বলতে চেয়েছেন—'তবুও অশান্তির আবহ বিঁধে থাকে বুকে/পরাশ্রিতের যন্ত্রণা তীব্র বিষের সমান।'

□ **সেকাল একালের মুখ : অশোক মৌলিক। শ্রীমতী প্রকাশনী। ১৪২০। ৮০ টাকা**

কবিতা জীবন কথনের পাঠ দেয়, তারই রূপময় পরিচয় দেখা গেল অশোক মৌলিক রচিত বর্তমান সংকলনটিতে। সুন্দর অথচ দ্যুতিময় বাক্যে তিনি অনায়াসে বিচরণ করেন দেশ-কাল-সমাজের চেনা অচেনা ভূমিতে। তিনি সারল্যের সঙ্গে বলতে পারেন—'দুপুরে দরজায় দেবে নাড়া/ধুলায় লুটিয়ে যাবে মৃত হৃদয়/হৃদয়। সে তো খায়নি তখন/সকাল বিনা আসনি কেন?' বা কখনও তিনি আলোক ইশারায় বলেন—'আর কিছু হাজির হবে আগামী সন্ধ্যেয়/কালপুরুষের মত হয়ে ওঠা শিকারি/পুরস্কারে'।

□ **খোয়াই : কাজল মিত্র। ভাষালিপি। ১৪১৯। কলকাতা ৪০ টাকা**

তিন ফর্মার সাদামাটা আকারে কবিতার বই। ছোটো বড়ো সব ধরনের কবিতায় আন্তর সৌন্দর্য প্রকাশে দীপ্যমান। প্রেম প্রীতি ভালোবাসা বেদনায় ছন্দ-শব্দ শরীর নিজস্ব দ্যুতিতে উজ্জ্বল। জীবনের নানা রূপ আলোর ফুলকির মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ভাবা-ব্যক্তি-ব্যক্তিত্ব-নগর মানসিকতার ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ক্রম বিন্যাসে। তিনি আশা রাখেন সময়ের কাছে। বলতে পারেন—'বীজতলা আমার আছে/দিতে পারি একটুকরো স্বর্ণজমিন/যেখানে রোপণ করব সবুজ চারাগুলি।' আবার জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট বলে দেন—'জীবন মানে যদি যন্ত্রণা/তবে যন্ত্রণাই কেন ভালবাসা/জীবনই ভালবাসা, নাকি ভালবাসাই জীবন/জীবনের খোঁজে ভালবাসা হারাই/আর ভালবেসে পেলাম/সেই জীবনকেই'।

□ **পাতালবহ্নি : দীপা বিশ্বাস। কৃত্তিবাস। ২০০৯। ৪০ টাকা**

ব্যক্তিগত অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ দীপার কবিতায়। ব্যক্তিক মানসতা থেকে উৎসারিত প্রেম প্রীতি ধোঁয়া ধুলো অপমানের মধ্যে অনায়াস বিচরণ করে যান। তিনি ভেসে যেতে চান উজানে। অমোঘ উচ্চারণে তুলে দেন—'ফিরে গেছে প্রেম আসবে না আর মন কি মানে/সেই অপরূপ শিহরণ জাগুক তপ্ত শরীরে/মরতে নামবে কি কালবৈশাখী কৃষ্ণ তিমিরে'।

□ **হয় তুমি নয় নক্ষত্র : অরুণ পাঠক। সাহিত্যের বেলাভূমি। ১৪২০। ২০ টাকা**

চব্বিশ পাতার কবিতার বই। ছোটো ছোটো চিত্রকল্পের মাধ্যমে জীবনকথা প্রেম প্রীতি নগর মানসতার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শব্দময় চিত্রকলা স্ফুরণে তিনি খুবই দক্ষ। সেই দক্ষতার কথা তিনি বলেন—'তুমি এলে সারাটা দিন সঙ্গে, চুপি চুপি অন্ধকার সাঁকো/আমার ভেঙে পড়া মানসিক ইচ্ছায় যত মস্তিষ্কক্ষরণ/যত স্বপ্নের কালো জল, নেমে আসে দেবদূত/চিনতে না পারার মতো ব্যর্থ সব স্পর্শের স্পর্শ আলোকিত দান'।

□ এইটুকু : তাপস সরদার। সৌহার্দি। ২০১৩। ৫০ টাকা

কবিতা কি নিছক জীবনের প্রতিচ্ছবি? তাপস সরদারের কবিতা পড়তে পড়তে কথাটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পথ চলতি অনেক দৃশ্য রূপ ধরা পড়ে চোখে। তারই বাঙ্ময় প্রকাশ দেখি তাঁর কবিতায় শব্দ চয়নে। গঙ্গার রূপ দেখে তিনি বলতেই পারেন—'পুণ্যতোয়া গঙ্গার দেশে/এখানে হাজার ক্ষুধা আবদ্ধ থাকে বিবপাত্রে/হাটে বা বাজারে/দানধ্যান কি-কম ফকিরের সেবা ঝুলির আশীর্বাদ/ফিরি হয় মানুষি শরীর'...শেষে তিনিই বলেন—'তবু পুণ্যতোয়া গঙ্গার উপকূলে আমাদের জীবন'।

□ এসো মৃত্যু দু'দণ্ড অবসরে : দুলালেন্দু সরকার। পৃথিবী। ২০১৪। ৫০ টাকা

কবি দুলালেন্দু সরকারের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। চলার পথে বহু মুখ, ঘটনা, ছবির মুখোমুখি আমাদের হতেই হয়। কবিও মানুষ। তিনিও চলেন, তিনিও দৈনন্দিনতার মুখোমুখি হন। উপলব্ধি করেন। তারপর কাব্যের ক্যানভাসে আঁকেন সেইসব ছবি কথা-শব্দের আঁচড়ে। তাঁর কাব্যভাষায় মূর্ত হয় জীবনের জলছবি। সেখানে প্রেম যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, তেমনই ক্ষুধা-কান্নার ছবিও সমান্তরাল চলে। কবি এক অপাপবিদ্ধ ভাষায় বলতে পারেন—'কান্নার শব্দগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়/দ্রুতগামী দূরপাল্লার ট্রেনের শব্দে'। অথবা দিন বদলের আকাঙ্ক্ষায় বলতে পারেন—'তুমি যেদিন ভাসতে চাইবে/অনায়াসে চলে আসব আমি/মেঘ হয়ে পার হয়ে যাব কয়েক জন্ম'। তবে এত সুন্দর কাব্য সংকলনে হঠাৎ 'স্বপ্নডানা' নামে গদ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ বোঝা গেল না।

□ এবং আত্মকথা : বৃন্দাবন দাস। কবিপত্র। ২০১৩। ৪০ টাকা

উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার কবিতার বই। কবি মনে হয়, দীর্ঘ কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। নীরব অথচ বাঙ্ময় উচ্চারণে কবি যেন নিমগ্ন হয়ে থাকেন। তিনি সহজেই বলতে পারেন—'সুপ্রিয় মানুষ—তুমি আর/ভালোবাসার অহংকার দেখিও না;'। এই জীবনবোধ আরও গভীর হয়ে ওঠে যখন বলেন—'রাখালিয়া জীবন রাখাল হতে তবু কোথাও বাধা/গুমরে গুমরে ওঠে নদীপ্রাণ শ্বাসবায়ু'।

□ অজয় কেন তুমি পদ্মা হলে না : প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিকণ্ঠ প্রকাশনী। ২০১২। ৫০ টাকা

আসানসোল থেকে শোভন সুন্দর রুচিসম্পন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে একসঙ্গে তিনজনের কবিতা সংকলন 'অজয় কেন তুমি পদ্মা হলে না'। তিনজনই যে যার নিজস্ব ভুবনে বসে শব্দ অক্ষরের চর্চা করেছেন। বলে চলেন ঘনঘন মনোভূমির কথা। সেখানে কেউ আশা প্রকাশ করেন—'একটা জীবন...একটা নদী...একটা উপত্যকা/শুধুমাত্র একটা কবিতার প্রতীক্ষায় আছি/জন্ম দিলে/বাণপ্রস্থে চলে যাবো'। তখন অন্যজন দ্যুতিময় ভাবনায় লেখেন—'রোদ্দুর পাড়ি দেয় ভালোবাসার উঠোনে/ভালোবাসা মেঘের বাড়ি সামলায়'। বেশ কিছু সুন্দর পংক্তিমালায় সাজানো সংকলনটি।

□ **প্রান্তিক : সীমা চক্রবর্তী। উদ্যান। ১৪১৯। ১০০ টাকা**

কবিতার বই। শিরোনামে লেখা হয়েছে প্রান্তজনের সাতকাহন। সমাজের প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নারা জীবনের কথা এঁকেছেন ছন্দে ছড়ায়। একটু পুরনো ঢঙের কবিতা, কিন্তু জীবনের রসে উজ্জ্বল। প্রান্তিক মানুষের কবিতা না বলে একে জীবনগাথা বলা উচিত।

সংযোজন—উবসী ভট্টাচার্য

□ **স্তবকে অনেক মুখ ও আরও : বিজয় পাল। প্রতিভাস। ২০১৪। ৮০ টাকা**

কবি বিজয় পাল দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পাশাপাশি নীরবে সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন, প্রথমদিকে কিছু পত্রপত্রিকায় লেখালিখি করলেও, পরবর্তীকালে একেবারেই অবসর নেন সাহিত্য জগৎ থেকে। কিন্তু কবিতার বাস তো কবি মননে, তাঁর কলম থেকে কখন অগোচরে এসে পড়ে তা বোধহয় কবিও জানেন না। আলোচ্য বইয়ের 'স্তবকে অনেক মুখ' বিভাগের কবিতাগুলি ওই নামের বই-এ প্রকাশিত, কিন্তু তা আজ আর পাওয়া যায় না, এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'আরও' বিভাগে অগ্রন্থিত কবিতাগুলি। কবি বিজয় পালের মৃত্যুর পর তাঁর এই বই সংকলিত হয়। বইটির প্রতি কবিতায় ছড়িয়ে আছে প্রেম, নস্টালজিয়া, জীবনবোধ। জীবনের চলার পথে কুড়িয়ে পাওয়া সময়ের ইতিকথাই যেন কবিতাগুলি। নিখুঁত ছন্দ, আবেগময়তার চলন প্রতি পংক্তিতে। যেমন—'উত্তাপ পোহায় প্রেম, গোদাবরী নিয়ত বহতা/মনে হয় পৃথিবীটা হৃদয়ের ফুলন্ত বিতান'। টুকরো কিছু ছবি যেন জীবনের ক্যানভাসে ভেসে উঠল। অনুভবী মনের নির্জন ডায়েরি কবিতাগুলি, কখনো বা জীবনের আয়না। বাঁচার স্তবক জুড়ে ভিড় করে আসে মুখ, সময়, জীবন-জীবনের কবিতা। কবি যখন বলেন—'ক্রুর ভয় বাতাসের মতো ঘিরে থাকে এই সমাজসংসার-/পূর্বাভাস ব্যাপক ঝড়ের'।
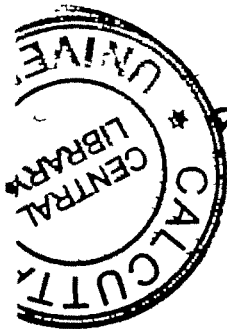
পরিচয় পত্রিকার আগামী সংখ্যার বিষয়

সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ের গ্রন্থ সমালোচনা

জুন মাসে প্রকাশিত হবে

পরিচয় সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭
মূল্য : ১০০.০০ টাকা